মহামন্ত্রী সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (ভারতীয় জাতীয় বাহিনী)

অংকণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় : রূপ-মঞ্চ ১৩৫২

শান্তিনিকেতনে অনেকের মাঝে কবিগুরুকে দেখা যাচ্ছে।

EXOTIC
BEAUTY
REVEALS

Astringent Lotion, Odorex,
Hair Oil, etc."

EXOTIC
Odorex

রূপ-মঞ্চ

৫ম বর্ষ : বৈশাখ ১৩৫২ : ৩য় সংখ্যা

ওরে যাত্রী,

ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী ;

চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি

ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি'

দিগন্তের পারে দিগন্তরে।

ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,

নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,

নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।

পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,

শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদ।

পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,

পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ় ফণা।

নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ

এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

রবীন্দ্র-স্মৃতি-সংখ্যা

নিয়ে দিকে দিকে প্রবাহিত হয়ে মরুর ভূমিকে শস্য শ্যামলা করে তোলে, তেমনি রবীন্দ্র-প্রতিভা আমাদের সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়ে তাকে সুন্দরতর ও মধুময় করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ছিলেন কবি—কিন্তু উপন্যাস, গল্প, সংগীত, নাটক আমাদের সাহিত্যের বিভিন্নধারা যে তাঁর বিভিন্নমুখীন প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জল, আমাদের সাহিত্যকে যে তাঁর প্রতিভার আলোকে জগতের আসরে দীপ্তিমান করে গেছেন, বাঙালী কি সেকথা কোনদিন ভুলতে পারবে? পারবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে ম্লান করে যদি বাংলা সাহিত্যে অদুর ভবিষ্যতে কোন শণজন্মা প্রতিভাধরের আবির্ভাব হয়—সে পরম সৌভাগ্যের দিনেও আজকের রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালী পরম শ্রদ্ধার সংগেই স্মরণ করবে।

সংগীত এবং নাট্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দানও অকিঞ্চিৎকর নয়। রবীন্দ্র-কাব্যের মতই তা বাঙ্গালীর গৌরবের সম্পদ। রবীন্দ্র-সংগীত এবং নাটক আভিজাত্যের কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের জীবনের ঘাত প্রতিঘাত, বাধা-বিঘ্ন ও অন্তরের বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করে নাটকের জন্ম। নাটকে অবাস্তবের স্থান খুব কম। অপ্রকৃত বা অরূপের স্থান নাটকে আমরা সাধারণত সহ্য করতে পারি না। কিন্তু অরূপের রূপ কল্পনায়ও যে বহু নাটক লিখিত হয়েছে এবং সে সব নাটকের কতগুলি যে আমাদের সমাদর লাভ করতে সক্ষম হ'য়েছে একথাও সত্য। যে কবি বা নাট্যকার অসীমকে সীমার মাঝে আনতে পেরেছেন—অন্তর্দৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম কল্পনার সাহায্যে অরূপের রূপ বর্ণনায় যে রূপক নাটক লিখিত হ'য়েছে—পাঠক-অন্তরে কেবলমাত্র সেই সব রূপক নাটকই স্থান করে নিতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক গুলিকে এই শ্রেণীর ভিতরই গ্রহণ করতে হয়। কবিগুরু তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে যে অরূপের রূপ দেখতে পেয়েছিলেন—তাঁর নাটকে সেই অরূপকেই রূপায়িত দেখতে পাই। রূপক নাটকের এখানেই সার্থকতা।

রবীন্দ্র নাটকের সমালোচনা করতে আমি এখানে আসিনি—সে ধৃষ্টতাও আমার নেই। রবীন্দ্র-নাটকের অনন্ত মাধুর্যের এক কণা পান করে যে আনন্দ পেয়েছি, এখানে সেই আনন্দোপলব্ধির আংশিক বিকাশেরই পরিচয় দিতে প্রয়াস পাবো। রবীন্দ্রনাথ যেমনি দরদী—তেমনি ছিলেন সুন্দরের উপাসক। তাই মানব মনের হাসি-কান্নার কথা যেমনি তাঁর নাটক থেকে বাদ যায়নি—তেমনি যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মধুর তাও স্থান পেয়েছে রবীন্দ্র-নাট্যে। তিনি গরলের মাঝে অমৃতের সন্ধান দিয়েছেন, ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টির বীজ আবিষ্কার করেছেন। প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলে তাঁর কাব্য অনন্ত মাধুর্যে ভরপুর। সেই আনন্দ সাগরে অবগাহন করে পাঠক-মন পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে।

* * * * *

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের রচনা। এই নাটকের সন্ন্যাসী দুঃখ কষ্টে জর্জরিত সংসার জীবনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করে গুহাবাসী হয়ে মনে করেছিল—"খুব টেক্কা দিলাম—প্রকৃতি আর তার মায়াফাঁদে আমাকে আকড়ে রাখতে পারলো না।" তাই তাকে বলতে শুনি:

কী কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসী প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়াফাঁদে।

যেন সন্ন্যাসী এখন সমস্ত দুঃখ কষ্টের বাইরে! কিন্তু সত্যই কী আমরা প্রকৃতির অসংখ্য বন্ধনের হাত এড়াতে পারি? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পারি না। রবীন্দ্রনাথের সন্ন্যাসীও শেষ পর্যন্ত পারেনি। যারা পারে তারা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। কারণ সুখ এবং শান্তি পেতে হ'লে—দুঃখ কষ্টে জর্জরিত সংসার আশ্রমের মাঝ থেকেই আবিষ্কার করতে হবে। তাই গুহাবাসী হ'য়েও সন্ন্যাসী আনন্দের আস্বাদ পেল না। দুঃখ কষ্টে ভরা এই সংসার জীবনের মাঝেই আনন্দের সন্ধানে তাকে আসতে হ'লো। এই সংসার সমুদ্র মন্থন করেই ত অমৃত পাওয়া যাবে। নইলে ক্ষুদ্র বালিকা যখন 'পিতা পিতা' বলে ডেকে উঠলো, সন্ন্যাসী ওভাবে বিচলিত হয়ে পড়লো কেন?

আয় বাছা, বুকে আয়, ঢাল্ অশ্রু-ধারা,
ভেঙে যাক এ পাষাণ তোর অশ্রু-স্রোতে,
আর তোরে ফেলে আমি যাবনা বালিকা,
তোরে নিয়ে যাব আমি নূতন জগতে।

বালিকার হাত ধরে সন্ন্যাসী সেই জগতেই পা বাড়ালো—যে জগত একদিন তার কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। সেই জগতই আবার তার কাছে আনন্দ মুখরিত হ'য়ে উঠলো। তার দিকে দিকে সন্ন্যাসী আনন্দ সংগীত শুনতে পেলো :

জগতের মুখে আজি একী হাস্য হেরি!
আনন্দ তরঙ্গ নাচে চন্দ্র সূর্য ঘেরি।
আনন্দ হিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছসি উঠে পাখির গলায়
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

নির্ম্মম নিয়তির নিঠুর পরিহাস! যে বালিকার হাত ধরে সন্ন্যাসী প্রকৃতির বুকে আনন্দের জয় গান শুনতে পেয়েছিল—সেই বালিকার মৃত্যুতে প্রকৃতি একদিন নিদারুণ প্রতিশোধ নিয়ে দেখালো, এই সংসারে অনাবিল শান্তি নেই। আমাদের চলার পথে প্রতি পদক্ষেপে আলো ও আঁধারের খেলা চলেছে। এই আলো আঁধারের ঘূর্ণাবর্ত্তের হাত থেকে আমরা কোন মতেই রেহাই পেতে পারিনা!

প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে একটী বিষয় লক্ষ করবার, এখানে কবিগুরু দু'টী সত্যকে প্রচার করতে চেয়েছেন—প্রথমটী হচ্ছে—সন্ন্যাসী-জীবনের কঠোরতার মাঝে যে মানবতা ছিল—বালিকার সংস্পর্শে সেই মানবতার বিকাশ এবং দ্বিতীয়টী হচ্ছে—যতই আমরা দুঃখ কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই না কেন—নিরবচ্ছিন্ন সুখ নেই। সুখের ভাগ নিতে গেলেই দুঃখের ভাগ গ্রহণ করবার জন্য তৈরী হয়ে থাকতে হবে।

* * * * *

'বাল্মীকি প্রতিভা' কবিগুরুর প্রথম বয়সের গীতিনাট্য। এখানেও কবি মানুষের জয়গানই গেয়েছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' অভ্যাসের কঠোরতায় সন্ন্যাসীর ভিতরকার

বিসর্জন নাটকে—রঘুপতির ভূমিকায়
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

মানুষটী ঢাকা পড়েছিল—সন্ন্যাসীর ভিতর চিরকালের যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল—সেই মানুষটী একদিন বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো। 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে দস্যুর নির্ম্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা—তার এই স্বাভাবিক মানবত্ব অভ্যাসের কঠোরতায় ঢাকা পড়েছিল।

দস্যু রত্নাকর গহন অরণ্যে প্রতিষ্ঠিত কালীমাতাকে নর রক্ত দিয়ে অর্ঘ দেয়—পথচারীদের হত্যা করে ধন-রত্ন লুণ্ঠন করাই তার অধিনস্থ দস্যুদের প্রধান উপজীবিকা,

সমস্যার শেষ নেই

আজকের এই দুর্দিনে বাড়ির কর্ত্রীর অবস্থাই সব চেয়ে শোচনীয়। সমস্যার আর শেষ নেই—খাদ্যের দাম আগুন, কাপড়জামা, কয়লা-কাঠের অবস্থাও দিনদিনই গুরুতর হতে চলেছে। এত সব সামলে ছেলেমেয়েকে স্কুলে ও কর্তাকে অফিসে পাঠানোর ব্যবস্থা করা কি সহজ কথা! কিন্তু এই দুঃসময়ের মধ্যেও একজন প্রকৃত বন্ধু তার আছে। সে হচ্ছে চা। দুশ্চিন্তা ও খাটুনিতে অবসন্ন হয়ে পড়লেও এক কাপ চা তাকে চাঙ্গা করে তুলবেই। চিন্তা-ভাবনা দূর করে মনে নতুন আশার সঞ্চার করতে এবং আগত সুদিনের সম্ভাবনায় তাকে সজাগ করে তুলতে একমাত্র চা-ই পারে।

আজ্ঞাবাহী দস্যুরা বলির জন্য এক বালিকাকে নিয়ে এলো একদিন। নির্মম দস্যু সর্দার বলির উপকরণ দেখে উল্লসিত হয়ে বলে: নিয়ে আয় কৃপাণ; রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা

শোণিত পিয়াসা, যা ত্বরায়।

লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িৎ খেলে চোখে,

করিয়ে খণ্ড দিগদিগন্ত, ঘোর দন্ত ভায়।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র মত দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে অন্তর সৌন্দর্যের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য এখানেও কবি—গুরু এক বালিকার সাহায্য নিয়েছেন। তাই যে মুহূর্তে বালিকা বেশী সরস্বতীর কাতর ধ্বনি শুনতে পাই:

দয়া করো অনাথারে, কে আমার আছে

বন্ধনে কাতর তনু মরি যে ব্যাথায়।

যে মুহূর্তে বনদেবীর অনুনয় শুনতে পাই:

(নেপথ্যে) দয়া করো অনাথারে, দয়া করগো,

বন্ধনে কাতর তনু জর্জর ব্যাথায়।

সেই মুহূর্তে পাষাণ-হৃদয় দস্যু সর্দারের চোখের কোনে জল দেখতে পাই:

পাষাণ হৃদয়ো গলিল কেনরে,

কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!

করুণার প্লাবনে পাষাণের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাই অধিনস্থদের প্রতি দস্যু সর্দারের আদেশ:

শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ,

কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে।

বাঁধন কর ছিন্ন।

মুক্ত কর এখনি রে।

তারপর দস্যু বাল্মীকির আজ একি ভাবান্তর! শাশ্বত শান্তির অন্বেষণে শূন্যমনে ব্যাকুল অন্তরে তাকে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে দেখি। যে দস্যু নির্মম হস্তে শত শত প্রাণীকে হত্যা করেছে—ভীত মনে হরিণ শাবককে ছুটতে দেখে আজ তার মনে করুণার উদ্রেক হলো—অধিনস্থদের শর নিক্ষেপ করা থেকে বিরত করলো। শত শত নিরীহ মানুষের রুধিরে করাল মূর্তি কালীকে স্নাত করতে যার মন কাঁপেনি—হরিণ শাবকের প্রাণ নিতে আজ গভীর ব্যথায় তার মন ভরে উঠলো।.........বাধা না মেনেও যখন ব্যাধের তূণ দু'টি প্রেমালাপী ক্রৌঞ্চকের একটিকে আহত করলো—আর একটির বিরহ ব্যথায় আহত ক্রৌঞ্চকের শোকে তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো—শোকের অভিব্যক্তিতে করুণার উষ্ণ প্রস্রবণ স্নাত ভাষার প্রথম শ্লোক মুখ দিয়ে নিঃসৃত হলো:—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম গমঃ শাশ্বতী সমাঃ,

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

যে কালী প্রতিমাকে দস্যু সর্দার একদিন শত শত মানুষের রক্তে অভিষিক্ত করেছে, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বলে এলো:--

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা!

পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা।

এতদিন কি ছল করে তুই, পাষাণ করে রেখেছিলি,

(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন-জলে গলেছি মা।

কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন,

আমায় তুমি ছলে ছিলে, (এবার) আমি তোমায় ছলেছি মা।

মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা।

* * * * *

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সূচনায় 'মায়ার খেলা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মায়ার খেলায় গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারেনি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।" শুধু 'মায়ার খেলা'ই নয়, রবীন্দ্র-কাব্যের এটাই হলো বিশেষত্ব—বাইরের অর্গল ঠেলে ভিতরের মানুষটীকে আবিষ্কার করা।

'মায়ের-খেলা' নাটকের নায়ক অমর নবযৌবন বিকাশে হৃদয়ের মাঝে অপূর্ব আকাঙ্খা অনুভব করলো—আপন মানসী মূর্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজতে একদিন বেরিয়ে পড়লো। শান্তা অমরকে ভালবাসতো—কিন্তু চিরদিন কাছে কাছে পেয়েও শান্তার অন্তরের ভাব তার কাছে অবিদিতই রয়ে গেল। প্রমদার কুমারী হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয়নি। 'ভালবাসা' কথাটার তার কাছে কোন দাম নেই। নিজের মনে সে হেসে খেলে বেড়ায়—আয়ো

অনেককে খেলায়। তার অহংকারী-মন কুমার বা অশোকের ডাকে সাড়া দেয় না। সে বলে :—

কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে ওঠে, কত ফুল যায় টুটে
আমি শুধু বলে চলে যাই।
পরশ পুলক-রস ভরা রেখে যাই, নাহি দেই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা-হুতাশ
চকিতে শুনিতে শুধু পাই
চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

কিন্তু প্রমদার এই গর্ব আর বেশীদিন টিকল না। প্রেমের অভিনয় করে করে প্রেমের ফাঁদে একদিন তাকে পড়তে হলো। অমর এসে যেদিন জিজ্ঞাসু নেত্রে তার কাননে প্রবেশ করলো, তার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রমদার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সখীদের ডেকে বল্‌লো :

দূরে দাঁড়ায়ে আছে,
কেন আসেনা কাছে,
যা, তোরা যা সখী, যা শুধাগে,
ঐ আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

...........উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলো। অমর প্রমদাকে একা পেয়ে যেই প্রেম নিবেদন করতে গেল সখীদের কাছ থেকে সে পেল বাধা। লজ্জা এসে প্রমদাকে আচ্ছন্ন করলো—সে কোন প্রতিবাদ করতে পারলো না। অমরের অসুখী মন শান্তার প্রতি ফিরে এলো। দীর্ঘ বিরহে শান্তার প্রতি মনের অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন অনুভব করবার সুযোগ এলো তার। শান্তার কাছে নিজেকে সঁপে দিল :

এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়
শীতল স্নেহসুধা করো দান,
দাও প্রেম, দাও শান্তি; দাও নূতন জীবন।

শান্তা ও অমরের মিলনোৎসবে পুরনারীগণ কাননে এসে আনন্দের গান গাইছে—অমর শান্তার গলায় মালা পরিয়ে দিতে যাবে—এক পার্শ্বে বিষাদ প্রতিমা প্রমদার করুণ রূপ

রবীন্দ্রনাথ : শিল্পী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় অংকিত একটী পেনসিল-স্কেচ।

দেখে অন্যমনস্ক অমরের হাত থেকে সে মালা খসে পড়লো। সমাগত পুরনারী এবং শান্তা বুঝলো দু'টী হৃদয় এক তন্ত্রীতে বাঁধা। শান্তা অমরকে ভালবাসে। নিজের দাবী মেটাতে যেয়ে সে কোনমতেই দয়িতের জীবনের সুখ-শান্তির অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে না। নিজেকে বিসর্জন দিয়েও দয়িতকে সুখী করাই যে দয়িতার কাম্য। তাই তাকে বলতে শুনি!

আমি কেন মাঝে থেকে, দু'জনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে।

শান্তা ও সখীগণ অমর ও প্রমদার মিলনের জন্য প্রস্তুত হ'লো। কিন্তু এমনি ভাবে প্রেমাস্পদকে গ্রহণ করে প্রমদা কেন নিজের অসম্মান করবে—তার অহংকারী মন বলে উঠলো—

ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ।

অমর নিজের ভুল বুঝতে পারলো। মায়ার ছলনায় সে হৃদয় নিয়ে খেলা করেছে। তার এই ভগ্ন সুখ—তার এই ম্লান মালা কী কেউ গ্রহণ করবে? কেন করবে না! তার শান্তা—অমরের মুখে হাসি ফোটাতে সে যে সব সময়ই প্রস্তুত। ঐ ভগ্ন সুখ—ঐ ম্লান মালা সে তার শাশ্বত প্রেমের ছোঁয়ায় বিকশিত করে তুলবে।

যদি কেহ নাহি চায়, আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব
আমার হৃদয়-মন, সব দিব বিসর্জন
তোমার হৃদয়-ভার আমি বহিব।
ভুল-ভাঙ্গা দিবালোকে, চাহিব তোমার চোখে,
প্রশান্ত সুখের কথা আমি কহিব।

প্রমদার ভুল ভাঙলো। সে বুঝতে পারলো নিজের অহংকারে নিজের সর্বনাশ সে কেমন করে ডেকে এনেছে। ব্যর্থ জীবনের বোঝা আজ তাকে একাই বহন করে চলতে হবে। তার বেদনায় কেউ সমবেদনা জানাতে আসবে না—কেউ আসবে না তার অশ্রু মুছিয়ে দিতে। অতৃপ্ত জীবনের হাহাকারে তার সমস্ত অহংকার ভেঙে চুড়মাড় হয়ে গেল—মায়া কুমারীগণ তাই তাকে লক্ষ্য করে বলে—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না
শুধু সুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা।

কবিগুরুর যে তিনখানি নাটক নিয়ে এখানে আলোচনা করলাম—তার ভিতর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এবং 'মায়ার খেলা' মূলত কাব্যনাট্য—'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য। তিনখানি নাটকই কবিগুরুর অপরিণত বয়সের লেখা। সমালোচকের দৃষ্টিতে তার যে দুর্বলতা চোখে না পড়ে তা নয়—বিশেষ করে 'মায়ার খেলা' নাটকে মূল সূত্র একটু বাধা পেয়েছে বৈকী—একথা কবিগুরু নিজেই স্বীকার করে গেছেন। কিন্তু সংগে সংগে সমালোচকেরা একথাও স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই, অপরিণত বয়সের এই তিনখানি নাটকেই কবিগুরুর প্রতিভা আত্মবিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

রূপমঞ্চ পড়ুন

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্য-কলার সচিত্র মাসিক।
বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মুখপত্র।

কার্যালয়ঃ
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: বি, বি, ৪২৯২

—পৃষ্টপোষকতায়—
নিতাইচরণ সেন
এন, সি, ঘোষ
দীনেশ দত্ত
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
বিভূতি ভূষণ দত্ত
এস, কে, রায়
এইচ বোর্ণ

(ঙ) সমাজের অকল্যাণকর, দুর্নীতি-মূলক—জাতীয় আদর্শের পরিপন্থী নাটক এবং চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বিরত থাকা।

(চ) দর্শক সাধারণকে সংঘবদ্ধ করে জনমত গঠন করায় বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে তুলতে সাহায্য করা।

(ছ) নূন্যাধিক দশজন দর্শক একত্রিত হ'য়ে মূল সমিতির সংগে যোগাযোগ রেখে শাখা সমিতি গঠন করা।

(জ) শিশুদের উপযোগী শিক্ষা ও নির্দোষ আনন্দ-মূলক নাটক ও চিত্র নির্মাণে আন্দোলন করা।

সর্বোপরি জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ সর্বপ্রকার কৃষ্টিমূলক আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে তুলতে সাহায্য করা।

রূপ-মঞ্চের একপাতা বিজ্ঞাপনের দাম বার্ষিক ৯৬০৲ টাকা— রূপ-মঞ্চের বার্ষিক গ্রাহকের হার সডাক ৮৲ টাকা; একপাতা বিজ্ঞাপন বৃদ্ধির চেয়ে একজন গ্রাহক বৃদ্ধিকে রূপ-মঞ্চ বেশী লোভনীয় বলে মনে করে।

গ্রাহক হতে হ'লে—

নাম...

ঠিকানা...

পেশা...

পরিষ্কার করে লিখে এই কাগজটী কেটে বার্ষিক চাঁদা ৮৲ সহ সম্পাদকের নামে পাঠিয়ে দিন। মাঘ মাস হ'তে রূপ-মঞ্চের বর্ষারম্ভ—যে কোন মাস হতে গ্রাহক হওয়া চলে। এক বছরের কম কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না।

গ্রাহক সংখ্যা..

গ্রাহকের মেয়াদ..

সম্পাদকের স্বাক্ষর...

আমাদের রবীন্দ্র-প্রীতি

গোপাল ভৌমিক

আত্ম-বিস্মৃতিকে যদি জাতীয় মৃত্যুর সামিল বলা হয় তা হলে বোধ হয় অন্যায় করা হবে না। মাঝে মাঝে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন আন্দোলন এবং রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাব দেখে ভাবতে ইচ্ছা করে যে জাতি হিসাবে আমরা বোধ হয় বেঁচেছি, খুঁজে পেয়েছি নিজের স্বরূপকে। কিন্তু পর মুহূর্তেই এমন একটা বিরুদ্ধ ঘটনার সংঘাতে হয়ত পড়তে হয় যার ফলে অতি স্বাভাবিক ভাবেই মানসিক আশাবাদিতায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় এবং সেজন্যে মানসিক অবস্থা অনেকটা যেন নৈরাশ্যবাদের কাছ ঘেঁসে চলে যায়। মনে হয় যে সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরে পরেই আমাদের জীবনে যে একটা জাতীয় ভাবের অবলুপ্তি এসেছিল, আমরা আজও ঠিক সেই পর্যায়ে আছি। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রহসন ঠিক এমনই একটা বিরুদ্ধ ঘটনা-সংঘাত। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর আজ প্রায় চারিটি বৎসর চলে যেতে বসেছে। অথচ এর মধ্যে আমরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার কি ব্যবস্থা করে উঠতে পেরেছি? এ কি আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে কলঙ্ক বিশেষ নয়? যদি কোন স্বাধীন দেশে রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভার জন্ম হত, তবে তিনি এক বাক্যে সে দেশের এবং সে জাতির মহাকবি বলেই শুধু স্বীকৃত হতেন না, তাঁর মত মর্যাদা সে দেশের রাষ্ট্রপতিরও থাকত কি না সন্দেহ। আর আমরা? পরাধীন ভারতবর্ষের লোক আমরা—ততোধিক ক্ষুদ্র বাঙ্গালার অধিবাসী আমরা—আমরা নিজেদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিরাট দুর্জ্ঞেয় প্রতিভাকে পেয়েও জীবিত কালে তাঁর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছি—মৃত্যুর পরও তাঁর স্মৃতিকে করছি অপমান। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে তাঁর প্রতিভাকে আমরা স্বীকার করতেই চাইনি। তারপর তাঁকে চিনেছি আমরা বৈদেশিক বিচারকদের নিঃসন্দেহ রায়ে। একেই বলে প্রকৃত দাস-মনোবৃত্তি। রাজনৈতিক পরাধীনতা মানুষকে কতটা আত্মবিস্মৃত করে তুলতে পারে, রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার চেষ্টাই হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাই হোক, নোবেল প্রাইজের সার্টিফিকেটের জোরে শেষ পর্যন্ত তিনি দেশবাসীদের হৃদয়ে কিছুটা স্থান করে নিয়েছিলেন। সে স্থানও প্রকৃতপক্ষে দেশবাসীদের হৃদয়ে কিনা আজ তা নিয়ে সন্দেহের কারণ দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের মৃত্যু দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। তা নইলে তাঁর মৃত্যুর পরে চার বছর হতে চলল, অথচ এ সময়ের মধ্যে আমরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারলাম না! একটা জীবন্ত জাতির পক্ষে এ যে কত বড় অপমানের কথা সেটা বলে বোঝাবার নয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্মৃতিরক্ষার অপেক্ষা রাখে না। সুদীর্ঘ ষাট বৎসরের অক্লান্ত সাধনায় তিনি বিশ্বের সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে অজস্র দান দিয়ে গেছেন, তারই কল্যাণে তিনি দীর্ঘকাল পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবেন। অন্তত সভ্য জগতে যতদিন জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চা হবে, তত দিন ত বটেই! কোন স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করে আমরা কি ততদিন কবির স্মৃতিকে ধরে রাখতে পারব? তবু মানুষ স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করে, অন্যান্য ভাবে স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করে। কারণ মহামানবের স্মৃতির প্রতি এ ভাবে সম্মান প্রদর্শন আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এর দ্বারা মৃত মহাপুরুষ যতটা সম্মানিত না হন, তার চেয়ে বেশী সম্মানিত হই আমরা নিজেরা। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর চার বৎসর অতীত হতে চললেও আমরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা করতে পেরেছি কি? কেন পারিনি সেইটাই হল বড় কথা। গভর্ণমেণ্টের কথা ছেড়েই দিলুম। কেন না বিদেশী গভর্ণমেণ্টের আমাদের দেশবাসী মনীষীদের প্রতি কোন কর্তব্য নেই। একমাত্র শোষণ এবং শাসনই তাঁদের কর্তব্য। কাজেই তাঁদের প্রতি আমাদের কোন অনুযোগ নেই। কিন্তু দেশের কর্পোরেশন বা বিশ্ববিদ্যালয় ত আমাদের হাতে! তাঁরাই বা রবীন্দ্র-স্মৃতিকে রক্ষা করার জন্যে কি ব্যবস্থা করেছেন? হতাশ হয়ে স্বীকার করতে হয় তাঁরা কিছুই করেননি। দীর্ঘ চার বৎসরেও এই মহান কর্তব্যটির প্রতি তাঁদের সদয় দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। কলিকাতা কর্পোরেশন আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নামে কলিকাতার কোন একটি রাস্তার নামকরণ করে উঠতে

পারেননি। অথচ এই মহানগরীর সঙ্গে বংশ পরম্পরাগত ভাবে কবির ছিল নাড়ীর যোগ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও আজ পর্যন্ত তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে কোন উদ্যোগ আয়োজন চোখে পড়ছে না। অথচ সুদূর ইংল্যাণ্ডের দিকে তাকালে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে বিশেষ অধ্যাপক পদ সৃষ্টির প্রয়াস হচ্ছে। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরেজদের জাতীয় সংস্কৃতির তফাৎ এইখানে। রাজনৈতিক কারণে আমরা ইংরেজ বিরোধী হতে পারি। কিন্তু তাদের চরিত্রে কতগুলো সদ্‌গুণ যে আছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় কোথায় ?

রবীন্দ্র-স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের দিক থেকেও যে কর্তব্য-চ্যুতি ঘটেছে—সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। আমরাই বা এতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষার জন্যে কি ব্যবস্থা করেছি ? কিছুই করিনি বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঠিক পরে পরেই ঘটা করে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা কল্পে একটি 'নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়েছিল। স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রভৃতি একাধিক সর্বভারতীয় নেতাকে নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয়েছিল বলে আমরা আশা করেছিলাম যে এই সমিতি ভারতের জনসাধারণের আস্থাভাজন হবে এবং এই সমিতির প্রচেষ্টায় শীঘ্রই হয়ত কবিগুরুর স্মৃতিরক্ষার জন্যে একটা মোটা রকমের টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু কার্যত আমাদের সে আশা ফলপ্রসূ হয়নি। জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই সমিতির অকাল মৃত্যু হয়েছিল বলা চলে। কেন না আমরা তাঁদের কোন কার্যক্রমই চর্মচোখে দেখতে পাইনি। অর্থ সংগ্রহের জন্যে তাঁরা আদৌ কোন চেষ্টা করেননি। আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম যে 'নিখিল ভারত স্মৃতিরক্ষা সমিতি' দেশবাসীদের তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার সর্ববিধ ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু কার্যত তাঁরা কিছুই করেননি। এমনই অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটে গেল সুদীর্ঘ তিন বছর। জনগণের ধৈর্যের বাঁধ গেল ভেঙে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আলোচ্য সমিতির কার্যক্রম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হল —দাবী জানান হল সমিতি পুনর্গঠনের। বাধ্য হয়েই সম্প্রতি সমিতিতে অদল বদল করে নতুন ভাবে 'নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি' গঠিত হয়েছে। এবারেও প্রেসিডেন্ট আছেন স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সুযোগ্য কর্মনিপুণ ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার। প্রধানত তাঁর চেষ্টায় এবার সমিতির ধনভাণ্ডারে যথারীতি অর্থ সংগ্রহ চলছে। আশা করা যায় এবার রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে কিছুটা অর্থ জমতেও পারে।

কয়েক মাসের প্রচেষ্টায় এপর্যন্ত রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছে তা কিন্তু আদৌ প্রত্যাশানুরূপ নয়। সংগৃহীত অর্থের মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং জনপ্রিয়তা মাপতে গেলে দুঃখিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি! এ পর্যন্ত সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ মাত্র আড়াই লাখ টাকা। তার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকাই দিয়েছেন মার্শাল এবং মাদাম চিয়াং কাইসেক। আমাদের দেশের কারও কাছ থেকে এ পর্যন্ত একযোগে ৫০ হাজার টাকা পাওয়া যায় নি। এটাকি প্রকৃতই দুঃখের বিষয় নয় ? একযোগে ৫০ হাজার টাকা দান করার মত অনেক ধনীই আমাদের দেশে আছেন। এবং যুদ্ধের বাজারে সামরিক কণ্ট্রাক্টের মহিমায় এরূপ অনেক ধনীরই সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি তাঁরা এত উদাসীন কেন ? আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির এই রূপ দেখে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্বে তাঁর একটি অভিভাষণে বলেছিলেন যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য মাত্র তিন লক্ষ নরনারীর সাহিত্য। তাঁর বক্তব্যের অর্থ এই যে আমাদের সাহিত্যিকরা মাত্র তিন লক্ষ নরনারীর জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য রচনা করে থাকেন—বাকী প্রায় ৫৯৭ লক্ষ বাঙালী নরনারীর জীবনই আমাদের সাহিত্যে উপেক্ষিত। আমার মনে হয় যে বাংলা সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা বোধ হয় তিন লক্ষেরও কম। তা নইলে এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারে মাত্র দুলাখ টাকা ওঠে কি ভাবে ? রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারে মোটা টাকা সাহায্য করার সামর্থ হয়ত

রূপ-মঞ্চ

আমাদের অনেকের নেই। কিন্তু দুএক টাকা দেবার সামর্থ আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। আমাদের এ ক্ষুদ্র কর্তব্যও কি আমরা ঠিক ভাবে পালন করছি? সামান্য ২।৪ লক্ষ টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষা করা চলে না। তাঁর স্মৃতিকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে গেলে বেশ কয়েক কোটী টাকার প্রয়োজন। আমাদের দেশ থেকে সে টাকা উঠবে নাকি?

পরিশেষে রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্দেশ্যেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। এঁরা নিখিল ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা সমিতি করেছেন—অথচ তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধী নেই কেন? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর অচ্ছেদ্য আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবেদনের একটা মূল্য আছে। শুধু বাংলার মধ্যে রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডার সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। কেননা বাঙ্গালীদের দান সম্বন্ধে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। বাঙ্গালীরা কোন দিন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছেন কিনা সন্দেহের বিষয়। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরেও রবীন্দ্রনাথকে নিজের এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রীদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করে তাঁর প্রাণপ্রিয় বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে হত। তখনও বাঙালীরা মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করে বিশ্বভারতীর অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে চেষ্টা করেন নি। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ অর্থ সংগ্রহের জন্যে যখন এমনই ভাবে সদলবলে অসুস্থ শরীরে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তখন দিল্লী থেকে এক অজ্ঞাতনামা বন্ধু প্রায় ৬০ হাজার টাকা একাযোগে পাঠিয়ে অসুস্থ কবিগুরুকে ভারত ভ্রমণ থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। সেদিনও যথোচিত অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কোন বাঙালী ধনীর শ্রীহস্ত রবীন্দ্রনাথের দিকে প্রসারিত হয়নি। এসবই আমাদের রবীন্দ্র-প্রীতির নিদর্শন! অহেতুক উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। আমার মনে হয় যে সমিতির কর্তৃপক্ষ যদি যথোচিত প্রচারকার্যের সহায়তায় সমস্ত ভারতে রবীন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষার জন্যে অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁদের উদ্দেশ্য অধিকতর সাফল্য মণ্ডিত হবে।

রবীন্দ্র কাব্যে নারী

প্রীতিদেবী মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র কাব্যে ও গীতিনাট্যে নারী নানারূপে আমাদের কাছে ফুটে উঠেছে, তাঁর কাব্যসমুদ্র থেকে যেমন নারী এসেছে মোহিনী মূর্তি নিয়ে, আবার তেমনি এসেছে কল্যাণময়ী মহিমময়ী রূপ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী প্রসূত নারীর এই রূপ যেমনি আমাদের মনকে কাব্যরসে আপ্লুত করে দেয়—তেমনি গ্রাম্য বালিকার মর্মবেদনা, রূপহীনার করুণ আবেদন, পতিতার স্বীকারোক্তি আমাদের মনকে গভীর ব্যথায় ভরে দেয়। এদের মানসিক দ্বন্দ্ব, সুখ, দুঃখ এমন সুষ্ঠুভাবে ফুটে উঠেছে যে, আপনজনের মতই এরা জাগিয়ে তোলে সহানুভূতি। কবি তার অপরূপ প্রকাশভংগী দিয়ে নারী হৃদয়ের এই চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন নানাভাবে—গ্রামের শ্যামল বনানী, মুক্ত প্রান্তর, দিঘির কালোজল সব কিছু হাতছানি দিয়ে ডাকে গ্রাম্য বালিকাকে। যে আজ হয়েছে পৌরবধূ, অবরুদ্ধ বেদনায় কান্নার ভিতর দিয়ে কাটে তার সারাদিন রাত্রি, মন তার চলে যায় সেখানে, যেখানে—

মাঠের পর মাঠ মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।

রাজধানীর পাষাণ কারার মাঝে প্রাণ তার ডুকরে কেঁদে ওঠে—

কোথা সে খোলা মাঠ উদার পথ ঘাট
পাখির গান কই বনের ছায়া।

তার এই আঁখিজলের অর্থ বোঝেনা কেউ, কারণ খুঁজে না পেয়ে তারা করে তিরস্কার, গ্রাম্য বালিকার স্বভাবের দোষ দেয় তারা—

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ
কেহ বা ভাল বলে, বলেনা কেহ।

অপরিচিতের মাঝে এসে বালিকা খুঁজে বেড়ায় একটু আদর, কামনা করে প্রতিজনের স্নেহ ভালবাসা, যার জোরে সে ভুলতে পারবে তার আজন্ম পরিচিত স্মৃতিকে। তাই তাদের এই অনাদরে মন তার ভরে ওঠে ব্যথায়, অতি দুঃখে তার অন্তর বলে ওঠে—

ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি
পরখ করে সবে করেনা স্নেহ।

মার স্নেহ, সখীদের ভালবাসা, গ্রামের স্মৃতি ওকে উন্মনা করে দেয়—আকাশে চাঁদ হেসে ওঠে, সে পারেনা আর এভাবে গুমরে মরতে, চারিদিকের অসহ্য বাঁধন ছিড়ে ফেলে সে ছুটে চলে যেতে চায় মুক্ত প্রান্তরে কিন্তু—

অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে
শাসন আসে ছুটে ঝটিকা তুলি।

এমনি ভাবে বালিকা থাকে বন্দী হয়ে, আত্মীয় স্বজনের কড়া পাহারায় বিরাট রাজধানীর পাষাণ কারার মাঝে, মনের আবেগ, চাপল্য, ভালবাসা সব রুদ্ধ হয়ে আসে, তাই তার মনে হয়—

দেবেনা ভালোবাসা দেবেনা আলো
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।
ডাক্‌লো ডাক্ তোরা বল্‌লো বল্
"বেলাযে পড়ে এলো জলকে চল্।"
কবে পড়িবে বেলা ফুরাবে সব খেলা
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল
জানিস্ যদি কেহ আমায় বল্।

গ্রাম্য বালিকার মনের এই রুদ্ধ বেদনা আমাদের মনে এক অপূর্ব করুণ রসের সৃষ্টি করে। এমনি ভাবে বন্দী হয়ে যে সব নারী-হৃদয়ের উৎস রুদ্ধ হয়ে যায় চিরদিনের মত তাদের প্রতি জাগিয়ে তোলে গভীর বেদনা। রূপহীনার প্রাণের দেবতার প্রতি প্রেমও এমনি ভাবে রুদ্ধ হয়ে থাকে, অন্তরে মাধুর্য তার যতই থাক্, রূপহীনা প্রেমের পূজার কোন অধিকার পায়না, তাই সে বিধাতাকে জানায় তার মর্মবেদনা. করুণ আবেদনে সে জাগিয়ে তোলে ব্যথা সকলের অন্তস্থলে, তাই কবির লেখনীতেও ফুটে উঠেছে—

তবে পরাণে ভালবাসা কেনগো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তাঁরে গিয়া কি দিয়ে।

যে গভীর অনুভূতি দিয়ে কবি দেখেছেন রূপহীনার অন্তরের সম্পদকে, সেই অনুভূতি নিয়েই তিনি দেখেছেন পতিতার অন্তরকে। সমাজের ঘৃণ্য এই পতিতার অন্তরেও সেই চিরন্তনী নারীত্ব বিরাজমানা। এই ঘুমন্ত নারীত্ব স্বর্গীয় প্রেমের আলোক স্পর্শে জেগে ওঠে। সরল কিশোর ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মন ভুলাতে যেয়ে তার অম্লান আলোক স্পর্শে পতিতার মাঝে জেগে উঠ্‌লো—

জননীর স্নেহ রমনীর দয়া
কুমারীর নব নীবব প্রীতি।

নারীর এই রূপ সর্বযুগের—সর্বকালের, তাই কবিও এই রূপকে অভিনন্দন জানালো ঋষ্যশৃঙ্গের উক্তি দিয়ে—

কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা
তোমার পরশ অমৃত সরস
নয়নে তোমার দিব্য বিভা।

তাঁর নারীত্বের এই পূজায় পতিতা হলো কৃতার্থ, সমাজের আবর্জনা রূপে চিরদিন নীরবে সে বরণ করে নিয়েছে সকলের অবজ্ঞা, তাই এই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে সে লুটিয়ে দিল নিজেকে তার অন্তরতম দেবতার পায়ে—ক্ষমা নিয়ে সে চলে এলো। বাইরের আবরণের মাঝে তার ভিতর জেগে উঠেছে যে নারীত্ব, তাই দিয়েই সে পূজা কর্‌বে তার দেবতাকে অন্তরের নিভৃত মন্দিরে—

তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া রবে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার
যতদিন বেচে রহিব ভবে।

সমগ্র নারীজাতির অন্তরের এই অপরূপ বিশ্লেষণ রবীন্দ্র কাব্যের অন্তর্নিহিত সত্য। নারীর পরিচয় তার দেহ সৌন্দর্যের অস্থায়ী মদিরতায় নয়—অন্তরের মাধুর্যে। এই মাধুর্য দিয়ে পুরুষকে শাশ্বত প্রেমের বাধনে আবদ্ধ করে রাখার মাঝেই তার সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর অন্তর দিয়ে, তাই শুধু তাঁর কাব্যে নয়, গীতি নাট্যের অন্তরালেও এই সুরই বেজে উঠেছে। প্রত্যেক নারীর উদ্দেশ্যে এই সত্যই তিনি প্রচার করেছেন কাব্য ও গীতিনাট্যের ভিতর দিয়ে। মোহিনী শক্তি দিয়ে পুরুষকে পরাজিত করে নারীর "বিজয়িনী" মূর্তি ফুটে ওঠেনি, কামনাকে ধ্বংস করেই নারী হয়েছে "বিজয়িনী।"

ক্ষণিক মদিরতার মোহপাশে পুরুষকে জয়করা যায় যৌবনের চাপল্য দিয়ে কিন্তু অস্থায়ী যৌবনের যখন আসবে জরা, তখন তার মূল্য আর থাকবেনা। এই মোহপাশ শিথিল হয়ে একদিন আসবেই, কিন্তু নারী অন্তরের সম্পদে পুরুষকে অভিষিক্ত করে অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে যদি আবদ্ধ করে রাখে স্বর্গীয় প্রেমের বন্ধনে, সে বাঁধন তবে কোনদিন ছিন্ন হতে পারেনা, এই বাঁধন হয় তাদের জীনের জয়যাত্রার সহায়, দেহের বল, মনের শান্তি। এর পরিণামে নেই ক্লান্তি। পুরুষের কাছে নারীর এই পরিচয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় আর নেই। কবির "চিত্রাঙ্গদা" গীতি নাট্যের মূল হলো নারীর এই পরিচয়। মাত্র এক বছরের জন্য ঋতুরাজ বসন্তের অনুগ্রহে পুরুষবেশী মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা পেল রূপ ও যৌবন, এই মোহিনী মায়ায় সে ব্রহ্মচারী অর্জুনের ব্রতভঙ্গ করে তাকে করলো বিমুগ্ধ। তারপর সাধনার সম্পদকে পেয়ে তার মাঝে একদিন জেগে উঠ্‌লো নারীর এই রূপ। সে বুঝলো যে—বাঁধনে সে অর্জুনকে বেঁধেছে, সেই রূপ ও যৌবন তো তার নিজস্ব চিরস্থায়ী যৌবন নয়। তার ক্ষণিকের এই রূপ যখন মুছে যাবে তখন কি দিয়ে তার প্রিয়কে বেঁধে রাখ্‌বে? তার রূপ ও যৌবনের ক্ষয়ের সংগে সংগে সে'ও যে অর্জুনের কাছ থেকে সরে যাবে। অনুশোচনায় ভরে উঠ্‌লো তার মন, কেন সে মিথ্যা দিয়ে অর্জুনকে ভুলিয়ে রাখ্‌লো, তাই একদিন সে অর্জুনকে দিল তার যথার্থ পরিচয়, তাঁকে বেঁধে রাখ্‌তে চাইলো নিজের অন্তরের মাঝে মিথ্যার মোহপাশ ছিন্ন করে—

যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মতো প্রভু এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে পুণ্য
আছে, কত দৈন্য আছে।
কিন্তু আছে

অক্ষয় অমর এক রমণী হৃদয়।
দুঃখ, সুখ, আশা, ভয়, লজ্জা, দুর্বলতা
ধূলাময়ী ধরণীর কোলের সন্তান –
তার কত ভ্রান্তি, তার কত ব্যথা, তার
কত ভালবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে
আছে একসাথে। আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ।

এই ভাবে সে তার রূপ ও যৌবনের অসারতা জানিয়ে দিল অর্জুনকে, নিজের চরিত্রবলের উপর অসীম বিশ্বাস রেখে সে তার নারীত্বের যথার্থ পরিচয় দিল তার প্রেমাস্পদের কাছে। তাই সেই পুরুষপ্রবর অর্জুনও শুধু তার বাইরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ নয়—অন্তরের সম্পদলাভে সে ধন্য হলো, বরণ করে নিল চিত্রাঙ্গদাকে নিজের অন্তরে। ঋতুরাজ মদনের বরে অর্জুনকে পরাজিত করেও চিত্রাঙ্গদার যে রূপ ফুটে ওঠেনি, নিজের প্রেমে তাকে জয় করে তার সেই বিজয়িনী রূপ ফুটে উঠলো, তার মাঝে নেই কোন মালিন্য—কোন দুর্বলতা, শুধু আছে এক অপরূপ নারীমূর্তি।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গীতিনাট্য "অরূপ-রতন," "চণ্ডালিকা" প্রভৃতিতেও নারীর এক একটী বিশেষরূপ রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু তারাও নারী জাতির উদ্দেশ্যে সেই একই আদর্শ স্থাপন করেছে। কবি প্রত্যেকটী নারী চরিত্রের ভিতর দিয়ে আমাদের কাছে এই বাণীই প্রচার করেছেন—'বাইরে থেকে মানুষকে চিনতে যেয়ো না, তোমার অন্তরের সম্পদ দিয়ে তার অন্তরকে দেখতে শেখো, রূপগর্বে গর্বিতা হয়ে স্বর্গীয় প্রেমকে খর্ব করো না। রূপের অহংকারে অন্ধ হয়ে মিথ্যার দিকে ছুটে চলো না। তোমার নারীত্বের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে তুমি বিজয়িনী হয়ে ওঠো।'

বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দকে দেখে চণ্ডাল কন্যা প্রকৃতি মুগ্ধ হলো এবং যাদুবিদ্যা পারদর্শিনী মাতার সাহায্যে তাকে টেনে আনলো তার কাছে, কিন্তু আনন্দের মনের দৃঢ়তার কাছে সে পরাজয় স্বীকার করলো। তাই আনন্দকে নিজের মোহ মদিরায় ডুবিয়ে দিল না, মুক্তি দিয়ে তাকে চিরদিনের জন্য স্থাপন করলো তার অন্তরের মণিকোঠায়। প্রকৃতির এই পরাজয়—গ্লানির পরাজয় নয়। ছলে কৌশলে আনন্দকে সে বেঁধে রাখতে পারতো কিন্তু তার মনের দৃঢ়তার কাছে নত হয়ে নারীত্বের পরিচয় দিয়েই বরণ করেছে পরাজয়কে। দয়িতের কাছে এই নতি স্বীকার নারীর গ্লানিময় পরাজয় নয়—প্রেমের আলোকে মোহের অন্ধকার থেকে দয়িতকে মুক্তি দেওয়া প্রেমময়ী নারীর উপযুক্ত কাজ, বাইরে থেকে না পেয়ে নিজের অন্তরে পাওয়াই সার্থক, এই সার্থকতার মাঝেই ফুটে ওঠে প্রেমের ফুল। "অরূপ-রতনে" সুদর্শনা রাজাকে বাইরে খুঁজেছিল। বুদ্ধির অভিমানে সঙ্গিনী সুরঙ্গমার কথা না শুনে সে স্থির করেছিল এই বাইরে থেকেই সে রাজাকে জয় করবে, জীবনে সার্থকতা লাভ করবে, কিন্তু তার এই অহংকার চূর্ণ হল। সুবর্ণের রূপে মুগ্ধ হয়ে অন্তরের রাজাকে বিসর্জন দিয়ে তার চারিদিকে বিপদ ডেকে আনলো। চারিদিকে জলে উঠলো আগুন, এই আগুনে তার অহংকার পুড়ে ছাই হয়ে গেলো, ফিরে পেলো তার অন্তরের খাঁটী সম্পদকে, বাইরের সম্পদে রিক্তা হয়ে অন্তরের সম্পদকে আশ্রয় করে সে এসে দাঁড়াল পথে, তখন এলো তার প্রভু, অসার অহংকার চূর্ণ করে আপন অন্তরের সম্পদের মূল্য বুঝিয়ে দিল তাকে, সেদিন সুদর্শনা পেল তার প্রভুকে—যাকে শুধু আপন অন্তরের আনন্দরসে উপলব্ধি করা যায়।

রবীন্দ্র কাব্য ও গীতিনাট্যে নারীর যে বিশেষ রূপ আমাদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে, তার মাঝ থেকে কয়েকটার সামান্য পরিচয় আমার লেখনীতে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। রবীন্দ্র কাব্য অসীম, তার কাব্যের আলোচনা অসীমকে সীমার মাঝে টেনে আনবার মতই ধৃষ্টতা মাত্র। কবি নারীর উদ্দেশ্যে যে সত্য প্রচার করেছেন, প্রত্যেক নারী যেন তা উপলব্ধি করে নিজেকে বিশ্বজনের কাছে তেমনি মহিমময়ী রূপে পরিচয় দেয়। যে রূপ তাঁর কাব্যে রূপায়িত হয়েছে, তা যেন প্রত্যেক নারীর রূপে প্রতিফলিত হয়, মিথ্যার মাদকতায় নিজে ডুবে অন্যেরও সর্বনাশ যেন ডেকে না আনে এই কামনাই করি।

উত্তরা • পূর্ণ • পূরবী

রাজকুমারী চন্দ্রা ছিলেন মীণাঘাটে। মীনাঘাট রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী তিনি। সুন্দরী, সুশিক্ষিতা ও মহিমময়ী। ছদ্মবেশী কুমার দীপনারায়ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি গভীর ভাবে তাঁর মনে দাগ কাটল। কুট-নীতিজ্ঞ দেওয়ানের চোখে এড়ায় না কিছুই। এক হৃতসর্বস্ব অপদার্থের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে ঠিক করেন। প্রথমে রাজী হলেও শেষ পর্যন্ত চন্দ্রা বেঁকে বসলেন। জঙ্গল মহলে জগদীশ প্রসাদের কাছে যেয়ে নিজের অন্তরের গোপন কথাটি প্রকাশ কর'লেন। কিন্তু গভীর অরণ্যে রাত্রির অন্ধকারে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে-উঠেছে তখন।

রাজকুমারী চন্দ্রা.কে পর্দায় মূর্ত করে তুলেছেন বাংলার প্রথিতযশা অভি-নেত্রী কানন দেবী। অভি-নেত্রী জীবনে এই সব-প্রথম তাঁর ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে আত্ম-প্রকাশ।

কুমার দীপেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন রায়গড়ে। রায়গড়ের চৌধুরী বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী তিনি। তেজস্বি, তীক্ষ্ণধী যুবক। বন্ধনহীন খেয়ালের বশে চলাই তার স্বভাব। খেয়ালের বশেই একদিন আসেন মীণাঘাটে—ছদ্মবেশে ল' অফিসার জগদীশ প্রসাদ রূপে। প্রথম আলাপে ছদ্মবেশী রাজকুমারীকে দেখে মুগ্ধ হন। রাজকুমারী মন জুড়ে বসেন। ক্ষমতা-লুব্ধ দেওয়ান সূর্যশঙ্কর বুঝতে পারেন সব। কুটিল জাল বিস্তার করে দুর্গম অরণ্যে অসভ্য জংলীদের দ্বারা দীপনারায়ণকে হত্যা করবার আয়োজন করেন। অবিচার অত্যাচার, ও উৎপীড়নে জংলীরা একেবারে এমন মরিয়া হ'য়ে উঠেছে উত্তেজিত ভাবে তারা জানাল, যা কিছু এতদিন তারা সয়েছে তার বিচার তারা চায়!

কুমার দীপনারায়ণকে পর্দায় মূর্ত করে তুলছেন বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রাভিনেতা ছবি বিশ্বাস। অভিনেতা জীবনে এই সর্বপ্রথম তার কাননদেবীর সঙ্গে আত্মপ্রকাশ

চরিত্র চিত্রণে

কানন দেবী

পূর্ণিমা, শ্রীমতী প্রভা, বীণা
সুলেখা, উমা ও আরো অনেকে।

—চরিত্র চিত্রণে—

ছবি বিশ্বাস

জহর গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী, ছয়া
রবি রায়, রঞ্জিত রায়, কৃষ্ণধন ও
আরো অনেকে।

—সুর সংযোজনায়—

রবীন চট্টো, ধীরেন মিত্র

অনাদি দস্তিদার (রবীন্দ্র সংগীত)

চিত্রগ্রহণে : বিভূতি লাহা

শব্দরূপায়ণে : যতীন দত্ত

—ব্যবস্থাপনায়—

বিমল ঘোষ

❖

রচনা ও পরিচালনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

❖

(সিনেমার গল্প)

স্কুল, কলেজ, সহ-শিক্ষা, – একটা উন্নত জেলার সহরে যা কিছু থাকা প্রয়োজন সবই সেখানে ছিল। এই কলেজেরই অর্থ শাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ চৌধুরী। শুধু অধ্যাপকই নয়, মিঃ চৌধুরীর দেশাত্মবোধ এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কলেজটীর যেন গর্বের বস্তু ছিল। তাঁর উন্নত দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু, উচ্চ হাসি এবং সর্বোপরি খদ্দর ও গান্ধী টুপী সমস্তই যেন তাঁকে শ্রদ্ধা বিমণ্ডিত করে তুলতো। ধরিত্রীর সহিষ্ণুতা দিয়ে গড়া অধ্যাপক চৌধুরীকে আধুনিক কালের সক্রেটীস আখ্যা দিলেও ভুল হবেনা, কেননা তাঁরও ছিল জ্যান্‌টিপের ন্যায় দুর্ভাষিনী ভার্যা কালীতারা। এই নিরানন্দ গৃহকে আনন্দ মুখরিত করে তুলতো তাঁদের একমাত্র কন্যা অবন্তী :—তার কলেজের এবং কলেজের বাইরের ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে।

প্রোঃ চৌধুরীর বাড়ীতে প্রবেশ করলেই শুনতে পাওয়া যায় তাঁর অনর্গল বক্তৃতা—ঝড়ের ন্যায় কোলাহল - তাঁর অসংখ্য ছাত্রের সম্মুখে হাত পা 'টেবিল চাপড়ে' লোকের দুঃখ, দারিদ্র, বেদনা, ধনিকের শোষণ,—একের পর এক সব তর্ক ও বিতর্ক। আবার পার্শ্বের ঘরে ফিরে তাকালে দেখা যাবে সেখানেও চলেছে কাব্য ও শিল্পের শান্ত আলোচনা। প্রোফেসারের গুণমুগ্ধ ছাত্রদল তাঁর বক্তৃতার অন্তরালে, নায়িকা অবন্তীকে ঘিরে পর এক সেখানে এসে ভীড় জমায়। আর সারা বাড়ী জুড়ে চলে চৌধুরী গিন্নী কালীতারার গৃহকার্যের অদ্ভুত ব্যস্ততা। প্রোফেসারের শ্রোতার দল অর্ধেক থেকে চতুর্থাংশে এসে নামে, চৌধুরী গিন্নির সু-উচ্চ কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে তাঁর কানে এসে পৌছায়, কিন্তু কিছুতেই তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই ;—হাতে হাত মিলাতে হবে, সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে একত্রে দাঁড়াতে হবে - গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সজ্ঘ, সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে,—প্রোফেসারের বিরামহীন বক্তৃতা উদ্দীপনায় ছুটে চলে। ভার্যা কালীতারাও হটবার নন। ঝুড়িময় গোবর ও জল নিয়ে সেই সভার মাঝখানেই দেখা দেন এবং প্রোফেসারের আপাদমস্তক সর্বশরীরে ঢেলে দিয়ে তবে নিরস্ত হন। সক্রেটিসের প্রশান্ত হাসিতে প্রোফেসার শুধু বলেন, "মেঘ গর্জনের পর এ বর্ষণ একান্ত প্রয়োজন ছিল।"

কিন্তু এ 'বর্ষণে'র ফলে প্রোফেসার পীড়িত হয়ে পড়েন। নিশ্বাসে, প্রশ্বাসে, সর্বদেহে তাঁর গোবরের দুর্গন্ধ। ডাক্তার ডাকতে হয়। বিজ্ঞ চিকিৎক বিশিষ্ট বন্ধু লোক। বুঝতে তার বাকী থাকেনা কিছু। অথচ সহজ পথে কালীতারা আয়ত্বে আস্‌বেন না তাও তিনি বোঝেন। একটা ফন্দি তার মাথায় খেলে। ডাক্তার আফশোষ করেন—চৌধুরী গিন্নীর কণ্ঠস্বর আজকাল এমন কর্কশ হলো কেমন করে। কালীতারার গলা,—কণ্ঠনালীর পরীক্ষা আরম্ভ হয়,—ডাক্তার হঠাৎ আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠেন, "বাক শক্তি হীনতার সর্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।" ডাক্তার নির্দেশ দেন,—অন্ততঃ এক সপ্তাহের জন্য তাকে কথা বলা বন্ধ রাখতে হবে—নিতান্ত প্রয়োজনে শ্লেট ও পেন্সিলের সাহায্যে ভাব প্রকাশ করা যেতে পারে। অত্যন্ত তিক্ত হলেও নিয়মিতরূপে ঔষধ সেবন করতে হবে। কথা বলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেই সম্পূর্ণরূপে বোবা হয়ে যেতে হবে।

প্রিয়তমা পত্নীর সাথে ভাব বিনিময়ের এমন অবাধ সুযোগ প্রোফেসারের জীবনে আর কখন দেখা দেয়নি। কলহের সূত্রপাত আরম্ভ হবার পূর্বেই প্রোফেসার শ্লেটখানি তার সামনে এগিয়ে দেন—"বল কথা বল, একটু মুখ খুলেছ কি অমনি বোবা হয়ে যাবে।" —এরূপ অব্যর্থ মহৌষধ আর কেউ কখন আবিষ্কার করতে পারেনি।

কালীতারার এই মৌন চিকিৎসা সকলের কাছেই একটা সুবর্ণ সুযোগরূপে দেখা দিল। আমোদ কৌতুক ও আহার বিহারে একদিকে যেমন অবন্তী ও তার বন্ধুদল,—অপর দিকে ঝি চাকরেরা যেন সমস্ত বাড়ীখানিকে দৈত্য দানবের একটা মন্ত্রণা আসর করে তুললো।

মৌন সপ্তাহ নীরবে অতিবাহিত হয়। জ্যোৎস্না-স্নাত উদ্যানে বিশিষ্ট ছাত্র কর্মীদের এক বিরাট ভোজে প্রোফেসার আমন্ত্রণ করেন তাঁর সমবায় আন্দোলনের অভিযানকে স্মরণীয় করবার জন্য।

সভা ভেঙ্গে গেছে। উদ্যানের নিভৃত কোনে ছুটি তরুণ তরুণীর অস্পষ্ট কলহ শোনা যায়। অবন্তী ও তার প্রণয়ী। পিতার অসম্মতিতে যুবকটী বিবাহে সম্মত নয়,—অবন্তীর মুখ থেকে অস্ফুষ্ট অভিশাপ বেরিয়ে আসে। যুবক চলে যায়,—অবন্তীর বেদনা মনের অশ্রুবন্যা মুক্তার মালার মত কপোল বেয়ে ঝরে পড়ে।

চৌধুরী গিন্নির উপবাসী-জিহ্বা প্রতিশোধের প্রবৃত্তি নিয়ে ছুটে চলে। ঝি-চাকরের উপর প্রথম পর্যায় শেষ করে নিয়ে বৃদ্ধ প্রোফেসারের পাঠ-কক্ষের দিকে তার আক্রমণ সুরু হয়।—ঘটনা প্রবাহ দ্রুত এগিয়ে চলে, আঘাত ও গর্জনে ঘরের দরজা খুলে যায়, কিন্তু কী এ, ওই "নির্বোধ বৃদ্ধের" সামনে বসে নিষ্প্রান শ্বেত প্রস্তরের মত তারই মেয়ে অবন্তী না—! "চুপ্! এসো,—বসো, ওর কি হয়েছে আমি বলছি,"—প্রোফেসার দরজা বন্ধ করে দেন।

নিঃশব্দে কিছু পরে তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। প্রোফেসার ও গিন্নি উভয়েই আজ চিন্তা-বিমর্ষ। মৃত্যুর মত এমন স্তব্ধতা সারা বাড়ীখানিতে আর কোনদিন কখন দেখা যায়নি!

* * * * *

দ্রুতগামী দার্জিলিং মেল ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে। জানালার ফাঁকে দেখা যায় তারই একটি কামরায় প্রোফেসার, কালীতারা ও তাঁদের মেয়ে অবন্তী,—ওদের ভারাক্রান্ত উদাস-দৃষ্টি বাইরের শূন্যতার প্রতি অপলকে চেয়ে আছে!

দার্জিলিংএর উপকণ্ঠে এক নিরালা পল্লীর এক কোনে তাঁরা বাসা বাধে। আরও কিছুদিন পরে দেখা যায় অবন্তীর কোলে এক সদ্যোজাত শিশু,—কন্যা।

সে প্রোফেসার চৌধুরী আর নেই, জগতের দৈন্য আজ আর তাঁকে ব্যাথিত করেনা, এ যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া এক পৃথক প্রতিমূর্তি। চৌধুরী গিন্নির বুকে আজ মায়ের অনুভূতি জেগে উঠেছে—বেদনাময়ী জননীর সর্ব স্নেহ নিংড়ে সে শিশুটীকে মানুষ করতে চায়। রাগ নেই, দ্বেষ নেই, রসনার সেই উগ্রতাও বুঝি আর নেই—পরিপূর্ণ ক্ষমার জীবন্ত প্রতিমা!

প্রোফেসার চৌধুরী বলেন, "অনাথ-আশ্রম ছাড়া শিশুটির অন্য ব্যবস্থা হতে পারেনা।" কালীতারার মায়ের মন কিছুতেই তাতে সায় দেয় না। করুণ আবেদনে প্রোফেসারের সহজাত দার্শনিক প্রবৃত্তি আলোড়িত হয়ে ওঠে,—প্রোফেসার কালীতারাকে বলেন, "হতে পারে যদি অবন্তীর পরিবর্তে তুমি এই শিশুর মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে সম্মত হও।" অবন্তীকে জিজ্ঞাসা করা হয় এই দুর্বার অভিশাপ সে মাথা পেতে নিতে রাজী কিনা। অবন্তী সম্মতি দেয়, আকুল আগ্রহে বলে ওঠে;—"হ্যা হ্যা,—সন্তান না হোক, অন্ততঃ বোনের পরিচয়েও একে আমারই কোলে মানুষ হতে দাও।" কালীতারা হাত বাড়িয়ে অবন্তীর কাছ থেকে শিশুকে কোলে তুলে নেয়, শিশুর সস্মিত মুখের দিকে চেয়ে অবন্তীর মাতৃমন শান্ত চিত্তে সমাজের এই কঠোর বিধান মাথা পেতে নেয়।

দিনের পর দিনে বছর ঘুরে আসে,—প্রোফেসার চৌধুরী তাঁর দেশের বাড়ীতে ফিরে যান।

প্রোঃ চৌধুরীর বাড়ী আজ যেন ঘুমন্ত পাতালপুরীর মতই নিস্তব্ধ। সে কোলাহল আর নেই—প্রোফেসারের সে উদ্দীপনাও থেমে গেছে—কাব্যালোচনার কলকণ্ঠও আর শোনা যায় না। একটা আকস্মিক ঘূর্ণ্যাবর্তে সবই যেন ওলট পালট হয়ে গেছে। তুষানলের মত একটা মৌন বেদনা যেন সর্বত্র বিরাজমান!

উত্তেজনা হয়তো নিভে গেছে,—কিন্তু মানবতার কল্যাণ প্রচেষ্টায় প্রোফেসারের সংকল্পের দৃঢ়তা আদৌ শিথিল হয়নি। সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস লেখা—গ্রামে গ্রামে সমবায় অভিযানের পরিকল্পনা তৈরী করা, তাঁর প্রাত্যহিক কাজ হয়ে দাঁড়াল। পিতার সংকল্পে অবন্তী নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলিয়ে দিয়েছে। প্রোফেসারের পাঠকক্ষে পিতাপুত্রীর আলোচনা চলে,—,—নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, নারীর সব কিছু সমস্যাই ওদের বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। গৃহিনী কালীতারাকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না—সে আজ সম্পূর্ণ পৃথক মানুষ! গৃহকার্যের কোন দিকে তার দৃষ্টি নেই,—তার সমস্ত ব্যস্ততা অবন্তীর শিশু-কন্যাকে

ঘিরে ছুটে চলেছে। প্রোফেসার ডেকে ডেকে হয়রাণ হন—ঝি-চাকরেরা ভয়ে ভয়ে দূরে থাকে। দুর্গোৎসবের বোধন ব্যবস্থায় কালীতারা আজ মহাব্যস্ত—অন্য দিকে মুখ ফেরাবার অবসর তার কোথায়? পৌঢ়া প্রতিবেশীরা এসে মাঝে মাঝে দেখা দেয়, এই বয়সেও সন্তান ধারনের জন্য সরস পরিহাস করে চলে যায়।—কালীতারার সহজাত কলহপ্রিয়তা শিশুর প্রতি স্নেহের অনুশাসনে পর্যবসিত হয়। এই শিশুকে নিয়েই কি তার দুদণ্ড বস্‌বার সময় আছে? অবন্তীর কোল থেকে রোরুদ্যমান শিশুকে বাজ পাখীর মত সে ছিনিয়ে নেয়!—গয়লাবৌ এখনও দুধ দিয়ে গেলনা, চাকরটা সেই কখন বেরিয়েছে এখনও খেলনা কিনে ফিরলনা—কালীতারার চীৎকারে সারা বাড়ীখানি মাঝে মাঝে তোলপাড় হয়ে ওঠে। প্রোফেসার ছুটে এসে পিছনে দাঁড়ান, তাঁর শুভ্র শ্মশ্রু বেয়ে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে!

শিশু বড় হয়। নাম রাখা হয় জয়ন্তী। তাকে শেখান হয়,—"অন্তী"—অবন্তী তার দিদি।

বছরের পর বছর কেটে যায়, বালিকা জয়ন্তী কৈশোরে পা বাড়ায়। অবন্তীর অভিন্ন প্রতিচ্ছবি সে। কাব্য ও কবিতা, প্রেম ও আনন্দ, বন্ধু ও বান্ধবী নিয়ে আই-এ ক্লাসের ছাত্রী জয়ন্তী ঠিক অবন্তীরই মত আবার বৃদ্ধ প্রোফেসারের গৃহকে গুঞ্জরিত করে তোলে।

অবন্তী দেখে, তার আনমনা উদাস দৃষ্টি শঙ্কিত হয়ে ওঠে। জয়ন্তীকে সে ডাকে, একান্ত ভাবে মিনতি জানায়,—"ওরে ওরা সব মিথ্যা. ভুল! পিতার আদর্শ ওদের উদ্বুদ্ধ করেনি, তোর সঙ্গ-সুখই ওদের টেনে আনে।"

"হ্যা, হয়েছে। তোর আদ্যিকালের বক্তিপানা এখন থামা। একালে ওটা চল্‌বে না।"—ঝঙ্কার দিয়ে জয়ন্তী তার চলার পথে ছুটে চলে।

বৃদ্ধা কালীতারার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, সমস্ত বাড়ীতে সে যেন একটা প্রেত মূর্তির মত ঘুরে বেড়ায়। তার সেই দাপট্ আর নেই, তার সেই হুঙ্কার আর শোনা যায়না—তার সর্বময় কর্তৃত্ব কে যেন অপহরণ করেছে,—এ সংসার তাকে চায় না! "সব ভুল, সব মিথ্যা"—বৃদ্ধা বিড় বিড় করে এঘর থেকে ও ঘরে যায়, দাওয়া থেকে বাইরে আসে, বাইরে থেকে বাগানে ঢোকে. অবন্তীর অসম্মান, অবন্তীর প্রতি জয়ন্তীর আঘাত তার সহ্য হয়না;—মাঝে মাঝে তার বিদ্রোহী মন চীৎকার করে ওঠে, জয়ন্তীকে শাসিয়ে বলে,—"ওরে বেইমানী জানিস তুই কে—।" ভয়ে, বিহ্বলে, আতঙ্কে অবন্তী মায়ের পাশে ছুটে আসে,—একান্ত অসহায়ের মত কালীতারার গলা জড়িয়ে ধরে আবেদন জানায়;.. "আমায় বাঁচতে দাও মা, সবকিছু এমন করে তুমি ধ্বংস করোনা।" কালীতারার অনুভূতি সাড়া পায়,—তার ক্ষুব্ধ মনের পুঞ্জিত বেদনা অশ্রুর উৎসে অবন্তীকে আশীর্বাদ জানায়।

—এমন ভাবে লোক বাচতে পারেনা। কালী-তারারও জীবনের আলো নিভে এলো। রোগশয্যায় শুয়ে শেষ নিশ্বাস ফেলবার পূর্ব মূহূর্তেও জয়ন্তীকে সে ডেকে কাছে নেয়, বলে,—"ওরে অবন্তী যে শুধু তোর বোনই নয়, বোনের চাইতেও বড়—মায়ের মত!" মায়ের এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে অবন্তীর বেদনা সমুদ্রে আলোড়ন তোলে কিন্তু জয়ন্তীর অশান্ত চিত্ত এই অর্থহীন বাক্যে একটা অস্বস্তিই বোধ করে। কালীতারার জীবনের দীপ নিভে যায়,—একটা অস্ফুট আর্তনাদে অবন্তী মায়ের বুকে ঢলে পড়ে।

* * * *

পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসী কুবের। কুবেরের মতই সে ছিল অর্থের অধিপতি, কিন্তু সাইলকের ন্যায় কৃপণ স্বভাবের জন্য লোকে তার নামোচ্চারণেও বিরত থাকতো। ওর নাম মুখে আনলে আহার নাকি জুটতোনা। একমাত্র পুত্র পার্থ, অথচ তার প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দয়া, মায়া, দাক্ষিণ্যে সে ছিল মুক্ত হস্ত। পিতার সর্বপ্রকার কালিমা ত্যাগের বিনিময়ে মুছে দিতে সে যেন বদ্ধপরিকর। ছাত্রদলের মধ্যে যারা বেশী যাতায়াত করতো প্রোফেসারের বাড়ী তার ভিতর পার্থও ছিল অন্যতম। প্রোফেসারের আদর্শ তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, অবন্তীর প্রতি ছিল তার অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং জয়ন্তীকে তার ভাল লাগতো অদ্ভুত আকর্ষণে।

অতীতের দুঃসহ বেদনায় অবন্তীর মন ধনযৌবনের

প্রতি বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। পিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেখে সহোদরার অকৃত্রিম স্নেহেই পার্থকে সে ভালবাসতো, কিন্তু জয়ন্তীর প্রতি তার অহেতুক আকর্ষণে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। এমন কি একদিন সুস্পষ্ট ভাবে পার্থকে জানিয়ে দিল, "তুমি আর এ বাড়ীতে আসবে না পার্থ।"

পার্থ আদর্শবাদী যুবক। জয়ন্তীকে বিয়ে করবার সঙ্কল্প তার মনে দৃঢ় হয়ে ওঠে। জয়ন্তীকে তার মনের এই কথা জানাতে হবে, তাই রাত্রির অন্ধকারে সে প্রোফেসারের বাড়ীতে প্রবেশ করে।—কিন্তু অবন্তীর প্রখর দৃষ্টিকে সে এড়াতে পারেনা।

পার্থ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়না। দৃঢ়তার সাথেই অবন্তীর সামনে এসে দাঁড়ায়, সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলে—"হ্যাঁ আমি পার্থ। জয়ন্তীকে আমি ভালোবাসি, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।"

গোলমালে প্রোফেসার বাইরে এসে দাঁড়ান। বুঝতে তাঁর কিছুই বাকী থাকেনা। বজ্র-কঠোর কণ্ঠে পার্থকে জানিয়ে দেন,—'আগামী শুভদিনেই জয়ন্তীকে তোমার বিয়ে করতে হবে, নয়তো এবাড়ীর দরজা চিরকাল তোমার জন্য বন্ধ থাকবে।'

পিতার সম্মতি পেতে পার্থ আদৌ বিলম্ব করে না। অর্থলিপ্সু কুবের অত্যন্ত আনন্দেই এতে সম্মতি দেন। প্রথমতঃ পার্থ বিয়ের একাধিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, দ্বিতীয়তঃ প্রোঃ চৌধুরী তাঁর মেয়ে জামাইয়ের স্বার্থের খাতিরে তাঁর সমবায় অভিযানের গতি অন্ততঃ কুবেরের ধন ভাণ্ডারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবেন,—এই দুটি সমস্যারই এমন সুসমাধান দেখে কুবের নিজেই একদিন প্রোঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে' বিয়ের সব কিছু পাকা করে ফেলেন।

বিয়ে হয়ে যায়। সকলেই সুখী। ধনী মহাজনের বাড়ীতেই সমবায় আন্দোলনের অভিযান আরম্ভ হলো,—প্রোফেসার ও অবন্তী এতে উল্লসিত। তা'ছাড়া এর চাইতে যোগ্যতর পাত্র জয়ন্তীর জন্য অবন্তী কল্পনাও করতে পারেনি। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অবন্তী ভাবে,—অন্ততঃ এদের ভালবাসা বিয়েতে পর্যবসিত হলো!

এই নবদম্পতির শুভমিলনে অবন্তীর মাতৃমনে আজ অফুরন্ত স্নেহ উৎসরিত হয়ে ওঠে, কিন্তু সে যে অভিশপ্তা! তার বঞ্চিত বুকের বেদনা একমাত্র সন্তানকে ঘিরে সান্ত্বনা পেতে চায়—কিন্তু সংসার তাকে ভুল বোঝে!! এক বৃদ্ধ পিতা, কিন্তু জয়ন্তীর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তারও তো বলবার কিছু নেই! অবন্তীর স্নেহ জয়ন্তীর ভাল লাগে না, পার্থের সাথে অবন্তীর আলোচনা জয়ন্তীর মনকে বিষাক্ত করে তোলে। জয়ন্তী অবন্তীকে ঘৃণা করে। অবশেষে অবন্তীর প্রতি উপেক্ষা দেখিয়েই জয়ন্তী শ্বশুরালয়ে চলে যায়। বৃদ্ধ প্রোফেসার সবই দেখে, অবন্তীর প্রতি সহানুভূতিতে তাঁর সজল চক্ষু স্বতই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

কৃপণতার অভিনয়ে কুবেরের স্নেহ এবং বিশ্বাস অর্জনে জয়ন্তীর বিশেষ বিলম্ব হয় না। কৃপণের ভূমিকায় মাঝে মাঝে সে কুবেরকেও ছাড়িয়ে যায়। কুবের এখন নিশ্চিন্ত। এক শুভদিনে, তার অপদার্থ পুত্র, অতুল ঐশ্বর্য এবং অগণিত অধমর্ণের দায়িত্ব এই পুত্রবধূর হাতে তুলে দিয়ে কুবের বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

পার্থ জয়ন্তীকে ভালবাসে, কিন্তু আদর্শের প্রতি তার শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্রও ম্লান হতে দেয় না। পার্থের প্রেম জয়ন্তী উপভোগ করে,—অবন্তীর স্নেহ পার্থকে ঘিরে রাখে। অবন্তীর প্রতি জয়ন্তীর ঘৃণা পার্থকে ব্যথিত করে। সমবায় আন্দোলনে জয়ন্তীকে টেনে আনতে পার্থ সর্বদাই সচেষ্ট, কিন্তু তার সমস্ত কল্পনা ব্যর্থতায় ভেঙ্গে যায়। পিতার আদর্শ জয়ন্তীকে যে উদ্বুদ্ধ না করে তা নয়, কিন্তু জয়ন্তীর বিশ্বাস পার্থ অবন্তীকে শ্রদ্ধা করে, পূজা করে, এমন কি তার চাইতেও বুঝি বেশী ভালবাসে। জয়ন্তীর বিশ্বাস,—অবন্তী তার প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই অবন্তী ও প্রোফেসারের মিলিত যুক্তিতে যা কিছু তার সামনে এসে দাড়ায় সবই সে নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙ্গে দেয়।

বছর ঘুরে লক্ষ্মীপূজার সময় এসে উপস্থিত হলো। অন্ততঃ এই উৎসব উপলক্ষে জয়ন্তী সম্মত হয়;—প্রোফেসার ও অবন্তীকে নিজের গৃহে আমন্ত্রণ করে পাঠায়। বাহ্যিক সৌজন্যে জয়ন্তী প্রাণপণে চেষ্টা করে তাদের আতিথ্যকে বরণীয় করে তুলতে।

রূপ-মঞ্চ

প্রোফেসার চৌধুরী এসেছেন, কথাটা রাষ্ট্র হতে বিলম্ব হয়না। দলে দলে গ্রামবাসী এসে ঘিরে দাঁড়ায়,—মহাজনী সুদের উৎপীড়ন থেকে এবার তাদের বাচাবার একটা পথ প্রোফেসারকে করে দিতেই হবে।

সমস্যা এসে দাঁড়াল যে পার্থের নিজের গ্রামেই এই সমবায় সমিতি সংগঠন করা সম্ভব কি—না।

পুত্রের প্রতি বৃদ্ধ কুবেরের আদৌ আস্থা ছিল না। তাই তার সমস্ত সম্পত্তির ভার পুত্রবধুর হাতে নিশ্চিন্ত মনে তুলে দিয়ে তাকে একান্তভাবে সাবধান করে দিয়ে যান, যাতে এই সব আন্দোলনকারীদের সাথে জয়ন্তী কোন প্রকার সংস্রব না রাখে। এতেও হয়তো জয়ন্তীর হৃদয় জয় করা গ্রামবাসিদের পক্ষে তত কঠিন হতো না, যদি না অবন্তীর সাথে পার্থের ব্যবহার দিনের পর দিন এমনিভাবে আত্মপ্রকাশ কত'। পার্থ অবন্তীকে শ্রদ্ধা করে, অবন্তীর সাথে তার আলোচনা চলে, অবন্তীকে নিয়েই তার বেশী সময় কাটে, এমন কি স্ত্রী জয়ন্তী অপেক্ষা অবন্তীর জন্যই যেন সে বেশী গর্ব বোধ করে।

প্রাঙ্গন-সংলগ্ন উদ্যানেই লক্ষ্মীর পূজা-মন্দির। মন্দিরের সামনে বিস্তীর্ণ প্রস্তর বেদীর উপর তুলসী-মঞ্চ। বেদীর উপরে পূজার্থীরা বসে ভীড় করে। পার্শ্ববর্তী শেফালির ঝাড় মঞ্চটীকে আবরিয়ে রেখেছে, তুলসীর পুণ্যস্পর্শ মেখে সেই বেদীর উপরে তার ছায়া এসে ছড়িয়ে পরে। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে অবন্তী এখানে এসে বসে থাকে। মাঝে মাঝে বাতাসের দোলা খেয়ে শেফালিকার ঝাড় নড়ে ওঠে। স্বর্গের স্নেহাশীষের মত শেফালির দল ওর গায়ে, মুখে মাথায় ঝড়ে পরে, পরিপূর্ণ শারদ জ্যোছনা গাছের ফাঁকে ফাঁকে বেদীর উপরে লুকোচুরি খেলে। অবন্তী তন্ময় হয়ে চেয়ে দেখে। স্বর্গের স্নেহ সিঞ্চনে—জ্যোস্নার পুণ্য অবগাহনে ওর জীবনের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে যায়। সে যেন মহিমাময়ী মাতৃমূর্তি! পার্থ পাশে এসে দাঁড়ায়। সেই অপূর্ব মাতৃলাবণ্যে সে মুগ্ধ হয়। অবন্তী তাকে বসতে বলে। মানব জীবনের ভাঙ্গা গড়া নিয়ে ওরা আলোচনা করে। অবন্তীর উদ্বেলিত মাতৃমন হয়তো বা নিজেকে হারিয়ে ফেলে,—ওর বাষ্পাকুল কণ্ঠ জয়ন্তীর কানে যায়। ঝোপের আড়াল থেকে সে শোনে, ওদের অলক্ষ্যে সে দেখে,—ঝরা শেফালির সাথে অবন্তীরও দুগণ্ড বেয়ে শুভ্র অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

জয়ন্তী ভুল বোঝে। সে আর দেখতে পারে না। বুঝিনা—হয়তো তাই! পার্থ নিজে হাতেই হয়তো অবন্তীর ওই চোখের জল মুছিয়ে দেবে!! সিংহীর বিদ্বেষ বহ্নি নিয়ে সে পিতার প্রকোষ্ঠে ছুটে যায়। প্রোফেসার নির্বিকার। জয়ন্তী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে,—"তুমি কি কিছুই বোঝনা বাবা, চোখের মাথাও কি খেয়েছ? আমার সংসার, আমার শান্তি, সবই সে ধ্বংস করবার জন্য এখানে এসেছে। ও আমার বোন নয়, ও শয়তানী! তুমি কথা বলছনা কেন বাবা?"—আক্রোশ-আতিশয্যে জয়ন্তী প্রোফেসারকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেলে।

প্রোফেসারের মেজাজ ইদানীং খিটখিটে—রক্তাধিক্য রোগে প্রায়ই তাঁকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়। উত্তেজিত ভাবে কর্কশ কণ্ঠেই তিনি উত্তর দেন,—"তুই পাপিষ্ঠা। আমি বলছি, ও তোর শুধু বোন-ই নয়, বোনের চাইতেও বড়। এ পৃথিবীতে ওর মত শুভাকাঙ্ক্ষী তোর আর কেউ নেই। যাও আমাকে এখন বিরক্ত করোনা—আমায় একা থাকতে দাও।"

—ফল হয় বিপরীত। ভুলের পরে জয়ন্তী ভুল করে চলে। পিতার কাছেও তার সান্ত্বনা মেলে না, তাই প্রকাশ্য বিদ্রোহে পিতার সঙ্গেই সে লড়তে চায়। তার জীবনকেই যদি ওরা এমনিভাবে ভেঙ্গে ফেলতে চায়, ওদেরই বা সে ক্ষমা করবে কেমন করে? কর্মচারীদের ডেকে জয়ন্তী সুস্পষ্ট আদেশ জানিয়ে দেয়,—সমবায় আন্দোলনের যে সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা আছে, তার অধমর্ণদের কেউ যেন তাতে যোগ না দেয়, পরন্তু আন্দোলনকারীদের পরিকল্পনা যারা ভেঙ্গে দিতে পারবে তাদের সে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে।

জয়ন্তীর এই গোপন দুরভিসন্ধি পার্থের কানে এসে পৌছায়;—অবন্তী এবং প্রোফেসার চৌধুরীকে সভামধ্যে অসম্মান এমন কি বলপ্রয়োগে তাদের আহতও করা হবে! পার্থ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, তাদের অনুরোধ করে সভায় যোগদান না করবার জন্য।

অবন্তী ও প্রোফেসার কেউই তাদের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হন না। পার্থকে সভাপতি করে সভা আরম্ভ হয়,—অসুস্থতার অছিলায় জয়ন্তী অনুপস্থিত থাকে।

সে এক মহতী জনসভা! কিন্তু মহাজনী পক্ষের ভাড়াটীয়া গুণ্ডাদের তর্ক. বিতর্ক, গালাগালি ও মারামারির এমন বেদনাদায়ক দৃশ্য প্রোফেসার জীবনে কখনও দেখেননি। পার্থ,—অবন্তী—সহকর্মীদের কেউই সেই উশৃঙ্খল জনতাকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয় না।—অবশেষে রুগ্ন প্রোফেসার উঠে এসে দাঁড়ান। বক্তৃতামঞ্চের মাঝখানে সভাপতির পার্শ্বে এসে তাঁর সহজাত উদাত্ত দার্শনিক কণ্ঠে সস্নেহে সেই শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করেন। স্তম্ভিত জনতা বিস্ময়ে চেয়ে দেখে, সেএক জ্যোতির্ময় ঋষি মূর্তি! জীবনের আদর্শ, স্বার্থান্বেষীর ক্ষুদ্র নীচতা, একের পরে এক প্রোফেসার বিবৃত করে চলেন। প্রোফেসার ভুলে যান তিনি অসুস্থ। অবন্তী ডাকে—"বাবা"। প্রোফেসারের ভ্রূক্ষেপ নাই। যেন কোন সাগ্নিক ঋষির অগ্নিমন্ত্র বহন করে তিনি আজ পদতলে সমবেত বিশ্ববাসীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। জনতা মন্ত্রমুগ্ধ! প্রোফেসারের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসে,—কিন্তু তাঁর মনঃশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে বিশ্বের নরনারীর পুঞ্জীভূত বেদনা সমুদ্র !!

জয়ের পরে জয়ধ্বনি, উল্লাসের পর উল্লাস,—শ্রোতৃমণ্ডলীর সেই হর্ষধ্বনি জয়ন্তীর নিভৃত শয়নকক্ষকেও আলোড়িত করে তোলে।

—প্রোফেসারের কণ্ঠস্বর ক্ষীন হতে ক্ষীনায়মান হয়ে আসে। আচম্বিতে সভাপতি পার্থ ফিরে তাকান;—কিন্তু প্রোফেসারের অবসন্ন দেহ তখন সেই বক্তৃতামঞ্চের উপরে ঢলে পড়েছে।—মৃত্যুপণে প্রোফেসার তার শেষ বাণী নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, মৃত্যুর পরে তাঁর শক্ররাও তাঁকে জয়ের মালা পরিয়ে দিল!

শ্রাদ্ধ দিবসে সমস্ত গ্রামবাসী সমবেত হয়। পরলোকগত মহাপুরুষের পুণ্য স্মৃতিকে তারা স্মরণীয় করে রাখতে চায়। তাই এই পুণ্য দিনেই তারা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস বলে আনুষ্ঠানিক আয়োজনের প্রয়াস পায়। পার্থকে তারা প্রথম সভাপতিরূপে মনোনীত করে, সমিতির উদ্বোধন ঘোষণা কর্তে অবন্তীকে তারা আহ্বান করে এবং পৃষ্ঠপোষিকা থাকবার জন্য জয়ন্তীকে অনুরোধ জানায়। জয়ন্তীর বিদ্রোহীমন তখনও শান্ত হতে পারেনি, তার প্রতি তার শ্বশুরের যে বিশ্বাস সে মর্যাদা সে কিছুতেই হারাতে পারেনা।—জয়ন্তীকে বাদ দিয়েই সমিতি গঠিত হয়।

—রাত্রির অন্ধকারে জয়ন্তী স্তব্ধ হয়ে ভাবে। মায়ের স্নেহ, অবন্তীর অনুশাসন,—সর্বোপরি তার আদর্শবান পিতার আকস্মিক মৃত্যু সবই আজ তার বিক্ষুব্ধ চিত্তকে বিচলিত করে তোলে। সে আজ বড় দীন, বিশ্বের সমারোহের মাঝে হে আজ সম্পূর্ণ একা। জয়ন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ঘুমন্ত পুরীর অলক্ষ্যে তার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সমিতির সভা ক্ষেত্রে এসে সে উপস্থিত হয়। বাইরের আকাশে তারার কথামালায় কীসের লেখা যেন সে দেখতে পায়, হাতের শুভ্র সাপ্‌লাগুলি পরম শ্রদ্ধায় সেই সভা প্রাঙ্গনে ছড়িয়ে দেয়। জয়ন্তী প্রণাম করে—উচ্ছ্বাস ক্রন্দনে পিতার বেদনা স্মৃতিকে সম্মান জানায়। জয়ন্তীর সমস্ত মনের গ্লানি কেটে যায়—ফিরে এসে নিতান্ত শিশুর মতই বিভোরে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

পিতার শ্রাদ্ধকার্য সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। এখানে থাকবার কোন প্রয়োজন আর অবন্তীর নেই! রাত্রি প্রভাতে পিতার সহরের বাড়ীতে ফিরে যাওয়াই অবন্তী মনস্থ করে। এই হয়তো তার চির বিদায়ের পালা! তার বঞ্চিতা জীবনের ব্যথা আজ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। জীবনের শেষ সান্ত্বনা জয়ন্তীকে সে দেখবে—একবার মাত্র, তাও শুধু চোখের দেখা! নিঃশব্দে জয়ন্তীর শোবার ঘরে অবন্তী প্রবেশ করে। নিষ্পাপ ঘুমন্ত শিশু,—হ্যাঁ ওকেই তো অবন্তী মানুষ করেছিল! দেহের সমস্ত রক্ত নিংড়ে বুকের মধু ঢেলে ওকেই তো সে লালন করেছে!—অবন্তী এগিয়ে যায়, ওর নিকটে—আরও সান্নিধ্যে। অবন্তীর তৃষিত বুকের উদ্গত আকাঙ্খা পৃথিবীর সমস্ত কথা ভুলে যায়। জগদ্ধাত্রীর স্নেহময় কল্যাণ-দৃষ্টিতে অবন্তী আজ জননী;—বঞ্চিতা—রিক্তা।

বাল্যের কাহিনী, কৈশোরের দুঃস্বপ্ন, মায়ের চিরবিদায়, পিতার মৃত্যু সবই আজ তার মনে পড়ে! জয়ন্তী তার

সন্তান,—বিশ্বের অমৃত সমুদ্র মন্থন করে ওই স্নেহ-বিষ সে কণ্ঠে ধরেছিল! কেমন করে অবন্তী তাকে ভুলে যাবে!! না, না একটা চুম্বন, একটুকু স্নেহ-স্পর্শ,—এইতো! কিন্তু, সন্ত্রস্তে অবন্তী পিছিয়ে আসে,—ঘুমের ঘোরে জয়ন্তী স্বপ্ন-বিহ্বলে ডেকে ওঠে—"মা"।

—অবন্তীর নিরাশ অন্তর গভীর হতশ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে। ওর জীবনব্যাপী হাহাকার অশ্রুবন্যায় নেমে আসে;—জয়ন্তীর শয্যা প্রান্তে, জয়ন্তীর উপাধানে ওর মাতৃ-মন সন্তান-স্পর্শ অনুভব করে।

ভোরের পাখী ডেকে উঠেছে। অবন্তীর ঘুমন্ত শিশু,—হ্যাঁ, জয়ন্তী,—হয়তো বা এখুনি ঘুম থেকে উঠে পড়বে! অবন্তী দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে আসে,—পার্থকে খোঁজে।

ঝরা শেফালি তুলসীর বেদী মঞ্চে ছড়িয়ে রয়েছে, পার্থ নিবিষ্ট মনে তাদের কুড়িয়ে চলেছে। বিদায়ের বার্তা নিয়ে অবন্তী এসে পাশে দাঁড়ায়, হাতের কুড়ান ফুলগুলি পার্থ অবন্তীর পায়ে ঢেলে দেয়,—ওকে প্রণাম করে। মমতাময়ী জননীর করুণা-দৃষ্টিতে অবন্তী পার্থকে আশীর্বাদ জানায়।

পার্থকে খুঁজতে এসে জয়ন্তী স্তম্ভিত,—হতবাক হয়ে যায়। শেফালির যে মালা তারই কণ্ঠে শোভা পাবে, তাই দিয়ে পার্থ অর্ঘ ঢেলে দিয়েছে অবন্তীর পায়ে! না না—অসম্ভব এই অপমানকে সহ্য করা। জয়ন্তীর জ্বলন্ত চোখ দিয়ে আগুনের তীব্র স্ফুলিঙ্গ ছুটে আসে,—"তোমাদের সুখের কণ্টক হয়ে কিছুতেই আমি এখানে থাকবোনা"—ঝড়ের বেগে জয়ন্তী ওদের কাছ থেকে চলে যায়।

অবন্তীকে নিয়ে যাবার জন্য বাইরেই সজ্জিত টমটম্ ছিল। ঘর, বাড়ী, সংসার, গ্রামের সর্বপ্রকার মমতা মুহূর্তে ছিন্ন করে জয়ন্তী তার পিতার সহরের বাড়ীর দিকে ছুটে চলে।

পার্থ হতবুদ্ধি হয়ে ভাবে,—একী হলো! অবন্তী অসহায়ের মত চীৎকার করে ওঠে, "যাও পার্থ এখনই ছুটে গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আন, আমাকে যদি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা কর, ওকে ভালোবেসো, ওকে সুখী করো।"—পার্থ তার সাইকেলটায় উঠে বসে।

স্বপ্ন চালিতের ন্যায় নিজের অবসন্ন দেহটাকে অবন্তী বাড়ীর ভেতরে টেনে আনে। অবন্তী ভাবে;—সে বোঝে,—তার বঞ্চিতা জীবনের অভিশাপকে বরণ করা ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই। জয়ন্তীর মন থেকে তার সর্বপ্রকার স্মৃতি তাকে মুছে ফেলতেই হবে! তাই পার্থ ও জয়ন্তী ফিরে আসবার পূর্বেই সে এ বাড়ী থেকে চলে যাবার সংকল্প করে।

অবন্তী তার জিনিষপত্র গুছিয়ে নেয়। কিন্তু কোথায় সে যাবে! এ পৃথিবীতে তাকে আশ্রয় ও সান্ত্বনা দেবার কে আর আছে!! পুরাণো সংবাদ পত্রে সে তার জিনিষ গুলো জড়িয়ে নিতে যায়, হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে, বড় বড় অক্ষরে লেখা,—"মেদিনীপুরে বিধ্বংসী মহাপ্রলয়—মহাকালের কবলে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অগণিত নরনারী—।" অবন্তী দেখতে পায়, তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে,—জীবন্ত কঙ্কালের অসংখ্য ছায়ামূর্তি। মায়ের বুক থেকে সন্তান ভেসে গেছে, পতির পার্শ্ব থেকে পত্নী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে! কে ওদের দেখবে, কে ওদের ডেকে কাছে নেবে!—অন্নহীন, বস্ত্রহীন, ওই কঙ্কালের দল প্রেতযোনির মতই ঘুরে মরে।

—সূর্যের সপ্তরশ্মি স্বর্গের দুয়ার থেকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। সংবাদের কাগজ খণ্ড অবন্তী দু'হাতে কুড়িয়ে জড়িয়ে ধরে,—একটা পরম সান্ত্বনায় ব্যাকুল কণ্ঠে ওর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়—"ভগবান!"

বাইরের জগত তখন জেগে উঠেছে, ঝরা শেফালিরা ঠিক তেমনি ভাবেই চেয়ে আছে, পাখীরা ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়,—কিন্তু অবন্তীর পথ এগিয়ে চলে। গাছেরা কানাকানি করে,—বাতাসের গায়ে কী যেন তারা বলে পাঠায়,—অবন্তীর ভ্রুক্ষেপ নেই! সে আজ মমতাময়ী বিশ্ব-জননী, সন্তানের ব্যাকুল আহ্বান তাকে আজ বিচলিত করে তুলেছে!—মাঠের পরে মাঠ, গ্রামের পরে গ্রাম—শিশিরভেজা ঘাসের ওপরে ওর কল্যাণী পদরেখা এঁকে ওঠে।

—জয়ন্তীর টমটম প্রোফেসারের সহরের বাড়ীতে তাকে নিয়ে এসেছে। এখানেই সে থাকবে তাই ঘরগুলি

নূতন করে সে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে। অনুসরণ ক'রে পার্থও প্রোফেসারের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়। জানালা থেকে জয়ন্তী তা' দেখে—ভৃত্যদের কঠোর আদেশ দেয়, এ বাড়ীতে পার্থকে যেন কিছুতেই ঢুকতে দেওয়া না হয়।

বন্ধ দুয়ারে নিষ্ফল আঘাত করে পার্থ নিজের বাড়ীতে ফিরে যায়, কিন্তু অবন্তীকে সে আর পায় না। অবন্তীকে পার্থ ভাল করেই জানে, তাই বিস্মিত সে হয় না।

চতুর্দিকে তার সন্ধানে লোক পাঠায়।

জয়ন্তী ঘরগুলি ধীরে ধীরে গুছিয়ে নেয়। প্রতিটি সরঞ্জাম—প্রত্যেকটী আসবাব আজ ওর চোখে বড় ভাল লাগে। ধুলি ধূসরিত প্রত্যেকটী পুস্তক ও পরিধেয় মুছে রাখে। প্রোফেসারের ব্যক্তিগত "ডায়েরী বইটা" হঠাৎ ওর হাতে পড়ে,—কত দুঃখ বেদনার ইহিতাস প্রোফেসার নিজে হাতে ওতে একে রেখেছেন! অবন্তী পড়তে থাকে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে ও এগিয়ে চলে। কত মমতা, কত স্নেহ যেন ওই ডায়েরী বইয়ের প্রত্যেকটী চিত্রে ছড়িয়ে রয়েছে! জয়ন্তীর দৃষ্টি পড়ে, বড় বড় অক্ষরে প্রোফেসারের নিজের হাতে লেখা রয়েছে, "অত্যন্ত গোপনীয়।" জয়ন্তীর উৎসুক মন বাধা মানে না,—হ্যা, এ যে ওরই জন্ম জীবনের কথা! জয়ন্তী পড়ে আর ভাবে, 'অবন্তী তার মা!' আলোর উচ্ছাস ও আঁধারের ছায়া ওকে যেন বিমূঢ় করে তুলে! না, না, কেমন করে এ মিথ্যা হবে, এযে বাল্মীকির বুকের ভাষায় দুঃখিনী সীতার বেদনার গান! জয়ন্তী আর ভাবতে পারে না—প্রোফেসারের আলোকচিত্র, কালীতারার তৈলমূর্তি সবই যেন তাকে আজ উপহাস করে। ঘরের মেজে, বাইরের পৃথিবী যেন ওর পায়ের তলা থেকে সরে যেতে চায়! অসহায় শিশুর মত প্রোফেসারের টেবিলের ওপর অবন্তীর ফটোখানা বুকে চেপে আর্ত চীৎকারে জয়ন্তী কেঁদে ওঠে—"মাগো,—মা"।—জয়ন্তী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যায়।

সারাদিনের অনুসন্ধানেও পার্থ অবন্তীকে খুজে পায় না। ধীরে ধীরে শরতের শান্ত সন্ধ্যা নেমে আসে। পার্থের ভারাক্রান্ত মন পবিত্র তুলসীমঞ্চের পাশে এসে দাঁড়ায়—অবন্তীর প্রতিটী কথা ওর মনে পড়ে,—নিজে হাতে পার্থ সন্ধ্যারতি জ্বেলে দেয়।

অর্গলবদ্ধ গৃহে জয়ন্তী মূর্চ্ছা থেকে ওঠে বসে, ঘর থেকে বাইরে আসে। ঝি এসে কাছে দাঁড়ায়,-কথা বলেনা। ভৃত্য এসে ডাকে "দিদিমনি",—ও ফিরেও তাকায় না।—জয়ন্তীর দ্রুতগামী টমটম আবার তাকে পার্থের বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে চলে।

মথিত সমুদ্রের মতই পার্থ আজ শান্ত,—স্থির। তুলসীর ওই বেদীতল অবন্তীর পদস্পর্শে আজ পুণ্যক্ষেত্র। শেফালির ফুলে দুহাত ভরে' পার্থ উঠে দাঁড়ায়,—ওই বেদীতলে তার বিশ্বজননীর পায়ে সে আজ অঞ্জলি ঢেলে দেবে! কিন্তু এ কি! পার্থ চেয়ে দেখে, শেফালির অঞ্জলি নিয়ে জয়ন্তী তার পাশে দাঁড়িয়ে। বেদনাক্লিষ্ট জয়ন্তীর দুনয়ন বেয়ে শুভ্র শেফালির মত অঘোর অশ্রু ধারা ঝরে পড়ে। অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ঢেলে ওরা সেই বেদীতলে প্রণাম করে।

—আর অবন্তী। সে আজ শুধু পার্থ ও জয়ন্তীরই জননী নয়,—তার সমস্ত নারীত্ব আজ মাতৃত্বে উদ্বোধিত হয়ে উঠেছে। অভিশপ্তা দুর্ভিক্ষের দেশে সহস্র সন্তানের আকুল ক্রন্দনের মাঝে সে আজ কল্যাণময়ী জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা।

[শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় কর্তৃক সিনেমার জন্য লিখিত "Mother unwept and unsung" নামক ইংরেজী গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন রূপ-মঞ্চ সম্পাদকীয় বিভাগের সভাপতি শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত রায়ের এই কাহিনীটী সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের মতামত চাচ্ছি।]

—সম্পাদক 'রূপ-মঞ্চ'।

"পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজনা চলতি হাওয়ার পন্থী"।
পথ বেঁধে দিল চিত্রে

কানন দেবী

রূপ-মঞ্চ : বৈশাখ : ১৩৫২।

নিউথিয়েটার্সের "হামরহি" চিত্রে

কুমারী বিনতা বসু

তোমাদের পৃথিবী

(গল্প)

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

দীপক ছবি এঁকে চলেছে, ওদিকে ময়লা বিছানায় ছোট ভাই প্রদীপ পড়ে চলেছে, এক মনে তুলি বুলিয়ে চলে দীপক। প্রদীপের হাই ওঠে ঘন ঘন, দাদাকে বলে, 'রাত অনেক হয়ে গেছে যে!' কিন্তু দীপকের তাড়া খেয়ে আবার পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করে!

কতক্ষণ কাজ করেছিল জানেনা, হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়েই অবাক হয়ে যায়, অনেক রাত হয়ে গেছে, তুলিগুলো গুছিয়ে রেখে ঘুমন্ত প্রদীপকে তুলে চোখে মুখে জল দিয়ে উঠিয়ে বসায়। ওদিকে আবার বিপদ, কুকারটার ঢাকনি খুলে অবাক হয়ে যায়, চাল ডাল তরকারী সবই তেমনি আছে, নীচেকার চুল্লিটা টানতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে! আগুনই দেওয়া হয়নি! দিতে ভুলে গেছে।

এত দুঃখেও হাসি আসে দীপকের। শূন্য প্রায় হাঁড়ি দু'টো হাতড়াতে থাকে, চিড়ে মুড়ির সন্ধানে, তাও নাই! প্রদীপ মুখের দিকে চেয়ে থাকে দাদার। হঠাৎ পাশের বারান্দায় এক ঝলক আলো দেখা যায়, বন্ধ দরজাটার কড়া নড়ে ওঠে! খুলেই দেখে দীপক, পাশের বাড়ীর মেয়ে অণিমা একটা এনামেলের থালায় খানকয়েক পোড়া রুটি আর একটু তরকারী প্রদীপের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়।

"এই দুর্দিনের সময়—"

উত্তরটা আগেই দিয়ে বসে অণিমা; "আপনার জন্য নিশ্চয়ই নয়, একরাত উপোস করে থাকলে আপনার কিছু হবেনা জানি।"

বলে দীপক—"চিড়ে মুড়ি আছে তাতেই ওর চলবে"

যেতে যেতে উত্তর দিয়ে যায় অনিমা; "নেই তা আমি জানি!" অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দীপক।

রাত অনেক হয়ে গেছে, মায়ের কথা মনে পড়ে নিশীথ নিঝুম রাতে। এতক্ষণ হয়ত মা রুগ্ন শরীর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দখিনের ভিটের সুপারী গাছে রাতের বাতাস দোল দিয়ে যায়, ধ্বসে পড়া শূন্য চালাঘরেই গৃহস্থের নগ্নদারিদ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মাকে সে নিয়ে আসবে, দেশে চাল মেলেনা, চারিদিকে অভাব অভিযোগ, মাকে সে নিয়ে আসবেই!

সকাল বেলায় বাজারের পয়সা দিয়ে বার হয়ে যায় দীপক কাল রাতের শেষ করা ছবিখানা নিয়ে, প্রদীপের এবেলাকার কাজ কুকার ধরান, সেও যোগাড় যন্ত্র করতে থাকে, আজ আর যেন ফস্‌কে না যায়।

দীপক ট্রামে চলেছে কি যেন ভাবতে ভাবতে। মাকে আনতেই হবে—চিকিৎসার দরকার হঠাৎ কনডাক্‌টারের ডাকেই চমক ভাঙ্গে। কপালটা ঘেমে ওঠে, পাদুটো যেন অবশ হয়ে যায়, এপকেট ওপকেট হাতড়ে কিছু মেলেনা, একটা পয়সাও নাই, অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে ট্রাম থেকে, মুখ টিপে হাসে অনেকেই!

হাটতে হাটতে চলেছে দীপক, দোকানের কাছের কলটাতে মুখ টুখ ধুয়ে কাপড়ের খুট দিয়ে মুছে দোকানে ঢোকে। মস্ত দোকান সারি সারি ছবি খ্যাত অখ্যাত শিল্পীর, কয়েকজন কর্মচারী ব্যস্ত ভাবে কি যেন কাজ করে চলেছে, এগিয়ে চলে দীপক।

রুক্ষ চেহারার ভদ্রলোক কাল চশমার মোটা ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে, আমতা আমতা করতে থাকে দীপক, 'যদি ছবিখানা রাখতেন—'।

ভদ্রলোক ছবিখানার খানিকটা সমালোচনা শুনিয়ে দেন তখুনই।

"—আর একটু sexappeal বুঝলেন কিনা—সাধারণ লোক যা চায়! সেইটারই অভাব দেখছি—!"

যাহোক দয়া করে দোকানে স্থান দেন ভদ্রলোক;

ছবিখানা সত্যই ভাল হয়েছিল, তাই হয়ত এক ভদ্রলোক দোকানের নিয়মিত খরিদ্দার, তাঁর নজর পড়তেই উচ্ছসিত প্রশংসা করে বসেন, কিনে নিয়েও যান ছবিখানা। দোকানের মালিক দুলালবাবুও প্রশংসা করতে থামেন না।

"চমৎকার হাত ভদ্রলোকের, নোতুন artist কিন্তু খুঁত কোথাও পাবেননা ডাঃ রায়। মাত্র দু'শ—অনেক কম দাম হয়ে গেল।"

ছবিটা বিক্রী হয়েছে, প্রথম ছবি, আশায় আনন্দে বুক

ভরে উঠে। টাকাটা গুনে দেখে নেয়, পাঁচখানা দশ টাকার নোট! পঞ্চাশ টাকা এই ঢের! আর একখানা ছবি রেখে নমস্কার করে বার হয়ে আসে! মাকে এইবার সে কলকাতায় আনবে। দেশে দুর্ভিক্ষ, সহরে তবু বাইরেই লেগেছে, নাড়ীতে টান পড়েনি।

প্রদীপ আজ কাল ব্যস্ত। রুগ্না মায়ের বিছানার পাশে বসে থাকে, ধূলিধূসর আকাশে জাগে ম্লান তারার দল। মোমবাতির ভীরু শিখা বাতাসে কেঁপে কখন শেষ হয়ে যায়।

অণিমা সাবুর বাটীটা এগিয়ে দেয়, "মাসীমা, খেয়ে নিন সাবুটা।"

সাবিত্রীদেবী রুগ্ন পাংশু নয়নে চেয়ে থাকেন সেবা-পরায়ণা মেয়েটীর দিকে, বড্ড মায়া হয় দেখলে একে। বৃদ্ধ বাবা, একা সংসার চালাবার সামর্থ্য নেই।

পোষ্যবর্গ অনেকগুলি, ছিন্ন কাপড়খানা কোন রকমে পরে রয়েছে! অণিমা তাগাদা দিয়ে ওঠে—"কই নিন খেয়ে, হাঁ-করে চেয়ে রয়েছেন যে!"

—"এইযে মা" চুমুক দিতে থাকেন বাটীতে!

দীপক মুগ্ধ হয়ে যায়, ডাঃ রায়ের সঙ্গে পরিচয়ে, এরই মধ্যে বিলেত ফিরে এসেছেন, চোখের ডাক্তার। সমাদরে নিজের ঘরে বসান। সারা ঘরখানার চারিদিকে নানা রকম ছবি দিয়ে সাজান। বলে চলেছেন, "প্যারিশের পিকচার গ্যালারী—গোঁগাঁদাভিঞ্চির সব কালেকসানই আমি দেখেছি সেবার রোমে—"

দীপক ওদিকে একমনে ছবি দেখে চলেছিল, দাঁড়িয়ে যায় হঠাৎ, এক মহিমময়ী নারীমূর্তি কোলে তার স্বর্গের এক দেবশিশু—অমলিন হাসিতে সারা ছবিখানা ভরিয়ে তুলেছে। পাশেই তার আর এক নারীর মূর্তি, কামাতুরা নারীর নগ্নদেহ নিবেদনের নির্লজ্জ মূচ্ছর্না!—"এখানে কেন এটা? ওপাশে সরিয়ে দেবেন, এখানে মানায় না!"

ডাঃ রায় দোষ পাড়তে থাকেন, "চাকর গুলোর যদি একটু হুস জ্ঞান থাকে!"

এত চাকর! দীপক অবাক হয়ে যায়! স্থলালবাবু ব্যবসাদার লোক, তিনি মনে মনে প্রমাদ গোণেন। ডাঃ রায় দীপককে বলে চলেছেন—

"আগামী ছবিটা কিন্তু বেশ Beautiful একখানা Landscape হবে —শীঘ্রই দরকার।"

দীপকের মনটা কেমন করে ওঠে, মায়ের অসুখ ডাঃ রায়কে কেসটার কথা বলি বলি করেও বলতে বাধে; মনে হয় ভদ্রতা বিরুদ্ধ!

পাড়ার ডাক্তার বাবু স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দেন, মায়ের অসুখের চিকিৎসা তিনি করতে পারবেন না। আমতা আমতা করতে থাকে প্রদীপ "ওষুধের বাকী দাম আমি কালই দিয়ে দোব, এই ছবিখানার দাম পেলেই!"

"ছবি আঁকেন আপনি! তাই বুঝি—"

এতদিনের অভাব-অনটন দারিদ্রের মূল কারণটা নির্ধারণ করে বসেন ডাক্তার বাবু!—"অন্যত্র দেখুন না হয়, আমি বড় ব্যস্ত বুঝতেইত পারছেন!"

ধীরে ধীরে বার হয়ে আসে দীপক।

বাড়ী ঢুকতেই দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায়, অণিমার ছোট ভাই বোন দুজন ঢুকছিল তাকে দেখে কি যেন লুকোবার চেষ্টা করে, হাতের ফাক দিয়ে দেখা যায় কোথা থেকে কতকগুলো ফেলে দেওয়া তরিতরকারী আর ছোট বোনটার হাতে খানিকটা জলো দুধ! ওদিকে কোথায় কারা দুধ দিচ্ছে সকলকে তাদের ওখান থেকেই আনা বোধ হয়। ছেলেমেয়ে দুটো মুখ কাঁচুমাচু করতে থাকে।

দীপক ঘরে ঢুকেই থেমে যায়, অণিমা মায়ের বিছানার পাশে বসেছিল। তাকে দেখে তাড়াতাড়ি বার হয়ে যায় ঘর থেকে! মা হাসেন!

"বেশ মেয়েরে! না থাকলে কি হত বল দেখি?"

দীপক বলে "তোমাদের বেশ হতে বেশীক্ষণ লাগেনা, একটু সেবাযত্ন করলেই বেশ।"

মা বলে চলেন—"কদিনই বা আছি, ওরাওত আমাদের জাত! বড্ড গরীব, যদি বৌ হয়ে—"

বাধা দিয়ে ওঠে দীপক, "আপনি পায়না খেতে আবার শঙ্করাকে ডাকে!"

কে যেন দরজার কাছ থেকে সরে যায়! মা হাসতে থাকেন "আয়না অণিমা!"

বেলা হয়ে গেছে অনেক, প্রদীপের দেখা নাই, মায়ের

ওষুধের শিশি খালি—পথ্যও নাই! শূন্য হাড়ি ছুটো হাতড়াতে থাকে দীপক—খিদেতে যে নাড়ীতে পাক দেয়! কুজোটা গেলাস অভাবে তুলেই মুখে ঢালতে থাকে।

ওদিকে সরু বারান্দার এক ফালিতে দেখা যায় অণিমাদের ছোট ছোট ভাই বোনগুলো কলাইচটা সানকিতে খানিকটা করে খিচুড়ী জাতীয় কোন পদার্থ পরম তৃপ্তি ভরে খেয়ে চলেছে, দীপক দাঁড়াতে পারেনা ওরা দেখলে হয়ত লজ্জাই পাবে—সরে আসে!

সিড়ির মুখেই প্রদীপের সঙ্গে দেখা! রাগের চোটে কাঠের সিড়ি বেয়ে নেমে এসে প্রদীপের কানটা ধরে ঘাকতক বসিয়ে দেয় "কোথাছিলি এতক্ষণ!" হঠাৎ কপালের এপাশে খানিকটা জমাট রক্ত দেখে অবাক হয়ে যায়—কাঁধের জামাই ছিড়ে গেছে! খামতা আমতা করতে থাকে প্রদীপ, "কনট্রোলের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম ঠেলাঠেলিতে পড়ে গিয়ে কপালটা কেটে আর জামাটা—!" অশ্রুভরা চোখে দাদার দিকে চেয়ে থাকে, হাতে তার সেই বার ঘণ্টার পরিশ্রমের ধন একসের চালের পুটুলি!" চোখ মুছতে থাকে। নীরবে উঠে যায় দীপক—!!···

কথা না বোলে ঘরের মধ্যে ঢোকে! টিনের ফুটো দিয়ে নোংরা ঘরখানাতে এসে পড়েছে দিনের আলো, মাটির একটা গামলায় তুলি ধোয়া বিবর্ণ খানিকটা জল। নোংরা পচা ঘরখানার মধ্যে সেই Landscapeএর সুন্দর ছবিটা একেবারে খাপছাড়া। দীপকের জীবন সুন্দরের পরিচয় পেলোনা কোনদিন, আজীবন কাটবে তার দুঃখ দারিদ্রের তীব্র কষাঘাতে, সে আঁকে সুন্দরী নারী—নাহয় কোন অজানা লোকের সৌন্দর্যের বাসস্থান, জীবনে যা কোনদিন স্বপ্নেও দেখেনি! তাই এদের শিল্প সৃষ্টি হয়ত এমনিই ব্যর্থ হয়।

তবুও দীপক তুলি চালিয়ে যায়, আশা তার অসম্ভব, বন্ধ দরজায় অণিমার করাঘাত শোনা যায় "বেলা যে গড়িয়ে গেল খাবেন না?"

রাত্রির অন্ধকারে শোনা যায়, অণিমার বাবার কণ্ঠস্বর, বৃদ্ধ বকে চলেছে—কাশির আবেগে বার হয়না অর্দ্ধেক কথা—"মর মর তোরা, বিশ্বজোড়া খিদের আগুন কি করে নেবাব, মরে জুড়ো তোরা, আমিও!"

কার কান্নার চাপা আওয়াজ তার কানে আসে বোধ হয় অণিমার! কে জানে দীপকের মনটা যেন কোনদিকে চলে গেছে!

ফিরতে রাত হয়ে গেছে অনেক! সারা বাড়ীটা নিঝুম। অস্পষ্ট অন্ধকারে তাদেরই গলির মধ্যে থেকে কে যেন একজনকে বার হয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ায়, ভালকরে চিনতে পারেনা, তবু যেন পরিচিত বোধহয়; চোরের মত দ্রুতপদে চলে যায় তারা! চিন্তিত মনে বাড়ী ঢোকে দীপক। অণিমাদের বাড়ী থেকে কার যেন চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসে।

মায়ের কথা বার বার ঠেলতে পারেনা দীপক।

"ওরে শোন, কাল ওদের বাড়ীতে কি সব কান্নাকাটি হচ্ছিল, বুড়োত বাঁচবে না, ঘরে আইবুড়ো মেয়ে পেটপুরে ছেলেগুলোকে খেতে দিতে পারেনা।"

নীরবে শুনে যায় দীপক, সবই জানে;

মা বলে চলেছেন "ওকে তুই ঘরে আন, ওর বাবাকে বলেছি কাল, বেচারী হাতে স্বর্গ পেলে, ভগবানের দয়ায় যাহোক দুপয়সা পাচ্ছিস সে তোর দশগুণ হবে—লক্ষী মেয়ে ও—"

দীপকের মনটা কেমন চিন্তান্বিত হয়ে ওঠে!

মোমবাতির আলোটা কঙ্কালসার জীর্ণ ঘরখানার আবহাওয়া বদলে দিয়েছে, দীপক অবাক হয়ে যায়! দাঁতে দাঁত চেপে শুনে যায় সে কাহিনী, সঙ্কুচিত পেশীগুলো বিস্ফারিত হয়ে যায়! অণিমা যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে—"না না! আমাকে মুক্তি দাও! তোমার যোগ্য নই, তোমার জীবন বিষময় করে তুলবোনা—"

দীপক স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিশ্বাসই করতে পারেনা এ কাহিনী! ছোট ছোট ভাই বোন, বাবা অনাহারে মরবে চোখের উপর—সে দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি তাই হয়ত এতবড় পাপ সে করতে প্রস্তুত হয়েছিল, সারা নারী জীবনের দুরপণেয় কলঙ্ক কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের অন্তরালে মানুষের দেহ-বুভুক্ষার তৃপ্তি করেছিলো!!

কথা শেষ করতে পারেনা কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠে তার দেহ।

"তোমায় আমি অপমান করতে পারব না! আমি তোমার অযোগ্য।"

দীপক যেন স্বপ্ন দেখে!

মা বলে চলেন "কি হয়েছে তোর বল দেখি, অণিমাকেও আর দেখিনা! লজ্জা পেয়েছে বিয়ের নামে।"

দীপক বলে ওঠে "বিয়ে আর হবে না, ওদের মত নাই।"

—"সেকিরে! তবে যে বল্লে",—মা অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন ছেলের দিকে, বার হয়ে যায় দীপক!

কদিন থেকে মায়ের অসুখ বাড়াবাড়ির দিকে, জ্ঞান প্রায়ই থাকে না। প্রদীপ মায়ের বিছানা ছেড়ে ওঠে না, অণিমা বাধ্য হয়ে আসতে থাকে কিন্তু দীপককে দেখলেই সরে যায়!

সকাল বেলায় মা দীপকের দিকে চাইতে থাকে।

"কি বলছ মা—!"

হঠাৎ একটা কোলাহলে চারিদিকের শান্তি ভ্রষ্ট হয়ে যায়—

একখানা মটরের ব্রেক কসার শব্দ, সারা পাড়ার লোক জমায়েত হয়, কে যেন চাপা পড়েছে! প্রদীপও নাই—সে গেছে ওষুধ আনতে। দীপক বার হয়ে আসে তাড়াতাড়ি!

কারটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাশেই নীল প্যাণ্ট পরা প্রদীপের অচেতন দেহটা তাড়াতাড়ি করে তুলে নেয় দীপক, মাথাটা ফেটে গেছে বোধ হয়। ভদ্রলোকও গাড়ী থেকে হাত বার করে নেহাৎ অবজ্ঞা ভরেই খানকয়েক নোট বার করে দেন,

"ভয়ানক অন্যমনস্ক! যাহোক—"

দীপকের রাগে সারা শরীর জ্বলে ওঠে!...নোট কখানা তার দিকেই ছুড়ে দিয়ে প্রদীপের অচেতন দেহটা নিয়ে চলে যায়।

মা মৃতপ্রায় দেহটা টেনে কোন রকমে এসে প্রদীপের

অচেতন দেহের উপর পড়ে আর্তনাদ করে ওঠেন, মায়ের আর জ্ঞান ফেরেনা, মরবার আগে ছেলের রক্তে তার হাত দু'টো রঞ্জিত হয়ে ওঠে! প্রদীপকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দীপক মায়ের সৎকার করবার যোগাড় করে! অণিমা নির্বাক নয়নে চেয়ে থাকে তার দিকে, দীপক যেন আজ পাষাণ! মা চলে গেল কোন অজানা দেশে, ছোট ভাই তার অবস্থাও শোচনীয়, এত বিপদেও হাসে দীপক! পাগল হয়ে যাবে বোধ হয়!!

—হ্যাঁ পাগলই! শ্মশান থেকে ফিরে একেবারে বদলে গেছে সে। উস্কোখুস্কো চেহারা, চোখ দুটো জলজল করে অস্বাভাবিক দ্যুতিতে। উন্মত্ত ভাবে এক এক করে সাজান ভাল ছবিগুলো ছিঁড়ে চলেছে, সুন্দরী নারীমূর্তি, হাসিমাখা শিশুর চাহনি—কোন স্বপ্নপুরীর ছায়াময় দেশ! এককালে যা ছিল সবচেয়ে প্রিয়, কত বিনিদ্র রজনীর সাধনার ধন! অণিমা ধাক্কা দিতে থাকে "দোর খুলুন—দোর খুলুন!"

...হঠাৎ দরজার সামনে ডাঃ রায় আর সুলালবাবুকে দেখে তার ধ্বংস পর্বে বাধা পড়ে! দুজনে এগিয়ে আসে ঘরের মধ্যে! দীপককে দেখলে আর চেনা যায় না! ডাঃ রায় প্রশ্ন করেন, "আমার ছবি?"

হঠাৎ দরজার কাছে কিসের একটা শব্দ শুনে সচকিত হয়ে ওঠে, অণিমা পাথরের রেকাবে করে চাট্টি ফলমূল নিয়ে ঢুকছিল এদিকে দেখেই কেমন যেন হয়ে যায়, পাথরটা পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল! ডাঃ রায়ও অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন তার দিকে!

দীপকের প্রশ্নে চমকে ওঠে অণিমা "চেন ওঁকে?"

হ্যাঁ' চেনে! সারাজীবন চিনবে কখনও ভুলতে পারবে না, ভুলবেনা সেই রাতের কথা, বিনিদ্র রজনী, বাবার হাঁফানির টান, ছোট ভাই বোনগুলো সারারাত কাঁদছে, ঘরে একমুঠো চাল অবধি নেই, বাবা কি যেন বলে চলেছে, "মরতে পারিসনা তোরা!"

ছোট কোলের ভাইটার দিকে চাইতে পারেনা, সিরোল পুঁটির মত জীর্ণ বুকটা কেঁপে ওঠে কান্নার বেগে, সইতে পারেনা অণিমা! কোন এক অস্পষ্ট দানবের মুখ যার কাছে বলি দিয়েছিল নিজেকে!!

নীরবে ঘাড় নাড়ে!

পরক্ষণেই ডাঃ রায় বলে উঠেন, "কই আমার ছবি!"

দীপক আবার পাগল হয়ে ওঠে! বলে চলে, "ছবি আমি আঁকব না! একবারকার খেয়াল মেটাবার জন্য ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছি!" সুন্দর ছবি গুলোকে টেনে টেনে বিদীর্ণ করে দেয়, সুলালবাবু বাধা দেন কিন্তু দীপক মানেনা, "যান যান আপনারা!" সুলালবাবু সরে যান, কেজানে যদি মেরেই বসে!

রাস্তায় একটা পরিবর্তন এসে গেছে, সারি সারি চলেছে নরকঙ্কাল—কোন রকমে চলেছে, গ্রাম গ্রামান্তরের বন্ধ্যা পল্লী পথে এরা আজ মৃতদেহের মজলিসে শকুনির আমন্ত্রণ জানিয়েছে, রাজপথে ডাষ্টবিনের ধারে ক্ষিন্ন কুকুরের সঙ্গে আজ চলে মানুষের বাঁটোয়ারা!

দীপকের চোখ এড়ায় না! বাইরের পৃথিবীর রূপ আজ শিল্পীর কল্পনাকে ছাপিয়ে গেছে, আজ তাই চাই শিল্পীর নোতুন অন্তর্দৃষ্টি! নিজের জীবনে তার অনুভূতি! ভাবতে পারেনা দীপক—শিরায় শিরায় তার চঞ্চল অগ্নিপ্রবাহ বয়ে যায়! ক্ষিপ্র হস্তে তুলির আঁচড় কেটে যায়! আবার তুলি ধরেছে সে নোতুন করে।

কোন এক বড় দেশের মাটি, সারা মৃত্তিকা রোদে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, তাম্রাভ ধরণীর বুকদিয়ে চলে এক কঙ্কালসার নারীমূর্তি, কোলে একটা শিশু হয়ত মরেই গেছে, শীর্ণ চোখের কোল গড়িয়ে বার হয় অশ্রু! চলেছে সে সামনের পানে!

বহুদিন পর দীপককে দোকানে আসতে দেখে সম্বর্ধনা জানান সুলালবাবু! কিন্তু হাতের ছবিটা দেখে তার ভাষা হারিয়ে যায়! অবাক হয়ে চেয়ে থাকে দীপকের দিকে! ঢোক গিলতে থাকে "রেখেদিন—কিন্তু এসব ছবি চলবে কি করে?"

দীপক কথা কয়না, ছবিখানা রেখে বার হয়ে আসে!

রাস্তা দিয়ে চলেছে—একটা জায়গায় কোলাহল দেখে থমকে দাঁড়ায়, সারি সারি কঙ্কালসার স্ত্রী-পুরুষ-শিশুদের জনতা। কারা দুধ দিচ্ছে তারই জন্য! একদৃষ্টে চেয়ে থাকে দীপক, গাছকোমর করে কাপড় পরা একটি মেয়ে

কপালে ঘামে ভেজা চূর্ণ কুন্তল, এক এক করে দুধ বিলি করে চলেছে! কতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছিল জানেনা সহসা আবিষ্কার করে বসে এবার দুধ নেবার পালা তার। অজ্ঞাতসারে কখন এসে লাইনে দাঁড়িয়েছিল, অপ্রস্তুত হয়ে সরে দাঁড়ায়! মেয়েটিও চায় তার দিকে! দীপকের সারা মন যেন কিসের আবিষ্কারে ভরে ওঠে!

বৈকালে বার হচ্ছে সুনীতি বাড়ী থেকে মায়ের ডাকে ফিরে চায় "সমিতির কাজে তুমিইত যেতে বলেছ মা। ডাঃ রায়ের বাড়ী নিশ্চয়ই যাবনা!"

মা বলে ওঠেন, "সুশীলের নাম শুনলেই তুই অত টিটকারী করিস কেন বল দেখি!"

মলিন ভাবে হাসে সুনীতি "তোমার সুশীল যে বড় দুঃশীল মা! সেদিনের কথা তুমি ভুলেছ, আমি ভুলিনি!"

সুনীতির চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিগত দিনের কাহিনী, বাবা তখন বেচে! কত আশা তার—সুশীল আর সুনীতির বিয়ে তারা দেবেনই! সুশীল পড়ছিল তখন ডাক্তারী, সুনীতির মনে সবে পৃথিবীর রং লেগেছে হঠাৎ একদিন সংবাদ এল সুশীল ডাক্তারী পাশ করার পর কে একজন প্রফেসর তাকে নিজের খরচায় বিলাত পাঠিয়েছেন নিজের জামাই করবেন ফিরে এলে!

বাবা ছুটে আসেন কলকাতায়, কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে যান। তার মাস তিনেক পরই মারা যান, সেই সুশীল আজকাল ডাক্তার হয়ে ফিরে এসেছে! সুনীতি তাকে ভোলেনি!

ভুলটা বোঝে ডাঃ রায় বারবার। মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে বিলাসের কোলে লালিত ধনী কন্যার স্বামী হবার দুর্ভাগ্যই হয়েছে, মতের মিল কোথাও হয়নি। গাড়ীখানা চলেছে লেকের ধার দিয়ে, ডাঃ রায় মাঝ পথেই নেমে পড়েন, শরীরটা তার ভাল নাই, রাণী শাসিয়ে দেয় স্বামীকে!

"সব কিছুরই সীমা থাকা দরকার, সমাজে বাস করতে গেলে নিমন্ত্রণেও যেতে হয়।"

ডাঃ রায় এড়িয়ে যান "শরীরটা খারাপ, একটু এইখানেই বসি, তুমি না হয় ঘুরেই এস!" গাড়ীখানা বার হয়ে যায়,

হঠাৎ সুনীতিকে ওদিকে যেতে দেখে এগিয়ে যান ডাঃ রায়! সুনীতি এড়াবার চেষ্টা করে, "এমনি একটু কাজে যাচ্ছি!"

"চল না হয় এগিয়েই দিয়ে আসি তোমায়!"

ডাঃ রায়ের সঙ্গে অগত্যা সুনীতি নীরবে পথ চলতে থাকে! হঠাৎ একটা গাড়ীর হেড লাইটের আলোয় থমকে দাঁড়ায় দুজনে! গাড়ীখানা থেমে যেতেই বার হয়ে আসে রাণী, ফিরতি পথে দেখা, কোন কথা না বলে ডাঃ রায় গিয়ে গাড়ীতে ওঠেন, গাড়ীখানা আবার চলতে থাকে, নীরবে এগিয়ে যায় সুনীতি!

ঝগড়াটা ভালো করেই সুরু হয় বাড়ী ফিরে, রাণী প্রশ্ন করে, "কে ও!"

—"তোমার জানবার দরকার নাই!"

ডাঃ রায়ের জবাবে চটে ওঠে রাণী।

সেবাশ্রমের বৈঠক শেষ হয়ে যায়, জীর্ণ মলিন ঘরখানায় চটাছাড়ার ছাপ, জীর্ণ চাটাই বিছান, সুনীতি বলে ওঠে, "প্রদীপ মনে আছেত!"

এককোণে প্রদীপ দাঁড়িয়েছিল, ঘাড় নাড়ে সে!

সুনীতি একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ছবিখানার দিকে, সদ্য শেষ করা ঠিক যেন তারই মূর্তি! সামনে চারিদিকে অগণিত জনতা ছেলে মেয়ে কঙ্কালসার মূর্তি! প্রদীপ আনন্দোজ্জল মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ওপাশে গাদা করা ছিন্নভিন্ন সুন্দর ছবিগুলো দেখে অবাক হয়ে যায় সুনীতি। "ওগুলো ছড়ান কেন প্রদীপ?"

—"আপনিই বা অন্য কারুর সংসারে লক্ষী বৌ না হয়ে পথে বার হয়েছেন কেন?"

অন্ধকার কণ্ঠস্বরে চমকে ফিরে চায় সুনীতি! দীপক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে "চুরি করে ঘর দেখতে এসে ধরা পড়ে গেছেন ত!"

পরিচয়টা ঘনিয়ে ওঠে ক্রমশঃ।

রাণী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সন্থ কিনে আনা ছবি-খানা দেখে, ডাঃ রায়ের ঘরে ছবিখানা বেশ সম্মানের সঙ্গেই রাখা হয়েছে, গলায় আবার একগাছি মালা, খুব চেনা মুখ! সহসা মনে পড়ে যায় সেই রাত্রের ঘটনা। ডাঃ রায়ের সঙ্গের সেই মেয়েটি! রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে রাণী—"এ ছবি এখানে রাখতে পাবে না!"

ডাঃ রায়ও প্রতিবাদ করেন,

রাণীও ছাড়বার পাত্রী নয় গর্জে ওঠে, "এ আমার বাড়ী!"

"তাহলে আমারও দাবী আছে! ছবি এই খানেই থাকবে!"

প্রদীপ চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দাদার কাছে ধরা পড়তেই আমতা আমতা করতে থাকে—"সসপেণ্ড করেছে কিনা!"

'—কেন?"

"—Strike করেছিলাম বলে Third master মারা গেছেন ছেলেমেয়েদের স্কুল ফাণ্ড থেকে টাকা সাহায্য করেনি বলে!"

অবাক হয়ে যায় দীপক—"strike করেছিলি বলে suspend করেছে, যেতে হবেনা আর ও স্কুলে।"

একটা কথা বার বার মনে আসে তার। ভ্রূণ হত্যা যদি আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ হয়, শিশু মনের নব-জাতক ইচ্ছার টুটি টিপে হত্যা করা নরহত্যার সমান অপরাধ।

কদিন থেকেই শরীরটা ভাল নাই দীপকের সেই চোখের গোলমাল। সুনীতি প্রায় অনুরোধ করে তাদের মিটিংএ যাবার জন্য, নাহয় বেড়াতে যাবার জন্য, কিন্তু দীপক ভয়ানক ব্যস্ত। কেবল ছবি আর ছবি। সারা বাংলাদেশের জনগণ অবাক বিস্ময়ে তার সৃজনী প্রতিভার দিকে চেয়ে থাকে নোতুন যুগের নোতুন আলোয় যার চোখ ভরে গেছে।

মাথার যন্ত্রনা থামাতে পারেনা! ডাক্তারের কাছে যেতে হয় তাকে!—পরীক্ষান্তে ডাক্তার সাহেব সাবধান করে দেন "যত্ন নেন চোখের!" ওষুধপত্র নিয়ে বার হয়ে আসে দীপক।

রাত্রি হয়ে গেছে সুনীতি উনুনের আঁচে বসে তরকারী কুটে চলেছে, পাশের বাড়ীর সুরপতি বাবুর বৌর কণ্ঠস্বর কানে আসে, খোকনকে ঘুম পাড়াচ্ছে। তারও হয়ত অমনি প্রশান্ত গৃহকোণে আসত কোন দেবশিশুচঞ্চল, ভাবতেও পারেনা। আজ সে কোন আলেয়ার পিছনে ঘুরে মরে। হঠাৎ দরজার কড়াটা নড়ে ওঠে! প্রবেশ করে প্রদীপ।—

সুনীতি গরম ভাত গুলো জুড়োতে দিতে দিতে বলে, "নাখেয়ে যাবেনা কিন্তু!"

চুপিচুপি ঢুকছিল প্রদীপ, পড়বিত পড় দাদার নজরেই! বগলের কাগজগুলো নামিয়ে দেখতে থাকে দীপক, ভয়ে চুপটি করে দাঁড়ায় প্রদীপ। যা বকুনিই না দেবে! পুরোণো খবরের কাগেজের ওপর কালি দিয়ে লেখা 'Feed the Poor' আরও নানা ধরণের Poster. দীপকের মনটা ভরে ওঠে তৃপ্তিতে, সারা রাত্রে চুপিসারে চোরের মত মানুষের সবচেয়ে উপকারী কাজ চালায় তাদের উদ্দেশে। নীরবে ভাইএর কাঁধে চাপড়িয়ে অভিনন্দন জানায় তাকে! প্রদীপের চোখ দুটো জলে ওঠে।

অণিমা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে! কি একটা লজ্জা সারা দেহে তার বাসা বেঁধেছে, দীপকের সামনে সে বার হয়না, অথচ দীপক কোন অদৃশ্য হাতের সেবা প্রতিদিনই পায়! তুলি গুলো ঠিক গুছোন—ময়লা বিছানাটায় কোনদিন পিঠ দিতে পারত না ছারপোকার জন্য, সব কিছু বদলে গেছে!

কদিন থেকেই চোখ দুটোর অসহ্য যন্ত্রণা বেড়ে চলেছে, অণিমার কণ্ঠস্বরে অবাক হয়ে যায় দীপক, "নিন বসুন," তুলোটা জলে দিয়ে সেঁক দিবার জন্য তৈরী হয় সে!

বার বার সুনীতি বাধা দেয় ছবি সে আঁকতে পাবেনা! অসহ্য যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে যেতে হয় ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার সাহেব হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়েন—"সময় থাকতে যত্ন করেন নি, Now it is to late."

একদৃষ্টে চেয়ে থাকে দীপক। থর থর করে চোখের পাতা বেয়ে জল বার হয়ে আসে, নীরবে কাঁধে হাত বোলান ডাক্তার সাহেব!

সুনীতিকে অভয় দেয় সে "ভাল হয়ে যাবে ও কিছু না!"

সুনীতি তবু চেয়ে থাকে তার দিকে, আজ দীপক একেবারে বদলে গেছে—

দিনের আলো বাতাস—বাইরের জগৎ সব কিছু মনে হয় দীপকের আপন, একদিন হেলায় ফেলায় তার গেছে, প্রতিটি মানুষ আজকের দিনে তার আপন, আবার ভাল বাসতে ইচ্ছা করে, সোনার আলো উদার আকাশ সব কিছুর রাজ্য থেকে সে হবে নির্বাসিত!

দীপক বলে চলে, তোমাদের মিটিংএ নিয়ে যাবে আমায়!"

সুনীতি সাগ্রহে রাজী হয় "নিশ্চয়ই!"

আজ সুনীতির সভানেত্রীর বেশ, খদ্দরের শাড়ী, গলায় একগাছা মালা, কোন এক তেজদৃপ্ত মহিমময়ী নারীমূর্তি, সমবেত জনতা শুনে যায় তার কথা, দীপক অস্পষ্ট চোখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে! এবেশে আর কাউকে এতদিনের মধ্যে সে দেখেনি, আজ নারীজাতির আর এক রূপের সন্ধান সে পায়!!

মিটিং শেষ হতেই ডাঃ রায় ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন সুনীতির দিকে, নীরবে প্রতি নমস্কার করে সুনীতি বার হয়ে যায় দীপককে নিয়ে, ডাঃ রায় অপ্রস্তত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে!

গঙ্গার ধারে সূর্যাস্ত! ঘন বনসীমার উপরে নামে সন্ধ্যার বন্দনা, মৌনী পৃথিবী বিহগের কলকণ্ঠে সামগীতি গায়, দুচোখ দিয়ে বিদায়মান আলোর দিকে চেয়ে থাকে! আজকের দেখা হয়ত হয়ে যাবে পৃথিবীর সঙ্গে শেষ পরিচয়!! বাদামী পালের নৌকাটা বয়ে চলেছে—দূর হতে কার কণ্ঠস্বর যেন ভেসে আসে বাতাসে –

"মোর ভুবনত' আজ হ'ল কাঙ্গাল
কিছুত নাই বাকী!
ওগো নিঠুর দেখতে পেলে তাকি!"

দীপকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে আসে! হঠাৎ উঠে পড়ে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে!

বার বার বলেও তাকে নিরস্ত করা যায় না,...সুনীতিকে সেই বেশেই বসতে হয়, সেই সভানেত্রীর বেশে ক্ষিপ্র হাতের তুলি মসৃন ভাবে ইজেলটার উপর চলে,…কোন এক মহিমময়ী নারীমূর্তি...চোখ দুটো জ্বালা করে, বার বার চোখে জলের ঝাওটা দিয়ে কাজ করে যায়,‥ বাধা দেয় সুনীতি "দীপক বাবু!"

দীপক বাধা মানে না, মন্থর গতিতে চলে তার তুলির আঁচড়, রাত্রি অনেক হয়ে গেছে, ইজেলটার দিকে বার বার চেয়েও তার আশা মেটেনা,…আজ সে তৃপ্ত!…ছবি যেন তার প্রাণ পেয়েছে, মুখে বিজয়িনীর হাসি, চোখে কোন অজানা দেশের আলো,…দীপকের মাথাটা যন্ত্রনায় খসে যাবার উপক্রম, চোখ দুটো দুহাতে চেপে ধরে অন্ধকারে, চোখের সামনে সাদা কালো ফুটকি ঘূর্ণিপাকে যেন ঘুরে চলেছে!...অসহ্য যন্ত্রণা—!!

সকাল হয়ে আসে! বাইরের পৃথিবী আবার জেগে ওঠে!...বিছানার উপর বসে চাইবার চেষ্টা করে,…অন্ধকার ঘোচেনা!...সামনে তার জমাট নিবিড় অন্ধকার,…আর্তনাদ করে ওঠে সে!!…তবে কি! তবেকি! সে অন্ধ!!… দু'হাত দিয়ে হাতড়াতে থাকে অসীম শূন্যে!…

সুনীতি ও আসছিল, থমকে দাঁড়িয়ে যায় দরজার কাছে!! রুদ্ধশ্বাসে সে এগিয়ে আসে "দীপকবাবু" তার চোখে জল নেমে আসে।

অন্ধ! আলোর রাজ্য থেকে সে নির্বাসিত, "তুমি

ইউনাইটেড ফিল্মসের "ভাইজান
চিত্রে সুন্দরী **মীনা**

"পথ বেঁধে দিল বন্ধন হীন গ্রন্থি
আমরা দুজনা চলতি হাওয়ার পন্থি"

পথ বেঁধে দিল চিত্রে জনপ্রিয় নট
ছবি বিশ্বাস

কাঁদ সুনীতি, কিন্তু মনের সামনে যে সুনীতি সে কখনও কাঁদবে না'…বুকের আনন্দ দিয়ে ফুটিয়েছি ওর মুখে হাসি, নিজের চোখের আলো নিঃশেষ করে দিয়েছি ওর চোখে আলো,—"

সুনীতির কথায় ডাঃ ঘোষ এগিয়ে আসেন, তিনিই চিকিৎসা করবেন,—সুনীতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পায়না,…এতদিন প্রতীক্ষার পর আজ ডাঃ ঘোষ যেন সুনীতিকে হাতে পান, তাই হয়ত কেসটা নিতে রাজী হন!

অণিমার সারা দেহে যেন কিসের ইসারা, মুকুলিত যৌবনের কোন অনাগত অতিথির সংকেত!…কবে কোন দুরপনেয় কলঙ্কের রাত্রি তার জীবনের মাঝে এতবড় অভিশাপ বয়ে নিয়ে এসেছে! তবুও আসতে হয় দীপকের ঘরে, আজ তাকে দেখতেই হবে। ঘরটা পরিষ্কার করছিল হঠাৎ কাদের পায়ের শব্দ পেয়ে সচকিত হয়ে বাইরে যায়, প্রবেশ করছিল ডাঃ রায় আর সুনীতি। সুনীতি চেয়ে থাকে তার দিকে।

ইদানীং সুনীতির আসা কমে গেছে, সমিতির কাজ তাছাড়া ডাঃ রায়ের ওখানেও যেতে হয় মাঝে মাঝে, কিজানি যদি না আসেন. অর্থ ব্যয় করে চিকিৎসা করাবার সামর্থ্য যার নাই, খোসামুদীই করতে হবে!

ভুল বোঝে দীপক,…চাকরটা ওষুধগুলো নামিয়ে দেয় ভাঙ্গা টেবিলটাতে, দীপকের কথায় মুখ তুলে উত্তর দেয়,

"হ্যাঁ দিদিমণি বার হয়ে গেছেন ডাঃ সাহেবের সঙ্গে,…"

চুপ করে থাকে দীপক!

দীপকের কথাতে অবাক হয়ে যায় সুনীতি—'কি বলছ তুমি!'

"হ্যাঁ চোখ নেই বলে কি কানও নেই, এখন যে দিনরাত ডাঃ রায়ের ওখানে! সমিতি—তোমার গেল কোথায়?"

অভিমান ভরাকণ্ঠে বলে সুনীতি,—"হ্যাঁ যাইত ডাঃ রায়ের ওখানে, যাব আর তাতে কারুর কিছু বলা সাজেনা!"

—অণিমা রুদ্ধদ্বার কক্ষে চেয়ে থাকে তার নগ্ন দেহের পানে,—নিটোল দেহের প্রতিটি ভাঁজে মাতৃত্বের ইশারা, কবে কোন ভুলে যাওয়া রাতের দুঃসহ স্মৃতি আজও সে ভুলতে পারেনা!

সকাল বেলায় কিসের একটা কলরবে সচকিত হয়ে উঠে দীপক, সবাই চলেছে ওদিক পানে,—হাতড়ে হাতড়ে সেও চলে,—কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ায়—অণিমা আর নাই, সে নাকি আত্মহত্যা করেছে,—বস্তির ওদিকটা নির্জন চালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলছে তার প্রাণহীন দেহ!—একা নয় সঙ্গে সেই অনাগত অতিথি—দীপকের অন্ধ চোখের পাষাণ কোলে গড়িয়ে বার হয় অশ্রু!

ডাঃ রায় ঘরে ঢুকতেই সারা মন তার বিষিয়ে ওঠে!

—"ওর মৃত্যুর জন্য কে দায়ী!"

দীপকের কথায় হেসে ফেলে ডাঃ রায় "কার! থাক! থাক ও কথা! মানে একটা দরকারে এসেছিলাম যদি ঐ ছবি খানা দিতেন, তাছাড়া আপনার চিকিৎসারও খরচ দরকার—!"

দীপক আজ মরীয়া হ'য়ে বলে ওঠে, "চিকিৎসা করবার দরকার নাই, আপনাদের পৃথিবীর দিকে যেন চোখ চাইতে না হয়! ওছবি আমার চোখ দিয়েই একেছি, ওর দাম হয় না!—একজনের সর্বনাশ করেছেন আবার কেন! যান যান আপনি এখান থেকে!"

আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিল ডাঃ রায় তাকে থামিয়ে দেন, 'অপমান,'—

রাগে বার হয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দরজার পাশে সুনীতির শেষ ছবিখানা দেখেই থমকে দাঁড়ান,—পাশের খানিকটা কালি নিয়ে ছবিটার মুখটা ভরিয়ে দেন, মুহূর্তে ছবিখানা নষ্ট হয়ে যায়!—উদ্ধত পাদবিক্ষেপে বার হয়ে যান তিনি।—ছবিটার মুখ গড়িয়ে কালি চুঁইয়ে পড়ে!

জয়ের হাসি হাসতে থাকে দীপক! আজ সে কিছুটা অপমান করতে পেরেছে, ছবিখানার কাছে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকে উন্মাদের মত? "কাউকে কাউকে আমার চাইনা! আমি একাই থাকব চিরদিন অন্ধ হয়ে! ওদের পৃথিবীর বাইরে—ছবি! এর আবার দাম!! কাউকে চাইনা।"

হাসতে থাকে উন্মাদের মত!

সুনীতি দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়,—তারই ছবি কালি দিয়ে বিকৃত করে হেসে বলছে উন্মাদের মত !—অপমান !! এতদিন পর যে এমনি করে তাকে অপমানিত হতে হবে জানত না সে। চোখ দিয়ে জল বার হয়ে আসে—প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় !!

কদিন থেকেই সুনীতি আর বার হয় না, মা অবাক হয়ে যায়,—"তোর হল কি সুনীতি,—সমিতিতে ও যাসনা !"

"—শরীরটা ভাল যাচ্ছেনা মা,—দিনকতক মামার বাড়ী যেতে !"

মা ও বলে ওঠেন, "আমিত আগেই বলেছিলাম বাছা তোরই সময় হচ্ছিল না !"

মা যাবার আয়োজন করেন !

প্রদীপ আজকাল ব্যস্ত কংগ্রেস প্রদশনী নিয়ে, বাংলার বিখ্যাত শিল্পী, লেখক, আরও সকলে আসবেন জাতীয় কৃষ্টির গৌরব যারা ! দীপকের আগ্রহ দেখে অবাক হয়ে যায় প্রদীপ !

আমার শেষ ছবি—আমিই—আবরণ খুলব ওর মঞ্চের উপর।

—ছবিখানাকে যত্ন করে ঢেকে রেখেছে দীপক !!

সারা প্যাণ্ডেলটা ভরে গেছে লোকে ! ডাঃ রায়—রাণীও বাদ যাননি ! দুরদূরান্তরের লোক সমাগমে সারা প্যাণ্ডেল ভরে গেছে !—মঞ্চের উপর বিখ্যাত শিল্পীদের সাধনার সম্পদ !—তুমুল করতালির মধ্যে এগিয়ে যায় দীপক মঞ্চের উপর ! সাগ্রহে জনতা চেয়ে থাকে তার ছবি খানার দিকে ! ঢাকাটা খুলে ফেলতেই সারা প্যাণ্ডেলে হাসির ধুম পড়ে যায়, তীব্র মন্তব্য—!

দীপকের পাদুটো কাঁপতে থাকে, সারা গায়ে দেখা দেয় ঘাম !—সে কিছু না ধরলে হয়ত পড়ে যাবে, সকলে চীৎকার করে—ছবি কোথায় এক পোচড় কালি।

"—দূর করে দাও।"

প্রদীপ ভিতর থেকে গিয়ে দাদাকে কোন রকমে ধরে বাইরে নিয়ে আসে ! দীপকের অন্ধ চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

"ওযে আমার মৃত্যু প্রদীপ !"

সহসা কার কণ্ঠস্বরে ফিরে চায়, সুনীতি এগিয়ে আসে দীপকের দিকে—

"ভুল বুঝেছিলাম তোমাকে—!"

—দীপক মুখ তোলে মাত্র !

আলোকিত মণ্ডপে সভার উদ্বোধন সঙ্গীত সুরু হয়—

"জনগণমন অধিনায়ক জয় হে
জয় ভারত ভাগ্য বিধাতা !"

দীপক সুনীতির হাত ধরে আলোকিত মণ্ডপের দিকে এগিয়ে যায়, পিছনে দেখা গেল কে একজন দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে রয়েছে ! তিনি ডাঃ রায় !!

সুরটা তখনও শোনা যায়,

"তব শুভ আশীষ মাগে
গাহে তব জয় গাঁথা !
জয় হে জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা"

সম্পাদকের দপ্তর

স্নেহা বন্দ্যোপাধ্যায় (সবজিবাগান লেন, কলিকাতা)

(১) আচ্ছা, এবারকার ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশনের বার্ষিক নির্বাচনকে কি আপনি সব ান্তঃকরণে সমর্থন করেন ? একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন। (২) বাংলাদেশে শ্রীমতী কাননকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নাকি বম্বের দিকে পা বাড়াচ্ছেন—এটা কি গুজব না সত্যি ? এই যাওয়া সম্পর্কে আপনার মত কি ? (৩) কিছুদিন আগে কোন পত্রিকায় দেখেছিলাম বিপ্রদাস বইখানির চিত্ররূপ দেওয়া হবে। কে এর পরিচালনার ভার নেবেন ? এই কয়জন শিল্পীকে পুস্তকের প্রধান চরিত্রে সাজিয়ে দিন—ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, মিহির ভট্টাচার্য অথবা জহর গাঙ্গুলী—মলিনা দেবী, সুনন্দা দেবী ও অহীন্দ্র চৌধুরী।

: (১) ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের মতের সংগে মিলতে না পারলেও অর্থাৎ নির্বাচনে জয়ী শিল্পীরা আমার মনঃপুত না হলেও, সংঘের অধিকাংশ সদস্যদের নির্বাচনে জয়ী শিল্পীদের অস্বীকার করি কি করে ? এর চেয়ে বেশী বুঝিয়ে বলতে পারলুম না বলে ক্ষমা করবেন। (২) শ্রীমতী কাননের বাংলা পরিত্যাগ করে যাবার সংবাদটী একদিক দিয়ে সত্য, অপর দিক দিয়ে মিথ্যা। বম্বের জনৈক প্রযোজক - লক্ষ্মীদাস আনন্দ (সম্ভবতঃ) ও কাননদেবীর সংগে যে পত্রালাপ চলছিল—তা থেকেই এই গুজবের সৃষ্টি এই গুজবের ভিতর তাই কতকটা সত্যি আছে বৈকি ! কিন্তু চলতি কথায় লোকে বলে—"ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার" উক্ত প্রযোজক এখন অবধি ছবির কোটাই পাননি অথচ লাফালাফি করে বেড়াচ্ছেন—তাই একদিক দিয়ে এটাকে নিছক গুজব বলেই মেনে নিতে পারেন। (৩) প্রাচীনেরা বলেন হাজার কথা পূর্ণ না হলে নাকি বিয়ে হয় না, তেমনি চিত্র-জগতের বেলায়ও অনুরূপ ঘটে—হাজার কথা না হওয়া অবধি সত্য খুঁজে পাওয়া যায় না। "বিপ্রদাস" সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা খুবই শুনছি। এ'ও শুনেছি ৮০০০৲ টাকায় নাকি এর চিত্র-স্বত্ব কে গ্রহণ করেছেন—ব্যস্ ঐ পর্যন্ত, আর উচ্চবাচ্য নেই। আপনার "অথবা" কথাটী তুলে দিয়ে কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে আপনার শিল্পীদের উপযুক্ততার কথা উল্লেখ করছি। বিপ্রদাস—ছবি বিশ্বাস, দ্বিজদাস—জহর গাঙ্গুলী (বয়সের মাত্রাটা একটু কম হলে আমার মনে হয় জহর দ্বিজদাসের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করতে পারতেন) অথবা মিহিরভট্টাচার্য, মা—চন্দ্রাবতী, বিপ্রদাসের স্ত্রী—সুনন্দা, বন্দনা—মলিনা (তবে সুনন্দার কাছে শ্রীমতী মলিনাকে ছোট বোনের ভূমিকায় মানাবে কিনা সন্দেহ আর তাছাড়া চিত্রে শ্রীমতী মলিনাকে বন্দনার ভূমিকায় একটু যেন বেমানানই মনে হবে। অবশ্য তার অভিনয় সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। অহীন্দ্র চৌধুরীকে যদি কোন চরিত্র বণ্টন করতে হয়, বন্দনার পিতা রায় বাহাদুরের ভূমিকা দিতে হয়।

এস রহমান (গ্রাহক নং ১১৩৩, হালিসহর, চটগ্রাম)

ঈশ্বরলাল, চন্দ্রমোহন, জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, বড়ুয়া মতিলাল, সায়গল, রাধামোহন। এদের পর পর সাজিয়ে দিন।

: ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, রাধামোহন, চন্দ্রমোহন, বড়ুয়া, মতিলাল, সায়গল, ঈশ্বরলাল।

আর রহমান (গ্রাহক নং ১১২২, ধোপাদিঘির পার, সিলেট)

(১) ভারতের বর্তমান শ্রেষ্ঠ কিশোর অভিনেতা কে ? (২) সুনন্দা দেবী কোন ছবিতে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি এখন কোন ছবিতে অভিনয় করছেন।

'দুই পুরুষে' শ্রীমতী সুনন্দা।

: (১) মাষ্টার কেশব রায়, বুদ্ধদেব, মাষ্টার নিমাই, অনন্ত মারাঠে ও সুরেশ, এরা প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। তবে অনন্ত মারাঠেকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারেন। (২) কাশীনাথ চিত্রে। বিরাজ বৌ (নির্মীয়মান), দুইপুরুষ (মুক্তি প্রতীক্ষিত)

এস্ আলী মোহাম্মদ ও কুমারী হাসিরেণ বোস (বাজার রোড বরিশাল)

(১) কণ্ঠসংগীতে অসিতবরণের চেয়ে রবীন মজুমদার অনেক ভাল—কিন্তু আপনি তা স্বীকার করেন না কেন? (২) প্রমথেশ বড়ুয়া ও ভী শান্তারামের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ পরিচালক?

: (১) অসিতবরণের দরাজ গলা যদি আমার কাছে বেশী ভালো লাগে সেটা কি অন্যায়? রবীন মজুমদারের কণ্ঠস্বরেরও তো আমি কোনদিন নিন্দা করিনি—তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমার ভালই লাগে—তবে তার অভিনয় বিশেষ করে "শাপমুক্তি" বা "দম্পতি"র নায়করূপে কী অসহ্য নয়? (২) দুজনের মানই নেমে এসেছে। তবু শান্তারামকে কিছুটা শ্রদ্ধা করতে পারি। প্রমথেশ বড়ুয়ার চেয়ে তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন পাবার যোগ্য।

শ্রীবিবেকারঞ্জন দাস (উলুবেরিয়া, হাওড়া)

চিত্র ভারতীর প্রযোজক শ্রদ্ধেয়া প্রতিভা শাসমলের সংগে কোনখানে সাক্ষাৎ অথবা কোন ঠিকানায় পত্রালাপ করা যেতে পারে?

: চিত্রভারতী, ৬১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট এই ঠিকানায় সাক্ষাৎ এবং পত্রালাপ দুইই করতে পারেন।

আবদুল মতলেব মোল্লা (আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা)

(১) মমতাজ শান্তি কি খাঁটী মুসলমান? মমতাজ শান্তির academic qualification কি? তার স্বামী কে? মমতাজ শান্তিকে বর্তমান যুগে গানে, সৌন্দর্যে ও অভিনয়ে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসাবে অভিহিত করা যায় কিনা। (২) বাংলা ফিল্মের প্রাণ শ্রীমতী কাননবালা ও মমতাজ শান্তির ভিতর কে বেশী টাকা পান? (৩) মমতাজ শান্তি ও নাসিমের ভিতর কে বেশী সুন্দরী।

: (১) নিশ্চয়ই। পাকিস্তান বিরোধী খাঁটী মুসলমান। Academic qualification অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কিছু নেই অবশ্য, তবে অভিনয়—সঙ্গীত এবং নৃত্যে তিনি পারদর্শিনী। মিঃ ওয়ালী। না। (২) বাংলা ছবির ব্যবসা ক্ষেত্র অপরিসর—বাংলা ছবির শিল্পীদের আয়ের পরিমাণও তাই সীমাবদ্ধ—মমতাজ শান্তির আয়ের পরিমাণ কানন দেবীকে যদি ছাড়িয়েও যায়—এই আয়ের পরিমাণ বুঝে আবার শিল্পীর 'মানের' তারতম্য বিচার করবেন না। মমতাজ শান্তিই বেশী আয় করেন। (৩) নাসিম।

হরিদাস মুখার্জি (রাসবিহারী এ্যাভেনিউ, কলিকাতা)

(ক) আজ কয়েক বছর হইল পাহাড়ী সান্যাল এই দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন আর আসিবার নামও করেন না। আমরা জানিতাম তিনি ৬ মাসের ছুটি লইয়া

Bombay গিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যদি নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন না হন তবে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ যে দিন দিন দুর্যোগে ঘিরিয়া ফেলিবে। (খ) দেবী মুখার্জ্জি কী গান গাইতে জানেন (গ) ডি, জির শৃঙ্খলে আবার কোন্ বিশৃঙ্খল বাধলো ?

: বাংলা চিত্র জগতের জীর্ণ কঙ্কালগুলির অর্থাৎ যে সব শিল্পীদের নিঃশেষিত প্রতিভার বিকাশ দেখতে পাই—বাংলা চিত্র জগতের বাইরেই তারা গ্রথিত থাক—তাদের টানাটানি করে আর লাভ কী ? বাংলা চিত্র জগত যাতে নূতন প্রতিভার জন্ম দিতে পারে সেই কামনাই করুন—নূতন প্রতিভাকে সম্মান দিয়ে তার যাত্রাকে জয়যুক্ত করে তুলুন। (গ) গান গাইতে জানেন কিনা ঠিক বলতে পারি না—তবে চিত্রে তার মুখে যে গান ফুটে উঠতে দেখেন—তা মুরগীর ময়ূর সাজার অনুরূপ অর্থাৎ ধার করা গলা (গ) ডি, জির শৃঙ্খল শৃঙ্খলিত হ'য়েই আছে।

তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (ডিকসন লেন, কলিকাতা)

(১) প্রথমতঃ গত বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠের যুগ্ম সংখ্যায় ২৩৭ পৃষ্ঠায় লতিকা মল্লিকের সম্বন্ধে ছাপা হ'য়েছে—"বাংলার এই শার্লি টেম্পলকে ক্যামেরার মারপ্যাচে এমন ভাবে সুরেশবাবু দেখাবেন যে 'কাশীনাথ' ও নীলাঙ্গুরীয়র লতিকাকে আমরা চিনতে পারবো না।" আশা করি চিত্রখানি দেখবার পর বাংলার শার্লি টেম্পল সম্বন্ধে আপনাদের মত বদলাবে।

শ্রীপার্থিব মুক্তিপ্রাপ্ত হবার আগে যে দুটী ছায়াচিত্রের কাহিনী রূপ-মঞ্চে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং যাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়েছিলেন তাহাদের আসন কোথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বলে শ্রীপার্থিব মনে করেন। আমি 'কতদূর' আর 'দোটানা'র কথাই বলছি। শ্রীপার্থিবের মনে রাখা উচিত ছিল যে তার ওপর এক কঠিন কার্যের ভার ন্যস্ত আছে।এটা ছেলে খেলা নয় যে এলোমেলো খানিকটা লিখলেই হলো। ভ্রান্ত মতবাদে রূপ-মঞ্চের সুনাম খর্ব হবে বলে মনে হয়।

(২) কিছুদিন হলো আমার এক বন্ধুর কাছে শুনলাম যে, যদিও 'উদয়ের পথে' প্রকাশ্যে বিমল রায়ের

নিউটকীজের 'বন্দিতা'য় ছায়া দেবী

পরিচালনাধীনে গৃহীত হয়েছে বলে জ্ঞাত কিন্তু বস্তুতঃ উক্ত চিত্রখানির পরিচালক নাকি ছবির নায়ক রাধামোহন স্বয়ং, তাই আপনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম আর দেখুন, বইটীতে কি Camera Crane ব্যবহার করা হ'য়েছিল ?

: (১) আপনার চিঠির একাংশে (এখানে উধৃত করা হয়নি) আপনি লিখেছেন—আপনি রূপমঞ্চের নিয়মিত পাঠক অথচ আশ্চর্য হচ্ছি রূপ-মঞ্চের আদর্শ সম্পর্কে এখনও অবগত নন। দেশীয় ছবির উন্নতিই রূপ-মঞ্চের কাম্য। তাই এর সেবায় যারা আত্মনিয়োগ করেছেন, নিছক ব্যবসায়ী হলেও একদিক দিয়ে যেমনি তাদের উৎসাহিত করা রূপমঞ্চের কাজ তেমনি নির্ভীক সমালোচনায় দোষ ত্রুটি বাতলে দিয়ে ভবিষ্যতে নিখুঁত ছবি তুলতে সতর্ক করিয়ে দেওয়াও। রূপ-মঞ্চের এই মতবাদ রূপ-মঞ্চের জন্ম থেকেই আমরা প্রচার করে আসছি। ছবি যখন তৈরী হয় তার প্রয়োজনীয় প্রচার কার্য করতে রূপ-মঞ্চ একটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি এবং এই প্রচার কার্য বিনা পারিশ্রমিকেই করা হ'য়ে থাকে। ছবি যখন মুক্তিলাভ করে রূপ-মঞ্চ তখন সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করে। তখন তার কোন দয়ামায়া নেই—শত শত পাঠকের দৃষ্টি

দিয়ে সে ছবিখানিকে বিচার করতে বসে। রূপ-মঞ্চের পাতা উলটে গেলে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। দোটানা বা কতদূর সম্পর্কে শ্রীপার্থিব যা প্রচার করেছেন—ছবি সম্পর্কে তার মত তাতেই ব্যক্ত হয়নি। 'কতদূর' এর সমালোচনা ও তার প্রচার দুটার পার্থক্য দেখেই তা বুঝতে পারবেন। কারণ দুইটি শ্রীপার্থিবের কলম থেকেই এসেছে। দোটানার সমালোচনাও তিনিই লিখলেন—তাই সমালোচনা করতে বসে ছবির মান সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন থাকেন। শিশুকে মানুষ করে তুলতে যেমন লালন এবং তাড়ন দুইই দরকার, আমাদের এই শিশু শিল্পটীকে তেমনি বাঁচিয়ে তুলতে—প্রচার এবং সমালোচনা দুইরই প্রয়োজন। রূপ মঞ্চের অন্যান্য পাঠক পাঠিকাদের একজন হয়ে আশা করি একথা আপনি স্বীকার করবেন।

জানিনা আমার এই উত্তরে রূপ-মঞ্চের আদর্শ সম্পর্কে আপনার সন্দেহ খণ্ডন করতে পারলুম কিনা—তবে যখনই কোন সন্দেহ জাগবে রূপ-মঞ্চের প্রতি—এমনি খোলাখুলি ভাবেই জিজ্ঞাসা করবেন। সবসময়ই মনে রাখবেন—আজ অবধি কোন প্রলোভনই রূপ-মঞ্চকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি—শ্রীপার্থিবের মত নির্ভীক কর্মী—আপনাদের মত অগণিত সহৃদয় পাঠকের স্নেহ সিঞ্চনে রূপ-মঞ্চের চলার পথ দিন দিনই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতরই হয়ে উঠবে।

(২) আপনার বন্ধুর মস্তিষ্কের উর্বরতাকে তারিফ করি। প্রতিভাবান অভিনেতা বা শিল্পীর সংস্পর্শে এলে পরিচালক তার পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন—বিশেষ করে তার পরিচালিত চিত্রের শিল্পীদের সংগে আলাপ আলোচনা করে পরামর্শ গ্রহণ করাই উপযুক্ত পরিচালকের কর্তব্য। সেই হিসাবে বিমলবাবু রাধামোহন বাবুর পরামর্শ নিতে পারেন তাই বলে তিনি পরিচালক হবেন কেন? চিত্রখানি সাফল্য অর্জন করেছে বলে হয়ত আপনার বন্ধু এ জয়মাল্য রাধামোহন বাবুর গলায় দিতে চান—এটা তার নিজের কল্পিত ধারনা—ছবিখানি যদি সাফল্য অর্জনে অসমর্থ হতো তার মনে এই কল্পনার স্থান হতো না। উদয়ের পথের পরিচালক শ্রীযুক্ত বিমল রায়। পরে জানাবো।—

বেতার জগৎ

পরিচালিকা - মনিদীপা

১৯১২ খৃষ্টাব্দের একটী রবিবারের বিকেল বেলা। পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য বৃহত্তম টাইটানিক আতলান্তিক সাগরের নীল জল সবেগে আলোড়িত করে চলেছে আমেরিকার দিকে। দু'পরতা লোহার আবরণে আচ্ছাদিত অভেদ্য এই বিরাটকায় জাহাজ অতি সহজেই পথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে পারবে এই ছিল সকলের দৃঢ় বিশ্বাস। গন্তব্যস্থানে পৌঁছুবার আর বেশী দেরীও নেই! কিন্তু এই বিকেল বেলা এলো এক দুর্যোগ, যাত্রীদের দৃঢ় বিশ্বাসের গ্রন্থিও শিথিল হয়ে এলো। সাগরের বুকে এক বরফের পাহাড় ভেসে উঠ্‌লো, টাইটানিক তার অভেদ্য দেহ দিয়ে বরফের পাহাড়কে আঘাত করলো কিন্তু পারল না জয়ী হতে, তার দেহের সম্মুখভাগের আবরণ খুলে গেল, সাগরের জল ভিতরের এঞ্জিন ঘরকে ভাসিয়ে দিয়ে জাহাজখানাকে উপরে নীচে দোলাতে লাগলো, যাত্রীরা এই ভয়াবহ বিপদে মুহ্যমান হয়ে পড়লো। কিন্তু জাহাজের ক্যাপ্টেন Harold Bride ও বেতারের অপারেটর Jack Philips অবিচলিত চিত্তে বেতারের এঞ্জিন ঘরে নিজেদের কাজ করে যেতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সাগরের জলে তাদের কোমর অবধি ডুবে গেল কিন্তু তাঁরা নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য চারিদিকে বেতারে খবর পাঠাতে লাগলেন 'S. O. S.'। তাদের এই আত্মত্যাগের ফল ফল্‌লো। সত্তর মাইল দুরবর্তী একটী জাহাজের কাছে এই আবেদন পৌছলো, জাহাজটী ছুটে এসে অসংখ্য যাত্রীদের উদ্ধার করলো। কিন্তু টাইটানিক জাহাজের Captain এবং Philipsকে নিয়ে সাগরের জলে নিমজ্জিত হলো।

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো বেতারের কথা, যা অসংখ্য লোকের প্রাণরক্ষার সহায়তা করেছে—বেতারের জয়গানে মুখর করে তুললো সারা দুনিয়া তাঁদের প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, সেই থেকে আজ অবধি এই বেতার যন্ত্র উন্নততর হয়ে কত লোকের প্রাণ রক্ষা করেছে এবং করছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেশ-বিদেশের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, প্রচার করছে নানা জাতির সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, আনন্দ দিচ্ছে সংগীত ও অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠান প্রচার করে।

এই যে অপূর্ব বেতার-যন্ত্র, যার সাহায্যে টাইটানিকের অসংখ্য যাত্রীর প্রাণ রক্ষা হয়েছে, তার আবিষ্কারের কথা মনে ভাবলে মন নত হয়ে আসে শ্রদ্ধায় এই যন্ত্রের মূল আবিষ্কারকগণের প্রতি। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে Savoy দেখিয়েছিলেন যে লৌহতারের ভিতর আকর্ষণী শক্তি আছে, তা বায়ু তরঙ্গে ভাসমান শব্দ আকর্ষণ করে আনতে পারে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে Joseph Henry অদূরবর্তী স্থান থেকে এই আকর্ষণী শক্তির বিকাশ দেখিয়েছিলেন, ঐ বছরই টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক Samual Morse আমেরিকায় একটি খালের এপার থেকে ওপারে সংবাদ প্রেরণ করতে সমর্থ হন। আধুনিক বেতার-যন্ত্রের সংগে এর বিশেষ সামঞ্জস্য নেই যদিও, কিন্তু সম্পর্ক আছে, কারণ এর উপর ভিত্তি স্থাপন করেই ধীরে ধীরে বেতারের আধুনিক রূপ গড়ে উঠেছে, কাজেই বেতারের আবিষ্কারের সংগে এঁদের নামও জড়িত থাকবে চিরদিন। এরপর ১৮৬৭—৭৩ খৃষ্টাব্দের ভিতর James Clerk Maxuall সর্বপ্রথম Electro—magnatism আবিষ্কার করার সময় radio—waves এর কথা উল্লেখ করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে Heinrich Hertz এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেন এবং সর্বপ্রথম বেতার transmission দেখান। তিনি বলেন যে, radio-wave ঠিক আলো এবং উত্তাপের স্তরের মত। তাঁর নামানুসারে এই wave, Hertzian—wave নামে পরিচিত। এইভাবে বেতারের মূল সূত্র গুলি উদ্ভাবিত হয়। বর্তমান বেতারের আবিষ্কারক Marconi এই মূল সূত্রের উপর ভিত্তি করে Hertz এর পদ্ধতি অনুসরণ করে বেতারের আধুনিক রূপ দান করেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে সে এক স্মরনীয় দিন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর Newfoundland নগরের একটী পুরানো ঘরে

বসে ২০০০ মাইল দূরবর্তী Poldhu থেকে তিনি সংবাদ আহরন করে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের পরিচয় দেন।

এই মহান্ বৈজ্ঞানিক ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত Bologna নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই Electricityর প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ দেখা যায়। ইংরেজী ও ইটালী ভাষায় শিক্ষালাভ করে তিনি Leghorn Bolognaতে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। সেখানে তিনি Prof. Righia নিকটে electromagnatic-waves সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন এবং স্বীয় প্রতিভার সহায়তায় বেতারের অধিকতর উন্নতিকল্পে ব্রতী হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি Hertzian—wavesএর সহায়তায় মাত্র এক মাইল দূরবর্তী স্থানে সংবাদ প্রেরণ করতে সমর্থ হন, কিন্তু এতে তিনি ক্ষান্ত হলেন না। অসাধারণ মেধা ও ধীশক্তি নিয়ে তিনি আরো দূরবর্তী স্থানে সংবাদ প্রেরণ এবং আহরন করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এই ভাবে তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বহু দূরবর্তী স্থান থেকে সংবাদ আহরণ করতে সাফল্য লাভ করেন। তারপর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি চতুর্দিকে সংবাদ ছড়িয়ে না দিয়ে বায়ুতরঙ্গের মধ্যবর্তী একটি নির্দিষ্ট পথে সংবাদ প্রেরণের চেষ্টা করেন এবং সাফল্যলাভ করেন। এইভাবে সংবাদ প্রেরণকে Beam-transmission বলা হয়। সমুদ্রের Lighthouseগুলি এই Beam-transmissionএর সাহায্যে নিজেদের অস্তিত্ব জানিয়ে সমুদ্রপথগামী জাহাজগুলিকে রক্ষা করে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে Marconi নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সমগ্র জীবন বিজ্ঞান সেবায় উৎসর্গ করে ৬৩ বৎসর বয়সে এই বৈজ্ঞানিক পরলোক গমন করেন।

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক স্বর্গত জগদীশচন্দ্র বসুর নামও বেতার আবিষ্কার প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। মার্কনির পূর্বেই তিনি বায়ুতরঙ্গের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের সম্ভাব্যে আবিষ্কার করেন কিন্তু পরাধীন দেশে জন্মেছিলেন বলে দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হতে পারেননি।

বিজ্ঞান আলোচনার জন্য আমরা এই প্রসংগের অবতারনা করিনি, বেতার বিভাগের পরিচালনা ভার গ্রহণ করার পূর্বে এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের আবিষ্কারক-গণের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের জীবন চরিতের এবং এই আবিষ্কারের খানিকটা আভাস দিয়েছি মাত্র।

বেতার যন্ত্রের উন্নতির সংগে সংগে পৃথিবীর নানাস্থানে বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, এই কেন্দ্রগুলি থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় এবং সংবাদ আহরনী যন্ত্র অর্থাৎ আমাদের পরিচিত 'রেডিও-সেটের' সাহায্যে শ্রোতারা তা উপভোগ করেন। ভারতের নানাস্থানেও সরকারের পরিচালনাধীনে বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আমাদের এই বিভাগের আলোচ্য কেন্দ্র হচ্ছে স্থানীয় "কলিকাতা বেতার কেন্দ্র", এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলির সম্যক্ আলোচনা হবে এই বিভাগে। পরে ভারতীয় বিভিন্ন কেন্দ্রগুলির দিকেও আমরা দৃষ্টি দেবো। শ্রোতা ও বেতার কেন্দ্রে রকর্তৃপক্ষের মাঝে ধীরে ধীরে যে অপ্রীতিকর সম্বন্ধের সৃষ্টি হচ্ছে, আমাদের এই বিভাগের ভিতর দিয়ে তাদের অভিযোগ প্রকাশ করে এবং আলোচনা করে এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া দূর করবার আন্তরিক চেষ্টা করা হবে। বেতারকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে এই কেন্দ্র-গুলিকে Propaganda যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশের জনসাধারণের কাছে যুদ্ধকালীন Propagandaর প্রয়োজনীয়তা আছে স্বীকার করি, কিন্তু

তাদের এই উদ্দেশ্য যে কতদূর সিদ্ধ হচ্ছে তা কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের শ্রোতারা উপলব্ধি করতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত "মজদুর-মণ্ডলী", "শ্রমিক-সঙ্ঘ", "পল্লী-মঙ্গল আসর" প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি এই উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধাচারনই করে, কারণ এই অনুষ্ঠানের সময়টুকু শ্রোতারা হয় রেডিও সেট বন্ধ করেন, নয়তো অন্য কেন্দ্রগুলির সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। কাজেই নিজেদের জাহির করবার উদ্দেশ্য কর্তৃপক্ষদের বিশেষ সাফল্য লাভ করে না, আর তাছাড়া পল্লীবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত "পল্লী-মঙ্গল আসরের" সার্থকতা কোথায়? এই আসরের আলোচনা যে পল্লীবাসীদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় না তা কি কর্তৃপক্ষ জানেন না? "আরো ফসল বাড়াও" "মাছের চাষ" ইত্যাদি আলোচনাগুলি সহরবাসী শ্রোতারাই মাঝে মাঝে শুনে থাকেন কিন্তু তাদের কাছে এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে কতদূর সাধিত হয় তা সহজেই অনুমেয়, যাদের কাছে এই আলোচনা কার্যকরী হওয়া সম্ভব, তাদের কাছে তা পৌঁছাবার উপায় নেই। কাজেই Propagandaর উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই অনুষ্ঠান যাতে সুষ্ঠুভাবে উদ্দেশ্য সাধন করে ঠিক সেভাবে গড়ে তোলা উচিত। Propagandaর বিষয় বস্তুগুলি এমনভাবে পরিবেশন করা আবশ্যক যাতে শ্রোতারা বিরক্তি প্রকাশের পরিবর্তে তা মনোযোগের সংগে গ্রহণ করেন। "সংবাদ" পরিবেশনেও গলদ দেখা যায়, প্রায়ই আমরা টাট্‌কা খবর শুনতে পাইনা, পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সংবাদ রেডিওর মারফত প্রচারিত হওয়া উচিত, কিন্তু এমনও দেখা গেছে সকাল বেলা পত্রিকা খুলে যে সংবাদ আমরা জেনেছি, বিকেলে সে সংবাদ রেডিওতে বলা হচ্ছে, তখন এর গুরুত্ব বা মূল্য থাকেনা মোটেই।

তারপর শিশুদের জন্য অনুষ্ঠিত আসর গুলির দিকে কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক, কারণ শিশু মনে যে বিষয় গুলো একবার দাগ কেটে যায় তা সহজে উঠবার নয়। এই বিভাগে তাই বিন্দুমাত্রও দোষ ত্রুটি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এই বিভাগে শিশুমনের খোরাকের উপযুক্ত নানা ব্যবস্থা রয়েছে যদিও, তবু সময়ের অল্পতার জন্য তা সুষ্ঠু ভাবে পরিবেশিত হয় না। "শিশু মহলের" জন্য নির্ধারিত ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে নানা কার্যতালিকা করা হয়েছে কিন্তু অল্প সময়ে তা এমন ভাবে পরিচালনা করা হয় যাতে বিষয়বস্তুগুলি শিশুদের কাছে পরিস্ফুট হয়না। যেমন এর পরিচালিকা শিশুদের "ভাবমণি" অর্থাৎ মহৎব্যক্তির কতকগুলি উক্তি শিশুদের লিখে রাখ্‌তে উপদেশ দিয়ে এত দ্রুত ভাবে পাঠ করেন তাতে শিশু তো দূরের কথা, তাদের মা, বাবাই লিখ্‌তে পারেন কিনা সন্দেহ। সময়ের অল্পতাই হয়ত এর কারণ, এবং যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়ে সময়ের পরিমাণ বাড়ানো যায় না, তখন এক সংগে সব কিছু গলাধঃকরণ করাতে না যেয়ে সময়ের পরিমাণে কার্যতালিকা কমিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাছাড়া পরিচালিকা মাঝে মাঝে অযথা বাগাড়ম্বর করে থাকেন যার কোন অর্থই হয়না। রবীন্দ্রনাথের "শৈশব" এই পর্যায়ের আলোচনায় তিনি আবেগের আতিশয্যে,—"তিনি পাঁচজন শিশুর মত জন্মিয়েই কেঁদে উঠ্‌লেন" এই উক্তি দ্বারা তার মনোদুঃখই হয়তো ব্যক্ত করেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এই ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ কেন যে সাধারণ মানুষের মত কেঁদে উঠ্‌লেন, তার অসাধারণত্ব বজায় রেখে কেন যে এর ব্যতিক্রম করলেন না—পরিচালিকার এই মানসিক দুঃখ—কথাগুলি বলবার ভংগীতে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু শিশুদের কাছে এই দুঃখ প্রকাশের কি কোন অর্থ হয়? অযথা এই উক্তির প্রয়োজনীয়তা কি?

দুপুরের অধিবেশন "মহিলা মহল" স্থাপনের যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু "বিদ্যার্থী মণ্ডলের" বিদ্যার্থীরা সে সময়ে বিদ্যালয়ে বিদ্যার্জনে ব্যস্ত তখন এই আসর স্থাপনের সার্থকতা কোথায়? "বিদ্যার্থী মণ্ডলের" কার্যতালিকা বিদ্যার্থীদের উপযুক্ত, কিন্তু তারা এসব উপভোগ করবার সুযোগ পায় খুব কমই। ছোটদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আসর গুলির মধ্যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত "গল্পদাদুর আসর" সত্যিই একটী উপভোগ্য অনুষ্ঠান। তাঁর পরিচালনায় এই আসর অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠ্‌বে মনে হয়। তাঁর কণ্ঠস্বরে গল্প বা আলোচনা ছোটদের কাছে

প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং বড়দেরও আনন্দ দেয়। কিন্তু তিনিও মাঝে মাঝে নবদ্বীপ হালদারের "পাঠশালা" জাতীয় হাসির নক্সা দিয়ে আসরের সুনাম নষ্ট করেন। এই হাসির নক্সাটীতে নবদ্বীপ হালদারের ছ্যাব্‌লামী ছাড়া আর কোন কিছুই নেই, একথা তিনিও বেশ উপলব্ধি করতে পারেন, কাজেই তাঁর মত লোকের কাছ থেকে এরকম আমরা আশা করিনি বা করিনা। আনন্দের ভিতর দিয়ে ছোটদের নানাভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং ঔৎসুক্য বাড়াবার উপায় তিনি বেশ ভাল রকমই জানেন। তাই তাঁর কাছ থেকে ছোটরা এবং আমরা আশা করি তিনি তাঁর লেখনীর মত এই বিভাগেও তাঁর সুনাম অক্ষুন্ন রাখ্‌বেন।

সম্প্রতি কলিকাতা বেতার কেন্দ্র "কবিকণ্ঠ"—"আমার গল্পলেখা" ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রযোজিত করে বিশিষ্ঠ সাহিত্যসেবীদের সাথে আমাদের পরিচয় স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছেন। "উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত" সম্বন্ধে আলোচনা করে এই সম্বন্ধে শ্রোতাদের জ্ঞান লাভের সুযোগ দিয়েছেন। বাংলার "লোক সংগীত" প্রচার করে শ্রোতাদের বাংলা গ্রাম্য সম্পদের সংগে পরিচয় স্থাপন করিয়ে আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। কিন্তু "বেতার সংগীত বিদ্যালয়" বন্ধ করার কারণ বুঝতে পারলাম না। "হে মোর ধরণীতল" গানটী মাত্র আংশিক ভাবে শিক্ষা দেওয়ার পর হঠাৎ এভাবে এই আসরটী বন্ধ করে দেওয়ার কারণ কি? কর্তৃপক্ষের এই খামখেয়ালীর জন্য তারা জনসাধারণের অশ্রদ্ধা কুড়িয়ে নিচ্ছেন, তাদের এই ধরণের আচরণে শ্রোতারা ক্ষুব্ধ হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলেও কোন প্রতিকার করা বা উত্তর দেওয়া হয় না। ইদানীং বেতার শিল্পীদের প্রতিও কর্তৃপক্ষ তাদের নির্দেশানুসারে চল্‌তে এক আদেশ জারী করেছেন, এতে তাঁদের যে জোর জবরদস্তি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা সত্যই গর্হিত এবং এর প্রতিবাদে বিশিষ্ট বেতার শিল্পীরা—বেতারের সংগে সাময়িক ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের দৃঢ়তার পরিচয়ই দিয়েছেন। এই বেতার শিল্পীবৃন্দ নিজেদের শিল্পচাতুর্যে শ্রোতাদের শ্রদ্ধা যেমন তাদের প্রতি জাগিয়ে তুলেছেন বেতারকেও তেমনি জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছেন, কাজেই তাদের অনুপস্থিতিতে বেতারের যে ক্ষতি হলো তা কি কর্তৃপক্ষরা একবারও চিন্তা করেন না? তাঁদের অভিযোগের প্রতিকার না করা পর্যন্ত যদি তাঁরা এভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকেন তবে বেতারের ভবিষ্যৎ রূপ কি হবে তা কর্তৃপক্ষরা যেন একবার কল্পনা করেন। "বিশেষ দুঃখের সংগে জানাচ্ছি" জানিয়ে রেকর্ড বাজিয়ে তারা আর কতদিন এই আসর বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারবেন? দিনের পর দিন এই রকম আচরণে কর্তৃপক্ষ শ্রোতা ও শিল্পীদের অসন্তোষ ও বিরক্তি বাড়িয়ে চলেছেন, এতে ক্ষতি হবে কার?

বৈদেশিক সরকারের পরিচালনাধীনে স্থাপিত বেতার কেন্দ্রের এই মনোভাব এবং আচরণ হয়তো অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু শ্রোতা ও শিল্পীদের সংগে তাদের প্রীতির বন্ধন থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বাঞ্ছনীয়। যতদিন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক সরকারের প্রভাব মুক্ত হতে না পারবে, ততদিন তাদের এই মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হবে বলে মনে হয়না এবং ভুক্তভোগী পরাধীন জাতি তা আশাও করতে পারে না। তবু যতদিন আমরা বন্ধনমুক্ত না হই, যতদিন না বেতার প্রতিষ্ঠান বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, ততদিন শ্রোতাদের মাঝে অসন্তোষজনক বন্ধন ভেঙ্গে গিয়ে প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠুক—যা দুই পক্ষেরই বাঞ্ছনীয়।

এই উদ্দেশ্যেই "রূপমঞ্চে" এই বিভাগ খোলা হল। শ্রোতাদের বক্তব্য এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে যাতে জনসাধারণ বেতার কেন্দ্রের গলদ জানতে পারে এবং তার প্রতিকার কল্পে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে যোগ দেন। এই বিষয়ে বেতার কেন্দ্রের বক্তব্যও আমাদের জানালে তা প্রকাশ করা হবে। পরস্পরের বক্তব্য জান্‌তে পারলে আমাদের উদ্দেশ্যও সাধিত হতে বিলম্ব হবে না। বেতার কেন্দ্র ও শ্রোতাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে ব্রতী হয়ে "রূপমঞ্চের" এই বিভাগটী দুপক্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে তার নির্ভীক মতবাদ প্রচার করতে কুণ্ঠিত হবে না। "রূপ-মঞ্চের" এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিভাগটীও অন্য বিভাগের ন্যায় জনসেবায় রত থাকবে এবং তাদের সমাদর লাভে বঞ্চিত থাকবে না আশা করি।

দোটানা—ইউরেকা পিকচার্সের বাংলা ছবি দোটানা শ্রী ও পূরবী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছিল। শ্রীযুক্ত অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতুল ঘোষের যুগ্ম পরিচালনায় চিত্রখানি গৃহীত হ'য়েছে। আলোকচিত্র ও শব্দ গ্রহণের দায়িত্ব ছিল যথাক্রমে শ্রীযুক্ত সুরেশ দাস ও জে, ডি ইরাণীর ওপর। সুর সংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত কালিপদ সেন; বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, রতীন বন্দ্যো, রবি রায়, শৈলেন চৌধুরী, হুয়া, প্রভা, লতিকা, রমা, কানু বন্দ্যো এবং আরো অনেককে দেখতে পাই।

সর্বোপরি 'দোটানা'র সর্বাধ্যক্ষরূপে দেখতে পাই ইউরেকা পিকচার্সের প্রথম চিত্র 'স্বামীর ঘরের' পরিচালক রেডিও-খ্যাত শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে।

দোটানার কাহিনীকারকে অনুপস্থিত দেখতে পাই। চিত্রখানি সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত মনি বর্মার পরিচালনা করবার কথা ছিল—কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে কর্তৃপক্ষের সংগে তাঁর মতদ্বৈত হয় তাই পরিচালনা ক্ষেত্র থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হয়। অবশ্য তাঁর নির্বাচিত গল্পটারই চিত্ররূপ 'দোটানা''। তবে ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুক্ত মনিলাল বন্দ্যোপাধায়ের 'একখানি' উপন্যাসের হুবহু ছাপ রয়েছে 'দোটানায়'। চিত্রখানি দেখতে দেখতে মনিলাল বাবু নাকি তাঁর পাশের বন্ধুকে বলেছিলেন, "আরে এ যে আমারই কাহিনী''। ব্যাপারটা তাই একটু ঘোলাটে মনে হচ্ছে। প্রযোজক শ্রীযুক্ত উমানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমরা জিজ্ঞাসা করি, এসব কী তাঁর অগোচরে হ'য়েছে?

দোটানার পরিচালকদ্বয় ইতিপূর্বে দু' একখানা ছবিতে সহকারী পরিচালকরূপে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। সুরশিল্পী কালিপদ সেনকেও সংগীত পরিচালকরূপে এই সর্বপ্রথম দেখতে পাই। নূতনকে সুযোগ দিয়ে প্রযোজক একদিক দিয়ে মহানুভবতারই পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু কথা হচ্ছে—এই 'কোটা'র বাজারে—চারিদিকের প্রতিযোগীতার মাঝে বাংলা ছবিকে যেভাবে 'নিকটিক' করে চলতে হচ্ছে—যে-নূতনের দক্ষতা সম্পর্কে প্রযোজক সচেতন নন, তাঁদের হাতে বাংলা ছবির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার ছেড়ে দিয়ে কী অনভিজ্ঞের মত কাজ করেননি? বাংলা ছায়াজগতের যে অভাবটা সবচেয়ে বেশী বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের পীড়া দেয়, তা হচ্ছে ঐ চির পরিচিত নায়ক নায়িকার মুখ—নূতন পরিচালক আবির্ভাব হবার পূর্বে নূতন শিল্পী আবিষ্কারের প্রয়োজন। দোটানার পরিচালনার ভার পুরাতনের হাতে দিয়ে যদি নূতন অভিনেতা অভিনেত্রীর সংগে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারতেন তাঁকে ধন্যবাদ জানাতুম। নূতন পরিচালকদের সম্পর্কে তিনি নিজেও আশাবাদী ছিলেন কি না জানি না—নইলে সর্বাধ্যক্ষরূপে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে দেখতে পাই কেন? কিছুদিন পূর্বে দোটানার দৃশ্যপটে যখন আমরা উপস্থিত হই—বীরেন্দ্র বাবু চিত্রের অভিনয়াংশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে জানতে পাই। কিন্তু চিত্রে সর্বাধ্যক্ষরূপে তাঁর নামের বিজ্ঞপ্তি দেখে ব্যাপারটা আরও একটু ঘোলাটেই হয়ে উঠেছে—তাই সর্বাধ্যক্ষরূপে তিনি দোটানার যশ এবং অপযশের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন না কোন মতে।

দোটানার কাহিনী রূপ-মঞ্চ পাঠকদের কাছে অজানা নয়—কাহিনীটী যদি যথাযথ রূপও পেত তবে একশ্রেণীর দর্শকদের কাছে কিছুটা সমাদর পেতই। একশ্রেণীর দর্শক বলতে আমি তাদেরই বুঝি—এক নিশ্বাসে সস্তা ডিটেকটিভ গল্পগুলি শেষ করে যারা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন—ডিটেকটিভ উপন্যাসের গাঁজাখুরী বিষয় বস্তু নিয়ে রকে বসে আড্ডা দিয়ে যারা সাহিত্যালোচনায় বিভোর বলে আত্মতৃপ্তি লাভ

করে থাকেন—পানের ডিবা—আর হাতে একখানা লাইব্রেরীর ছাপ মারা বই নিয়ে যারা সকাল আটটায় লেজারে মাথা গুজতে ছুটতে থাকেন—কিন্তু পরিচালনার গুণে (?) কাহিনীর সেই রহস্য টুকুও আর তার গতির সংগে অনাবৃত রয়নি—তাই দোটানা তাঁদের কাছেও সমাদর পাবে না। চিত্রের প্রথমাংশ কোন রকমে সহ্য করলেও দ্বিতীয়াংশে পরিচালক এবং সর্বাধ্যক্ষ আর থাই রাখতে পারেননি। শেষাংশ দেখে মনে হয় যে কাটা কাটা কতকগুলি দৃশ্য সংযোগ করে দিয়েছেন।

কাহিনীতে প্রথমে লতিকার সংগে জহরের মিলনের নির্দেশ ছিল—কিছুদূর অগ্রসর হবার পর কর্তৃপক্ষ বুঝলেন, জহরের বিপরীত ভূমিকায় লতিকার অভিনয় কোন মতেই মানাতে পারে না · তাই কাহিনীর বর্তমান পরিণতি অন্য রূপ নিয়েছে। কিন্তু চিত্রের প্রথমাংশে জহর এবং লতিকার অনুরাগ বেশ ফুটে উঠেছে—এতে পরিণতিও হয়েছে সম্পূর্ণ বেখাপ্পা। মূল আর শেষ-দুইয়ের সংগে কোন সম্বন্ধ নেই।

ষ্টুডিওতে মডেলের সংগে শিল্পী ডুয়েট জুড়ে দিল—এরূপ শত ছিদ্র বেরিয়ে যাবে যদি দোটানাকে নিয়ে টানাটানি করি। বিচারের দৃশ্যে একস্থানে লতিকার পরিবর্তে আর একটী মেয়েকে হাজির করা হয়েছে—কর্তপক্ষের এই খামখেয়ালী কোন দর্শকই বরদাস্ত করতে পারেন না।

'স্বামীর ঘরের' ব্যার্থতা শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী দোটানার সার্থকতা দিয়ে ঢেকে ফেলবেন বলেই আমাদের আশা ছিল—কিন্তু সেদিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ করেছেন। দোটানার সপক্ষে তাঁর সর্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভদ্রেরই বা কী বলবার আছে? পর পর দু'খানি চিত্রের ব্যর্থতায় ইউরেকা পিকচার্সের যাত্রা পথকে তিনি মসীলিপ্ত করে দিলেন—এ সত্যকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না কোন মতেই। স্বামীর ঘরের চেয়ে দোটানাকে খুব বেশী সম্মানিত আসন দিতে পারি না। শিল্পী সমাবেশের দিক থেকে এক লতিকার নির্বাচন ছাড়া শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলীকে আমাদের বলবার কিছু নেই—কাহিনী এবং পরিচালনার অযোগ্যতাই 'দোটানা'কে ব্যর্থতার মাঝে টেনে নিয়ে গেছে। চিত্রনাট্য যিনি লিখেছেন—চিত্রনাট্য সম্পর্কে তার আদৌ জ্ঞান আছে কিনা সন্দেহ। কথোপকথন অতি সাধারণ। তারপর চিত্রের সংযতি খঁজে পাওয়াও দায় তাই চিত্র সম্পাদকের ওপরেও কিছুটা সন্দেহ আসে বৈ কী? চিত্র গ্রহণে সুরেশ দাশ মশায় স্থানে স্থানে দর্শকদের খুশী করতে চেষ্টা করেছেন।

পরবর্তী চিত্রের কাহিনী এবং পরিচালক নির্বাচনের সময় শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় যেন একটু ভেবে চিন্তে অগ্রসর হন। হাতের কাছে যেটা বা যাকে পেলাম তাই দিয়েই যেন কাজ চালিয়ে নিতে না চান। প্রযোজক হিসাবে দর্শকদের প্রতি, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি তাঁর যে দায়িত্ব আছে সে দায়িত্বের কথা যেন তিনি ভুলে না যান।

কলিয়ঁা—ওরিয়েণ্টাল পিকচার্সের কলিয়ঁা প্যারাডাইস ও দীপক-এ মুক্তিলাভ করেছে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত কেদার শর্মা। চিত্রখানির পরিচালক এবং প্রযোজক হচ্ছেন শ্রীযুত শর্মা। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন লীলা দেশাই, রমলা, রামদুলারী, সুলোচনা চ্যাটার্জি, লীলা মিশ্র, মতিলাল, রাজেন্দ্রসিং, জ্ঞানী প্রভৃতি।

কাহিনীর ভিতর নূতনত্ব কিছু নেই। সহরের কপটতা ও গ্রামের সারল্য, সহর এবং গ্রামের দুইটি মেয়ের ভিতর দিয়ে পরিচালক ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, মূল কাহিনীকে কেন্দ্র করে আবার শাখা-প্রশাখাও গজিয়েছে। একটি গ্রাম্য বালিকার শোচনীয় পরিণতি, সহুরে মেয়ের কপট আকর্ষণে তার দয়িতের জীবনের হাহাকারও ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন পরিচালক। কাহিনীর অবাস্তবতা এবং পরিচালনার দুর্বলতায় তাঁর সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে 'How green was my valley' বা 'কাশী-নাথ' চিত্রের টেকনিক প্রবর্তনে তিনি যে প্রয়াস পেয়ে-ছেন তার প্রশংসা করবো। তাছাড়া পল্লীশিক্ষা বিস্তারের সদুদ্দেশ্যও অবশ্য পরিচালকের ছিল—কিন্তু অন্যান্য আগাছায় সে সদিচ্ছা আর পুষ্ট হ'য়ে উঠতে পারেনি। সস্তা হিন্দি ছবিগুলি যেভাবে বাজার ছেয়ে ফেলছে, কলিয়ঁা মাত্র তাদেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করলো। তাছাড়া ছায়াছবির হিসাবে তার কোন সার্থকতা নেই।

কলিয়ঁা চিত্রখানির এক আর্থিক দৃষ্টিভংগী ছাড়া—তাও পরিচালকের হীন মনোবৃত্তিতে দুষ্ট, আর কোন বিশেষ সার্থকতা আমাদের চোখে পড়েনি। অভিনয়ে—রমলা এবং মতিলাল কিছুটা প্রশংসা পেতে পারেন। চিত্রের দৃশ্য রচনার জন্য প্রশংসা করবো। সঙ্গীতাংশও আমাদের ভাল লেগেছে। শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ চলনসই।

জাতির সাহিত্য, কৃষ্টি ও হাসি-কান্নার সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠবে রূপালী পর্দায়ঃ
চলচ্চিত্রের আদর্শ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকারের অভিমত

"চিত্র শিল্প সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতাই জন্মায়নি" চিত্র জগতের এমন একজন লোক একথা বল্লেন যা শুনে কয়েক মিনিট আমি হতবাক হয়ে রইলাম। তাঁর টেবিলের সামনে বসে—তাঁর নিজের কাছ থেকে শুনে একথা যখন আমিই সত্য বলে মেনে নিতে পারিনি, তখন তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে শুনে আপনাদের বিশ্বাস করতে একটু খটকা লাগবে বৈকী?

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে যিনি শিল্পের মর্যাদা দিয়েছেন, ভারতের বাজারে বাঙ্গালীর অর্থ এবং পরিচালনায় যে প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছে—তার সর্বময় কর্তা, 'Bengal Motion Pictures' Producers' Association' এর সভাপতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র-নাথ সরকারকে সেদিন যখন জিজ্ঞাসা করলাম, চলচ্চিত্র শিল্পে আপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছি—রূপ-মঞ্চের পাঠকবর্গের প্রতিনিধি হয়ে, তিনি অসহায় শিশুর মত আমার দিকে চেয়ে পরিষ্কার বলে গেলেন—"চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে আমার এমন কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই যা আপনাদের বলি।" এই অবিশ্বাস্য কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলে যদি আমি গ্রহণ না করি—আপনারা কী আমাকে খুব বেয়াড়া বলে মনে করবেন? কিছুক্ষণের জন্য হতবাক হ'য়ে রইলাম—"না বিশ্বাস আমি করতে পারি না"—মুখ ফিরিয়ে চাইতেই ছোটাই বাবুর চোখে চোখ পড়লো—মুচকি তিনি হাসছেন—অর্থাৎ আমার মত তিনিও শ্রীযুত সরকারের কথাটাকে অবিশ্বাস বলে উড়িয়ে দিতে চান, তাই একটু বল সঞ্চয় করে আবার জিজ্ঞাসা করলাম : চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হলেন কী করে—?" শ্রীযুক্ত সরকার এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না—তাঁর চোখ মুখ বিজয়ী সেনার দীপ্তিতে সমুজ্জল হ'য়ে উঠলো—স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বলে যেতে লাগলেন।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার

"চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ের দিক অবশ্য রয়েছে—তাকে আমি অস্বীকার করিনা, কিন্তু—" কিছুক্ষণের জন্য থেমে শ্রীযুক্ত সরকার আবার বলতে লাগলেন— "কিন্তু চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ের দিকটাকেই আমি বড় করে দেখিনি। এর আভ্যন্তরীণ শিল্পময়ী প্রতিমার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম—বাংলায় বলতে গেলে ম্যাডান কোম্পানীই তখন আসর জুড়ে, অনাদরের গ্লানিমায় তখন শংকিত পদক্ষেপে এর অভিযান কেবল সুরু হয়েছে নিন্দুকের বাক্যবাণে এর যাত্রাপথ সন্দেহ কণ্টকাকীর্ণ! কিন্তু অবগুণ্ঠন তলে যে শিল্প-প্রতিমা রুদ্ধ কণ্ঠেও যে আশার বাণী প্রচার করতে প্রতিটি মুহূর্তে স্পন্দিত হয়ে উঠতো, তাঁর সেই স্পন্দন আমি শুনতে পেয়েছিলাম—চলচ্চিত্র শিল্পের সেই কল্যাণময়ী রূপে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম—তার সেই আশার বাণী—আমায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। জাতির সাহিত্য, কৃষ্টি—হাসি-কান্নার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠবে রূপালী পর্দায়—চলচ্চিত্রের সেই রূপেই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। জানিনা, আমার সেই কল্পনা কতখানি সাফল্যের রূপ পরিগ্রহণ করেছে সেকথা,

আপনারা জনসাধারণই বলতে পারেন, আপনারাই তার বিচারক।" শ্রীযুক্ত সরকার এক নিঃশ্বাসে এই কথাগুলি বলে চুপ করলেন। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের কল্যাণময়ী রূপের আরাধনায় নিয়োজিত সামান্য একজন সাংবাদিক, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের একজন ভাগ্য নিয়ন্ত্রার কাছ থেকে এই কথাগুলি শুনে আশায় যে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে সেত স্বাভাবিক, তাই গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শ্রীযুক্ত সরকারকে বল্লাম,—বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের এরূপ একজন দরদী প্রযোজক মূলে আছেন বলেই বাঙ্গলী চিত্রামোদীরা নিউথিয়েটার্সকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলেই মনে করেন—বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে নিউথিয়েটার্স ভারতের বাজারে সম্মানের আসনে বসিয়েছে, তাতেই আপনার কল্পনার সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালী চিত্রামোদীরা তাই তাঁদের অভাব-অভিযোগ, আবেদন-নিবেদন সর্বপ্রথমে নিউথিয়েটার্সের কাছেই পেশ করে।

—চলচ্চিত্রের মারফতে সাম্যবাদ প্রচারের আপনি সমর্থন করেন কিনা—সাম্যবাদ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

: "চলচ্চিত্রের মারফতে কোন ধরণের আদর্শ প্রচার করা হবে সেকথা বলবেন আপনারা, আপনাদের চাহিদা মত ছবি তুলতেই আমরা প্রয়াস পাবো। তবে ব্যক্তিগত ভাবে কোন বাদই আমি বুঝিনা—এক জাতীয়তাবাদ ছাড়া। কোটি কোটি ভারতবাসীর কণ্ঠস্বরের সংগে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে চাই, ভারতের মুক্তিই সর্ব প্রথমে আমাদের কাম্য।"

—সোভিয়েট রাশিয়ায় শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে রূপালী পর্দা 'Black Board' এর কাজ করে—আমাদের এখানে কী সম্ভবপর নয়—এবং N. T.র নিছক শিক্ষামূলক চিত্র নির্মানের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

: "কেন সম্ভবপর নয়! Travelling Short Film,

Geographical Short Film এজন্য নির্মান করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক খণ্ড চিত্র যুদ্ধোত্তর কালে নিশ্চয়ই এই অভাব দূর করবে। অবশ্য আমাদের বর্তমানে সেরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।"

—মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র আমাদের দেশের মনীষীদের জীবনী পর্দায় রূপায়িত করতে N. T. অগ্রসর হবে কিনা—একথা জিজ্ঞাসা করলে, শ্রীযুক্ত সরকার বলেন,

: "বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এরূপ দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর নয়—যুদ্ধোত্তর কালে এ বিষয়ে N. T. অগ্রসর হবে। এসব চিত্র গ্রহণে বহু বাধা আছে। কোন প্রকার ত্রুটি থাকা চলবে না। তারপর মানুষের জীবনে 'romance' এর দিকটা চলচ্চিত্রের কাছে বেশী আকর্ষণীয়। আমাদের দেশের জনসাধারণ আমাদের মনীষীদের জীবনের romance-এর দিকটা প্রকাশ্যে চলচ্চিত্রে গ্রহণ করবেন কিনা সেও একটা সমস্যার কথা।"

—কবিগুরুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে চিত্রজগত থেকে অর্থসংগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীযুক্ত সরকার আশ্বাস দিয়ে বলেন, "B.M.P.P.A-র সে পরিকল্পনা আছে এবং অর্থসংগ্রহ করে যথাসময়ে যথাস্থানে দেওয়া হবে।"

—চলচ্চিত্র শিল্পের সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন বিভাগের শিল্পীদের অকাল মৃত্যুতে যদি তাঁদের পরিবারবর্গকে অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়—তাঁদের সাহায্য করবার কোন ব্যবস্থা কী B.M.P.P.A-র গ্রহণ করা উচিত নয়?

: B.M.P.PA-র এই বিষয়েও পরিকল্পনা আছে, তবে এখন পর্যন্ত তা কার্যকরী হয়নি।"

—যে সব আজেবাজে ছবি আজকাল বাজারে চলছে—তা দেখে যদি দর্শকেরা বলেন, 'চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেছে'—এই অভিযোগ কী আপনি অস্বীকার করবেন?

: "বর্তমান কালে গৃহীত ছবিগুলি দেখে যদি কেউ বলেন, দেশীয় শিল্পের গতি রুদ্ধ হয়ে এসেছে—তাহলে মস্ত ভুল করবেন। কারণ বর্তমানে সকলেরই Money-

ওয়াসীয়াৎনামা চিত্রে, অহীন্দ্র, অসিতবরণ ও সুমিত্রাকে দেখা যাচ্ছে।

makingএর দিকে দৃষ্টি—তবু দেশীয় ছবি যে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধোত্তর কালের ছবি দেখে তার মান বিচার করবেন।"

হিন্দি ও বাংলা ছবির তুলনামূলক প্রশ্ন তুললে শ্রীযুক্ত সরকার বলেন, "বাংলা ছবি এখনও তুলনায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে। এমন কী আজকাল বাংলায় নির্মীত হিন্দি ছবিও বাংলার বাইরের ছবিগুলির সংগে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ আসন পাচ্ছে।"

চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ের উপযোগী করে উৎসাহী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাকে শ্রীযুত সরকার প্রশংসা করেন এবং এ বিষয়ে যাঁরা অগ্রণী হবেন, তাঁদের সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

বেলা একটায় আমাদের আলোচনা আরম্ভ হয়, দুটো বেজে যায়—বাইরে আগন্তুকেরা ভিড় করেন, তাই আলোচনায় ছেদ টানতে হয়। উঠে আসবার আগে রূপমঞ্চের কথা মনে পড়ে। ভীত মনে জিজ্ঞাসা করি: আমাদের কাগজ কি আপনি দেখেছেন?

: শুধু দেখা কেন, আমি প্রতি মাসে পড়ি।"

—চলচ্চিত্র শিল্পকে নিখুঁত রূপ দিতে আমরা কী ভাবে সেবা করতে পারি?

: "আপনারা ত আপনাদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করছেন। এত অল্প সময়ের ভিতর নির্ভীক মতবাদ প্রচার করে রূপমঞ্চ যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে—তাই কী তার কৃতকার্যতার সাক্ষ্য দেয় না?"

এতখানি সময় নষ্ট করেছি—মনে মনে লজ্জিত হচ্ছিলুম—বাইরে কত আগন্তুকের অভিশাপই না জড়ো হচ্ছে আমার জন্য · তাই আরও কয়েকটী বিশেষ কথা প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম। বাংলা চিত্রে পুরোণ অভিনেতা অভিনেত্রীরা দর্শকদের অসহ্য হয়ে উঠেছেন—এ বিষয়ে আপনারা কী সচেতন? এবং আমরা সাংবাদিকেরাও বা কী ভাবে এই অভাব মোচনে সাহায্য করতে পারি—'

: দর্শক সাধারণের এই অভিযোগ আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি—এবং N.T. নূতন শিল্পী আবিষ্কারে যে সচেতন তার প্রমাণ—প্রতি বছরেই N.T-র ছবিতে দর্শকেরা নূতন মুখ দেখতে পান। আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে—প্রথম চিত্রের অকৃতকার্যতায় নূতন শিল্পীদের একটু নরম সুরে আঘাত করা—নইলে আপনাদের বাক্যবাণে টলিউডের ধার দিয়েও আর তাঁরা আসবেন না"—এই কথা বলেই শ্রীযুক্ত সরকার হেসে ফেলেন।

যে সব শিল্পী বাংলা ছেড়ে বম্বে ও অন্যান্য প্রদেশে গেছেন, তাঁদের সমর্থন করে শ্রীযুক্ত সরকার বলেন, "যেখানে ৫০০৲ তাঁদের আয় ছিল, সেখানে যদি ৫০০০৲ টাকা পান আমি সমর্থন করবো না কেন? টাকাটা ত বাংলাতেই আসছে। অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা গেছেন, সেদিক দিয়ে তাঁরা কৃতকার্যও হয়েছেন বৈকী? এবং তাঁরা যেয়ে নূতন শিল্পীদের প্রবেশপথও প্রসার করে দিয়েছেন।"

যে সব পরিচালক N.T ছেড়ে অন্যত্র গেছেন তাঁদের সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকারের ব্যক্তিগত মত জিজ্ঞাসা করলে শ্রীযুক্ত নীতীন বসুর পক্ষেই রায় দেন এবং শ্রীযুক্ত বড়ুয়া সম্পর্কে বলেন, 'He has got a very good brain' অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে শ্রীযুক্ত সরকার অস্বীকার করেন।

৭৫ মিনিটের বেশী শ্রীযুক্ত সরকারের সংগে আমার আলোচনা হয়। আমাদের আলোচনার যে বিষয়গুলি প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়েছেন, এখানে কেবল সেইগুলিই প্রকাশ করা হলো। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব শ্রীযুক্ত সরকার আগ্রহের সংগে ধীর ভাবে দেন। আলোচনায় এতটা উৎসাহের পরিচয় দেন যে, মাঝে মাঝে তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের বাঁধও ভেঙ্গে যায়। এই ৭৫ মিনিট আলোচনায় যে সব প্রশ্নের উত্তর পেলাম—সে লাভের চেয়েও ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীযুক্ত সরকারের চরিত্রের যে মাধুর্যের পরিচয় পেয়েছি—তার তুলনা হয় না।

শ্রীপার্থিব।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৫২।

অনুরাধা (কাব্যগ্রন্থ): শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বেঙ্গল পাবলিশার্স কর্তৃক ১৪ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম দুই টাকা।

কয়েকটি প্রেমগাঁথার সমষ্টি "অনুরাধা"। অনুরাধা সপ্তদশ নক্ষত্রের নাম। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করলে জাতক কান্তিমান, তেজস্বী, নৃত্যগীতবাদিত্রাদিতে দক্ষ এবং প্রেমিক হয়। সুতরাং, নামের থেকেই আলোচ্য গ্রন্থখানির জন্মপরিচয় জানা যাবে।

কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বহু বৎসর যাবৎ কাব্য-লক্ষ্মীর সেবা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন ক'রেছেন। তাঁর লেখা "রক্ত রেখা" একদা বাঙ্গলার যুবক-যুবতীদের মনে যথেষ্ট উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। তাঁর "মধুমালতী" "মনো-মুকুর" প্রভৃতি গ্রন্থও ভাবে-রসে অপূর্ব। সাহিত্য সাধনার দীর্ঘকালের ভিতর সাবিত্রীবাবু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঢং-এর কবিতা নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট ক'রেছেন এবং তার পূর্ণ বিকাশ দেখা দেয় "মডার্ণ কবিতা" কাব্যগ্রন্থে।

আগেই বলা হ'য়েছে, অনুরাধা কয়েকটি প্রেম-গাঁথার সঙ্কলন। সব ক'টি কবিতাতেই কবি, নারীর দেহমনের অপূর্ব রহস্যের উদ্দেশ্যে আপন মনের স্তোত্র দিয়ে স্তবগান ক'রেছেন।

কাছে স'রে এস, তোমার আলোকে তোমারে
দেখিব প্রিয়া,
কোন্ রহস্যে রমণী হ'য়েছে বিশ্বের বরণীয়া।

অথবা :

তনু দেহখানি লাবণ্যে ভরা, ঢল ঢল দু'টি আঁখি
উরস উৎসী কামনার দু'টি ফুলে
গুরু উরুভারে অলস গমন, জঘনে মেখলা শোভা
নীবিবন্ধন খুলে খুলে যায় বারে বারে।

কিংবা

ওগো সুন্দরী, সম্বৃতবাসে তুমি সুন্দরী রমা,
রমণীয় তুমি, কমনীয় তুমি, কামিনী তিলোত্তমা।

এমনি প্রচুর ছত্র গ্রন্থখানির সর্বাঙ্গ থেকে উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু নারীর দেহমনের বিস্ময়ে বিমুগ্ধ কবির চিত্তে কিসের যেন অতৃপ্তি, কিসের যেন একটা অভাব র'য়ে গিয়েছে। নারীর প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে নারীকে পরিপূর্ণভাবে না পাওয়ার ক্ষোভও ধ্বনিত হ'য়েছে অনেকগুলি কবিতায়।

ভাল যদি তুমি বাসিতে না পার, কেন চুম্বন দিলে?

অথবা :

সে কি তবে মায়া? ভ্রম সে আমার, তুমি
আসিবে না আর?
বরষা রজনী কাটিবে বৃথায় ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

অবশ্য, বিরহ ছাড়া প্রেম মধুরও নয়, পূর্ণাঙ্গও নয়। এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বইখানা আরও মর্মস্পর্শী হ'য়েছে।

"অনুরাধা" বাঙ্গলার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে যথা-যোগ্য সমাদর লাভ করতে সমর্থ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

—প্রদ্যোত মিত্র

হে বীর পূর্ণ কর (নাটক): মন্মথকুমার চৌধুরী প্রণীত। শ্রীহট্ট বানীচক্র ভবন থেকে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

সারা ভারতের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলাদেশই নাট্যলক্ষ্মীর একনিষ্ঠ পূজারী। এখানকার সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণে নাট্যপ্রেরণা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মনসার ভাসান, কৃষ্ণযাত্রা, প্রভৃতি পল্লীবাসীদের নাট্য প্রেরণার পরিচায়ক। এই শ্রেণীর নাটকে সামাজিক অথবা পৌরাণিক কাহিনীর মারফৎ-এ আমাদের দেশের সত্যকার প্রাণধারার পরিচয় লাভ হয়। সহরেও আজকাল এক শ্রেণীর শিক্ষিত নাট্যামোদীকে নতুনভাবে নাট্যরচনায় উদ্দীপীত হ'তে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ওই একই; তবে রূপের কিছুটা বিভেদ আছে। তাঁরা দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যরচনা ক'রে জনসাধারণের মাঝে নিজেদের ভাবধারা সংক্রামিত করতে

চান। নাট্যকার মন্মথকুমার চৌধুরী তাঁর "হে বীর পূর্ণ কর" নাটকে সেই চেষ্টাতেই ব্রতী হ'য়েছেন।

নাট্যকার সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি শক্তিশালী। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবানুগ এবং চরিত্রচিত্রণও প্রশংসনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাহ'লে আমাদের দেশে কোন নাটকই জনসমাদর লাভে সমর্থ হয় না। অথচ, সমগ্র দেশের দাবী মেটাবার পক্ষে সামান্য কয়েকটি পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সাধ্য নিতান্তই নগণ্য। সহরের ও পল্লীগ্রামের সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয়ে মন্মথকুমারের "হে বীর পূর্ণ কর" নাটক বিশেষ উপযোগী হবে বলেই আমাদের ধারণা। —প্রদ্যোত মিত্র

রাত্রির বিভীষিকা (শিশু উপন্যাস) : শ্রীপ্রদ্যোত-কুমার মিত্র প্রণীত। ইউনিভার্সাল বুক সিণ্ডিকেট কর্তৃক ২নং কলেজ স্কোয়ার থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মারফৎ-এ শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার মিত্র ইতিমধ্যেই বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর রচনা "রাত্রির বিভীষিকা" কয়েক বৎসর আগে ভাই-বোন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময়েই পাঠকদের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশের পল্লীগ্রামে এক বাঙ্গালী যুবকের দুঃসাহসিক অভিযানই এই বইখানির বিষয়-বস্তু। বাজার চলতি আর দশখানা রোমাঞ্চ সিরিজের মত এই বই খানাতে খুন-জখম, রিভলভার ভেল্কি প্রভৃতির সমাবেশ না করেও লেখক অতি সাধারণ গল্পের ভেতর দিয়ে যেভাবে পাঠকদের শেষ পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, তা বিশেষ প্রশংসনীয়। সবার ওপর লেখক কেবল গল্প বলেই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ছেলেদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করারও চেষ্টা করেছেন।

বইখানির ভেতরে কোন ছবি না থাকার জন্যে ছেলেদের আকর্ষণ করবার ক্ষমতা অনেকটা ক'মে গিয়েছে বলেই আমাদের ধারণা; তারপর প্রচ্ছদপটও নিতান্তই অর্থহীন ও বিরক্তিকর। —কালীশ মুখোপাধ্যায়

চিত্র সংবাদ ও নানাকথা

রূপ-মঞ্চ বেতার-বিভাগ—

ভারত সরকারের বেতার বিভাগের কলিকাতা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ বহুদিন থেকেই আমাদের কাছে এসে স্তূপীকৃত হচ্ছিল। কলিকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষদের যথেচ্ছাচারিতায় একদিকে যেমনি শ্রোতাদের ভিতর অসন্তোষের বহ্নি গুমোট পাকিয়ে উঠছিল, অপরদিকে কেন্দ্রের বিভিন্ন শিল্পীরাও কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্ব এবং নানা অন্যায় জবরদস্তির ভিতর হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। বিভিন্ন বিভাগের অনুষ্ঠানলিপির সমালোচনা করে শ্রোতারা যখন প্রতিবাদ জানাতেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাচ্ছিল্যের আঘাতে তাদের সেই প্রতিবাদকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। কর্তৃপক্ষের বধির কর্ণে শ্রোতাদের ন্যায়সঙ্গত আবেদন নিবেদন বারবার আঘাত করলেও জনমতকে শ্রদ্ধা করবার মত উদারতার পরিচয় তাঁরা কোনদিনই দিতে পারেননি। কোন কোন সময় বিশেষ বিশেষ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালকেরা বেতারের শ্রোতাদের ন্যায় সংগত দাবীকে শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করলেও তাঁদের কিছু করবার থাকেনা নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে অনেক সময় তাই বলতে দেখা যায়, "আপনাদের অনুরোধ রাখতে অপারক, আমাদের হাতে কোন ক্ষমতা নেই, ক্ষমা করবেন।"

বর্তমানে বেতারের পনের জন যন্ত্রশিল্পী কর্তৃপক্ষের অন্যায় জবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বেতার কেন্দ্রের সংগে সাময়িক ভাবে যে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন, তাদের প্রতিবাদকে সমর্থন করে বেতার কেন্দ্রের শতাধিক খ্যাতনামা শিল্পী এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এদের দাবী সম্পূর্ণ ন্যায় সংগত। কোন প্রকার বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করে কর্তৃপক্ষ যন্ত্র শিল্পীদের উপরে যে বাধা নিষেধ চাপিয়েছেন তা সম্পূর্ণ গর্হিত।' এই খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—বেতারের জনপ্রিয়তার মূলে যাদের প্রতিভা কর্তৃপক্ষ স্বীকার না করলেও বেতারের শ্রোতারা সশ্রদ্ধ ভাবে মেনে নেন, কর্তৃপক্ষের জোর জবরদস্তির বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করে তারাও সাময়িক ভাবে স্থানীয় কেন্দ্রের সংস্পর্শ বর্জন করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কর্তৃপক্ষ নিজেদের অন্যায় জেদকে বলবতী রাখবার জন্য কোন প্রকার মীমাংসার ভিতর না যেয়ে গোপনে নূতন শিল্পী সংগ্রহের

বন্দিতা চিত্রে ছায়া দেবী ও ছবি বিশ্বাস

দিকে মনোনিবেশ করেছেন। এই নূতন শিল্পীদের প্রথম থেকেই আমরা সতর্ক করিয়ে দিচ্ছি, বেতার কেন্দ্রের পূর্বতন শিল্পীদের দাবী না মেটানো অবধি কর্তৃপক্ষের জবরদস্তিকে বহাল রাখতে বেতার কর্তৃপক্ষের সংঘে তাঁরা যেন চুক্তিবদ্ধ না হন, এবং বেতার কেন্দ্রের অপরাপর শিল্পী যাঁরা এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের সংগে সহযোগীতা করছেন, অন্যায় জবরদস্তির বিরুদ্ধে যারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে তুলতে এই শিল্পীরাও যেন হাতে হাত মেলান। নিজেদের শক্তি সম্পর্কে যদি বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা এবং শ্রোতারা অবহিত হয়ে ওঠেন, কর্তৃপক্ষ বেশীদিন নিজেদের অন্যায় জেদকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারবেন না।

জনসাধারণের অনুরোধে এমাস থেকে "রূপ-মঞ্চে" বেতার বিভাগ খোলা হলো। এই বিভাগটীও "রূপ-মঞ্চের" অন্যান্য বিভাগের ন্যায় জনসাধারণের মতবাদকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবে। এই বিভাগটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন "রূপ-মঞ্চের" সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যতমা সদস্যা মণিদীপা। বেতার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানাতে হলে মণিদীপা, রূপ-মঞ্চ, ৩০নং গ্রে ষ্ট্রীট—এই ঠিকানায় জানাতে হবে। আশা করি "রূপ-মঞ্চের" অগণিত পাঠক পাঠিকা, বেতার কেন্দ্রের শ্রোতা ও শিল্পীদের অনুরাগে রঙ্গ-মঞ্চের এই নূতন বিভাগটী ও রঞ্জিত হয়ে উঠ্‌বে।

বেতার কেন্দ্রের সহিত অসহযোগ

আর্টিষ্টস্ এসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদকের বিবৃতি

আর্টিষ্টস্ এসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুত সন্তোষ সেনগুপ্ত ও শ্রীযুত জগন্ময় মিত্র এই বিবৃতি প্রচার করেছেন :—

আর্টিষ্টস্ এসোসিয়েশন কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সহিত এসোসিয়েশনের সহযোগিতা না করিবার নির্দেশ দিবার জন্য সমগ্র বেতার শ্রোতা কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারেন। বেতার প্রতিষ্ঠানের সহিত অসহযোগিতার জন্য বেতার শ্রোতাদের যে অসুবিধা হইতেছে, তাহার জন্য এসোসিয়েশন আন্তরিক দুঃখিত। এসোসিয়েশন জন-সাধারণের নিকট নিম্নোক্ত কৈফিয়ৎ দিতেছে—

গত ১লা এপ্রিল হইতে বেতার কেন্দ্রের যন্ত্রীদের মাহিনা বৃদ্ধি না করিয়া শিফট্ প্রথা প্রচলন করা হয়। তাহার ফলে তাহাদের গ্রামোফোন, সিনেমা ইত্যাদিতে যোগ দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং কার্যকালও অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এইজন্য যন্ত্রীরা এপ্রিল মাস হইতে নূতন কণ্টাক্ট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। গায়ক-গায়িকাদিগের প্রতিও জুলুম কর্তৃপক্ষের নির্বাচিত গান গাহিবার জন্য শিল্পীদের নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহার পর গান গাহিবার সময় অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হয়; অথচ এজন্য পারিশ্রমিক বাড়ানো হয় না। কর্তৃপক্ষের এই প্রকার অবিচার লক্ষ্য করিয়া শিল্পীরা বিবেচনা করেন যে, আত্মসম্মান বজায় রাখা অথবা সঙ্গীতের প্রতি সুবিচার করা আর চলিতেছে না। তদুপরি কলিকাতা কেন্দ্র হইতে রবীন্দ্রসঙ্গীত যথাসম্ভব বর্জন করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। যাঁহারা শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও অন্য ধরণের গান গাহিতে বলা হইয়াছে। এই সকল অবিচার প্রতিকারকল্পে এসোসিয়েশন গত ২৪শে এপ্রিল হইতে স্থির করিয়াছেন যে, বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের এই নীতি বন্ধ না করা পর্যন্ত এসোসিয়েশনের কোন সভ্য বেতারের সহিত সহযোগিতা করিবেন না।

এসোসিয়েশনের সভ্যদের অসহযোগিতার ফলে রেডিও কর্তৃপক্ষ এখন অতি পুরাতন ষ্টুডিও রেকর্ড ও গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাইতেছে। সময় সময় আবার এইসব রেকর্ড এমন চতুরভাবে বাজান হয় যে, মনে হইতে পারে যে, কোন শিল্পীই হয়ত গাহিতেছেন। এসোসিয়েশন আজ বেতার শ্রোতাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, বেতার কর্তৃপক্ষ বাঙ্গলার শিল্পীদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার শিল্পী ও যন্ত্রীরা শ্রোতাদের আনন্দ দানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

ওয়াসীয়াৎনামা চিত্রে ভারতী ও রাজলক্ষীকে দেখা যাচ্ছে

গভর্ণমেণ্ট হাউসে শিল্পকলা প্রদর্শনী

গত ২৫শে এপ্রিল বেলা ৪টায় গভর্ণমেণ্ট হাউসে শিল্পকলা প্রদর্শনীতে বিশেষ ভাবে সাংবাদিকগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রদর্শনীটি মহামান্যা শ্রীমতী কেসির পরিকল্পনা।

প্রদর্শনীতে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রতীক নিদর্শনগুলিকে একত্র সমাবেশ করিয়া শ্রীমতী কেসি নিজের শিল্পকলা ও সুরুচি জ্ঞানের যেমন প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন নিদর্শন আনাইয়া বাংলার শিল্পকলার একটা ধারাবাহিক ইতিহাসকে যেন দর্শকদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন।

এই প্রদর্শনীতে আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শান্তিনিকেতনের কলাভবন, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, আর্কেলজিক্যাল সার্ভে, বঙ্গীয় ব্রতচারী সমিতি প্রভৃতি বহুস্থান হইতে ১০৬টি বাংলার চিত্র ও মূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে শুধু যে চোখেরই তৃপ্তি হয় তাহা নয়, এখানে আসিয়া

বাংলার শিল্প ও কলার রসধারা যে প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাপি প্রবহমান ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আশায় আনন্দে ও গৌরবে বুক ভরিয়া উঠে। এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দদানের জন্য শ্রীমতী কেসিকে আমরা আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই।

মহামান্যা শ্রীমতী কেসি স্বয়ং, ক্যাপ্টেন আরুইন ও মিঃ আলতাফ হোসেন অভ্যাগতগণকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

মঞ্চ ও চিত্র সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা

প্রথম বক্তৃতায় আধুনিক বাংলা নাটক সম্পর্কে আলোচনা

গত ১৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় ২০৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ মন্দার ফিল্ম ষ্টুডিও কক্ষে প্রোগ্রেসিভ আর্ট প্রেমার্সের উদ্যোগে "মঞ্চ ও ছায়াচিত্র" সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতার উদ্বোধন হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভটাচার্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত "আধুনিক বাংলা নাটকের ধারা" সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

কুমারী মীরা ঘোষ দস্তিদার উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারাবাহিক বক্তৃতার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলেন যে, একটি নাট্য গ্রন্থাগার ও নাট্য-বিদ্যালয় স্থাপন করাই হইল সংঘের লক্ষ্য। তিনি এই কাজে সর্বসাধারণের সহযোগিতা ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি একমাত্র অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়ায় বাংলা নাটকের প্রগতি বাধা পাইতেছে। তারপর কিভাবে সমাজ জীবনের পরিবর্তন হইতেছে এবং আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা নিত্য সত্যের সন্ধান মিলিতেছে তাহা ব্যক্ত করিয়া তিনি বলেন যে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আধুনিক সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন যে অন্নবস্ত্রহীন আমাদের বাস্তব জীবন অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ বলিয়াই আজকাল কাব্য শুনিতে ভাল লাগে না; কিন্তু নাটকে কাব্য বর্জনীয় নয় কারণ নাটকের আর এক নাম দৃশ্য কাব্য।

রবীন্দ্র জন্ম-স্মৃতি উৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় রূপ-মঞ্চ পত্রিকা ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির উদ্যোগে ৭৪।১, আমহার্স্ট স্ট্রীটে 'রবীন্দ্র জন্ম-স্মৃতি' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভা প্রারম্ভে শিল্পী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় অংকিত কবিগুরুর একখানি তৈলচিত্র সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন।

প্রীতিদেবী মুখোপাধ্যায়, কুমারী সতীরায় ও কুমারী তোতার মিলিত কণ্ঠে 'জনগণমন অধিনায়ক হে' সংগীতটী গীত হবার পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যুগান্তর পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু।

শ্রীযুক্ত দেবব্রত ঘোষ, দীনেশ ঘোষ ও হীরেন্দ্র মিত্র কয়েকখানি রবীন্দ্র সংগীত গাইবার পর—উপস্থিত সুধীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মুখীন প্রতিভার কথা উল্লেখ করে সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোত

সভাপতি শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য বলেন যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অসম্পূর্ণতা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। সেই জন্যই মানুষের অবিরাম চেষ্টা নাটকে, কাব্যে, উপন্যাসে, সাহিত্যে একটি সম্পূর্ণতার আদর্শ সৃষ্টি করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা। জীবনের সম্পূর্ণতার আদর্শকে যদি সঙ্কুচিত করা হয় তাহা হইলে জীবন ও রঙ্গ-মঞ্চের পক্ষে উহা ক্ষতিকর হইবে।

সভাপতির অভিভাষণের পর কুমারী মীরা, সঙ্গীত বিশারদ শ্রীযুক্ত পবিত্র দাসগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় গান গাহেন। শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন দেব, শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র বসু এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এই ধারাবাহিক বক্তৃতায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নোক্ত বিষয় সমূহে বক্তৃতা করিতে সম্মত হইয়াছেন:—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (গণনাট্য); শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য (বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব); ডক্টর হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত (ভারত নাট্যশাস্ত্র); শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (নাটকে বস্তুবাদ); শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ (নাটকে নৃত্যকলা); শ্রীযুক্ত দ্বিজেন সান্যাল (মঞ্চ ও সঙ্গীত); শ্রীযুক্ত পবিত্র দাশগুপ্ত (নাটক ও সঙ্গীত); শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু (অভিনয় কলা); শ্রীযুক্তা আভা গুপ্তা (মঞ্চ ও পর্দা লোকে ভদ্র মহিলা)। এতদ্ব্যতীত মঞ্চ ও চিত্র জগতের আরও বহু গুণী ও জ্ঞানী ব্যাক্তিকে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

মন্দার ফিল্মস্

মন্দার ফিল্মস্‌এর নূতন কার্টুন চিত্র কুইন এ্যানাফেলিস রক্সী সিনেমায় বিভিন্ন সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে দেখানো হয়। আগামী সংখ্যায় এ্যানাফেলিস সম্রাজ্ঞীর সমালোচনা প্রকাশ করবার ইচ্ছা আছে।

মাই সিস্টার চিত্রে সুমিত্রা, সাইগল, শুক্তিধারা ও দেবী মুখার্জী। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন হেমচন্দ্র।

মিত্র, মিঃ আমিনুর রহমান ও আরো অনেকে রবীন্দ্র কাব্য হতে আবৃত্তি ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্র স্মৃতি-রক্ষা কল্পে রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারে প্রদান করবার জন্য একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। যে সব পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে অর্থ দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায় সভায় তাদের নাম ব্যক্ত করেন। ঐ অর্থ এবং রূপ-মঞ্চের পাঠক পাঠিকাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ মজুমদারের হস্তে প্রদান করে রূপ-মঞ্চে দাতাদের নাম যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।

সভাপতির অভিভাষণের পর সভা ভংগ হয়। কর্তৃপক্ষ জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করেন।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, অখিল নিয়োগী, লালমোহন বসু, মিঃ আমিনুর রহমান প্রদ্যোত মিত্র, নিকুঞ্জ পত্রী, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস ভট্টাচার্য, দেবব্রত ঘোষ, নীলমণি গোস্বামী, দীনেশ ঘোষ অমূল্য মুখোপাধ্যায়, কালীশ মুখোপাধ্যায়, হীরেন মিত্র, শ্রীযুক্তা অরুণা ভৌমিক, প্রীতিদেবী মুখোপাধ্যায় সতী রায়, ও আরো অনেকে সভায় উপস্থিত থেকে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আমরা রূপ-মঞ্চের পাঠক পাঠিকাদের নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে অর্থ প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়, ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এই ঠিকানায় রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের কথা উল্লেখ করে টাকা পাঠাতে হবে। আমাদের কাছ থেকেই তাঁরা রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের রসিদ পাবেন এবং সাহায্য কারীদের নাম যথারীতি রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হবে।

রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে অর্থ প্রদান করে
আপনি আপনার কর্তব্য
সম্পাদন করুন!

পরলোকে সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৬ই মে রবিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের নর্থ গ্যারেজের ফোরম্যান সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই শোকে মৃতের বিধবা স্ত্রী প্রভা দেবী ও ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

ডি, লুক্স পিকচার্স

ডি, লুক্স পিকচার্সের বাংলা চিত্র 'পথ বেঁধে দিল' উত্তরা পূরবী ও পূর্ণতে মুক্তি লাভ করেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। নায়কনায়িকারূপে এই চিত্রে শ্রীমতী কানন ও ছবি বিশ্বাসকে সর্বপ্রথম আমরা দেখতে পাবো। চিত্রের প্রথম প্রদর্শনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারে প্রদান করা হয়েছে; এই অর্থের পরিমাণ ৪৫,০০০ হাজারের উপর। আমরা কর্তৃপক্ষের এই বদান্যতার প্রশংসা করি। আগামী সংখ্যায় 'পথ বেঁধে দিল'র সমালোচনা প্রকাশিত হবে।

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

নিউ টকীজের বাংলা চিত্র বন্দিতা একযোগে মিনার, ছবিঘর ও বিজলীতে মুক্তিলাভ করেছে। বন্দিতার সংগে স্বর্গত পরিচালক হেমন্ত গুপ্তের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই চিত্রখানি আরম্ভ করে শেষ করবার সুযোগও তাঁর হয়নি। বন্দিতার প্রথম প্রদর্শনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ রবীন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডারে প্রদান করা হবে। এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্সের এই আদর্শ অপরাপর চিত্র ব্যবসায়ীদের আমরা অনুসরণ করতে বলি।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন

অরোরা ফিল্মের প্রযোজনায় নরেশ মিত্রের পরিচালনায় অনুরূপা দেবীর পথের সাথীর কাজ অরোরা ফিল্ম ষ্টুডিওতে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। শ্রীমতী সন্ধ্যারাণীকে অনেক দিন বাদে চিত্রামোদীরা এই চিত্রে দেখতে পাবেন।

রূপশ্রী লিঃ

সাংবাদিক চন্দ্রশেখরের নাম চলচ্চিত্র মহলে সুপরিচিত। নির্ভীক এবং বলিষ্ঠ মতবাদ প্রচার করে চন্দ্রশেখর জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হয়েছেন—চন্দ্রশেখর ছদ্মনাম, তবে তাঁর আসল নাম মনুজেন্দ্র ভঞ্জের সংগেও চিত্রামোদীরা অপরিচিত নন। নিউ থিয়েটার্সের বহু চিত্রে সহকারী পরিচালকরূপে তিনি চিত্র পরিচালনা ব্যাপারেও দক্ষতা অর্জন করেছেন। রূপশ্রী লিঃ-এর আগামী চিত্র 'মৌচাকে ঢিল-'এর পরিচালনার ভার শ্রীযুক্ত ভঞ্জের ওপর দিয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁর দক্ষতা সম্বন্ধে দর্শকদের

মন্-কী-জীৎ

২৫শে মে মুক্তিলাভ করবে বিজ্ঞাপনে ১৮ই মে প্রকাশিত হ'য়েছে।

পরিচয় পাবার সুযোগ ঘটিয়ে দিলেন। আমরা কর্তৃপক্ষের পরিচালক নির্বাচনের তারিফ করি। মৌচাকে ঢিলের কাহিনী লিখেছেন শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বিশী। এই চিত্রে নায়ক নায়িকারূপে নূতন মুখেরও পরিচয় পাওয়া যাবে বলে শুনছি।

আর্ট-ইন্-ইণ্ডাষ্ট্রী একজিবিশন

কমার্শিয়াল আর্টে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বিলেতে প্রেরণের সমিতির যে পরিকল্পনা ছিল বর্তমানে তা কার্যকরী হতে চলেছে। 'আর্ট-ইন্-ইন্ডাসট্রি' প্রদর্শনীর সাধারণ সম্পাদক আমাদের জানিয়েছেন—সমিতির ব্যয়ে ভারতীয় ছাত্রদের বিলেতে পাঠাবার পরিকল্পনানুযায়ী বম্বের স্যার জে, জে, আর্ট স্কুলের মিঃ ভি, এন আদ্রেকর সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীরূপে নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারতীয় শিল্প বিদ্যালয়গুলির ভিতর জে, জে আর্ট স্কুল বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এর বহু ছাত্র আর্ট-ইন-ইনডাসট্রি প্রদর্শনীর বহু পুরস্কার পেয়েছেন মিঃ আদ্রেকর জে, জে, আর্ট স্কুলের ডেপুটী ডিরেক্টর এবং কমার্শিয়াল আর্ট সেকশনের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট।

বিলেতে শিক্ষার ব্যয় স্বরূপ আর্ট-ইন-ইনডাষ্ট্রী এক-জিবিশনের তরফ থেকে বৃত্তিস্বরূপ মিঃ আদ্রেকরকে ৩,৫০০ টাকা দেওয়া হবে এবং বাকী ব্যয় ভার বম্বে সরকার বহন করবেন বলে স্বীকৃত হয়েছেন।

রবীন্দ্র-সমিতি (উদয়পুররাজ)

উদয়পুর রাজ্যের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনসট্রাকশন এক বিজ্ঞপ্তিতে আমাদের জানিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে উদয়পুরের 'ট্যাগোর সোসাইটী' ১লা মে থেকে ৭ই মে রবীন্দ্র জন্ম-সপ্তাহ পালন করেন। এতদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকাগুলির এক বিশেষ প্রদর্শনী হয়। আমরা উদয়পুররাজের এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করি। উক্ত প্রদর্শনীতে 'রূপ-মঞ্চ'ও বিশেষ স্থান

লাভ করে। উদয়পুররাজ, সমিতির সম্পাদক মিঃ এইচ, এস, মোরদিয়া ও মিঃ যোশীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশন

গত ১২ই মে শনিবার ১৮ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে 'বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশনে'র বাৎসরিক সাধারণ সভা হয়। উক্ত সভায় উক্ত এসোসিয়েশনের ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্য কার্য পরিচালন সমিতি নির্বাচিত হয়। শ্রীযুক্ত সুরেশ মজুমদার (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ) এই নূতন কার্য পরিচালন সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (দীপালী) ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত এস, এম বাগড়ে (ম্যানেজার, রক্সী সিনেমা, কাপুরচাঁদ লিঃ) সমিতির অনারারী সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত নলিন ব্যানার্জি (স্পোর্ট এ্যাণ্ড স্ক্রীণ) সহকারী সেক্রেটারী এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর (দীপালী ও রূপশ্রী লিঃ) কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন:—শ্রীযুক্ত সত্যনাথ মজুমদার (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড), নির্মলকুমার ঘোষ (অমৃতবাজার), সুকুমার ব্যানার্জি (সিনেমা টাইমস) কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক (আনন্দবাজার পত্রিকা), জে, সি, হিমকার (জাগৃতি), পঙ্কজ দত্ত (দেশ, প্রচার সচিব কাপুরচাঁদ লিঃ), মিঃ এ, কে, খাঁ (অনুপস্থিত থেকেও নির্বাচিত হয়েছেন)।

সভার পর এক প্রীতি সম্মেলন হয় এবং তাতে ১৯৪৪ সালের জন্য বঙ্গীয় ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশনের গুণানুসারে পুরস্কারসমূহ বিতরণ করা হয়। বার্ষিক সভায় ও পরে যে প্রীতি সম্মেলন হয়, তাতে বিদায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভিতর এঁরা ছিলেন, মিঃ এস, আর হেমাদ, নরেশ চন্দ্র ঘোষ, কানাই লাল ঘোষাল, এস, আর, সরকার, বি, এল, খেমকা, হরিপ্রিয় পাল, ভানু ব্যানার্জি, অমর মল্লিক, সুমিত্রা দেবী, রেখা মল্লিক, রাধামোহন ভট্টাচার্য, অনিল বাগচি, সুধীন মজুমদার, অতুল চ্যাটার্জী, লোকেন বসু, সুবোধ মিত্র, জি, রাও, বিমল রায়, মাধব ঘোষাল, সৌরেন সেন, মিঃ প্যাটেল, অপূর্ব মিত্র, হেমন্ত চ্যাটার্জী, ফণীন্দ্রনাথ পাল, খগেন রায়, সুখেন্দু সেনগুপ্ত, যোগজীবন ব্যানার্জি, ডাঃ অজিত শঙ্কর দে, শিশির বসু, কালীশ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ, সাগরময় ঘোষ, মন্দার মল্লিক ও আরো অনেকে।

রূপ-মঞ্চ

৫ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ : ১৩৫২

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্য-কলার সচিত্র মাসিক।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মুখপত্র।

কার্যালয় :
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : বি, বি, : ৪২৯২

প্রতি বাংলা মাসের ৩০শে রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হয়।
বর্তমানে প্রতি সংখ্যার : মূল্য আট আনা।
সডাক এক বছরের গ্রাহক মূল্য আট টাকা।
এক বছরের কম কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না।
নূতন লেখকদের উপযুক্ত রচনা রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হয়।
অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠাবার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি না।

—পৃষ্টপোষকতায়—
নিতাইচরণ সেন
এন, সি, ঘোষ
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
বিভূতি ভূষণ দত্ত
দীনেশ দত্ত
এস, কে, রায়
এইচ ঘোষ

পরলোকে রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাতনামা চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪॥০ টায় তাঁর বিবেকানন্দ রোডস্থিত বাসভবনে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৪৪ বৎসর। রতীন্দ্রবাবুর অকাল মৃত্যুতে আমরা বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি ও রূপ-মঞ্চের পাঠকবর্গের তরফ থেকে আন্তরিক শোক প্রকাশ করছি। রতীন্দ্রবাবুর শোকসন্তপ্ত বিধবা স্ত্রী ও একমাত্র কন্যার এই শোকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

রতীন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে চিত্র ও নাট্য জগতের যে ক্ষতি হলো তা অপূরণীয়। আগামী আষাঢ় সংখ্যা রূপ-মঞ্চে আমরা দর্শক, নাট্যামোদী—ও শিল্পীরা সমবেত ভাবে মৃত শিল্পীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করবো। আশা করি রতীন্দ্রবাবুর গুণগ্রাহী বন্ধুরা রূপ-মঞ্চের এই প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে আগামী ২৫শে আষাঢ়ের ভিতর রূপ-মঞ্চ সম্পাদকীয় বিভাগে শিল্পীর প্রতি নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলী পাঠিয়ে আমাদের বাধিত করবেন।

রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার-এর

সাহায্য কল্পে রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকা ও পৃষ্ঠ-পোষকবর্গের নিকট হ'তে প্রথম দফায় প্রাপ্ত অর্থের তালিকা—

অমূল্য মুখোপাধ্যায়—(সভাপতি রূপ-মঞ্চ সম্পাদকীয় বিভাগ) ২৫৲

রূপ মঞ্চ পত্রিকা—(গ্রে ষ্ট্রীট) ২০৲

নাট্যকার মন্মথ রায়—(কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) ২০৲

(রূপ-মঞ্চ রবীন্দ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'বন্দিতা' গল্পের পারিশ্রমিক)

প্রীতি দেবী মুখোপাধ্যায়—(আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট) (রূপ-মঞ্চ রবীন্দ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্র কাব্যে নারী' প্রবন্ধটীর পারিশ্রমিক) ১০৲

ডাঃ বিমল বসু—(রূপ-মঞ্চ সম্পাদকীয় বিভাগ) ১০৲

মেসার্স মণ্ডল ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিঃ—(কলেজ ষ্ট্রীট) ১০৲

কালীশ মুখোপাধ্যায়—(সম্পাদক রূপ মঞ্চ) ১০৲

শিল্পী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়—(আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট) ১০৲

ইষ্ট ইণ্ডিয়া আর্ট প্রেস—(গ্যালিফ ষ্ট্রীট কলিঃ) ১০৲

কমলকৃষ্ণ বসু—(নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট) ৫৲

প্রদ্যোত মিত্র—(যুগান্তর পত্রিকা) ৫৲

বীণা অধিকারী—(সালকিয়া হাওড়া) ৫৲

অধ্যাপক জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়—(স্কটিশচার্চ কলেজ) ৫৲

আনওয়ার হোসেন—(পাঁচঘর বর্ধমান) ৫৲

মিটার হাফটোন কোং—(কালীঘাট, কলিকাতা) ২৲

হাজারী লাল বিশ্বাস—(হরতকী বাগান লেন, কলি) ২৲

শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ—(গরুলিয়া, ২৪ পরগণা) ২৲

গোপাল ভৌমিক—(বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ) ২৲

মিসেস আভারাণী মণ্ডল (হরতকী বাগান লেন কলিকাতা) ২৲

সুকুমার কুমার—ক্ষেত্র ব্যানার্জি লেন, হাওড়া—২৲

অনিল ভাদুড়ী—(এম. আই. প্রেস) ১৲

অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (প্রিণ্টার এম. আই. প্রেস) ১৲

লক্ষ্মীরাণী গুহ (মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) ১৲

দেবব্রত মজুমদার—(ব্লাকোয়ার স্কয়ার কলিকাতা) ১৲

জয়গোবিন্দ সামন্ত—(মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা) ১৲

কুমারী নীহার রায়—(শিববিশ্বাস লেন কলিঃ) ১৲

কুমারী অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায়—(আপার সার্কুলার রোড) ১৲

কুমারী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়—(আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা) ১৲

[গত ১৮ই জুন অবধি রূপ-মঞ্চ 'রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে' জন্য মোট ১৭০৲ টাকা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। রূপ-মঞ্চের পাঠকবর্গের সংখ্যা মনে করলে—এই সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। আশা করি—রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকা ও পৃষ্ঠপোষকবর্গ নিজেদের সামর্থানুযায়ী অর্থ প্রেরণ করে রূপ-মঞ্চের এই মহতী কাজকে জয়যুক্ত করে তুলবেন। সমস্ত সংগৃহীত অর্থ মূল রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে প্রদান করা হবে। আমাদের কাছে যাঁরা অর্থ প্রেরণ করবেন—মূল সমিতির রসিদ আমাদের কাছ থেকেই পাবেন—এবং রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত হবার পর এই নামের তালিকা যথারীতি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।] —কালীশ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক রূপ-মঞ্চ পত্রিকা, : ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিঃ।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যা রূপ-মঞ্চে রূপবাণীর উদ্বোধন উৎসবে কবিগুরুর বাণীর প্রতিলিপি আমরা স্ক্রীন করপোরেশনের সৌজন্যে পেয়েছিলাম। ফিল্ম করপোরেশন নয়।

শ্রীমতী ছায়া দেবী

নিউটকিজের "বন্দিতা" চিত্রে

চিত্রখানি মিনার, বিজলী, ও

ছবিঘরে চলছে

বদেশিক চিত্রাভিনেত্রী

লুপে ভেলেজ

চিত্র নাট্য ও চিত্র শিল্প

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

চিত্র নাট্য সম্বন্ধে আমি আগেই রূপমঞ্চের পাঠক পাঠিকাদের আসরে কয়েকটি কথা বলেছিলাম কিন্তু আমার কোন কোন অপরিচিত বন্ধুদের কাছ থেকে আবার তাগিদ আসায় আমায় বলতে হচ্ছে, যা জানি এ বিদঘুটে জিনিষটার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা, যদিও তা অসম্পূর্ণ এবং হয়ত ভ্রান্তঃ। একটা কথা প্রথমেই বলে রাখি না পড়ে পণ্ডিত আমরাও বিষয়ে। দৌড় তাহলে বুঝলেন কতখানি, এ লাইনের বিশেষত্ব এই কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, এ নিয়ে বইও বেশী নাই, যা দু'একখানা আছে আমাদের মুলুকে তার দেখা মেলেনা এবং যাদের কাছে তাও এসে পড়েছে তারা এহেন সম্পত্তি কারুর হাতে তুলে সহসা দিতে চান না, অগত্যা আমরা না পড়েই পণ্ডিত হয়েছি। দোষ আমাদের কিছুই নাই।

যাক ও কথা, আমাদের ঘরোয়া দুঃখের কাহিনী আর নীচতা আপনাদের কাছে বলবনা হাসবেন: কিন্তু নির্জলা সত্যি কথা। কাজের কথায় আসি এইবার।

প্রথমেই জানা দরকার সিনেমা হচ্ছে motion picture. Picture that has a motion. গতি আছে, ঘটনার চারিপাশে রূপ দিয়ে চোখের সামনে ধরে দেওয়া হয়। চিত্র নাট্য হচ্ছে তারই মূল জিনিষ: গল্প সাধারণ ভাবে পড়লে বুঝতে পারেন, নাটকও; কিন্তু চিত্রনাট্য হচ্ছে মাঝের জিনিষটা। গল্প এবং সিনেমার মাঝামাঝি চিজটা। আপনি যদি কোন একটা নামকরা সিনেমার বইএর চিত্রনাট্য পড়ে যান, খানিকটা পড়ার পর ধুত্তোর বলে ফেলেই দেবেন কিন্তু সেটা ছবি হয়ে উঠলে রূপ বদলে যায়। একেবারে নোতুন মাল!

আচ্ছা ধরুন প্রবোধবাবুর প্রিয়বান্ধবী নিশ্চয়ই পড়েছেন, সিনেমায় ওঠার পরও দেখেছেন অবশ্যই! কিন্তু বই যা দেখেছেন ছবিতে তাকি পেয়েছেন হুবহু! নেই। থাকতে পারেনা। চিত্রনাট্য যখনই রচনা করা হবে কতকগুলো জিনিষের উপর নজর দিতে হয় আগে, Romance, Situation, Dialogue, Dramatice Temperament. নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত এবং রস। বই জমানো দরকার, নাহলে ছ'আনার বিনিময়ে মাস মাস ধরে দেশের লোক গাল দেবে! বই এর মধ্যে লেখক সূক্ষ্মমনস্তত্ত্ব নিজের ভাষার প্রবাহে, সুনিপুণ লেখনীর সাহায্যে গুছিয়ে

পথ বেঁধে দিল চিত্রে শ্রীমতী পূর্ণিমা

তুলে ধরবে কিন্তু ছবির পর্দায়ত ভাষা ধরা যায় না! সেখানে চিত্রনাট্যকারের কাজ হচ্ছে কেবলমাত্র ঘটনার সংস্থাপন এত সাবধানে করতে হবে তার মনস্তত্ব বা মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ফুটে বার হবে। প্রথমেই ধরুন দেখা গেল ঝড়-জলের রাত্রি, চলেছে তারই মধ্য দিয়ে কোন এক ছন্নছাড়া, পড়ে যায়। কত বাধা তবুও তাকে যেতে হবে—সামনে তার আলেয়ার আলো, অন্তরে তার অমনি বিপ্লব! সব কিছুর বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ!—শেষে আবার দেখা যায় ঐ দৃশ্য! সেইখানেই হয় তার মৃত্যু! এক ছন্নছাড়া হতভাগার জীবনের শোচনীয় পরিণতি—বইএ এসব নাই। ভাষা—বর্ণনা এই সব দিয়েই বইএর সার্থকতা! কিন্তু চিত্র নাট্যকার এই খানেই তার ছবিকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করে তুললেন। 'নর্মদার প্রতিশোধ খেজুরায় নিলেন!' এ টেকনিকটার নাম বলা যেতে পারে Flash back. এটা সাধারণতঃ কোন Tragic storyর বেলাতে সুষ্ঠরূপে খাটান চলে।

তারপর ধরা যাক নায়ক নায়িকার প্রথম পরিচয়। পুলিশের তাড়া খেয়ে চলেছে তারা দুজনেই, দেখা হয়ে যায় নাটকীয় ভাবেই! এত দুঃখের মধ্যেও তাদের কথাবার্তা দর্শকের হাসির খোরাকই যোগায়! তর তর করে বই এগিয়ে চলে ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে। বই খানার শেষে কি আছে জানেন ত? চিঠি লিখে রেখে চলে গেলেন নায়ক! চিঠি খানা অনায়াসে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বলে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু ছবিতে যদি ঐ হত, দেখে উঠে আসতেন আর বলতেন 'বই না আথার ছাই!—দূর!!'

চিত্রনাট্যকার এইখানেই ক্ষান্ত হননি, কোন অংশে বইএর রস নষ্ট করতে চান না! অর্থ বা উদ্দেশ্য ঠিক রেখে তিনি সেই চিঠির মর্মার্থ জনসাধারণের কাছে আরও সুস্পষ্টতর করে দেন, তাদের মিলন হয়ে গেল অদ্ভুতভাবে! নায়িকা নিয়ে যায় নিজের ঘরে সবকথা শুনেই শ্রীমতীর মহৎ আদর্শের ছোঁয়া জহরের মনে লাগে! ভাবেন নি কি এইবার মিলন হ'লে বেশ হয়! দুজনের জীবন মধুময় হয়! কিন্তু আগেকার সেই মাতাল বন্ধুটার কথা মনকে নাড়া দেয়, তার মনকে। বার হয়ে আসে!! সবকিছু ছেড়ে পথের মুসাফির আবার নামে পথে! পিছনে অশ্রু সজল নয়নে চেয়ে থাকে শ্রীমতী! এ তার কি হ'ল!! আপনার মনটা কি নাড়া দেয়নি—চলেছে সে!! সবকিছু বাধা বিপত্তি ভেদ করে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ! শেষ হয়ে যায় মুসাফিরের জীবন, পথেই—অশ্রু সজল হয়ে উঠে চোখ: আরও চমৎকার করবার ব্যবস্থাও করেছিলেন চিত্রনাট্যকার, কিন্তু আপনাদের দুর্ভাগ্য সেটা আর ছবিতে রূপ পায়নি' সময় হয়ে ওঠেনি! অবশ্য এটা ভিতরের খবর। শুনুন বলছি—সেটা।

বার হয়ে যায় নায়ক পথে। মাঝ সিঁড়িতে এসে শ্রীমতী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বার হয়ে যায় জহর, চোখের জল তাকে বাধতে পারেনা!—চলেছে সে! পথেই তার জীবনের যবনিকাপাত হল!

খবর গেছল শ্রীমতীর কাছে! শ্রীমতীর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে!—দূরে দেখা যায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি ভাবছে সে! হয়ত তার জীবনপথের সেই মহৎ বন্ধুর কথা, তারই চরিত্র, পুন্য মনুষ্যত্বের দাবী যারা রাখে!—

শোনে সেই অবস্থায় সেই বন্ধুর জীবনের কাহিনী! সব শেষ! রুগ্ন শয্যায় চোখ ভেঙ্গে জল নেমে আসে সেই ছন্নছাড়ার উদ্দেশ্যে!

তাহলে বলুন এইবার পাকাহাতের চিত্রনাট্য কখনই বইকে নষ্ট করেই না, বরং বইএ যে না-বলা আধ-বলা কথা, তাকে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তোলে, সুন্দরতর করে তোলে!

—চিত্রনাট্য বই পড়েই করা যায় না! দরকার চিত্র জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ,—তাদের টেকনিকের

সঙ্গে পরিচয়। কতকগুলো বাধা নিয়ম আছে সেগুলো প্রথমে জানা দরকার।—

সাধারণ উপন্যাসে থাকে অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ। নাটকে থাকে অঙ্ক, দৃশ্য। চিত্রনাট্যেও সেই রকম ব্যবস্থা আছে। পরিচ্ছেদ খানিকটা করে এগিয়ে গিয়ে দম নেয় তাকে বলে Sequence আর ছোট ছোট ঘটনাকে বলা যেতে পারে shot. সাধারণতঃ বইএ ৬।৭ কোন কোন চিত্রনাট্যকার ১২।১৩টা Sequence ও রাখেন! প্রথম Sequence এ বইএর মোটামুটি চরিত্রকে পরিচয় করে দেয়! (establish).

ছোট ছোট ঘটনা সুষ্ঠরূপে—একটার পর একটা এমন ভাবে বসাতে হয় যাতে গল্পের গতি ঠিক এগিয়ে চলে অথচ কোথাও ধাড়াক করে jork দিয়ে গল্প এগিয়ে না যায়, দর্শকের মাথায় তাহলে হাতুড়ির ঘা মারা হয়ে যাবে। অবশ্য এ চরিত্রটা প্রায়ই হয়ে যায় মাঝে মাঝে, সাধারণ দর্শকে বোঝেনা!

—একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন পর্দার দিকে ঘটনার পর ঘটনা পার হয়ে যাচ্ছে! পরেই সুরু হয়ে গেল দশ বৎসর পরের কাহিনী! চোখে পরিবর্তনটা বিসদৃশ ঠেকেনা মন এ ধাকাটা বোঝে, কেন জানেন—দুটো পৃথক ঘটনার মধ্যে থেকেও ২০।২৫ ফিট ফাঁকা রয়ে গেছে! চোখে কাল একটা দাগ এক কলমের আঁচড়ের মত ১০ বছর পরের কথাই দিব্যি মনে করিয়ে দেয়! বিসদৃশ ঠেকেনা! এ বিজ্ঞানের প্যাঁচ পয়জার!

—যাক ওকথা!—প্রথম সিকোয়েন্স সুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দিক দেখা সাধারণতঃ হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে প্রথমতঃ হালকা ভাবে তাকে চিত্রিত করা হয় যেমন ধরুন কোন হাস্যকর চরিত্র—তবে খোলা হাসি না হওয়াই উচিত (যদিও এইটাই হয়ে থাকে)। খুব হালকা ভাবে সুরু করে সেই সিকোয়েন্স শেষ হবার দিকে ক্রমশঃ কাহিনীর গতি যাতে এগিয়ে যায় বেশ ঘটনা বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে এমনি ভাবে টেনে নিয়ে গিয়ে কোন একটা ছোট climex এ তুলে sequence শেষ করা উচিত। এখানে কতকটা থিয়েটারের টেকনিকই দরকার। বেশ একটা ছোট জমাটি কিছু করে মঞ্চে দৃশ্য শেষ হয়। সিনেমার মধ্যেও তেমনি। শেষের দিকে গল্পের গতিবেগ ও জটিলতা বেড়ে যায় এসময়তেই সাবধান হয়ে চিত্রনাট্যকার কলম চালান, বইএর সাফল্য এই খানেই!

সব নিয়ম কানুন গুলোর মধ্যে বাধাবাধি বড় একটা নেই, যেখানে যা সুবিধা সেই রকমই কাজ করতে হয়। প্রথমেই বলেছি সব যদি এক রকম নিয়মেই চলে বলবেন একঘেয়ে! তাই যার যা ভাল লাগে তেমনই করে, যদিও এটা ভালর চেয়ে খারাপই দাঁড়ায় বেশী!

সব যে গুলো হাজড় পাঁজড় করে বকে গেলাম এগুলো দিয়ে প্রথম তৈরী সিনেমার গল্প ভাল করে মেপে জুপে সাজান চলে, কিন্তু কোন বাজারের বিখ্যাত উপন্যাসকে চিত্ররূপ দিতে গেলে ঝুক্কি অনেক পোয়াতে হয় চিত্র-নাট্যকারকে!—অনেক মাথা ঘামাতে হয়, কারণ নোতুন যা কিছুই বসাবে বইএর সঙ্গে সমান তাল রেখে বসাতে

কোশিস চিত্রে কল্যাণী

হবে, নাহলে গালাগালত আছেই তার উপর আরও কিছু! কারণ শুধু চিত্রনাট্যের জন্যেই ভাল বই নষ্ট হয়ে যায় যেমন ধরুন বিভূতিবাবুর নীলাঙ্গুরীয়।

আপনারা কি বলবেন জানিনা, আমার মনে হয় বইখানা মার খেয়েছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে চিত্রনাট্যের জন্য! যিনি চিত্রনাট্য করেছেন বইখানার, মনে হয় সাহিত্যের পাড়া ঘেঁসেও কোনদিন তিনি যাননি,—নাহয় বইখানা বুঝতেই পারেন নি!

যে চরিত্র গুলো মূল বইএ যাদু তৈরী করেছে তারা পর্দায় না ফুটেই ঝরে গেল!—সাপ-ব্যাঙ-কোনরূপই পেলনা সত্যিই যদি কোন নিখুঁত চিত্রনাট্যকার হতেন বইখানা মার খেতনা। তাই দরকার চিত্রনাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক বা নাট্যকার হওয়া! ডিরেক্টারী করা এক জিনিষ চিত্রনাট্য আর এক জিনিষ। কিন্তু দেখেছেন ব্যাঙএর ছাতার মত কোম্পানীর বই গুলোতে যিনি ডিরেটার, তিনিই চিত্রনাট্যকার, তিনিই সব—এমনকি কাহিনীকার পর্যন্ত! অবশ্য এর মধ্যে একটা গোপন কথা আছে। সেটা নাজানাই ভাল!

ও জানতে চান! শুনুন! কাউকে বলবেননা কিন্তু, আপনি গল্প লেখেন,—গল্প সিনেমায় উঠবে, স্বপ্ন দেখেছেন কোনদিন! ও স্বপ্ন! আলেয়া! আদা নুন খেয়ে পাতার পর পাতা গল্প লিখলেন—রাতের বেলায়, সারাদিন মাথা খুঁড়ে!—সুরু করলেন হাটাহাটি! টো-টো-টো করে ঘুরছেন! জুতোর সঙ্গে রাস্তার গলা পিচ আটকে যাচ্ছে, কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসে! কোন ডিরেক্টারই হবেন হয়ত, দয়া করে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে রাখলেন! একগাল হেসে

বারকতক নমস্কার ঠুকে বেরিয়ে এলেন,—স্বপ্ন দেখছেন ছবি উঠবে পর্দায়! এই খানটা হিরোইন কেঁদে ভাসিয়ে দিল, নায়ক চলে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে, দেশের ডাকে! আহা হাউস থম থম করছে!!

দুদিন, তিনদিন, কয়েক সপ্তাহ ঘুরলেন ডিরেক্টার সাহেবের সন্ধানে, তিনি বাড়ীতে থেকে বলে পাঠালেন কলকাতার বাইরে গেছেন স্যুটিংএ! কোনদিন বা বসেই রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা! বেশ খানিকটা বসে রইলেন হয়ত চাকর এসে বলল আজ সাহেবের মাথা ধরেছে, পরে আসবেন। বেরিয়ে আসছেন দেখলেন আপনারই মত একজন হয়ত দর্শন প্রার্থী! সেও স্বপ্ন দেখে তার বইটা উঠে গেছে! হয়ত দেখলেন আরও একজন! ডিরেক্টার সাহেব নির্বাক!! মানুষের দেহমন কতদিন পারবেন, শেষকালে থাক্‌গে বলে যাওয়া বন্ধ করলেন। ওদিকে ভুইফোঁড় ডিরেক্টার সাহেব বসে গেছেন আপনাদের তিনজনের দেওয়া গল্প তিনটে জোড়াতাড়া দিয়ে কিছু দাঁড় করে তুলতে! তুললেন! প্রডিউসারের পায়ে তেলত দিচ্ছেন। বইও উঠল—কাহিনী ও পরিচালনা বড় বড় অক্ষরে ছাপা হ'ল! আপনি কোথায় গেলেন!! The Great Director! বিশ্বাস করছেন না! এ গল্প নয়! হলপ করে বলতে পারি, নির্জলা সত্যি! আজ পর্যন্ত চুরি সমানে চলে আসছে! বিখ্যাত ইংরাজী বই ঝেড়ে নাম পিটিয়ে নিল—আমরা গর্দভের মত তাই দেখছি! দিব্যি পয়সা দিয়ে রজত জয়ন্তী সপ্তাহও চালিয়ে দিচ্ছি এর পরও বাংলার দর্শককে কি বলব—বলুন!! ওর নীচে শুদ্ধ ভাষা আর আমার জানা নেই!

এইবার বলুনত! এমনি যেখানকার বেশীর ভাগ পরিচালক, তাঁরা চুরি নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না চিত্রনাট্য লিখবেন! একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। কোন একজন ডিরেক্টর আমাদের দেশের, বড় বড় লেখকের বই যেমন রবিবাবু, শরৎবাবু এদের বই পরিচালনা করতে সাহসী হ'ন অথচ এক কলম লিখতে গেলেই সর্বনাশ! এক লাইন রবিবাবুর রচনা উদ্ধৃত করেছেন তাও নিভুর্ল ভাবে নয়!

আমাদের চিত্রকাহিনী লেখকদের দোষ আমি দোষ।

তাদের জীবনের উদ্দেশ্য একটা কাহিনী উঠল পর্দায়! ছুটো, কয়েকটা! ব্যস ডিরেক্টার হব!—মাত্র একটী লোককে এই পথে দেখলাম যিনি এই নিয়েই রয়েছেন – অনেকবার পরিচালক হবার সুযোগ এসেছে তবুও হননি। আর হননি বলেই সারা বাংলায় শুধু বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার, তিনি নিউথিয়েটার্সের বিনয় দা (বিনয় চট্টোপাধ্যায়)। নিজেই বলেন, ডিরেক্টার আর চিত্রনাট্যকার বা চিত্রকাহিনীকার এক পদার্থ নয়—আলাদা জিনিষ! এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই হয়ত ভাগ্যচক্র থেকে—প্রতিশ্রুতি ওয়াপস, দুই পুরুষ, মাই সিষ্টার পর্যন্ত সমান সুনাম বজায় রেখে এসেছেন। আশা করি রাখবেন, যদি ডিরেক্টারীর ভূত ঘাড়ে না চাপে!

হলিউডএ চিত্র প্রযোজকরা যে কোন বিখ্যাত বই বাজারে বের হয় বা আগে থেকেই আছে তাদের চিত্ররূপ দেবার চেষ্টা করেন, এনিয়ে চিত্র নাট্যকারদেব মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতাও সুরু হয়, কে কোন বইখানা সবচেয়ে ভাল চিত্ররূপ দিতে পারেন!—এবং সে script ভাল দরেই বিক্রী হয়। যেম ধরুন! বিখ্যাত বই কতকগুলো Les Misrable. Crime and Punishment. Ann Carnena. Gone with the wind. Rebecca.a Dr. Jucle and Mr. Hude. Madam Curie. Jan e Eyre. How Green was my valley. For whom the Bell Tolls. ইত্যাদি! কত নাম করব! মাত্র কয়েক খানা নাম দিলাম যেগুলো সারা পৃথিবীর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ বই বলা যেতে পারে, সেগুলোর কত সুন্দর চিত্ররূপ হয়েছে! যেমন How green was my valley. Jane Erye দুটো বই—দুটী ছেলে মেয়ের জীবন নিয়ে রচিত! বিশেষ করে Jane Erye একটা সর্বহারা মেয়ের জীবন কাহিনী।

Sherllety Bronte এর পৃথিবী বিখ্যাত বই,—তার চিত্ররূপ হয় অথচ আমাদের দেশের ছোট একখানা বই যেমন ধরুণ বিভূতি বাবুর পথের পাঁচালী, অপরাজিতের চিত্ররূপ হয় না! বলতে যান, সবজান্তা প্রযোজক ডিরেক্টার বলে উঠলেন—"লোকে নেবেনা মশাই!"

ডিরেক্টার আগেই ঘাড় নাড়বে কারণ বাবা মরবার সময় বলে গেছে তাকে—'বাছা ডিরেক্টারী করে যদি খেতে চাও নামজাদা বইএর ডিরেক্টারী করোনা, চিত্রনাট্যতেই টে'সে যাবে! রুটি মারা পড়বে!' কাজেই ঘাড় নাড়েন! কিন্তু আপনি যদি পড়ে থাকেন ও দুখানা বই আর যদি

অরোরা ফিল্মের ওনো ওনাতা হুঁ চিত্রে উল্লাস ও মেঘমালা

আগেকার নাম করা কোন বই দেখে থাকেন বলুনত ওর কি চিত্ররূপ সাফল্য মণ্ডিত ভাবে হয় না? ও ধাপ্পা বিশ্বাস করবেন কেন? এ বাবা ছেলেদের কথা কওয়া টকীর চেয়ে মুখ বোজা ছিল ভাল যে তারা 'শ্রীকান্ত' রূপ দিয়েছিল, অন্ততঃ চেষ্টা করেছিল। সেই পাঁচ পার্সেণ্ট শিক্ষিত আর তিন পার্সেণ্ট সিনেমা দর্শকের যুগে! আজ প্রায় দশ পার্সেণ্ট শিক্ষিত আর ষাট পার্সেণ্ট সিনেমা দর্শকের যুগে এরা ধাপ্পা দেয়, বেমালুম হতে পারেনা অমন বই! আপনাদের যে নিজের স্বতন্ত্র মতবাদ কোন থাকতে পারে তা বিশ্বাসই করেন না তারা!

এর নিরাকরণের উপায় কি তা আমি বলবনা, জানিও না। কারণ এইটুকু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে যে বলা কওয়া করে কাগজের পাতায় গালাগাল করে ওদের মত লোকদের টলান যায় না, কারণ যাদের টাকা আছে তাদের কাছে বলতে যান হয়ত জবাব দেবে, 'মশাই আমার ছাগল ল্যাজের দিকে কাটি আর মুড়োর দিকে কাটি আপনার কি এসে যায়!' যদি সেই পয়সাওয়ালা প্রযোজকদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় তবেই যদি কিছু হয়!

একটা নোতুন খবর শুনে থাকবেন, আমাদের দেশের অন্যতম বিখ্যাত পরিচালক ভি-শান্তারামের হিন্দীচিত্র 'পড়শী' বিলাতের গভর্ণমেণ্ট চিত্রপ্রতিষ্ঠান সেখানে দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন!—উপায়টা হচ্ছে কথা কইবার সময় ছবির চরিত্র গুলো মুখ নাড়ে, সেই মুখ নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ভাষা বাদ দিয়ে মুখে অর্থাৎ সেই ফিল্মএর গায়ে নোতুন করে ইংরাজী কথা লাগিয়ে দিয়ে তারা চালাচ্ছেন এই টেকনিকটাকে বলে Dubbing আমাদের দেশের অর্থাৎ নিউথিয়েটার্সের কুশলী শিল্পীরা এর মধ্যেই এ বিষয়টাতে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। যেমন ধরুণ হিন্দী ডাক্তার, অনেক সেটে নোতুন করে ছবি তোলবারই দরকার হয়নি, আগেকার বাংলায় নেওয়া ছবির গায়ে বেমালুম হিন্দী কথা বসিয়ে দিয়েছেন, ধরতেই পারেন নি! ওয়াপসে একটা বিশেষ চরিত্র আগাগোড়া এই উপায়েই চলে গেছে! লক্ষ্য করলেও বুঝতে পারবেন না!—চেষ্টা করে দেখতে পারেন!—এইযে বিশেষ শিল্পী—ইনি কে জানেন না হয়ত,—সুযোগ্য পরিচালক ও চিত্র সম্পাদক সুবোধ মিত্রই—এখানে এই প্রথার প্রবর্তক।

বাংলা ভাষা ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা, এবং পৃথিবীর দরবারে এ ভাষার কদর আছে সে কথা বলাই বাহুল্য! সেখানে বই এর অভাব নেই—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারদের বইএর মতই অনেক বই এখানে রয়েছে! যেমন ধরুণ রবীন্দ্রনাথের বই—গোরা, নৌকাডুবি ইত্যাদি। গোরা তুলবার জন্য হলিউডের চিত্র নির্মাতা পরিচালকরা এখানে আসতে চান—অথচ আমাদের দেশে যদি কোন সুযোগ্য লোকের হাতে পড়ে এটাকে ভাষান্তরিত করা হ'ত—সারা পৃথিবীর দরবারে এ আসন পেত।

শেষের কবিতা, এরও সিনেমা-পসবিলিটি অনেক, অথচ আমাদের দেশের প্রযোজকরা একেবারে নীরব!

আমরা যা পারলাম না, হলিউডে তাই নিয়ে মাতামাতি সুরু হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথের জীবনী নিয়ে বই তোলবার, তারা নিজেরাই বাংলার মাটি হাঁজড়ে পাঁজড়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা কবির জীবনে যা ছায়াপাত করেছিল, সেই সব সন্ধান করে চিত্রনাট্যের খোরাক জুটিয়েছিলেন! সুযোগ্য পরিচালক এবং অভিনেতা লেসলী হাওয়ার্ড-এর উপর ন্যস্ত হয়েছিল তার অভিনয় এবং পরিচালনার, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের সে ছবি আর উঠল না, লেসলীর অকাল মৃত্যুতে তা পিছিয়ে গেল!

পারবেন আমাদের দেশের চিত্র নাট্যকার এমনি ছবির কল্পনা করতে!—মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। তাইত এযে বিরাট কাণ্ড। প্রেম কোথায়, নাচের গান কোথায়, হাসির খোরাক কোথায়!

ওকথা বাদই দিলাম—শরৎচন্দ্রের জীবনী,—কত বিচিত্রময়, কত না ঘটনাবহুল,—এমন সহজ রসপূর্ণ জীবনী, কি চিত্রে রূপান্তরিত করা যায় না। আমি বলব যায়, অতি সহজেই যায়। বেশী খরচও নয়।—সুন্দর সুষ্ঠ ভাবে—ছেলেবেলা থেকে শেষ জীবন অবধি বেশ রসঘন করুণ চিত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু চিত্র-নির্মাতাদের সে নজর কোথায়। এই শরৎবাবু না এলে বাংলার চিত্রশিল্প যে কোন গহ্বরে পড়ে টিঁ টিঁ করত কে জানে। বাজারে যে সব রাবিশ ছবি বার হয় তার চেয়ে অনেক ভাল ছবিই তৈরী করা যায় যদি প্রথমতঃ প্রযোজকরা বাজারে রীতিমত চিত্র কাহিনী বা চিত্র নাট্যের জন্য খোঁজ করেন। আমাদের অনেক বড় ছোট লেখক যারা আসছেন তাদের কলম একেবারে অযোগ্য নয়। ঐসব ভুঁই ফোঁড় ডিরেক্টার বা ফোঁপর দালাল সিনেমা কোম্পানীর ধামাধরা তালিবাজ গল্প লিখিয়েদের যে সব বস্তাপচা—ট্রেডমার্ক—দেওয়া বই বের হয়, তার চেয়ে কোন অংশে ভোঁতা নয়ই, বরং অনেক আশাপ্রদ!

দেখুন না, হিন্দী ছবি 'পড়শী' বিলেতে দেখান হ'ল, বাংলার কোন ছবিই কি ওর সমান তালে উঠতে পারেনি যা বাইরে দেখান যেতে পারে! কেন পারেনা, বাংলাই সারা ভারতের চিত্রশিল্পকে শিল্পী, পরিচালক, লেখক জুগিয়েছে। নিজের বেলায় এত দৈন্য কেন! দৈন্য তাদের নয়, হীনতা তাদের নয়, আমাদের চিত্র প্রযোজকদের।

এ নিয়ে বেশী কিছু আমি বলবনা! শুধু এই কথাটাই আমি জানিয়ে যেতে চাই—আজকে চিত্রনাট্যকার বা কাহিনীকারকে Studioর পাঁচিলের মধ্যেই না বেঁধে রেখে তার পরিসীমাটা আরও বাড়ান দরকার! বাইরের প্রতিভা যে সুযোগ পেলে বাজারে ঐসব ভোঁতামারা গল্প, সংলাপ চিত্রনাট্য, রচনাকারদিকে ছাপিয়ে যায় তার প্রমাণ আপনারা ত পেয়েছেন! এতে প্রযোজকদের হুঁস হওয়া দরকার।

কিন্তু আমাদের হাত বাধা, প্রথমেইত বলেছি না পড়ে পণ্ডিত আমরা! আমাদের দেশে কোন প্রতিষ্ঠানই নেই যেখানে সিনেমা শিল্প সম্বন্ধে কিছু শেখান হয়! শিখতে হলে ধন্না দিতে হবে এঁদের দরজায়। তবে বড় যারা হয় তাদের মধ্যে যে কিছু একেবারে নেই, সে কথা বলবার সাহস কারোরই নেই,—কিন্তু যে সব ভুঁইফোঁড় তিন দিনের ডিরেক্টার আর লেজুড় লাগান পিছনে কাহিনীকার তাদের বিদায় নেওয়া উচিত। অন্ততঃ জোর করে আমাদের তাড়ান দরকার! আবার আর এক শ্রেণীর পরিচালক আছেন তারা প্রথমে হয় বাংলা ছবি তুলতে গিয়ে কুপোকাত হয়েছেন, গালাগাল খেয়ে হিন্দী ছবিতে হাত দিয়েছেন! সাধারণ হিন্দী ছবির পরিচালক হচ্ছেন বোকামী ন্যাকামী আর ছ্যাবলামির মাপকাঠি। কোনরকমে একখানা উৎরে গেলেন, তারপরে বাংলা ছবি তুলতে বললেই তিনি গোঁফ পাকিয়ে জবাব দেন, "বাংলা ছবি, আবার ছবি, ও আর তুলবোনা হিন্দী ছবিই তুলব!"

সব জায়গাতেই সব সময়েই নিজের যতটুকু মনে হয় আমি বলব, ছবি মার খায় প্রধান এবং সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে ডিরেক্টার। পয়সার লোভে তাদের চুরি করা কাহিনী, জোলো চিত্রনাট্য আর দুর্বল সংলাপ কোন রকমে বসিয়ে ছবি তৈরী করতে যাতে না পায় তার প্রতিবাদ করা উচিত! এবং ডিরেক্টার হবার যোগ্য তারাই হবেন যারা অন্ততঃ পাঁচ বছর থেকে বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আগেকার সহকারী অবস্থায় বা চিত্রনাট্যকার হয়ে থাকা কালে! চিত্র শিল্পে এখনও বুদ্ধিমান রত্নর চেয়ে মায়ে খেদান বাপে তাড়ান গোপাল অনেকেই আছে তাদের তিনকড়া বিদ্যে নিয়ে ডিরেক্টারী করেন। তাঁরা চিত্র-কাহিনীইবা কি বুঝবে চিত্রনাট্যই বা কি করবে! যা দেবেন ছাগলের সামনে, তাতেই মুখ লাগাবে! তেমনি ওদিকে যা করতে দিন ছ্যাবলামি ঠিকই করে যাবে! তাই আপনাদের এ দুর্ভোগ, আমাদের এ ভোগান্তি।

আমাদের কোন পরিবর্তন আসছে কিনা জানিনা, তবে সকলের মত আমিও বলব দিন হয়ত আসবে, সেইদিন আবার বাংলা ছবি দেখবেন ততদিন ছবি দেখা বন্ধ করে দেন, দেখবেন পরিবর্তনের দিন এসে গেছে খুব কাছে।

ছোটদের ছবি

দিলীপ দে চৌধুরী

[শিশুদের এই দাবীকে রূপ-মঞ্চ সর্বোতভাবে ন্যায়-সংগত বলে মনে করে—তাই এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে তুলতে রূপ-মঞ্চকে সব সময়েই তারা তাদের পাশে পাবে।—সম্পাদক]

ছোটদের উপযোগী চিত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আর কেউই সন্দিহান নন। সকলেই প্রায় স্বীকার করেন যে দেশের ছেলে মেয়েদের সত্যিকার 'মানুষ' ক'রতে হ'লে কিশোরোপযোগী চলচ্চিত্রের একান্ত প্রয়োজন। তথাপি কেন যে তা তোলা হয়না সেটা একটা আশ্চর্যের বিষয়। ভারতে প্রতি বছর যথেষ্ট ছবিই তোলা হ'চ্ছে। এইসব ছবি দিয়ে দেশের কতখানি উপকার হ'চ্ছে জানিনা, তবে সিনেমা শিল্পের যে কোন ক্ষতি হ'চ্ছে না সে বিষয় নিশ্চিন্ত। তার প্রমাণ স্বরূপ দেখা যাচ্ছে আগাছার মত গজাচ্ছে নিত্য-নতুন সিনেমা প্রতিষ্ঠান। জাতীয় জীবনে সিনেমার সাহায্য অপরিহার্য না হ'লেও প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই।

অত্যন্ত আনন্দের কথা, বাংলার কিশোররা আজ দাবী ক'রতে শিখেছে। ছোটদের ছবির জন্যে ছোটরাই আজ আন্দোলন ক'রছে। হিন্দু বয়েজ স্কুলের ছাত্র সমিতি এগিয়ে এসেছে এদের মুখ পাত্র হ'য়ে। প্রার্থনা করি এরা জয়যুক্ত হোক, সফল হোক এদের আন্দোলন।

অনেকে বলেন, 'ছোটদের ছবির দর্শক নেই বাংলা দেশে।' এঁদের কাছে আমার অনুরোধ, যদি কোনদিন ছোটদের উপযোগী কোন ইংরাজী ছবি বা লরেল হার্ডি কি চার্লি-চ্যাপলিনের কোন বই আসে কোন সিনেমায়, একবার যেন দেখে আসেন দয়া করে শিশু দর্শকের ভীড়টা সেখানে কিরকম। এই তো সেদিন উত্তর কলিকাতার কোন এক চিত্রগৃহে 'কিংকং' দেখতে গিয়েছিলাম ছোট ভায়েদের নিয়ে। সমস্ত 'হল' টায় শিশুদের মেলা ব'সে গিয়েছিল ব'ললেই চলে। দু-চার জন মাত্র বয়স্ক লোককে দেখলাম যাঁরা অভিভাবক হিসাবে এসেছিলেন!

কথায় কথায় সব নজীর দেখান নিরঞ্জন পালের তোলা দু'খানা ছোটদের ছবির। স্বীকার করি সাফল্যমণ্ডিত হয়নি ছবিগুলো। কিন্তু তার কারণ তো অনেক কিছুই হ'তে পারে। অভিনয়ের ত্রুটি কিম্বা কাহিনী নির্বাচনের গলদ। তারপর সেগুলো আলাদা দেখাবার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তাদের জুড়ে দেওয়া হ'য়েছিল তথাকথিত এক একখানা প্রেমের 'প্যানপানি'র সংগে। ছোটদের দেখতে হ'লে তো সেখানাকে বাদ দিয়ে দেখা সম্ভব হ'তো না।

ওদের দেশে ছোটদের জন্যে আলাদা চিত্রগৃহ পর্যন্ত আছে। আমরা এখনি অবশ্য অতটা চাইছি না। তবে সপ্তাহে একটা দিন অন্ততঃ নির্দিষ্ট কয়েকটা চিত্রগৃহে 'ছোটদের ছবি' দেখান হোক। প্রয়োজন হ'লে এর জন্যে বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ক'রতে পারেন কর্তৃপক্ষ।

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন 'ছোটদের ছবি' বলতে তোমরা কি বোঝ? 'ছোটদের ছবি' প্রধানতঃ হবে শিক্ষামূলক। যেমন মনে করুন, রাশিয়ার ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে একটা ছবি তোলা হলো। ওরা কি ভাবে মানুষ হয়, কি ভাবে গড়ে ওঠে ওদের জীবন আমরা জেনে নিলাম এবং আমাদের জীবনেও অনুকরণ করতে চেষ্টা ক'রবো তাদের সংগুণ গুলোকে। এইভাবে বিভিন্ন দেশের ছেলে-মেয়েদের সংগে আমাদের তফাৎ এই সব ছবির মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেরাই ধরতে পারবো।

তারপর, মহাপুরুষদের জীবনীকে অবলম্বন ক'রেও ছোটদের ছবি তোলা যায়। সেক্সপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ কি যীশুখৃষ্টের জীবনীকে চিত্রে রূপান্তরিত ক'রলে ছোটরা তার থেকে শিখতে পারে অনেক কিছু।

শিল্প বিষয়ক ছবিও ছোটদের সম্পূর্ণ উপযোগী। দেশ বিদেশের প্রসিদ্ধ শিল্পের পরিচয়! কেমন করে তৈরী হয় কাপড় বা কাগজ, মাটীর খেলনা কি কাঠের জিনিস। কি করে পাওয়া যায় সোনা, লোহা অথবা কয়লা। এই সব তথ্য ছোটদের জানা উচিৎ এবং তারা জানতে চায়ও। সম্প্রতি সরকার Information Films of India নাম দিয়ে অনেকগুলি এই শ্রেণীর ছবি তুলেছেন। কিন্তু

মন-কী-জিৎ চিত্রে শ্রীমতী নীনা।

শ্রীমতী যমুনা

আর্ট ফিল্মের "তকরার" চিত্রে

সেগুলিকে দেখান হয় কোন একটী বাংলা বা হিন্দী ছবির সংগে যা ছোটদের দেখার উপযুক্ত নয়। সরকার থেকে যদি এই সব ছবিগুলোকে পৃথক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় তাহ'লে ভাল হয়।

এ ছাড়া ছোটদের উপযোগী শিক্ষামূলক সামাজিক উপন্যাস লিখিয়ে নিয়েও ছবি তোলা যায়। এই রকম ছবিরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এই রকম ছবিই সবচেয়ে জনপ্রিয় হবে। কারণ একঘেয়ে উপদেশ শুনতে কার আর ভাল লাগে? ছোট ছেলে হ'লেও তারা তো মানুষ? ছোট ছেলে মেয়েদের গল্পের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা আমাদের দেশে বহুকাল থেকেই চলে আসছে। উপযুক্ত শিশু সাহিত্যিকদের দিয়ে শিক্ষা-মূলক কাহিনী লিখিয়ে নিয়ে তার চিত্ররূপ দিলে সে ছবির দর্শকের অভাব হবে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস আমার অন্ততঃ নেই।

বাংলায় এত নাম করা সিনেমা কোম্পানী রয়েছে অথচ বাংলার শিশুদের জন্যে সাহস করে' এগিয়ে আসার মত কেউ কি নেই? বাংলার ছেলেদের জন্যে—ভবিষ্যৎ সমাজের বংশধরদের জন্যে এতটুকুও কেউ কি ভাবতে পারেন না? একটা ছবিতে লোকসান দেবার মত শক্তি বহু প্রতিষ্ঠানেরই আছে (দিচ্ছেও যথেষ্ট)। কিন্তু তবু কেন তাঁরা চুপ করে আছেন জানি না। আমাদের মনে হয় এ সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিৎ প্রত্যেকেরই।

বাংলার শিশু কিশোরদের মধ্যে আজ একটা জাগরণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন পত্রিকার ছোটদের বিভাগের মধ্যে দিয়ে বাংলার কিশোর দল আজ তাদের বলিষ্ঠ চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছে। পরাধীন দেশের বন্দী ছেলেমেয়েরা আজ পাল্লা দিতে চায় স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়েদের সংগে। তাদের সংগে সমানে দাঁড়িয়ে বলতে চায়, 'আমরাও মানুষ'। কে জানে এদের মধ্যে থেকেই হয়তো বেরিয়ে আসবে কোন মুক্তিদাতা বীর কিশোর।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সকল খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিকগণ আজ সিনেমার সংগে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন অন্ততঃ তাঁরাও কি ভেবে দেখতে পারেন না কথাগুলিকে একবার?

লুপে ভেলেজ

মিঃ বিকিউব.

মাদকতাময়ী চিত্রাভিনেত্রী লুপে ভেলেজের মৃত্যু, আজ সারা জগতের চিত্রামোদীদের মনে বিষাদের ছায়াপাত ক'রেছে। শ্রীমতীর জীবনে কোনও দিনই, কোনও ধরণের কোন নীতির বালাই ছিল না, আর তা ছিল না ব'লেই মনে যে-দিন নীতির উদয় হ'ল : নিজের নীতিহীন জীবনের ভবিষ্যৎ প্রতিচ্ছবি কল্পনা করে, বাড়ানো-পা সে-দিন টেনে আনার উপায় নেই দেখে, শ্রীমতী নিজের জীবন-সূত্র ছিঁড়ে ফেল্লেন।

১৯১০ সালের ১৮ই জুলাই মেক্সিকোর স্যান্ লুই পটোসি-তে লুপের জন্ম হয়। লুপের পুরো নাম হ'ল লুপে ভেলেজ ডি ভিলালোবস।

বেশ সঙ্গতিপন্ন পিতার অতি বড় আদরের কন্যা ছিল ও। অন্য ছেলে-মেয়েদের চেয়ে লুপের আদর বেশী ছিল এই জন্য যে, ওর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ওর পিতার আর্থিক উন্নতি ঘটে। তাই ওর পিতার সংসারে ওর একটি স্বতন্ত্র আসন এবং মর্যাদা ছিল। ওর কোনও ইচ্ছাই কোনও দিন অপূর্ণ থাকতো না।......

হেসে-খেলে, আমোদ-প্রমোদের মধ্যে লুপের বাল্যকাল বেশ ভাল ভাবেই কাটে।...

কৈশোরের প্রারম্ভে, লুপে, বিশেষ-ক'রে ওর জন্যে নিযুক্ত-করা ঝি-চাকর গুলোকে নিয়ে থিয়েটারে-দেখে-এসে নাচ-গানের অনুকরণ আরম্ভ ক'রলো। ওর বাড়ীর ছাদে ওর এই নাচগানের আখড়া বস্‌লো।

এই নাচ-গানের জন্য সংসারে বড় শৃঙ্খলার অভাব ঘটতে লাগলো। ওর মা নাচ-গান মোটেই পছন্দ করতো না। মেয়ের এই ধিঙ্গীপনা ওর চোখে বিষ ছড়াতে লাগলো। অনেক ব'লে ক'য়েও মেয়েকে বাগে আনা সম্ভবপর হ'ল না। সুতরাং সংসারে অশান্তিরও আর শেষ রইলো না!

এই সময়ে আবার—এগার কি বার বছরেই লুপের দেহে যৌবনের বান্ ডাকলো : পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গ কামনার জন্য লালায়িত হ'য়ে উঠলো ও। ফলে, একটুখানি রংদার ফিতা বা নামজাদা নর্তক-নর্তকীর একখানি ছবির বিনিময়ে লুপে যুবকদের মধ্যে চুম্বনাদির আদান-প্রদান সুরু করলো : ওর বাড়ী এবং বাড়ীর আশ-পাশ পাড়ার বদ-বওয়াটে ছেলেতে ভ'রে গেল। এই সব ব্যাপারে ওর বড় বোন জোসেফাইন-এর কাছ থেকে ও খুব সহযোগিতা পেতো।

কিছু দিনের মধ্যেই মা, মেয়েদের কীর্তি-কলাপ টের পেলো; বুঝলো : তার এই মেয়ে দু'টির জন্যেই তার সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে একদিন।

লুপে মার মনের ভাব বুঝলো এবং এ-ও বুঝলো যে, এভাবে বাড়ীতে থেকে আর বেশীদিন প্রেমের হাট বজায় রাখা যাবে না। আর তা' ছাড়া যখন মা একদিন এমন কথাও স্পষ্ট জানালো যে,—ওরা বাড়ী থেকে চ'লে গেলে দুঃখিত তো হবেন-ই না, উপরন্তু খুসীই হবেন উনি—তখন ওরা দু'বোনে বে-পরোয়া হ'য়ে উঠলো : বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো ওরা।

টেক্সাস্-এ এসে আস্তানা পাতলো ওরা। এখানে কয়েকজন মার্কিনী যুবতীর সঙ্গে ওদের হৃদ্যতা ঘটলো। এই হৃদ্যতার সুযোগ নিয়ে লুপে, যতদূর পার্‌লো মার্কিনী আদব-কায়দা এবং নাচ-গান শিখে নিলো।...

লুপে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র কল্পনা ক'রে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো।

এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল। খবর এলো: পিতা ওর আহত হ'য়ে শয্যাশায়ী হ'য়েছে—অর্থাভাবে সংসার অচল হ'য়ে উঠেছে।

লুপেকে বাধ্য হয়েই গৃহে ফিরতে হ'ল।

বাড়ী ফেরার কয়েকদিন পরেই পিতার মৃত্যু ঘটলো।

দেখা গেল জীবিত অবস্থায় যিনি ছিলেন সঙ্গতিপন্ন, তার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা কপর্দকহীন। কোথা দিয়ে এবং কেমন ক'রে যে কখন সব কর্পূরের মত উবে গেছে তা কেউই টের পায় নি।

মা এবং অন্য সব বড় ভাই-বোনেরা অবস্থা দেখে 'কি করি', 'কি হবে' বলে অশ্রু বিসর্জন এবং কালক্ষেপ করা সুরু করলো। কি ক'রলে সব দিক বজায় থাকে, সে দিকে কারুরই কোনও উৎসাহ দেখা গেল না।

এই সব দেখে-শুনে লুপে একদিন বড় বেশী রেগে গেল। ক্রন্দনরত মা এবং ভাই-বোনদের উদ্দেশ্য ক'রে বল্‌লো: ওগো! তোমরা তোমাদের কান্না থামাও। নির্বোধের মত শুধু কেঁদে কোনও লাভ নেই। যাতে এই বিপদ কাটে তার ব্যবস্থা—উপার্জনের চেষ্টা দেখা। তোমাদের চোখের জলের ঐ ফোঁটাগুলো যদি এক এক টুকরো সোনা হ'ত, তা'হ'লে তোমাদের ঐ কান্নায় আমার আপত্তি থাক্‌তো না, কিন্তু তা যখন হবার নয়, তখন উঠে প'ড়ে রোজগারের উপায় দেখ।

সেই দিনই রাত্রে, লুপে তার এক প্রেমিকের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেল। ষ্টেজে তখন এক নামজাদা নর্তকীর নাচ চলছিলো। নাচ শেষ হ'তেই প্রেক্ষাগৃহের সকলেই হর্ষধ্বনি প্রকাশ ক'রে হাততালি দিয়ে উঠলো। লুপে কিন্তু নাক সিঁটকে তার প্রেমিককে উদ্দেশ্য ক'রে বললো: অত চেঁচাবার মত কিইবা এমন নাচলো—আমিও অমন নাচতে পারি!

প্রেমিক প্রবর উত্তরে বিরক্তি-মাখা স্বরে ব'লল: হাঁ! ও-রকম ভাবতে পারো বটে তুমি! কিন্তু মনে রেখো এ তোমার বাড়ীর ছাদের নাচ নয়, বুঝলে!

লুপে, উত্তরে কিছু বললো না, চুপ ক'রে রইলো।

তার পরের দিন, লুপে তার মাকে নিয়ে সেই থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলো। ম্যানেজার প্রথমে তাকে 'সখীদের' দলে নিতে রাজী হ'লেন, কিন্তু লুপে তাতে রাজী নয়।

'আমি এই থিয়েটারের যে কোনও নর্তকীর চেয়ে ভাল নাচতে পারি;—আমি তাদের চেয়ে কোনও অংশে হীন নই এই দেখুন' এই বলে লুপে কোনও অনুমতি না নিয়েই ষ্টেজে গিয়ে নাচ সুরু করলো।

ম্যানেজার প্রথমটা লুপের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে, হেলার চোখে লুপের নাচ দেখছিলো। কিন্তু কিছু পরেই ওস্তাদ শিল্পী তার নিজের ভুল বুঝতে পারলো। বুঝলো, সামান্য শিক্ষা পেলেই এই মেয়েটি তার দলের সেরা নর্তকী হ'য়ে উঠবে। লুপে সেই থিয়েটারে চাকরী পেলো।

এই সময় বিধাতা বোধ হয় লুপের ওপর খুব সদয় ছিলেন।

হঠাৎ শেষ সময়ে ঐ থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ নর্তকীর সঙ্গে কর্মকর্তাদের মতের অমিল হওয়ায়, নর্তকী থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ ক'রে যায়। এবং মনোমত আর কাউকে না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত লুপেকেই ঐ ভূমিকাটিতে অভিনয় করতে দেওয়া হয়। জনপ্রিয় হওয়ার প্রচুর মাল-মশলা ছিল ভূমিকাটিতে। নতুন শিল্পীর উৎসাহ এবং বৈচিত্রময় অভিনয় চাতুর্যে ভূমিকাটি আশাতিরিক্ত সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠলো: প্রথম দিনেই লুপে জনপ্রিয়তার শীর্ষ আসনে উঠে বস্‌লো।

লুপের প্রেমিক প্রবর কিন্তু লুপের এই সাফল্যে মোটেই সুখী হ'তে পারলো না। হাজার-হাজার দর্শকের লালসা মাখা দৃষ্টির সামনে তার প্রেমিকাকে সে ছেড়ে দিতে রাজী হ'ল না কিছুতেই। লুপে কিন্তু অসঙ্কোচে তাকে ছেড়ে দিলো।

*

এই সময় বিশ্ববিখ্যাত 'থিয়েট্রিক্যাল এজেণ্ট' ফ্রাঙ্ক উড্‌ইয়ার্ড লস্‌ এন্‌জেলস-এ "The Dove" খোলার জন্য নর্তকী খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

সংবাদপত্র মারফৎ লুপের লাস্যময় অভিনয়-চাতুর্য সংবাদ সংগ্রহ ক'রে, উনি ওর অভিনয় দেখতে আসেন। লুপের নাচ এবং অভিনয় উডইয়ার্ডকে মুগ্ধ করলো।

সুযোগও এসে গেল। থিয়েটারের সেই নামজাদা নর্তকীটি আবার ফিরে আসায়--লুপে বিনা বাধায় থিয়েটার ছাড়ার ছাড়পত্র পেলো। উডইয়ার্ডের সঙ্গে নূতন চুক্তিপত্র সাক্ষর ক'রে পুরাণো চুক্তি পত্র ছিঁড়ে ফেল্‌লো লুপে।

গৃহের একটা ব্যবস্থা ক'রে কয়েকদিন বাদে, লুপে লস্ এন্‌জেল্‌স্‌এ এসে হাজির হ'ল।

উডইয়ার্ড আগেই চ'লে এসেছিল। কথা ছিল ষ্টেশনে দেখা হবে। কিন্তু দেখা গেল ষ্টেশনে কেউ নিতে আসে'নি ওকে! ব্যাগে একটি মাত্র ডলার, একটি লোমহীন 'মেক্সিক্যান' কুকুর এবং নিটোল যৌবন সম্বল নিয়ে অচেনা অজানা দেশে ভাগ্যান্বেষী লুপে হোটেলে হোটেলে উডইয়ার্ডের তল্লাস সুরু ক'রলো, কারণ হোটেলের ঠিকানাটি লুপের ব্যাগে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ছ'দিন বিশ্রামহীন পরিশ্রম করার পর উড্‌ইয়ার্ড-এর পাত্তা পাওয়া গেল।

আস্‌তে ছ'দিন দেরী হওয়ায়, যে ভূমিকাটির জন্যে লুপেকে এখানে আনা হ'য়েছিল, সেই ভূমিকাটি আর একজনকে দেওয়া হ'য়েছে শুনে, লুপে অকুল পাথারে পড়লো। উডইয়ার্ড অনেক ক'রে লুপেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভবিষ্যৎ সুযোগের আশায় অপেক্ষা ক'রতে ব'ল্‌লেন।

অন্য উপায় না থাকায় লুপে অপেক্ষা করতে বাধ্য হ'ল।

বেশীদিন অবশ্য অপেক্ষা করতে হ'ল না।

একদিন লুপে, হ্যারী র‍্যাফ-এর নজরে পড়লো।

এই হ্যারী র‍্যাফ লোকটির শিল্পী নির্বাচনে অদ্ভুত দক্ষতা দেখা যায়। ইনিই জোয়ান ক্রফোর্ডকে 'উইণ্টার গার্ডেন'-এ নাচতে দেখে, ছবির জন্য পছন্দ ক'রে নিয়ে আসেন।

এ ক্ষেত্রেও লুপে পরীক্ষায় আশাতিরিক্ত ফল লাভ করলো। ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্-এর বিপরীতে 'গচো' ছবিতে অভিনয় করার জন্য লুপে নির্বাচিত হ'ল। লুপে যা' কোনও দিন কল্পনাও ক'রে নি বাস্তবে তাই ঘটলো।

মেক্সিকোয় লুপে যেমন আন্দোলন এনেছিল, হলিউডেও সেই রকম আন্দোলন আনলো। তখন, লুপে ছাড়া কারু মুখে যেন আর কোনও কথা নেই। যে-কোনও মজলিসেই যাও না কেন, কাউকে না, কাউকে বল্‌তে শুনবে: 'হোয়াট্ ডু ইউ থিঙ্ক অফ্ লুপে?'

মেক্সিকোয় যেমন লুপের 'রসের নাগর'-এর অভাব দেখা যায় নি হলিউডেও তেমন দেখা গেল না। মর্তের এই নন্দন কাননের জাত-লোভ্য সব নায়কের দল লুপের রূপ-যৌবনে ঝাঁপ দেবার জন্য লালায়িত হ'য়ে উঠলো। যৌবনের প্রারম্ভে যে উচ্ছৃঙ্খল নীতিহীন জীবনযাপনের বাসনা মনে জেগেছিল, সে বাসনা পূর্ণ মাত্রায় পূর্ণ হ'ল!

চিত্ররাজ্যে দিনের পর দিন কিভাবে নিত্য-নূতন ভূমিকায় বৈশিষ্ট্যময় অভিনয় চাতুর্য দেখিয়ে লুপে আজ সারা জগতের জনপ্রিয় শিল্পী হ'য়ে উঠেছে তার পরিচয় এখানে বোধ হয় না দিলেও চল্‌বে।

এই জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম নিয়ে ছিনি মিনি খেলার প্রবৃত্তিও বেড়েছে। যার ফলে আজ ওকে আত্মহত্যা করে নিজের সম্মান বজায় রাখতে হ'ল।

লুপের জীবন জোয়ারে সাঁতারুর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়: তার মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত হ'চ্ছে, গারী কুপার, জন গিলবার্ট, রোনাল্ড কোলম্যান, রিকার্ডো কর্টেজ, জনি ওয়েস মূল্যার, আরটুরা ভি করডোভা এবং নবাগত ফরাসী অভিনেতা হ্যারল্ড রেমণ্ড।

উপরোক্ত সব ক'জনের সঙ্গেই লুপে রীতিমত প্রেমের খেলা খেলেছে, কিন্তু একমাত্র ওয়েসমূলর ব্যতীত আর কাউকে বিয়ে ক'রে নি এবং সে বিয়েও বেশী দিন স্থায়ী হয়' নি। পুরুষকে নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার, হাতের পুতুল ক'রে রাখার সর্বনাশা স্পৃহা লুপের সর্বনাশ ক'রেছে। লুপের শেষ প্রেমিক হ্যারল্ড সম্বন্ধে লুপে একজায়গায় বলেছে: এতদিন আমিই পুরুষদের

চালাতাম, কিন্তু এখন দেখছি আমাকে কিভাবে চালাতে হয় তা' হ্যারল্ড জানে। আমি ওকে এই জন্য ঘৃণা করি, কিন্তু ওর কবলের বাইরে আসতে পারি কই?

হ্যারল্ডের কবল থেকে বেরিয়ে আসার যখন আপ্রাণ চেষ্টা করছে লুপে, সেই সময় ও একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলো ও তিনমাস গর্ভবতী। রাত তখন তিনটে।

তার পরের দিন সকাল বেলা শয্যায় ওর মৃতদেহ দেখা গেল; কোলে দু'খানি চিঠি। পরীক্ষায় জানা গেল অত্যাধিক ঘুমের ওষুধ খাওয়াই মৃত্যুর কারণ।

একখানি চিঠি ওর প্রেমিক হ্যারল্ডকে লেখা। তাতে লেখা: 'নিষ্ঠুর! আমাকে এবং আমার পেটের সন্তানকে অন্তরে অন্তরে এত বেশী ঘৃণা ক'রে মুখে হাসি নিয়ে আমার সঙ্গে তুমি কেমন ক'রে প্রেমের অভিনয় ক'রতে তাই ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। তুমি আমাদের উদ্ধার করতে পারতে—কিন্তু তা' যখন তুমি করলে না—আমার আর অন্য উপায় রইলো না।'—

অপর চিঠিখানি লুপের সেক্রেটারীকে লেখা: ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন—আমার সন্তানের মাথায় লজ্জার বোঝা চাপানোর চেয়ে, আমার এবং আমার সন্তানের জীবন নষ্ট করাই আমি শ্রেয় মনে করলুম। ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন।'

ঈশ্বর লুপেকে ক্ষমা করুন।

আঘাতের পর আঘাত

(গল্প)

শ্রীসনৎকুমার মৌলিক

তুহিন একটা আশ্চর্য যাকে বলে অদ্ভুত মানুষ। কথা নেই বার্তা নেই একদিন এসে এই সহরে উপস্থিত। তখন তাকে কে চিনতো, তখন তাকে কে জানতো? সামান্য ব্যবসা ফেঁদেছিল এ সহরে এখন হোয়েছে অসামান্য অর্থ। আগে ছিল গরীব এখন হোয়েছে ধনী—দস্তুর মতো ধনী। তার কি নেই? সহরের প্রান্তসীমায় কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় তার বাড়িটি। ব্যবসার কোলাহলের মাঝে থেকেও তুহিন কেমন নির্জনতার মাঝে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। সহরবাসীরা চায় তার সঙ্গ, চায় তার বন্ধুত্ব, চায় তার আত্মীয়তা কারণে ও অকারণে। রতনপুর ছোট্ট সহর হোলে কি হবে? এখানে সব হয়। রবিবাসুরীয়, শোকসভা, জন্মোৎসব, জলসা বারোমাসে তের পার্বন লেগেই আছে। এখানকার মেয়েরা সবাই প্রগতিপন্থী—একেবারে অগ্রগামী সব বিষয়েই। মেয়েরা নামের পেছনে বি-এ, এম-এ, লাগিয়ে গল্প লেখে, কবিতা লেখে। তাদের বিয়ের ছবি দৈনিক কাগজে ছাপা হয়। সহরের সৌখিন সভা থেকে তুহিনের কাছে নিমন্ত্রণ আসে রোজই। তুহিন কোনদিন যায়না সভায়। সেদিন কোন এক মনীষীর শোক-সভা হবে। সভার প্রথমে আছে উদ্বোধন সংগীত—গায়িকা সবাই শ্রীমতীর দল আর সভার শেষে আছে জল-যোগের বন্দোবস্ত। সহরের বিচক্ষণেরা বাছাই বাছাই মেয়েদের পাঠিয়েছে তুহিনের কাছে। তুহিনতো মেয়ে দেখে অবাক। এরা আবার এখানে কেন?

"আপনারা কি চান?" তুহিন জিজ্ঞেস করে।

দীপ্তি অগ্নি সবার আগে চোখ-ঝলসানো হাসি দিয়ে বলে—"আপনাকে শোক-সভার সভাপতি হোতে হবে কিন্তু হ্যাঁ—" সঙ্গে সঙ্গে মন ভোলানো ভংগি দেখিয়ে চোখটা একজন বিশিষ্ট অভিনেত্রীর ঢং-এ ঘুরিয়ে ফেলে। তুহিন জবাব দেয়—"যে লোকটা জন্ম থেকে শোক পেয়ে আসছে তাকে কী আপনারা শান্তিতে থাকতে দেবেন না! একী বিড়ম্বনা!" বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে যায়। দীপ্তি শোভনার হাতে চিমটী কাটে।

শোভনা এবার স্বজাতীয় কৌশল অবলম্বন করে—"আপনি না গেলে সভা বন্ধ হোয়ে যাবে যে।" বলতেই সাদা গাল লজ্জায় লাল হোয়ে যায়। অন্যান্য মেয়েদেরও। তুহিন ম্লান হেসে বলে:—"উপযুক্ত শোক-সভাই বটে। আচ্ছা, এক কাজ করুন না—সভা না করে ঘরে গিয়ে শোক করুন। এসব সভাতে—সভাটাই ঘটা করে হয়, শোক হয়না বুঝ্‌লেন।" একথাতে শোভনার গলায় গুঁড়ি গুঁড়ি পাউডার ঘামের সঙ্গে মিশে যায়। বৃথা হোল তুহিনের কাছে আসা। দীপ্তির হাসি, শোভনার কৌশল এদের পেছনে কত চমকপ্রদ ইতিহাসই না আছে—তবু সব ব্যর্থ হোয়ে গেল, ম্লান হোয়ে গেলো।

তুহিনের নিস্তার নেই। নিজেকে নৈর্ব্যক্তিক করে বাঁচতে চেয়েছিল তাও বুঝি ভেঙ্গে যায়।

পিঁপড়ের কামড়ের মত বৃদ্ধের দল তাকে কামড়ায় "আমার মেয়ে সিপ্রার জন্মদিনে অনুগ্রহ করে যদি আপনি আমার বাড়িতে পদার্পন করতেন" বৃদ্ধ রমাপদ হাত কচলায়।

"আপনার মেয়ের জন্মদিনকে ম্লান করতে চাইনে" পত্রপাঠ বিদায়।

আর একজন উপস্থিত। "আমার মেয়ে মীনা এবার ইকনমিকসে এম-এ দিচ্ছে—"

"আমিতো এম-এ পাশ করিনি।"

কথা আর এগোয় না।

নতুন মুন্সেফ ত্রিদিব সেন গেলো তুহিনের কাছে। একথা সেকথার পর সে আসল কথাটা পাড়ে—"হ্যাঁ দেখো তোমার মত ইয়ংম্যান আমি লাইফে খুব কম দেখেছি। তোমাকে আমি ঘরের ছেলে করতে চাই।" পাইপটা জোরে জোরে টানে। তুহিন একেবারে কাগজের মত ফ্যাকাশে হোয়ে যায়। একটু কেশে নিয়ে বলে—"ঠিক কথাটা বুঝতে পারলেম না।" ত্রিদিব সেন একটা হাঁটু নাচিয়ে বলে—আমার মেয়ে সুলোচনার সংগে তোমার বিয়ে দিতে চাই।" বুক পকেট থেকে তার মেয়ের ফটো বের করলো। তুহিনের

হাতের উপর ফটোখানা রেখে দেয়। ত্রিদিব আবার আরম্ভ করে—"ফটোখানা পছন্দ হোয়েছে কিনা কাল এসে জেনে যাবো। সুলোচনা ভিক্টোরিয়াতে পড়ে। আচ্ছা আসি।" তুহিন হ্যাঁ-না কিছু বলতেই মোটর করে মুনসেফ অদৃশ্য হোয়ে যায়।

ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে তুহিন। টেবিলের উপর সুলোচনার ফটো। মেয়েটী দেখতে মন্দ না। রংটা সামান্য কালো। তাহোক। বেশ দেখতে। ফটোটা যেন নীরবে বলছে—আমায় নাও। আমায় নাও। তুহিন বিছানায় শুয়ে পড়ে। সহরবাসী সবাই ক্ষেপে উঠেছে তাকে সংসারী করতে। দিনের পর দিন লোক আসছে তার কাছে। কি করবে তুহিন ভেবে পায়না। একটা পরীক্ষা করা যাকনা? তুহিন এবার ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন। সকাল বেলা। ত্রিদিব সেন হাজির। "মেয়ের বিয়ের গরজ আমারি। কিহে পছন্দ হোল?"

তুহিন মাথা নিচু করে বলে—"পছন্দ? হ্যাঁ-তা হোয়েছে।" ত্রিদিব গর্বের হাসি হাসে—"ও বাপু আমার মেয়ে, পছন্দ হোতেই হবে। তোমার সঙ্গে মানাবে ভালো। তুমি হচ্ছ হেলদি, ওয়েলদি এ্যাণ্ড ওয়াইস।" তুহিন বাধা দেয়—"না-না-ওসব কি বলছেন।" চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। ত্রিদিব বলে—"তুমি বড্ড বিনয়ী। সহরের সবার ধারণা তোমার বিয়েতে সাহস নেই। তোমার মত ছেলেরিত বিয়ের সাহস থাকা চাই।" তুহিন বোকার মত জিজ্ঞেস করে বসে:—"আমাকে আপনার মেয়ে দিতে সাহস আছেত?"

ত্রিদিব টেবিল চাপড়ায়—"আছে, আলবাত আছে। আমিইত উত্থাপন করেছি। তোমার সব আত্মীয়দের খবর দাও। আর আমিও একটা শুভদিন দেখি কি বলো?"

তুহিন নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে—"দেখুন একবার আমার এক বন্ধু আমার অজ্ঞাতে কোথায় একটা বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিলো। পাত্রীপক্ষ আমার নাম শুনেই তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করেছে।" ত্রিদিব হাসিতে ঘরখানা ফাটিয়ে দেয়—"এটা বুঝলেনা, তখন তোমার হাতে অর্থ ছিলনা তাই। এ সহরেতে তোমায় নিয়ে টাগ অফ ওয়ার চোলছে।" ত্রিদিব পাইপ ধরালো। তুহিন আবার জিজ্ঞেস করে—"তাহলে মেয়ে দিতে আপনার সাহস আছেত?" ত্রিদিব সেনের মনে খটকা লাগে—"আরে তুমি বার বার এক কথা বোলছ কেন? তোমায় মেয়ে দিতে সাহস আছে—একশবার সাহস আছে। কেমন হোলত।"

তুহিন ম্লান হেসে বলে—"তবে শুনুন—আমি ধবলপুরের জমিদারের ছেলে।"

ত্রিদিব একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। চোখদুটো আগুনের মত জ্বলে উঠে। টেবিল থেকে ছোঁ মেরে সুলোচনার ফটোখানা তুলে নিলো! তুহিন শুকনো হেসে বলে—"আহা ওকি করছেন আমি যে ফটোখানাকে ভালবেসে ফেলেছি।"

ত্রিদিব সেন ফটকার মত ফেটে পড়ে—"সেমলেশ। লজ্জা করেনা। ঝির ছেলে হোয়ে আমাদের বংশে বিয়ে করতে চাও?" ত্রিদিব সেন গজ গজ করতে করতে বের হয়ে গেল। রাস্তায় হাঁটছে আর মুনসেফ ভাবছে বাড়ীতে গিয়ে গঙ্গার জলে ফটোখানাকে শুদ্ধ করে নিতে হবে।

ম্যালেরিয়া
৩৫ মিলিমিটার সাউণ্ড ফিল্ম্,
৩ রীলে সম্পূর্ণ

অবলম্বন

(গল্প)

শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ

পশ্চিম বাংলার একটি গ্রাম। গ্রামের নাম কুমারপুর। সবাই এখানে কুমোর। একপাশে একটি নদী ও আর একপাশে বন। মাঝখানে শুধু এই কয়েক ঘর কুমোর একটি শান্ত পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। মেয়েরা নদীর তীর থেকে নিয়ে আসে নরম মাটির তাল। পুরুষরা চাকা ঘুরিয়ে সেই তালকে দেয় নানান রূপ। তাদের কঠিন পেশী বহুল হাতের চাপে ও হাল্কা মুগুরের আগাতে স্থূল মাটির পিণ্ডটা পাত্‌লা ও মসৃণ হ'য়ে ওঠে। দূর হ'তে শোনা যায় এই প্রতিক্রিয়ার—শব্দ ঠক্ ঠক্ গট্ গট্—কুমোরেরা হাঁড়ি পিট্‌ছে। পেটান শেষ হলে মেয়েদের হাতে আবার ফিরে আসে মাটির হাঁড়ি, কলসী, মালসা, খুরী, ভাঁড়। আলাদা করে সাজিয়ে রাখতে হয় একটির পর একটি। কোন রকমে একটির সঙ্গে আর একটির সংস্পর্শ ঘট্‌লে সব পরিশ্রমই মাটি, মাটি আবার তার স্বাভাবিক রূপ নেবে। মেয়েরা বোধ হয় পুরুষদের চোখে বেশী সাবধানী। তাই এই কাজের ভারটা তারাই নিয়েছে। শুধু তাই নয়, কাঁচা মাটিকে পাকা করবার ভারও তাদের। ভাটিতে হাঁড়ি সাজিয়ে কাঠের যোগাড় মেয়েরাই করে। ভাটি? জঙ্গলের ধারে, মানুষের বসতি থেকে দূরে শুধু একটা চালাঘর। মেঝেটা খুঁড়ে গভীর করে নাম দেওয়া হয়েছে ভাটি। ভাটির গহ্বরে কাঠ ও শুকনো পাতার স্তরের উপর সাজিয়ে দেওয়া হয় কাঁচা মাটির জিনিষ। মেয়েরা ধরিয়ে দেয় আগুন। জঙ্গলের হাওয়ায় আগুন জ্বলে লাল হয়ে ওঠে। মেয়েদের মুখে তার লাল আভা পড়ে। পোড়া মাটিও হয় লাল। তারপর লাল আগুন নিভে আসে। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে জীবন ধারণের অপরিহার্য সরঞ্জাম।

সব দেশেই আছে সাধারণের মধ্যে দু'একটা অসাধারণ। কুমারপুরের কুমোরদের কর্ম'ঠ জীবন যাত্রার মধ্যে দ্বারিকানাথ ওরফে দুয়ারী পালের ঘরটা অসাধারণ। খুব বড় না হ'লেও মাঝারী রকম চালাটার নিচে বেশ লম্বা একটি বারান্দা। একটি ছিটে বেড়ার দেয়াল দিয়ে সেটাকে দু'ভাগ করা হ'য়েছে। দূর থেকে মনে হ'বে যেন পাশাপাশি দু'টি ঘর। তার একটাতে বাইরে থেকে দেওয়া আছে বাঁশের কপাট, আর একটাতে কাঠের। কাঠের কপাট দিয়ে বারান্দার একটা ভাগে ঢুকলে ভিতর দিকে আর একটা ছোট ঘরও পাওয়া যাবে। এই ঘর ও বারান্দার ভাগটা নিয়ে দুয়ারীর বসবাস। বারান্দার আর একটা ভাগে বাঁশের কপাট দেওয়া শূন্য জায়গাটায় একধারে পড়ে থাকে একটি অব্যবহার্য কুমোর চাকা। এককালে দুয়ারীর বাবা সেটা ঘোরাত। সে মারা যাওয়ার পর ওতে আর হাত পড়েনি। দুয়ারী অক্ষম, দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগী। কোন রকমে ধীরে ধীরে লাঠি ধরে হাঁটে। বিয়ে তাকে কেউ দিতে চায় না। সংসারে তার বোন বাসনা ওরফে বাসি ছাড়া তার আর কেউ নেই। বাসি তার অবস্থাটাকেও স্বজাতির নাম দিয়েছে, সে কুমারী। তাকে বিয়ে করতে অনেকে হয়ত চায়। কিন্তু, সে দাদাকে ফেলে রেখে শ্বশুর-বাড়ী যাওয়ার কথা ভাবলে ভ'য়ে কেঁপে ওঠে। দুয়ারী বলে,—"বাসি! এমন একটা ছেলে পাওয়া যায় না যে তোকেও বিয়ে করে আর আমারও ভার নেয়?" বাসি উত্তর দেয় না। রাগে গর-গর করতে করতে একটা খড়ের দড়ি নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। দূর থেকে মুখ ফিরিয়ে বলে,—"আবার সুরু করেছ? চল্লুম তবে জঙ্গলে, আর ফিরছিনা।" দুয়ারী তার পঙ্গু দেহটাকে দুলিয়ে হাসে। জানে, বাসির ওটা রহস্য। জঙ্গল থেকেত তাকে পাতার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসতেই হ'বে। নইলে কালকের ভাতের যোগাড় হবে কি করে? কালত আর এখানে হাঁড়ির হাট বসবে না যে বাসি গাঁয়ের অন্য কুমোরদের হাঁড়ি নিয়ে বেচে আস্‌বে। কাল যে সোমবার, হাটত বসে হপ্তায় একদিন, বৃহস্পতিবার। বাকি ক'টা দিন বাসি জঙ্গল থেকে শালপাতা এনে কাঠি দিয়ে সেলাই করে। তারপর পাতার বোঝা মাথায় নিয়ে দু'ক্রোশ দূরে সহরে কোন ময়রার দোকানে বেচে আসে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই কাজই করে বাসি। সহর থেকে ঘরে

কয়লা কাঠ এক বিষম সমস্যা

কয়লা ও জ্বালানি কাঠের সমস্যা নেই এমন লোক খুবই কম। দুটো জিনিসই এখন দুষ্প্রাপ্য। আর পাওয়া গেলেও তা বাড়িতে বয়ে নিয়ে আসা এক বিরাট ব্যাপার। কিন্তু এক কাপ চায়ের আন্দাজ জল গরম করতে কয়লা বা কাঠ কতোই বা লাগে! অথচ এক কাপ ভালো চা পেলে কী না হয়! চিন্তাভাবনা এক মুহূর্তে দূর হয়ে যায়, তার জায়গায় আসে ফুর্তি, তৃপ্তি আর পরিপূর্ণ শান্তি। যুদ্ধজনিত নানা অসুবিধের মধ্যে যখনই জীবন দুর্বহ মনে হবে তখনই এক কাপ চা খেলে বুঝতে পারবেন কতটা এর ক্ষমতা।

IK 237

ফিরে আসে সন্ধ্যার সময়। সমস্ত দিনটা পঙ্গু দুয়ারী দুয়ার আগলে বসে থাকে। বাসি সন্ধ্যার পর রান্না করে। তারপর খাওয়া ও শোয়া। এই নিয়মে এদের জীবনযাত্রা চলে। কখনও কোন ব্যাতিক্রম হয়নি। একঘেয়ে মনে হয় না। দু'জনাই এতে অভ্যস্ত।

হঠাৎ এক বৈচিত্র দেখা দিল। সেবার আশ্বিনের শেষে খুব ঝড় হয়ে গেল সপ্তমীর দিন। এ অঞ্চলে বিশেষ ক্ষতি হ'ল না, শুধু জঙ্গলের অনেক শাল-গাছ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বাসি সহরে পাতা বেচতে গিয়ে শুনে এল যে, দক্ষিণ অঞ্চলে নাকি বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। কুমারপুরের মোড়লও শুনে এসেছে যে, এমন ঝড় নাকি পৃথিবীতে আর কখনও হয় নি। দুয়ারী বলে,—"এবার ত তোকে কিছু খড় অন্ততঃ যোগাড় করতে হয় বাসি। দেখেছিস চালাটার অবস্থা। যেটুকু ছিল তাও আর নেই।" বাস্তবিকই চালাটাতে কাঠ, বাঁশ ও খড় তখনও কিছু কিছু ছিল কিন্তু, তা দিয়ে রোদ জল বাতাসের কোনটাই আট্‌কান যায় না। বাসি বলে, "দেখি, ভূষণাকে বলে, চারটি খড় দিতে পারে কিনা? কিন্তু মোড়ল হয়ত রাগবে।"

ভূষণা কুমারপুরের মোড়লের ছেলে। বাসিকে অসময়ে সাহায্য করে। বাসিও তার বিনিময়ে ভাটিশালে ভূষণার হাঁড়ি-পাঁজায় পাহারা দেয়। আবার কোন সময় হাটেও হাঁড়ি বেচে। মোড়লের মনোভাব তাতে কঠিন হ'য়ে ওঠে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। পরোপকার ও তার প্রয়োজনীয়তা এই মোড়লের ৬২ বৎসর বয়সের মধ্যে সম্পূর্ণ অজানা। আর, তা ছাড়া এই সোমত্ত মেয়েটাকে গাঁয়ের বুড়োরা আদৌ দু'চোখে দেখতে পারে না।

শরতের দুপুর বেলার কড়া রোদ। ঘরের মধ্যে গুমোট গরম। হয়ত আবার বর্ষা নামবে। আবহাওয়াটা সকলকে ঘর্মাক্ত করে তুলেছে। কুমোরদের হাঁড়ি পেটার শব্দও একটু কম। বাসি গেছে সহরে পাতা বেচ্‌তে। একা দুয়ারী রোগ ও রোদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে লাঠি ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল সামনের গাছ-তলায়। দূরে দেখা গেল বিদেশী পথিক। পরণে ধুতি, মাথায় পাগড়ীর মত করে গামছাটা বাঁধা, কাঁধে একটা কাপড়ের পুটুলী ঝোলানো। এগিয়ে আসছে দুয়ারীরই ঘরটার দিকে। কাছাকাছি এসে বল্লে,—"পুকুর এখানে আছে? জল খাব।" দুয়ারী বলে "এধারে ত পুকুর নাই। দূরে নদী আছে। জল ঘরেও আছে কিন্তু আমার দেওয়ার মত হাত নেই।" বিদেশী পথিক করুণ নয়নে দুয়ারীর অর্ধ-গলিত আঙুলগুলি দেখে। এদিকে তেষ্টায় তার গলাটা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে উঠেছে। দুয়ারী প্রশ্ন করে,—"কি জাত?" বিদেশী উত্তর দেয় "কুমোর।" দুয়ারীর রোগ-ক্লিষ্ট মুখে হাসি আসে। "স্বজাতি! এস এস, ঘরে এস। জল ঐ কলসীতে রয়েছে—নিজেই একটু গড়িয়ে নাও না।"

কাট-ফাটা রোদে বুকফাটা তৃষ্ণা সব সংকোচ কাটিয়ে বিদেশীকে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় কুষ্ঠ-রোগীর ঘরের ভিতর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর বিদেশীর চোখে অদ্ভুত ঠেকে। কলসী থেকে জল ঢেলে আকণ্ঠ পূর্ণ করে অজ্ঞাতে উচ্চারণ করে "আঃ"। দুয়ারী বলে,—"কদ্দূর থেকে আস্‌ছ?"

বিদেশী একটা দক্ষিণ দেশের নাম করে। বলে,—সে দেশে আর কিছুই নেই। ঝড় আর বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ করে যারা বেঁচেছিল অনাহারে ও মহামারীতে তারাও আর বেঁচে নেই। সে তাই পালিয়ে এসেছে। সে কুলদা-কুমোর নামে তাদের দেশে খুব সুনাম পেয়েছিল। লোকে জানে,—কুলদা ইচ্ছা করলে মাটির হাঁড়িকে লোহার মত শক্ত করতে পারে। আর শুধু কি হাঁড়ি? কুঁজো, কেট্‌লি, কল্‌কে প্রভৃতি সৌখীন জিনিষও সে এই মাটি দিয়েই গড়তে পারে। একবার তাদের দেশে মেলা হয়েছিল, তাতে এই সব জিনিষ দেখিয়ে সে মেডেল পেয়েছিল। কিন্তু, এখন কি করবে সে? সে দেশে যে এখন বাসই করা যায় না। তাই সে বেরিয়েছে অন্য দেশে আশ্রয়ের খোঁজে।

শুন্‌তে শুন্‌তে দুয়ারী অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। ভাবে, একে এখানে রেখে দিলে হয়। বলে, "দেখ তুমি এইখানেই থেকে যাও না—ক্রোশ দুই দূরেই ত সহর—তুমি এইখানে থেকেই ব্যবসা চালাও না—আমারও ত আর কেউ নেই।" বিদেশী জবাব দেওয়ার আগে ঘরের সামনে দেখা দেয়

বাসি। পরণের সাড়ীর খানিকটাতেই চাল ডাল প্রভৃতি বেঁধে সহর থেকে ফিরে এসেছে। সে হঠাৎ এই অপরিচিত লোকটিকে দেখে অপ্রচুর পরিধেয় দিয়ে তার রূপ-যৌবনকে ঢাক্‌বার চেষ্টা করে। দুয়ারী ঘর থেকে বেরিয়ে বাসির সঙ্গে একটু তফাতে যায়। আস্তে আস্তে কথা হয় দু'জনার। তারপর তারা ঘরে ফিরে আসে। দুয়ারী বলে "কুলদা, তোমার থাকাই ঠিক হ'ল। ওটি আমার বোন—ও আর ক'দিন? ভিন্‌গাঁয়ে বিয়ে হ'লেত একলাই তখন থাক্‌বে দাদা!" বাসি ছুটে বারান্দা থেকে ছোট ঘরটায় ঢুকে কাপড়ে বাঁধা চাল-ডাল সশব্দে ঢেলে দেয় হাঁড়িতে। কুলদা থেকে যায় বাঁশের কপাট-দেওয়া বারান্দাটাতে।

দলের মধ্যে যেমন নূতন লোকের আগমনটা পুরাতনেরা সইতে পারেনা। কুমারপুরের কুমোরদের মধ্যেও ঠিক তাই। তারা এই বিদেশীকে সাহায্য করা দূরে থাক্, তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। প্রথম দিনই কুলদার হাতের কাঁচা মাটির জিনিষ ভাটিতে পোড়াতে নিয়ে এসে বাসি মোড়লের ধমকে চমকে উঠল। মোড়ল বলে, "গাঁয়ের কুমোর ছাড়া কেউ এ ভাটিতে মাটি পোড়াতে পাবে না।" কথাটা বাসি সহ্য করতে পারল না। তার বাবাও ত এই গাঁয়েরই কুমোর ছিল। সেই সূত্রে তাদের কি কিছুই অধিকার নেই! অধিকারের কথা মনে হতেই গলার স্বরটা চড়া পর্দায় বেরিয়ে আসে। বাসি কান্না ও রাগ-মিশ্রিত কণ্ঠে চীৎকার করে—"আজ আমার বাবা নেই বলেইত এমন জুলুম করতে পারছ মোড়ল। কিন্তু, এর কি বিচার নেই? যারা এখন জুলুম করছে তারা কি মরবে না? মোড়ল মরলে মোড়লের মেয়ের উপরও কি ভগবানে জুলুম করাবে না।" মোড়লের মেয়ে কাপড় জড়িয়ে ছুটে আসে। হাত ও মুখের বিকট ভঙ্গী করে মোড়লের মেয়ে বলে, "তোর মত কি সবাই বাপ-খাকী ল্যা।" তারপর বাসির মুখ থেকে ছুটতে থাকে "ছেলে-খাকী" "পোড়ারমুখী" ইত্যাদি অনেক উত্তেজক শব্দ। ক্রমে চীৎকার, গালিগালাজ ও কান্নায় কুমারপুর মুখরিত হ'য়ে ওঠে। মেয়েরা বেরিয়ে আসে। ঝগড়ার ঝড় শ্লীলতাকে উড়িয়ে দেয়। কুমারীরা হ'য়ে

ওঠে ভীমা ভয়ঙ্করী। বাসির দিকে মুখ ভেঙিয়ে বলে, "পাটাবুকির তেজ দেখছ? ডেকে দোব ভূষণাকে।" ভূষণাকে কিন্তু ডাকতে হয় না। সে নিজেই এসে পড়ে। গোলমাল থামানোর চেষ্টা করে। বলে, "যেতে দাও।" মোড়লকে বলে, "বাবা, ভাটিতে দুয়ারীরও মাটি পোড়ানোর অধিকার আছে—মনে কর না দুয়ারীই মাটি পোড়াচ্ছে।" তারপর বাসিকে বলে,—"দে বাসি তোর জিনিষ গুলো।" বাসি ভাটিতে ঢোকে। বড় বড় চোখ করে রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে ফিরে যায় মোড়ল। মেয়েরা মুখে কাপড়-চাপা দিয়ে হাসে।

সময় সব কথাই ভুলিয়ে দেয়। বাসির গালাগালি মোড়ল ও ভোলে। কুলদা নির্বিঘ্নে চালায় কুমোর-চাকা। ঘরের চালে নূতন খড় দেওয়া হয়। দুয়ারী সগৌরবে চেয়ে থাকে—বারান্দাময় কালো মাটির কুঁজো, কেট্‌লী, কল্‌কে প্রভৃতির দিকে। এক-পাশে পৈত্রিক কুমোরশালে বিদেশীর হাতে ঘোরে কুমোর-চাকা। এক সময় দুয়ারীর বাবার হাতে সেটা ঘুরত। এখন একমনে কুলদা সেখানে তার সবল হাতের চাপে মাটির পিণ্ডকে দেয় নানান আকৃতি। হাতের চাপ ও চাকার গতির সঙ্গে সঙ্গে বাহুর মাংস-পেশীগুলো ফুলে ফুলে নাচে। ছিটে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে বাসি।

বাসি কিন্তু তার সাবেক শালপাতার ব্যবসাটা ছাড়ে না। আগেকার মত সে বোঝা নিয়ে সহরে যায়, কিন্তু একা নয়। পাশে পাশে চলে বাঁক কাঁধে কুলদা। বাঁকের দুই দিকে দড়ির জালে বাধা কালো মাটির কুজো প্রভৃতির ফাঁক দিয়ে সামনে থেকে মানুষটাকে দেখা যায় না। পাশেও আবার ঘাড় বেঁকিয়ে দেখবার উপায় নেই। ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গুর পাত্র-গুলোতে ঠোকাঠুকি হ'য়ে অনিষ্ট ঘটতে পারে। সাবধানে পথ চলে কুলদা। তবুও নির্জন পথে বাসির সঙ্গে দু'একটা কথা হয়। কুলদা বলে,—"আজ আবার সেই পাঞ্জাবী ঠিকেদার ডেকেছে।" বাসি বলে, "কেন?" কুলদা দু'এক পা এগিয়ে থেমে যায়। তারা তখন একটা খালের ধারে এসে পড়েছে। কাঁধের বাঁকটা সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে কোমরে বাঁধা গামছাটা খুলে ঘাম মুছতে মুছতে কুলদা বলে, "ঠিকেদার বলে কি জান? বলে, মাটির কেটলি ও পেয়ালা তৈরী করতে। সে তার বাসার ধারেই সব বন্দোবস্ত করে দেবে, মায় ভাটি-শালার। তার বাসাতেই আমাকে আলাদা ঘর দেবে থাকতে। যুদ্ধের জন্য জিনিষ-গুলো মাসে হাজার হাজার জোগাতে হবে। তাতে তারা হাজার হাজার টাকা দেবে।" বাসি অবাক হ'য়ে কুলদার কথা শোনে। বলে, "তবে তাই কর না কেন?"

সহরে ঢুকে বাসি ও কুলদা যে যার খদ্দেরের খোঁজে ভিন্ন পথ ধরে। বাসি তার ময়রার দোকানে পাতা দিতে এসে দেখে ভূষ্‌ণা সেখানে বসে আছে। বাসিকে দেখে সে অকারনে হাসে। বলে, "মুড়কি খাবি বাসি?" বাসি 'না' বলে এগিয়ে চলে। ভূষণা তার পেছু নেয়। অকারণে বাসির পাশে গা-ঘেঁসে চলে। বাসি বলে, "মরণ আর কি! গায়ে পড়বি যে।" ভূষণা একেবারে ঢলে পড়ে হাস্‌তে হাস্‌তে গুন্‌ গুন্‌ করে গান ধরে,—"মরিব মরিব সখি—।" এমন সমন অন্য পথ দিয়ে আসে কুলদা। বাসি গালাগাল দিয়ে ভূষণাকে দূর করে দেয়। ভূষণা কুলদার দিকে চেয়ে থাকে। চোখ দু'টো তার লাল। নেশা করেছে বোধ হয়। ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে এসে কুলদাকে বলে, "দেখবি না—দখ্‌নি ভূত!" দেশ ও জাতকে ব্যঙ্গ করলে সকলেরই রক্ত গরম হয়। কুলদাও ক্ষেপে ওঠে বাঁকটাকে ভূষণার দিকে বাড়িয়ে দেয়। ভূষণা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নেয় আধ-খানা ইট। রক্ত-গঙ্গা হয় আর কি? সহরের দর্শকেরা ভিড় জমায়, ঝগ্‌ড়া থামিয়ে দু'জনাকে তফাৎ করে দেয়। ভূষ্‌ণা চলে যাবার সময় শাসিয়ে যায়, "আচ্ছা, টের পাবি এবার মজাটা।" বাসির বুকটা ভয়ে কেঁপে ওঠে। কুলদাও বিপন্ন হয়ে পড়ে। দর্শকরা ক্রমে ক্রমে সরে যায়। কুলদা বাসির কাছে এগিয়ে এসে বলে, "আমি আর তোদের গায়ে ফিরব না বাসি, আমি এখানেই কণ্ট্রাক্টারের বাসায় থাকব তুই একাই ফিরে যা।" ভয়-ব্যাকুল চোখ দু'টি তুলে বাসি বলে,—"কেন?" কুলদা বলে,—আমাকে যখন তোদের গায়ের লোক চায় না তখন জোর করে নিজের ও তোদের বিপদ

ডেকে এনে লাভ কি ?" বাসি বলে, "আমি আজ একলা ফিরি কি করে ? পথে যদি ঐ বজ্জাতটা একলা পেয়ে কিছু করে ?' বিদ্রূপ মেশানো স্বরে কুলদা বলে, "এতদিন ত একলাই ছিলি। আর আজ না হয় সঙ্গেই গেলাম ! কিন্তু কাল—পরশু ?" তারপর বাসির হাত দুটি ধরে গম্ভীর গলায় বলে, "যেমন ছিলি তেমনি থাক্। আমায় ভুলে যাস্ বাসি।" বাসির বুকটা কাঁপে, চোখটা ছল-ছল করে। বলে, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।" কুলদা বলে, "দাদাকে ছেড়ে ঠিকেদারের বাসায় আমার কাছে থাকতে পারবি ! বাসি অজ্ঞাতে হেসে ফেলে। বলে, "কেন, দাদাকেও নিয়ে আসব।" কুলদা কথা কয় না। চুপ করে ভাবে। তারপর আবার পথ চলে তারা। মুদীর দোকানে চাল-ডাল কিনে মনোহারী দোকান হ'য়ে গাঁয়ের পথে পাড়ি দেয়।

দুয়ারী কুটির দুয়ারে ঠিক তেমনি প্রতীক্ষাই করে। বেলা পড়ে আসে। দূর শালবনের মাথায় ছড়িয়ে যায় সোনালী রোদ। মাঠের বাতাস সোনালী ধুলো ওড়ায়। ধুলো-পায়ে দুয়ারে আসে বাসি। দূরে দেখা যায় গামছা-বাঁধা কুলদার মাথা। অস্তাচলের রঙে সব রঙীন।

দুয়ারী বলে,—"বাসি, আজ এত দেরী যে ?" বাসি তখন ছোট ঘরটার মধ্যে শাড়ীর খুঁট থেকে বার করছে কয়েকটি রঙ-বেরঙের টিপ। সহর থেকে ফেরার পথে কুলদা মনোহারী দোকান থেকে পছন্দ করে কিনে দিয়েছে। বাসি কি যেন ভাবতে থাকে ! দুয়ারীর কথা শুনতে পায় না। দুয়ারী ধমক দিয়ে ওঠে,—"শুনতে পাস্ নে পোড়ার মুখী ?"

বাসি চম্‌কে ওঠে। বুকটা কাঁপে। গলায় জড়তা আসে। হাতের টিপ-গুলোকে চালের হাঁড়িতে ফেলে দিয়ে বলে,—"কি বলছ ?"

"বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। সেই দুপুর থেকে ঠায় একলা বসে তোর মরণ কামনা করছি, বলি আজ এত দেরী হ'ল কেন ?"

বলতে বলতে দুয়ারী ছোট ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ে। বাসি বলে "আজ ময়রা বলছিল তার আরও অনেক

আদর্শবাদী রতীন্দ্রনাথ

যাঁর মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য
চিত্র ও নাট্যামোদীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে
প্রকাশিত হলো রূপমঞ্চ রতিন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা।

ফটো : মডার্ণ ইলেকট্রিক ষ্টুডিও

রতীন্দ্রনাথ ও রাণীবালা।

অধুনালুপ্ত নাট্য-ভারতী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত **'কঙ্কাবতীর ঘাট'** নাটকের একটী দৃশ্যে।

রূপমঞ্চ রতীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা

ফটো : ডি, রতনের সৌজন্যে।

শালপাতার ঠোঙা চাই। আজকাল নাকি যুদ্ধের জন্যে সহরে অনেক লোকজন বেড়েছে। তৈরী ঠোঙা না হ'লে সে ঠিক ব্যবস্থা করতে পারছে না। পারবে দাদা তৈরী করতে? আমি কাঠি টাঠি সব ভেঙে আনব। ঐ মুখপোড়া ময়রাই ত আজকে এই সব কথাতে দেরী করে দিল।"

দুয়ারী উত্তর দেয় না। নীরবে তার আঙুলগুলার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। ছিটে বেড়ার ওপাশে কুলদার কাশি শোনা যায়। বলে,—"কি মতলব হচ্ছে হে ভাই বোনে?" দুয়ারী এবারও উত্তর দেয় না। কিসে যেন বিভোর হ'য়ে থাকে।

তারপর, শীতের রাত সুরু হতে না হতেই পল্লীর কলরব থেমে আসে। হাঁড়ি-পেটার শব্দও নাই। সমস্ত কুমারপুর নিঝুম। খাওয়া দাওয়া সেরে বারান্দায় কাঁথাটাতে শরীর ও মুখ ঢেকে খাটিয়াতে শুয়ে পড়ে দুয়ারী। ঘুমের ঘোরে ঘায়ের যন্ত্রণা থাকে না। আঙুল-গুলির অক্ষমতা ভোলে। স্বপ্নে গড়ে চলে লক্ষ শালপাতার ঠোঙা।

ছোট ঘরটার মধ্যে বাসি শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে প্রায় অচেতন হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকে। অবচেতন মনে ফুটে উঠে নানা আকাঙ্খার বিচিত্র চিত্রপট। মনে হয়, কার যেন দুটি সবল বাহু এক মূর্তিমান অসহায়তাকে বেষ্টন করে আছে।

ছিটে বেড়ার দেওয়ালের ওধারে কুঁজো, কেটলি কলকের স্তূপ। তারই একপাশে শুয়ে থাকে কুলদা, বাঁশের কপাটটায় শিকল দেওয়াও হয় না। সে জানে, চোরে আর কি নেবে? টাকাকড়ি যা কিছু সব ত বাসির কাছে রেখে দিয়েছে। আর, এই মাটির জিনিষে হাত দিতে চোরের গুরুর নিষেধ আছে। পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে থাকে যুবক। মনের মধ্যে জেগে থাকে ভবিষ্যতের আশা। স্বপ্ন দেখে,—মিলিটারী ঠিকাদারকে হাজার হাজার মাটির জিনিষ বেচে সে রীতিমত বড় লোক হ'য়ে উঠেছে—সহরে তার মস্ত বড় বাড়ী—সামনে একটা বাগান—বাগানের ধারে পুকুর—পুকুর ঘাটে—ও কে? বাসি নয়? —হ্যাঁ বাসিই ত—!

খুট করে একটা শব্দে বাঁশের কপাটটা খুলে যায়। মুখে কাপড়ের গালপাট্টা এঁটে সাত আটটা যোয়ান ঢুকে পড়ে। কুলদা উঠ্‌বার আগেই দু'জন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গলাটা টিপে ধরে মুখে কাপড় গুঁজে দেয়। একের শক্তি বহুর কাছে হার মানে। গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে কুলদা। পাশেই লাঠির ঘায়ে গুঁড়া হয়ে যায় তার ভবিষ্যতের আশা, সযত্নে গড়া শিল্প-সম্পদ। শব্দে চম্‌কে ওঠে ছিটে-বেড়ার ওধারে দুয়ারী। ধড়-মড় করে উঠে পড়ে বাসি। বারান্দা থেকে বাইরে আসবার দরজাটা খুলবার চেষ্টা করে। দেখে বাইরে থেকে সেটা বন্ধ। চীৎকার করতে থাকে বাসি। ছিটে-বেড়ার এধারে কে গর্জন করে উঠে,—চুপ্ কর। স্বরটা যেন পরিচিত মোড়লের ছেলে ভূষণার মত। চীৎকার করে কাঁদতে থাকে বাসি। এধারে তখন সবই গুঁড়া হয়ে গেছে।

যাবার সময় আততায়ীদের মধ্যে একজন কুলদার মুখে এক লাথি মেরে বলে,—"কেমন শা—দখ্‌নি ভূত?" কুলদার তখন হাত-পা বাঁধা।

বহুকষ্টে হাতের বাঁধনটাকে দাঁতের সাহায্যে খুলে কুলদা বারান্দা থেকে বেরিয়ে আসে। যারা এসেছিল তারা তখন চলে গেছে। কুলদা বাসিদের বারান্দার কপাটটা খুলে দেয়। জলন্ত কেরোসিনের ডিবা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে বাসি। কুলদার বারান্দায় ঢুকে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে। হাতের আলোটার মত তার বুকটাও দাউ দাউ করে জ্বলে। সমস্ত কুমারপুর নিস্তব্ধ। কেউ আসে না, সাড়া দেয় না। বাকি রাতটা জেগেই কাটায় গ্রামের প্রান্তে এই তিনটি প্রাণী। কুমারী, কুষ্ঠে ও কুলদা।

সকাল হ'তে না হ'তেই বাসি ছুটে যায় মোড়লের ঘরে। ভূষণা বাইরেই ছিল, বাসিকে দেখে একটা অশ্লীল ভঙ্গী করে। বাসি সোজা ঘরের মধ্যে ঢোকে। দেখে শীতের ভোরে গাঁয়ের সব যোয়ানগুলোই জড় হয়েছে। মাঝখানে আগুন রেখে তারা শরীরগুলো গরম করে নিচ্ছে। বাসিকে দেখে তারা হো-হো করে হেসে ওঠে। ছুটতে

ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বাসি। বাইরে উত্তরেব হাওয়াটাও তখন হোঃ হোঃ করে হাসে।

সব শুনে দুয়ারী বলে, "কুলদা, আর তোমায় ভাই রাখতে পারি না। ভিন্ গাঁয়ে যাও। গুণী লোক তুমি। তোমার কিছু অভাব হ'বে না।" কুলদা একটু ইতস্ততঃ করে। বাসির দিকে একবার তাকায়। বলে—"হুঁ, চলি তবে?"

গামছাটা মাথায় বেঁধে আবার বেরিয়ে পড়ে বিদেশী। বাসির কাছ থেকে সঞ্চিত টাকাকড়ি গুলাও নিতে ভুলে যায়। দুয়ারী ধমক্ দেয়,—"কোথা যাচ্ছিস্ পোড়ার মুখী।" বাসি থামে।

দিনের আলোতে কুমারপুরের কাজ চলে। আবার চারিদিকে শোনা যায় হাড়ি পেটার শব্দ। হেঁট মাথায় হেঁটে যায় কুলদা। কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। তবুও এগিয়ে চলে।

তারপর,—আবার আসে রাত। শীতের রাতের পূর্ণিমা। সবাই ঘুমায়। ঘুমন্ত গ্রামটার ওপর জেগে থাকে শুধু মুক্ত আকাশের চাঁদ। হঠাৎ কুকুর-ডাকার শব্দে দুয়ারীর ঘুম ভেঙে যায়। সে একটু নিস্তব্ধ থেকে দু'একবার কেশে গলাটাকে একটু পরিষ্কার করে নেয়। চোখের পাতা না খুলেই "ও কিছু না, আর কোন ভয় নেই বাসি, তুই ঘুমো" বলে দুয়ারী আবার পাশ ফেরে। কারণ সে জানে যে শীতের রাতে আকাশের চাঁদ দেখে মাটির কুকুর চীৎকার করে—চাঁদের দিকে চেয়ে ছুটে—চাঁদটাকে মনে করে শত্রু। একটু বাদে আবার কুকুর ডেকে ওঠে। এবার দূরে, ভাটিশালার দিকে,—গ্রাম ছাড়িয়ে। দুয়ারি ডাকে,—বাসি। কোন সাড়া পাওয়া যায় না। আবার ডাকে। চোখটা খুলে খাট থেকে উঠে লাঠিটা নিয়ে ছোট ঘরটায় ঢুকে পড়ে। দেখে বাসির শয্যা শূন্য। দুয়ারীর বুকটাও শূন্য মনে হয়। সেখান থেকে শুধু বেরিয়ে আসে বিকৃত কণ্ঠের ডাক্—বাসি! বাসি। বিজন বনের প্রান্তে সহরের পথ ধরে বাসি তখন এগিয়ে চলেছে বিদেশীর খোঁজে। দুয়ার খুলে লাঠি ধরে বেরিয়ে আসে দুয়ারী। জ্যোৎস্নায় চোখ মেলে দেখে। কাউকে দেখতে পায় না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে লাঠি ধরে ভাটিশালার দিকে এগিয়ে চলে। মনে করে হয়ত বাসি অনেক আগেকার মত আজ রাতে আবার ভাটিশালে ভূষণার হাঁড়ি-পাঁজায় পাহারা দিতে গেছে। ভাটি-শালার সামনে এসেও কাউকে দেখতে পায় না। ভাটি-শালার চালার মধ্যে সে ঢুকে পড়ে। দেখে সেখানেও কেউ নেই,—শুধু হাঁড়ির পাঁজাটা গন্‌গনে আগুনে লাল হ'য়ে আছে। দুয়ারীর কপালটা কুঁচকে উঠে, চোখ দুটো বড় হয়। এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে সে লাল আগুনের দিকে। জলন্ত আগুনের উপর ঝুঁকে পড়ে। দেখতে দেখতে সেই আগুনের মধ্যে যেন ভেসে ওঠে এক-জোড়া মুখের ছবি। কুলদার আর বাসির। দুয়ারীর চোখ দুটোও জলে উঠে। দুয়ারী আর ভাবতে পারে না। কাঁপতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে মাথাটা বোঁ ক'রে ঘুরে যায়। হাত থেকে খসে পড়ে শেষ অবলম্বন লাঠি। অজ্ঞান হ'য়ে আগুনের উপর পড়ে যায় দুয়ারী।

সকালে কুমোররা ভাটিশালায় এসে ভয়ে শিউরে উঠে। দেখে, হাড়ির পাঁজার উপর পড়ে আছে আস্ত একটি নর-কঙ্কাল। মাটির হাড়ির উপর মানুষের হাড় সনাক্ত করা যায় না। মেয়েরা বলে,—কুমারীর। পুরুষরা বলে—সেই বিদেশীর। মোড়ল বলে,—যারই হোক্ দেবতার রোষ পড়েছে ভাটি-শালে, ভাটি বদলাই চল্।

সম্পাদকের দপ্তর

তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (ডিকসেন লেন, কলিকাতা)

'উদয়ের পথে' বাণীচিত্র গ্রহণ করবার সময় "Camera Crane'এর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা আপনি জানতে চেয়েছিলেন। 'উদয়ের পথে'র পরিচালক শ্রীযুক্ত বিমল রায়কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম, 'উদয়ের পথে' বাণীচিত্রে Camera Crane এর সাহায্য গ্রহণ করা হয় নি।

নেপাল মুখোপাধ্যায় (সাঁনবান্ধা, বাঁকুড়া)

আপনাকে একটী চিঠি দিতে বাধ্য হলুম এই জন্য যে, বাংলা চিত্রে অশ্লীলতার জন্য দর্শক সমিতি যে প্রতিবাদ করেছেন সে বিষয়ে দু' একটা কথা বলতে চাই। 'অভিনয় নয়'—এর যে দৃশ্যটি আমাদের চোখে অশ্লীল বলে লেগেছে, সেরকম দৃশ্য কি আর কোন বইয়ে নেই? অর্থাৎ বাংলা ছবিতে না থাকতে পারে কিন্তু কোন বিদেশীয় ছবিতে কি নেই? অথচ আমরা সকলেই সে সমস্ত বিদেশী বই দেখি এবং তার প্রশংসা করতেও দ্বিধা বোধ করি না। অশ্লীল বলতে 'অভিনয় নয়'ের একমাত্র অর্ধেক বুকখোলা পূর্ণিমার কথাই মনে হয়, অথচ আমরা নিশ্চয়ই 'কিসমেট' 'গ্যাসলাইট' ইত্যাদি বই দেখতে ভুলিনি। তাতে কি ঐরকম কিছু অশ্লীলতা নেই? অথচ ঐ সমস্ত বইয়ের জন্য বাংলাদেশে অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হলো না। আমি আমার যুক্তিতে ভুল হতে পারি এবং সেই জন্যই আপনার নিকট হতে একটা উত্তর আশা করি।

: বৈদেশিক ছবিতে অশ্লীলতার ছাপ থাকলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে না একথা আপনি কি করে বুঝলেন? শুধু আমরাই নই, যাদের ছবি অর্থাৎ বৈদেশিকেরাও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে থাকেন। সমাজের পরিপন্থী দুর্নীতিমূলক কোন ছবিকেই কোন সুরুচিসম্পন্ন দর্শক কোন দিনই সমর্থন করেন না। তবে কথা হচ্ছে আমেরিকা, বৃটিশ বা অন্যান্য বিদেশীয় ছবিতে যে সব দৃশ্য আমাদের কাছে অশ্লীল বলে মনে হয়, ওদেশীয়দের কাছে তা মোটেই অশ্লীল নয়। যেমন চুম্বন বা ও দেশীয় ঢং-এ নায়িকাদের পোষাক পরিচ্ছদ পরবার ধরণ—আমরা কী প্রকাশ্যে আমাদের চিত্রে মেনে নিতে পারবো? পারবো না এই জন্য যে, আমাদের সমাজে ও ধরণের প্রচলন নেই। ওদেশে আছে। তাই ওদেশীয় ছবিতে এসব দৃশ্য অশ্লীল নয়—কিন্তু আমাদের দেশীয় ছবিতে হাটুর উপরে কাপড় উঠলেই, কী গায়ের ব্লাউজটা (অবশ্য নায়িকার কথাই বলছি) একটু ঢিলে বা ছোট হলেই—আমরা অশ্লীল বলি—কি অনেক-ছবিতে দেখা যায় নায়ক নায়িকাকে পরিচালক চুম্বনের পূর্ব মুহূর্তের জন্য তৈরী করে দৃশ্যটী disolve করে দিলেন—সে সব দৃশ্যে অশ্লীলের ইঙ্গিত বলে ধরে নেবো। ওপারের ঢেউ এসে যদি আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—সেদিন আর একে অশ্লীল বলবো না। বিদেশীয় ছবি যখন আমরা দেখতে যাই ওদেশীয় সমাজ ব্যবস্থার কথা ভুলে যাই না। তাই আমাদের সমাজে সেটা অশ্লীল, বৈদেশিক ছবিতে সেটাকে ফুটে উঠতে দেখলেও প্রতিবাদ করবার কোন প্রয়োজন হয় না।

'গ্যাসলাইট' ছবিটী দেখবার আমার সুযোগ হয় নি। 'কিসমেট' ছবিটী দেখেছি। ছবির টেকনিকের হয়ত প্রশংসা করবো কিন্তু ছবিখানার যে কোন গাম্ভীর্য নেই—এবং মূল থেকে (অর্থাৎ আজ যে রাজা কাল সে ফকির) আগাছাই যে প্রাধান্য পেয়েছে একথা বলতে কুণ্ঠিত হবো না। জাকজমকময় দৃশ্যে—

সংগীত এবং আনুসঙ্গিকে কেবল দর্শক-মন মাতাল করে তোলাই 'কিসমেট' এর উদ্দেশ্য। বৈদেশিক ছবিগুলির একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, নিছক আনন্দ দানের জন্য নৃত্যগীতসম্বলিত চিত্রগুলি ছাড়া কোন 'সিরিয়াস' বা শিশুচিত্রে আমাদের চোখেও অশ্লীলতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধরা পড়ে না।

—হাউ গ্রীণ ওয়াজ মাই ভেলী,—মিসেস মিনিভার, ডিজরেলী, ম্যাডাম কুরী, ড্রাগনসসিড প্রভৃতি চিত্রগুলি যে-মন নিয়ে দেখতে যান, হুপী, রোম্যান স্কাণ্ডালস, সাউথ সিকে' কেন্দ্র করে নৃত্যগীত সম্বলিত চিত্র, কিসমেট প্রভৃতি শ্রেণীর চিত্র কী সেই একই মন নিয়ে দেখতে যান? প্রথমোক্ত ছবিগুলি দেখে এসে ছোট বড় নির্বিশেষে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকের কাছেই পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে থাকেন—দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর ছবিগুলি দেখে এসে যৌবনোচ্ছল মাদকতাময় দৃশ্যগুলির কথা বড় জোর সমবয়স্কদের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে থাকেন। এই ব্যবধানের কথা মনে করে বৈদেশিক ছবির অশ্লীলতা দেখে আমরা দর্শকেরা প্রতিবাদ করি কিনা তার উত্তর আপনি আপনার নিজের কাছেই পাবেন।

ভারতের অন্যতম মুক্তিসাধক জওহরলালজী হলিউড পরিভ্রমণ করে একদিন বলেছিলেন, হলিউড যৌনচর্চারই স্থান। আবার সেই হলিউডের ছবি দেখে তিনি প্রশংসা না করেও থাকতে পারেন নি। যেটা সত্য সেটা সব সময়েই সত্য। বৈদেশিক ছবির অশ্লীলতাও আমরা মেনে নেই না। তবে তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ হয়তো শুনতে পান না এই জন্য যে, বৈদেশিক ছবি আমাদের আলোচনার বাইরে। 'বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি' বা 'রূপ-মঞ্চ' পত্রিকা সর্বপ্রথমে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য কামনা করে। তারপর—অন্যান্য প্রাদেশিক ছবি-গুলির স্থান। বৈদেশিক চিত্রশিল্প উন্নতি লাভ করুক বা না করুক সে জন্য মাথা ঘামানোর মত উদারতা আমাদের নেই।

এখন 'অভিনয় নয়' চিত্র সম্পর্কে দু' একটি কথা বলতে চাই। 'অভিনয় নয়' চিত্রের দৃশ্যাবলী কী আপনার চোখেও অশ্লীল বলে মনে হয় নি। বৈদেশিক ছবির সংগে তুলনা করতে যাবেন না। আপনার বাবা, মা, ছোট ভাই ও বোনেদের নিয়ে এক সংগে দেখতে যেয়ে রুচীতে বাধে কি না চিন্তা করে দেখুন। শনিবারের চিঠির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় চিত্রখানি দেখতে যেয়ে শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারেন নি। শনিবারের চিঠিতে তিনি এক স্থানে উল্লেখ করেছেন—চিত্রখানি দেখবার সময় শৈলজানন্দ যে একজন সাহিত্যিক, এক কথা চিন্তা করে ছবিখানি তাঁকে অন্ততঃ দশবার জুতা প্রহার করেছে। রূপ-মঞ্চের একাধিক বিশিষ্ট পাঠক 'অভিনয় নয়' এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চিঠি লিখেছেন। যেটা অশ্লীল, শুধু আমাদের চোখেই নয় সকলের চোখেই তা ধরা পড়েছে। চিত্রশিল্পের উন্নতি যারা কামনা করেন—শৈলজানন্দের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা রয়েছে, প্রত্যেকেই তাঁর এই হীনতার জন্য ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অর্ধোন্মুক্ত—বা নগ্ন দেহই যে কেবল অশ্লীল বলে পরিগণিত হবে তার কোন মানে নেই। দেখতে হবে পরিচালকের উদ্দেশ্য কী। যেমন মনে করুন, গত দুর্ভিক্ষের কাহিনীকে কেন্দ্র করে যদি কোন ছবি গৃহীত হয়, দুর্ভিক্ষের যথাযথ রূপ নিয়ে পর্দায় যদি অর্ধনগ্ন বা নগ্ন দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের আপনি দেখতে পান, সে দৃশ্যকে অশ্লীল বলে কোন মতেই আখ্যা দেবেন না। কিন্তু পরিচালক যদি দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে যৌন-আবেদনের লোভ সামলাতে না পারেন তখন কী তার উদ্দেশ্যকে খুব সৎ বলে তারিফ করবেন? 'অভিনয় নয়' চিত্রে গণিকালয়ের দৃশ্যে এবং আরো একটী দৃশ্যে পরিচালকের অসদুদ্দেশ্যই ফুটে উঠেছে। তিনি ঘুঙুর পরাবার অছিলায়—এবং গণিকার সুযোগ নিয়ে বা চিঠি না-দেখাবার ভাণ করিয়ে পূর্ণিমা ও রেণুকার যৌন-আবেদনে দর্শকদের আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। তাই এই অসদুদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানতে পারলুম, পরিচালক নিজেও এ বিষয়ে অবহিত—(এবং অবহিত ছিলেন বলেই Press Showতে ঐ দৃশ্য দেখান হয়নি) তিনি নাকি একজন বন্ধুর কাছে বলেছেন, "জানি 'শহর থেকে দূরে' থেকে এক স্তর নীচে আমি নেমে গেছি, আমি জেনে শুনে এটা করেছি, ছবির কাটতির জন্যে" এই শোনা কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দকে 'জ্ঞান পাপী' ছাড়া আর কি বলতে পারি? চিত্র জগতের রামা শ্যামা পরিচালকের এই হীন মনোবৃত্তিতে আমরা ক্ষুব্ধ হতাম না। কিন্তু শৈলজানন্দের মত একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক, যাঁর প্রতি আমাদের তথা বাংলার দর্শকদের যথেষ্ট আশা ও শ্রদ্ধা রয়েছে তাঁর এই হীনতায় কী ব্যথিত হওয়াটা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক? আমাদের শৈলজানন্দকে আমরা গালাগালি দেব—প্রশংসা করবো—তাঁর উপর আমাদের দাবী আছে, কিন্তু বাইরের লোকেও তাঁকে সমালোচনা করবার সুযোগ পাবে কেন? 'অভিনয় নয়' সম্পর্কে বম্বের Filmindia পত্রিকার সমালোচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—সমালোচনার শেষের কয়টী 'লাইন' এখানে উদ্ধৃত করছি:

"In Short there is nothing to remember in the Picture. It provides some casual entertainment but is definitely not "worth showing to good family audiences."

হরিদাস মুখোপাধ্যায় (রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা)

বিশ্বস্তসূত্রে জানিলাম যে অশোককুমার বম্বে হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন। নিউ টকীজের হইয়া তিনি একটী চিত্রে অভিনয় করিবেন। চিত্রখানি নাকি প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত হবে। আমার জিজ্ঞাস্য যে, ইহার ভিত্তি কতদূর সত্য? যদি সত্য হয় তবে তাহার সহিত স্ত্রী চরিত্রে কে অভিনয় করিবেন এবং চিত্রখানির নাম কি?

: হ্যাঁ এ বিষয়ে যা শুনেছেন তা সত্যি। শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া নিউ টকীজের 'পরছান' নামে যে হিন্দি চিত্রখানির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন—তাতেই অভিনয় করতে অশোককুমার কলকাতায় এসেছেন।

তবে তিনি বম্বে থেকে এখানে এসে অভিনয় করে যাবেন। অভিনয়ের জন্ম ১ লক্ষ এবং যাতায়াত ও এখানকার খরচ বাবদ ২৫ হাজার টাকায় চুক্তিবদ্ধ হ'য়েছেন। এই চিত্রে বম্বের মায়া ব্যানার্জি ও শ্রীমতী চন্দ্রপ্রভাও চুক্তিবদ্ধা হ'য়েছেন। তাছাড়া শ্রীযুক্ত বড়ুয়া ও যমুনা দেবীও থাকবেন অভিনয়াংশে। চিত্রখানির পরিবেশনের সর্ব স্বত্ব পেয়েছেন এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্স লিঃ। বাজারে একটা গুজব বেরিয়েছে, পয়ছান কবিগুরুর 'গোরার' হিন্দি চিত্র রূপ হবে। এই গুজবটী সত্য নয়। অবশ্য শ্রীযুক্ত বড়ুয়া গোরার চিত্ররূপ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—তবে পয়ছানের সংগে তার কোন যোগাযোগ নেই।

কানন চট্টোপাধ্যায় (রাসবিহারী এভেনিউ, বালীগঞ্জ)

হেমচন্দ্র পরিচালিত 'মাই সিসটারের' বিষয় আমার কিছু বলবার আছে। আমি গত মার্চ মাসে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম। ১৩৫১ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা রূপ-মঞ্চে পড়েছিলাম যে, "মাই সিসটার" বম্বেতে মুক্তিলাভ করেছে ও বম্বেবাসীদের পাগল করে তুলেছে।" তাই আমার একটু আগ্রহ হয়েছিল মাই সিসটার দেখবার। লক্ষ্ণৌতে একটা সিনেমা হলে 'মাই সিসটার' দেখানো হচ্ছিল। বম্বে-বাসীকে যখন পাগল করে তুলেছে তখন হয়তো আমাকে সহজেই পাগল করে দেবে। সিনেমা হলের নাম আমার অত খেয়াল নেই। সিনেমা হলে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে 'শো' আরম্ভ হলো। প্রথম দিকটা মন্দ লাগল না কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন খাপছাড়া হয়েছে ছবিটা! সুমিত্রা দেবী একটা গানও গাননি। সুমিত্রা দেবীকে দিয়ে যখন একটা চরিত্র গঠন করা হয়েছে আগাগোড়া, তখন তাকে দিয়ে গান গাওয়ানো হয়নি কেন? তিনি কী গান গাইতে জানেন না? আর একটা স্থানে দেখলাম যে, সুমিত্রা তার গুরুজন এক বৃদ্ধা মহিলাকে একটী স্থানে দাঁড় করিয়ে সায়গলের সংগে প্রেমালাপ করতে বাগানে প্রবেশ করলেন! কিছুক্ষণ পরে উক্ত বৃদ্ধা মহিলা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুজনকে প্রেমালাপে মত্ত অবস্থায় দেখতে পান। প্রেমিক প্রেমিকা কিন্তু তা সত্বেও বিরত হলো না। এটা কী শোভন হয়েছে? আমার ত বইটা ভাল লাগলো না—বম্বে বাসীরা মাই সিষ্টার দেখে কী জন্ম পাগল হলেন তাও আমি বুঝতে পারলুম না।

: মাই সিষ্টার সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে পারলুম। 'মাই সিষ্টার' স্থানীয় কোন প্রেক্ষাগৃহে এখনও মুক্তি লাভ করেনি—এবং আমারও দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। তাই 'মাই সিস্টার' সম্পর্কে কোন অভিমত ব্যক্ত করতে পারলুম না। তবে এই কথাটুকু বলতে পারি, বাংলার বাইরে মুক্তিলাভ করে চিত্রখানি অসম্ভব জনপ্রিয়তা যেমনি অর্জন করেছে তেমনি নিউ থিয়েটার্সের আর্থিক লাভালাভও কম হয়নি। অবশ্য বাংলার বাইরের জন-প্রিয়তার কথা মনে করে ছবির ভালমন্দ বিচার করা যায় না। তার নিদর্শন 'ওয়াপস'। 'ওয়াপস' চিত্রখানি

এন, টির আর্থিক সাফল্য এনেছে, বাংলার বাইরে প্রশংসাও পেয়েছে—কিন্তু বাঙ্গালী দর্শকের চিত্ত জয় করতে পেরেছে কি? এ বিষয়ে বাঙ্গালী দর্শকের রুচী যে যথেষ্ট উন্নত সে বিষয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। তাই আপনার ভাল না লাগাটাও হয়ত অন্যায় নয়। পরিণীতা-শেষরক্ষা খ্যাত পরিচালক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি লাহোর থেকে কলকাতায় এসেছেন। তিনি লাহোরে 'মাই সিষ্টার' চিত্রখানি দেখেছেন এবং সেখানে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তাও তিনি বল্লেন। 'মাই সিষ্টারে' নাকি সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন শ্রীমতী চন্দ্রাবতী—কিন্তু তার মুখে হিন্দি উচ্চারণ গুলি যথাযথ ফুটে ওঠেনি। Blood Bank এর 'propaganda' নিয়ে 'মাই সিষ্টারের' কাহিনী গড়ে উঠলেও—'propa ganda' কে মূল কাহিনী থেকে পৃথক ভাবেই দেখানো হয়েছে—এজন্য শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় প্রশংসাই করলেন। 'মাই সিষ্টার' সম্ভবতঃ নিউ সিনেমায় শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে—তখন এর সমালোচনা করা যাবে। তবে তার পূর্বে এই কথাটুকু বলে রাখি—বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের হিন্দি ছবিগুলি—বাংলার বাইরে যদি আর্থিক সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয়, তবে তার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। বাংলা ছবির মান নীচে না নামলেই হলো। যেখানে হিন্দি ছবিগুলি বাংলা থেকে অজস্র টাকা লুট করে নিচ্ছে—সেখানে বাংলায় প্রযোজিত হিন্দি ছবিগুলি যদি ভেলকী বাজী দেখিয়েও টাকা নিয়ে আসতে পারে বাংলার বাইরে থেকে, তাকে আমরা অন্ততঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে তারিফই করবো।

নিউ থিয়েটার্সের 'দুই-পুরুষ' চিত্রে লতিকা ব্যানার্জি

জনৈক দর্শক (সৈদাবাদ, বহরমপুর)

(১) আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে ৪৫ বৎসর পেরিয়ে গেলেই মানুষের প্রতিভা যায় নষ্ট হয়ে। শৈলজানন্দের বয়স কত জানি না। মনে হয় ৪৫ বৎসরের

বেশীই। তাঁর 'অভিনয় নয়' দেখেই আমার এই ধারণা হয়েছে। আচ্ছা, অন্য দেশে দেখি, যত লোকের অভিজ্ঞতা বাড়ে তত যায় প্রতিভা বেড়ে। কিন্তু বাংলা দেশে বিশেষ করে পরিচালকদের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখি কেন ?

(২) রাধামোহন ও বিনতা বসুর 'educational qualification' কি ? (৩) ১৯৪৪ সালে সৌন্দর্যে কোন্ পুরুষ এবং মহিলা শিল্পী প্রধান স্থান অধিকার করেছেন।

: অন্যান্য পরিচালকদের কথা এখানে বলার প্রয়োজন নেই কিন্তু শৈলজানন্দের অভিজ্ঞতা কী বাড়েনি আপনি বলতে চান ? জনৈক বন্ধুকে বলা তাঁর উক্তি যদি সত্য হয়, অর্থাৎ এক ধাপ নামলেই কোরস ভরতি টাকা—অর্থাৎ দর্শকেরা সস্তা জিনিষের জন্যই বেশী টাকা দিয়ে থাকেন—এবং যদি দর্শকেরা টাকা খরচ করে তাই দেখতে যেয়ে তাঁর ধারণার সত্যতা প্রমাণ করান—তবে কেন বলবো না যে, শৈলজানন্দের অভিজ্ঞতা বেড়েছে। তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমার ধারণা, বাংলায় বর্তমানে যে কয়েকজন পরিচালক আছেন, দর্শকদের সম্পর্কে শৈলজানন্দ যদি ঐ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করতেন, তবে পরিচালক হিসাবে তাঁর স্থান কারো চেয়ে নীচুতে হতো না। বইয়ের পাতায় সরল ভাবে কাহিনীটাকে বলে যাবার বিশেষত্বটুকু যেমনি শৈলজানন্দের সাহিত্যিক জীবনে গৌরব এনে দিয়েছিল—পরিচালক জীবনেও তিনি সে গৌরব থেকে বঞ্চিত হননি কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতাই তাঁর গৌরবের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(২) রাধামোহন ভট্টাচার্য এম-এ, বি-এল; বিনতা বসু—কৃতিত্বের সংগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আই, এ পড়ছিলেন—। (৩) সৌন্দর্যের পরিমাপ করতে কোন প্রতিযোগিতা হয়নি, তাই আমার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ কর্চ্ছি অবশ্য বাংলা চিত্রজগৎ সম্পর্কে। সৌন্দর্যের পরিমাপ করতে যেয়ে যে যে 'factor' গুলি থাকা প্রয়োজন বাংলা চিত্রজগতে যে পুরুষ তারকার দল জল জল করছেন—তাদের কারোরই মাঝে সে 'factor' গুলি খুঁজে পাবেন না—বা ১৯৪৪ সালে বাংলা চিত্রজগতকে উজ্জলতর করে কোন নূতন তারকার (পুঃ) আবির্ভাবও হয়নি—এদিক দিয়ে স্ত্রী জাতীয় তারকারা খানিকটা মান রেখেছেন—শ্রীমতী সুমিত্রা দেবীর নামই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য।

সুধাংশু কুমার রায় (খুলনা)

(ক) শ্রীমতী বিনতা বসুর আগামী ছবি কি ? (খ) সাধনা বসুকে আর কোন ফিল্মে দেখতে পাচ্ছিনা কেন ? (গ) বেলু বোস কি সাধনা বসুর আত্মীয়া (ঘ) রবীন মজুমদারের শ্রেষ্ঠ অভিনীত বই কোনটী, তিনি কোন বইতে সবচেয়ে ভাল গেয়েছেন—(ঙ) উদয়ের পথে, সহর থেকে দূরে, নন্দিতা, বন্দিতা, পথ বেঁধে দিল, অভিনয় নয়, দোটানা, কতদূরের মধ্যে সবচেয়ে কোনটী ভাল হয়েছে পর পর সাজিয়ে দিন। কে কোন বইতে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—

: (ক) হামরহী (উদয়ের পথে'র হিন্দি সংস্করণ) (খ) কোন বাংলা চিত্রে বর্তমানে সাধনা বসু অভিনয় করছেন না। জয়ন্ত ফিল্মের আগামী হিন্দি চিত্র 'উর্বশী' চিত্রে শ্রীমতীকে দেখতে পাবেন। তাছাড়া তিনি নিজেই একখানি চিত্রের প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ত তাতেও আত্মপ্রকাশ করবেন। চিত্রখানির নাম হ'য়েছে 'অজন্তা' ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত হবে। তাই বর্তমানে তিনি কলকাতাতেই এসেছেন। (গ) না। (ঘ) সমাধান এবং বন্দিতায় রবীন্দ্র বাবুর অভিনয় আমার ভাল লেগেছে। প্রত্যেক ছবিতেই রবীন্দ্রবাবু ভাল গেয়ে থাকেন, তার ভিতর শাপমুক্তি ও গরমিলএর গান আজও কানে লেগে আছে। (ঙ) (১) উদয়ের পথে—স্বর্গত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও দেবী মুখোপাধ্যায় (২) সহর থেকে দূরে—জহর, মলিনা, পশুপতি, রেণুকা, ফণীরায়। (৩) বন্দিতা—অহীন্দ্র চৌধুরী (৪) পথ বেঁধে দিল—ছবি বিশ্বাস (৫) অভিনয় নয়—ইন্দু মুখোপাধ্যায় (৬) নন্দিতা—পূর্ণিমা (৭) কতদূর—প্রভা (৮) দোটানা—(হয়া)

অনিল ব্যানার্জি (রাজচন্দ্র সেন লেন, কলিকাতা)

কানন দেবীর বম্বে যাবার কথা কি সত্য ? প্রমথেশ বড়ুয়ার খবর কি ?

: বম্বের লক্ষ্মীদাস আনন্দ প্রডাকশন্সের সংগে কানন দেবী একখানি চিত্রে অভিনয় করবার জন্ত ছ'লক্ষ টাকায় চুক্তিবদ্ধা হ'য়েছেন একথা সত্যি। চিত্রখানির নাম হয়েছে কৃষ্ণলীলা। সংগীত পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত কমল দাশগুপ্ত। তবে তিনি এখান থেকেই তার কাজ করবেন। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত দেবকী বসু। সন্ধি খ্যাত পরিচালক অপূর্ব মিত্র এসোসিয়েট-ডিরেক্টর রূপে কাজ করবেন। পূজার সবই ঠিক কিন্তু কথা হচ্ছে প্রতিমাই তৈরী হয়নি—অর্থাৎ প্রযোজক এখন পর্যন্ত নাকি লাইসেন্সই সংগ্রহ করতে পারেন নি।

ডি ব্যানার্জি (১১৬৯)

আপনাদের রূপ-মঞ্চে 'জানেনকি এঁদের' ধারা বাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে হইতে বন্ধ হইয়া গেল কেন। গুহ ষ্টুডিওর খবর কি? ভ্যারাইটী পিকচার্স কি আর কোন ছবি তুলবেনা মনস্থ করিয়াছেন।

: আপনাদের আগ্রহ থাকলে 'জানেন কি এঁদের' আবার প্রকাশ করা হবে। তবে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত না হলেও চিত্র তারকাদের জীবনী পরবর্তী সংখ্যা গুলিতেও প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। 'লাইসেন্স' না পাবার জন্যেই সব চুপ চাপ আছেন।

ফণীন্দ্রনাথ সাহা (কান্দির পাড়, কুমিল্লা)

এবার রামশাস্ত্রী প্রথম স্থান অধিকার করেছে শুনে আমরা সকলে অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা কেহ বুঝে উঠতে পারলুম না, কেন উদয়ের পথে দ্বিতীয় হলো, আর কি গুণের জন্যইবা রামশাস্ত্রী প্রথম হয়েছে। পত্রিকায় যে ইংরেজী 'Kismet' এর বিজ্ঞাপন দেখলাম হিন্দি কিসমৎ-এর সংগে তার কী কোন মিল আছে? আর ঐ English এর নাম কিসমৎ রাখা হলো কেন।

: ভারতীয় ছবিগুলির ভিতর রামশাস্ত্রী প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই জন্ত যে, তার যোগ্যতাকে ছাপিয়ে উঠবার শক্তি ১৯৪৪ সালের আর কোন ছবির ছিলনা। অভিনয়—পরিচালনা—দৃশ্যপট, টেকনিক চিত্র খানির কোন দিকেই দৈন্যতা নেই। তারপর ভারতীয় ইতিহাসের একটী অধ্যায়কে রূপায়িত করা হয়েছে—এবং সে রূপ যথাসাধ্য নিখুঁত করবার চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। কিসমৎ-এর সংগে ইংরেজী Kismet-এর কোন সম্পর্ক নেই। 'নছিব' এর দৌলতে রাজা হয় ভিখারী, ভিখারী হয় রাজা—ইংরেজী Kismet এর প্রতিপাদ্য বিষয় বস্তু, তাই চিত্র খানির নাম হয়েছে Kismet.

অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (রেষ্টুরেণ্ট ওয়েসিজ, জলপাইগুড়ী)

(১) আজকাল অধিকাংশ দর্শকই বাংলা অপেক্ষা হিন্দি ছবি পছন্দ করেন কেন? (২) কানন দেবীর শ্রেষ্ঠ অভিনীত ছবি কোনটী :

: (১) বাংলা ছবি নিকৃষ্ট বলে হিন্দী ছবি দেখেন—এদের এই ধরণের মতবাদের অবশ্য কোন ভিত্তি নেই—তবে হিন্দি ছবিতে নূতন মুখের সংগে পরিচয় ঘটে—আর তাছাড়া ৩য় ৪র্থ শ্রেণীর বিদ্যা নিয়ে বাংলা বই ছেড়ে ইংরেজী বই বগলে করে ঘুরতে যে আত্মপ্রসাদ পাই আমরা, ঠিক সেই আত্ম-প্রসাদের লোভও অনেক দর্শকের ভিতর দেখা যায়—বাংলা ছেড়ে হিন্দি ছবি দেখবার সময়। (২) শেষ উত্তরের পর আর কোন চিত্রে মনে রাখবার মত কানন দেবীর অভিনয়ের পরিচয় পাইনি।

সুবোধ পাল (মহেশতলা লেন, হুগলী)

(১) নিম্নলিখিত নাম গুলির শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে সাজাইয়া দিন। নবদ্বীপ হালদার, চার্লি চ্যাপলিন, রনজিৎ রায়, লরেল-হার্ডি, চার্লি। (২) আমরা বাংলা সিনেমায় Adventurous কোন ছবি দেখতে পাইনা কেন (৩) ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৪৪ সালের মধ্যে যতগুলি বাংলা ছবি তোলা হয়েছে তন্মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ (৪) বর্তমানে শ্রেষ্ঠ পরিচালক (বাংলা এবং হিন্দি ছবির) কে?

(১) চার্লি চ্যাপলিনের নাম এঁদের সংগে জড়িয়ে তাঁকে নামিয়ে আনতে চাই না। ষ্টান লরেল, অলিভার হার্ডি, রণজিৎ রায়, নবদ্বীপ হালদার, চার্লি। (২) আমাদের প্রযোজকরা Adventurous নন বলে। (৩) ১৯৩৫-৪০ সালের পূর্ব পর্যন্ত নীতীন বসুর ভাগ্যচক্র, প্রমথেশ বড়ুয়ার অধিকার। ১৯৪০ সাল থেকে আজ অবধি—বিমল রায়ের

উদয়ের পথে। (৪) হিন্দি—গজানন জায়গীরদার, বাংলা—বিমল রায়।

দেবব্রত পুরকায়স্থ (অম্বিকাপট্টি, শিলচর, আসাম)

(১) বাংলা চিত্রজগতে অভিনেতা হিসাবে ছবি বিশ্বাস ও জহর গাঙ্গুলির মধ্যে এবং গায়ক হিসাবে রবীন্দ্র মজুমদার ও অসিতবরণের মধ্যে কাহার স্থান উচ্চে ?

(২) বর্তমানে ভারতবর্ষে চিত্র-পরিচালকদের মধ্যে কাহার স্থান উচ্চে।

(৩) নিউথিয়েটার্সের সর্বপ্রথম চিত্র কোনটী ? উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী চিত্রগুলি কার কার পরিচালনাধীনে গৃহীত হবে। বিরাজ বৌ-এর খবর কি ?

(৪) ফিল্মিস্তানের পরবর্তী চিত্রের খবর কি? নীতীন বসু ইহাদের হইয়া যে ছবি তুলিবেন তার নামকরণ কী হইয়াছে।

(৫) কানন দেবী অভিনীত P. R. Production এর বনফুলের খবর কি ?

: Smart এবং dashing চরিত্রাভিনয়ে ছবি বিশ্বাস—তরবর-খরখর চরিত্রে জহর গাঙ্গুলী, দু'জনেই এরূপ অভিনয়ে বাংলা চিত্র জগতে সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। আবার দু'জনেই তাঁদের একঘেয়েমীর জন্য দর্শক-মন থেকে বিদায় নেবার জন্য পা বাড়িয়েছেন।

(২) দু'জনকেই গানের জন্য প্রশংসা করবো। অসিতবরণের—পুরুষোচিত কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য এবং রবীন্দ্র মজুমদারের—সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের মেয়েলী গলা আমার ভাল লাগে।

(৩) দেনা পাওনা। সুবোধ মিত্র পরিচালিত দুই পুরুষ মুক্তি প্রতীক্ষায়। অমর মল্লিক পরিচালিত বিরাজ বৌ—তারই দলে ভিড়েছে। সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ওয়াসীয়াৎনামা সমাপ্তির পথে। সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় 'নার্স সি সি' এগিয়ে চলেছে।

(৪) ফিল্মিস্তানের নীতীন বসু পরিচালিত চিত্রের সংবাদ পরবর্তী সংখ্যায় জানাবার ইচ্ছা রইল।

তবে শশধর মুখোপাধ্যায় তাজমহল পিকচার্সের 'বেগম' চিত্রখানির ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করেছেন। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন সুশীল মজুমদার। সংগীতাংশের ভার পড়েছে শচীন দেববর্মনের উপর। নায়ক নায়িকারূপে অভিনয় করছেন অশোককুমার ও নাসিম। (৫) নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় পি, আর প্রডাকসন্সের 'বনফুল' প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছে। অহীন্দ্র চৌধুরী ও কানন দেবীর প্রতি দুটী বিশেষ চরিত্রের ভার পড়েছে।

কুমারী উমাদত্ত গুপ্তা (পরাশর রোড, বালিগঞ্জ)

রূপ-মঞ্চ রবীন্দ্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় লিখিত "Mother unwept and unsung" গল্পের বাংলা অনুবাদ 'বঞ্চিতা আমি একাধিকবার পড়ে দেখেছি। অবন্তীর বঞ্চিতা জীবনের কাহিনী যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে তার প্রতিটি লাইন সর্বদাই আমার মনে পড়ে। কেমন করে সে তার 'স্নেহ-বিষ' কণ্ঠে—ধারণ করেছিল, জয়ন্তীর শয্যাপ্রান্তে কেমন করে সে সন্তান-স্পর্শ অনুভব করেছিল—তার বেদনা-জীবনের প্রতিটী অনুভূতি যেন ছবির মত এক এক করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমার মনে হয় শিশির ভেজা ঘাসের ওপরে অবন্তীর কল্যাণী—পদরেখা প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার অনুভূতিকে আলোড়িত করে তুলবে। মূল ইংরেজী গল্পটী পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়নি কিন্তু বাংলা ভাষায় এক বঞ্চিতা নারীকে এমন করে যে বিশ্ব জননীরূপে এঁকে তোলা যায় তা আমার জানা ছিল না। আপনার পত্রিকার একজন পাঠিকার পক্ষ থেকে অনুবাদক শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায়কে তাঁর এই সার্থক রূপদানের জন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানালে বাধিত হবো।

: বঞ্চিতা গল্পটী ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি গল্পটী শ্রীযুক্ত রায় ইংরেজীতেই প্রথম লিখেছিলেন। অনুবাদক শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায় ও নাট্যকার মন্মথ রায়কে আপনার চিঠি দেখিয়েছি। দু'জনেই আপনার প্রশংসাবাণী সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। রূপ-মঞ্চের প্রতিটি পদক্ষেপ এমনিভাবে আপনাদের প্রশংসা-আশীষে সার্থক হ'য়ে উঠুক—'রূপ-মঞ্চের' সম্পাদক হিসাবে তাই আমার বড় কামনা।

বেতার জগৎ

পরিচালিকা - মনিদীপা

নাট্যাভিনয় :—কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে প্রতি শুক্রবার একটী করে নাটক বা নাটিকা অভিনীত হচ্ছে, এছাড়া মাঝে মাঝে ছোট ছোট নানা ধরণের নক্সাও পরিবেশিত হচ্ছে, বেতারের অন্যান্য আসরের মত এই আসরটীও আভ্যন্তরীণ গলদ ছাড়াতে পারেনি। স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে যে সকল নাটক দিনের পর দিন অভিনীত হয়ে রসপিপাসুদের আনন্দ বিতরণ করে এসেছে এবং এখনও করছে, সে সকল নাটকও বেতার শিল্পীরা রূপায়িত করে তোলেন, কিন্তু তাদের অভিনয়ে এবং প্রযোজনার ত্রুটিতে তা শ্রোতাদের মনকে বিক্ষুব্ধই করে তোলে। তিন ঘণ্টার নাটককে মাত্র একঘণ্টা কিংবা ৪৫ মিনিটের নাটকে রূপান্তরিত করতে যেয়ে প্রযোজক এমন ভাবে নাটকের অংশ কেটে বাদ দেন যে, প্রায় নাটকেরই গতিবেগ শিথিল এবং ঘটনা পরম্পর সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে, তখন আর তা তেমন উপভোগ্য হয় না। কর্তৃপক্ষের এদিকে সজাগ দৃষ্টির প্রয়োজন। স্থানীয় শ্রোতাদের রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখ্‌বার সুযোগ ঘটে, তারা যখন বেতারের মারফত সে নাটকগুলির এই রূপান্তর শুনতে পান, তাদের মন বিক্ষুব্ধ হয় বৈকী। তাছাড়া এই অভিনয় শহর থেকে দূরের শ্রোতাদের মনে মূল নাটক সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে। কর্তৃপক্ষ বলতে পারেন সময়াভাব, কিন্তু তাহলে এই সব নাটকের অভিনয় না করানই শ্রেয়। বেতারের শিল্পীবৃন্দ যদি তাদের অভিনয় চাতুর্যে আমাদের আনন্দ দিতে পারতেন, তাহলেও এই ত্রুটী ততটা শ্রোতাদের কাছে ধরা পড়তোনা। মুটবিহারী বলতে শ্রোতাদের মনে স্বর্গত বিশ্বনাথ অথবা ছবিবিশ্বাসই জেগে ওঠেন, সেস্থানে বেতারের ইন্দু সাহার মুট-বিহারী কি এতটুকু আঁচড় কাটতে সক্ষম হয়েছে? এরূপ একটী গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের রূপ দিতে তেমনি একজন দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন। সবাই যদি সব চরিত্রে অভিনয় করতে পারতো, তাহলে আর অভিনেতাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্যের বিচার হতো না। কর্তৃপক্ষ এই গলদ ঘুচাতে পারেন, রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকগুলি রঙ্গ-মঞ্চের শিল্পীদের দ্বারা অভিনয় করিয়ে, তাহলে তাঁরা যে শ্রোতাদের শুধু আনন্দ এবং রসাস্বাদনের সুযোগ দেবেন তানয়, প্রতিভাবান্ শিল্পীদের প্রতিভার সংগে তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে, ধন্যবাদ ভাজন হবেন। আমাদের দেশে অভিনয় প্রতিভার আদর আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে, শিল্পীদের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধার অন্ত নেই, তাঁদের অভিনয় প্রতিভা একমাত্র সিনেমার ভিতর দিয়ে জনসাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। রঙ্গমঞ্চের সাফল্যমণ্ডিত নাটকে শিল্পীদের অভিনয় প্রতিভার পরিচয় মফঃস্বলের অধিকাংশ শ্রোতাদের পক্ষেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হয়না, তারা এই অভাব মেটাতে পারেন যদি বেতারে তারা অভিনয় করেন। পূর্বে এই সুযোগ তাদের ঘটেছে। দুর্গাদাস প্রমুখ শিল্পীরা যখন P. W. D. সুপ্রিয়ার কীর্তি, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি নাটক স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে মূর্ত করে তুলতেন, তখনই মফস্বলবাসী শ্রোতাদের সে অভিনয় শুন্‌বার সুযোগ হ'তো এই বেতার কেন্দ্রের মারফত, আজকাল তা হয়না কেন? বেতার কেন্দ্রের মুখপত্র 'বেতার জগতে' রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের নাম দেখা যায়, কিন্তু অভিনয় আসরে তাদের উপস্থিত হতে দেখা যায় না। "দুই পুরুষে," জহর গাঙ্গুলী, জীবেন বোস্, সরযূবালা, রেবা দেবীর নামোল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের মাঝে কেউ উপস্থিত ছিলেন না, তাদের পরিবর্তে কে অভিনয় করেছেন তা'ও জানানো হয়নি। "সংগ্রাম ও শান্তি", বিজয়া ইত্যাদিও এই অভিযোগ থেকে বাদ যায না। কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যদি মঞ্চাভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের দিয়ে অভিনয় করাতে সক্ষম না হন, তবে শ্রোতাদের অযথা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এসব নাটকের এইভাবে অঙ্গহানি করে অভিনয় যেন না করান। যদি খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের দিয়ে বেতারের জন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ ভাবে নাটক লিখিয়ে নেন, তাহলে আর এভাবে শ্রোতাদের মাঝে অসন্তোষের সৃষ্টি হবেনা। যে ধরণের নক্সা

এবং নাটক আজকাল বেতারের কর্তৃপক্ষরা অভিনয় করাচ্ছেন, তাতে প্রশংসাযোগ্য বা উপভোগ্য বিশেষ কিছু থাকেনা, সমস্ত নাটকখানা একঘেয়ে তালে চলতে চলতে হঠাৎ যেন তার সেই চলা বন্ধ হ'য়ে পড়ে। "মুখোস" নাটকটীকে এই পর্যায়ে টানা যেতে পারে, তাছাড়া অন্যান্য নক্সা তো আছেই। "বাংলার বধূ" নক্সা একমাত্র "বধূর" অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, এবং শ্রোতাদের মনে সত্যিই ভাবান্তর এনে দিতে সক্ষম হয়। "বধূ" রূপে পারুল দেবী নাকি তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাই রূপায়িত করে তোলেন, বিশ্বস্তসূত্রে জ্ঞাত এই সংবাদ সত্য কিনা জানিনা, কিন্তু আমার মনে হয় তিনি তার দরদভরা অভিনয়ে শ্রোতাদের মনকে তার প্রতি তথা নির্যাতিতা বাংলার বধূদের প্রতি অনেকটা সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

বেতার কেন্দ্রে যেসব শিল্পীরা অভিনয় করছেন তাদের মধ্যে নীলিমা সান্যাল, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, সুনীল দাসগুপ্ত প্রতি অভিনয়ে এবং অধিকাংশ নক্সাতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এদের মাঝে কল্যাণী মুখোপাধ্যায় এবং সুনীল দাসগুপ্তের অভিনয় প্রতিভা সত্যিই প্রশংসনীয়। উপযুক্ত পরিচালকের অধীনে এদের অভিনয় আরো উন্নত হবে বলে আশা করি। এরা দুজনই আন্তরিকতা দিয়ে ভূমিকাগুলিকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট। কল্যাণী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে "গৃহ প্রবেশে"র মাসী, "দুইবোনের" শর্মিলা যথার্থ রূপে ফুটে উঠেছে। স্ত্রীর প্রেমে বঞ্চিত যতীনের মর্মবেদনা সুনীল দাশগুপ্তের অভিনয়ে শ্রোতাদের মনে করুণা জাগিয়ে তুলেছে। "দুই বোনের" নীরদ, "বিন্দুর ছেলে"র মাধব, "মৃত্যুর পরে" নাটকে আত্মারূপে সুনীল দাসগুপ্তের অভিনয় উপভোগ্য। প্রতিটী ভূমিকাতেই তিনি সুঅভিনয় করে থাকন, এই দুজনের অভিনয়ের মধ্যে ক্রমোন্নতি দেখা যায়, তাই মনে হয় তারা অভিনয় শিল্পের উন্নতির প্রতি সত্যিই যত্নশীল এবং এজন্যই ভবিষ্যতে তাদের সত্যিকারের দক্ষশিল্পীরূপে দেখতে পাব বলে মনে আশার সঞ্চার হয়। নীলিমা সান্যাল ছাড়া বেতারের কোন নাটককে মনে পড়েনা। নক্সা থেকে আরম্ভ করে একাদিক্রমে সব নাটকে অভিনয় করে তিনি একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছেন। তিনি যেন বেতারের 'ঝোলের লাউ ও অম্বলের কদু'। সহযোগী 'যুগান্তর পত্রিকা' বেতার প্রসংগে বলেছেন, শ্রীমতী নীলিমা সান্যাল বেতারের সর্বত্র বিকিয়ে যাচ্ছেন অথচ বাজার দরে নেই। কথাটা একদিক দিয়ে খুবই সত্য, অর্থাৎ তার কোন বৈশিষ্টই আমাদের মনে রেখাপাত করে না। অষ্টম বর্ষীয়া মীরাবাঈ রূপে নীলিমা সান্যাল কি অসহ্য নয়? "দুই পুরুষে" কল্যাণী অথবা "গৃহ প্রবেশে" হিমি রূপে তার অভিনয় একঘেয়েমীর প্রভাব ছাড়াতে পারেনি। একই সুরে একই ভংগীতে কথা বলা তার অভিনয়ের বৈশিষ্ঠ্য। প্রত্যেকটী নাটকেই বিশিষ্ট ভূমিকায় নীলিমা সান্যালের নির্বাচন অনুমোদন করা যায়না। তার অভিনয়ের যে কোন তারতম্য নেই, বাচন ভংগীর পরিবর্তন নেই তা কি প্রযোজকের দৃষ্টিতে পড়েনা? আর তার কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত মোটেই শ্রুতি মধুর হয় না। তার কণ্ঠস্বর রবীন্দ্র সংগীতের উপযুক্ত নয় এবং বিকৃত সুরও বেদনা দেয় বৈকী? এ বিষয়েও প্রযোজক ও পরিচালকের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন মনে করি।

এই তিনজন ছাড়া বেতারে ইন্দু সাহা, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীধর ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ চৌধুরী, তপতী চট্টোপাধ্যায় মাঝে মাঝে নাটকে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। দুই পুরুষে "নুট বিহারী" রূপে ইন্দু সাহা প্রশংসনীয় অভিনয় করেননি। "মুখোস" নাটকে তার অভিনয় চলন সই। তাঁর অভিনয়ের প্রশংসাবাদ শুনেছিলাম তাই কার্যক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখে বিক্ষুব্ধ হওয়া অসঙ্গত নয়। 'নারদ মুনির' নক্সা নাট্যকের কোন তাৎপর্য আমরা বুঝলাম না, বীরেন্দ্র বাবু এই পাগলামী থেকে সরে থাকলেই পারতেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রযোজক, পরিচালক এবং অভিনেতা রূপে শ্রোতাদের সন্তুষ্টই করে আসছেন। দুই পুরুষ নাটকে একমাত্র তাঁর অভিনীত শিবনারায়ণ ছাড়া কোন ভূমিকাই সুঅভিনীত হয়নি। একটী জনপ্রিয় নাটকের এরূপ পরিণতি টেনে আনার প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা কি? বিশেষতঃ যখন এই নাটকখানা স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে দিনের পর দিন জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছিল।

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনাধীনে "সংগ্রাম ও শান্তি" সর্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় হয়েছিল। তবে তাঁর সহশিল্পীরা যাতে অভিনয়ে উন্নততর দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন সেদিকে তাঁর দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে শিল্পীদের বাচন ও উচ্চারণের বিশুদ্ধতার প্রতি পরিচালকের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গল্পদাদুর আসর:—গল্পদাদুর আসর আজকাল অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেনের পরিচালনায় বসে থাকে। শিশু সাহিত্যিক মহলে তিনি সর্বজন পরিচিত। পরিচালকের পরিবর্তনে আসরের আকর্ষণ কিছুটা কমে থাক্‌লেও এতদিন কোন দোষ ত্রুটী চোখে পড়েনি। কিন্তু গত ২৭শে মে এই আসরে রঞ্জিত রায়ের হাসির গল্প "পারমিট্" বাজিয়ে শোনান তিনি অনুমোদন করলেন্ কেন? এটা কি ছোটদের শুন্‌বার এবং উপভোগ করবার মত হাসির গান? সভ্য সভ্যা যা শুনতে চাইবে, ভালমন্দ বিচার না করে তাই শোনানো তাঁর মত সাহিত্যিকের কাছ থেকে আশা করি না। পণ্ডিতি করেও কি তাঁর এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান জন্মেনি? এই আসরটি যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও ত্রুটিহীন হয়ে ভবিষ্যতে আরও শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে, তার জন্য তিনি আন্তরিক যত্নবান হবেন, আমাদের এই আশা নিরাশায় পর্যবসিত হবে না এই বিশ্বাস যেন আমাদের তিনি পূর্ণ করেন।

বেতার বিভ্রাট

মিষ্টভাষী

কিছুদিন হ'লো কলিকাতা রেডিও ষ্টেশনে গণ্ডগোল আরম্ভ হ'য়েছে। রূপ-মঞ্চের পাঠক পাঠিকা এ-খবর জানেন। নানাবিধ পত্রিকায় এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি হ'য়েছে। অনেক সভায় এ নিয়ে অনেক বলাবলি হ'য়েছে। কিন্তু সমস্যার ঠিক সমাধান আজো হয়নি।

আর্টিষ্টস্ এসোসিয়েশন দল বেঁধে সমস্যার সমাধান করার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু পারেন নি। না পারার কারণ আছে। এই এসোসিয়েশনের একজন কর্মীও এসোসিয়েশন পরিচালনার কাজের উপযুক্ত নন্।

সব কদিনের সভাতেই আমি উপস্থিত ছিলাম। যেখানে একটি দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে সবাই উপস্থিত হ'য়েছে, সেখানে কি নিয়ে আলোচনা হবে তারই ঠিক ছিলনা। প্রথম যেদিন, হয়ত ২৪শে এপ্রিল, সভা ডেকে রেডিয়োর সঙ্গে ধর্মঘট করার প্রস্তাব পাশ হ'লো,—সেদিনের সে হাস্যরসের কথা জীবনে ভুলবোনা। শ্রীযুত নির্মল চন্দ্র সেদিনের সভার সভাপতি মনোনীত ছিলেন, কিন্তু তিনি সময় মত এসে না পৌছনোয় নৃপেন বাবু (নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়) সভাপতির আসন নিলেন। নৃপেনবাবু আগাগোড়া ভদ্র ভাষায় ভদ্র ভঙ্গীতে বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিলেন যে বেতার কর্তৃপক্ষ হিট্‌লারী মনোভাব গ্রহণ করার দরুণই শিল্পীরা দল বেঁধে সম্মিলিত হ'য়ে আজ বেতারের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হ'চ্ছে। নৃপেনবাবু বার বার উল্লেখ করেছিলেন যে এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নয়, বেতারের কোনো বিশেষ কর্মীর সঙ্গে এ লড়াই নয়। ভালো কথা। কিন্তু তাঁর এই কথার ওপর বার বার জোর দেওয়া ও পুনরাবৃত্তি করা দেখেই সন্দেহ হয়েছিলো, নৃপেনবাবুর মতিগতি ভালো নয়। সেদিন নৃপেনবাবু ছিলেন সবার পুরোভাগে, তিনি সেদিন হ'য়েছিলেন সবার চালক। তাঁর ওপর অনেক বিশ্বাস ও অনেক আস্থা রেখে এসোসিয়েশনের কর্মীরা কাজ করছিলো। যদিও একথা বলা চলে যে সভা পরিচালনার পক্ষে কারো কোনো অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা না থাকায় সভায় বিশৃঙ্খলার অন্ত ছিলোনা। কি নিয়ে আলোচনা হ'চ্ছে, কি অভিযোগ, শিল্পীদের দাবী কি, কিছুরই ঠিক নেই। সমস্ত সভ্যদের ডেকে এনে তাদের সম্মুখে আর কয়েকজন শিল্পীর এলোমেলো কথা, কথা কাটাকাটি। এভাবে দাবী মেটানো যায়না। একমাত্র সন্তোষ সেনগুপ্তের সুখ্যাতি করবো। তিনি ভদ্র ও বিনয়ী। তিনি জানেন শিল্পীদের কি দাবী, কি নিয়ে এই সভা। কিন্তু এসোসিয়েশনের সম্পাদক যখন তিনি হ'য়েছেন, তখন তাঁর উচিত ছিলো, তিনি তাঁর নির্বাচিত সভাপতিকে দিয়ে সভা পরিচালনা করান। যখন যার খুসী এবং যা খুসী বলায় সমস্ত সভায় গোলমাল ও গোলযোগ হ'য়েছে। কাজের

কাজ কিছু হয়নি। সর্বপ্রথম একটা প্রোগ্রাম করা উচিত ছিলো, প্রথমে উপস্থিত শিল্পীদের জানিয়ে দিতে হবে যে বেতার কি কি ভাবে শিল্পীদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে। তারপর জানাতে হবে শিল্পীদের দাবী কি। অবশেষে ঠিক হবে এই দাবী মেটাবার পথ কোথায়, কি ভাবে সেই পথ নির্দেশ মিলবে। অথচ দু'ঘণ্টা যাবৎ সভায় ব'সে থেকেও নানাজনের নানাপ্রকার এলোমেলো কথা শুনে, সভা ভঙ্গ হবার সময়ও বুঝতে পারলাম না, সিদ্ধান্তটা কি হ'লো। অবশেষে উঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এসোসিয়েশনের একজন চাঁইকে। বললাম, তাহ'লে কি ঠিক করলেন। তিনি বললেন, বোধহয় ষ্ট্রাইক।

—কবে থেকে ?

—বোধ হ'য় কাল থেকে।

এই বোধ হ'য় শুনে বোধ হ'লো যে কারো কিছু বোধগম্য হয়নি।

এ-ভাবে যদি এসোসিয়েশন কাজ ক'রে চলেন, তাহ'লে হলপ ক'রে বলা চলে যে এসোসিয়েশন রেডিয়োর সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠ্‌বেন না। রেডিয়ো সরকারী ব্যাপার, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'লে শিক্ষায় ব্যবহারে সভা পরিচালনায় একতাবদ্ধতায় শক্তিশালী হ'তে হবেই।

এসোসিয়েশন যে একতাবদ্ধ নয়, তার প্রমাণ নৃপেন্দ্র কৃষ্ণের দলত্যাগ। তিনি সভায় পৌরহিত্য করলেন, রেডিয়োর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তারপর একদিন রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা করলাম, ধর্মঘট কদিন চলবে ? তিনি বললেন, যদ্দিন না বেতার আমাদের দাবী মেনে নেয়। (ঠিক মনে আছে—তিনি 'আমাদের দাবী' ব'লেছিলেন, 'আমার দাবী' বলেন নি।) বললাম, গল্পদাদুর আসরের কি হ'চ্ছে ? তিনি বললেন—যা ইচ্ছে করুক ওরা (বেতার কর্তৃপক্ষ) আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।—অর্থাৎ ধর্মঘট শেষ হ'লেও তিনি আর যোগ দেবেন না। অথচ এ কি ? তিনি আত্মবিক্রয় ক'রেছেন। আত্ম-বিক্রয় ক'রেছেন এসোসিয়েশনের কাছে নয়, বেতারের কাছে। তিনি এখন বেতারের পক্ষ হ'য়ে শ্রোতাদের পত্রের উত্তর দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মুখোসটি আছে অন্য রকমের। তিনি বলেন, তিনি একজন শ্রোতা এবং অসন্তুষ্ট শ্রোতা। আর এই অসন্তুষ্ট শ্রোতা হিসেবেই পত্রের উত্তর দিচ্ছেন আর নাকি বেতারের সঙ্গে লড়াই করছেন শ্রোতাদের দাবী নিয়ে। এত বড় মিথ্যে কথা, এত বড় প্রবঞ্চনা ইতিহাসেও বিরল। আমি জানতে চাই—ও-প্রকারের প্রবঞ্চনার প্রতি এসোসিয়েশন কি করবেন ঠিক ক'রেছেন ?—এঁকে মুক্তকণ্ঠে গালাগাল দিলেও আশ মেটে না। হাতে নয়, ভাতে যদি এসো-সিয়েশন এঁকে মারতে পারেন তবেই এসোসিয়েশন শক্তিশালী হ'য়েছে বলে মনে করবো।

বেতারের জুলুম বাড়ছেই। তারা গাইয়েদের কারো কারো পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিয়ে তাদের হাত করার চেষ্টা করছেন। পারিশ্রমিক বাড়াবারও কোনো নিয়ম তারা করেন নি। কাউকে ১৫৲ টাকা থেকে ৪০৲ টাকা ক'রেছেন, কারো-বা ২০৲ থেকে ২৫৲ ক'রেছেন। আর গান গাওয়ার সময় দিচ্ছেন অনেক বাড়িয়ে। প্রত্যেক শিল্পীদের কাছে এই পারিশ্রমিক বাড়াবার সংবাদটা গিয়েছে গোপনে—আর বলা হয়েছে, এ-যেন গোপন থাকে অর্থাৎ কার কত বাড়ল, কেউই যেন না জানে। বেতারের এ-চালাকী বেশীদিন হয়ত চলবে না এ জানাজানি হবেই। এ-কথা বেতার কর্তৃপক্ষ যেন মনে রাখেন।

এক সঙ্গে সব কথা জানানো সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে সব বলবো। এই সঙ্গে আর একটা কথা জানিয়ে আজকের মত বক্তব্য শেষ করছি। এবার যে ধর্মঘট হ'লো তার জন্যে খেটেছেন উনিশ জন যন্ত্রী—যাঁদের নিয়ে এই হাঙ্গামা। তাঁরা শিল্পীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ধর্মঘটে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। আচ্ছা, এই যন্ত্রীদের দাবী তো না-হয় মিটলো, ধরুন মিটলো। কিন্তু অন্যান্য শিল্পীদের অনেক দাবী আছে। যা এখনো আলোচনা করাই হয়নি। যখন সে প্রশ্ন উঠবে, তখন যদি ধর্মঘট করার দরকার হয়, এসোসিয়েশন কর্মী পাবে কোথায়। এই যন্ত্রীরা নিশ্চয়ই তখন এত আগ্রহে ছোটাছুটি করবে না। কখনোই করবে না—তাদের চালচলনেই বোঝা যায়। এর পর সবার নাম ক'রে আরো খুঁটিনাটি ঘটনা জানাবো।

কলিকাতায় সাধনা বোস

—সুধীরেন্দ্র সান্যাল।

বন্ধুজায়া সাধনা বোসকে এবার দীর্ঘ দিন পরে দেখলাম তাঁর মাতা-ঠাকুরাণী মিসেস্ সেনের অতিথিরূপে বালিগঞ্জের বাড়ীতে।

সাধনার সংগে আমার শেষ দেখা গত অক্টোবরের ছুটিতে বোম্বেতে। আমি আমার বন্ধুদের সংগে বাস করছিলাম তাজমহল হোটেলে। সাধনা ছিলেন তারই অন্তর্ভুক্ত, পার্শ্ববর্তী গ্রীনস্ হোটেলে। সেখানকার প্রতিটি সন্ধ্যা নানা গল্পে ও আলাপ আলোচনায় আমরা কাটিয়েছি। গত মহা-ষ্টমীর রাত্রে স্থানীয় বাঙ্গালী ক্লাবের পূজামণ্ডপে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম। সে-দিনের প্রবাসী বাঙ্গালী হিসেবে আমার সঙ্গী হয়েছিলেন বাঙলার মেয়ে সাধনা বোস। দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবার ব্যাগ্রতা প্রকাশ করায় আমি তাঁকে দুর্গাস্তোত্র ও মন্ত্র পাঠ করিয়ে-ছিলাম। সে দিনের সে স্বপ্নস্মৃতি আমার মনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

শ্রীমতী সাধনা বসু

সাধনার জীবনে অবসর বলে কিছু নেই, তাই ছুটিও তার ভাগ্যে জোটে না। তবুও বোম্বেতে উর্বশী-ছবির কাজ অসমাপ্ত রেখে তাঁকে ছুটে চলে আসতে হয়েছিল কল্‌কাতায়। এই আসার উদ্দেশ্য খুলে বলাই বর্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য।

স্বনামে ফিল্ম প্রডিউস্ করবার বিশেষ অনুমতি লাভ করবার পর প্রডিউসার সাধনা বোস স্থির করেন, তাঁর প্রযোজনায় প্রথম ছবিখানি বোম্বেতেই তোলা হবে। গল্প লেখাবার তোড়জোড় ও আনুসঙ্গিক আয়োজন শেষ হ'তে না হ'তেই তাঁর এক বাঙালী বন্ধু হঠাৎ বোম্বে এসে উপস্থিত হ'ন। ইনি চিত্রশিল্পের সংগে সংশ্লিষ্ট না হ'লেও সব রকম সুকুমার শিল্পকলার বিশেষ অনুরাগী এবং বিশেষ অর্থশালী ব্যবসায়ী। সাধনাকে এই ভদ্রলোক প্রস্তাব করেন: ছবিখানি বাঙলাদেশে এসে তুলুন, আমরা আপনার পার্টনার হ'ব।

এখানে প্রসঙ্গত বলা ভাল যে licence—holder গণ ইচ্ছামত একজন বা একাধিক financial partner গ্রহণ করতে পারেন। প্রস্তাবটি সাধনার মনঃপুত হয়েছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই খবর পেলাম শ্রীমতী সাধনা কল্‌কাতায় এসে পৌচেছেন। আমাদের এক বন্ধু বিশিষ্ট ফিল্ম ব্যবসায়ী মিষ্টার হেমাদের অফিস থেকে স্লিপে ঠিকানা লিখে সাধনা আমাকে সাক্ষাৎ করবার জন্যে আহ্বান করেন।

আমি বোস-দম্পতীর দীর্ঘ দিনের বন্ধু; এককালে বহু মঞ্চাভিনয়ে সি-এ-পির সহযোগী কর্মীরূপে মধু-সাধনার সম্মিলিত অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলাম! সুতরাং প্রথম সাক্ষাৎ-কালে সহজ-সৌজন্যে সাধনা আমায় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অভ্যর্থনার মধ্যে কোন আতিশয্য ছিল না এবং এমন একটা মাধুর্য ছিল যা অতিথির আবির্ভাবকে সহজ করে তোলে।

: তাপর কেমন দেখছেন এবার আমায়? একটু মোটা হয়ে পড়েছি, নয়?

সহজভাবেই জবাব দিলাম: স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য এবং সাজগোজ পরিপাটি অর্থাৎ যাকে বলে: Bubbling over with health and gaiety!

এখানে বলা ভাল যে বিজাতীয় শিক্ষা দীক্ষা ও সংগ দোষে কথাবার্তায় আমার manners সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়। আলাপের মুখে প্রায়ই মাতৃভাষা বর্জন করে থাকি—এর কারণ এ নয় যে মাতৃভাষায় আলাপ করতে আমি অপটু বা ঐ ভাষার উপর আমার বিরাগ আছে। jokes and repartees এর উপর আমার স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় এই কৌতুক প্রবণ মজলিসী মনটাকে অনেক সময় ভিজিয়ে তুলতে স্বদেশী সরবৎ-এর চেয়ে বিদেশী কটুটেইল শ্রেয়তর বলে মনে হয়। বাঙালীর পক্ষে এটা গর্বের কথা নয় স্বীকার করি। কিন্তু বিজাতীয় অনুকরণ প্রিয়তার এমন বহু লজ্জাই ত হজম করছি।

সাধনা বোস ভিন্ন জগতের মানুষ। শিল্পীরা সবাই তাই। চিরাচরিত সংস্কার বা convention এর উর্ধে তাঁদের মন।

আলাপ আলোচনায় ভাষার কৌলিন্য রক্ষিত না হলেও এঁদের কাছে ক্ষমা পাওয়া যায়।

আমি যে তাঁকে flatter করিনি, এটা বোঝাতে আমায় আরও খানিকটা বাক্য প্রয়োগ করতে হ'ল।

শুধালাম: "What brings you back to Calcutta ?"

জবাব এল: 'অজন্টা!'

ঘণ্টার আওয়াজের মত গুরুগম্ভীর এই নামটি। ভারতীয় ঐতিহ্যের ও কৃষ্টির কত স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে ঐ নামটির সঙ্গে।

কৌতূহলী মনটা উৎকর্ণ হয়েছিল বাকীটা শোনবার জন্যে। সাধনা বলতে লাগলেন: "লাইসেন্স পাওয়া গেছে, এটাত জানেনই সবাই। Now my friends want me to produce the picture in Calcutta ;

আমি বল্লাম: স্বাগতম্। অজন্টার ঘণ্টা তাহলে এখানেই বাজুক। But who are those friends ? Are all of them your partners ?

সাধনা জবাব দিলেন: ব্যস্ত কী? কেউ অচেনা নয়, probably they are more your friends, than mine !

সত্যি? অবাক চোখে চেয়ে রইলাম সাধনার দিকে।

তারপর বাইরে পেলাম পর পর ক'খানা মোটারের আওয়াজ! ধীরে ধীরে কামরায় এসে ঢুকলেন:

মিষ্টার হেমাদ, মিষ্টার শান্তি সাহগাল, মিষ্টার বি, এল, খেমকা ও আর একজন বাঙালী বন্ধু (ইনি একজন বিশিষ্ট ধনী ও ব্যবসায়ী এবং তাঁর নামটি অজ্ঞাত রাখতে চান)। অতএব partnerদের পরিচয় পাওয়া গেল। কারণ, খানিক পরেই দেখতে পেলাম চামড়ার পোর্টফোলিয়া খোলা হ'ল এবং পর পর অনেক গুলো document টেবিলে ছড়িয়ে dotted lineএ নাম স্বাক্ষর সুরু হ'ল।

এই ঘটনার ঠিক দুদিন পরে, "300 club" নামক শহরের বিশিষ্ট ও অভিজাত মিলনকেন্দ্রে আমি নিমন্ত্রিত হলাম ডিনারে, মিসেস বোসকে meet করবার জন্যে। পার্টনারদের মধ্যে মিষ্টার খেমকা এই dinnerটি দিয়েছিলেন।

সাধনাকে খানিক্ষণ একান্তে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: Arrangements are all pucca ?

জবাব এল: Perfectly okay !

: Then we can celebrate the night

পরের দিন সাধনা জানালেন: গল্পের outlineটা একবার শুনবেন না? অবশ্যই রাজী হলাম। কিন্তু তার আগে সাধনার কণ্ঠে শুনলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর কবিতা 'অভিসার'-এর আবৃত্তি।

আবৃত্তি সাঙ্গ করে সাধনা বল্লেন: এই হোল আমার কাহিনীর মর্মকথা। নটি বাসবদত্তা ও সন্ন্যাসী উপগুপ্ত। এদেরই আকর্ষণ-বিকর্ষণকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে আমার চিত্র-নাট্য। তারই outline এবার শুনুন।

কয়েক সিট্ folis কাগজে নির্দোষ ইংরাজীতে লেখা চিত্রনাট্যের প্লট। রচয়িতা সুবিখ্যাত কথা-শিল্পী পণ্ডিত ভাগবত চরণ বর্মা। বাসবদত্তা ও উপগুপ্তের কথিকাকে নাটকাকারে শাখা পল্লবিত করে, চমৎকার একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীতে পরিণত করা হয়েছে। এই দুটি চরিত্রের পাশাপাশি আরও অনেকগুলি নর-নারী ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। মথুরার রাজা, রাণী, মন্ত্রী, সান্ত্রী, পরিষদ,

বণিক, বণিক পত্নী ও আরও অনেকে! বিচিত্র পট-ভূমিকায়, ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে, বহু রস সমন্বয়ে এই কাহিনীটি জমাট হয়ে উঠেচে উপভোগ্য নাটকাকারে। পরিকল্পনার অভিনবত্ব সত্যই আমাকে মুগ্ধ করল। পড়া শেষে বল্লাম: চমৎকার! আপনার বাসবদত্তা আপনাকে বঞ্চিত করবে না। এখন উপযুক্ত উপগুপ্ত হাজির হ'লেই সব দিক রক্ষা হয়। কিন্তু ছবিখানির পরিচালনা করবেন কে?

সাধনা জবাব দিলেন: পাঞ্জাবের স্বনামধন্য চিত্র-শিল্পী 'শিরীন-ফরহাদ'-চিত্রের পরিচালক, পাঞ্জাবী প্রহ্লাদ দত্ত। এর জন্যে তিনি পারিশ্রমিক পাবেন: পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর সংগীতাংশের পরিচালনা করার জন্যে আহ্বান করেছি তিমিরবরণকে। তিনি মাসিক দুহাজার টাকায় চুক্তিপত্র সাক্ষর করেছেন।"

: "And what would be the cost of production?"

: Near about six lakhs of rupees.

এর পরেও আরও দুদিন সাধনার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিল দুটো dinnerএ; তার একটি দিয়েছিলেন মিষ্টার শান্তি সাহগাল তাঁর বালিগঞ্জের প্রাসাদোপম অট্টালিকায়।

গত বুধবার ৬ই জুন শ্রীমতী সাধনা তাঁর আগামী ছবি অজন্তার গোড়াপত্তন করে বোম্বাই রওনা হ'লেন। আপাততঃ সেখানে বসে চিত্র-নাট্যটি লেখাবেন। ইতিমধ্যে তাঁর পার্টনাররা ছবিতোলবার অন্যান্য আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। আগামী সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকে স্থানীয় একটি ষ্টুডিওতে এই ছবির কাজ সুরু হবে।

পথ বেঁধে দিল

ডি লুক্স পিকচার্স প্রযোজিত বাংলা ছবি 'পথ বেঁধে দিল' গত ১০ই মে থেকে উত্তরা, পুরবী ও পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। চিত্রখানির পরিচালনা, কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র। সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মিত্র, রবীন চট্টোপাধ্যায় ও অনাদি দস্তিদার (রবীন্দ্র সংগীত)। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন কানন দেবী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, পূর্ণিমা, প্রভা, তুলসী চক্রবর্তী, ছায়া, রবি রায় এবং আরও অনেকে।

পথ বেঁধে দিল চিত্রে কানন দেবী

প্রথমতঃ 'পথ বেঁধে দিল' চিত্রের নামের কোন সার্থকতা আমরা খুঁজে পেলাম না। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথ বেঁধে দিল' নামে একখানা উপন্যাস আছে—ইতিমধ্যে অনেক পাঠক তার সংগে গোল পাকিয়ে ঠিক যেমন হয়েছিল 'যোগাযোগ' ও রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের বেলায় আমাদের কাছে বহু চিঠি লিখেছেন—যাঁরা চিঠি লিখেছেন তাঁদের এ ব্যাপারে ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়—এবং তাঁদের অজ্ঞতারও প্রকাশ পায়নি—কারণ বাইরে থেকে সত্যটা আবিষ্কার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং যখন শরদিন্দু বাবুর উপন্যাস খানি বহু পূর্বেই কোন বিশেষ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। আমাদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, বার বার তাঁরা এই ভুলের সৃষ্টি করে—আমাদের জবাবদিহির মাঝে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

'পথ বেঁধে দিল' চিত্রের কাহিনীটী প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা।

রূপ-মঞ্চ

সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র বাবু বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন—যদিও তাঁর সেই অতীতের খ্যাতির দিকে তাকিয়ে বর্তমানের অখ্যাতির জন্যও বাঙ্গালী চিত্রামোদীরা শ্রদ্ধা জানাতে মোটেই কার্পণ্য করেন না। বিদেশিনীর অকৃতকার্যতা, কতদূরের (কাহিনী) ব্যর্থতাকে ছাপিয়েও বাঙ্গালী দর্শকেরা যে সংসার বা 'পথ বেঁধে দিল'র প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে আসছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটা প্রচলিত কথা আছে : বারে বারে মুরগী তুমি খেয়ে যাও ধান, এবারেতে মুরগী তোমার বধিব পরাণ।" বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের মনের অবস্থাও ঠিক তাই—বারবার প্রেমেন্দ্রবাবুর ব্যর্থতাকে ভবিষ্যতের আশায় রাঙ্গিয়ে দিলেও--এবার তাঁরা প্রেমেন্দ্রবাবুর ভবিষ্যৎ চিত্র সম্পর্কে কোন রঙের প্রলেপই মাখাতে পারবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। তবু প্রেমেন্দ্রানুরাগীদের "Hoping against hope" হবে একমাত্র সান্ত্বনার।

বাইরে থেকে যতটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি—এক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী নিউ থিয়েটার্সের কাছ থেকে যেরূপ সুযোগ পেয়েছিলেন পরিচালনা ক্ষেত্রে, তাঁর পর প্রযোজকের কাছ থেকে এক প্রেমেন্দ্র বাবুর মত এতখানি সুযোগ সুবিধা পাবার সৌভাগ্য আর কোন পরিচালকের বেলায়ই দেখা যায়নি। অন্যান্য পরিচালকদের ক্ষেত্রে অপরের গল্প নিয়ে কাজ করতে হয়—চিত্রনাট্যও হয়ত আর কেউ লিখে থাকেন—তাই ব্যর্থতার আঘাতে যখন সেই সব পরিচালকদের হিমসিম খেতে দেখি, তাঁরা স্বভাবতঃই দোষ চাপান গল্প লেখকদের প্রতি। আবার লেখকেরাও পরিচালকদের আক্রমণ করতে কসুর করেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র বাবুর সে অনুযোগ—অভিযোগ সৃষ্টির কোন পথই নেই। কারণ চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও কাহিনীর দায়িত্ব তাঁর একার ঘাড়েই ছিল। কেবলমাত্র কাহিনীকার প্রেমেন্দ্র মিত্র ও পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভিতর 'টাগ অব ওয়ার' চলতে পারে। এবং সে 'টাগ অব ওয়ার' এর রায় কাহিনীকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুকূলে আমরা দিতে পারি। কাহিনীটীর যে সম্ভাবনা ছিল আমরা তা অস্বীকার করিনা। মীনাঘাট রাজ্যের

আলোচ্য চিত্রে ছবি বিশ্বাস

সর্বেসর্বা দেওয়ানের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রজা-আন্দোলনকে সিনেমার আন্দোলনে পর্যবসিত না করে যদি সত্যিকারের একটী প্রজা আন্দোলনকে রূপ দেওয়া হতো—এবং ল' অফিসার জগদীশপ্রসাদ ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বন করে—সে আন্দোলনকে জয় মণ্ডিত করে তুলতে আত্মনিয়োগ করতেন—রাজকুমারী চন্দ্রা তাঁর ব্যক্তিত্বে আগে থেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন—তাঁর কর্ম-দক্ষতায়—আত্মত্যাগে নিজেকে তাঁর কাছে সঁপে দিয়ে গরীয়সী বলে মনে করতেন। তাহলে সেই মিলনও খুব স্বাভাবিক ভাবে হতো। ল' অফিসাররূপী দীপেন্দ্রনারায়ণকে রায়গড়ের চৌধুরী বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীর ছাপ দেওয়ার কোন তাৎপর্যই বুঝলাম না। এক মদের বোতল ছাড়া রায়—গড়ের চৌধুরী বংশের উত্তরাধিকারীর আর কোন পরিচয়ই পাওয়া যায়নি। রায়গড়কে বাদ দিয়ে মীনাঘাটকে কেন্দ্র করেই কাহিনী গড়ে ওঠা উচিত ছিল। মীনাঘাটে ল' অফিসাররূপে আসবার আগে পরিচালক দীপনারায়ণকে দিয়ে আজে বাজে বকিয়েছেন। মনে হয় তখন অবধিও পরিচালক ভেবে উঠতে পারেন নি—চিত্রের পরিণতি কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন। যদি দু'টী রাজ্যের রেষারেষী নিয়ে আখ্যান ভাগ গড়ে উঠতো তবু এক রকম হতো। এযে একটা জগা খিঁচুরী হয়ে গেছে। কী রকম হলে ভাল

হতো না হতো সে কথা থাক—কারণ আমি গল্প লেখকও নই বা পরিচালকের দক্ষতাও আমার নেই। তাই সমালোচকের লোলুপ-জিহ্বা নিয়ে এই জগা খিচুরীকেই আস্বাদ করে দেখি—নুন ঝাল ঠিক আছে কিনা।

প্রথমে ধরুন—কাশীতে দীপনারায়ণ একটা সাধুর ছবি তুলতে ক্যামেরা বাগিয়ে—রাজকুমারী চন্দ্রা এসে হাজির হলেন ক্যামেরার চোখের সামনে। লক্ষ করে দেখবেন—যে সাধুটীর ছবি নিতে দীপনারায়ণ ক্যামেরা বাগিয়ে ছিলেন—অনিচ্ছাকৃত ভাবে চন্দ্রার ছবি ক্যামেরা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না—যাদের ক্যামেরা সম্পর্কে একটু জ্ঞান আছে তাঁরাই একথা স্বীকার করবেন। এই দৃশ্যেই প্রেমেন্দ্র বাবুর মানুষের মনস্তত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। ক্যামেরাটা ওভাবে ছুড়ে ফেলার ভিতর কী 'সীভালরী' লুক্কায়িত থাকতে পারে? তিনিত ক্যামেরাটাকে খুলে negative খানাকে নষ্ট করে ফেলতে পারতেন। রাস্তার একটী সাধুর ছবি তুলতে দীপেন্দ্র নারায়ণকে দেখি—ছবি তুলবার 'হবি' যে তাঁর আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাঁরা ছবি তুলেন, ক্যামেরার প্রতি যে তাঁদের কত দরদ একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারেন। ক্যামেরাটা ছুড়ে ফেলাতে দীপেন্দ্রনারায়ণের চরিত্রের খামখেয়ালী মনোভাবের পরিচয় পায়নি, পরিচয় পেয়েছে তাঁর চরিত্রের অসামঞ্জস্যতার। সেজন্য প্রেমেন্দ্র বাবুর অজ্ঞতাকেই দোষ দেবো। যে জিনিষটী আমি ব্যবহার করি—বিশেষ করে আমার 'হবি'র বা ভাললাগার জিনিষটীর প্রতি স্বভাবতঃই একটা নাড়ীর টান পড়ে যায়—যেমন কারোর কুকুর পোষার বাতিক—কেউ শিকার ভাল বাসেন—কেউ ছবি তুলতে ভালবাসেন—কেউ রেসিং কারএ ঘুরতে ভালবাসেন—আপনার 'হবি' বা ভাল লাগার জিনিষগুলোকে কোন মতেই আপনি তাচ্ছিল্য ভাবে নষ্ট করতে পারেন না—তার দাম অপরের কাছে যতই থাকুক, আপনার কাছে অমূল্য। আমার জনৈক ধনী বন্ধুর একটী রেসিং কার আছে, বাবুয়ানীতে তিনি কারো চেয়ে কম নন। সব সময় ফিটফাট থাকেন। কাপড় ময়লা হবে বলে যেখানে সেখানে বসেনও না। গাড়ীটা নিয়ে প্রায়ই আসতেন আমার কাছে—ক্লিনার সংগে সংগেই একজন থাকতো। ঝক ঝক করে গাড়ীখানা। গাড়ীতে উঠবার সময় একদিন দেখি, পরণের ফিনফিনে ধবধবে ধুতিটা দিয়ে—বনেটা ঝাড়ছেন—ধুলো জমেছে বলে। 'হবি'র বা ভালবাসায় জিনিষের প্রতি মানুষের এই রকমই দরদ থাকে। সেটা মূল্যবান গাড়ীই হউক, ক্যামেরাই হউক বা একখানি বিনে পয়সার ক্যালেণ্ডারই হউক না কেন! মানুষের মনের এই সাধারণ মনস্তত্ব টুকুও যে প্রেমেন্দ্র বাবুর জানা নেই—সে জন্য দুঃখিত।

তুলসী লাহিড়ী অভিনীত দেওয়ানজীর চরিত্রটীকে কূট নীতিজ্ঞ বলে আগাগোড়া বলে আসা হয়েছে—অথচ তার কূটনীতির কোন পরিচয় পেলাম না। তার ক্রূর চক্রান্ত কী এবং কাকে ঘিরে তাও বুঝলাম না। চিত্রের শেষাংশে কেবল একটু আভাস পাওয়া গেছে—তাতে বোঝা যায়—দীপেন্দ্রনারায়ণের সংগে মীনাঘাট নিয়ে ভাগ বাটোয়ারার চক্রান্তে ছিলেন—এবং দীপেন্দ্রনারায়ণের দ্বারা সে আশা ফলবতী হলো না দেখে—তাঁর এক আত্মীয়ের সংগে এ বিষয়ে লিপ্ত হলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, লোকে যত চক্রান্তজাল বিস্তার করে, তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে, এখানে দেওয়ানের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? তিনি একা মানুষ—তাঁর চরিত্রের কোন গোপনীয় দুর্বলতার সন্ধানও আমরা পাইনি—মীনাঘাটের তিনিইত ছিলেন সর্বেসর্বা। তাছাড়া রাজকুমারী চন্দ্রাকে নিজের মেয়ের মতই মানুষ করেছেন—তাই এরূপ ভাবে কোন চক্রান্তে জড়িয়ে পড়াটা তাঁর পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। চিত্রের এই চক্রান্তের দিকটায় শরৎচন্দ্রের বিজয়ার ছাপ এসে পড়েছে হুবহু। কিন্তু সেখানে রাসবিহারীর ছিল বিলাস—এখানে দেওয়ানের সে রকমত কেউই নেই। টমটম বেয়ে রাজকুমারী চন্দ্রা চলেছেন—ল' অফিসারের সংগে সংঘর্ষ হলো—আত্মগোপন করে আলাপ করলেন—আলাপ জমে উঠতে উঠতে পরিচালক নগরের উপকণ্ঠে এক নির্জন স্থানে তাদের নিয়ে হাজির করলেন—আলাপ জমানোর জন্য—সন্ধ্যাকে ডেকে আনলেন—কাহিনীকে জমিয়ে তুলতে দস্যুদের আনলেন—সবই যেন 'ভানুমতির খেইল।'

বাংলার দর্শক ৬ আনা ন' আনা শ্রেণীরই বেশী স্বীকার করি—তৃতীয় শ্রেণীতেই তাঁরা ভ্রমণ করেন—কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান নেই, পরিচালকের এই ধারনাকে কোন মতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না। L-Shape-এ ট্রেণের Berth এর arrangement ত কোন দিন দেখিনি। অন্ততঃ কৌতুহল বশে রাজরাজরাদের Special কামরাগুলিওত উঁকি মেরে দেখেছি। এই দৃশ্যে পরিচালককে এক দিক দিয়ে প্রশংসা করবো, সাধারণ পরিচালকেরা আগে থেকেই হয়তো দীপেন্দ্রনারায়ণকে জগদীশ প্রসাদ সাজাতে তৈরী হয়ে থাকতেন—কিন্তু প্রেমেন্দ্রবাবু সেটা করেন নি। তিনি দীপেন্দ্রনারায়ণকে যেভাবে জগদীশ প্রসাদে রূপান্তরিত করেছেন সেজন্য প্রশংসাই করবো। কিন্তু যেখানে দীপেন্দ্রনারায়ণের সংগে দেওয়ানের পূর্বথেকেই পরিচয় রয়েছে—এবং এক দিন না এক দিন দুজনের সাক্ষাতের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, সেক্ষেত্রে দীপেন্দ্রনারায়ণকে ছদ্মবেশে মীনাঘাটে নেওয়া কী তাঁর উচিত হয়েছে ?

যে মালমশলাটা দিয়ে পরিচালক আলোচ্য চিত্রের গতি বেঁধে দিয়েছেন—তার প্রত্যেকখানি ইটের অসামঞ্জস্যতার জন্য সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হয়েছে—এবং তাঁর অনিপুণ হাতের পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করে নি।

অভিনয়ে দীপেন্দ্রনারায়ণের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের এক ঘেয়েমী ছৈবিক কায়দা আধিক্য দোষে দুষ্ট। রাজকুমারীর ভূমিকায় কাননের অভিনয় দেখে জনৈক অবাঙ্গালী বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'Should Kanan retire from film world' বন্ধুবরের প্রশ্নের উত্তর তখন না দিয়ে বলেছি, সম্পাদকের অনুমতি পেলে রূপ-মঞ্চের পাতায় পৃথকভাবে এর উত্তর দেবো। অবশ্য রাজকুমারীর রাজকুমারীত্ব যে একটুকুও ফুটে ওঠে নি এজন্য মূলতঃ দায়ী পরিচালক। তাঁর রাজকুমারীত্ব যদি কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকে ত 'বব'ছাটা ফিরিঙ্গি টাইপের চুলেই—আর কিছুতে নয়।

তুলসী লাহিড়ী চরিত্রানুযায়ীই অভিনয় করেছেন। জহরের জাহরিক টাইপের ব্যতিক্রম হয়নি। শ্রীমতী প্রভা সম্পর্কেও তাই বলা চলে। রবি রায়কে নিন্দাই করবো। সংগীতাংশ মাতাল করতে পারেনি। তবে একটী গানে কাননের গলার একটু কাজ দেখিয়েছেন সংগীত পরিচালক এবং এ গানখানির সম্ভবতঃ সুর দিয়েছেন ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র। শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ চলনসই। দৃশ্যপটের জন্য কর্তৃপক্ষ কার্পণ্য করেন নি একটুকুও—শিল্প নির্দেশক একটু সচেতন থাকলে এই আয়োজন সার্থক হতো। —শ্রীপার্থিব

বন্দিতা

নিউ টকীজ প্রযোজিত বাংলা ছবি 'বন্দিতা' গত ১২ই মে থেকে মিনার, ছবিঘর ও বিজলীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। চিত্রখানির কাজ আরম্ভ করে পরিচালক হেমন্ত গুপ্ত অকালে মারা যান। তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন শ্রীযুক্ত রাজেন চৌধুরী। এই চিত্রের অন্যতম সংগীত পরিচালক স্বর্গত হিমাংশু দত্ত সুর সাগরও আর আমাদের মাঝে নেই। চিত্র সমালোচনা করবার পূর্বে স্বর্গত পরিচালক হেমন্ত গুপ্ত ও সুর শিল্পী হিমাংশু দত্ত সুর সাগরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

'বন্দিতা' চিত্রখানি মূলত পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত রাজেন চৌধুরী। শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলতে গেলে আমাদের কাছে অপরিচিত (চিত্র পরিচালনা ব্যাপারে এই সর্ব প্রথম তাঁকে দেখতে পাচ্ছি—সহকারী রূপে ইতিপূর্বে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন কি না সে বিষয়েও আমাদের ততখানি মনে নেই)। তবে নূতন পরিচালক রূপে তিনি যে আমাদের নিরাশ করেন নি একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। বরং চিত্র প্রযোজনা ক্ষেত্রে একদিন নিউ টকিজের যে দুর্ণাম ছিল—একমাত্র 'দাবী' ছাড়া সুনামের কোঠায় নিউ টকীজের আর কোন ছবিকে দেখতে পাইনি—আলোচ্য চিত্র 'বন্দিতা' 'দাবী'র দোসর হবার দাবীকরে যদি দুর্ণামের কোঠা ছাড়িয়ে সুনামের কোঠায় থাকতে চায় তবে এই দাবীকে আমরা অগ্রাহ্য করবো না। আমার এই কথায় দর্শকেরা যেন মনে না করেন, 'বন্দিতা' একখানি উন্নত ধরণের ছবি হয়েছে—নিউ টকীজ এতদিন যে সব ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন তার মানের কথা চিন্তা

করে 'বন্দিতা'কে উচ্চ স্থান দিচ্ছি—শুধু উৎসাহের জন্যই—এবং সমালোচকদের কাছ থেকে এই ধরণের উৎসাহ আমাদের প্রযোজক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির পথে সাহায্য করে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

'প্রেসশোর' দিন চিত্রখানি দেখে যখন রাস্তায় পা বাড়িয়েছি—চিত্রজগতের কোন 'জাঁদরেল' সমালোচকের সংগে দেখা। অনেকদূর এক সংগে এলাম। চিত্রখানি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পেলাম, 'Nothing but cuttings of so many pictures.' 'বন্দিতা' চিত্রখানি সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশ করতে গেলে বাস্তবিকই ঐ সংক্ষিপ্ত কথাটাই প্রযোজ্য বেশী। বিশেষ ক'রে রিক্তা, সোনার সংসার—এর ত হুবহু ছাপ রয়েছে। শ্রীযুক্ত সুনীতীকুমার চট্টোপাধ্যায় বেতার মারফত অভিনয় নয় ও বন্দিতার সমালোচনা প্রসংগে যে কথা বলেছেন তা সত্যই প্রনিধানযোগ্য—অভিনয় নয়—এর নাট্যকার এবং বন্দিতার জহর অভিনীত চরিত্রটীর সংগে যে কোন বাস্তব যোগাযোগ নেই—এবং সিনেমার চরিত্রগুলি ঠিক এমনি অস্বাভাবিক—একথা তিনি জোর করে বলেছেন—'অভিনয় নয়' এর কথা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বন্দিতার জহর অভিনীত চরিত্রটীর ওভাবে পালিয়ে যাবার কী সার্থকতা আছে—তার পালিয়ে এবং বেচে থাকার কী কোন সার্থকতা প্রকাশ পেয়েছে? একটা ঘা মারলো লোকটা পড়ে গেল—অমনি নিজেকে খুনী মনে করে—পিট্টান দিল—সবই যেন সাজানো। নায়কের পলায়ন এবং কাশীতে গুণ্ডার আশ্রয়ে থেকে জীবন যাপন পদ্ধতির সংগে বাস্তবের কোন যোগাযোগ নেই। তবে যে পথ দিয়ে কাহিনীকার অথবা পরিচালক তার নায়ককে পরিচালিত করেছেন চিত্রজগতে সে-পথ এতই পরিচিত যে তার বিরুদ্ধে দর্শকমন অতি সহজেই বিদ্রোহ হ'য়ে ওঠে। বন্দিতা চিত্রে মন-দেয়া নেয়ার যে চিরাচরিত প্রথা ফুটে উঠতে দেখেছি পরিচালক চিত্রে তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে অন্য পথে যদি চলতেন ছবিখানি একঘেয়েমীর দুর্ণামের হাত থেকে রেহাই পেত। 'বন্দিতা' নামটারও সার্থক হতো। ছায়া দেবী শিশুমঙ্গলের আশ্রমে চলে এলেন—শত শত মাতৃহারা শিশুদের ভার তিনি গ্রহণ করলেন, তার সেবা, যত্ন ও স্নেহে আশ্রমের শিশুদের বুকে টেনে নিয়েছিলেন—এই শিশু মঙ্গলের দিকটাকে কেন্দ্র করে যদি 'বন্দিতা' গড়ে ওঠতো—চিত্রখানিকে সার্থক বলতে পারতুম। এবং এর যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। 'বন্দিতা'কে আশ্রম থেকে টেনে না নিয়ে আশ্রমেই রাখা উচিত ছিল। শিশুপরিবৃত আশ্রমে ছায়া দেবীকে দেখে সাধনা বসু অভিনীত একখানি চিত্রের কথা দর্শকদের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

দর্শকদের সম্পর্কে পরিচালকের একটা হীন ধারণার জন্য আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছি। পরিচালকেরা অনেক ক্ষেত্রে মনে করে থাকেন—দর্শকেরা তাঁদের চেয়ে কম বোঝেন, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখিনি—কিন্তু আমাদের পরিচালকদের সব সময়েই মনে রাখা উচিত, দর্শকেরা তাঁদের চেয়ে বেশী তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন। ফণীরায় অভিনীত ষ্টেশন মাষ্টারের চরিত্রটীর কথা মনে করুন। সিগন্যালের কাজ করতে করতে হাতটা তাঁর সব সময়েই—অবসর সময়েও টরে টক্কার মশগুলে ব্যস্ত। একই কাজ করতে করতে মানুষ যে সেই কাজ ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে—মানব মনের এই সাধারণ ধর্মটীর কথা চিত্রে সর্বপ্রথম আমাদের বলেন—চার্লি চ্যাপলিন তাঁর Modern Times এ। তাই বন্দিতার পরিচালক এই সত্যটীর সর্বপ্রথম আবিষ্কারক হিসাবে যদিও কোনমতেই দাবী করতে পারেন না—তবু তাঁর অনুকরণ—প্রিয়তার জন্য প্রশংসা করতাম। কিন্তু তিনি দর্শকদের বুদ্ধি বিবেচনার উপর আস্থা রাখতে পারেননি—তাই সিগন্যালার কেন ওর কম কাজ করেছে তা আর চিত্রে চেপে রাখতে পারলেন না। বলে দিলেন—তাতে সমস্ত মাধুর্যই নষ্ট হয়ে গেল।

আলোচ্য চিত্রে প্রশংসা করবার মত অস্বাভাবিক কিছু যদিও নেই—তবু চিত্রখানিকে মোটামুটি আমরা ভালই বলবো। Sentiment এর প্রাবল্যে দর্শকমন গলিয়ে দেবার মত মাল মশলা এতে আছে। অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী ও ফণীরায়ের কথাই আগে বলতে হয়। রবীন মজুমদারের অভিনয়ও আমাদের অনেকদিন পর ভাল লেগেছে। ছায়া দেবী, সুপ্রভা মুখার্জিও উল্লেখযোগ্য। কুমারী

মনিকা 'বন্দিতা'য় আমাদের খুশী করতে পারেননি। একটা টাইপ চরিত্রে ডিজি উল্লেখযোগ্য। চিত্রের সংগীত ও আনুসংগিক একরকম। —শ্রীপার্থিব

মন্দার ফিল্মের নূতন কার্টুন চিত্র

শিল্পজগতে কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রের একটি বিশেষ স্থান আছে। সুনিপুণ শিল্পী কয়েকটি রেখার সাহায্যে যেভাবে মনের ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন—অনেক সময় ভাষায় তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে মাধ্যম করিয়া কেবল রেখার সাহায্যে তাহার মধ্যে বিভিন্ন রসের ঝঙ্কার করাই কার্টুনের বৈশিষ্ট্য। এক একটি রস সঞ্চারের জন্য এক এক প্রকার রেখার প্রয়োজন হয়। হাস্য, বিষাদ, বাৎসল্য, বিদ্রূপ, বিস্ময় প্রভৃতি রসগুলিকে বিকাশ করিতে হইলে কোন্ রসের জন্য কোন্ কোন্ রেখার প্রাধান্য হওয়া উচিত ইহা যাঁহার জানা আছে তিনি অনায়াসেই রেখাবাহুল্য ও রেখাবৈপরিত্য পরিহার করিয়া প্রধান রেখার সাহায্যে চিত্রে অভিপ্সীত রস সঞ্চার করিতে পারেন। চিত্রমাত্রেই রেখাবাহুল্য বর্জনীয়; বিশেষ করিয়া কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রে তাহা একেবারেই অচল। কার্টুনে রেখাবাহুল্যের চাইতে রেখাবৈপরিত্য আরও বেশী নিন্দনীয়, কেননা তাহা রসহানিকর। নাটকের অভিনয়ে যেমন দুই বিপরীত রসের অবতারণা দূষনীয়, তেমনই কার্টুনেও এক সঙ্গে দুই বিপরীত রস-প্রকাশী রেখা স্থাপন বর্জনীয়। যখন মুখে যে ভাবটিকে প্রকাশ করিতে হইবে তখন সেই রস-প্রকাশী রেখাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। মানুষের মুখে ভাবের অভিব্যক্তি হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। কাজেই কার্টুনেও ভাব প্রকাশের সময় শিল্পীকে এই মুখের রেখাগুলির উপরই বিশেষ ভাবে নজর রাখিতে হয়।

এই ভূমিকা করিতে হইল এই জন্য যে, আমাদের দেশে কলা হিসাবে কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র আজও পর্যন্ত তেমন একটা উৎকর্ষ লাভ করে নাই। সংবাদপত্রে কার্টুনের সমাদর অবশ্য কিছু কিছু হইতেছে এবং বিজ্ঞাপনে ও প্রাচীর পত্রাদিতে কার্টুনের ব্যবহার আজকাল কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছে; কিন্তু ছায়াচিত্র জগতে যে আমাদের দেশে কার্টুনের একটা বিরাট সম্ভাবনা আছে—সেদিকে কাহারও বড় একটা নজর অদ্যাবধি পড়ে নাই। অথচ আমেরিকায় কার্টুন চিত্রে ডিস্‌নে-সাহেব কি যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন অল্প বিস্তর আমরা তাহা অনেকেই জানি এবং বিভিন্ন সিনেমা ভবনে ছবি দেখিতে গিয়া আমরা তাহার পরিচয় পাই। আমেরিকার শিল্প পরিষদের এদিকে নজর পড়ায়ই কার্টুনের আজ সেখানে এতখানি উন্নতি হইয়াছে। কার্টুন আঁকা যে কি কঠিন কাজ, কতখানি গভীর ও সূক্ষ্ম রসানুভূতি থাকিলে যে সামান্য কয়েকটি রেখার ব্যঞ্জনায় একটি মনের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে দেওয়া যায়—তাহা আগেই বলিয়াছি। কার্টুন—ছায়াচিত্র বিপুল পরিশ্রম, অসাধারণ সহিষ্ণুতা এবং অদম্য অধ্যবসায় সাপেক্ষ। প্রতিটি ছবিকে হাতে আঁকিয়া তারপর সেলুলয়েডে গাথিয়া তাহাকে একটি কাহিনী বা গল্পে পরিণত করা সহজ কথা নয়। যে শিল্প এত পরিশ্রম সাধ্য বলা বাহুল্য সরকার বা শিল্পপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে কোন শিল্পীর ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইহার বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে কার্টুন—ছায়াচিত্র বেশীদূর অগ্রসর না হইলেও এই দিক দিয়া একেবারে চেষ্টা করা না হইয়াছে এমন নয়। কিছুকাল যাবৎ মন্দার ফিল্মের প্রযোজক শ্রীযুক্ত মন্দার মল্লিক বাংলা কার্টুন চিত্র লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন এবং পরীক্ষায় তিনি অনেকটা সফলও হইয়াছেন। আমরা সেদিন তাঁহার নূতন ছবি "কুউন অ্যানোফিলিজ" (Queen Anopheles) দেখিয়া আসিয়াছি, ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রচার কার্যের উদ্দেশ্যে এই ছবিখানি তোলা হইয়াছে। ইতিপূর্বে আমরা মন্দার বাবুর 'আকাশ-পাতাল' ও 'অমর-লিপি' নামে দুইখানি বাংলা কার্টুন ছবি দেখিয়াছি, সেই তুলনায় তাঁহার তৃতীয় ছবি অনেক গুণ সফল হইয়াছে। ইহা আশার কথা। "কুইন অ্যানো-ফিলিজ"-এ প্লে-ব্যাকে যে সংলাপ যোজনা করা হইয়াছে তাহার সঙ্গে চিত্রের ওষ্ঠাধর নড়াচড়া এবং অঙ্গভঙ্গীর মিল তাহার ছবির তুলনায় ঢের বেশী। ছবির Synchronization-এ মন্দার বাবু অনেকখানি আগাইয়াছেন। এছাড়া ছবির গতিও আগের ছবির তুলনায় বাড়িয়াছে। ডিস্‌নের

ছবির সঙ্গে তুলনা না চলিলেও এই ছবিখানিকে একটি সফল বাংলা কার্টুন চিত্র বলা চলে। যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা পাইলে মন্দার বাবুও তাঁহার সহকর্মীরা যে অচিরেই বাংলা কার্টুন শিল্পকে অনেকখানি উন্নত করিতে পারিবেন—সেদিন তাঁহার ছবিখানি দেখিয়া আমরা এই বিশ্বাস লইয়াই ফিরিয়াছি।

কার্টুনে যথেষ্ট লোকের খোরাক থাকে এবং সেই জন্যই ইহা দেখিয়া লোক যথেষ্ট আমোদও পায়। কেবল আমোদই নয়, কার্টুনের সাহায্যে লোকশিক্ষারও ব্যবস্থা করা সম্ভব। সাধারণ ছবিতে exaggeration বা অতিরঞ্জন নিন্দ্যনীয়, কেননা তাহাতে অস্বাভাবিকতা থাকে। কিন্তু কার্টুনে exaggeration বা অতিরঞ্জন খারাপ লাগে না—তাহাতে বরঞ্চ রস-পরিবেশনে সুবিধাই হয়। তাছাড়া কার্টুনে Symbolization এরও সুবিধা বেশী। প্রতীক সাহায্যে সর্বসাধারণকে কোন কিছু বুঝানো সহজ। সেই জন্যই কার্টুন ছবিকে লোকশিক্ষার বাহন করা সুবিধাজনক। ব্যবসায়েও ইহা দ্বারা অর্থাগম না হইতে পাবে এমন নয়। লোকশিক্ষা ও সিনেমা শিল্প উৎসাহী ব্যক্তিদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

—দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ধাত্রীপান্না—

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত ঐতিহাসিক নাটক ধাত্রীপান্না মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে শচীন্দ্রনাথের স্থান অবিসংবাদিত। শচীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা, তিনি সব সময়ই নূতনকে নিয়ে যাঁচাই করে দেখছেন—। যে ঢং-এ বাংলা নাটক লিখিত হতো সেই চিরাচরিত পথ বেয়ে না যেয়ে—নূতন পথ আবিষ্কার করে—তার উপযুক্ততা সম্পর্কে পরীক্ষা করে নেবার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর প্রত্যেকটি নাটকে। পরীক্ষামূলক ভাবে নাটক লিখবার জন্য তাঁর বহু নাটকেই বিদেশীয় ভাবধারার সুস্পষ্ট ছাপ এসে গেছে এবং সে জন্য তাঁকে কম বাক্যবাণও সহ্য করতে হয়নি। বর্তমানে তিনি যে পথে পরীক্ষামূলক নাটক লিখতে অগ্রসর হয়েছেন—এ বিষয়ে যদিও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্তকে অগ্রণী বলা যেতে পারে তবু শচীন্দ্র প্রতিভা মহেন্দ্র বাবুকে যে ছাপিয়ে উঠেছে একথা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন। বর্তমানে ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে নূতন ঢংএ লিখবার শচীন্দ্রনাথের প্রয়াস সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'রাষ্ট্র বিপ্লব' থেকে। ইতিহাসের জীর্ণ পাতা থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে নূতন ভাব ও রসে সমৃদ্ধ করে তিনি আমাদের উপঢৌকন দিয়েছেন। মঞ্চ ও চিত্রের মারফতে জাতির মর্মবাণীকে ফুটিয়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তার কথা আজ আর কেউ অস্বীকার না করলেও কার্যক্ষেত্রে আমাদের চিত্র ও নাট্যজগতের কর্ণধারদের অনেক সময়েই টিকি খুঁজে পাওয়া দায়! শচীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাষ্ট্র বিপ্লবে' সুস্পষ্ট ভাবে যে আদর্শ ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস পেয়েছিলেন—সেজন্য আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁকে প্রশংসা করেছি। আলোচ্য নাটকেও এ বিষয়ে তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় না দেখে খুশীই হয়েছি। আলোচ্য নাটক ধাত্রীপান্নাতে তিনি যে সত্য ও ন্যায়ের বাণী প্রচার করেছেন—তা খুব সময়োপযোগী হয়েছে। যুদ্ধরত প্রতিহিংসা পরায়ণ প্রত্যেক জাতির কাছেই ভারতের মহীয়সী নারী ধাত্রীপান্নার 'মর্মকথা' সত্য ও ন্যায়ের পথের নির্দেশ দেবে। নাটকের এখানেই সার্থকতা। নাট্যকারের সাফল্য এখানেই যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ক্ষমতালুব্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণ দাম্ভিকের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করতে পেরেছে।

ধাত্রীপান্নার কাহিনী ভারতীয়দের কাছে অবিদিত নয়—এই মহীয়সী নারী নিজ পুত্রের প্রাণ বিনিময়ে প্রভু পুত্রের প্রাণ রক্ষা করে যে আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন—ভারতীয় ইতিহাসে চিরদিন তা প্রজ্জ্বোল থাকবে। মায়ের ইঙ্গিতে বনবীরের অত্যাচার যখন চরমে পৌঁছলো—সর্দারদের সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়ে ধাত্রীপান্না মূর্তিমতী দীপশিখার মত চিতোরে আত্মপ্রকাশ করলেন। অভিযুক্ত বনবীর ও শীতল সেনীর হত্যার আবেদন নিয়ে যখন সর্দারগণ উপস্থিত—ধাত্রীপান্না অকম্পিত চিত্তে প্রচার করলেন—প্রতিহিংসাতেই সত্যিকারের জয় নয়। উদয়সিংহকে তার প্রাপ্য রাজ্যে অভিষিক্ত করে মাতৃস্নেহের

দাবীতে বনবীরের হাত ধরে রাজপুরীর ভোগ বিলাস ত্যাগ করে চলে গেলেন—অনুতপ্ত শীতলসেনীও অনুসরণ করলেন তাঁদের।

ধাত্রীপান্নার ভূমিকায় প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সরযূবালার অভিনয় হয়েছে নিখুঁত। ধাত্রীপান্নার মর্যাদা একটুকু তাঁর অভিনয় দোষে ক্ষুন্ন হয়নি। তাঁর পরই বলতে হয় বনবীরের ভূমিকায় প্রতিভাধর অভিনেতা শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাসের কথা। স্থানে স্থানে একটু যাত্রার প্রভাব এসে পড়লেও তাঁর অভিনয় খুব হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছে। শীতলসেনীর ভূমিকায় নীরোদাসুন্দরী এবং সন্তোষ সিংহ ও শৈলেন চৌধুরীর অভিনয়ও হ'য়েছে প্রশংসনীয়। রাজকুমারী চম্পার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন—তাকে ছবি বিশ্বাসের বিপরীত ভূমিকায় ঠিক মানানসই হয় নি; এই ভূমিকাটি আর কাউকে বণ্টন করা উচিত ছিল।

নাটকে তিনটি অংক। এই তিনটি অংকে কয়েকটা স্থানের দুর্বলতা ইচ্ছা করলেই নাট্যকার শুধরে নিতে পারতেন। প্রথমতঃ বনবীরের সৈন্যরা যখন পান্নার অন্বেষণে বেরিয়েছে—এ দৃশ্যে—কিছুটা হাস্যরস পরিবেশনে নাট্যকার চেষ্টা করেছেন। এই হাস্যরস পরিবেশন করতে যেয়ে নাট্যকার পূর্বতন নাট্যকারদের প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারেন নি। সৈন্যদের অংগ ভংগির দ্বারা সৃষ্ট হাস্যরসে দর্শক-মন যে খুব বেশী প্লাবিত হ'য়েছে বলে ত মনে হয় না—বরং একটু বিকৃত রুচীর বলেই দর্শকেরা মনে করেন। আর মেবারের রাজলক্ষ্মীর চরিত্রটির জন্যও নাট্যকারকে প্রশংসা করতে পারলুম না। রাজলক্ষ্মীর পরিবর্তে চারণদের দেখালেই ভাল করতেন। তারপর বিরাট বপু নিয়ে যখন কোকিলকণ্ঠি ইন্দুবালা দেখা দেন—চোখ বুজে চীৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছা করে—"সখি ক্ষমো—ক্ষমো"।

দৃশ্যপটগুলি ও পোষাক পরিচ্ছদের খুব প্রশংসা করতে পারবো না--অথচ সেগুলি সম্পর্কে একটু সতর্ক হলেই কর্তৃপক্ষ নিখুঁত করতে পারতেন। বিশেষ করে যে গৃহে রাজকুমারী চম্পাকে বনবীর প্রথমে এনে রাখলো—ঐ গৃহ অর্থাৎ ঐ দৃশ্যের বাড়ী ঠিক বিংশ শতাব্দীর প্রমোদোদ্যানের মতই হয়েছে। সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি শুধরে নিলে ধাত্রীপন্নাকে একখানি সাফল্যজনক নাটক বলেই আমরা অভিহিত করতে পারবো।

—নিতাই সেন

চিত্র সংবাদ ও নানাকথা

শ্রীমতী সাধনা বসু—

নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু বহুদিন বাংলার বাইরে থেকে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। আমাদের প্রতিনিধি তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করলে খুব আগ্রহের সংগেই কথাবার্তা বলেন। সম্প্রতি তিনি একখানি চিত্র গ্রহণে অনুমতি পেয়েছেন ভারত সরকার থেকে। চিত্রখানি কলকাতায় সম্ভবতঃ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত হবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বাসবদত্তার' আদর্শে অনুপ্রাণিত সাধনার এই চিত্রখানির নাম হ'য়েছে 'অজন্তা'। 'সিরিন ফরহাদ' 'পড়শী' প্রভৃতি চিত্রের খ্যাত নামা চিত্রশিল্পী 'ট্রীক ফটোগ্রাফীর' যাদুকর শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ দত্ত চিত্রখানি পরিচালনা করবেন। সুরশিল্পী নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীযুক্ত তিমির বরণ—মিঃ এস, আর, হেমাদ, খেমকা, এস, সায়গল (ব্রিটিশ ডিসট্রি বিউটর্স) এবং শ্রীমতী সাধনার একজন বাঙালী বন্ধু (যিনি তার নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক) এই চিত্রখানির আর্থিক ব্যয়ভারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আগামী আগষ্ট মাসে সম্ভবতঃ চিত্রের কাজ আরম্ভ হচ্ছে। শ্রীমতী সাধনা বর্তমানে বম্বে ফিরে গেছেন ফিরে এলে এ বিষয়ে আরো সংবাদ দিতে পারবো বলে আশা করি।

শ্রীযুক্তা প্রতিভা শাসমল –

সর্বপ্রথম বাঙ্গালী মহিলা প্রযোজক—চিত্র ভারতীর শ্রীযুক্তা প্রতিভা শাসমল একখানি চিত্র গ্রহণের অনুমতি পেয়েছেন। কবিগুরুর 'শেষরক্ষা'র পর তারাশঙ্করের 'কবি'র চিত্ররূপ দেবেন বলে শ্রীযুক্তা শাসমল মনস্থ করেছিলেন। কোন বিশেষ কারণে 'কবি' আপাততঃ স্থগিত রইল। চিত্রামোদীদের ভিতর যাঁরা তারাশঙ্করের 'কবি' বইখানা পড়েছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন বাংলার পল্লীর কবিয়ালদের জীবনী নিয়ে লিখিত এই বইখানার চিত্ররূপ দিতে হলে কবিয়ালদের জীবন যাত্রার সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার প্রয়োজন—তাই শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর কর্তৃপক্ষদের এজন্য তাঁর বীরভূমস্থিত স্বগ্রামে যেয়ে কবিয়ালদের সংগে পরিচিত হতে আমন্ত্রণ করেছেন—যতদিন সে সুযোগ না আসে এবং পরবর্তী লাইসেন্স না পাওয়া যায় ততদিন অবধি 'কবি'র চিত্ররূপদেবার পরিকল্পনা স্থগিত থাকবে।

চিত্রভারতীর বর্তমান চিত্রের কাহিনী লিখেছেন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। 'সতী' অথবা 'সৌভাগ্যবতী' নাম নিয়ে এই চিত্রখানির কাজ আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে আরম্ভ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পরিচালনার ভার কে গ্রহণ করবেন এখনও স্থিরীকৃত হয় নি। আমরা চিত্র ভারতীর নূতন উদ্যমের সাফল্য কামনা করছি।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন—

এদের নিজস্ব ষ্টুডিওতে শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্রের পরিচালনায় 'পথের সাথী'র কাজ সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর উপন্যাস খানিকে ভিত্তি করে 'পথের সাথী' গড়ে উঠেছে। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, ইন্দু মুখার্জি, মিহির ভট্টাচার্য, রেণুকা রায়, সন্ধ্যারাণী, লীলা ও মীরা দত্ত প্রভৃতি।

এস, ডি, প্রোডাকশন—

খ্যাতনামা গীতিকার প্রণব রায়ের "রুম নাম্বার সেভেন' এর কাহিনী শ্রীযুক্ত সুকুমার দাসগুপ্তের পরিচালনায় কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে চিত্র-রূপায়িত হচ্ছে। সন্ধ্যারাণীকে চটুল রূপ-সজ্জায় এই চিত্রে দেখা যাবে। শ্রীমতী সাবিত্রী ও রবীন মজুমদারও অভিনয় করছেন! পরবর্তী সংখ্যায় 'রুম নাম্বার সেভেন' এর বিশদ বিবরণ দেবার ইচ্ছা রইল।

ইউরেকা পিকচার্স—

চিত্র সম্পাদক সন্তোষ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় ইউরেকা পিকচার্সের তৃতীয় বাংলা ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে। উড়োচিঠি-খ্যাত নাট্যকার নিতাই ভট্টাচার্য এবার ইউরেকার কাহিনী লিখেছেন। কাহিনীটি নাকি নানা দিক দিয়ে বৈচিত্রময়।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

এদের বাংলা ছবি দুই পুরুষ ও হিন্দি প্রচার মূলক চিত্র 'মাই সিসটার' মুক্তি প্রতীক্ষায়। 'বিরাজ বৌ'ও অবগুণ্ঠন উন্মোচনের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে

আছে। সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কৃষ্ণকান্তের উইল এর হিন্দি 'ওয়াসীয়ৎ নামা' সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় নার্স সিসির কাজও অনেক দূর এগিয়েছে। নার্স সিসিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন অসিতবরণ, ভারতী, ছবি বিশ্বাস, সুমিত্রা দেবী, লতিকা ব্যানার্জি, শৈলেন চৌধুরী প্রভৃতি। সুর সংযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন. শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক।

চিত্রামোদিরা শুনে খুশী হবেন—নিউ থিয়েটার্স শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'র চিত্রস্বত্ব মেসার্স গুরুদাস চ্যাটার্জি এণ্ড সন্স এর কাছ থেকে ক্রয় করেছেন।

শ্রীযুক্ত মধু বোস—

খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক মধুবোস একখানি চিত্রের লাইসেন্স পেয়েছেন। চিত্রখানি বম্বেতে গৃহীত হবে।

"কলিকাতাকে আবর্জনা মুক্ত কর"

'কলিকাতাকে আবর্জনা মুক্ত কর' এরূপ একখানি প্রচারমূলক চিত্র গ্রহণের অনুমতি পেয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটি স্পীকার শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুত্রদ্বয়। শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় চিত্রখানি পরিচলনা করবেন বলে প্রকাশ।

কল্পনা—উদয়শঙ্করের সর্বপ্রথম নৃত্য সম্বলিত চিত্র কল্পনা'র মহরৎ উৎসব গত ৩০শে মে সুসম্পন্ন হয়েছে। এই চিত্রে শ্রীযুক্ত শঙ্কর ও তাঁর স্ত্রী অমলা দেবীকে প্রধানাংশে দেখা যাবে।

ইউনিটি প্রডাকসন্স—

প্রযোজক পরিচালক মিঃ আর শর্মা তাঁর 'কুরুক্ষেত্র' চিত্রের বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ করে সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছেন। 'কুরুক্ষেত্র'র এখন সম্পাদনার কাজ চলছে। মিঃ শর্মা বর্তমানে একটী সামাজিক চিত্রের রূপ দিতে কাগজ পত্র নিয়ে ব্যস্ত।

ইউনিটির অন্যতম স্বত্বাধিকারী মিঃ এল পরাশর পাঞ্জাব সরকারের পক্ষ থেকে পাঞ্জাবের খ্যাতনামা কবি ও দার্শনিক সৈয়দ ওয়ারী শাহ'র জীবনী অবলম্বনে গৃহীত একখানি চিত্র পরিচালনা করবার ভার পেয়েছেন।

ইউনিটির মিঃ শর্মা ও পরাশর

শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

কবি, গায়ক, অভিনেতা ও রাজনীতিজ্ঞ শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ পর্দায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী রূপায়িত করবার জন্য একখানি লাইসেন্স পেয়েছেন। এই চিত্রে অভিনয় করবার জন্য স্বামীজির আত্মীয় স্বজনদের কাছে আবেদন জানান হয়েছে। আমরা হরীন্দ্রনাথের এই মহৎ কাজের সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

রূপশ্রী লিঃ—

খ্যাতনামা সমালোচক চন্দ্রশেখর তাঁর সর্বপ্রথম চিত্র 'মৌচাকে ঢিল' এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। চিত্রের শিল্পী নিবাচনের ভিতর দর্শকেরা দুজন নবাগত অভিনেত্রীর সন্ধান পাবেন। সুভদ্রা ও সুমিত্রা। এই নবাগতা শিল্পীরা দুটী বিশেষ ভূমিকায় 'মৌচাকে ঢিল' এ আত্মপ্রকাশ করবেন। তাছাড়া শ্রীযুক্ত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দু মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, ফণীরায়, বেলা মুখোপাধ্যাকেও নির্বাচনে দেখতে পাবেন।

আই, এফ, আই—বর্তমান জুন মাসে আই, এফ, আই'র মুক্তি প্রতিক্ষীত চিত্রগুলি! (১) দি স্টোর অব এ ডব্লু, আর, আই, এন। (২) ইণ্ডিয়া বিল্ডস হার ওয়াগন। (৩) আউট অব দি সয়েল। (৪) পটারিজ। (৫) কিপ স্মাইলিং। (৬) পাবলিক ট্রাষ্ট (এন-ও-আই)। (৭) ব্রাজিল টু ডে (আর, কে,

ও)। (৮) ডেনজারাস কামেণ্ট (এম, ও, আই)। (৯) সাবজেক্ট ফর ডিসকাসন।

চিত্ররূপা লিঃ—

শৈলজানন্দের কাহিনী অবলম্বনে এদের একখানি বাংলা চিত্রের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে বলে প্রকাশ।

মতিমহল থিয়েটার্স—

শৈলজানন্দের পরিচালনায় মতিমহল থিয়েটার্সের পৌরাণিক চিত্র শ্রীদুর্গার কাজ সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছায়া দেবী প্রভৃতিকে এই চিত্রে দেখা যাবে।

ষ্টাণ্ডার্ড পিকচার্স—

রা ম শা স্ত্রী-খ্যাত অভিনেতা-পরিচালক গজানন জাগীরদার ষ্টাণ্ডার্ড পিকচার্সের বৈরম খাঁ 'চিত্রের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। এই চিত্রে অভিনয় করছেন জাগীরদার, মেহতাব, সুরেশ, সুনলিনী দেবী, হানসা, ললিতা পাওয়ার ও আরো অনেকে। সংগীত পরিচালনা করছেন গোলাম হায়দার।

শ্রীযুক্ত দেবকী বসুর মেঘদূত—

কীর্তি পিকচার্সের 'মেঘদূতে'র পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন খ্যাতনামা প্রবীন পরিচালক দেবকী বসু। মেঘদূতের সুর সংযোজনা করবেন শ্রীযুক্ত কমল দাসগুপ্ত। বিভিন্নাংশে দেখা যাবে শ্রীমতী লীলা দেশাই, সাহু মোদক, আগা জান, কুসুম দেশ পাণ্ডে, হরি শিবদশানী, ওয়াস্তি, ও আরো অনেককে।

কালিকার নূতন নাটক—

কালিকার নূতন নাটক '২৬শে জানুয়ারী'র মহলা চলেছে। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে '২৬শে জানুয়ারী' উদ্বোধন হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি। নাটকখানি রচনা করেছেন খ্যাতনামা নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। '২৬শে জানুয়ারী'কে সর্বজনপ্রিয় করে তুলতে প্রযোজক শ্রীকালিদাস প্রচুর অর্থব্যয় করছেন—চেষ্টারও নাকি ত্রুটি হচ্ছে না। শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ দাসের উপর মঞ্চশয্যার ভার পড়েছে। বিভিন্ন চরিত্র চিত্রনে আত্মপ্রকাশ করবেন নরেশ মিত্র ইন্দু মুখার্জি, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রঞ্জিৎ রায়, তপন কুমার, ফণী, ভূপাল, জ্যোতির্ময়, বেচু, ভরত, মলিনা বেলা, উমা, বন্দনা প্রভৃতি।

জাতির মর্মভাঙা রক্তরাঙা সত্যোপলব্ধির দিন ২৬শে জানুয়ারী—কর্তৃপক্ষ সংবাদ পত্রে এই বলে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন—। সত্যকথা। জাতির কাছে এই ২৬শে জানুয়ারী একটী স্মরণীয় দিন হয়ে আছে— এই বিশেষ দিনটীকে লক্ষ্য করে যে নাটক রচিত হয়েছে—জাতির কাছে যে তার বিশেষ দাবী থাকবে একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কথা হচ্ছে ইতিপূর্বে 'শ্বেতজাতির প্রভুত্ব ঈশ্বরের বিধান' কথাকে সমর্থন করে কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রে যে লজ্জাকর বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন তার জন্যে ২৬শে জানুয়ারী সম্পর্কে এখনও আমরা সংশয়হীন হ'য়ে উঠতে পারি নি। তাই ২৬শে জানুয়ারীর শুভ উদ্বোধন দিবসের জন্য আমরা উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায় রয়েছি।

রঙমহল—

রঙমহল রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার মন্মথরায়ের পৌরাণিক নাটক 'খনা' নূতন বেশে সজ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কুইনাইনের অভাবে ময়দার বড়িকে কুইনাইনের প্রলেপ দিয়ে বাজারে যখন চালানো হয়—খরিদ্দারেরা তাকে যে সম্মানের সংগে গ্রহণ করে থাকেন—খনাকে তার চেয়ে বেশী সম্মান আমরা দিতে পারি না। নাটকখানি এখন অবধিও আমরা দেখে উঠতে পারি নি। ইতিমধ্যে দেখে আগামী সংখ্যায় এর সমালোচনা প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল।

ষ্টার থিয়েটার—এখানেও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর কঙ্কাবতীর ঘাটকে সংস্কার করে দর্শনী আদায় করছেন—এই সংস্কার কার্যের আমরা অনুমোদক নই, কেন, তার কৈফিয়ৎও আগামী সংখ্যার জন্যে রইল।

মিনার্ভা—শচীন্দ্রনাথের ধাত্রীপান্না নাট্য ভারতীতে সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল—কিন্তু নাট্যভারতীর অকস্মাৎ অন্তর্ধানে ধাত্রীপান্নার আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। সম্প্রতি মিনার্ভা তার আত্মপ্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন—ধাত্রীপান্নার আত্মপ্রকাশের সার্থকতাকে আমরা সর্বান্তকরণে স্বীকার করি।

রূপ-মঞ্চ

শ্রীরঙ্গম—শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' এখানে সাফল্যের সংগে অভিনীত হচ্ছে। মধ্য সাপ্তাহিক আকর্ষণ রূপে তুলসীদাস রাম নামের মহিমা কীর্তন করতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। 'বিন্দুর ছেলে'র সমালোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি তুলসীদাস সম্প্রতি আমরা দেখে এসেছি। তাই তুলসীদাস সম্পর্কে দু' একটী কথা এখানেই বলে রাখছি তুলসীদাসের প্রয়োগকর্তা যদি শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী হ'য়ে থাকেন—তুলসীদাস সম্পর্কে তাহ'লে আমাদের অভিযোগ অনেক আছে এবং ভাদুড়ী এর প্রয়োগকর্তা নন বলে মনে করেই আমরা তুলসীদাসের সমালোচনা করবো।

ইনসান চিত্রে 'শোভনা সমরথ'

রামায়ণ-লেখক সাধক তুলসীদাসের যৌবন থেকে চিত্রকূটে পৌঁছবার পূর্ব পর্যন্ত আখ্যানভাগ নাটকে স্থান পেয়েছে। নাট্যকার শ্রীযুক্ত সুরেশ চৌধুরী—ইতিপূর্বে হিন্দি গান লিখে খ্যাতি অর্জন করলেও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তুলসীদাসের মারফতেই তাঁর সংগে সর্বপ্রথম আমাদের পরিচয় ঘটলো। এবং এই পরিচয়ে চতুর নাট্যকার হিসাবে তিনি আমাদের মনে রেখাপাত করতে পারেন নি। সাধক এক রামায়ণ রচয়িতা রূপেই তুলসীদাস আমাদের কাছে পরিচিত, তাই নাটকে তুলসীদাসের সন্ন্যাস জীবনের প্রাধান্য দিলে তুলসীদাস নাটকের সার্থকতা যেমনি প্রকাশ পেত তেমনি জনপ্রিয়তার দিক থেকে নাটকখানি সাফল্য অর্জনে সমর্থ হতো। অথচ তা না দিয়ে সন্ন্যাস জীবনের পূর্বকালকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সাধক তুলসীদাসের একটু আভাস দিয়েছেন মাত্র এবং সেখান থেকে নাটকখানি তবু একটু জমেছে।

অভিনয়ে তুলসীদাস ও রত্নার ভূমিকায় নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও রাধারাণীর কথাই উল্লেখ করা চলে। নরহরির ভূমিকায় কালী সরকারের অভিব্যক্তিহীন অভিনয় পীড়া দিয়েছে। নরহরির স্ত্রীর ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভা চলন সই। ছোট্ট একটী ভূমিকায় শ্রীমতী নিভাননী কোমর দুলিয়ে বাহবা নিতে চাইলেও তাকে নিন্দা করবো না। রাজগুরুর ভূমিকায় যে পালোয়ানী ভদ্রলোক অভিনয় করেছেন—অভিনয় থেকে তার পালোয়ানী অংগভংগী বেশ হাসির খোরাক জুগিয়েছে। তার শিষ্যের ভূমিকায় মণি শ্রীমানি খানিকটা প্রশংসা পেতে পারেন। বিকৃত দর্শনের কতগুলি 'ব্যালটগাল" শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে আজো কায়েমী হয়ে আছে। বার বার প্রতিবাদ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ যে কেন তাদের বিদায়ের ব্যবস্থা করেন না—আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এরা যে নাটকের অংগহানি করে শুধু তাই নয়—নাট্যামোদী হিসাবে এদের দিকে তাকাতেও রুচিতে বাধে।

তুলসীদাসের দৃশ্যপটের প্রসংসা করবো। সংগীত যদিও নাটকের মূল আকর্ষণ, পাগলিনীর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন তার জন্য অনেকগুলি সংগীতই ব্যর্থ হয়েছে। তুলসীদাসের ব্যর্থতার মূলে কর্তৃপক্ষের সজাগ

দৃষ্টির অভাব বলেই আমাদের মনে হয়। অথচ সুদক্ষ অভিনেতৃ সম্মেলনে নাটকখানিকে আকর্ষনীয় করা যেত বলেই আমাদের বিশ্বাস—অন্ততঃ ধর্মপ্রাণ ও সংগীত প্রিয় নাট্যামোদীদের আনন্দ দিতে পারতো।

কর্তৃপক্ষ নাটকখানি দেখবার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সমালোচক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছিলেন—সাংবাদিকদের সংগে যোগাযোগ স্থাপনে কর্তৃপক্ষের এই সদ ইচ্ছাকে আমরা প্রশংসা করি।

পারিবারিক আনন্দানুষ্ঠান—

গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, রূপমঞ্চ সম্পাদকীয় বিভাগের সভাপতি শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান শৈলেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শুভ পরিণয় পাইকপারাস্থিত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সমীরার সংগে সুসম্পন্ন হয়েছে। এই বিবাহোপলক্ষে পাত্রপক্ষ কন্যা পক্ষের কাছে কোন দাবী না করে বিবাহের সমস্ত খরচ নিজেরাই বহন করেছেন।

এই বিবাহকে কেন্দ্র করে বধূ পরিচয়ের দিন রাত্রে ৭৪।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এক আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন অমূল্যবাবুর মাতা শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবী। সভায় কার্য পরিচালনা করেন অমূল্য বাবুর পিতৃব্য প্রবীণ শিক্ষক ও কবি শ্রীযুক্ত যতীশ মুখোপাধ্যায়। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের ভিতর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অনেকেই আবৃত্তি, গান, হাস্যরস, ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সংগীতাংশ ও কৌতুকানুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীযুক্ত পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রীতি দেবী মুখোপাধ্যায়, শ্যামলী মুখোপাধ্যায়, নীহার চক্রবর্তী ও রমেশ মুখোপাধ্যায়কে চার খানি বই উপহার দেন। 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হ'য়ে প্রীতি মুখোপাধ্যায় শৈলেশ মুখোপাধ্যায়কে সজনীকান্তের 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতা পুস্তকখানি উপহার দেন। এবং স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির জন্য শক্তিশ মুখোপাধ্যায়কে ও সত্যেন্দ্রনাথের বাংলাদেশ আবৃত্তির জন্য পরেশ মুখোপাধ্যায়কে রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় দু'খানি বই উপহার দেন। জলসানুষ্ঠানের পর শ্রীযুক্ত যতীশ মুখোপাধ্যায় এরূপ পারিবারিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, প্রতি সপ্তাহে সম্ভব না হ'লেও ১৫ দিন অন্তর প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহেই এরূপ মিলনানুষ্ঠানের প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই অনুষ্ঠানে পরিবারের নিকটতম আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবেরা উপস্থিত থেকে পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তার সমাধান করবেন। এই পারিবারিক দিকটা ছাড়া এরূপ মিলনানুষ্ঠানে নূতন সাহিত্য—বিভিন্ন সাহিত্যিকদের রচনা থেকে পাঠ ও আবৃত্তি—ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজের বিভিন্ন বিভিন্ন সমস্যা—নূতন নাটক ও চিত্র নিয়েও আলোচনা অপরিহার্য অংগ হবে। আজীবন শিক্ষাব্রতী অমূল্যবাবুর অন্যতম পিতৃব্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যতীশ বাবুকে সমর্থন করে এক বক্তৃতা করেন। সভানেত্রীর অভিভাষণের পর সভা ভংগ হয়। সভানেত্রী উপস্থিত সকলকে মিষ্টি বিতরণ করেন। **(—মণিদীপা)**

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির অধিবেশনে পরিচালক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

গত ১৩ই মে (১৯৪৫) বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির উদ্যোগে "রূপ-মঞ্চ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭৪।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ গৃহে একটি অধিবেশন হয়ে গেছে।

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় "আধুনিক দেশীয় চিত্র" সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন।

পরিচালক চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজ অভিজ্ঞতা সভ্যদের নিকট ব্যক্ত করেন এবং প্রথম শ্রেণীর চিত্র নির্মাণের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে বলেন যে, চিত্র প্রযোজক এবং পরিচালকদের মধ্যে অসহযোগীতাই এর প্রধান কারণ। "কোন রকমে চালিয়ে নাও"—প্রযোজকদের এই মূলমন্ত্র পরিচালকদের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। একাধিক পরিচালক যে সস্তার রুচি পরিচয় দিয়ে দর্শকবৃন্দের কাছ থেকে বদনাম কেনেন তার মূলে রয়েছে প্রযোজকদের অর্থের লোলুপ দৃষ্টি।

এঁদের দৃষ্টি ভংগি এতই পুরাণো যে কোন পরিচালক যদি নূতন প্রচেষ্টার জন্য অগ্রসর হন তো প্রযোজক দেন্ বিরাট বাধা। এ ছাড়া কর্মীসঙ্ঘের ভিতরও যোগসূত্র নেই। প্রথম এবং সত্যিকার উন্নত চিত্রের জন্য চাই যাকে বলে "Team Work কিন্তু কলিকাতার ষ্টুডিওতে এর ব্যতিক্রম। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর টেক্কা দিতেই ব্যস্ত। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আরও বলেন, চিত্র নির্মাণে লাহোর অন্যদেশের তুলনায় শিশু কিন্তু সেখানকার প্রযোজকদের উৎসাহ উদ্দম পরিচালকদের প্রতি সহানুভূতি এবং সহযোগীতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। পরিচালক যাতে করে উন্নত ধরণের চিত্র দর্শকদের উপহার দিতে পারেন তার জন্য যে কোন পরিমাণ অর্থব্যয় করতে তাঁরা কুণ্ঠিত নন্। যতদিন না পরিচালক এবং প্রযোজক-দের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন হবে এবং পরিচালক স্বাধীন ভাবে চিত্র নির্মাণে হাত দেবেন ততদিন চিত্র নির্মাণের উন্নতির কোনই আশা নেই এই বলে পরিচালক চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন।

সভায় অনেকে তর্ক বিতর্ক এবং আলোচনায় যোগ দেন।

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, কুমারী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত লাহিড়ী সভায় গান করেন।

সভার শেষে অতিথিবৃন্দদের জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সংহতি) মন্দার মল্লিক (মন্দার ফিল্ম), নারায়ন চৌধুরী (ওরিয়েণ্ট), দক্ষিণা বসু (যুগান্তর) গোপাল ভৌমিক (কৃষক), গনেশ দত্ত (পূর্ব্বাসা), তুষার মিত্র (শিশির), মনোজিৎ বসু, অখিল নিয়োগী (খেয়া) রণজিৎ কুমার সেন (বঙ্গশ্রী) শক্তিপদ রাজগুরু, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি গোস্বামী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। —শ্রীঅঃ

"ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি,"

দীর্ঘ পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আজ প্রতিষ্ঠানটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি যে শীঘ্রই একটা শক্তিশালী কমিটি গঠন করে নূতন পথ দেখাবে এরূপ আশা করা অন্যায় হবে না। কলিকাতা এবং বোম্বাইএ দপ্তর খোলা হবে এবং এই প্রতি-ষ্ঠানের উন্নতির জন্য যাতে সভ্য সংখ্যা বাড়ান যায় তার জন্য রীতিমত চেষ্টা চলেছে। দেশের শিল্পের যাতে প্রসার ঘটে তার জন্য শিল্পকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হবে এবং দেশীয় শিল্প দ্রব্যাদী সহ বাৎসরিক মেলার ব্যবস্থার বিষয়ে এই কমিটি বিশেষ চিন্তা করছেন। কমার্শিয়াল আর্ট এবং শিল্পকলা ডিজাইনের জন্য বিশেষজ্ঞও নিযুক্ত করা হবে। সম্ভব হলে দেশীয় শিল্প এবং চারুকলার সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ মাসিক পত্রও প্রকাশের আয়োজন চলছে।

কমার্সিয়াল আর্ট সংক্রান্ত উন্নতির জন্য সর্ব বিষয়ে এই প্রতিষ্ঠান যত্নবান হবেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট একটি মোটা টাকা সাহায্যের জন্য চিন্তা করছেন এবং অনুমানে মনে হয় দেশীয় করদরাজ্যও এই প্রগতিশীল শিল্প প্রতিষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথাযোগ্য সাহায্য করবেন।

সুচারুরূপে কাজ আরম্ভ করবার জন্য মূলধন ৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্প ব্যবসায়ীরা ও ২লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের জন্য ১৯৪১ সাল থেকে যাঁরা পরিশ্রম করছেন তাঁরাই এই ইন্‌ষ্টিটিউটের মূল এবং স্থায়ী সভ্য।

প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য—

কমার্সিয়াল আর্ট এবং শিল্পের নক্সার উন্নতির জন্য কাজ দেখান এবং কুটির শিল্পের অস্তিত্ব যাতে লোপ না পায় তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

আর্টিষ্ট ডিজাইনার্স প্রভৃতিদের সংগে শিল্প ব্যবসায়ী এবং সহরবাসীদের যোগসূত্র রক্ষা করা।

ভারতের কমার্সিয়াল আর্টিষ্ট এবং ডিজানাইরদের একটি তালিকা রাখা।

ভারত এবং ভারতের বাহিরে যাতে করে শিল্পকলার প্রসার হয় এবং সমাদর লাভ করে তার জন্য প্রদর্শনী এবং বাৎসরিক মেলার আয়োজন করা।

কোন্ কোন্ জাতীয় শিল্প জনসাধারণের সমাদর লাভ করে তার দিকে দৃষ্টি রাখা এবং জনমত গঠন করা।

শিল্পকলায় অভিনবত্ব বা অসাধারণ প্রতিভার জন্য পুরস্কার বিতরণ করা বা পারিশ্রমিক অর্থ প্রদান করা।

শিল্পকলা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া।

যে সমস্ত শিক্ষক এই শিল্প সম্বন্ধে ডিগ্রি নিতে চান, তাঁদের জন্য বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা।

ইন্‌ষ্টিটিউট্ এর সহিত যাতে করে যোগসূত্র রাখা সম্ভব হয় তার জন্য ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাহিরে প্রতিনিধি প্রেরণ করা।

শিল্পকলার উন্নতির জন্য মাসিক পত্রপ্রকাশ করা এবং পুরোদমে প্রচার কার্য চালান।

সভ্যদের সুবিধার জন্য শিল্পকলা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি 'আপ্-টু-ডেট' লাইব্রেরী স্থাপন করা এবং ক্লাব বা আড্ডার ব্যবস্থা করা যেখানে শিল্প বিষয়ে তর্ক বিতর্ক চলতে পারে।

এই ধরণের শিল্পকলা বিষয়ে যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থাকে তো সেই প্রতিষ্ঠানের সংগে সহযোগীতা করা।

প্রেসিডেণ্ট্, ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, অবৈতনিক সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ এবং অডিটরস্ নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। কোষাধ্যক্ষ নিয়মানুসারে ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্ এবং কমিটির সদস্যরূপে কাজ করবেন।

ইন্‌ষ্টিটিউটের চিফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার জেনারেল সেক্রেটারী রূপে কাজ চালাবেন।

প্রয়োজন মত বেতন্ দিয়ে কলিকাতা এবং বোম্বাইতে উপযুক্ত লোক রাখা।

১৯৪৫ সালের ৮ই মে তারিখে এমেরি সাহেবের বক্তৃতার সারাংশ।

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতবর্ষে এই আন্দোলন সম্পূর্ণ নূতন। আবার অপর দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতের অতীত কুটীর শিল্পের প্রবর্তন করা, যখন কারিকর নিজেই ছিল শিল্পী, রাজমিস্ত্রী, নিজেই ছিল ভাস্কর এবং গৃহ নির্মাতা, নিজেই ছিল ডিজাইনার। বর্তমান শিল্পের সঙ্গে কলা শিল্পের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে আসচে কিন্তু এ যোগাযোগ না রাখার কোন সঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পাই না।

বিজ্ঞাপন এবং প্রচার কার্যই যদি বর্তমান যুগের বিশেষত্ব বলে ধরে নেওয়া যায় তো বিজ্ঞাপন কেন কুৎসিত্ হবে এর কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ নেই।

আমি ভবিষ্যৎ ভারতের দিকে তাকিয়ে আছি, যখন শিল্প এবং কলাশিল্পের ব্যবধান দূর হয়ে জাতীয় উন্নতির জন্য তারা একতার পরিচয় দেবেন!

আমি এই আন্দোলকে ঐকান্তিক ভাবে সমর্থন করি কারণ শুধু যে শিল্পের উন্নতি এতে হবে এমন নয়, বরং শিল্পের সঙ্গে চারুকলার যোগ হয়ে সৌন্দর্য বাড়বে এবং এই সৌন্দর্যই আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর, মধুর, কল্যাণময় এবং শান্তিপ্রদ করে তুলবে। —শ্রীঅঃ

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির

উদ্যোগে অনুষ্ঠিত

তৃতীয় বার্ষিক জনপ্রিয়তা প্রতিযোগিতার ফলাফল

এগারো হাজারের অধিক দর্শকদের যোগদান !

(ক) শ্রেষ্ঠ তিনখানি—বাংলা চিত্র

(১) উদয়ের পথে—১১,৩২৭ (প্রথম)—নিউ থিয়েটার্স লিঃ। (২) সন্ধি—৬,৫২৩ (দ্বিতীয়)—চিত্র-রূপা লিঃ। (৩) ছদ্মবেশী—৬,২১৬ (তৃতীয়)—ডি, লুক্স পিকচার্স। (৪) মাটির ঘর—৪৬২৪ (ভারত লক্ষ্মী পিকচার্স)। (৫) পোষ্যপুত্র—২৪১২ (ভ্যারাইটী পিকচার্স। (৬) অভিনয় নয়—২,২০৮ (কালী ফিল্মস) (৭) নন্দিতা—১২১১ (রূপশ্রী লিঃ)। (৮) প্রতিকার—৮১০ (নিউ সেঞ্চুরী)। (৯) চাঁদের কলঙ্ক—৮০৯ (ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও)।

(খ) শ্রেষ্ঠ মৌলিক কাহিনী

(১) উদয়ের পথে—জ্যোতির্ময় রায় (প্রথম)—৮,০১৬।

(২) সন্ধি—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—১,৯০৪। (৩) প্রতিকার—প্রেমেন্দ্র মিত্র—২০০।

(গ) শ্রেষ্ঠ চিত্র রূপ (চিত্রনাট্য)

(১) উদয়ের পথে (প্রথম)—১০,৬১১। (২) সন্ধি—২,৫৯। (৩) মাটির ঘর—২৩০।

(ঘ) শ্রেষ্ঠ পরিচালনা

(১) বিমল রায় (উদয়ের পথে)—১১,৩০১। (অপূর্ব মিত্র—(সন্ধি)—২৪।

(ঙ) শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রহণ

(১) বিমল রায় প্রথম (উদয়ের পথে)—৯,৬১২। (২) প্রমথেশ বড়ুয়া (চাঁদের কলঙ্ক)—১,৪২৩। (৩) অজয় কর (সন্ধি)—২৯১।

(চ) শ্রেষ্ঠ শব্দ গ্রহণ

(১) অতুল চট্টোপাধ্যায়—(প্রথম) (উদয়ের পথে) ৯,২৩৬। (২) ... (চাঁদের কলঙ্ক)—৬৪৯। (৩)—(সন্ধি)—৬৪০। (৪) —(বিদেশিনী)—২০০। (৫)—(নন্দিতা)—২০০।

(ছ) শ্রেষ্ঠ মৌলিক সুর সংযোজনা

(১) শচীন দেববর্মন (প্রথম)—(ছদ্মবেশী)—৫,০২৬। (২) অনিল বাগচী (সন্ধি)—৪,৬০৩। (৩) রাইচাঁদ বড়াল (উদয়ের পথে)—৬০১। (৩ক) কমল দাশগুপ্ত (নন্দিতা)—৬০১। (৪) সুবল দাশগুপ্ত (চাঁদের কলঙ্ক)—৪০২। (৫) গিরীন চক্রবর্তী (অভিনয় নয়)—২১২।

(জ) শ্রেষ্ঠ তিন জন অভিনেতা

(১) রাধামোহন ভট্টাচার্য (১ম) (উদয়ের পথে)—৬,৮১৯। (২) ছবি বিশ্বাস (২য়) (ছদ্মবেশী)—৫,২৩১। (৩) বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (৩য়) (উদয়ের পথে)—৩,৪১২।

(৪) { অহীন্দ্র চৌধুরী (মাটির ঘর)—১৬১৩। দেবী মুখার্জি (উদয়ের পথে)—১৬১৩। }

(৫) ফণীরায়—(সন্ধি)—১৬০০। (৬) জহর গঙ্গোপাধ্যায় (মাটির ঘর)—১২০০। (৭) রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (মাটির ঘর)—৬০০। (৮) অমর মল্লিক (শেষরক্ষা)—৪০৭। (৯) প্রমথেশ বড়ুয়া (চাঁদের কলঙ্ক)—৪০৩। (১০) শৈলেন চৌধুরী (প্রতিকার)—৪০২। (১১) রবীন্দ্র মজুমদার (নন্দিতা)—২১৩। (১২) প্রমোদ গাঙ্গুলী (পোষ্যপুত্র)—১৮৭।

(ঝ) শ্রেষ্ঠ তিনজন অভিনেত্রী

(১) সুমিত্রা দেবী (প্রথম) (সন্ধি)—৬,৪১৫ (২) বিনতা বসু—দ্বিতীয় (উদয়ের পথে)—৪,৮০২। (৩) রেণুকা রায়—তৃতীয় (অভিনয় নয় ও পোষ্যপুত্র)—৩,৪০৭।

(৪) { মলিনা দেবী (মাটির ঘর)—২৮১৪। রেখা মল্লিক (মিত্র) (উদয়ের পথে)—২৮১৪। }

(৫) পদ্মা দেবী (শেষরক্ষা ও মাটির ঘর)—১,৪২৩। (৬) কানন দেবী (বিদেশিনী)—৬১৯।

(৭) { পূর্ণিমা (নন্দিতা)—৪০১। সুপ্রভা মুখার্জি (অভিনয় নয়)—৪০১। }

(৮) ছায়া দেবী (সমাজ)—২০১।
যমুনা দেবী—(চাঁদের কলঙ্ক)—২০১।
সন্ধ্যারাণী—(ছদ্মবেশী)—২০১

(ঞ) শ্রেষ্ঠ গান (কথা)

(১) ৺অজয় ভট্টাচার্য (ছদ্মবেশী) ৫,৬:৯। (২) শৈলেন রায় (উদয়ের পথে) ৩,৫০৩। (৩) প্রেমেন্দ্র মিত্র (প্রতিকার)—১,২০২। (৪) প্রণব রায় (ঐ)—৭২৯।

(ট) শ্রেষ্ঠ দৃশ্য রচনা

(১) উদয়ের পথে—৮,২৯৮। (২) মাটির ঘর—১,৩৩৬। (৩) চাঁদের কলঙ্ক—১,১৭২। (৪) সন্ধি—৪০২। (৫) বিদেশিনী—২০৩।

তৃতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতায় বাংলা বর্ষানুযায়ী নির্মিত বাংলা চিত্রগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এবার, গত ১৯৪৪ সনে মুক্তি প্রাপ্ত চিত্র এবং বাংলা ১৩৫২ সালের ৩০শে চৈত্র অবধি মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্রগুলিই স্থান পেয়েছে। প্রায় ১২,০০০ শত দর্শক এবার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। গত বছরের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি দর্শক বৃন্দকে সংঘবদ্ধ করে দিনদিন যে জনপ্রিয়তার দিক এগিয়ে যাচ্ছে বর্তমান বছরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী দর্শকদের সংখ্যা থেকেই তা বোঝা যায়।

(স্বাঃ) ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)।

(স্বাঃ) সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক)।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির ফলাফল এই সংখ্যায় মুদ্রণের জন্য কাগজ প্রকাশে কয়েকদিন বিলম্ব হলো। আশা করি পাঠকবর্গ সেজন্য ক্ষমা করবেন। আগামী সংখ্যা 'রতীন স্মৃতি' সংখ্যা রূপে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতা নিয়ে আগামী সংখ্যায় সমালোচনা করবার ইচ্ছা রইল। —(সম্পাদকঃ রূপ-মঞ্চ)।

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্য-
কলার সচিত্র মাসিক।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির
মুখপত্র।

কার্যালয়ঃ
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: বি, বি,: ৪২৯২

প্রতি বাংলা মাসের ৩০শে
রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হয়।
বর্তমানে প্রতি সংখ্যার:
মূল্য আট আনা।
সডাক এক বছরের গ্রাহক মূল্য
আট টাকা।
এক বছরের কম কাহাকেও
গ্রাহক করা হয় না।
নূতন লেখকদের উপযুক্ত রচনা
রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হয়।
অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠাবার
দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি না।

—পৃষ্ঠপোষকতায়—
নিতাইচরণ সেন
এন, সি, ঘোষ
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
বিভূতি ভূষণ দত্ত
দীনেশ দত্ত
এস, কে, রায়
এইচ বোর্ণ

রূপ-মঞ্চ

৫ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যাঃ আষাঢ়ঃ ১৩৫২

হরিজন রতীন্দ্রনাথ—

৩১শে জ্যৈষ্ঠ। বৃহস্পতিবার। শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে 'তুলসীদাসের' অভিনয় হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে বহু সাংবাদিক বিভিন্ন পত্র পত্রিকার পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়েছেন। রূপমঞ্চের তরফ থেকে আমিও তাঁদের দল ভারী করে বসে আছি। অভিনয়ের সময় পেরিয়ে গেলো। অভিনয় আরম্ভ হচ্ছে না। উপস্থিত নাট্যামোদীরা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তাঁদের গুনগুনানি অধৈর্য-মনের পরিচয় দিতে লাগলো।

সংকেত ধ্বনি বেজে উঠলো। অভিনয় আরম্ভ হবে। পর্দা উত্তোলনের সংগে সংগে নাটকের কোন চরিত্রটীর আত্মপ্রকাশ হয় নাট্যামোদীদের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ। পর্দা উঠলো। কিন্তু নাটকের কোন চরিত্রই আত্মপ্রকাশ করলো না। আত্মপ্রকাশ করলেন ঋষি মনোরঞ্জন। সাধারণ বেশে। তাঁকে দেখে সমস্ত গুনগুনানি থেমে গেল। শোকে মুহ্যমান—নিশ্চল প্রতিমূর্তির মত তিনি এসে দাঁড়ালেন। তাঁর আর্তরূপ জানিয়ে দিল, আমি আজ এমন একটি দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি, যে নির্মম সত্যটী প্রকাশ করতে আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে।

"আপনারা শুনে আমারই মত মর্মাহত হবেন," অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মনোরঞ্জন বলতে লাগলেন, "আমরা খবর পেলাম, চিত্র ও ছায়া জগতের তরুণ শিল্পী, একনিষ্ঠ সেবক, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বিকেল ৪॥টায় মারা গেছেন। ছোট ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ আপনাদের কাছে বহন করে এনেছি, বেশী বলবার আমার শক্তি নেই। আশাকরি তা বুঝতে পারবেন। কিছুক্ষণের জন্য অভিনয় বন্ধ থাকবে।"

অভিনয় বন্ধ রইল। দমকা হাওয়ার মত মনোরঞ্জনের এই নির্মম সংবাদটী প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত আলাপ আলোচনাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। দু'মিনিট পূর্বেও দর্শকদের যে প্রাণ-চাঞ্চল্যে প্রেক্ষাগৃহটী মুখরা হয়ে উঠেছিল, দু'মিনিট পরে সেখানে নেমে এল নিশ্চল নিস্তব্ধতা। একটা

শোকের . ঝড় বয়ে গেছে সেখান দিয়ে। বাতাসের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে দর্শকদের সমস্ত গুনগুনানি। এই থমথমিয়ে ওঠা আবহাওয়ায় দর্শকেরা, সংবাদিকরা কেবল পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করছেন। তাঁদের দৃষ্টি এই সংবাদটীকে সত্য বলে মেনে নেবার অসমর্থতাই জানিয়ে দিচ্ছে। 'হ্যাঁ এইত সেদিন কত আলাপ আলোচনা হয়েছে, ট্রামে চড়ে অনেক দূর একসংগে গেলাম, ঐ ত ঐ রাস্তার মোড়ে পাঞ্জাবীতে হাত দিয়ে ট্রামের জন্ম অপেক্ষা করতে দেখেছি, রিকসায় চড়ে ফিট ফাট হয়ে সকলের সকৌতুক দৃষ্টির মাঝ দিয়ে যেতে দেখেছি, না না এ হতে পারে না। সেদিন কেন, আজও সকালে তাঁর সংগে দেখা হয়েছে।' এই সংবাদটীকে কেউই সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না, আমিও নই। কিন্তু আমাদের পারা না-পারার জন্ম সত্য কোনদিন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আত্মপ্রাকাশ করে না। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু আমাদের প্রয়োজনে দিন ক্ষণ দেখে আসে না, আসে তার নিজের খামখেয়ালীতে। এক্ষেত্রে ও তার ব্যতিক্রম হলো না। এমনি ভাবে দুর্গাদাস ও অজয়ের মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। বিশ্বনাথের মৃত্যু সংবাদও এসেছিল এমনি আকস্মিকভাবে। তবু মনে মনে সান্ত্বনা পেলাম এইমনে করে, একজন অভিনেতার মৃত্যু সংবাদ বরণ করে নেবার এই বুঝি উপযুক্ত স্থান। পাদপ্রদীপের আলোক মালার সামনে একদিন তাঁর সংগে পরিচয় হয়েছিল, পাদপ্রদীপের আলোক মালার সামনে বসে তাঁর পরিচয়ের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হবার সংবাদটীকে স্বীকার করে নেবার সময় প্রথম পরিচয়ের ছবিটা মনে ভেসে উঠে অনুভূতির নাড়ীতে যে মোচড় দিল, তার বেদনা আমার মত সেদিন অনেক বন্ধুই যে অনুভব করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অভিনয় আরম্ভ হলো। কিন্তু সহজ এবং সুস্থ মন নিয়ে যেমনি শিল্পীরা পাচ্ছিলেন না অভিনয় করতে, তেমনি সহজ মন নিয়ে সে অভিনয় উপভোগ করার অপারকতাই ছিল আমাদের মাঝে। অসুস্থ-মন নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে বসে থাকা সম্ভব হলো না। ছুটে এলাম বাইরে। শ্রীরঙ্গমের জনৈক বন্ধু খবর দিলেন, রতীনের মৃতদেহ থিয়েটারে নিয়ে আসা হচ্ছে। জহর এবং অন্যান্য শিল্পীরা শিল্পীর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে এসে নামালেন। ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে ঢেকে রাখা হয়েছে—কে বলবে রতীনের মৃত্যু হয়েছে। ফুল শয্যায় গভীর নিদ্রায় তিনি মগ্ন। শিল্পীর নশ্বর দেহের কাছে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। কথা বলার ভাষা আমার হারিয়ে গিয়েছিল। আনুষ্ঠানিক মতে হয়ত ফুলদিয়ে অঞ্জলি দেওয়া উচিত ছিল। কাগজের প্রতিনিধি হিসাবে, দর্শক সমাজের পক্ষ থেকে বলা উচিত ছিল, গভীর শোক প্রকাশ ও শ্রদ্ধা নিবেদন কচ্ছি, কিন্তু শোকের আঘাত যখন অন্তরের অন্তস্থলে যেয়ে পৌঁছোয়, বাইরের অনুষ্ঠান সেখানে লজ্জায় আত্মগোপন করে।

* * *

অভিনেতা রতীন্দ্রনাথের সংগে পরিচয় অনেক দিনের হ'লেও—ব্যক্তিগত আলাপ খুব বেশী দিনের নয়। তিনি অভিনেতা আমি দর্শক—তিনি অভিনেতা আমি সমালোচক এবং এইসূত্র থেকেই মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ইউরেকা পিকচার্সের কার্যালয়ে প্রথম আলাপে নাট্য ও চিত্র জগতের প্রতি তাঁর দরদী মনের পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কোন কার্যোপলক্ষে শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের সংগে দেখা করতে ইউরেকা পিকচার্সের অফিসে গিয়েছি, রতীন বাবুও সেখানে। আমি এবং বীরেন বাবু কথা বলছি— বীরেন বাবু রতীন বাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "রতীন এঁর সংগে তোমার পরিচয় নেই বুঝি!" বীরেন বাবুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই তিনি বল্লেন, "পরিচয় আছে তবে আলাপ নেই। এই একটু পূর্বেই আপনাদের কথা বলছিলাম এঁদের (ইউরেকার অন্যান্য

বন্ধুদের দেখিয়ে), আজীবন সাধনাকে স্বীকার করবার মত অন্ততঃ আমাদের জগতে কেউ আছেন-এই দুর্গাদাস দেখেই তা মনে হচ্ছে (হাতে ছিল তাঁর সদ্য প্রকাশিত দুর্গাদাস)।

তারপর কথার মোড় ফিরিয়ে বীরেনবাবু এবং আরো কয়েকজনকে লক্ষ করে বল্লেন, "জানেন বীরেনবাবু আমার চোয়ালের প্রতি এঁদের ভারী আক্রোশ"--সবাই জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন রতীনবাবুর দিকে—রতীন বাবুকে বলতে না দিয়ে ব্যাপারটা আমিই খুলে বল্‌লাম। রূপমঞ্চের পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ থাকতে পারে, কোন চিত্র সমালোচনা প্রশংগে রতীন বাবুর 'চোয়াল'কে আক্রমণ করে বলা হয়েছিল 'বোয়াল মাছের চোয়াল', কারণ চিত্রে রতীন বাবুর চোয়ালটা কোন কোন স্থানে বড় বিশদৃশ্য দেখাতো। সেদিন সকলেই এই ব্যাপারটা উপভোগ করলাম। কৌতুক উপভোগ করবার পর অকপট ভাবে রতীন বাবু বল্লেন, 'বাস্তবিকই সিনেমার দৌলতে ওটাকে যেন একটু বাড়তি মনে হয়।' নিজের দুর্বলতাকে এরূপ সহজ এবং সরল ভাবে স্বীকার করে নেবার মত মনের প্রসারতা খুব অল্প শিল্পীর ভিতরই অমি দেখেছি। তাই বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের বিরাগ ভাজনই হ'য়ে পড়ি। রতীন বাবু সম্পর্কে এই ব্যতিক্রম তাই আমায় মুগ্ধ না করে পারেনি।

রতীন্দ্রনাথের আর একটা দিকের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম—তাঁর প্রগতিশীল মন চিরদিন নূতনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে। আমাদের চিত্র ও নাট্য জগত নূতন ভাবধারা ও প্রকাশ ভংগী প্রবর্তনে ব্রতী হউক, মনে প্রাণে তিনি তার কামনা করতেন। জাতীয় আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে তুলতে আমাদের চিত্র ও নাট্যলোকের দায়িত্ব যে কোন অংশে কম নয়—তিনি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন - একদিন এই প্রসংগে কথা হতে হতে তিনি উত্তেজিত ভাবে বলেছিলেন, "একদিন আসবে যেদিন জাতির মর্মবাণী ধ্বনিত হয়ে উঠবে চিত্রে ও মঞ্চে—সেদিন আর্থিক তাগিদে নয়, জাতির প্রয়োজনের তাগিদে সত্যিকারের আদর্শ জাতীয় নাট্যমঞ্চ গড়ে উঠবে।" রতীন্দ্রনাথের এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক উক্তি আজ একটুকুও ম্লান হয়নি আমার কাছে। আজ তাঁকে এবং একসংগে আর একজন ভারতের মুক্তিকামী নেতার কথা মনে পড়ছে—যাঁর প্রতি রতীন্দ্রনাথেরও ছিল অসীম শ্রদ্ধা ও আশা—

তিনি একদিন বলেছিলেন, 'বিপ্লবী কখনও নৈরাশ্যবাদী হ'তে পারেন না। যিনি বিপ্লবী—তিনি মনে করবেন, আজ আমরা কৃতকার্য না হলেও একদিন আসবে, যেদিন বিপ্লব বিজয়ী হবে—এই বিজয়ের জন্য যদি যুগ যুগান্তর-ও কেটে যায় তবু বিপ্লবীর নিরানন্দ হলে চলবে না।" রতীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে এই কথার বিশ্বাসী ছিলেন—চিত্র ও নাট্যজগতের বর্তমান নৈরাশ্যজনক অবস্থায় অনেকের মত তাঁকে ঝিমিয়ে পড়তে দেখিনি। মনে প্রাণে ছিলেন তিনি বিপ্লবী, তাই চিত্র ও নাট্য জগতের বর্তমান নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিকে ভেদ করে যে সুষ্ঠ ও কল্যাণ-কর রূপের আবির্ভাব হবে, সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আশাবাদী। তাই নূতন ভাব ধারা প্রবর্তনে—নূতন আদর্শ নিয়ে যিনিই এগিয়ে এসেছেন, গভীর শ্রদ্ধার সংগে তাঁকে স্বীকার করে নেবার মত উদারতা কখনও রতীন্দ্রনাথের ভিতর অভাব হয়নি। বাংলার নাট্যজগতের অন্যতম প্রগতিশীল নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের প্রতি তাই ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। রাষ্ট্রবিপ্লবের নূতন প্রকাশভংগী—পরীক্ষামূলক ভাবে নাটক রচনায় শচীন্দ্রনাথের দুঃসাহ-সিকতার কথা বলতে বলতে তিনি অভিভূত হ'য়ে পড়তেন।

রতীন্দ্রনাথ কত বড় শিল্পী ছিলেন কি না ছিলেন তা আমাদের বিচার্য নয়—তা বিচার করবার সুযোগও আর আমাদের আসবে না। রতীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরে চিত্র ও নাট্যমঞ্চের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাই প্রত্যেক চিত্র ও নাট্যামোদীর অন্তরে যে তাঁর বিয়োগ-ব্যাথা নাড়া দিয়ে আসবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রতীন্দ্রনাথ আজ আর আমাদের মাঝে নেই, বেঁচে থাকতে তিনি যাঁদের খ্যাতি এবং অখ্যাতি পেয়েছিলেন, চিত্র ও নাট্যজগতের সেই বন্ধুরা তাঁর মৃত্যুতে নিজেদের যে একজন খুব আপনার জন হারিয়েছেন—মনের মধ্যে বার বার কী এই কথাটাই স্পন্দিত হচ্ছে না?

গভীর বেদনার সংগে একটা কথা এখানে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি, বেঁচে থাকতে আমরা অনেকেই চিত্র ও নাট্যজগতের শিল্পীদের কোন মর্যাদাই দেই না। এঁরা আমাদের সমাজের চোখে হরিজন। আমাদের মাঝ থেকে যখন এঁরা চলে যান তখনও এঁদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতে আমরা নারাজ। 'Man wars not with the dead' বলে যে ইংরেজী কথাটা আছে—আমাদের বাঙ্গালী জীবনে তার ব্যতিক্রম দেখতে পাই। আমাদের বাঙ্গালী জীবনের এই কলঙ্ক কী চিরদিন দুরপনেয়ই থাকবে? রতীনের স্মৃতিকে দর্শক এবং পাঠক সমাজের মাঝে চির জাগরূক রাখবার জন্যে রূপমঞ্চ যে আয়োজন করেছে, তাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্য আমরা সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম, সহযোগিতা এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি যাঁদের পেয়েছি, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁরা এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন, যিনি যতখানি শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য নন, রূপমঞ্চ তাঁকে তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা দিচ্ছে। তাই রূপমঞ্চের এই আয়োজন তাঁরা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন নি। গভীর মর্ম বেদনার সংগেই এ কথা বলতে হচ্ছে। তাঁদের শুধু আমার এইটুকু বলার, তাঁরা ভুলে যান কেন, যে-শ্রদ্ধা আমরা দিচ্ছি তা ব্যক্তি রতীন্দ্রনাথকে নয়—শিল্পী রতীন্দ্রনাথকে—যে শিল্পী আমাদেরই এই হরিজন-জগতের একজন। আর শ্রদ্ধা নিবেদন করবার সময় যদি তৌলদণ্ডে তুলে তাকে বিচার করতে হয়—আন্তরিকতার দিক থেকে তাহলে কী অনেকখানি ফাঁকা থেকে যায় না? আমাদের সমাজ জীবনে অভিনেতা অভিনেত্রীরা কতটুকু মর্যাদা পেয়ে থাকেন? সামাজিক জীবনে তাঁদের কী অপাঙক্তেয় করে রাখা হয় নি? অথচ চিত্র ও নাট্যকলা সুষ্ঠু রূপ পেল না বলে আমাদের সমাজ ধুরন্ধরদের অভিযোগের অন্ত নেই। আজ যদি চিত্র ও নাট্য জগতের শিল্পীদের আমরা সামাজিক মর্যাদা না দিতে পারি—চিত্র ও নাট্যকলার কল্যাণের রূপ কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে বর্বরতা। যতদিন আমাদের সমাজের চোখে এঁরা সমাদৃত না হবেন, রূপমঞ্চ এঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে একটুকুও কার্পণ্য করবে না—চিত্র ও নাট্য জগতের নগণ্যতম একজন শিল্পীর সম্পর্কেও আমাদের এই কথা।

চিত্র ও নাট্য জগতের কর্মীদের বিরুদ্ধেও নানান অভিযোগ আছে—যা স্বতঃই আমাদের কাণে এসে আঘাত করে—রতীন্দ্রনাথও তা নিয়ে খুব বেদনা অনুভব করতেন। পরস্পরের ভিতর হৃদ্যতার অভাব। চিত্র ও নাট্যজগতের আমরা একে অপরকে সহ্য করতে পারি না। পুরাতনের খ্যাতিকে ম্লান করবার সম্ভাব্য নিয়ে যদি একজন নবীন অভিনেতা আত্মপ্রকাশ করেন—নূতন দৃষ্টি ভংগী নিয়ে যদি নূতন পরিচালক "স্ক্রীপ্টের খাতা নিয়ে বসেন—নূতন প্রযোজকের যদি আবির্ভাব ঘটে—নূতন একটী পত্রিকা যদি জন সাধারণের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে নেয়—পুরোনদল সহজ-ভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারেন না। আমাদের মনের এই অপ্রসারতার জন্য—রতীন্দ্রনাথ দুঃখ করতেন। নূতন যদি কোন চমক লাগা রং নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো—পুরাতনের ক্রূর অগ্নিবর্ষি দৃষ্টিতে তাকে শুকিয়ে যেতে হয়। এক মঞ্চে—এক দৃশ্যপটে—এক সংগে অভিনয় করেও একে অপরকে স্বীকার করে নেবার উদারতা আমাদের ভিতর খুব কমই দেখা যায়। বাংলার চিত্র ও নাট্য জগতের শিল্পীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নেহাৎ অমূলক নয়।

আসুন, আজ আমরা দর্শক, সাংবাদিক, শিল্পী, চিত্রও নাট্য জগতের বিভিন্ন বিভাগের বন্ধুরা একটা সাধারণ মঞ্চ তৈরী করি, যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে খুব সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারবো। তাহলেই শত শত রতীনের মৃত্যুকে আমরা আমাদের মনের প্রসারতা ও আন্তরিকতা দিয়ে চির স্মরণীয় করে রাখতে পারবো। আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনের বন্ধুদের ধন্যবাদ, এ বিষয়ে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন বলে।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়।

রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলার চিত্র ও নাট্য জগতের অনেকেরই অগ্রজ স্থানীয়। আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শোকসভায় পঠিত তাঁর এই অভিভাষণ থেকে রতীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর কতখানি স্নেহ ছিল অতি সহজেই বোঝা যাবে।]

আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন প্রচার করেচেন, আজকায় এই শোক-সভায় প্রধান বক্তারূপে মঞ্চ দখল করব আমি। আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন জানেন না মঞ্চে আমি মূক, বক্তৃতায় আমি অসমর্থ। তা ছাড়া যাঁর স্মৃতি নিয়ে এই সভা আহূত, সেই রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমার অনুজ। জ্যেষ্ঠ অনুজের শোকে কাঁদে, বক্তৃতা করে না।

জ্যেষ্ঠ অনুজের শোকে বক্তৃতা করেনা, কিন্তু দশজনকে ডেকে শোনায়. ভাই তার কি প্রিয়ই ছিল, কত গুণেরই না অধিকারী ছিল। আমিও তাই শোনাতে চাই। শোনাতে চাই রতীনের মত মিষ্টভাষী, সদালাপী, পরদুঃখকাতর, আদর্শনিষ্ঠ, সহকর্মী সুহৃৎ আমার এই দীর্ঘ জীবনে খুব বেশী পাইনি। বছরের পর বছর, দশ বছরেরও অধিককাল, প্রায় প্রত্যেকটি প্রভাতে তিনি আমার কাছে উপস্থিত থাকতেন, কচিৎ কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটেচে। মৃত্যুর দিনেও বেলা পৌণে দুটো পর্যন্ত তিনি আমারই পাশে বসে তাঁর প্রিয়তম বন্ধু সন্তোষ সিংহ এবং স্নেহের পাত্র মিহির ভট্টাচার্যের সঙ্গে কতই না রহস্য করে গেছেন। তখন কেইবা জেনেছিলাম তার আড়াই ঘণ্টা পরেই মর্ত্যে মৃতদেহটি ফেলে রেখে তিনি অমৃতলোকে চলে যাবেন! এত আকস্মিক তাঁর তিরোভাব যে আজও, ঠিক এক পক্ষ পরেও, সংশয় এসে চিত্তকে নাড়া দিয়ে জানতে চায় সত্যই কি রতীন নেই! আশে-পাশে চেয়ে দেখে বুঝতে পারি রতীন আমাদের মাঝে সত্যই আর নেই! রতীন নেই, কিন্তু তাঁর স্মৃতি মনকে ছেয়ে রেখেচে। সেই স্মৃতি নিয়েই তাঁর বন্ধু আমরা আজ সমবেত হয়েচি এই মঞ্চে, যেখানকার পাদ প্রদীপের আলোয় অভিনেতারূপে তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁর অভিনেতৃ-জীবনের ইতিহাস আমি সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশ করিচি, এখানে তাঁর পুনরাবৃত্তি আর করব না। শুধু বলব, তিনি ছিলেন একজন প্রগতিশীল অভিনেতা, নাটকের নব নব রূপদানে তাঁর উৎসাহের অবধি ছিলনা, তার জন্য শ্রমে ছিলনা কুণ্ঠা।

নাটক নিয়ে আমি কতগুলি দুঃসাহসিক experiment করিচি। তার কতগুলি আমারই অক্ষমতার জন্য ব্যর্থ হয়েচে, কতগুলি উৎরেও গেছে। যে গুলি উৎরে গেছে সেগুলি নিয়ে experiment করবার সুযোগই আমি পেতাম না, যদি না কয়েকটি প্রগতিশীল অভিনেতা আমাকে সমর্থন করতেন। অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী বরাবরই আমার খেয়ালকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেচেন। 'তটিনীর বিচারে' যে টেক্‌নিক আমি অবলম্বন করি, তাতে নাটকের গতির সঙ্গে মঞ্চের গতির একটা সামঞ্জস্য রেখে অভিনয়কে speedy করে তোলবার ইচ্ছা আমার ছিল। মঞ্চমালিকরা নাটকখানি নির্বাচন করলেন, কিন্তু পরিচালক দুর্গাদাস বেঁকে বসলেন। তিনি বল্লেন, ক্ষণস্থায়ী ছোট ছোট দৃশ্য নাটকের রসহানি করবে। রতীন, সন্তোষ, জহর আমার পক্ষ অবলম্বন করলেন। মঞ্চমালিক দুর্গাদাসকে অব্যাহতি দিয়ে নটসূর্য অহীন্দ্রকে আনলেন। অহীন্দ্র বোঝালেন রসহানির কোন ভয় সত্যি সত্যিই নেই। পরিচালনার ভার তিনি গ্রহণ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করলেন যে, কার্যান্তরে নিযুক্ত থাকবার জন্য তিনি উদ্বোধনের মাত্র তিনটি দিন আগে সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারবেন। তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে যাবেন। মহলা তদনুযায়ী দিয়ে রাখলে শেষের তিনটি রিহার্স্যালে তিনি সব ঠিক করে নেবেন। তাঁর মুখের কথা কিন্তু আমার মনে তেমন উৎসাহের সঞ্চার করতে পারল না। এগিয়ে এলেন রতীন, সন্তোষ, জহর। অহীন বাবুর অনুপস্থিতিতে সকালে বিকেলে রাত্রে অসাধারণ পরিশ্রম করে নাটকখানি তাঁরা অভিনয়োপযোগী করে

রাখলেন। অহীন্দ্র এসে শেষ তুলি বুলিয়ে দিলেন। দর্শকরা নতুন টেক্‌নিক গ্রহণ করলেন। রতীন অগ্রগামী না হলে তা হতে পারত কিনা সন্দেহ।

এই টেকনিককে আরো উন্নত করবার চেষ্টা করা হোলো 'সংগ্রাম ও শান্তিতে'। তখন অবশ্য গোড়া থেকেই অহীন্দ্রকে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও এক অভিনব বিপদ দেখা দিল। দৃশ্যপট তৈরি করবার ভার যাঁর ওপর ছিল, তিনি উদ্বোধনের তিন দিন আগেও শেষ দৃশ্যটি তৈরি করে দিলেন না। খুব তাড়া দেবার পর উদ্বোধনের দুদিন আগে যে দৃশ্যপট তিনি তৈরী করে দিলেন তা দেখে আমাদের সবারই চক্ষু চড়কগাছ! দৃশ্যপট একটা হয়েচে, কিন্তু তা দিয়ে নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বলা হোলো, একদিনে নাটকের প্রয়োজন মতো Setটি তিনি তৈরি করে দিতে পারবেন কি না? তিনি সাফ জবাব দিলেন, পারলেও তিনি তা করবেন না, যেহেতু তাঁর ধারণা তিনি ঠিক Setই তৈরি করেচেন। অহীন্দ্র খাপ্পা, আমরা হতবাক,মালিক শোনালেন, Advance Booking খুব ভালো, উদ্বোধনের তারিখ বদলানো যাবে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমরা কিছুই ঠিক করতে পারি না। রতীন আমাকে এক পাশে টেনে নিয়ে বল্লেন—"স্যার রাগ যদি না করেন আমি একটা কথা বলি।"

বল্লাম—"বল।"

রতীন বল্লেন—"ও সেটটা বাতিল করাই যাক্।"

"—শেষ দৃশ্যটা কি পর্দা টাঙিয়ে প্লে হবে?-'

রতীন বল্লে—"তা কেন? প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটাকেই আবার শেষ দৃশ্যে চালিয়ে দিন।"

—"তার মানে শেষ দৃশ্যটা আবার নূতন করে লিখি?" খুবই সহজ ভাবে তিনি বল্লেন—"তা লিখতে হবে বৈ কি?"

আমি বল্লাম—"চমৎকার!"

তিনি অভয় দিলেন—"ও আপনি এক রাতেই শেষ কর ফেলতে পারবেন স্যার।"

—পেশাদার লেখক আমি চেষ্টা করলে পারব জেনেই জিজ্ঞাসা করলাম—"তারপর"

—"তারপর আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। সকালে আমি Script নিয়ে আসবো, আর্টিষ্টদের আনিয়ে নিয়ে রিহার্স্যাল দোব। তারপর সন্ধ্যে বেলায় অহীনদা থাকবেন, আপনি থাকবেন, রাত ভোর রিহার্স্যাল দিয়েও একটা Scene তৈরী করতে যদি না পারি, তা হলে আমরা কিসের আর্টিষ্ট?"

সব শুনে অহীন্দ্র বল্লেন—"দেখুন যা ভাল হয় তাই করুন। কাল আমাকে না হয় একটু বেলা থাকতে থাকতেই আনিয়ে নেবেন।"

সারারাত জেগে শেষ দৃশ্যটা নতুন করে লিখলাম। ভোরেই রতীন হাজীর। script নিলেন, আমাকেও নিলেন গাড়ীতে তুলে। থিয়েটারে গিয়ে দেখি সন্তোষ, সুলাল, রাণী হাজির। দুটো অবধি রিহার্স্যাল হোলো। তারপর আবার সন্ধ্যে থেকে শুরু করে সারারাত। বিপদ কিন্তু তাতেও কাটল না। উদ্বোধনের দিনই ছিল দুবার অভিনয়। প্রথম অভিনয়ে প্রথম অঙ্কের শেষে দর্শকরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। দ্বিতীয় অঙ্কের গতি মন্থর হলেও উপভোগ্য, তৃতীয় অঙ্কও শুরু হলো চমৎকার। কিন্তু যবনিকার পর বন্ধুরা বল্লেন, শেষটা ঠিক শেষের মুখে কেমন যেন dull হয়ে গেছে। সর্বনাশ! ২য় অভিনয়ের

জন্য তখুনি 'হাউস ফুল' বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়েচে। সে শো'তে অভিনয় dull হলে, বই মাঠে মারা যাবে। হঠাৎ আমার মনে হোলো সামান্য কিছু বদলে দিলে dullnessটা কেটে যায়। রতীনকে তাই বল্লাম। তিনি বল্লেন, "লিখে ফেলুন স্যার, আমরা আছি।"

তাই লিখতে লাগলাম। কিছু কিছু লাইন বদলে হবে রতীনের, সন্তোষের, রাণীর। নতুন নতুন কথা দিয়ে তাই করা হোলো। কিন্তু আমার লেখা হতে না হতেই দ্বিতীয় অভিনয় শুরু হয়ে গেল। দু'বার দু' অঙ্কের মাঝখানে রতীন, সন্তোষ, রাণী নতুন লাইনগুলো ভালো করে আউড়ে নিলেন। প্রম্পটাররা ছাড়াও উইংসের এক পাশে আমি, এক পাশে জহর, হাতে আমাদের নতুন লাইন লেখা চিরকুট। আমাদের সাহায্যের দরকার হোল না, রতীন নিজের পার্ট'ও বল্লেন, সন্তোষ, রাণীকে ষ্টেজে দাঁড়িয়েই বলে দিতে লাগলেন। ফাঁড়া কেটে গেল। বন্ধুরা বল্লে, চমৎকার হয়েচে, দর্শকরাও তাই বল্লেন। 'সংগ্রাম ও শান্তি' সুলিখিত সফল নাটকরূপে স্বীকৃতি পেল। কিন্তু পেছনে ছিল যাঁদের উৎসাহ, শ্রম, সহানুভূতি, তাঁদের কি ভোলা যায়? রতীন ছিলেন উৎসাহে তাঁদের সকলের অগ্রণী। জহর এই সম্প্রদায় ছাড়বার পর অহীন্দ্র, রতীন আর সন্তোষকে নিয়ে নাট্যভারতীতে এবং রঙমহলে প্লাবন, কঙ্কাবতীর ঘাট, মাইকেল, ভোলামাষ্টারের রূপারোপ করেছেন, কোন খানেই আমার বই না হলেও অনেক মহলায় আমি উপস্থিত থেকেচি এবং প্রতিবারই দেখেচি রতীন সমানই উৎসাহ নিয়ে কাজ করেচেন। নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের কাছে বসে থেকে মাইকেল নাটকের দৃশ্যের পর দৃশ্য লিখিয়ে এনেছেন, ভোলামাষ্টার নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। রঙমহল ছেড়ে যখন মিনার্ভায় গেলেন তখনই তাঁর একটু পরিবর্ত'ন আমি লক্ষ্য করলাম। একটা আঘাত যেন তাঁর উৎসাহকে মন্দীভূত করেচে। তাঁর অকুণ্ঠ শ্রমের বিনিময়ে তিনি যা আশা করেছিলেন তা তিনি পান নি বলে তাঁর মনে ক্ষোভ জমে উঠেছে। মিনার্ভায় একমাত্র আমি বল্লেই তিনি আগেকার মতো উৎসাহ নিয়ে মহলায় লেগে যেতেন, কিন্তু আমি যাতে তাঁকে ডেকে না পাই তাঁরও চেষ্টা তিনি করতেন। আমি অনুমানে বুঝে নিয়েছিলাম তাঁর ক্ষোভের কারণ কি। আমি তাঁকে সে সম্বন্ধে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও কিছু মুখ ফুটে আমাকে বলেন নি। শেষ দিন সকালেও অন্যান্য অনেক কথার মাঝে বার বার তিনি একটি আদর্শ থিয়েটারের কথাই তুলেছিলেন মনে পড়ে।

মাস কয়েক আগে আমি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম, আমাদের অভিনেতারা জাতির রাজনৈতিক প্রসারের সঙ্গে যোগ রাখেন না বলেই রাজনীতিকে ভিত্তি করে যে নাটক লেখা হয়, তার যথার্থ রূপ দিয়ে আমাদের খুসি করতে পারেন না। সে লেখা পড়ে কেউ চটেছেন, কেউ পরোক্ষে শাসিয়েছেন, অধিকাংশই মৌন থেকে তাঁদের মনোভাব আমাকে জানতে দেননি। একমাত্র রতীনই উপযাচক হয়ে আমাকে বলেচেন—"I plead guilty Sir; আমাদের যা করা উচিত তা আমরা করি না। আর তা করি না বলেই আমরা আজও নিরাশ্রয়।"

আজ রতীনের কথা বলতে বলতে এই কথাটিই আমি বলব যে, 'দেহপট সঙ্গে নট সকলেই হারায়' কথাটা সত্য নয়। কথাটা বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ নট-নাট্যকার বলে গেছেন। সম্ভবতঃ তিনি ক্ষোভ করেই ও-কথা বলে গেছেন। হয়ত তাঁর ওই উক্তি ছিল নটকুল সম্বন্ধে তাঁর প্রচ্ছন্ন কোন ইঙ্গিত। রতীনকে স্মরণ করে আজও আমি বলচি, আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনের সদস্যদের সম্বোধন করেও বলচি যে, জাতির কর্ম-প্রয়াসের সঙ্গে যোগ রেখে চলবার চেষ্টা না করলে তাঁদের সকল শিল্প-প্রতিভাই স্বীকৃতির অভাবে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। একদিন যেমন কানু বিনা কোন গীতই সার্থক হোত না- আজও তেমন জাতির মর্মবাণীর বাহন না হলে কোন শিল্পই স্বার্থক বলে স্বীকৃতি পাবে না। রাষ্ট্র-সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হয়ে কল্পনায় গড়ে তোলা মায়ালোকে নিজেদেরকে প্রচ্ছন্ন রাখলে কোন নাট্যকার, কোন নট, কোন গায়ক, বাদক, চিত্র শিল্পী মুক্তিকাম জাতির স্বীকৃতি লাভ করে ধন্য হতে পারবে না, পরবর্তীরা এই অনুচিত ঔদাসিন্যের জন্য তাঁদের কাউকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে না।

স্মৃতি-কথা

নীরেন লাহিড়ী

[খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক নীরেন লাহিড়ী আদর্শবাদী কল্যাণ ধর্মী রতীন্দ্রন'থের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।]

রতীনবাবুর কথা বলতে গেলে, কাজের মধ্য দিয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমি কতটা জানতাম, সেই কথাই শুধু বলতে পারি। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় বেশীদিনের নয়, তবে তার পূর্বে ছায়াচিত্রে এবং রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয় দেখতে সুযোগ আমার ঘটেছিল। তাঁকে প্রথম দেখি 'মহানিশা' নাটকে নির্মলের ভূমিকায়। তারপর 'সোনার সংসার' ছায়াচিত্রে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে অভিভূত হ'য়ে ছিলাম, বেশ মনে আছে। একজন বলিষ্ঠ সুন্দর যুবার পক্ষে অনাথ-আশ্রমের সেই স্নেহপ্রবণ অধ্যক্ষের চরিত্রকে রূপ দেওয়া যে কতখানি অভিনয় শক্তি ও কি গভীর অনুভূতি সাপেক্ষ, তা' বলা বাহুল্য। রতীনবাবু সেই চরিত্রটিকে শুধু রূপ দেন নি, নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আমার মনে গোপনে সেদিন এই আশাই লুকিয়েছিল, কোনদিন সুযোগ পেলে সেই বৃদ্ধ অধ্যক্ষের চরিত্রটিকে আরও বিশদরূপে লোকচক্ষে প্রকাশ করব।

এর বহুদিন পরে চিত্রবাণী কোম্পানীর তরফ থেকে তাঁদের 'গরমিল' চিত্র পরিচালনা করার জন্য আমার ডাক পড়ল। গল্পটি লিখেছিলেন সুসাহিত্যিক বন্ধুবর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর এই গল্পের 'প্রফেসর ঘোষাল' চরিত্রটিকে রূপ দেওয়ার জন্য আমরা উভয়েই একমত হ'য়ে রতীনবাবুকে ডেকে পাঠাই। তাঁর সংগে প্রাথমিক আলাপ ও আলোচনার পর, তাঁকে বললাম, "যতটুকু সংলাপ যতটুকু action এই চরিত্রের জন্য আপনাকে দেওয়া হবে, শুধু ততটুকুর অভিনয় করলেই এবার যথেষ্ট হবে না। যে লোকটি কথা কইবে, চলে-ফিরে বেড়াবে, শুধু তা'কে নয়, —জীবন সম্বন্ধে যে মনোভাব, যে দৃষ্টিকোণ এই লোকটিকে এক অদ্ভুত অসাধারণ চরিত্রে পরিণত করেছে, তাঁর সম্পূর্ণ প্রকাশ ক'রে সম্পূর্ণ registration আপনার মধ্যে আমরা দেখতে চাই-ই।"

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, তিনি শুধু বলেছিলেন, "আচ্ছা আমি চেষ্টা করব। আপনারা যদি ভরসা করতে পারেন, তবে আমিই বা আশা করব না কেন?"

কার্যকালে দেখেছি, কী নিবিষ্টচিত্তে নীরবে তাঁর অংশগুলি তিনি আয়ত্বে আনবার চেষ্টা করছেন। মাঝে মাঝে মনে হ'ত যেন ধ্যানে ব'সে আছেন। নিজেরা এক এক সময় বিব্রত বোধ করতাম তাঁর নিষ্ঠা দেখে, ভাবতাম আমরা বোধ হয় তেমন ভাবে মনের ঐকান্তিকতা দিয়ে কাজ করছি না—কোথাও বোধ করি ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। তারপর 'গরমিল' ছবি যখন রূপালি পর্দায় প্রতিফলিত হ'ল-তখন দেখলাম, আমাদের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি ঢেকে দিয়েছেন তাঁর অসাধারণ অভিনয়ে।

'গরমিল' চিত্রের পর অনেকদিন তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার ঘটেনি। সম্প্রতি 'ভাবীকাল' চিত্রটির পরিচালনার ভার যখন আমার উপর পড়ল, তখন বন্ধুবর প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই নবরচিত গল্পে একটি নতুন চরিত্রের সন্ধান পেলাম। আবার ডাক পাঠালাম রতীনবাবুর কাছেই। এই চরিত্রটি তাঁর নিজের অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। মনোহর মাষ্টার গ্রাম্য স্কুলের একজন আদর্শবাদী শিক্ষক। সে স্বপ্ন দেখত, এক নতুন প্রভাতে মানুষ যেন মানুষের পূর্ণ অধিকার পেয়েছে। ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে দেখা হয় কর্মপন্থী আদর্শবাদী শিবনাথের সঙ্গে। মনোহর মাষ্টার হন তার সঙ্গী। কিন্তু মনোহর মাষ্টারের স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে সত্য হয়ে ওঠার পূর্বেই রতীনবাবুর হ'ল আকস্মিক মৃত্যু। এ মৃত্যু রতীনবাবুর চলে যাওয়া নয়,—এ মৃত্যু আমাদের কর্মজীবনে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

আজ শুধু আমাদের সেই বন্ধুর জন্য নয়—বাংলার এক প্রতিভাশালী নটের জন্য নয়—আদর্শবাদী কল্যাণধর্মী একটি মানুষের পরলোকগত আত্মার জন্য শান্তি কামনা করি, শ্রদ্ধাঞ্জলি দিই।

রতীন্দ্রনাথ

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

[বেতার, চিত্র ও নাট্যজগতের দরদী বন্ধু বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র রতীন্দ্রনাথকে খুব নিবিড় ভাবেই জানতেন। রতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে অভিনয়ের অন্তরালে তঁার যে কতখানি দান ছিল সে কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। 'রতীন্দ্র সংখ্যা' প্রকাশে তিনি এবং আমাদের অগ্রজ স্থানীয় নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে যে সাহায্য করেছেন—এঁদের এই সহ-যোগিতা না পেলে অনেক খুঁতই থেকে যেত।]

মৃত্যুর দাক্ষিণ্যে ভরা এই বাংলাদেশে যে-কোন লোকের আকস্মিক তিরোধান আজকের দিনে স্বাভাবিক নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে সত্য, তবুও মানুষের মন কোন প্রিয়জনের এই অনিবার্য অকাল পরিণতিতে বিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। প্রভাতে যার প্রাণ-চঞ্চল-স্বাস্থ্য দীপ্ত প্রসন্ন মূর্তিকে দেখবার সুযোগ হল, সেই দিনই মধ্যাহ্নে তাঁকে মৃত্যুর নিথর কোলে নিস্পন্দ হ'য়ে শায়িত দেখলে মানুষের নিজের জীবন সম্বন্ধেও একটা অবসাদ ঘনিয়ে আসে। রতীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুর সংবাদে তাই তাঁর বন্ধু ও হিতৈষীদের মনে যে গভীর ক্ষোভের ও আকস্মিক বিয়োগব্যথার সঞ্চার হ'য়েছে তা ভুলতে বহুদিন লাগবে।

বাংলার সর্বজন পরিচিত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় অধিকাংশ অভিনেতার অগ্রজ স্থানীয় এবং তাঁর গৃহে ছায়াচিত্র ও রঙ্গজগতের বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা প্রায়শঃই গিয়ে থাকেন। পনেরো ষোল বছর ধ'রে আমি শচীনদা'র ঘরে কতজনকেই না দেখলুম। বাংলা রঙ্গমঞ্চকে নূতন নূতন নাটক যুগিয়ে সংস্কার করে এবং অভিনেতৃদের সর্বপ্রকারে একটা উন্নত আদর্শে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা আমরা কয়েকজন নেপথ্য থেকে বহু দিনই ক'রে আসছি। বহু অভিনেতা আমাদের কথা শুনেছেন, কেউ ভুল বুঝেছেন, কেউ অন্তরালে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন এবং অনেকে আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক ক'রে তোলবার জন্যে প্রাণপণ সহায়তা ক'রেছেন। রতীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই হিসেবে আমাদের একজন প্রধান সহায়। গত বৎসর অধিকাংশ সময়ে আমরা তাঁকে কর্মী হিসেবে পেয়েছি। অভিনেতা হিসেবেই রতীন্দ্রনাথ সাধারণের কাছে পরিচিত, কিন্তু অভিনয় করা ছাড়াও নেপথ্যে তাঁর যে কতখানি দান রয়ে গেল, সেই পরিচয়টুকু আমাদের দেওয়া কর্তব্য।

মানুষ অপর মানুষকে গভীর ভাবে জানতে পারে সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে, রতীন্দ্রকেও আমরা বিশেষভাবে সেই কাছাকাছি সম্বন্ধের ভেতর দিয়েই জানতে পেরেছিলুম এবং তাঁর কাছ থেকে আমরা যে শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতি পেয়েছি তা কোন দিনই ভুলতে পারবো না। তাঁর ব্যব-হারের মধ্য দিয়ে যে আভিজাত্যের পরিচয় ফুটে উঠতো তার প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। শ্রদ্ধেয় কোন ব্যক্তির মুখের ওপর সে কখনও প্রতিবাদ করেনি এ আমি বহুবার প্রত্যক্ষ ক'রেছি, অথচ সে যে দৃঢ়চেতা ছিল না তাও বলা চলে না। মতের বিরোধ হ'লে সে সেখান থেকে নীরবে চ'লে গিয়েছে, হয়তো কর্মে ইস্তাফা দিয়েছে কিন্তু কোন অসম্মানসূচক ব্যবহার করেনি। কোন এক সময় উত্তেজিত হ'য়ে কোন এক রঙ্গালয়ের মালিককে সে রূঢ়ভাবে কয়েকটি কথা বলে, কিন্তু তার জন্য পরে সে অত্যন্ত ব্যথিত ও লজ্জিত হ'য়েছিল।

রতীন্দ্রনাথের এই গুণের কথা আমি বেঙ্গল কেমি-কেলের বহু কর্মচারীর মুখেও শুনেছি। থিয়েটারে যোগ-দানের পূর্বে রতীন্দ্রনাথ বেঙ্গল কেমিকেলে ক্যাস ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতেন এবং রাজশেখর বাবুর (পরশুরামের) অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজশেখর বাবুর সম্বন্ধে রতীন্দ্রনাথের মুখে আমরা যে কত প্রসংসা শুনেছি তা' বলতে পারি না—মানুষ বোধ হয় দেবতারও এত প্রশংসা করে না। পুরাতন মনিবের প্রতি তাঁর এই প্রীতি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্তমান ছিল।

বেঙ্গল কেমিকেলের কার্য পরিত্যাগ করে সুদক্ষ অভিনেতা রবি রায়ের আমন্ত্রনে তিনি রঙমহল রঙ্গমঞ্চে প্রথম যোগদান করেন। কি ভাবে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে সেটুকু এখানে বলা আবশ্যক।

বছর দশ বার আগের কথা, কোন বন্ধুর মারফৎ সংবাদ পেলুম যে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে এক প্রিয়দর্শন নটের আবির্ভাব হয়েছে তাঁর নাম রতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—দৈহিক স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠবে এই তরুণ অভিনেতাটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' নাটকের কয়েকটি দৃশ্য অভিনয় ক'রে যথেষ্ট যশও অর্জন করেছেন। তারপর মহানিশা নাটকের প্রধান একটি অংশে অবতীর্ণ হ'য়ে রতীন্দ্রনাথ নাট্যামোদীদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত হ'লেন।

তখনও আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি। এই সময়ে তিনি একদিন বেতারে অভিনয়ের জন্য আমার কাছে যান এবং সেইদিনই আমি তাঁকে বেতার অভিনয়-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত করি। যেদিন আমি বেতারের কর্তৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে সেখানকার শিল্পী হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হই তার কিছু পরেই রতীন্দ্রনাথও বেতারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

বেতারে সবেমাত্র যখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের পালা সুরু হয়েছে, সেই সময় বন্ধুবর কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক) ও যামিনী মিত্র আমাকে রঙ্‌মহলের পরিচালনার জন্য নিয়ে যান এবং সেইখানে রতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হ'য়ে ওঠে। স্বর্গীয় বন্ধু দুর্গাদাস ও রতীন্দ্রনাথ এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা জহর গাঙ্গুলী ও সন্তোষ সিংহ আমাকে রঙ্গমঞ্চ পরিচালনায় যে ভাবে সাহায্য ক'রেছিলেন তা আমি কোনদিনই বিস্মৃত হব না—নিজেদের সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়ে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সমস্ত খুঁটিনাটি যাতে নিখুঁত ভাবে আমি সম্পাদন ক'রতে পারি তার জন্য এঁরা প্রাণপণ সাহায্য তো করতেনই, উপরন্তু রতীন্দ্রনাথ মহলা শেষ হবার পর গভীর রাত্রি পর্যন্ত একাকী আমার সঙ্গে থেকে নানা বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দান ক'রতেন। এই অভিনেতাটির অপরিসীম ভদ্রতা ও অভিনয়-নিষ্ঠা আমাকে সত্যই মুগ্ধ ক'রেছিল।

আমি একদিন রাত্রে তাঁকে ব'লেছিলুম যে আমাকে এই ভাবে সাহায্যদান ক'রে আমায় বিশেষ ঋণী ক'রে ফেলছেন রতীন বাবু। তার উত্তরে তিনি আমায় ব'লেছিলেন একটি কথা যা আমার মনে থাকবে চিরদিন।

'ভাবীকাল'এর মনোহর মাষ্টার

তিনি ব'ল্লেন, "রঙ্গালয়ের ভেতর আপনারা সহজে আসতে চান না, অথচ আপনাদের মত বাইরের লোকদের সঙ্গে আমাদের সহজ সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে রঙ্গালয়ের অপাঙক্তেয়তা বহুল পরিমাণে ঘুচে যাবে, এই আশায় আমি আপনাদের কাছে কাছে থাকি--কারণ আমার বিশ্বাস আপনারা বাইরে বেরিয়ে অন্ততঃ আমাদের সম্বন্ধে কিছু প্রচার কার্য চালিয়ে অভিনেতৃসঙ্ঘের কদর বাড়াবেন।" অভিনেতাদের সম্মান ও মর্যাদা যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য রতীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখে আমি সেদিন সত্যই এই আদর্শবাদী যুবক অভিনেতাটির প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হই। এবং তাঁর

পরেও দীর্ঘদিনের পরিচয়ের ভেতর দিয়ে বারবার তাঁর প্রগতিশীল মনের পরিচয়ও যথেষ্ট পেয়েছি।

বাংলাদেশের রঙ্গালয়ে নূতন কোন পরীক্ষামূলক নাটক অভিনয়ের বাধা আছে যথেষ্ট কিন্তু রঙ্‌মহলে যখনই আমরা কোন নূতনত্ব করবার ইচ্ছা ক'রেছি তখনই রতীন্দ্রনাথও সর্বান্তঃকরণে আমাদের সহায়তা ক'রতে এগিয়ে এসেছেন—শুধু আমি কেন, দুর্গাদাস, অহীন্দ্রবাবু প্রভৃতি সকলেই যখনই কোন প্রযোজনা ক'রেছেন তখনই রতীন্দ্র, জহর ও সন্তোষ সিংহ পরমোৎসাহে সেই কার্যে লেগে গিয়েছেন দেখেছি। পরিচালকদের সময়াভাবে প্রাথমিক মহলা পরিচালনা করা, দৃশ্য সংস্থাপন ইত্যাদি কোন কিছুর বন্দোবস্ত করার সময় যখন হ'ত না, তখন রতীন্দ্রনাথ প্রমুখ অভিনেতারা সকাল সন্ধ্যায় মহলা দিয়ে সব-কিছুই ঠিক ক'রে রাখতেন এবং পরিচালকদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রতেন সকল সময়—এর জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক বা নামের প্রত্যাশা এঁরা কখনও করেন নি।

ষ্টার থিয়েটারে যখন আমি 'বিদ্যাপতির' প্রযোজনার ভার গ্রহণ করি সেই সময় বাহিরের নানা কার্যে ব্যস্ত হ'য়ে আমি সকল দিন মহলায় উপস্থিত থাকতে পারতুম না। রতীন্দ্রনাথের উপর আমি অধিকাংশ ভার ন্যস্ত ক'রেছিলুম কিন্তু সেজন্য কোনদিন আমাকে দুঃখিত হ'তে হয়নি। সুষ্ঠুভাবে রতীন্দ্রনাথ আমার অনুপস্থিতে সকল পরিচালনা ক'রতেন এবং কোন কোন বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করা নিতান্ত আবশ্যক হ'য়ে উঠলেও আমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কিছুমাত্র অদল বদল করতেন না। পরিচালকের আদেশের চেয়ে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিমানকে তিনি বড় করেন নি ব'লেই আমাদের অন্তরকেও জয় ক'রেছিলেন বিশেষ ভাবে।

রঙ্‌মহল থেকে কোন এক সময় বাড়ীওয়ালাদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার ফলে এই থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ যখন থিয়েটার তুলে নিয়ে যান তখন শচীন সেনগুপ্ত মহাশয় ও আমি, রতীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন অভিনেতার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েই কর্তৃপক্ষকে হ্যারিসন রোডে নাট্য-ভারতীর উদ্বোধন করাতে রাজী করি। হ্যারিসন রোডে বাংলা থিয়েটার কিছুতে চ'লতে পারেনা ব'লে সে সময় সকলের বিশ্বাস ছিল কিন্তু শচীন দা ও আমি জোর ক'রে কর্তৃপক্ষকে যে সেখানে থিয়েটার নেওয়াতে রাজী ক'রতে পেরেছিলুম তার একমাত্র কারণ রতীন্দ্র, জহর, সন্তোষ ও কয়েকজন অভিনেত্রীর কাছ থেকে আমরা যথেষ্ট ঐক্যের ভরসা পাই এবং এই ঐক্য গঠন ক'রতে রতীন্দ্র আমাদের বিশেষ সহায়তা ক'রেছিলেন। কোন একটা নূতন সঙ্কল্প বা আদর্শ তাঁর সামনে উপস্থিত ক'রলে কলেজের ছাত্রদের মত উৎসাহ তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হ'ত। এর একমাত্র কারণ রতীন্দ্রের মনে ছিল একটা বড় আদর্শ।

আর একটি বিশেষ জিনিষ রতীন্দ্রের মধ্যে আমরা লক্ষ্য ক'রেছিলুম সেটা হ'চ্ছে তাঁর নিয়মানুবর্তিতা। কি রঙ্গালয়ে, ছায়াচিত্রে বা বেতারে যে সময় তাঁর মহলার জন্য বা অভিনয়ের জন্য উপস্থিত হবার কথা থাকতো তিনি ঠিক সেই সময় বা তার কিছু পূর্বে সেখানে হাজির হ'তেন এবং এই কারণে তিনি বহুজনের মন আকর্ষণ ক'রতে পেরেছিলেন।

রঙ্গালয়ের সিফ্‌টার ইলেক্‌ট্রিসিয়ান, ড্রেসার প্রত্যেকের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী কারণ তাদের হ'য়ে রতীন্দ্র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রয়োজন হ'লে রীতিমত বিবাদ করতেও কখন পেছপাও হ'তেন না। যে-কোন লোকের আপদে বিপদে রতীন্দ্রকে ডাকলে তিনি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে কখনও ব'সে থাকতেন না এ আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি। রোগের যন্ত্রণায় যে রোগী ছট্‌ফট্‌ ক'রছে তাকে সেবার নৈপুণ্যে সুখী করবার কৌশল রতীন্দ্রের যথেষ্ট ছিল, তাই বন্ধুবর প্রসিদ্ধ যক্ষ্মা-চিকিৎসক রামচন্দ্র অধিকারী মহাশয় আমায় প্রায়ই বল'তেন যে, রতীন্দ্র অভিনয় ছেড়ে দিয়ে যদি হাসপাতালে চাকরি নেয়, তাহ'লে সে সত্যিই ডাক্তারদের বিশেষ সহায়ক হ'য়ে উঠতে পাবে।

অভিনেতা হিসেবে রতীন্দ্রনাথের যে-দিকে ত্রুটী ছিল সেই ত্রুটী কি ভাবে সংশোধন ক'রে তিনি আরও ভাল অভিনয় ক'রতে পারেন তারজন্য আগ্রহের সঙ্গে বন্ধুজনের সমালোচনা শুনতেন এবং সেই কারণে ক্রমশঃ তাঁর অভিনয়-বৃত্তির যথেষ্ট উন্নতি সূচিত হ'চ্ছিল। বাংলা রঙ্গমঞ্চে তিনি যে ক'টি ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন তার মধ্যে 'তটিনীর বিচারে' বসন্ত, 'সংগ্রাম ও শান্তিতে' অবিনাশ, 'পি-ডব্‌লু-ডি'তে সৌম্যেন, 'মহানিশায়' নির্মল, 'চরিত্রহীনে' সতীশ চিরদিনই স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে—ভবিষ্যতে এই অভিনেতার কাছ থেকে বাংলার আনন্দজগৎ অনেক কিছু প্রত্যাশা ক'রতেন কিন্তু দুঃখের বিষয় সে প্রত্যাশা অকস্মাৎ চিরদিনের মত বিলীন হ'য়ে গেল।

রতীন্দ্রের পারিবারিক জীবনের মস্ত বড় বন্ধন ছিল তাঁর একমাত্র কন্যা। এই কন্যাটির কোষ্ঠিতে নাকি একটি ফাঁড়া ছিল—কোন জ্যোতিষী ব'লেছিলেন, তার জন্য স্নেহ-কাতর পিতা তার কাছ থেকে সর্বদা দূরে থাকতেন। আমি তাঁর কন্যাকে দেখেছি। এত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী বালিকা বাঙালীর ঘরে সচরাচর দেখা যায় না—রতীন্দ্রনাথ তাকে প্রাণভ'রে ভালবাসতেন অথচ বেশী কাছে যেতেন না। রতীন্দ্রের ভগ্নিপতি রয়টার এসোসিয়েটেড্‌ প্রেসের ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক ও সাহিত্যিক বন্ধুবর প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেই সে মানুষ হয় ও প্রবোধবাবুর কাছে নিজের কন্যার মত থাকে। এই মেয়ের জন্য রতীন্দ্রের শঙ্কা ও উদ্বেগ ছিল অত্যন্ত বেশী এবং তাঁর বিশ্বাস নিজের কন্যা অপরকে দান ক'রলে বোধ হয় তার সমস্ত আপদ দূর হ'য়ে যাবে—তাই মেয়েটিকে কাছে রাখতে কোন দিন তিনি ভরসা পান নি। বর্তমানে কলকাতায় বাড়ী ভাড়া পাওয়া দুষ্কর, সেই জন্য স্ত্রী ও কন্যাকে কিছুতে ইদানিং বহু চেষ্টা ক'রেও কাশী থেকে নিয়ে আসতে পারছিলেন না, সেজন্য প্রায়ই খুব চঞ্চল হ'য়ে প'ড়তেন। আজ অকস্মাৎ তাঁর লোকান্তর হওয়াতেই বোধ হয় আমাদের মনে হ'চ্ছে যে তাঁর নিজের ক্ষুদ্র পরিবারকে কাছে নিয়ে আসবার জন্যই সম্প্রতি ভদ্রলোক এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন।

মৃত্যুর দিন সকালে শচীন্দ্র বাবুর ঘরে ব'সে নিত্য নিয়মিত যেমন আলাপ পরিহাস করেন, সেই দিনও বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত হৈ চৈ ক'রে গেছেন এবং তিনি যে কতক-গুলি উপর্য্যুপরি বিপদ কাটিয়ে বেঁচে গেছেন এবং তার ফলে যে অনেকদিন এখনও বাঁচবেন এ বিষয়ে পরিহাসচ্ছলে অনেক কথা বলেন। মাণিকতলার কোন এক বন্ধুর বাড়ী তিনি থাকতেন। সপ্তাহ খানেক পূর্বে ধাত্রীপান্নায় ছবি-বিশ্বাসের সঙ্গে অভিনয় ক'রতে ক'রতে তরোয়াল খেলায় তাঁর পায়ে আঘাত লাগে এবং প্রচুর রক্তপাত হওয়ায় তিনি দু'চার দিন ছুটি নেন—ইতিপূর্বে আমাদেরই এক বিশেষ বন্ধু তাঁকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আপনার আঘাতের ফলে প্রচুর রক্তপাত হবার সম্ভাবনা, একটু সাবধানে থাকবেন। তিনি তাঁকে সেই দিনই হাসতে হাসতে বল্লেন, যাক্‌ মশাই, ফাঁড়া কেটে গেল আপনি যা ব'লেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে, রক্তপাত তো হ'য়েছেই উপরন্তু কাল দ্বিপ্রহরে ঘরের বৈদ্যুতিক পাখা কড়িকাঠ থেকে খ'সে পড়েছিল। আমি ঠিক সেই সময় পাশ ফিরে শুয়েছিলুম ব'লেই বেঁচে গেছি—অতএব আর একটা ভীষণ রক্তপাতের বা মৃত্যুর হাত এড়িয়েছি।" সকলেই সে কথায় খুব কৌতুক বোধ করেছিল, কিন্তু কে জানতো যে সেই দিনই মধ্যাহ্নে মৃত্যু তাঁর জীবন অপহরণের পূর্ণ সুযোগ পাবে। সেই দিনই প্রাতঃকালে তিনি এক মিলিটারী লরীর আঘাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং

তাঁর পরিধানের কাপড় ছেঁড়ার ওপর দিয়েই তিনি পরিত্রাণ লাভ করেন।

মধ্যাহ্নে বাড়ী ফিরে এক গেলাস সরবৎ ও দুটি সন্দেশ খেয়ে তিনি বিশ্রামের জন্য শয়ন করেন এবং ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই শরীর নিতান্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়ে! তাঁর বন্ধুকে ডেকে নিজের ঘাড়টি দেখিয়ে শুধু একবার বলেন একটু বরফ দাও এখানে, বড় কষ্ট হ'চ্ছে,। বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ তাঁর আদেশ পালন করেন এবং তার কিছু পরেই তিনি বন্ধুর গলা জড়িয়ে বলে ওঠেন 'চল্লুম'। এই কথার পরই তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ বন্ধুর বুকে লুটিয়ে পড়ে। রতীন্দ্রনাথের আর একটি প্রিয় বন্ধু হাস্যরসাভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর কাছে এসে আর তাঁকে জীবিত দেখতে পান নি। মুহূর্তের মধ্যে এই অবিশ্বাস্য সংবাদ সহরে ছড়িয়ে পড়ে।

শ্মশান ঘাটে বাংলা রঙ্গমঞ্চের, ছায়াচিত্রের প্রায় অধিকাংশ অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, বন্ধুবর্গ, ও নাট্যামোদীরা সমবেত হ'য়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করেন। তাঁর নিতান্ত আত্মীয়স্বজন তাঁর শেষ বিদায়ের সময়ে চোখের জল ফেলতে পারেন নি সত্য, কিন্তু তিনি নিজে আপন গুণে যে-বহুজনকে মৈত্রীবন্ধনে বেঁধেছিলেন তাঁদের অশ্রুধারায় তাঁর মৃত্যু বরণীয় হ'য়ে উঠেছিল।

বন্ধু রতীন্দ্রনাথ

গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

[রতীন্দ্রনাথ পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। শ্মশান ক্ষেত্রে রতীনের বিদেহী আত্মার জ্যোতি দর্শনে তিনি মানব দেহে অবস্থিত আমাদের আত্মার যে সাধারণ ধর্মের কথা বলেছেন তা প্রণিধান যোগ্য।]

সেদিন রঙমহল রঙ্গমঞ্চে বন্ধুবর রতীন বন্দোপাধ্যায়ের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে আমরা অনেকেই হৃদয়াবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, স্মৃতির খুদ কুঁড়োতে মন এত ভরপুর হয়েছিল যে কথার জন্যে মনের মাঝে শূন্য স্থান খুব কমই ছিল। কিন্তু সেদিন আর আজকের মধ্যে যে কালের ব্যবধান, মাত্র এইটুকু ব্যবধানই আজ আবার আমাকে মুখর হবার অবকাশ করে দিয়েছে, এও এক পরামাশ্চর্য ব্যাপার, কালের কুটিল গতি সত্যই বিস্ময়কর,—মানুষ হৃদয়হীন ত কখনই নয়, আর হৃদয়ের পরিধিও ক্ষুদ্র নয়—। আকাশ যেমন অনন্ত, মনুষ্য হৃদয়ের ভাবরাশিও তেমনি অনন্ত। কখন কখন এই ভাবরাশি ঘনীভূত হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, কখনও বা দ্রবীভূত হয়ে স্রোতস্বনীর ন্যায় খরতর বেগে অর্গল ভেঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। আত্মা যখন অনন্ত ভাবে থাকে তখন সে নির্বাক, আবার যখন শান্ত ভাবে থাকে তখনই সে বিক্ষুব্ধ মুখর।

রঙমহলের স্মৃতিবাসরে রতীনের মুক্ত আত্মার সঙ্গে যে আমাদের আত্মার সাময়িক সংযোগ হয়েছিল তারই প্রভাব আমাদের গম্ভীর করে দিয়েছিল। কিন্তু গাম্ভীর্যের আবরণে আমাদের ব্যবহারিক অনুভূতিগুলিকে বীজাকারে রাখলেই ত চলবে না—সেগুলিকেও প্রব । করা দরকার—আদর্শবাদী মানুষ, রতীনের আদর্শগুলিকে নিজেদের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিতে চায়, তাই আজ তাঁর আদর্শগুলিকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করবো। অধিকাংশ ব্যক্তি কোনরূপ আদর্শ না নিয়েই জীবনের এই অন্ধকারময় পথে হাতড়িয়ে বেড়ায়। যার একটি আদর্শ আছে, সে যদি হাজারটা ভ্রমে পতিত হয়, যার কোনরূপ আদর্শ

রতীন্দ্রনাথ

নাই, সে দশ হাজার ভ্রমে পতিত হবে ইহা নিশ্চয়। অতএব একটি আদর্শ থাকা ভাল, এই আদর্শ সম্বন্ধে যত পারি শুনতে হবে; ততদিন শুনতে হবে—যতদিন না উহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, যতদিন না আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে—যতদিন না উহা আমাদের শরীরের অণুতে পরমাণুতে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। প্রথম প্রথম সফল না হই ক্ষতি নাই, এই বিফলতাই স্বাভাবিক, ইহা মানব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ। এরূপ বিফলতা না থাকলে জীবনটা কি হ'ত? যদি জীবনে এই বিফলতাকে জয় করবার চেষ্টা না থাকতো তবে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? বিফলতা না থাকলে জীবনের কবিত্ব কোথায় থাকতো। এই বিফলতা, এই ভ্রম, থাকলই বা।—বারবার অকৃতকার্য হই কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, বারবার ঐ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করি—চেষ্টা করলেই বাসনা পূর্ণ হ'বে।

রতীনের জীবনের আদর্শ ছিল, মৈত্রি, পরোপকারস্পৃহা, নিঃস্বার্থপরতা এবং এ আদর্শগুলিকে সে আত্মগত করেছিল—জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে এগুলিকে সে পরীক্ষা করে—সিদ্ধ হয়েছিল।—বোধহয় সে বস্তুর অন্তস্থলে সেই একত্ব ব্যঞ্জক ভাব ও আদর্শগুলিকে অনুভব করতে পেরেছিল। আমার বিশ্বাস সে প্রত্যক্ষও করেছিল। নতুবা তাঁর

প্রাণহীন মৃত দেহে আত্মজ্ঞানীর লক্ষণ সকল কেন প্রকট হয়েছিল।......তিরোভাবের পর সহাস্য বদন, অমলিন দেহ লাবণ্য ত' যার তার দেহে থাকে না। শবের পাশে দাঁড়িয়ে যখন আমার মনে এই সব চিন্তা হচ্ছিল—তখন রতীনের মুক্ত [illegible] আত্মা যেন আমার আত্মাকে আশ্রয় করে অভিনব ভাবে জানিয়ে দিলে—তুমি ভিতরে চলে যাও সেখানে তুমি একত্ব দেখতে পাবে ;—মানুষে মানুষে একত্ব, নরনারীতে একত্ব, জাতিতে একত্ব, উচ্চ শ্রেণীতে একত্ব, ধনী দরিদ্রে একত্ব—দেবতা মানুষে একত্ব। সকলেই এক—আর যদি আরও ভিতরে যাও তখন দেখবে, ইতর প্রাণীরও তাই—আমি মুক্ত স্বভাব বশতঃ এখন তাই দেখছি—তাই আমার শব মুখে শিবজ্যোতি দেখতে পাচ্ছ। আমার এই অনুভূতিকে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেবেন না অথবা উচ্ছাস বহুল উক্তি বলেও উপেক্ষা করবেন না।—আমরা সকলেই নিশ্চয় শুনেছি 'শ্মশান-বৈরাগ্য' বলে একটা কিংবদন্তি আছে কিন্তু আমি ঐ কিংবদন্তিটাকে সত্য বলে স্বীকার করি। রজস্তম মিশ্রিত কর্মসঙ্কুল জীবনে সত্যানুভূতি হবার অবকাশ আমাদের খুবই কম থাকে—জীবন আর মৃত্যু মুখোমুখি যেখানে দাঁড়ায়, এমন স্থান হোলো শ্মশান। এই শ্মশানই উপযুক্ত ক্ষেত্র জীবনকে তার স্বরূপে প্রত্যক্ষ করবার।—গুহা গর্ভের যুগ যুগান্তের অন্ধকার যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়ে গর্ভস্থিত সকল রহস্যই প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তেমনি শ্মশানের রূঢ় সত্যরূপ, হঠাৎ প্রবল উপলব্ধির আকর্ষণে যেন মনের অসত্যের পর্দা সরিয়ে দেয়। আত্মা যেন আসক্তির মোহ কাটিয়ে হঠাৎ উলঙ্গ তরবারির মত মায়াকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করতে উদ্যত হয়—আর মহামায়া হাসি মুখে সন্তানের তাড়নায় ভয় পাবার ভান করে মায়াবর্তের মধ্য থেকে মুক্তি ভিক্ষার মত কণা মাত্র সত্য বোধ দান করে মানবকে কৃতার্থ করেন, আর মানুষ মহার্ঘ বৈরাগ্যকে সাময়িক উপলব্ধি করে ধন্য হয়ে যায়।

আমি হঠাৎ বুঝলাম জীবিতাবস্থায় মানুষের যে সব মহৎগুণের স্থূল বিকাশ দেখতে পাই—তাহা উপেক্ষণীয় নয়। সেই সব আদর্শবাদকে উপেক্ষা না করে আপন জীবনে সেগুলিকে সঞ্জীবিত করতে পারলেই আমরা শতদলের মত সূর্যলোক স্পর্শে বিকশিত হবার উপযুক্ত হব। আমার মৃত্যুর বিভীষিকাকে উপেক্ষা করে আত্মজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হতে পারব। আমি বন্ধুর প্রতি অহেতুক গুণমুগ্ধ হয়ে বা মৃতবন্ধুর বিচ্ছেদ জ্বালাকে বাড়াবাড়ি দেখিয়ে দুর্বিসহ শোকের অবতারণা করে লোকের কাছে বন্ধুপ্রীতির পারাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যে রতীনের শব দেহের সুদুর্লভ লক্ষণ সকলের গুণগান করছিনা—সেদিন যে সমস্ত ব্যক্তি শব-দেহের পাশে ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই বিশেষত্বটুকু লক্ষ না করেই থাকতে পারেন নি।—আমি বোধ হয় ভাবাবেগে বিদেহী আত্মার সহজলভ্য 'মিডিয়ম' হয়ে পড়েছিলাম, তাই সদ্য মুক্তির আনন্দে বিরাজমান রতীনের আত্মা আমার আত্মাকে অবলম্বন করে—হৃদয়ের ভাবরাশিকে মথিত করে বলে—জীবদ্দশায় আমি তোমার বন্ধু ছিলাম কিন্তু মৃত্যুর পর দেহের ব্যবধান ভেঙ্গে আমি তোমার আত্মার সঙ্গে পরম বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হ'লাম—কারণ আমরা একই—তুমি এই উভয় মিলিত আত্মাকে ব্রহ্ম জ্যোতিঃজ্ঞানে—বিবস্বান সূর্য জ্ঞানে প্রার্থনা কর—"হে সূর্য, হিরণ্ময়পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করেছ। সত্যধর্মা আমি যাতে তা দেখতে পারি এজন্য তা অপসারিত কর......আমি তোমার পরম রমণীয় রূপ দেখছি—তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রয়েছেন—তা আমিই—তা আমিই।

একি। আজ এক যুগেরও উর্ধ্বকাল ধরে যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছিলুম—কানু, আমি, রতীন তিনটিতে

মিলে পরস্পরের শ্রদ্ধা ভক্তি, ভালবাসা সব একসঙ্গে মিশ্রিত করে যে অপরূপ মধুর সম্বন্ধ পাতিয়েছিলুম—কৈ তখন ত তাহলে আমরা তাঁর প্রকৃত পরিচয় খুব কমই পেয়েছিলুম—ভেবেছিলাম রতীন অসাধারণ বন্ধু বৎসল, পরোপকারী, নিরহঙ্কারী, সুমার্জিত অভিনয় কুশলনট মাত্র—কিন্তু সে যে স্বভাবতঃ মুক্তাত্মা—তা ত তখন বুঝতে পারিনি॥—কৈ সে ত অদ্ভুত উন্নত চরিত্রের লোক ছিল না। তাঁর বহু ত্রুটী বিচ্যুতি দেখেছি—তবে কোন পুণ্যে, কোন কর্মফলে সে যোগীর বাঞ্ছনীয় দেহত্যাগের অধিকারী হোলো।

হে বন্ধুগণ, হে মানব সন্তানগণ তোমরা কাণ পেতে শোন—তোমাদের আপনার জন রতীনের বিদেহী আত্মা—কি মহামন্ত্রে আমার আত্মাকে জাগরিত করে তাঁর সমাধান করে দিয়ে গেছে—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং, প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ, বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে দাহ্যবস্তুর রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন, তেমনি এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে সেই সেই রূপ হয়েছেন এবং তাদের বাইরেও আছেন। যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে নানাবস্তুভেদে তদ্রূপ হয়েছেন, তেমনিই সেই এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে সেই সেই রূপ হ'য়েছেন এবং তাদের বাইরেও আছেন।—আমাদিকে এই একত্ব ভাব উপলব্ধি করতে হ'বে—এবং তখনই আমাদের সখ্যতা নিবিড় হবে—এই রতীনের আত্মার সনাতন উপদেশ—হে মানব, তুমি আগে সকলের সখা হও তবেই সকলে তোমার সঙ্গে সখ্যতা করবে—দেখবে তোমার সখ্যভাব দেশের ব্যবধান, কালের ব্যবধান, শত্রুতার ব্যবধান অতিক্রম করে তোমার ভালবাসার বন্যায় জগত প্লাবিত করে ঈর্ষা, গ্লানি, নীচতারূপী দুর্বলকর ভাবগুলিকে ভাসিয়ে দিয়ে তোমাকে নির্মল করে পবিত্র করে তুলছে—আরো উর্দ্ধে উঠে অমৃত লোক থেকে ঐ বিদেহী আত্মা সনাতন বাণী কি নির্ভীক জ্ঞান প্রচার করে মানব সর্বোচ্চ ভাবে পৌছাবার জন্যে আহ্বান করছে শোন—

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদার্ন যজ্ঞাঃ
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপং শিবোঽহং শিবোঽহং।

সর্বপাপ হারী—বল প্রদ এই মন্ত্র স্মরণ মনন ও ধা[illegible] করে—এস সকলে আজ আমরা সখাভাবে আবদ্ধ হ[illegible] আমাদের প্রিয় সখার জীবন বেদকে শ্রদ্ধা প্রকাশ করি—

ওঁ তৎসৎ ওঁ

হরিচরণ দত্ত

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস্

১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

স্মরণে

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

[নিউথিয়েটার্স লিঃ অন্যতম প্রচার-সচিব ও খ্যাতনামা সাংবাদিক।]

যাঁরা চলে যায়, তাঁদের অভাব যতই ব্যক্তিগত হোক, প্রকাশ্য সভায় সকলের সাথে তাঁদের স্মরণ করার মধ্যে একটা গৌরব আছে। তাই আর্টিষ্ট এসোসিয়েশানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত, শোক সভায় সেদিন উপস্থিত হয়ে এই কথাটাই বার বার মনে হয়েছিল। বেঁচে থেকে, কলালক্ষ্মীর সেবা করে যে লোকটি অপরিমেয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ তাঁর তিরোধানে আমরা তাঁকেই স্মরণ করে পরম গৌরব বোধ করবার অধিকারী হ'লাম। এ গৌরব যাঁর জন্যে আমরা বোধ করবার অধিকারী, তাঁর জীবন-ধারণও সার্থক।

নটগুরু মহাকবি গিরিশচন্দ্র একদিন বহুদুঃখেই বলেছিলেন: "দেহ-পট সংগে নট সকলি হারায়।" এ উক্তির অন্তরালে যে কতবড় বেদনা ও লজ্জা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, এ যুগের মানুষ হয় ত' তা অনুভব করতে পারে।

জীবনে যাঁরা সব কিছুই দিল, একটা জাতিকে জাগিয়ে গেল নব জাগরণের মন্ত্রে, সমাজকে বড় করতে, মানুষকে আত্মসচেতন করে তুলতে যাঁরা গেয়ে গেল নিত্য নব জীবনের গান—তাঁরা কি সত্যই এত তুচ্ছ?

আধুনিক উদার-পন্থী সমাজ এ কথা স্বীকার করে না। তাই শিল্পীদের তাঁরা আজ যথাযোগ্য সমাদর ও স্বীকৃতি দিতে ভয় পায় নি।

শিল্পীরাও যে মানুষ; তাঁরাও যে সমাজের বন্ধন চায়; সেই সমাজেরই পাঁচ জনের সাথে একাসনে বসে পান-আহারের সহজ অধিকার চায়—সুখের কথা বর্তমান যুগ-ধর্মের আওতায় বর্দ্ধিত ও ক্রমোন্নত মানুষের সমাজ শিল্পীদের সে অধিকার দিতে কার্পণ্য করে নি।

অভিনেতা রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ এবং আত্মসচেতন সামাজিক জীব।

তিনি যে একজন ভাল অভিনেতা ছিলেন, রতীন সম্বন্ধে এটাই খুব বড় কথা নয়। কিন্তু যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি এ পথে পা বাড়িয়েছিলেন ও সহজেই পথ ক'রে, অনেক পরবর্তীদের অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন, এই পরম আদর্শবাদী মানুষটির জীবনের এইটুকুই সার কথা।

রতীন গত ১৪।১৫ বছর আগে তাঁর যাত্রা সুরু করেন। তখন পথ অবশ্য অনেকটা তৈরী হয়েছিল। সেই পথ তৈরী করতে যাঁরা জীবনপাত করেছেন, তাঁদের মধ্যে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, স্বর্গত ললিত লাহিড়ী, স্বর্গত রাধিকানন্দ, নরেশ চন্দ্র মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, স্বর্গত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। জাতি ও রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতারূপে এঁদের আগে যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁরা নিজেরা সে পথ করে নিয়েছিলেন সত্য কিন্তু তাকে সহজ ও সরল করে বেঁধে যেতে পারেন নি।

পাকা শড়কে যাদের অভিযান ঘটেছিল পরবর্তীকালে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই দলভুক্ত পরম আদর্শবাদী ও অগ্রগামী।

মর্মান্তিক দুঃখের কথা, এই প্রতিভাধর অভিনেতাকে নিতান্ত অকালেই আমাদের হারাতে হোল।

জীবনের রঙ্গমঞ্চে, শেষ নাটকের শেষ অংশটি বোধ করি এমনি করুণই হয়।

যিনি তাঁকে নিষ্ঠুরের মত এমনি অকালে টেনে নিলেন, সকল মানুষের সেই ভাগ্য বিধাতার কাছে আজ শুধু এইটুকু প্রার্থনাই নিবেদন করি; যেন রতীনের বিদেহী আত্মা তার স্রষ্টার মাঝেই পরম শান্তিতে বিলীন হয়ে যায়। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি।

অভিনেতা রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিচরণ ভঞ্জ

[পরিচালক হরিচরণ ভঞ্জ রতীন্দ্রবাবুর যতটুকু ব্যক্তিগত পরিচয় পেয়েছিলেন, তাতেই মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি।]

রতীন্দ্রনাথ আজ আর আমাদের মাঝখানে নেই। তিনি ইহজগতের সমস্ত মায়া কাটিয়ে হঠাৎ চলে গেলেন। কিন্তু মানুষ গেলেও তাঁর স্মৃতি থাকে, তাঁর স্মৃতিই তাঁকে চিরদিন ইহজগতে অমর করে রাখে। তাই তিনি আজ আমাদের সবার কাছে তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবের কাছে তাঁর অমর স্মৃতি রেখে গেছেন। প্রথম জীবনে তিনি যখন মঞ্চ ও চিত্র জগতে দেখা দিয়েছিলেন অভিনেতারূপে, তখন তিনি ছিলেন একজন সুদর্শন ও সুকণ্ঠ নট। বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় তার প্রথম চিত্রাবতরণই দর্শককে মুগ্ধ ও অভিভূত করে। তারপর একে একে বহু ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ন ও খ্যাতিলাভ করেন।

আমার সঙ্গে তাঁর সাধারণ পরিচয় থাকলেও, আমাদের প্রথম ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব হয় 'মাটির ঘর' চিত্রে। 'কল্যাণের' ভূমিকাটী সত্যিকার দরদ দিয়ে এত সজীব, সরস ও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারবেন, রতীনবাবু কল্যাণ করবার পূর্বে পর্যন্ত আমার সে ধারণা ছিল না। শুধু যে অভিনেতা হিসাবে তিনি চরিত্রটি সাধ্যমত রূপে, রসে সমৃদ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন তা নয়, মানুষ ও বন্ধু হিসাবেও তিনি যে কত বড়, কত উঁচু কত অমায়িক ও সদালাপী ছিলেন তা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। যাঁর সঙ্গে একবার তাঁর আলাপ হয়েছে তিনি কখনই তাঁকে ভুলতে পারবেন না।

অভিনেতার মধ্যে যে গর্ব যে বাহ্যাড়ম্বর থাকে রতীন বাবুর মধ্যে তা আদৌ ছিল না। বড়কে কি করে সম্মান দিতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয়, তাঁর মত খুব কম অভিনেতার ভিতর সে উদারতা দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ হিসাবে তিনি বিরাট দরদী অন্তর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই আজ আমরা তাঁকে ভুলতে পারছি না।

সোনার সংসারে 'অধ্যাপক', গরমিলের 'অধ্যাপক' ও 'মাটির ঘরে'র কল্যাণই আমার মনে হয় তাঁর চিত্র জগতের সব চেয়ে বড় চরিত্ররূপ। ষ্টুডিওতে প্রথম প্রবেশ কল্লেই বা কোন চিত্র প্রদর্শনীতে গেলেই বার বার মনে পড়ে তাঁর সদা হাস্যমুখ—মনে পড়ে তাঁর মিষ্টি কথা আর মনে পড়ে তাঁর ভদ্র ব্যবহার। তাই তিনি আজ নেই এ কঠোর সত্য কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না, সহজ বলে গ্রহণ করতে মন চায় না। জানি না তিনি পরপার থেকে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন কি না, কিন্তু যদি দেখতে পান তিনি সান্ত্বনা পাবেন যে তাঁর ভক্ত, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি সকলে একত্রে তাঁর জন্য অশ্রু অর্ঘ নিবেদন করছেন। এর চেয়ে বড় সম্মান আর কি হতে পারে? যত দিন মঞ্চ ও চিত্র বাংলাদেশে টিঁকে থাকবে, তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে চিরদিনের জন্য অমর হয়ে থাকবে।

'মাটির ঘরে'র চিত্র পরিচালক হিসাবে তাই আজ রতীন বাবুর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অন্তরে অনেক কথাই ভীড় করছে—অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছে কিন্তু ভাষা আজ হারিয়ে গেছে। আজ নির্বাক হয়ে গেছে মুখ—তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে মনে মনে বলি, তিনি যেখানেই থাকুন—তাঁর আত্মার শান্তি হ'ক—এবং এটাই আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা।

রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-নাট্যের একপাতা

সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[রঙমহল নাট্যমঞ্চেই রতীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ। রঙমহলের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল—ব্যক্তিগত এবং শিল্পী দুই হিসাবেই। রঙমহলের কর্মসচিব রূপ-মঞ্চ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়ে শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের কিছুটা আভাস এখানে দিয়েছেন।]

১৯০১ সালে তালতলার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ৺অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম এবং একমাত্র পুত্র রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্মকালে সাধারণতঃ যেমন আনন্দোৎসব হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহার অভাব হয় নাই কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হইল এই যে, সূতিকাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই রতীনবাবুর মাতাঠাকুরাণী বিশেষভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। এবং ছয়মাস কালও অতিক্রম করিল না তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রতীন বাবুর পিতা ইহাতে বড়ই চিন্তিত হইলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের দয়ায় ছোট ভ্রাতৃবধু তাঁহার অঙ্ক হইতে রতীনকে আপন অঙ্কে টানিয়া নিয়া রতীন-বাবুর পিতাকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

রতীন বাবুর কাকীমার কোন পুত্র সন্তান হয় নাই—মাত্র একটি কন্যা হয়। কাজেই রতীনবাবু মাতৃস্নেহের প্রতিটি বিন্দুর আস্বাদ তাঁহার কাকীমার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। রতীন বাবুর কাকীমা বিশেষ বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁহার লেখা কয়েকখানি পুস্তক আজও বাঙলা ভাষার সম্পদ। তিনি শিশুকাল হইতেই রতীনের চরিত্রগঠনে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতৃহীন রতীনকে তিনি কখনও তিরস্কার বা প্রহার করিতে পারিতেন না, ফলে শৈশব হইতেই রতীনের চরিত্রে একটা একরোখা ভাব ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই একরোখা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের ভাবটা শিশু রতীন হইতে ভবিষ্যতে অভিনেতা রতীনেও সংক্রামিত হইয়াছিল। বিশেষ আভিজাত্যপূর্ণ একটি নিজস্ব ভঙ্গিমা রতীনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। আমি যাহা

রিজিয়া নাটকে সমরেন্দ্রর ভূমিকায় রতীন্দ্রনাথ

বুঝিয়াছি উহাই ঠিক। আমি যাহা করিব উহা সকলকেই মানিতে হইবে—ইহা চিরদিনই রতীনের চরিত্রের উপর বিশেষভাবে প্রবল ছিল। তবে উহা প্রায় ক্ষেত্রেই সকলের পক্ষে গ্রহণীয় হইত। কারণ ন্যায্য ছাড়া অন্যায় কাজে রতীন কোন দিনই ঝোঁক দিত না। ইহা তাঁহার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করিবে কিনা—রতীন সর্বদাই চিন্তা করিয়া কথা বলিত বা কার্য করিত।

শিশু রতীনের খাবার কোন সঠিক সময় ছিল না, তাঁহার প্রয়োজন সকলকে সব সময় বুঝিয়া চলিতে হইত। এবং তাঁহার রুচি বুঝিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইত। একটু এদিক ওদিক হইলেই অভিমানী রতীন আর সেদিন খাইবে

না। অনেক সাধ্য সাধনার পর একমাত্র কাকীমাই তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিতেন। যাহা হউক শৈশব কাল অতিক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গেই বালক রতীন আবার পিতৃহীন হইয়া পড়িল। এবং কাকীমার সংসারই একমাত্র বালক রতীনের আশ্রয়স্থল হইল। একে অভিমানী তায় পিতৃ-মাতৃহীন রতীন অতিকষ্টে প্রবেশিকা পর্যন্ত লেখাপড়ায় অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। তাহার পরই কোন সাংসারিক প্রয়োজনে রতীন বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রতি-বেশীর সহায়তায় কলিকাতা Imperial libraryতে চাকুরী করিতে যান কিন্তু এই চাকুরী তাঁহার ভাল লাগে নাই। উহা কেবলমাত্র রতীনবাবুর জ্ঞান সঞ্চয় এবং নাট্যানুরাগ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিল মাত্র। এই সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'সঙ্কটত্রাণ সমিতি'তে রতীন বাবু যোগদান করেন। আচার্যদেব বালক রতীনকে বড়ই ভালবাসিতেন। এবং এই সময়ে তিনি রতীনবাবুর উপর 'সঙ্কটত্রাণ সমিতি'র হিসাব নিকাশের ভার প্রদান করিয়া-ছিলেন। বালক রতীন অতীব দক্ষতার সহিত তাঁহার কর্ম্ম কুশলতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। পরবর্তী কালে আচার্য্যদেবের সমর্থনের জন্যই তিনি Bengal Chemical এর সহকারী কোষাধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছিলেন।

বালক রতীনকে তাঁহার কাকীমা সমস্ত দিনের খরচ বাবদ ।৹ আনা করিয়া পয়সা দিতেন। সারাদিন রাস্তা দিয়া যত ফেরিওয়ালা যাইত রতীন প্রত্যেককে ডাকিয়া তাহা পরীক্ষা করিত। কোন কোন দিন বৈকালের পূর্বেই উহা ফুরাইয়া যাইত—তখন রতীন আরও পয়সার জন্য আব্দার জানাইলে তাঁহাকে মিতব্যয়িতা শিক্ষা দিবার জন্য কাকীমা প্রত্যহ অন্ততঃ ১০ পয়সা করিয়া সঞ্চয় করিবার জন্য পরামর্শ দিতেন। উত্তরে বালক রতীন বলিত "সেটা কাল থেকে করব আজতো পয়সা দাও"। পরবর্তী দিবসেও ঐ একই উত্তর হইত। কাজেই মিত-ব্যয়িতা সম্বন্ধে শেষ দিন পর্যন্ত রতীনের কোনই জ্ঞান ছিল না। বিদ্যাভ্যাসের সময় রতীন বেশ মেধাবী ছাত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। আবার স্বাস্থ্য বিষয়েও রতীন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। বাল্যে ও কৈশোরে রতীন সিমলা

অঞ্চলে বাস করার সময় বন্ধু বান্ধব মহলে সর্বদাই বিশেষ স্থান লাভ করিত। ১৩ বৎসর বয়সেই রতীন বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। যৌবনে বহু বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে রতীন সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ সান্ধ্য সমিতি ক্লাবে প্রথম প্রফুল্ল নাটকে সুরেশের ভূমিকায় অবৈতনিকভাবে অবতরণ করেন। স্বর্গীয় ভুবনেশ মুস্তফী মহাশয় নাট্যজগতের তাঁহার প্রথম আচার্য ছিলেন। তাঁহার শিক্ষায় রতীন আপন ভূমিকায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন। তাহার পর Bengal Chemicalএ 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ, 'রঘুবীরে' রঘুবীর প্রভৃতির অভিনয়ে তিনি এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন যে বহু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা তাঁহাকে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে যোগদানের আমন্ত্রণ করেন। এমন কি রবি রায় তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চে লইয়াও যান।

১৮৩০ সালে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে যখন অহীন্দ্রবাবুর প্রযোজনায় শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথে'র অভিনয়ের আয়োজন হয় সেই সময় রতীনবাবুকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য মনোনীত করা হইয়াছিল। কিন্তু রতীন বাবু কাকীমার মনোভঙ্গের আশঙ্কায় উক্ত ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাহার পর প্রায় ১ বৎসর পরে তিনি বিল্বমঙ্গল নাটকে কালীফিল্মের সহযোগিতায় নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ঐ সময়ে তিনি বাটীতে ঐ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানান নাই। ছবি মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে তিনি কাকীমাকে উক্ত ছবি দেখান। উহাতে তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করিলে এবং অভিনয় করিতে অনুমতি দিলে তবে তিনি ১৯৩২ সালে মহানিশায় নির্মলের ভূমিকা লইয়া রঙমহল রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হয়েন।

Bengal Chemical এর চাকুরী করিবার সময় তিনি যখন প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার জন্য আহুত হন, তখনই কাকীমার অনুরোধে তিনি বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয়েন। এবং বহু বন্ধু বান্ধব সহ দিল্লীতে গিয়া বিবাহ করেন। তিনি সাধারণ মেয়েকে বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন। কোনরূপ আড়ম্বর না করার জন্য তাঁহাকে অনুযোগ করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বাংলাদেশের বর দিল্লীতে আড়ম্বর সহ উপস্থিত হইলে লোকে বলিবে ইহাদের দেশের লোক এখনও অনেকে অর্ধাহারে এবং অর্ধনগ্ন অবস্থায় দিন কাটায়। বাংলার সাহায্যে সেদিনও দিল্লী থেকে চাঁদা আদায় করেছি"। ইহাতেই রতীনের দেশপ্রীতির অনেকখানি পরিচয় সাধারণে লাভ করিবেন বলিয়া আশা করি।

দুই বৎসর পূর্বে রঙমহলে কার্যকালীন ৺কাশীধামে যখন রতীনবাবুর কাকীমা মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন রতীনবাবু কলিকাতায়। তিনি তাঁহার মাতৃসমা কাকীমাতার পারলৌকিক কার্য করিবার জন্য ৺কাশীধাম যাত্রা করেন। এবং যখন কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সহকর্মীগণের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বালকের মত বলিতে থাকেন, "আজ আমি প্রথম মাতৃহীন হইলাম", তখন সকলেই তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা দর্শনে অভিভূত হইয়াছিলেন। ইহার পর প্রায় মাসাধিক কাল রতীন বাবুকে সর্বদাই বড় বিমর্ষ দেখিতাম। তিনি মাতৃহারা শিশুর মত এই ব্যথা বহুদিন ভোগ করিয়াছিলেন।

রতীন বাবুর অভিনীত বহু ভূমিকা সাধারণের কাছে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। তাঁহার শেষ অভিনয় মিনার্ভায় ধাত্রীপান্না নাটকে। রতীনবাবুর চরিত্রের সৌহার্দ বহুদিন তাঁহার সহকর্মী ও বন্ধু বান্ধবের হৃদয়ে আঁকা থাকিবে। মৃত্যুর দিনও প্রায় বেলা ১২॥০টা পর্যন্ত তিনি রঙমহলে উপস্থিত ছিলেন। এবং যাবার সময় প্রত্যেকের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। বেলা ৪টার সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রীয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে, পত্নী এবং ১০ বর্ষিয়া বালিকা কন্যা ডালিকে রাখিয়া মহাপ্রয়াণ করিলেন। কর্তব্য পরায়ণতা, বিনয়, সদালাপ, এবং স্পষ্টবাদীতা, রতীনবাবুর গুণাবলীর মধ্যে সর্বদাই পরিদৃষ্ট হইত। তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ সেদিন রঙমহলে বহু সুধীগণ সমাগমে যে স্মৃতি তর্পণ হয় তাহাতে শুনিলাম তাঁহার ফিল্মের শেষ ভূমিকায় বলিয়াছেন—"আমি আবার আসিব নবীনের প্রাণে নবীন মূর্তিতে, বাংলার প্রাঙ্গনে আবার আমি জন্মগ্রহণ করিব।"

আমরা তাঁহার গুণমুগ্ধ সুহৃদ। কালের গতি নিরোধ করিবার শক্তি আমাদের নাই, আমরা তাঁহার শেষ বাণীর উত্তরে বলিয়াছিলাম হে কর্মী, হে বন্ধুবৎসল তোমার গোপণ দানের তুলনা ছিল না, তোমার প্রান তোমার ইচ্ছা প্রতি বাংলার ছেলে মেয়ের প্রাণে সঞ্জিবীত হউক, তুমি এস—ফিরে এস—স্বাগতম—সুস্বাগতম।

মানুষ রতীন্দ্রকুমার

অধ্যাপক শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

[শিল্প-মনের অন্তরালে রতীন্দ্রের অন্তরের যে খাঁটি মানুষটীর সন্ধান পেয়েছিলেন, রতীন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে অধ্যাপক, নরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সেই কথাই বলেছেন মুক্তকণ্ঠে।]

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে রতীনবাবুর আবির্ভাব হ'য়েছিল আকস্মিক। মুগ্ধনেত্রে সেদিন দেখেছিলাম তাঁর প্রতিভা প্রদীপ্ত অভিনয়, প্রেক্ষাগৃহ কলগুঞ্জনে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিল তাঁর গৌরবময় প্রতিষ্ঠার কথা। সে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি; তাঁর আকস্মিক তিরোভাবে —তাই এত বেদনা,—এত অশ্রু। শুধু নট-জীবনের প্রকৃষ্টতাই তাঁকে এই প্রতিষ্ঠা দেয় নি। এই প্রতিষ্ঠার গৌরব তাঁর চারিত্রিক সৌকুমার্যে, ব্যবহারিক সুন্দরতায়। মানুষকে তিনি ভাল বেসেছিলেন—তাই তাঁর প্রেম—শত মৃত্যুকেও যেন আজ ম্লান করে দেয়।

পরম শ্রদ্ধেয় নাট্যকার—শ্রীযুক্ত শচীন সেন মহাশয়ের গৃহে রতীনবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সাধারণতঃ রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্র অভিনেতাদের প্রতি লোকে স্বাভাবিক ধারণা পোষণ করেন না। কেহ বা হয়তো ভাবেন, তাঁরা দেবতা কেহ বা মনে করেন তাঁদের স্থান নরকে। কিন্তু মনে আছে—প্রথম দিনের পরিচয়ে—তাঁর মধ্যে দেবতার মাহাত্ম্য বা নারকীয় লক্ষণ—কিছুই আমি খুঁজে পাইনি—পেয়েছিলাম বলিষ্ঠ-সত্যিকার একটা মানুষের সন্ধান। দৃঢ়, সুঠাম দেহশ্রী, কথায় বার্তায় সংযম সুষমা, আত্মপ্রকাশের নিপুণ ব্যঞ্জনা, আমাকে মুগ্ধ ক'রেছিল। তারপর প্রাত্যহিক আলাপনে তাঁকে চিনবার সুযোগ হয়েছিল ভাল ক'রে।

রঙ্গমঞ্চে যাঁরা বঞ্চিত, যাঁরা অনাদৃত, দেখেছি, তাঁরা ভীড় জমিয়েছে রতীনবাবুর কাছে—কল্যাণ হস্তে তিনি তাঁদের ক্ষতমুখ অমৃত প্রলেপে ভরে দিয়েছেন। সাম্প্রতিক রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থাপনা তাঁকে পীড়া দিত, পীড়া দিত মঞ্চ-মালিকগণের স্বৈরাচার, ব্যথিত হতেন তিনি শিল্পমনের অমর্যাদায়। মনে হতো,—তাঁর পূর্ণ প্রকাশ কোথায় যেন ব্যহত হচ্ছে। আত্মপ্রকাশের পরম প্রশান্তি নিয়ে তাই তিনি স্বপ্ন দেখতেন, এমন একটা আদর্শ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা, যার সঙ্গে জাতির, শিল্পীর থাকবে প্রাণের সংযোগ। শিল্পীর আন্তরিক সেবায়—সেই প্রতিষ্ঠান জাতীয় সম্পদে পরিণত হবে। তাই দেখতে পেয়েছি—কোন নাটকে যদি তাঁর আদর্শকে খুঁজে পেয়েছেন, প্রাণের সবখানি দরদ উজাড় ক'রে সেই নাটকের সাফল্য তিনি কামনা ক'রেছেন। এবং এও দেখেছি মঞ্চনীতিবিদ্‌গণের সাংস্কৃতিক দৈন্যে তাঁর একান্ত কামনা ক্ষোভে ভরে উঠেছে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সর্বদিকে যে বিরাট দারিদ্র, যে বিরাট দৈন্য, তিনি অন্তরে অন্তরে তা উপলব্ধি করেছিলেন—দেখেছিলেন মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিক অনাচার, বুঝতে পেরেছিলেন বঙ্গরঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠদেশে যে দুষ্টব্রণ—তার বিষ কার্য কতখানি প্রাণঘাতী। তাই তাঁর স্বপ্ন!

জানি না তাঁর স্বপ্ন কোন দিন সত্যরূপ পাবে কি না? কিন্তু মনে হয়, যে আশার বীজ তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল—তার সুফল-সম্পদ আমাদের সমস্ত দীনতা একদিন ঘুচিয়ে দেবেই--

"বলে যাব দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গাইতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, হে রতীন্দ্র, হে নট কুশলী, হে মানুষ, তোমার স্বপ্ন সত্য হোক, তুমি শান্তি লাভ কর, তুমি তৃপ্ত হও।

রঙমহলে রতীন্দ্র-স্মৃতি-বাসরে সমবেত জনমণ্ডলীর শ্রদ্ধা নিবেদন

গত রবিবার, ১লা জুলাই, সকাল ৯টায়, 'বেঙ্গল আর্টিস্টস্ এসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে এঁদের অন্যতম উৎসাহী সদস্য সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য রঙ্‌মহল প্রেক্ষাগৃহে একটি সভা আহুত হয়। সু-সাহিত্যিক ও ছায়াচিত্রের জনপ্রিয় পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট অভিনেতা, রঙ্গালয়, ছায়াচিত্র প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। রতীন্দ্রনাথের অনুরাগী বহু সংখ্যক বন্ধু-বান্ধবও সভায় যোগদান করেন। সেদিনকার সভায় যাঁরাই উপস্থিত ছিলেন তাঁরাই একথা স্বীকার ক'রবেন যে, এরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ আবহাওয়া ও এরূপ শোক প্রকাশের অকৃত্রিম আয়োজন খুব কমই অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। প্রত্যেক বক্তার বাণী এত মর্মস্পর্শী হ'য়েছিল যে সমাগত বন্ধু-বান্ধব প্রত্যেকেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠেছিল।

রতীন্দ্রের একটি চিত্র পুষ্পমাল্যে সজ্জিত ক'রে রঙ্‌মহলের পাদপীঠে স্থাপন করা হয় এবং তার চতুর্দিকে ধূপ ধুনা জেলে দেওয়া হয়। রতীন্দ্রের অভিনয়-জীবনের প্রথম কার্যস্থল 'রঙ্‌মহলে' এই স্মৃতি-বাসর অনুষ্ঠিত হওয়ায় অনুষ্ঠানের গভীরতা আরও বৃদ্ধি পায়। সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অহীন্দ্র চৌধুরী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, অখিল নিয়োগী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ রায়, সুধীরেন্দ্র সান্যাল, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, নীরেন লাহিড়ী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, মিহির ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, অমূল্যচরণ সেন, বিমল ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভাত সিংহ, রবি রায়, ভূপেন চক্রবর্তী, ফণী পাল, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, কুমার মিত্র, সন্তোষ সেনগুপ্ত, শ্রীমতী মলিনা, বেলা প্রমুখ আরও কয়েকটি রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীও রঙ্‌মহল থিয়েটারের ও মিনার্ভার বহু অভিনেতা।

প্রথমে অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সভাপতিকে বরণ ক'রতে উঠে বলেন, "আজকে সকালে আমরা যে উদ্দেশ্যে এইখানে সমবেত হ'য়েছি তা আপনাদের অবিদিত নয়, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে অতি অল্প বয়সেই রতীন্দ্রকে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছে। তাঁর স্মৃতি-বাসর রঙ্‌মহলে হওয়ায় আমার মনে হ'চ্ছে যে সে রঙ্‌মহলকে ভালবাসতো, এইখানেই অভিনয় জীবন শুরু হয় তাই বোধ হয় তাঁর আত্মার তৃপ্তির জন্যই এইখানে এই আয়োজন করা সম্ভব হ'য়েছে। আজকের স্মৃতি-বাসরে পৌরহিত্য করবার জন্য আমরা বন্ধুবর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আহ্বান ক'রছি, কারণ আমরা জানি, রতীন তাঁর খুবই স্নেহের পাত্র ছিল এবং সম্প্রতি তাঁর অসমাপ্ত একটি চিত্রে কাজও ক'রছিল। আমি আশা করি আমার এ প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন ক'রবেন—শৈলজানন্দ বাবুকে আমি আসন গ্রহণ ক'রতে অনুরোধ করি।"

শৈলজানন্দবাবু আসন গ্রহণ করবার পর তাঁকে মাল্যদান করা হয়, তিনি সেটি রতীনের চিত্রটির উপর অর্পণ করেন। তাঁর অনুরোধে প্রথমে সুবিখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর লিখিত বক্তৃতাটি পাঠ করেন। (বিস্তৃত বিবরণ 'রূপমঞ্চে' এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হ'য়েছে) শচীন্দ্রবাবু বক্তৃতাটি পাঠ ক'রতে ক'রতে বার বার অত্যন্ত আবেগ চঞ্চল হ'য়ে উঠছিলেন এবং তিনি যে রতীন্দ্রকে কতখানি স্নেহ ক'রতেন তা আন্তরিক ভাবে অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে ব্যক্ত করেন।

তারপর সুপ্রসিদ্ধ নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় রতীন্দ্র প্রসঙ্গ অবতারণা ক'রে বলেন, "জগদ্বিখ্যাত

প্রযোজক গর্ডন ক্রেগ্ রঙ্গালয়ের অভিনয় সম্পর্কে ব'লেছেন যে, অভিনয়শিল্প কোনদিনই বড় হ'তে পারবে না যদি না সেখান থেকে অভিনেতাদের বাদ দেওয়া যায়। তাঁর যুক্তি এই যে, অপর সকল শিল্পে স্রষ্টা তাঁর নিজের ধারণাকে রূপ দিতে পারেন অখণ্ডভাবে কিন্তু কোন নাট্যকার বা পরিচালক অভিনেতাদের নিয়ে নিজের মনের সেই রূপটি দিতে পারেন না—তার কারণ অভিনেতারা যতই কেন চরিত্রানুগ অভিনয় করুন না কিছুতেই তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বাদ দিতে পারেন না। আর তাছাড়া দর্শকদের সঙ্গে তাঁদের একটা সম্পর্ক স্থাপন হ'য়ে যাওয়াতে দর্শকরাও অভিনীত চরিত্রের ভেতর দিয়ে সেই আড়ালের মানুষটিকে কিছুতেই ভুলতে পারেন না, তার ফলে প্রকৃত অভিনয় ব্যাহত হয়। তার চেয়ে পুতুলকে দিয়ে যদি অভিনয় করান যায় তাহ'লে পরিচালক যথার্থভাবে একটা অখণ্ড রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

গর্ডন ক্রেগের এই কথাগুলো যখন প'ড়েছিলুম তখন কিছুতেই তাঁর যুক্তিকে মেনে নিতে পারিনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে যে সম্পর্ক হয় এবং দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার সংযোগের ফলে যে রসের উৎপত্তি হয় সে রস সঞ্চার পুতুল কোন দিনই যে ক'রতে পারে না এইটে তিনি যে কেন বুঝলেন না তাই ভাবতুম। আমরা অভিনয় করি, অভিনেতারা পরস্পর মিলিত হই, দর্শকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে এবং সেই পরিচয়ের ফলে অভিনয়ও যে কত রস-সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে তাও তো প্রত্যক্ষ ক'রেছি। সেখানে সম্পর্ক বিরহিত পুতুল কি ক'রবে? কিন্তু আজ ভাবছি যে হয়তো পুতুলই ভাল। অভিনয়ের জন্ম তারাই আসুক, কারণ আমরা অভিনয় ক'রতে ক'রতে যে সম্পর্ক গড়ে তুলি, সে সম্পর্কের ভিতরে মাঝে মাঝে যখন হারাণোর ব্যথা পেতে হয় তখন মনের মধ্যে গভীর অবসাদ ঘনিয়ে আসে। সংসার রঙ্গমঞ্চে নিজেদের ভূমিকা অভিনয় ক'রতে ক'রতে কত ব্যথাই না পেতে হয়, কিন্তু মানুষের গড়া রঙ্গমঞ্চে এই নতুন সম্পর্ক পাতানোর ভেতরেও যদি এত ব্যথা পেতে হয় তাহ'লে তার চেয়ে প্রাণহীন পুতুলের অভিনয়ই ভাল, তাহ'লে এত ক্ষোভের কিছু থাকে না।

আমাদের আজকে রঙ্গমঞ্চ থেকে চ'লে যাবার দিন এসেছে, কিন্তু যে সব অভিনেতা জীবনের প্রাচুর্যে ভরা, তাঁরা যদি আমাদেরই আগে চ'লে যায় তাহ'লে এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি হ'তে পারে? রতীনের মৃত্যুতে সেই কথাটাই বার বার তাই আমাদের বুকে বাজছে। তাঁর কথা ব'লতে গেলে আমার নিজের একটা কথা মনে পড়ে যে, রঙ্‌মহলে আমার সঙ্গে তাঁর একটা গভীর যোগ ছিল এবং অভিনয় ক'রতে ক'রতেই একটা মধুর সম্পর্ক হ'য়ে গিয়েছিল। চরিত্রহীনে আমি সাজতুম তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র, সে সাজতো সতীশ। চিরদিনই সে আমাকে সেই দাদার মতই দেখতো, সম্মান ক'রতো। (মনোরঞ্জনবাবু এই কথাগুলি ব'লতে ব'লতে অভিভূত হ'য়ে পড়েন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হ'য়ে আসে, কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার আরম্ভ করেন)। আবার হয়তো রঙ্গমঞ্চে চরিত্রহীনের অভিনয় হবে। আমি ভাববো সেই সতীশ ভাই আমার নেই—কাঁদবার জন্য আমি এখনও প'ড়ে আছি।"

মনোরঞ্জন বাবুর বক্তব্য সমাপ্ত হ'লে সুধীরেন্দ্র সান্যাল মহাশয় বলেন "রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্র জগত থেকে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অকস্মাৎ মৃত্যু বিস্ময়ের সৃষ্টি ক'রেছে। ছায়াচিত্রে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু পাবার আশা আমাদের ছিল। একথা সর্ববাদী সম্মত যে তাঁর মৃত্যুতে বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্র একজন বিশিষ্ট অভিনেতাকে হারিয়েছে। কয়েকটি বিশেষ টাইপের চরিত্র ফোটাবার কৌশল রতীন্দ্রের ছিল। আজ তাঁর মৃত্যুতে আমরা সকলেই মর্মাহত।"

সুধীরেন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের বক্তৃতার পর অখিল নিয়োগী মহাশয় বলেন, "রতীনবাবুর সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। তিনি যখন বেঙ্গল কেমিকেলের চাকরি পরিত্যাগ ক'রে রঙ্‌মহলে 'মহানিশা' নাটকে অবতীর্ণ হন তখন থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—তা ছাড়া তিনি বহু ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে নিজের সুনামকে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহার অতি সুন্দর ছিল, তাঁর মধ্যে আর একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল দায়িত্ববোধ। একটি দিনের ঘটনার কথা উল্লেখ কচ্ছি। আমি একদিন মিনার্ভা

থিয়েটারে 'রাষ্ট্রবিপ্লব' দেখার জন্য আমন্ত্রিত হই এবং আমার আসনের সুব্যবস্থা করবার জন্য শচীন সেনগুপ্ত মহাশয় রতীন্দ্রের ওপর ভার অর্পণ করেন। কার্যোপলক্ষে আমার থিয়েটারে পৌঁছতে দেরী হয়। আমি ধারণা ক'রে নিয়েছিলুম যে, যেহেতু অভিনেতারা অনেকেই কথার ঠিক রাখতে পারেন না সেইহেতু রতীন্দ্রবাবুও যে তাঁর ব্যতিক্রম হবেন সে আশা করিনি। তার ওপর আমার নিজেরই দেরী হ'য়ে গেছলো, কিন্তু আশ্চর্য, আমি গিয়ে দেখলুম যে রতীনবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে সাজঘরের সামনে পায়চারি ক'রছেন এবং আমায় দেখে ব'লে উঠলেন 'এই যে অখিলবাবু, আপনি এত দেরী ক'রে ফেললেন? আপনার জন্যে এখনও আমি সাজতে যেতে পারিনি—আসুন আপনাকে বসিয়ে দিয়ে আসি' ব'লে আমার যথাযথ আসন গ্রহণের সুব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ঘটনাটি সামান্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সব ছোট ছোট ঘটনা থেকেই মানুষের চরিত্র কি রকম তা বোঝা যায়।"

অখিল নিয়োগীর বক্তব্য শেষে প্রভাত সিংহ মহাশয়কে কিছু বলবার জন্য সভাপতি মহাশয় অনুরোধ করেন। প্রভাত বাবু বলেন, "রতীন সম্বন্ধে আমি যে কি ব'লবো এখনও ভাবতে পাচ্ছিনা। সে যে চ'লে গেছে তা আমি এখনও যেন বিশ্বাস ক'রতে পাচ্ছিনা। ১৯৩০ সালে রঙমহলের একজন ডিরেক্টর হিসেবে আমি যখন এসেছিলুম সেই সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। চিরদিনই যে আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার ক'রেছে এবং নানা বিষয়ে মতদ্বৈধ হ'লেও সে আমাকে তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিতরণ ক'রতে কখনও কার্পণ্য করেনি। আজ তাঁর স্মৃতি সভায় আমাকে উপস্থিত হ'য়ে ব'লতে হবে এ কোনদিন আমার কল্পনায় ছিলনা—এখনও যেন তা ভাবতে পারছি না, তবু এই সভাগৃহে চারিধার থেকে যেন সেই প্রত্যক্ষ সত্য ফুটে উঠছে, সে নেই—সে নেই—সে নেই!"

প্রভাত বাবুর পর পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মৃত বন্ধুর উদ্দেশে আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন। গভীর ব্যথাভরা কণ্ঠে সজল চক্ষে রতীন্দ্রের প্রতিকৃতির সামনে গিয়ে তিনি বলেন, "বন্ধু তুমি আজ চ'লে গেছ আমাদের মাঝখানে আর নেই এ স্বপ্নাতীত। মৃত্যুর পর যদি আত্মার অনুভব শক্তি থাকে তা হ'লে আজকের এই ব্যথার নৈবেদ্য তুমি নিশ্চয় গ্রহণ ক'রবে। বহুদিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি, আমার দারুণ দুঃখের দিনে তোমাকে সহচর রূপে পেয়েছিলুম, তুমি আমায় ভালবেসেছিলে, আজ থেকে তোমার সেই স্নেহছায়া স'রে গেল, এ দুঃখ আমি কি ক'রে প্রকাশ ক'রবো? তোমার আত্মার উদ্দেশে আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রছি, হে বিদেহী! তুমি তা' গ্রহণ কর!"

গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দান ক'রে আসন গ্রহণ করার পর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমি রতীনের এই অকস্মাৎ বিয়োগে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছি। আজকের সভায় এসে শুধু দুঃখ হ'চ্ছে এই যে বাংলাদেশ এখনও শিল্পীদের প্রতি সম্মান দেখাতে পাচ্ছে না। অভিনয় দেখতে যেলোক সমাগম হয় তা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়, কিন্তু কোন অভিনেতার মৃত্যু তিথিতে সে জনসমাগম না দেখলে মনটায় বড় কষ্ট হয়। রতীন্দ্রনাথের শোক সভায় তবু যাঁরা এসেছেন তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। শুধু অভিনেতা হিসাবে নয় ব্যক্তিগত ভাবে আমি রতীনের গুণমুগ্ধ ছিলাম। তাঁর চোখে আমি দেখতাম একটা আদর্শের স্বপ্ন কিন্তু সে তা সফল ক'রে যেতে পারলো না। হয়তো আবার সে নববেশে কোনদিন এই পৃথিবীতে দেখা দেবে। যাবার সময় তাঁর কয়েকটি কথা আমার কাণে আজও ধ্বনিত হ'চ্ছে। সে মৃত্যুর পূর্বে বন্ধুবর নীরেন লাহিড়ী (বেণু বাবু) পরিচালিত 'ভাবীকাল' নামক একটি ছবিতে কাজ কচ্ছিল। তাঁর ভূমিকা ছিল একটি দরিদ্র স্কুল মাষ্টারের। শেষ সুটিংয়ের দিনে ছবিতে সে কতকগুলি কথা বলে। আজ মনে হ'চ্ছে বিধাতার নির্দেশে যেন ছবির ভূমিকার ভেতর দিয়েই সে নিজের বিদায় বার্তা প্রকাশ ক'রে গেল। সে ব'লেছিল 'আমি আজ চ'লে যাচ্ছি কিন্তু আবার আমি আসবো—আবার জন্মগ্রহণ ক'রবো—তোমাদের মাঝখানে হয়তো নয়—নতুন জীবনের মাঝে—নতুন মানুষের নব আদর্শলোকে।"

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরে অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় রতীন্দ্রের কয়েকটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেন। অহীন্দ্রবাবু বলেন, "বহু নাটকের প্রযোজনায় রতীন নেপথ্যে থেকে আমাকে যা সাহায্য ক'রেছে তা আমি কোনদিনই বিস্মৃত হব না। সময়াভাবে আমি সকল সময় সব কিছু পরিদর্শন ক'রতে পারতুম না কিন্তু সে সকালে, বিকেলে, মহলা চালিয়ে, দৃশ্যপট সংস্থান ক'রে এমন কাজ এগিয়ে রাখতো যে আমার শুধু একটু শেষ ঘসা মাজা করা ছাড়া আর কিছু ক'রতে হ'ত না। সকলের চেয়ে তাঁর বড়গুণ একটা ছিল যে সে বয়োজ্যেষ্ঠদের অতিরিক্ত সম্মান ক'রতো এবং তাঁর ওপর কোন ভার অর্পণ ক'রলে সে কোনদিন 'না হবে না—হয়না' এরকম উক্তি করতো না। এ যুগে এরূপ গুণ খুবই দুর্লভ। মুখের ওপর কখনও তাঁকে অসম্মানকর কথা ব'লতে আমি দেখিনি এবং এই কারণে সে আমার অত্যন্ত প্রীতিভাজন ছিল। তাঁর জীবনের সকল খুঁটিনাটি আমি জানিনা তবে তাঁর জীবনের এই মধুর দিকটার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল যথেষ্ট।"

অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয় রতীন্দ্র সম্বন্ধে বলেন, "আর্টিস্টস এসোসিয়েশনের তরফ থেকে রতীন বাবুর মৃত্যুতে এই যে শোক সভার আয়োজন হ'য়েছে এরজন্য নাট্যামোদীরা নিশ্চয় অত্যন্ত খুশী হবেন যে শিল্পীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আয়োজন আজ বাংলা দেশে শুরু হ'য়েছে। নৃপেন্দ্রবাবু সভায় বিরাট জনতা না দেখে ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন কিন্তু আমি তা হইনি কারণ, আমি মনে করি পৃথিবীতে মানুষের অন্তরঙ্গ খুব কমই থাকে এবং শোকসভায় আন্তরিকতা না নিয়ে এসে শুধু গতানুগতিক শ্রদ্ধা নিবেদন করার মধ্যে যে কৃত্রিমতা ফুটে ওঠে আজকের দিনের তার অভাবই আমাদের প্রীত ক'রেছে। যাঁরা এই সভায় উপস্থিত আছেন তাঁরা বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ পরিচালক মণ্ডলী ও সাহিত্যিক তাছাড়া তাঁর বহু বন্ধুবান্ধবকে এইখানে এমন অসময়ে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি—এই প্রীতি কজন পায়? আমরা হিন্দু, আমরা বিশ্বাস করি অমরলোক থেকে মানুষের আত্মা মরলোকে তার প্রিয়জনের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করতে পারে, রতীন্দ্রও তা প্রত্যক্ষ ক'রছেন এবং তাঁর উদ্দেশে যে শোকাশ্রু তর্পণ করতে আমরা তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গরা সমবেত হ'য়েছি তা দেখে তিনিও তৃপ্তিলাভ ক'রছেন। রতীন্দ্রকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলুম, বন্ধু প্রীতির বহু নিদর্শন আমি দেখেছি। তাঁর বন্ধু জহর গাঙ্গুলী মহাশয়ের একটি সন্তান বিয়োগের সময় তিনি নিজে ছুটে গিয়ে কিভাবে বন্ধুর সাহায্য ও সান্ত্বনার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তাও দেখবার সুযোগ আমার হ'য়েছিল, তাছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও বহু উপকার তিনি আমার ক'রেছেন।

মানুষের জীবনে কাম্য থাকে সকলের ভালবাসা পাবার, আজকের সভায় এসে আমি এইটুকু শুধু প্রত্যক্ষ করলাম যে কত ভালবাসাই না তাঁর জন্য কত লোকের বুকে জমা ছিল। মানুষ ঐশ্বর্য প্রত্যাশা করে, সুনাম প্রত্যাশা করে শুধু একটি মুহূর্তকে বাঁচিয়ে রাখতে, সেটি হ'চ্ছে জীবনের প্রয়াণ মুহূর্ত। আমি চলে যাবার পর আমার জন্যে চোখের জল ফেলবার কেউ রইলো না এ দুঃখ পেতে চায়না কোন মানুষের মন। সে সাধনার পরিপূর্ণতা দাবী করে, পরিমাপ ক'রে এইভাবে যে মৃত্যুর পরও সে যেন সবার স্মরণে থাকে। সে যেন অশ্রুর উপহার পায়। রতীন্দ্র পরিপূর্ণতা লাভ ক'রেছেন সেই দিক দিয়ে—কারণ বহুজনের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি তিনি আজও পেয়েছেন।

আমার আর একটি বিশেষ কথা এই যে শিল্পীদের যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহ'লে শুধু একটা শোকানুষ্ঠানের ভেতর দিয়েই আমাদের কর্তব্যকে নিঃশেষিত ক'রলে চ'লবে না। শিল্পকে সমুন্নত ক'রে সমগ্র শিল্পীদের মর্যাদা বাড়াতে হবে। আনন্দ লোককে আমাদের এমন উন্নত পর্যায়ে তোলা আবশ্যক, যাতে দেশের জনসাধারণের শ্রদ্ধা এর প্রতি আরও বেড়ে ওঠে, যে শ্রদ্ধার ফলে এর ইতিহাস রচিত হবে এবং কোন শিল্পীর দানই উপেক্ষিত হবে না।

যাঁরা আমাদের আনন্দ দেন তাঁরা আমাদের

নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত 'ভাবীকাল' চিত্রে রতীন্দ্র, রবি রায় ও আরো অনেকে

প্রীতির পাত্র। এই দুঃখময় জীবনের কত মুহূর্তই না তাঁরা আনন্দে ভরিয়ে তুলেছেন—তাঁদের আমরা ভুলবো কি ক'রে? আমরা তাই শিল্পীদের এত ভালবাসি যে তাঁরা আমাদের মানসলোকে আনন্দের উৎস খুলে দেন বহুবার। তাঁদের দোষ ত্রুটী কিছুতেই বড় হয়ে ওঠে না যখন ভাবি তাঁদের দানের কথা। তাই বড় দুঃখ হয় যখন আনন্দ জগৎ থেকে কোন শিল্পী বিদায় গ্রহণ করেন। রতীন্দ্রের মত বহু জনকেই অকালে পৃথিবী থেকে চ'লে যেতে হ'য়েছে বা হ'য়ে থাকে তার জন্য সেই ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দুঃখ রয় তাও স্বাভাবিক কিন্তু সম্পর্ক যেখানে বিস্তৃত, বহুজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত তখন দুঃখের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়! তাঁর সঙ্গে বাংলার দর্শকমণ্ডলীর সম্পর্ক শিল্পী হিসাবে। আজ সেই শিল্পপীঠ থেকে তাঁর মত একজন শিল্পী অকস্মাৎ বিদায় গ্রহণ ক'রলেন এই দুঃখই বড় দুঃখ, কারণ আমরা সাধারণ লোকের দেখা পাই বহু স্থানে কিন্তু প্রকৃত গুণী-শিল্পীর দেখা পাই না সহজে।

তাই আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ যে, বাংলার শিল্পকে আরও বড় করবার প্রচেষ্টা আপনারা করুন—শিল্পীদের প্রতি সারা জাতি যাতে আরও শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে ওঠে তার জন্য আমাদের আয়োজন আরম্ভ হ'ক এখন থেকে। আনন্দের ইতিহাসে শুধু রতীন নয় সমস্ত শিল্পী ও কর্মী যেন অবিস্মরণীয় হ'য়ে থাকে। পরিশেষে সভাপতি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, 'আমি আর রতীন্দ্র সম্বন্ধে বেশী কিছু ব'লতে চাইনা কারণ তাঁর বহুগুণের পরিচয় আপনারা পূর্ববর্তী বক্তাদের কাছ থেকে শুনেছেন। রতীনের শোক-সভায় আমি উপস্থিত হব এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, সে ছিল আমার নিতান্ত স্নেহের পাত্র, আমার শ্রাদ্ধ-বাসরে তাঁর উপস্থিতিই হ'ত যোগ্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু তৎপরিবর্তে আমাকে এসে তাঁর আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে হ'চ্ছে এর চেয়ে গভীর দুঃখের কথা আর কি থাকতে পারে। রতীন্দ্রকে নিয়ে আমি আমার শ্রীদুর্গা ছবিতে কাজ ক'রছিলুম কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার অসমাপ্ত ছবির কাজে সে তাঁর ভূমিকাও অসমাপ্ত রেখে চ'লে গেল; কিন্তু যেখানে সে তাঁর শেষ দিনের কাজ সমাপ্ত ক'রলো সে

অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ
মনোজ বসুর **'প্লাবন'**
নাটকের রূপ সজ্জায়।
রূপমঞ্চ রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা।
ফটো : ডি, রতনের সৌজন্যে

রতীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রাবতী
গুণময় বন্দোপাধ্যায় পরিচালিত ভারতলক্ষী
পিক্‌চার্সের **'গৃহলক্ষী'র** একটি দৃশ্যে।

রূপমঞ্চ রতিন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা

ফটো : বিধুভূষণ বন্দোপাধ্যায়র সৌজন্যে।

স্থানটি বড় করুণ, বড় মর্মস্পর্শী। আমি তাঁর ভূমিকা বাদ দেব না কারণ তাঁর অভিনয়ে আমি বড় খুশী হ'চ্ছিলুম। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চটোপাধ্যায় এই মাত্র নীরেন লাহিড়ী মহাশয়ের পরিচালিত 'ভাবী কাল' ছবিতে তাঁর শেষ অভিনয় দিনের প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রেছেন। যে কথাগুলি সে বলে গিয়েছে তার বেদনা ভোলা সহজ নয়। আমার 'শ্রীদুর্গা' ছবিতে সে ক'রছিল মারুতির ভূমিকা। শেষ দিন যেখান থেকে সে চ'লে আসে সেই দিনটি আমার চোখের সামনে আজও ফুটে রয়েছে এবং আমার মনে হ'চ্ছে যাবার দিন তাঁর আসন্ন হ'য়ে এসেছিল ব'লেই হয়তো নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁর মুখ দিয়ে শেষ বাণী এমনি ভাবে প্রকাশ ক'রেছিল।

দৃশ্যটি ছিল এই। বাণে বাণে লঙ্কার আকাশ সমাচ্ছন্ন, যুদ্ধক্ষেত্র ভয়াবহ আকার ধারণ ক'রেছে—সমস্ত রাঘব সৈন্যের আর্তনাদে লঙ্কার আকাশ বাতাস ভ'রে উঠেছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি শেলাহত হ'য়ে লক্ষ্মণরূপী ধীরাজ ভটাচার্য শায়িত হ'য়ে আছেন। এই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করার সাধ্য কারো ছিলনা। এমন সময় সহসা রাম রূপে ছবি বিশ্বাস সেইখানে ছুটে এলেন লক্ষ্মণকে রক্ষা ক'রতে, সঙ্গে মারুতিরূপী রতীন ও অন্যান্য অনুচর। রামকে দেখে রাঘব সেনাপতিরা ব'লে উঠ্‌লেন, প্রভু আপনি এই ভীষণ স্থানে ছুটে এলেন কেন, আজ এখানে মৃত্যুর প্রলয় নৃত্য শুরু হয়েছে, আজ রাক্ষস রোষে কারুর নিস্তার নেই, আপনি রণক্ষেত্র ত্যাগ করুন প্রভু!"

তখন রাম সজল চোখে ব'লে উঠলেন 'না—না তোমরা একি কথা ব'লছো, আমি কি আমার ভাই লক্ষ্মণকে ত্যাগ ক'রতে পারি—তার বিরহে আমার জীবিত থাকা অসম্ভব। আমিও আজ ম'রতেই চাই—সীতাকে ভুলতে পারি—কিন্তু ভাইকে ভুলবো কেমন ক'রে? সে যে আমার জন্যেই স্বেচ্ছায় পরম দুঃখকে বরণ ক'রে নিয়েছে। মৃত্যু আসে আসুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু যেন রাম-লক্ষ্মণের নাম একসঙ্গে মুছে দিয়ে যায়।"

এইরূপ কাতরোক্তি ক'রতে ক'রতে রাম যুদ্ধক্ষেত্রে অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছেন কিছুতেই শান্ত হ'চ্ছেন না—লক্ষ্মণকে কি ক'রে পুনর্জীবিত করা যায় এই তাঁর ধ্যানজ্ঞান চিন্তা। তখন সুষেণ বললেন যে, প্রভু লক্ষ্মণকে এক অমৃত ঔষধি দিয়ে বাঁচানো যেতে পারে কিন্তু সে ঔষধি আনবে কে? দুস্তর সাগর পার হ'য়ে, দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে গন্ধমাদন পর্বত থেকে তা আহরণ ক'রে আনতে হবে—তা আনবার মত শক্তি তো কারুর নেই।"

তখন মারুতি তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন 'আমি আনবো সেই অমৃত, সপ্তসাগর পার হ'য়ে—প্রভুর নাম নিয়ে। রামনাম যার রক্ষা কবচ তার ভয় কি এ জীবনে? —প্রভু আপনি শান্ত হ'ন, আমি যাচ্ছি বিদায় নিয়ে, যদি তা সংগ্রহ ক'রে না আনতে পারি, তাহ'লে আর আপনার সামনে এসে দাঁড়াবোনা।' এই ব'লে মুখে 'জয়রাম' 'শ্রীরাম' উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে সে বেরিয়ে গেল আর ফিরলো না।', আমার মনে হ'চ্ছে সে যেন আজও তার প্রভুর প্রাণসম ভ্রাতাকে বাঁচাবার জন্যে অমর্ত্যলোকে অমৃতের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার আসবে কি না কে জানে?

শৈলজানন্দ যখন গম্ভীর স্বরে এই ঘটনা বিবৃত ক'চ্ছিলেন সেই সময় সভাস্থ সকলের চোখে জলধারা বাধা মানেনি। সবশেষে শৈলজানন্দবাবু নির্মলেন্দু লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি পত্র পাঠ ক'রে সকলকে শোনান। নির্মলেন্দু বাবু লিখেছিলেন, 'আজকের সভায় আমি ইচ্ছা ক'রেই উপস্থিত হইনি—তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমি বিশ্বাস করিনি যে সে মৃত, আজও করিনা। আমি তাঁকে মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে জীবিত দেখে এসেছি, আজ ভাবতে পারিনা সে নেই। আমার কাছে সে এখনও বেঁচে এবং চিরদিনই বেঁচে থাকবে। আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ, সভাপ্রাঙ্গণে গিয়ে কনিষ্ঠের মৃত্যুর অবিসংবাদী প্রমাণ নিয়ে আসতে পারবো না। ভাববো তাঁর সঙ্গে ঘটনাচক্রে আমার আর দেখা হয় না—এই মিথ্যাই আমার কাছে সত্য হ'য়ে থাক—সে আমার কাছে বরাবর বেঁচে থাক্‌!" ইতি তাঁর দাদা নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

সভার প্রথমে জগন্ময় মিত্র এবং সভার শেষে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্তোষ সেনগুপ্ত দুটি করুণ রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে শোকের গভীরতা বৃদ্ধি করেন। সভা ভঙ্গের সময় সভাপতির অনুরোধে রতীন্দ্রের আত্মার প্রতি সমবেত সকলে নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশের জন্য কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান হন।

ম্যালেরিয়া

৩৫ মিলিমিটার সাউণ্ড ফিল্ম্,
৩ রীলে সম্পূর্ণ

'শেল ফিল্ম্ য়ুনিট্'-এর নতুন ছবি। এতে ডায়াগ্রাম, সিনেমাইকোগ্রাফি এবং ভারতে ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তোলা দৃশ্যাবলির সাহায্যে বোঝানো হয়েছে কী ক'রে মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়ার বিষ প্রবেশ করে এবং কী করলে এই রোগের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। **প্রথম খণ্ডঃ ম্যালেরিয়া জীবাণু, দ্বিতীয় খণ্ডঃ ম্যালেরিয়াবাহক মশা, তৃতীয় খণ্ডঃ ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।** 'লণ্ডন স্কুল অব হাইজীন অ্যাণ্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এই ফিল্ম্‌টি তৈরি হয়েছে। ভারতের সর্বত্র স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তাদের এই ফিল্মের সাহায্য নেবার জন্য ভারত সরকারের 'কমিশনার অব পাব্লিক হেল্‌থ' নির্দেশ দিয়েছেন। এই ফিল্ম্ বার্মা-শেলের 'লেণ্ডিং লাইব্রেরি'র অন্তর্গত। শিক্ষাদানের জন্য কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এবং স্বাস্থ্যনীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনা ভাড়ায় এই ফিল্ম্ ধার পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধীয় ফিল্ম্ 'বার্মা-শেল ফিল্ম্ লাইব্রেরি'তে আছে। ৩৫ মিলিমিটার ও ১৬ মিলিমিটার ফিল্ম্ ধার নিতে হ'লে প্রচার বিভাগে আবেদন করুন।

মাদ্রাজ বোম্বাই কলকাতা দিল্লী করাচি

BSMK 11

শিশির কুমারের একলব্য-শিষ্য

রতীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রমোহন রায়

[বাংলার সর্বজন প্রিয় সুদক্ষ অভিনেতা শ্রীযুক্ত রবি রায় রতীন্দ্রের আবিষ্কারক। তাঁর আগ্রহ এবং দুরদর্শিতার জন্যই অভিনেতা রতীন্দ্রনাথকে আমাদের পেতে সৌভাগ্য হ'য়েছিল। এজন্য বাঙ্গালী চিত্র ও নাট্যমোদীরা কতকাংশে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।]

অনুপম শিল্পী স্বর্গীয় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখ্‌তে বলা হ'য়েছে। আমি অভিনেতা—সাহিত্যিক নই, সুতরাং সাহিত্য করে কিছু লিখে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করবার শক্তি আমার নেই। তথাপি লিখ্‌ছি—কারণ লিখ্‌তে আদিষ্ট হয়েছি—না বলবার ক্ষমতা নেই!

১৯৩১ সালে খুব আড়ম্বরেই রঙ্‌মহলের উদ্বোধন কার্য সমাধান ক'রে ভেবেছিলেম একটী ছোটখাট আদর্শ রঙ্গালয় তৈরি করবো। কিছুদিনের মধ্যেই সব আশা চুরমার হোয়ে গেল। ১৯৩২ সালের বড় দিনের পূর্বেই নানারকম বিপর্যয়ের ফলে রঙ্‌মহলের পাদপ্রদীপের আলো নিভিয়ে দিতে হোল। কি করা যায়—দুঃস্থ নট—টাকার বিশেষ দরকার। বন্ধুবর শিশির মল্লিক মহাশয়ের শরনাপন্ন হলেম। তাঁকে সমস্ত বিষয় খুলে বললেম। তিনি রাজী হলেন—সতু সেন ও যামিনী মিত্র বন্ধুদ্বয়ের সহায়তায় রঙ্‌মহলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। আবার নূতন ভাবে, নব উদ্যমে কোমর বেঁধে নেমে যাওয়া হোল, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম ঘূর্ণীয়মান রঙ্গমঞ্চ তৈরি হোল—অনুরূপা দেবীর উপন্যাস 'মহানিশা' যোগেশচন্দ্র কর্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত হয়ে মহলায় পড়্‌লো—আমাকে দেওয়া হল নায়ক নির্মলের ভূমিকা। অন্তরালে ডেকে শিশিরকে বললাম, 'সবই যখন নূতন ভাবে হচ্ছে—একটী নূতন নায়কের সন্ধান করবে?' সে বল্‌লে, 'দেখনা যদি পাওয়া যায় তো খুবই ভাল হয়।' আমি তাঁকে রতীনের কথা বললাম—তাঁর আবৃত্তি, কণ্ঠস্বর ও অভিনয় পদ্ধতির কথা বললাম। সে বল্‌লে—'আগে কাউকে ভেঙ্গনা—যদি পাওয়া যায় তবে বলা যাবে।' আমি বললাম 'তথাস্তু।'

এইখানে বলে রাখা দরকার, কয়েক বৎসর পূর্বে রতীনের অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় নাট্য মন্দির রঙ্গমঞ্চে 'রঘুবীর' নাটক অভিনয় করেন। সেদিনকার সে অভিনয় দেখতে আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেম— রতীন ভায়া রঘুবীরের ভূমিকা অভিনয় করেছিল। তাঁর অভিনয় আমার এত ভাল লাগে যে, বিরামের সময় ভেতরে গিয়ে আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরি। তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করতেই সে নম্রভাবে বলেছিল, "সবই গুরুর আশীর্বাদ দাদা, হাজার হোক একই গুরুর শিষ্য তো!' তাঁর দিকে অবাক হ'য়ে চাইতেই সে একটু মিষ্টি হেসে ব'লে ছিল, "বুঝ্‌লে না দাদা, আমি যে বড়দার (শ্রদ্ধেয় শিশির কুমারের) একলব্য-শিষ্য।" কথাশুনে তাঁর ওপর শ্রদ্ধা তো হোলই, একটু টানও যে না পড়লো, একথা জোর ক'রে বলতে পারিনে। মনে মনে ভাবলেম ছেলেটীকে সাধারণ রঙ্গালয়ে নিয়ে এলে মন্দ হয় না। কিন্তু মনের কথা মনেই চেপে রাখলেম। প্রকাশ করতে সাহস হলো না; কথায় কথায় জানলেম যে আমার কনিষ্ঠ সহোদর ভূমেনের সে বিশিষ্ট বন্ধু। অভিনয় শেষে আর একবার দেখা করে চলে এলেম। মনে মনে স্থির করলেম, সুযোগ আর সুবিধা পেলেই রতীনকে রঙ্গালয়ে আনবার চেষ্টা করবো। এতদিন পরে সেই সুযোগ আর সুবিধা এসে উপস্থিত হলো।

সন্ধ্যার পর সুকিয়া ষ্ট্রীটে রতীনদের ক্লাবে গিয়ে উপস্থিত হলেম। এ কথা সে কথার পর তাঁর কাছে আমার আগমনের কারণ সম্বন্ধে আভাসে একটু গৌর চন্দ্রিকা ভেঁজে এলেম। পরদিন থেকে ভূমেনকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিলেম। দু তিনদিন পরেই ভূমেন বললে, 'সব ঠিক হ'য়ে গেছে, দু একদিনের মধ্যেই রতীন এসে দেখা করবে।' কিন্তু সাত আট দিন কেটে গেল রতীনের আর দেখা নেই। একপক্ষ হ'য়ে গেল। নাটক মহলায় পড়েছে-আমিই নির্মলের ভূমিকা মহলা দিয়ে চলেছি। শিশির একদিন ডেকে বললেন, 'তোমার রতীন আর

আসবে না তোমাকেই শেষ পর্যন্ত নির্মল করতে হবে। ভাল ক'রে তৈরি হয়ে নাও, আর একটা মুরলীধরের চেষ্টা দেখো।' পরদিন সকাল বেলাতেই স্বশরীরে রতীনদের ক্লাবে গিয়ে তাঁকে বাড়ী থেকে ডাকিয়ে এনে বললেম, 'কি হে ভায়া, ভূমেনকে বলেছ' আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দেবে, দু একদিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে দেখা করবে অথচ সপ্তাহ কেটে গেল, তোমার পাত্তা নেই, ব্যাপারটা কি? বলি সত্যিই মনস্থ করেছো, ইচ্ছে আছে না ঘোরাচ্ছ?' রতীন হেসে বল্লে, 'না দাদা, সে সব কিছু নয়, ক'দিন একটু ভেবে চিন্তে দেখ্‌লেম, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করলেম—যোগ দেওয়াই স্থির করেছি। ভয় নেই কথার আর নড়চড় হবেনা, আজ সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু দাদা ভূমেনের কাছে যা শুনলেম তাতে যে একটু ভয় হচ্ছে-প্রথমেই অতবড় একটা ভূমিকা দিয়ে নামাবে? তার চেয়ে তুমিই 'নির্মল' করো দাদা, আমাকে বরং বুড়ো মুরলীধরের ভূমিকাটাই দাও।' আমি হেসে বল্লেম, 'মুরলীধর করবার জন্য তোমায় নেওয়া হচ্ছেনা, নায়কের ভূমিকাভিনয়ের জন্যই তোমায় মনোনীত করা হয়েছে। এমন সুন্দর চেহারা, সুন্দর কণ্ঠস্বর, ভাবনা কি?' সে একটু হেসে আফিসের সময় হয়েছে ব'লে বিদায় নিলে, আমি ফিরে এলেম।

সন্ধ্যার পর রতীন এলো। আমি তাঁকে শিশিরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেম। তাঁকে দেখে তাঁর কথায় বার্তায় শিশির খুবই সন্তুষ্ট হলো। আমাকে ভিতরে গিয়ে মহলা আরম্ভ করতে বললে। মহলা আরম্ভ হবার একটু পরেই শিশির রতীনকে নিয়ে এসে নরেশদাকে বললেন, 'এই নিন নরেশবাবু, আপনার নির্মল।' সকলের সঙ্গে রতীনের পরিচয় হোয়ে গেল। আমিও সময় বুঝে

'নির্মলের' লিখিত অংশটা তার হাতে দিয়ে মুরলীধরের ভূমিকাটা চেয়ে নিলেম।

১৯৩৩ সালের ১৭ই এপ্রিল, মহানিশার প্রথম অভিনয় হোল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'নির্মলের' ভূমিকায় রতীন পাদ-প্রদীপের সম্মুখে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন। বলতে দ্বিধা নেই, প্রথম অভিনয় রজনী থেকেই রতীন নিজেকে অভি-নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে নিল। এরপর ২রা ডিসেম্বর অশোক নাটকে কুনাল এবং তারপরেই পতিব্রতা নাটকে রতীন নায়ক রনেন্দ্রের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করে সত্যিকারের যশের অধিকারী হলেন। ১৯৩৩ সালের ৩১শে মার্চ পতিব্রতার প্রথম অভিনয় হয়। জুন মাস পর্যন্ত অভিনয় ক'রে আফিসের অর্থাৎ বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্মকর্তার আপত্তি করায় রতীন থিয়েটারের সম্পর্ক ছাড়তে বাধ্য হন। তিনি সেখানে সহকারী কোষাধ্যক্ষের কার্য করতেন।

রতীন ছেড়ে দিলে তাঁর ভূমিকাগুলি বাধ্য হ'য়ে তখন আমাকেই অভিনয় করতে হোত। এই ব্যাপারের একমাস পরেই আমরা 'কাজরী'র অভিনয় আরম্ভ করি, ৭ই আগষ্ট তারিখে। রতীন নেই, আমরা জহর ভায়াকে সম্প্রদায়ভুক্ত করে নিলেম।

কিন্তু মঞ্চের মায়া রতীনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে দুমাস যেতে না যেতেই সে কর্মকর্তাদের, বন্ধুবান্ধবদের এমন কি আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ, উপ-রোধ ও নিষেধ সত্ত্বেও বেঙ্গল কেমিক্যালের কোষা-ধ্যক্ষের কার্যে ইস্তফা দিয়ে, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই আবার আমাদের সংগে যোগ দিলে। এবারে এসেই সে ২০ সেপ্টেম্বর "বাংলার মেয়ে" নাটকে নায়ক সত্যেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। ১২ই ডিসেম্বর যোগেশচন্দ্রের 'রাবণ' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। রতীন প্রথম অভিনয় রজনীতে 'বিদ্যুৎজিতে'র ভূমিকা অভিনয় করেন কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয় রজনী থেকেই তাঁকে 'মেঘনাদের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হয়। ১৯৩৫ সালের ৯ই মে 'পথের সাথী' নাটকে রতীন I. C. S. হিরণ্ময়ের ভূমিকাভিনয়ের অভিব্যক্তির মধ্যে যে সংযমের পরিচয় দেন নবীন অভিনেতার পক্ষে তাহা সত্যই অত্যন্ত দুর্লভ। 'পথের সাথীর' অভিনয় যখন সগৌরবে চল্‌ছিল', সেই সময় অমরঘোষ মহাশয় এসে আবার রঙ্‌মহলের পরিচালনার ভার নিতে চাইলেন। বন্ধুবর শিশির মল্লিক তাঁর সংগে পরিচালনার ভার নিতে রাজী হলেন না। মর্যাদার সঙ্গে নিজে সরে দাঁড়ালেন। আমরাও (জহর, ভূমেন ও আমি) সময় বুঝে মানে মানে ছেড়ে দিয়ে নাট্য নিকেতনে যোগদান করলেম। রতীন ভায়া রঙ্‌মহলেই রয়ে গেলেন।

১৪ই ডিসেম্বর। নাট্য নিকেতনে শচীনদার 'নরদেবতা'র আড়ম্বরের সংগে প্রথম অভিনীত হলো। কিন্তু কয়েক রাত্রি অভিনয় হওয়ার পর বড়দিনের মধ্যেই 'নরদেবতা' রাজরোষে পতিত হ'য়ে বিদায় নিতে বাধ্য হোল। ২০শে ডিসেম্বর রঙ্‌মহলে নূতন পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পাদ প্রদীপের আলোকে যোগেশ-চন্দ্র কর্তৃক নাট্য রূপান্তরিত হোয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো। রতীন নায়ক 'সতীশের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। এই সতীশের ভূমিকাভিনয়ে অসাধারণ নৈপুণ্যই নাট্যরস পিপাসু দর্শকগণের মনে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এরপর যোগেশচন্দ্রের 'নন্দরাণীর সংসারে' মতিলালের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে রতীন দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করে দেন। এর পর তিনি যে সব নাটকে অভিনয় ক'রেছেন তার অধিকাংশই আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি—সুতরাং সে বিষয় বিস্তারিত আলোচনা আমি করবো না। তবে শুনেছি, প্রত্যেক নাটকের নব নব ভূমিকায় রতীন বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। শচীনদার 'ধাত্রীপান্না' নাটকে বিক্রমজিতের ভূমিকাতেই তিনি শেষ মঞ্চাবতরণ করেন।

ছায়াচিত্রের অভিনয়েও রতীন যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ছায়াচিত্রে তাঁর অভিনীত ভূমিকাগুলির মধ্যে বিল্বমঙ্গলে 'বিল্বমঙ্গল', মন্ত্রশক্তিতে 'অম্বর' পণ্ডিত মশাইয়ে 'বৃন্দাবন', গরমিলে 'অধ্যাপক', মাটীরঘরে 'কল্যাণ' প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই অনন্যসাধারণ।

সুধী দর্শকগণের মন থেকে রতীনের নাম শীঘ্র মুছে যাবে না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তবে মহানটের ভাষায় বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, 'দেহপট, সনে নট, সকলি হারায়'।

অভিনেতা হতে গেলে সর্বাগ্রে দরকার আকৃতি ও কণ্ঠস্বর। বিশেষ ক'রে মঞ্চে যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁদের উদার কণ্ঠ থাকা একান্ত প্রয়োজন—ছায়াচিত্রে 'মাইকে' অনেক কাজ হয় বটে, ক্ষীণকণ্ঠ হলেও যায় আসে না—কিন্তু মঞ্চে তা একেবারে অসম্ভব। তারপর বাণী শুদ্ধ হওয়া দরকার, সর্বশেষে শিক্ষা—সে নিজের শিক্ষাও বটে এবং নাট্যাচার্যের শিক্ষা প্রণালীও বটে। সর্বোপরি স্বভাবমত কিছু ক্ষমতারও দরকার।

আন্তরিক ও বাহ্যিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকলে প্রকৃত শিল্পী হওয়া যায় না। অভিনীত চরিত্রের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে না পারলে অভিনেতা কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করতে সক্ষম হয় না। যে ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে তার মধ্যে নিজেকে একেবারে লীন করে দিতে না পারলে সত্যিকারের রস সৃষ্টি করা যায় না।

রতীনের মধ্যেএর প্রায় সব গুলি গুণই অল্প বিস্তর বর্তমান ছিল। তাঁর শিক্ষা ছিল, দীক্ষা ছিল, বুঝতে পারতো, বোঝাতে পারতো। হাস্‌তে পারতো প্রাণখোলা, হাসি, কাঁদতেও পারতো, তবে নিজে ইমোশনকে চেপে রেখে দর্শকদের চোখের জলই বেশী বের করতো। ইমোশনকে সংযত করা খুব কঠিন ব্যাপার, এবিষয় সে ওস্তাদ ছিল।

আমরা যারা অভিনয় করি অর্থাৎ অভিনেতারা সবাই অল্পবিস্তর একটু ছিট গ্রস্থ। শিল্পী মাত্রেরই একটা ছিট থাকে সে যে রকমই হোক্‌। তাই আমরা গড়েছিলাম এক ছিটগ্রস্থ সম্প্রদায়ের বৈঠক (ক্র্যাঙ্কস্‌করনার) রতীন ছিলেন তার এক বড় পাণ্ডা। আমরা কেউ কেউ অধিকাংশ দিনই হয় অনুপস্থিত থাকতেম কিন্তু রতীনের কামাই বড় দেখা যেত না। আস্‌তো সবার আগে, যেতো সবার পরে। বেলা হোল—তবু উঠ্‌তে দেবে না, টেনে বসাবে, হাসবে, কাঁদাবে (অর্থাৎ এক এক সময় এমন কারো পেছনে লাগতো যে তাঁর চোখের জল বের হবার উপক্রম হোত) অমনি আবার কথার মোড় ফিরলো আবার হাসি, আবার চীৎকার আবার আনন্দ—যাঁরা সে বৈঠকে যোগ দিতেন তাঁরাই জানেন—রতীনের অভাব সে সমাজের বুকে কতখানি বাজ্‌বে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'ঈট'। রতীনের মধ্যে কোনও দিন সেই 'ঈট্‌' এর অভাব দেখিনি।

রতীন আদর্শবাদী ছিল। অপূর্ব ছিল তাঁর নিষ্ঠা। যখন যেটা নিয়ে পড়তো তখন সেইটাতেই মসগুল হোয়ে থাক্‌তো। উত্তরবঙ্গ রিলিফের জন্য লোক আবশ্যক, চললো রতীন। T. B. হয়ে কোন বন্ধু অসম্ভব কষ্ট পাচ্ছে—আত্মীয় স্বজন কেউ এগোয় না, রতীন রাতদিন তাঁর শুশ্রূষায় লেগে গেল।—নূতন বই তাড়াতাড়ি খুলতে হবে—শেখাবার লোকের অভাব—ভাবনা কি—সকাল থেকে রাত্রি ৩টা পর্যন্ত কোমর বেঁধে লেগে গেল রতীন। নাট্য নিয়ন্ত্রণ করতে,—চা আছে—সিগারেট আছে—আর মনে আছে অদম্য বল—অদম্য আশা—অদম্য সাহস—আর চাই কি? রতীন সত্যিই থিয়েটারকে ভাল বাস্‌তো, কি ক'রে এর উন্নতি হয়, কি ক'রে একে নূতন রূপ দিয়ে গড়ে তোলা যায়, কি করে একটা প্রগতিশীল রঙ্গালয় গঠন করা যায়, এই সব ছিল তাঁর মর্মের কাহিনী।

নটগুরু গিরিশচন্দ্র লিখেছেন—

> "তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার
> তথাপি এ পথে পদ ক'রেছি। অর্পণ
> রঙ্গভূমি ভালবাসি হৃদে সাধ রাশি রাশি
> আশার নেশায় করি জীবন যাপন।

রতীন রঙ্গভূমিকে ভাল বাসতো—রঙ্গভূমির উন্নতি কি ক'রে করা যায়, সে তার স্বপ্ন দেখতো—আশার-নেশায় সে সব সময়ই মত্ত থাক্‌তো। দুরন্ত কাল তাঁকে অসময়ে আকস্মিকভাবে আমাদের কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। তাঁর আশা অপূর্ণ রইলো, কার্য অসম্পূর্ণ রেখেই সে চলে গেল। তাঁর অসমাপ্ত ছায়াছবি "ভাবীকালের" মনোহর মাষ্টারের ভূমিকায় মৃত্যুর দুদিন পূর্বে সে বলেছিল—"আমাদের যাবার সময় হয়েছে, কিন্তু আমরা আবার আসবো, নবীন কর্মীদের মাঝে আমাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবো'। তাই তুমি এস বন্ধু, বাঙ্গালীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ সংস্কৃতির প্রয়োজন—দুঃস্থ নটের ও নাট্যশালার তো বটেই, যে নাট্যশালা তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল, তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে আবার তুমি ফিরে এস, নব জীবন নিয়ে সেই অমৃতলোক হতে নব সংস্কৃতির নব ধারা বহন করে।

রতীন্দ্র-স্মৃতি

বাণীকুমার

[বেতার-খ্যাত নাট্যকার বাণীকুমার রতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে—তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।]

ক'বছর আগে ঠিক গণনা ক'রে বল্‌তে পার্‌বোনা—একদিন সন্ধ্যার পরে সৌরীনদা'র (ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে রঙ্‌মহলে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সৌরীনদা' নিয়ে গেলেন উপর তলায় একেবারে সাজ-মহলে। এ-ঘর ও-ঘর উঁকি মার্‌তে মার্‌তে শেষকালে একটি ছোট ঘরে এসে আমরা পৌঁছুলুম। দেখি একজন তরুণ অভিনেতা পিছন ফিরে বসে আর্‌শীর সাম্‌নে ঝুঁকে প'ড়ে একাগ্রমনে তাঁর কপালে একটি কাটা-দাগ আঁক্‌ছেন। আমরা দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেও যখন তাঁর কোনো সাড়া পেলুম না, তখন সৌরীনদা' হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁকে ডেকে বল্‌লেন—"কি হে রতীন—একেবারে তন্ময় যে। আমরা এসেছি টেরও পাওনি নাকি?" রতীন বাবু মুখ ফিরিয়ে সহাস্যমুখে সম্ভাষণ কর্‌লেন। সৌরীনদা' তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, সাড়ম্বরে গুণাবলীর বিশেষণ দিয়ে। রতীনবাবু আমাকে প্রীতি-জ্ঞাপন ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন "তাহ'লে গুণীলোক। আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে আমি খুব আনন্দ পেলাম। তবে আপনাকে আমি চিনি বেতারের মধ্য দিয়ে—আপনার লেখা শুনি—বেশ ভালো লাগে। আপনার শক্তি আছে।" আত্মপ্রসাদ লাভ করলুম। সেই আমার প্রথম আলাপ রতীনবাবুর সঙ্গে। আজ্‌কে সেই হঠাৎ পরিচয়ের দিনটি আমার মনে পড়ছে। সেদিন তাঁকে আমি বলেছিলুম "আপনার মত দু'চারজন নির্ভীক অভিনেতা যদি বাঙ্‌লা রঙ্গালয়ে যোগ দেন, তাহ'লে রঙ্গালয়ের পয় বাড়্‌বে। সত্যি—আপনাদের মত লোকেরই বেশী দরকার এই রঙ্গালয়কে আরো উন্নত ক'রে তুলবার জন্যে।" আমার উক্তিটি তিনি বিনয় হাস্যে গ্রহণ ক'রে আমাকে সবিশেষ আপ্যায়িত করে ছিলেন।

আমার এই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তটুকু স্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ আবার হঠাৎ খুঁজে পেলুম। এখনো আমার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে—সেই তরুণ কান্তি স্বাস্থ্য-সুন্দর চেহারা, সেই সদাহাস্য মুখ, সেই মধুর সম্ভাষণ। সেদিন সত্যই আমি আশা-প্রশংসার দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেছিলুম। তারপরে নানাক্ষেত্রে, নানা উপায়ে ক্রমশঃ রতীন-মানুষটার পরিচয় পেতে থাকি। তাঁর অভিনয়, বেতার নাট্যাভিনয়ে তাঁর প্রায়শঃ আবির্ভাব, তাঁর হাস্য-বিজড়িত তর্কের উচ্ছ্বাস, তাঁর তাল-ঠোকা মতামত, তাঁর শিল্পজনের প্রতি সহানুভূতি ও আন্তরিক শ্রদ্ধা-পূর্ণ ভালোবাসা—এইগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'তে তাঁকে সত্যিকারের চেনার কোঠায় মধ্যে যখন পেলুম, তখনি জেগে উঠ্‌লো তাঁর সঙ্গে আমার সহজ-সরল অন্তরঙ্গতা। এতো গেল ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু রূপদক্ষ রতীন্দ্র সম্বন্ধে অবিমিশ্র সুখ্যাতি হয় তো ক্ষুদ্র পরিসর, তথাপি তাঁর শিল্পজনের আদর্শবাদীতা নিয়ে একটা বহুপৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর আদর্শবাদীতা যে কত বড় ছিল—তা'র প্রমাণ তিনি প্রথমেই দিলেন এমন চাকুরী ছেড়ে দিয়ে—যা উচ্চ-শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে লোভনীয়। বাঁধা-মাইনের পাকা-রাস্তা ছেড়ে অনিশ্চিতের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়া অর্থাৎ দারিদ্র্য বরণ করা কতখানি সাহসের দরকার—তা' চাকুরীজীবী বাঙালী মাত্রেই স্বীকার কর্‌বেন। কিন্তু তিনি নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে এই অনিশ্চিতকে নিশ্চিত ক'রে তুলেছিলেন। এইখানেই তাঁর সাধনার সার্থকতা। আমার মনে হয় শিল্প-জগতে আনন্দ-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ স্থাপন করাই তাঁর ছিল কামনা। অনেক সময়ে এ ক্ষেত্রে যদি অর্থ-সমাগমের সহায়তা কর্‌তো না—কিন্তু তাঁর নট-জীবনকে সার্থক ক'রে তুলেছিল। তিনি কোনোদিন অভাবকে ভয় করতেন না, নিজের অভাবটাকে তিনি বড় মনে ক'রে দেখতেন না, পরের অভাবটা ভেবেই তাঁর মাথা যেন বেশী ঘেমে উঠতো এবং নিজের সামর্থ্য দিয়ে তা মেটাবার চেষ্টা করতেন। নিজেকে এমনি জড়িয়ে নিয়েছিলেন যে—এ যোগটা কর্তব্য জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হয় নি, তাঁর সকল কাজের মূলে ছিল উদার প্রেম—সেই প্রেমের উৎস তাঁকে দিত প্রেরণা। তাই

হাজার বাধা পেয়েও তাঁর সবুজ অন্তরটা পাক ধ'রে শুকিয়ে হলদে হ'য়ে যায়নি। তাঁর যা প্রাণের জিনিস ছিল—তা কলের জিনিস হ'য়ে ওঠেনি। কর্মস্থলে যাঁদের সঙ্গে তাঁকে উঠতে বস্তে হোতো—তাঁদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতির পার্থক্য, শিক্ষার প্রভেদ, বাধা ব্যবধান, এমন কি বিরুদ্ধতা কিছু-না-কিছু ছিলই—কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর জীবনে সেই জিনিসটাই একান্ত হ'য়ে ওঠেনি—বেসুরের উপরেও সুর বেজেছে। রতীন্দ্র সকলের অন্তর অধিকার করতে পেরেছিলেন, তার কারণ—মানুষের সব চেয়ে যে বড় শক্তি—তাই তাঁর ছিল, সে হচ্ছে—ভালোবাসার শক্তি। এই শক্তিতেই মানুষকে আপনার ক'রে নেওয়া যায়—সেই জন্যে তিনি সকলেরই আত্মীয় ছিলেন। তিনি জান্তেন তাঁর চারিধারে ঘেরা জগৎকে। তাঁর ছিল এক বিচিত্র অথচ সহজ প্রকৃতি। আমরা জানি এমন দু'চার জন হতভাগ্য নট-শিল্পী আছেন—যাঁরা অভিনয়-বিদ্যাদাধ্য খ্যাতিমান টাকা কড়ি সহজে লাভ করেন বটে—কিন্তু সেই জগৎটাকে হারিয়ে বসেছেন, মনের যোগাযোগ নেই—তাঁদের চারপাশে স্বার্থের গণ্ডী ঘিরে থাকে, তাই প্রাণটা সেখান থেকে নির্বাসিত, অথচ প্রকৃত শিল্পীর তা ধর্ম নয়।—শিল্পীর ধর্ম-কর্মকেই তিনি খুব বড় ক'রে মান্তেন। শিল্পী বন্ধু ও সহকর্মীদের জন্যে তাঁর স্বার্থত্যাগ—তাঁকে যাঁরা জান্তেন—তাঁদের কাছে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখ্বে। তাঁর মধ্যে আর একটি বিশেষ জিনিষ লক্ষ্য করেছি—তাঁর দুঃসাহস, ন্যায়ের প্রতি তাঁর একান্ত অনুরাগ। যেদিন আমাদের "সন্তান" নাটকের অভিনয় নিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছিল, সেইদিন রতীন্দ্রই জোর গলায় আমার কাছে ঘোষণা করেছিলেন—"এই নাটক (অর্থাৎ আনন্দমঠের) অভিনয় না হওয়া জাতির অপমান। আমরা আছি, এর অভিনয় করতেই হবে, বাণীকুমার! ব'সে থাকলে চল্বে না। যেখানেই অভিনয়ের ব্যবস্থা করো—আমাকে ডেকো—আমি নিজে নাম্বো, আর সাহায্য আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব তা' করবো। আমার যদি কিছু আসে—আমি বুক পেতে নোবো।" সেদিন এই চির যুবকের উৎসাহ

বাণী আমাকে উদ্দীপনা দিয়েছিল। তারপরে "সন্তান" অভিনয় আরম্ভ হ'তে তিনি অশেষ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এর অভিনয় দেখ্‌বার অতি আগ্রহ আমাকে লজ্জিত ক'রে তুলেছিল,—কেননা তিনি অভিমান ক'রে বলেছিলেন—'বাণী, এম্‌নি বটে! সেদিন বুক পেতে দিতেও পেছপাও হইনি' অথচ তুমি একদিনও নাটকটা দেখ্‌বার জন্যে নেমন্তন্ন কর্‌লে না।" সত্যি—এ খেদ আর আমার যাবে না। তিনি যে-রবিবারে "সন্তান" দেখ্‌বার জন্যে ব্যবস্থা কর্‌লেন—ঠিক তা'র দু'দিন আগে বৃহস্পতিবারে তাঁর প্রাণবায়ু মহাবায়ুর সঙ্গে মিলিয়ে গেল। মধ্যাহ্নেই সূর্যাস্তের শোক। কোথায় নট-শিল্পী রতীন্দ্রের অভিনন্দন জানাবো—তা'র পরিবর্তে মরণ-মহেশ্বরের অমোঘ বিধানে তাঁর বিদায়-আরতি কর্‌তে হোলো। দুঃখ আর কি কর্‌বো—দুঃখ ক'রেই লাভ কি? তবে মনটা কিছুতেই সান্ত্বনা মান্‌তে চায় না, এই কথা ভেবে যে—বঙ্গ-রঙ্গপীঠ থেকে এক তরুণ পূজারী তাঁর দান অসম্পূর্ণ রেখে অকালে মহাযাত্রার পথে চ'লে গেলেন। তাঁর তো এখনো সংসার রঙ্গমঞ্চ থেকে চরম ছুটি নেবার সময় হয় নি? তবে কি তাঁকে নটরাজ মৃত্যুর বেশে আহ্বান দিতে—তিনি সাড়া না দিয়ে পারলেন না? সেখানে কি নটরাজের তাণ্ডব সঙ্গী হবার জন্যে তাঁর এমন আকস্মিক ডাক পড়্‌লো। জানি না, বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু যাঁরা তাঁকে আপনার ক'রে পেয়েছিল—তাঁরা যে কি হারালেন— তা' ভাষার অতীত, অনুভবে তা'র উপলব্ধি।—

আজ আর কোনো কথা নয়। আজ সত্যই তাঁর বিদায় আরতি।—

দূরে কোন্ অজানার ডাকে ছাড়ি' মর্ত্যসীমা
হে যৌবন-রস-দীপ্ত শেষ অরুণিমা
নিভাইয়া দিলে তব মহাযাত্রাকালে,
আঁকিয়া নির্মম করে বন্ধু-জন-ভালে—
তব-প্রেম-স্নেহ-তৃপ্ত শত স্মৃতিরেখা,
মোছেনি মোছেনা কভু—র'বে সদা লেখা।
বিদায় লয়েছ তুমি অতি সকৌতুকে,
জাগাইয়া রাখো তবু বুকে,—
প্রতি দিবসের দীর্ঘশ্বাসে
অস্ফুট নীরব তব ভাষে,
তব হাস্য-পুলকিত স্বর,
গুঞ্জরিছে মর্মে মর্মে——অক্লান্ত নির্ঝর।
তবু তুমি জেগে রবে স্মৃতিলোকে যৌবনের সাজে—
সুস্পষ্টের মাঝে।
মৃত্যু মহাসাগর-সঙ্গমে
গেছ চলি—লুপ্ত করি সর্ব দ্বন্দ্ব-ভ্রমে।
বিস্মৃতির শব্দহীন রাত্রি আসি'
গ্রাস ক'রে তব স্মৃতি রাশি—
যদি কোনো দিন,
তবু জানি—তব নাম নাহি হবে অতলে বিলীন,—
সুচির-চিহ্নিত র'বে নাট্য চিত্রপটে,
অনাগত যুগান্তের প্রবাহিনী-তটে
রহিবে জাগ্রত তুমি শ্যামশস্প-সম,
নটেশের মর্ত্য-দূত—স্মৃতি অনুপম।

আমাদের রতীন—

খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়

[রীতেন এণ্ড কোং, ডি, লুক্স পিকচার্স ও এম, পি, প্রডাকসন্সের সর্বজন পরিচিত হারুদা—রতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মধুর ব্যবহারের উল্লেখ না করে পারেন নি।]

সে আজ অনেকদিনের কথা, রঙ্‌মহলে তখন 'মহানিশা' অতি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে। একদিন দেখতে গেলাম। তখন বুঝি নি। সেই দিনটিকে আমায় চিরকাল স্মরণীয় করে রাখতে হবে। অভিনয়ে মুগ্ধ হ'য়েইছিলাম। আরো মুগ্ধ হ'লাম অভিনয়ের জয়মাল্য ছিল যার গলায়।সেই নির্মল বেশী প্রিয়দর্শন রতীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। আজ বলতে দ্বিধা নেই, প্রথম আলাপেই লোকটি তাঁর নিঃসঙ্কোচ অমায়িকতায় আমার মন কেড়ে নিয়েছিলো।

তারপর এ পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্টতর হয়েছে—ব্যক্তিগত বন্ধুত্বে আর কর্মগত সম্পর্কে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সংস্রব সে শিল্পপ্রতিভায় ও চরিত্র-মাধুর্যে করে রেখেছিলো আগাগোড়াই অতি উল্লেখ যোগ্য। অভিনয়কে সে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিল। তাই বোধ হয় সামান্যতম অংশও তাঁর অভিনয়ে এতো প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে কতো আলোচনাই না হ'য়েছে। তাঁর অভিনেতা জীবনের বোধ হয় সব চেয়ে বড়ো গুণ ছিলো এই যে, পর্দায় ও মঞ্চে নব নব গৌরব অর্জন করার সময়েও সে অপরের মত জানতে বা প্রয়োজন মতো গ্রহণ করতে কখনও কার্পণ্য করে নি।

কিন্তু অভিনয়ের কথা আজ আর বল্‌তে ইচ্ছে নেই। যা কেবলি মনে হচ্ছে—অভিনেতা হিসেবে সে যতো বড়োই হোক, মানুষ হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, সে আমার কাছে ছিলো আরো অনেক বড়ো। যশ তাঁর অন্তরকে মলিন হ'তে দেয় নি। প্রতিভা যেন তাঁকে করেছিল আরো সরল। যারই সম্পর্কে সে এসেছে, তার মুখেই রতীনের উচ্ছসিত প্রশংসাই শুনেছি। সদালাপী লোকটি আমাদের মধ্যে ছোটো বড়ো সকলকেই ব্যক্তিত্বের গুণে আপনার করে নিয়েছিলো।

রতীনের অটুট স্বাস্থ্য ছিলো আমাদের আলোচনার বিষয়। এই স্বাস্থ্যে যে সে আমাদের হঠাৎ এমনি করে ছেড়ে যেতে পারে তা আমাদের কল্পনার অতীত ছিলো। তাই প্রথম যখন তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেলাম—তাঁরই পরিকল্পিত কোনো রহস্য বলে উড়িয়ে দিতে আমাদের এতোটুকুও দেরী হয় নি।

কিন্তু না। আজ সত্যিই রতীন আর নেই। তাঁর সদা হাস্যমুখে সে আর আমাদের প্রিয় সম্ভাষণ করবে না। আমাদের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু আর বাংলার কলা রসিকদের তাদের অন্যতম প্রিয় অভিনেতাকে হারানোর দুর্ভাগ্যকে আজ বরণ করে নিতেই হবে।

তাঁর পরিজনের কথা মনে করে বেদনা পাচ্ছি। ভগবান তাঁদের এ বিয়োগ সইবার যথেষ্ট শক্তি দিন।

আমার রতীনদা

বিমল ঘোষ

[এম্‌, পি, প্রডাকসন্সের ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ ব্যক্তিগত ভাবে রতীন্দ্রনাথকে যতটুকু জান্‌তেন— তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের কিছুটা আভাস দিয়েছেন মাত্র।]

রূপমঞ্চ রতীন্দ্র-সংখ্যা প্রকাশ করছেন্‌। ক্রাঙ্কস্‌ কর্ণারের প্রত্যেক সদস্যকে কিছু না কিছু লিখ্‌তে হবে, এই প্রেসিডেন্টের আদেশ। আমি কোন দিন কিছু লিখিনি, কোন দিন যে লিখতে হবে এও আমি কোন দিন ভাবতে পারি নি। তবে লিখছি এই জন্যে যে, মনের কোনে যে বেদনা জমে রয়েছে তার কিছু প্রকাশ করতে পারলে বোধ হয় ব্যথা হাল্কা হয়ে যাবে।

রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কাছে ছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত। তাই চিরদিনই আমার 'রতীনদা' ছিলেন। ১৯৩৭ সালে রঙ্গমহলের দোতলায় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। ছেলে বেলা থেকেই থিয়েটার বায়স্কোপ দেখতে ভাল বাসতাম, তাই থিয়েটার ও চিত্র জগতের লোকেদের একজন হবার জন্যে সর্বদাই সুযোগ খুঁজ-তাম। অনেক চেষ্টার পর শ্রীযুক্ত সতু সেনের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাঁকে অনেক বুঝিয়ে তাঁরই সহকারীর কাজ করবার সুযোগ পাই, কিন্তু তাতেও এলো বাধা। শ্রীযুক্ত জহর গাঙ্গুলী অর্থাৎ আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সুলালদা বল্‌লেন, একাজ তোমার করা হবে না। আমার মন ভেঙ্গে গেল। এই সময় রতীনদা আমাকে বললেন, কোন ভয় নেই আমি সুলালকে বলে সব ঠিক করে দেবো। সেই দিন থেকে তিনিই আমাকে নিজে হাতে করে এই চিত্র জগতের এক একটা ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম ছবি ইন্সপেক্টার শুরু হলো। রতীনদার সঙ্গে ষ্টুডিও যাওয়া ও তাঁরই সঙ্গে ফেরা, তারপর উত্তরায় সিনেমার পিছনে বসে আড্ডা, রাজ্যের যত কথা। আড্ডায় থাকতেন রীতেন কোং-এর হারুদা, নিউ পুপুলার পিকচার্সের সুধীর দাস। সকলেই রাত্রি ১০॥ পর্যন্ত আড্ডা দিতেন। রতীনদা ছিলেন এই আড্ডার প্রাণ। কেননা তিনি যে দিন না আসতেন, এই আড্ডা জমতো না। সকলেই তাঁর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো। রতীনদা ছিলেন আমার গুরুস্থানীয়, যখনই সময় পেতেন আমাকে নানা শিক্ষা দিতেন। কিসে এই চিত্র জগতের উন্নতি হয় তা বোঝাতে চাইতেন। তিনি যা বলতেন তা বুঝে চুপ করে শুনতাম। তিনি ছিলেন আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু। কখন কাউকে খোসামদ্‌ করতে দেখি নি। যখন রঙ্গমহলে কোন কাজ ছিল না চিত্র জগতেও ডাক নেই, টাকার অভাবে তিনি নিজে উপোস করে দিন কাটিয়েছেন, কিন্তু কারো কাছে গিয়ে সাহায্য চান নি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরদুঃখ কাতর, গরীব লোকের সাহায্য করাই তাঁর ছিল নেশা। ব্যক্তিগত ভাবে আমার জীবনে তিনি ছিলেন বড় ভাই, বন্ধু। আমার বিবাহের দিন তিনিই ছিলেন বরকর্তা। যখনই আমার বিপদ হতো তিনি আমার পাশে উপস্থিত হতেন। ১৯৪৫ জানুয়ারী মাসে যখন আমার ছুটিকন্যা ১৫ দিনের মধ্যে বসন্ত রোগে মারা গেল, আমার এই রতীনদাই প্রত্যেক দিন সকালে আমার বাড়ীতে আসতেন, দিনের পর দিন এসে আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। রতীনদা আমাকে বড় করবার জন্য অযথা লোকের কাছে বলেছেন যে, ও খুব কাজের লোক। আর একটী কথা তিনি আমায় বলতেন, ছোট অভিনেতাদের অগ্রাহ্য করোনা। মৃত্যুর দিনেও বেলা বারটা পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্তের ঘরে তিনি আমাকে ঐ কথাই বলেছিলেন, "আমাদের মত ছোট ছোট আর্টিষ্টদের অগ্রাহ্য করোনা" আমার উন্নতি দেখলে, আমার প্রশংসা শুনলে তিনি গর্ব বোধ করতেন, কেন না তিনি জান্‌তেন তাঁরই হাতে গড়া। আজ রতীনদা নেই সে কথা ভাবতে পারা যায় না। তাঁকে আমি ফিরে পাবো না জানি, কিন্তু তাঁর আদেশ আমার কাছে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাঁর বাণী আমার কাছে অমর হয়ে থাকবে, তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনাই ভগবানের কাছে করি।

স্বর্গীয় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সরযূবালা দেবী

[বাংলার নাট্য-মঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেত্রী শ্রীমতী সরযূবালা রতীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তাঁকে যতটুকু জানতে পেরেছিলেন, রতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে সেই কথাই বলেছেন ।]

রূপ-মঞ্চের সম্পাদক মহাশয় শ্রদ্ধেয় রতীনবাবু সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করেছেন। আমি অভিনেত্রী, কিছু কিছু অভিনয় করতে শিক্ষা পেয়েছি। লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে একেবারেই পারি না। কিন্তু রতীন-বাবুর স্মৃতি এখনো ভুলতে পারছিনা বলেই খানিকটা কর্তব্যবোধে কলম ধরেছি। বেতার-নাট্যালয়ে প্রথম রতীনবাবুর সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়। সে আজ বছর সাত আট পূর্বের কথা। তার পূর্বে শুনতাম তিনি একজন সুবিখ্যাত অভিনেতা। এই পর্যন্তই জানতাম। কারণ তখনও তাঁর সঙ্গে এক-মঞ্চে অভিনয় করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

নাট্য ভারতীতে প্রথম সে সৌভাগ্য অর্জন করলাম, তবে মাত্র ছ'মাসের জন্ম। তারপর মিনার্ভায় বৎসর কালাবধি অভিনয় করেছি তাঁর সঙ্গে। এই অত্যল্পকালের পরিচয়েই আমি বুঝতে পারি, তিনি একটু অসাধারণ প্রকৃতির লোক। উন্মুক্ত—উদার তাঁর অন্তর। নাট্যবিষয়ে সদা জাগ্রত ছিল তাঁর দৃষ্টি। নাটককে সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্ম ছিল তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা। সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে নাটককে দেখতে খুব কম অভিনেতাই সমর্থ হন। অনেক সময় আমাদের অজানায় আমাদের অনেক ভুল হয়ে যায়। সে সব ভুল ধরা পড়ে একমাত্র নাট্যবিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের কাছে। রতীনবাবু আমাদের সেই ভুলগুলি চুপি চুপি সযত্নে শুধরে দিতেন। আমাদের খ্যাতির পিছনে তাঁর সাহায্য অনেক ছিল। তাঁর সেই সাহায্যের ও মধুর ব্যবহারের কথা কেবলই মনে জাগে। এখনও থিয়েটারে তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়াতে হয়, মনে হয় যেন রতীনবাবু শুয়ে আছেন তাঁর ইজিচেয়ারে। তাঁরমত একজন সু-অভিনেতা —নাট্য জগতের উন্নতি-কামী পুরুষের অকাল মৃত্যু নাট্যজগতকে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত করল।

স্বর্গত রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

[অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন করে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই--এবং এঁর সংগে রতীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব এতই ঘনিষ্ট হ'য়ে উঠেছিল যে, তাকে অনেকই আত্মীয়তার পর্যায় বলে মনে করতেন।]

বর্তমান রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যাঁদের সামান্যও পরিচয় আছে, স্বর্গীয় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তাঁদের বিশেষ ভাবে স্মরণ করাতে হবেনা। সাধারণ রঙ্গালয়ে ও চলচ্চিত্রে যে সকল কৃতী অভিনেতা অভিনয় নৈপুণ্যে প্রতিভার বৈশিষ্টে ও শিল্পচাতুর্যে দর্শকদের মনোরঞ্জন ক'রে প্রশংসা অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে রতীন বাবুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাম নাট্য-জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে কিনা জানিনা। তাঁর প্রতিভা বিকাশের যথেষ্ট অবকাশ মিলে নাই। অসম্পূর্ণ জীবনের স্বল্প পরিসরের মধ্যে প্রতিভার বিচার চলে না। তথাপি তাঁর গুণালোচনার প্রয়োজন আছে এবং সে বিচার কেবলমাত্র দর্শকগণ এবং তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধুরাই করতে সক্ষম। দর্শকগণের হৃদয় রাজ্যের একপ্রান্তে তিনি আসন পেয়েছেন। অভিনেতা হিসাবে ইহাই তাঁর সার্থকতা। আজ তাঁর অনুপস্থিতিতে নাট্য জগত কতকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বইকি।

তাঁর মৃত্যুতে আমি একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে হারালাম। আমার সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট মেলা মেশা আছে। তিনি এই সূত্রে সাধারণের কাছে "ভাই" বলে আমার পরিচয় দিতেন। আমার তাতে আপত্তি ছিল না, কারণ হৃদয়ের সম্বন্ধ সেখানে প্রধান, সেখানে আত্মীয় অনাত্মীয়ের প্রশ্নই উঠে না।

প্রায় বিশ বছর পূর্বে তখনকার সুকীয়া ষ্ট্রীট, এখন যাহা কৈলাস বসু ষ্ট্রীট নামে পরিচিত, সেখানে 'সান্ধ্য সমিতি' নামে একটী নাট্য সম্মিলনী ছিল। আমি ও রতীন বাবু ওই সমিতির সভ্য ছিলাম। তাঁর সাথে প্রথম পরিচয়ের কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। "সান্ধ্য সমিতিতে" একদিন উজ্জলবর্ণ এক বলিষ্ঠ যুবককে দেখলাম। তাঁর চেহারার

রতীন্দ্রনাথ ও কানুবন্দ্যোপাধ্যায়
ফটোঃ গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় (কানুবাবুর সৌজন্যে)

মধ্যে এমন দীপ্তি ছিল, যা অতি সহজেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের উভয়ের পরিচয় হোল। সে পরিচয় অতি-সাধারণ; কিন্তু তা থেকেই যে সখ্যতার সৃষ্টি হোলো তার জের তিনি মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যন্ত টেনে রেখেছিলেন। "সান্ধ্য সমিতিতে" থাকবার কালে "প্রফুল্লে" সুরেশের, "আলমগীরে" আলমগীরের, "বিবাহ বিভ্রাটে" মিঃ সিং এর, "প্রতাপাদিত্যে" প্রতাপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। "সান্ধ্য সমিতিরে" উদ্যোগে নাট্যমন্দিরে "রঘুবীর" অভিনীত হয়। সেই সময় রতীন বাবু রঘুবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দর্শকগণের অজস্র প্রশংসা অর্জন করেন। নাট্যাচার্য ভুবনেশ মুস্তাফির শিক্ষকতায় তিনি নাট্য শিল্প বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠেন। সান্ধ্য সমিতিতে থাকবার কালে নির্বাক চিত্র 'সহধর্মিনী'তে তিনি অভিনয় করেন। চিত্র জগতে এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। এই বইখানি ছবিঘরের উদ্বোধন কালে দেখান হয়। কিয়ৎ-

কাল পরে চিত্র পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আমার ও রতীন বাবুর পরিচয় হয়। ১৫৭বি, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, আর্ট বি প্রোডাক্সন্ কোম্পানীর ছাদেতে আমাদের সান্ধ্য বৈঠক বসতো। আমরা দু'জনে অফিসফেরত গুণময় বাবুর ওখানে যেতাম। আমাদের মধ্যে অভিনয় বিষয়ে নানা আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলতো। কোন কোন দিন আসর ভাঙতে রাত্রি হয়ে যেতো। গুণময় বাবুর সংস্পর্শে এসে পরবর্তী জীবনে আমরা বিশেষ লাভবান হয়েছিলাম। অফিস ফিরত প্রায়ই দুজনে সিনেমায় যেতাম। নূতন ইংরাজী ছবি আমাদের আকর্ষণের বস্তু ছিল। মধ্যে মধ্যে রতীন বাবু আমার অফিসে আসতেন। আমার অফিসে "কালী ফিল্মসের" প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সম্বন্ধী অবনী চট্টোপাধ্যায় কাজ করেন। তাঁর সৌজন্তে রতীন বাবুর সাথে গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরিচয় ঘটে। গাঙ্গুলী মহাশয় রতীন বাবুর আলমগীরের অভিনয় দেখে বিশেষ প্রীত হন। তিনি "কালী ফিল্মসের" বিল্বমঙ্গলের নাম ভূমিকায় অভিনয় করতে রতীন বাবুকে অনুরোধ করেন। সবাক চিত্রে রতীন বাবুর এই প্রথম আবির্ভাব। "মহানিশা" নাটকে যখন তিনি অভিনয় করেন ৺ যোগেশ চৌধুরী মহাশয়কে দিয়ে পত্র লিখিয়ে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর সাথে আমার পরিচয় করান। আমি তাঁর কাছে বিশেষ উপকৃত। তাঁকে দেখলে গম্ভীর প্রকৃতির মনে হ'তো কিন্তু যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তারাই রসিক প্রাণের পরিচয় পেতো।

মৃত্যুর পূর্ব দিনে আমার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয়। অফিস ফিরত তাঁর বাড়ী যাই, সেখানে সংসারিক বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হয়। পরের দিন অফিসে খবর পেলাম রতীন বাবুর শরীর ভাল নয়, আমাকে ডেকেছেন। তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখি তখন রতীন বাবু আর ইহ জগতে নেই।

বেতার বিভ্রাট

মিষ্টভাষী

গতবার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলেছিলাম। আর্টিষ্টস্ এসোসিয়েশন সে বিষয় আজ পর্যন্ত কিছু করার পরিকল্পনা ক'রেছেন কি না, আমাদের জানার ইচ্ছা। আশা করি, শ্রোতারা সকলেই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের এই সুবিধাবাদিতার জন্যে জবাবদিহি প্রত্যাশা করেন। আজো নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'সবিনয় নিবেদন' করে চলেছেন, কিন্তু তাঁর নিবেদন যতই সবিনয় হোক-না কেন, কোন শ্রোতাই তাঁর বিনয়ে তুষ্ট হবেন না। কেননা, সকলেই জেনে ফেলেছে যে তিনি শ্রোতাদের মধ্যেকার একজন নন্, তিনি শিল্পী সংঘের মধ্যেরও একজন নন্। তিনি একক, তিনি অদ্বিতীয়। তিনিই তাঁর একমাত্র উপমা কেবল। শিল্পীসংঘের আশু দরকার—এঁর বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো। ইনি শিল্পীসংঘের ইজ্জৎ নষ্ট করেছেন,বেতার কর্তৃপক্ষের ইনি একজন ভিকটিম্, বেতার জেনে ফেলেছে, 'ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না' (কথাটা কোনো বেতারকর্মীর মুখের কথা বলে গুজব)। এখন সেইজন্যে দরকার যে বেতার কর্তাদের জানিয়ে দিতে হবে, যে ভাত ছড়ালেও কাকের অভাব হয়, যদি সে কাক একেবারে পাতি কাক না হয়। হা-ভেতে কাক যে, সে অবশ্য সুধু ভাত কেন, অনেক অখাদ্য দেখলেও তাতে মুখ দিতে উদ্যত হয়। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সমগ্র শিল্পীদের সম্মান হানি ক'রেছেন—সমগ্র শিল্পীরা এর প্রতিকার দাবী করে। শিল্পীসংঘ এদিকে এগিয়ে আসুন, শিল্পীসংঘের কাছে এই আমাদের দাবী। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকে নিয়ে এখন তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হওয়া দরকার। এমন ঘোরতর-আন্দোলন শুরু করতে হবে যে তাঁর সর্বশরীর থেকে ময়ূরপুচ্ছ খুলে গিয়ে তাঁর আসল চেহারা প্রকাশিত হয়।

পৃথিবী টাকার বশ—এ খবর আমরা জানি। সেই টাকার ঝুন শুনে নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ এমন অসংযত ও অশিষ্ট ভাবে নিজেকে ধরা দিতে পারেন—এখবর আমরা আগে পাইনি। এঁকে নিয়ে—আন্দোলন করার কথা এই জন্যে বলছি যে ভবিষ্যতে অন্য কোনো শিল্পী যেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের পদাঙ্কানুসরণ করতে ভরসা না করেন। মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ—অবশ্য করা উচিত। কিন্তু এ-হেন মহাজন যেন পদাঙ্ক রেখে যেতে না পারেন, তাঁর পদ-চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে তাই সবার চেষ্টা করতে হবে।

আমরা জান্তে চাই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'সবিনয় নিবেদন' থেকে অবিলম্বে বিদায় নেবেন কিনা। বেতারের তাঁরা কর্মী—ওটা তাঁদের কাজ। তাঁরা করুক্। তিনি সে-উচ্চ আসন থেকে নেমে এসে সামান্য শিল্পীদের কাছে এসে তাঁর অপরাধের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করবেন কিনা। আমাদের মনে হয়—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যেন সুরু হয়েই গেছে। সেদিন বেতার-কেন্দ্রের অভ্যন্তরে একটা গণ্ডগোল দেখলাম। মিঃ বোখারী (স্টেশন ডিরেক্টর) ছুটে এসে ফোন তুলে নিতে গিয়ে ডাকলেন—'নিপুণ! পাশের দরজা দিয়ে অবিলম্বে নিপুণ (অর্থাৎ নৃপেন) ভীত গলায় বললেন—ইয়েস স্যার।' তারপর তিনি এসে মিঃ বোখারীর মুখোমুখী বসলেন অনুগত শিশুর মত আর অপরাধীর মত মুখ ক'রে। টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথাবার্তা হ'লো কি একটা ঘড়ি নিয়ে। টিকা নিষ্প্রয়োজন অলমিতিবিস্তরেণ। ঘটনাটির ফলাফল এখনো জান্তে পারিনি।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ই, দু'দিন বা দু'দিন পরে। তবুও শিল্পীসঙ্ঘের তরফ থেকেও কিছু করবার আছে। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না ক'রে বাহুবলের উপরও খানিকটা নির্ভর করতে হবে বই কি। রূপমঞ্চ ঠিক গালাগাল দেবার মত কাগজ নয়, উপযুক্ত ভাষায় গালাগাল দিতে জানতো 'চাবুক'। দুঃখের বিষয় সে পত্রিকাটি এখন বন্ধ। সত্যি, এসব—লোকের জন্যে সেই 'চাবুক' দরকার।

কেবল-যে-নৃপেন্দ্রকৃষ্ণই একমাত্র অপরাধী আমরা তা অবশ্য বলছিনে। তবে তিনি, সমসাময়িক ভাষায় Criminal No 1, আরো অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা শিল্পীসংঘে যোগ না দিয়ে নিজেদের সুবিধা ক'রে নিয়েছেন। নীচে তাঁদের নামের লিষ্ট দিলাম।

(ক) যে সব শিল্পী ইতি পূর্বে কলকাতা বেতার

কেন্দ্র থেকে গান গাইতেন না, গাইবার সুযোগও হয়ত মেলেনি, অথচ শিল্পীসংঘ যখন বেতারের সঙ্গে অসহযোগিতা করতে আরম্ভ করে, সেই সুযোগে এই সব শিল্পী বেতারের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে-শিল্পীসংঘের লক্ষ্য ভ্রষ্ট ক'রেছেন। যথা—

১। রতীন রুদ্র ২। সৌরেন রায় ৩। পৃথ্বীশ মুখার্জি ৪। কান্তি কুমার বল ৫। অনিমা মিত্র ৬। দীপ্তি ঘোষ ৭। অমিয়া রায় (ঢাকা থেকে আগত)

(খ) যাঁরা আগে থেকে নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাবে গাইতেন কিন্তু শিল্পীসংঘের সঙ্গে সহযোগিতা না ক'রে বেতারের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রেছেন। যথা—

১। বেচু দত্ত ২। রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। মীরা চাটার্জি ৪। লীলা দেবী (রায় নয়)।

এঁদের সহযোগিতার ফলে শিল্পীসংঘের অসহযোগ সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। শিল্পীসংঘের উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে পণ্ড হ'য়েছে। শিল্পীসংঘের এতে যথেষ্ট অনিষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমরা বর্তমানে বেতার জগৎ খুলে দেখছি, উপরোক্ত 'ক'-শ্রেণী ও 'খ'-শ্রেণীর গায়ক গায়িকারা রীতিমত প্রোগ্রাম পাচ্ছেন। অর্থাৎ শিল্পীসংঘ নামক দলটির ক্ষতি ক'রে তাঁরা ব্যক্তিগত সুবিধা ক'রে নিয়েছেন। এই যদি হয় আদর্শ, তাহ'লে ভবিষ্যতে কোন দিন অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেতার তাতে বিন্দুমাত্র ভীত হবে না। কেননা, তারা জেনে নিয়েছে-যে বাংলাদেশে এই 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর সুবিধাবাদী শিল্পীর অভাব হবে না। জরুরী প্রয়োজনে তারা এই শ্রেণীর শিল্পীদের পাবেই। বেতারের সে আশা নির্মূল করতে হলে, বেতারের জুলুম বন্ধ করতে হ'লে শিল্পীসংঘকে তৈরি হ'তে হবে। আর বর্তমানে যারা শিল্পীসংঘের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ করতে হবে। কোনো আসরে বা কোনো সঙ্গীত অনুষ্ঠানে উপরোক্ত সুবিধাবাদী শিল্পীরা গেলে সেখানে কোনো শিল্পী সংঘের সভ্য উপস্থিত থাকবেননা, তারা গাইবেননা—বাজাবেননা।

গতবারে ব'লেছিলাম যে ষ্ট্রাইক বন্ধ হ'য়েছে বটে, কিন্তু শিল্পীসংঘের জয় হয়নি, বেতারেরই হ'য়েছে জয় জয়কার। সে উক্তির কারণ স্পষ্ট। শিল্পীসংঘ তাদের দাবী মিটিয়ে নিতে পারেন নি। তাদের উচিত উক্ত 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর গাইয়েরা বেতারে গাইলে, তাঁরা গাইবেননা। কোনো যন্ত্রী তাদের সঙ্গে বাজাবেন না। যতদিন না শিল্পীসংঘ এই দাবী মেটাবার মত শক্তিশালী হবে, ততদিন শিল্পীদের দুর্দিন ঘুচবেনা। শিল্পীসংঘ কি বলবেন—তাঁরা এই সব সুবিধাবাদী শিল্পীদের বিরুদ্ধে কি নীতি গ্রহণ করার জন্যে মনস্থ ক'রেছেন? যদি এখনো কিছু না করে থাকেন, অবিলম্বে করুন। আমার নামের লিষ্টে যদি কারো নাম বাদগিয়ে থাকে, দয়া ক'রে তিনি বা অন্য কোনো পাঠক আমাকে তা জানালে বাধিত হব। আমার ঠিকানা, C/o সম্পাদক, রূপ-মঞ্চ।

শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী'র

সন্ধান অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন শ্রীযুক্ত স্বকুমার দাসগুপ্তের "সাত নম্বর বাড়ী"তে এর খোঁজ মিলবে।

শ্রীমতী রেনুকা রায়।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১৩৫১ সালের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী— শৈলজানন্দের 'মানে- না- মানা'য় দর্শক সাধারনকে অভিবাদন জানাবেন।

কাঠগোলাপ

(গল্প)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কমলা অত্যন্ত আঁট মেয়ে। যাকে বলে কঠিন, মজবুত। গড়নে-পিটনে তো বটেই, জীবনের প্রতি ভঙ্গিমায়।

রঞ্জনের তাকে ভীষণ পছন্দ। শুধু তার শরীরের পেটাই-কুটাই নয়, মনের গাঁথনি-আঁটনি। শরীরে যেমন বাড়তি মেদ নেই, মনে নেই তেমনি কোনো বাড়তি মোহ। ব্যায়ামমার্জিত শরীর, বিজ্ঞানশাসিত মন। ওর বিশেষণটা ঝকঝকে নয়, খটখটে। ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে পারিপাট্যটাই ওর বেশি স্পষ্ট।

হাতে গলায়-কানে কণামাত্র আভরণ নেই। রঙের ছাপ বা ছোপ আছে এমন শাড়ি সে পরে না। মাথার চুল ঘাড়ের কাছে ছাঁটা, যাতে কবরীবিন্যাসের কোনো অবকাশ না থাকে। চর্মচর্চার দিন পেরিয়ে এসেছে। তার চরিত্রে যদি কোন শ্রী থাকে তাই ফুটে উঠুক তার রূপে, তার রেখায়।

এক কথায়, সে অধিপতি রঞ্জনের তৈরি। কাব্য যদি প্রশ্রয় পেত, বলতে পারতুম, সে রঞ্জনের প্রণীতা।

আগের দিনে যে সব মেয়েরা দেশের কাজ করত, তাদের মাঝে স্বপ্নই ছিল বেশি, যুক্তি ছিল না। কাজ ছিলনা, শুধু ঝাঁজ ছিল। এখন যারা কাজ করছে তাদের মাঝে আছে একটা স্থিতির দৃঢ়তা। বে-নোঙর ভেসে বেড়াবার দরকার নেই, পেয়ে গেছে যেন বন্দরের আশ্রয়। কল্পনার দৌড়শেষ। তাই আজও কাজ নেই। কিন্তু তাই বলে কারসাজিও নেই।

কমলাকে সংক্ষেপে রঞ্জন "কম্" বলে ডাকে।

আর রঞ্জনকে কমলা কি বলে ডাকবে তাই নিয়ে কথা উঠেছিল। নিজের নামটার জন্যে রঞ্জন অত্যন্ত লজ্জিত, বড্ড বিশ্রী-রকম রঙচঙে। কিন্তু কমলা তার মান রেখেছিল, বলেছিল, চমৎকার নাম, রণ আর জন দুইই পাওয়া যাবে এক সঙ্গে। রঞ্জন গিয়েছিল আরো গভীরে, বলেছিল, 'শুধু "র" বলে ডেকো।'

নামের আদ্যাক্ষর। কিন্তু অর্থটা ইংরিজি। কাঁচা বা আনাড়ি নয়, খাঁটি, নির্ভেজাল। যদিও রঞ্জন একেবারে 'নিট' খেতে পারে না, সোডা লাগে।

রঞ্জন জন্মকালো বড়লোকের ছেলে। বাপ তাকে দস্তুর-মত ভয় করে, যখুনি যা চায় তখুনি দিয়ে দেয় সে-পয়সা। পয়সা দিয়ে বা নির্বিঘ্ন করে রাখবার চেষ্টা করে। বাইরে জৌলুসের দিক থেকে নিষ্কর্মা ছেলে আছে, ভিতরে আছে তাঁর টাকার পাকা গাথুনি, এইটেই সুব্যবস্থা। নামও হয় দামও বাড়ে। ছেলে সনাতন উড়নচড়েমিতে বিষয়-আসয় উড়িয়ে দেবে এ বরং স্বাভাবিক, কিন্তু চোর-ডাকাত এসে লুটের মাল বাঁটোয়ারা করে নেবে এ অসহ্য।

কমলার বাপ ছা-পোষা উকিল। সারা দিন-রাত ঠুকরে-ঠুকরে বেড়ান কোথায় দু' পয়সা রোজগার করতে পারবেন। ছেলেদের শাঁসালো চাকরি, মেয়েদের পুরুষ্টু বিয়ে আর শেষ বয়সে গিন্নির গায়ে কিছু মোটা গয়না এই তাঁর জীবনের মধ্যবিত্ত ধ্যান-ধারণা। বড় মেয়ে অমলাকে বিয়ে দিয়েছেন এক গাঁজা-মদের ইনস্পেক্টরের সঙ্গে। বিয়ে দিয়েছিলেন ঘরোয়া আপোসে, দরদাম কষামাজা করে। তখনো এত প্রগতি হয়নি বলে সদ্গতি হয়নি অমলার, এ আপশোষ গিন্নিকে করতে শোনা যায় মাঝে-মাঝে। কমলাকে তাই তাঁরা লম্বা দড়ি দিয়েছেন।

কমলা তাঁদেরকে হতাশ করে নি। কাজ করেনি অবিবেচকের মত। তার সূক্ষ্মদর্শিতায় সবাই তাঁরা সন্তুষ্ট। সে গেঁথেছে রাঘব বোয়ালকে। তার রণগুরুকে।

তারই কাছ থেকে শেখা তার টেকনিক, পদ্ধতি-প্রণালী। এই বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতা। নিশ্চল নির্লিপ্তি।

অমলা ভাবতরল, তাই তার কৌতূহলের শেষ নেই। জিগগেস করে, 'কত দিন তোদের জানাশোনা ?'

'এক বছর তিন মাস উনিশ দিন।'

'প্রথম কোথায় আলাপ হলো ?'

'পার্টির মিটিঙে, পয়লা মে।'

'তারপর রোজই বুঝি দেখা-শোনা হয় ?'

'মাঝে-মাঝে। রবিবার মানি না, ওটা বাদ দিয়ে।' কমলা যেন ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বলছে এমনি শুকনো কণ্ঠস্বর।

অমলা এবার গায়ে ঢলে পড়ে: 'কবে কি ভাবে বুঝলি যে তোরা ভালবাসিস একে-অন্যকে?'

কমলা দিদিকে আস্তে ঠেলে দিয়ে বোকার মত আশ্চর্য চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ও আবার বুঝতে হয় নাকি? মাথা ধরাতে, বদহজম করাতে হয় নাকি? দিদি একেবারে প্রাগৈতিহাসিক।

'এর মধ্যে আবার বোঝবার কি আছে?' কমলা অল্প একটু ঠোঁট বাঁকায়।

'আহা, ঢং করিসনে। নিজে বুঝলেই তো চলবে না। আরেকজনকে বোঝাতে হবে তো! তোদের মনের কথা কি করে প্রকাশ করলি একে-অন্যের কাছে?'

অসীম কৌতূহল অমলার। সে এ জীবনে বুঝতে পারেনি এই ভালবাসাবাসির স্বাদ। কি রকম তার চেহারা আর ব্যবহার! তাতে কি কিছু লজ্জা মেশানো আছে, কিছু ভয় আর স্তব্ধতা? তাতে কি বুক কাঁপে, চোখে জল আসে?

'বল্ না, বাবা। অত চাপাচুপি কিসের।'

নতুন বউদের কত চিঠি খুলে পড়েছে অমলা, আড়ি পেতেছে কত বাসর-ঘরের জানলায়, শোনেনি, দেখেনি কোন ভালবাসা।

'আমাদের তো কোনই কথা হয়নি এ বিষয়ে।' কমলা নির্বাষ্প গলায় বললে।

'আহাহা, কথা না-ই বা হল। কাজেও তো বোঝানো যায়? ধর, হাতে হাত ধরে রেখে অনেকক্ষণ, কিংবা হঠাৎ গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে—'

'ভালগার।' কমলা লাফিয়ে উঠল এক ঝটকায়।

* * * *

কমলা আর রঞ্জন তাদের বিয়ের কথাটায় এইভাবে উপনীত হল।

সন্ধ্যা, রঞ্জন এসেছে কমলাদের বাড়িতে। সমস্ত বাড়িটাতে একটা জঙ্গুলে বিশৃংখলা। পাঁজি, নিলাম ইস্তাহারের ফর্ম, হোমিওপ্যাথির বই, ক্যালেণ্ডারের ছবি, ফসল বাড়ানোর বিজ্ঞাপন, পেচকবাহিনীর পট, ধোবা-বাড়ি যাবার জন্যে ময়লা কাপড়ের কুঁড়, তরকারির খোসা, ভেজা কাঠের ধোঁয়া।

রঞ্জন সরাসর চলে এল কমলার ঘরে। বিচ্ছিন্নতায় পবিত্র সে ঘরের পরিবেশ। মাঝখানে অমলার ঘরটা পেরিয়ে আসতে হয়েছিল। ট্রাঙ্ক আর বিছানা আর বালিশ আর মশারি আর কাঁথা আর পেনি আর এঁটো আর কাঁটা আর ওষুধ আর ওষুধ—

তুলনায় কমলার ঘর তীর্থস্থান। বেড়ায় গোঁজা দেশবীর কারুর ছবি নেই, ক্যালেণ্ডারের অজুহাতেও নয়। শুকনো তক্তপোষ, হয়ত একজনের পক্ষেও অকুলান। হাসপাতালের রুগী বা জেলের কয়েদীর মত। সময়টা যে রুগ্ন আর স্থানটা যে ফাটক এই বোধের বেদনা তাকে বিশ্রামের সময়ও বিঁধে থাকুক এই তার ব্রত। ক্যানভাসের একটা ইজিচেয়ার পর্যন্ত নেই, মুহূর্তের জন্যেও ভঙ্গিটা আলস্যে নোয়াতে সে প্রস্তুত নয়। খাড়া-পিঠ কাঠের দুটো চেয়ার। একটা বেবার্নিশ টেবিল। তাতে কয়েকখানা বই আর কিছু লেখবার কাগজ আর একটা ফাউণ্টেন-পেন। এক পাশে তার হাত-ব্যাগটা। একখানা কোথাও আয়না পর্যন্ত নেই। ভেজা চুলে আঙুল বুলিয়ে নিলেই আঁচড়ানো হয়ে যায়। বাঙলা বই একখানা মাত্র আছে। রাশিয়ার চিঠি। রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি ভাঙা লাইন মোটে সে মুখস্থ বলতে পারে, তাও রঞ্জনের কাছে শিখে। "অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু।"

হ্যাঁ, আর, বাঁশের চোঙার একটা ফুলদানি আছে। কিন্তু ফুল নেই। আছে কিছু অনভিজাত ঘাস-পাতা।

ফুল মানেই হচ্ছে পেলব মোহ। রঙ আর গন্ধের উচ্ছ্বাস। আর ঘাস হচ্ছে অগণন জনগণের প্রতীক।

দু' জনে বসলো দুটো মুখোমুখি চেয়ারে। যেন আলাপ নয়, মন্ত্রণা। উকিলে-মক্কেলে পরামর্শ।

পাতলা চুলে বাদামী রঙের ছিটে, চোখে জরো উজ্জ্বলতা, শরীরে সুন্দর ক্লান্তি—রঞ্জনকে একটু লুকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে কমলার। কিন্তু তক্ষুনি চোখ ফিরিয়ে এনে বেড়ার গায়ের টিকটিকিটাকে দেখে।

'আমি হপ্তাখানেকের জন্যে একটু বাইরে যাব।' বললে রঞ্জন।

'আমিও যাব।' উছলে বলতে যাচ্ছিল কমলা, কিন্তু গলায় নিয়ে এল অভ্যস্ত নিস্পৃহতা: 'কাজ আছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, পার্টির কাজ। তুমি যাবে? নৌকোয় ঘুরতে হবে কিছুদিন।'

ঝিলকিয়ে ওঠার কোনো মানে হয় না। নদী যতই উত্তাল হোক কমলাকে নিস্তরঙ্গ থাকতে হবে। বললে, 'কাজে লাগব কিছু?'

'কাজে লাগার মানে? আমার কাজে?'

লজ্জায় মরে গেল কমলা। অবশেষে তাই সে বুঝতে দিল রঞ্জনকে? নৌকোর নিভৃতিতে স্বপ্নরচনার কাজ? বিভ্রমমণ্ডন?

'না, পার্টির কাজে।' সংশোধন করলে কমলা।

'হ্যাঁ, কয়েকটা মহিলা-আত্মরক্ষাসমিতি অর্গানাইজ করতে হবে।'

'তা হলে যাব।' নৌকো আর নদী মুছে গিয়ে কমলার চোখে জলে উঠল কতগুলি প্যামফ্লেট আর হ্যাণ্ডবিলের বাণ্ডিল।

'খুব অসুখবিসুখ হচ্ছে আজকাল। টিকে নিয়েছ?'

'নিয়েছি। আইন বাঁচাতে দু'বার নিতে হয়েছে।' কমলার ইচ্ছা হয়েছিল হাতটা একবার প্রসারিত করে দেখায়, কিন্তু গুটিয়ে নিল।

'কলেরার ইনজেকশান?'

'না, এটা নেয়া হয়নি।

'ওটাও নিয়ে নাও। গ্রামে যেখানে যাব সেখানে বছরভোর কলেরা।'

'কালই নেব।'

'তারপর এ সময়েই বিয়ে করে ফেলা ভাল।'

কমলা হঠাৎ ঠাণ্ডা, স্তব্ধ হয়ে গেল। বুক দুলে উঠতে চেয়েছিল, শাসন করলে। এতে উত্তেজিত বা উদ্বেলিত হবার কী আছে? বসন্ত-কলেরার পরেই বিয়ে।

'কি, বিয়ে করবে?' রঞ্জন আবার উস্কে দিল প্রদীপের শলতে।

'কাকে?' ভয়ে-ভয়ে রঞ্জনের চোখের দিকে তাকাল কমলা।

দেখল, সে-চোখে হাসি নেই, উদ্দীপনা নেই, একটা নিষ্প্রাণ স্পষ্টতার শান্তি।

'আর কাকে! আমাকে।'

'মন্দ কি।' গলার স্বরটা ঠিক অনুকরণ করতে পেরেছে কমলা।

ভেবেছিল এবার বুঝি একটা অনিবার্য ঝড় উঠবে। তাকিয়ে দেখল রঞ্জনের হাত মুঠ করা। কমলাও হাত মুঠ করল।

'ডাক্তারের একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হয় তা হলে। সার্টিফিকেট অফ ফিটনেস। দাঁতে কেরিজ ছাড়া আর কিছু পাবে না।'

'আর আমার কনষ্টিপেশন।'

'তা হলে সেই কথাই রইল।' রঞ্জন আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে উঠে পড়ল। 'বাইরে বেরুবার আগেই বিয়েটা সেরে ফেলি। একটা নোটিশ দিতে হয় বুঝি আগে!'

'ঐ ফর্ম টুকু না মানলেই কি নয়?'

প্রচ্ছন্ন একটু ব্যস্ততা ছিল বা কমলার প্রশ্নে, সূক্ষ্ম একটা ধমক খেল সে। রঞ্জন বললে, 'আইন অমান্য তো করতে পারিনে।'

'তা বটে।' সামলে নিতে কমলার দেরি হল না এতটুকু।

'তা হলে সেই কথাই রইল।' বারে-বারে একই কথা রঞ্জনের মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। 'কাল এসে তোমাকে নিয়ে যাব ক্লিনিকে। কলেরার ইনজেকশান দিইয়ে আনব। পরে—'

কমলার ইচ্ছে সে বলে, চলো, নতুন ঘাস উঠেছে চরে, দু'জনে একটু বেড়াই এই জ্যোৎস্না রাত্রে। তখুনি সামলে নিল জিভ কেটে। ছি ছি ছি, নিতান্ত সেকেলে হবে, নিতান্ত রোমান্টিক। সে শুধু ঘরের পাশের অন্ধকার সরু গলিটা দিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে দিয়ে এলো রাস্তা পর্যন্ত। সম্ভ্রান্ত ব্যবধানের বিচ্যুতি ঘটল না এতটুকু।

ঘরে ফিরে এসে কমলা জানলাটা বন্ধ করে দিল। চাঁদটা মুছে ফেলবার জন্যে নয়, ধুলো উড়িয়ে ঝড় উঠেছে একটা। চারিদিকের ঝড়ের মাঝে নিজের এই উষ্ণ অব্যাহতিটা সে উপভোগ করে। কিংবা কে জানে, প্রতীক্ষা করে, ঝড় এসে সমস্ত দরজা-জানলা ভেঙে লোপাট করে দেবে।

* * * *

তারপর হঠাৎ দ্রুত পট পরিবর্তন হল।

শোনা গেল রঞ্জন কে-এক মনোরমা চক্রবর্তীকে বিয়ে করছে। আর সে নাকি এক নিমেষে, এক নিশ্বাসে প্রেম!

কে এই মনোরমা এই নিয়ে আমাদের দলে অনেক গবেষণা সুরু হল। আন্দাজে সবাই ঢিল ছুঁড়তে লাগল। কেউ বললে, খদ্দরের দেশের মেয়ে, কেউ বললে, না, কাস্তে-হাতুড়ির, কেউ বা বললে, সটান উলটো-বাড়ির। কেউ-কেউ বা বললে, দলছাড়া। উটকো লোক।

নিজেই গিয়ে পাকড়ালুম রঞ্জনকে। এ কী ব্যাপার? কে মনোরমা?

রঞ্জন বললে, 'মনোরমা চিত্তহারিণী। কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনী।'

তার ভাব-ভাষা সব বদলে গেছে মুহূর্তে। সে রবীন্দ্র-নাথ ডিঙিয়ে চলে গেছে একেবারে কালিদাসে।

বললুম, 'কমলার কী হল?'

কমলা আঁট কদম আর মনোরমা বিহ্বল চাঁপা। কনক চাঁপা। হাতের নাগালের মধ্যে ফুটে থাকে। ডাল-পালা-মেলা বিরাট কোনো আড়ম্বর নেই। সে-গাছে কাঠ হয় না।

কথা বলতে হয় না। কথা চাপতে হয় না। গন্ধে-বর্ণে-স্পর্শে কত কথা আপনা থেকেই উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। হাত বাড়াতে হয় না। হাত মুঠ করতে হয় না। প্রতীক্ষার একটু সংকেত করলে আপনা থেকেই কুলাতি-ক্রান্ত হয়।

'শেষকালে তুমি দল ছাড়বে?' তিরস্কার করে উঠলুম।

'শতদলের জন্যে শত দল ছাড়তে পারি। কাঠে গোলাপ ফোটাতে চেয়েছিলুম, কিন্তু কাঠগোলাপ নিয়ে করব কি?'

তবু দিনের পর দিন সময় নিতে লাগল রঞ্জন। বললুম, 'না, কমলাকে পষ্টাপষ্টি জানতে দিতে হয় তোমার মত-বদলের কথা।'

জানলেই তো সেই কেলেংকারি। সেই বাঙালী মেয়ের চিরন্তন ব্যবহার। নির্ভেজাল গালাগাল দেবে কতগুলো, ঈর্ষায় বিষজর্জর হবে, কিংবা কে জানে ভেঙে পড়বে খান-খান হয়ে। কাঁদবে অবোধ শিশুর মত।

সেটা কি রঞ্জনের ভয় না আশা, বুঝতে পাচ্ছিলুম না।

'ন', ভয় পাব না।' নিজেকে গুছিয়ে নিল রঞ্জন: 'সত্যবাদিতার ব্রত নিয়েছি। ব্রত নিয়েছি সাহস আর মনোবলের। ভয় পাবো কেন? যা দুর্নিবার, দুর্লঙ্ঘ্য, তাকে অস্বীকার করবো না, পারবো না করতে।'

তাই রঞ্জন গেল কমলার কাছে। তার সেই কাষ্ঠাবৃত ঘরের কাঠিন্যে।

কমলা রাশিয়ার যুদ্ধ-গল্পের বাঙলা অনুবাদ করছিল। রঞ্জনকে দেখে বললে, 'ও তুমি? বোস।'

কলেরার ইনজেকশান না নিয়েও দু'জনে কি করে বেঁচে আছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখাল না কমলা। বিয়ের নোটিশ দেয়া হল কি না হল সে যেন এক দিন আপিসে গিয়ে দেখে এলেই চুকে যায়। কটা মাস কেটে গেল এরি মধ্যে তা তো খবরের কাগজে ঠাহর করলেই হিসেবে আসে। কিন্তু দিন-দিন কত চমৎকার লেখক যে বেরুচ্ছে রাশিয়ায়, তার লেখাজোখা নেই। কত বছর আগে হয়তো চাষা ছিল, এখন মস্ত সাহিত্যিক হয়ে উঠেছে।

'বিদায় নিতে এসেছি।' রঞ্জন বললে।

লেখা বন্ধ করলেও কলমটা কমলার আঙুলের মধ্যে ধরা আছে। বললে, 'আবার যাবে নাকি কোথাও? এবার কিন্তু আমিও যাব। ওবারের মত—' রাগ বা অভিমান নেই এতটুকু, এমন রেখাহীন কণ্ঠস্বর।

'না, বাইরে যাব না। তোমার জীবন থেকে চলে যাব।'

'সে কি, যুদ্ধে যাচ্ছ ?' চোখ তুলে তাকাল কমলা। 'ও, হ্যাঁ, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। বেশ তো, ভাল কথা। আমি পারব অপেক্ষা করতে।'

'না। আমি বিয়ে করছি।'

'সে তো করবেই জানি।' যেমন কমলা জানে গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে।

'জান। কিন্তু আর কাউকে। তোমাকে নয়—'

কমলার আঙুল থেকে কলমটা খসে পড়ল না। বললে, 'কাকে ?'

'মনোরমা চক্রবর্তীকে।'

কি উত্তরটা ভাল হয় ইঙ্গিত পাবার জন্যে কমলা তাকাল একবার রঞ্জনের চোখের দিকে। বললে, 'মন্দ কি।' বলে ফের লিখতে সুরু করল। কে বা মনোরমা, কবে বা বিয়ে, কিছুতেই যেন তার কিছু এসে যায় না। সে পরীক্ষায় ঠিক উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে।

অবোধ শিশুর মত রঞ্জনই বুঝি কেঁদে উঠল। বলল, 'কমলা, আমাকে কোন দিনই তা হলে তুমি ভালবাসনি ?'

কোন উত্তর রঞ্জনের মনঃপূত হবে জানা আছে কমলার। বললে, 'ভালবাসা ? ও নাম শুনলুম কবে! মনে তো হয় না, ভালবাসতে পারি, ভালবাসতে পেরেছি তোমাকে কোন দিন।'

পরীক্ষায় ফুল মার্ক পেয়েছে কমলা। এমনি গর্ব হচ্ছিল তার। হয়ত এখুনি তার সমস্ত গর্ব সমস্ত প্রত্যাহার রঞ্জন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। কাঠের ঘর পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।

কিন্তু রঞ্জন চলে গেল নির্বাপিতের মত।

কিন্তু মনোরমা কই ?

রঞ্জন বললে, 'সে আমার চিত্তের গুহাবাসিনী সন্ন্যাসিনী। অপর্ণা। কঠিনের তপস্যা করছে।'

সম্পাদকের দপ্তর

রতীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দর্শক সাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদন

তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (ডিকসন লেন, কলিকাতা)

রতীনবাবুর মৃত্যু সংবাদ শুনে বাস্তবিকই মর্মাহত হলুম। অকালে বাংলা চিত্র ও নাট্য জগত আবার একজন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতাকে হারালো। খবরের কাগজের ক্ষুদ্র হরফে রতীনবাবুর মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হ'য়েছে, এবং শুধু ঐ সংবাদ ছাড়া তাঁর জীবনের কোন আলোচনাই কোন কাগজ করেননি। কিন্তু আপনাদের দান অনেক। এই জন্য আপনারা আজ পর্যন্ত সে স্মৃতি-সংখ্যাগুলি প্রকাশ করছেন তার জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। আমি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আপনাদের সকলকে, যাঁদের সাহায্যে এই স্মৃতি সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হ'য়েছে। আর একজন সাধারণ দর্শক হিসাবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি রতীনবাবুর পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে।

ধীরেন্দ্রনাথ হালদার (সম্পাদক, 'কাল বৈশাখী,')

রতীনদার সংগে আমার পরিচয় বেশীদিনের নয়। নিতান্ত অতর্কিত ভাবেই তাঁর সংগে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁর মত একজন খ্যাতনামা অভিনেতার সংগে আমার আলাপ হবে এবং সেই আলাপ ক্রমে এত গভীর হবে, তা আমি কোনদিনই ভাবিনি। প্রথম আলাপের পর প্রায়ই তাঁর সংগে দেখা করতে গেছি। প্রথম প্রথম একটু সংকোচ বোধ করতাম। যদি তিনি কোন সময় বিরক্ত হন। এই সংকোচ তাঁর চোখ এড়াত না। তাই তিনি বলতেন, 'এখানে এসে এত ভয় পাও কিসের জন্য ? আমরা বাঘ না ভাল্লুক। আমরাওত তোমাদের মতই মানুষ। কোন ভয় করবে না। এসে নিঃসংকোচে কথা বলবে। তাতে আমি আনন্দই পাব বেশী।" একজন সাধারণ দর্শক হ'য়েও তাঁর স্নেহ আমি অন্যান্য সকলের সমানই পেয়েছি। তাঁর মত একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ অভিনেতা যে আমাকে এতটা আপনার করে নেবেন তা ছিল আমার ধারণারও অতীত। তাঁর সংগে আলাপ হওয়ার আগে আমার ধারণা ছিল, নিশ্চয় তিনি খুব দাম্ভিক প্রকৃতির লোক। কিন্তু আলাপের পর থেকেই আমার সে ভুল ভেঙ্গেছে। একদিন তাঁর কাছে আমার মনের কথা প্রকাশ করাতে তিনি হেসে বলেছিলেন, 'দাম্ভিক হতে যাবো কেন ? আমরাও ত তোমাদেরই মত সাধারণ ঘরের ছেলে।' তাঁর চরিত্রের সব চেয়ে বড় গুণ ছিল তিনি প্রত্যেককেই আপনার ক'রে নিতেন। এই গুণটা অনেক অভিনেতারই নেই। এক দিন কথায় কথায় বলেছিলেন, "সকলের সংগে আলাপ করতে বড় ইচ্ছা হয়। কারণ নিজের বলতেও বিশেষ কেউ নেই। হয়ত একদিন এঁরাই আমার শেষ কাজ করবে।"

ভগবানের এমনই লীলা যে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও তিনি তাঁর চিরআদরের 'রংমহলের' সংগে দেখা করে পরলোকে অভিনয় করবার জন্য চলে গেলেন। কিন্তু পারলেন না শেষে দেখা দিতে তাঁর স্ত্রীকে। এই আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীর আজ যে কি নিদারুণ অবস্থা তা আমাদের ধারণার অতীত। আমরা বন্ধু হ'য়ে যখন এই আঘাত সহ্য করতে পাচ্ছি না, তিনি স্ত্রী হ'য়ে সেই আঘাত কেমন করে সহ্য করবেন ? তাই আজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যিনি চলে গেলেন, তাঁর আত্মা চির-শান্তি লাভ করুক। আর তাঁর শোকাতুরা স্ত্রী ও কন্যা এই শোক সহ্য করবার মত শক্তি লাভ করুক।

সবশেষে মিনার্ভা, রংমহল ও অন্যান্য মঞ্চ ও চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ, স্বর্গতঃ শিল্পীর স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁরা যেন কোন ব্যবস্থা করেন। আর সেই সংগে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা যাতে কোন বিপদে না পড়েন, তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন।

সুনীলকুমার চক্রবর্তী (গোন্দল পাড়া, চন্দননগর)

এই সেদিনের কথা। বাংলার শিল্পীরা সদলবলে পাড়ি দিচ্ছে ব'ম্বের দিকে, বাংলা হ'তে চলেছে শ্মশান। আমাদেরই বাংলার ছেলে চলেছে অন্য দেশে। ভাড়াটে শিল্পী সেজে। এমনি সময় একদিন দেখা হয় আমাদের 'রতীনদার' সাথে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমি বল্লাম —"কবে চলেছেন বোম্বের দিকে ? সবাই তো যাচ্ছে চলে, আপনার পালা কবে ? তাগিদ কি এরই মধ্যে এসে গেছে, আপনার কাছে।" কথাটা শুনে তাঁর মুখের ভাব

বদলে গেল। মনে হল, তিনি যেন বেশ চিন্তিত ও কাতর হয়ে পড়েছেন। তাই কথাটা বলেই আমি অন্য বিষয় পাড়বার অবসর দেখছিলাম। কিন্তু তিনি নিজেই ঐ কথা বলতে লাগলেন। ঠিকমত আমার মনে নেই। তবে মোটামুটি সবটাই জানতে পারবেন। আর এ থেকেই বুঝতে পারবেন তিনি তাঁর বাংলা মাকে কতটা প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন।

"সত্যি, এটা বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমাদের আজ এতটা নীচে নামতে হচ্ছে। এতে যারপর নাই কষ্ট হয় শুনে, বাংলা ছেড়ে আজ সবাই চলে যাচ্ছেন। আর্ট (Art) জিনিষটা প্রাণের। পরের ভাড়াটে হয়ে কি নিজের আন্তরিক ভাব জানানো যায়? না, তা যায় না, যেতে পারে না। নিজের দেশের শিল্পকে ফেলে যাব অন্য স্থানে? জেনে রাখ, তা আমি কখনই যাবো না। আর যখন দেখবে আমি অন্য স্থানে গেছি, আমার মনুষ্যত্বের তখন অপচয় হয়েছে, আমার আমিত্ব মারা গেছে। তারপর বাংলার জল হাওয়া ছেড়ে কি আমরা সত্যিই যেতে পারি? আবার এখানেই আসতে হবে। 'ভালমন্দ' যাই হ'ক না কেন, জানি আমাদের ভায়ের কাছেই করছি। এটা আমাদেরই দেশ। দাবী আমার এখানে আছে যথেষ্ট।"

আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু কথা তাঁর এখন ভেসে উঠছে মনে। ভাবছি, তিনি মরেন নি, মরতে তিনি পারেন না।

এ, এইচ, সালেউদ্দিন (কলিকাতা—১১১০)

বাংলা মঞ্চ ও চিত্র জগতের খ্যাতনামা শিল্পী রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে একজন চিত্র ও নাট্যানুরাগী হ'য়ে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। অভিনয়-শিল্প সমাজের কাছে আদৃত না হইলেও আমি একজন তার অনুরাগী বলিয়া স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন, এবং তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

কনক নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর, হুগলী)

অভিনেতা রতীন্দ্রনাথকে প্রথম আমি দেখি 'ইন্সপেক্টারে' অথবা 'ধূমকেতু' নামক ছায়াচিত্রে। একজন শিল্পী এক সংগে দুইটি চরিত্রে এমন সুনিপুণ ও সাবলীল অভিনয় করতে পারেন তাহা আমার ধারণাতীত ছিল। শুধু আমার কেন, বহু দর্শকের মনে রতীনের এই চাঞ্চল্যকর অভিনয় দাগ কেটেছিল। পরবর্তীকালে রতীনের প্রতিভা বিকশিত হ'য়ে উঠলো আরও নব নব রূপ সম্ভারে—যা দেখবার আশায় আমরা এতদিন উদগ্র নয়নে চেয়েছিলাম রঙিন পর্দার পানে। 'পরিচয়' বাণীচিত্র বোধ হয় রতীনের শ্রেষ্ঠতর পরিচয়। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে রতীনের কতখানি দক্ষতা বা জ্ঞান ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে এই পরিচয় বাণী-চিত্রে। বাকশুদ্ধি ও অভিব্যক্তির নিপুণতা ছিল রতীনের শিল্প-জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট। এ বিষয়ে আমার নিজের মনে হয় স্বর্গীয় খ্যাতনামা শিল্পী ৺ দুর্গাদাসের পরেই বোধ হয় তাঁর নাম করা যায়। মনের মধ্যে বিচিত্র ভাবা-বেশ বয়ে চলেছে, বিচিত্র ধারায় তা বাহিরে (অর্থাৎ লোকচক্ষুর সামনে) নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করাই শিল্পীর ধর্ম। রতীন্দ্রনাথ যতদিন আমাদের আনন্দ দিয়েছেন—ততদিন তিনি যথাযথ রূপে সে ধর্ম পালন করেছেন—আদর্শ শিল্পীরূপে। রতীনকে আমি শেষ দেখি 'মাটির ঘর' বাণীচিত্রে কল্যাণের ভূমিকায়। এই বাণীচিত্রে বহু খ্যাতনামা শিল্পী অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু কেন জানি না সব চেয়ে ভাল লেগেছিল রতীনের অভিনয়। বিধায়কের কল্যাণ—যেন সত্যই মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল তাঁর অভিনয়ে।

রতীনের অকাল বিদায়ে চিত্রশিল্পের যে কতখানি ক্ষতি হ'লো তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। শুধু উপলব্ধির বিষয়। ভাষায় যেটুকু প্রকাশ করেছি সেটুকু শুধু স্বর্গীয় প্রিয় শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি—শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ের ভবাবেগ।

রাণু দেব (মুক্তারাম রো, কলিকাতা)

জনপ্রিয় নট রতীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে সামান্য একজন দর্শক হ'য়ে আমি আন্তরিক শোক প্রকাশ করছি। অভিনয় করে যাঁরা আমাদের দিনের পর দিন আনন্দ দান করেন—সমাজে তাঁরা অনাদৃত। মৃত্যুর পর তাঁদের আমরা একদম ভুলে যাই। রূপমঞ্চ আজ এদিকে

হস্তক্ষেপ করেছেন, রূপমঞ্চের এই মহৎ প্রচেষ্টায় রূপমঞ্চের একজন গ্রাহিকা হ'য়ে আমি গর্ব অনুভব করি। তাই রূপমঞ্চের রতীন্দ্র স্মৃতি সংখ্যার মারফৎ আমাদের জনপ্রিয় শিল্পীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

অমিয় কুমার দত্ত (কলিকাতা)

বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই। এই প্রতিভাবান শিল্পীর মৃত্যুতে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ও ছায়াচিত্রের যে প্রভুত ক্ষতি হলো তা বলাই বাহুল্য। মহানিশা নাটকে নির্মল, 'সর্বহারা' নাটকে একটি বিশিষ্ট ভূকিকায় অভিনয় করে তিনি দর্শক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৮যোগেশ চৌধুরী রচিত 'নন্দরাণীর সংসার' নাটকে মতিলালের ভূমিকাভিনয়ে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। পি, ডব্লিউ, ডি নাটকে সোম্যেন্দ্র, কঙ্কাবতীর ঘাটে প্রবীর, মাইকেল-এ মিঃ আর্ডেন—তটিনীর বিচার, মাটীর ঘর, কর্ণার্জুন, মন্ত্রশক্তি ভোলামাষ্টার প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ছায়াচিত্রেও তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করে।

রূপ-মঞ্চকে তিনি ভালবাসতেন। কথা প্রসংগে একদিন রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করায় তিনি পত্রিকাটির প্রশংসা করে বলেন, 'এই শিল্পটীকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবার জন্য রূপ-মঞ্চের চেষ্টা ও কৃতিত্বের যা পরিচয় পেয়েছি—বাস্তবিকই তা প্রশংসার যোগ্য।' রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল না। তবুও আজ মনে হচ্ছে তিনি ছিলেন আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। তাঁর অকাল মৃত্যুতে একজন নিকট-জনকে হারিয়েছি বলেই আমি অনুভব করছি। তাঁর অমর আত্মা শান্তিলাভ করুক এই আমার কামনা।

শুভ্রা দেবী (বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

আমরা অভিনয় না করলেও, অভিনয়ের সফলতায় আমাদের আনন্দ হয়। একজনের অভিনয় দেখে আমরা সত্যিকারের আনন্দলাভ করতুম, তিনি আর কেউ নন, তিনি রতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আজ ইহধামে নাই।

রতীনবাবুর অভিনয়ের আলোচনা করার স্থান এ নয়। সবাই তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ। কিন্তু আমার যা ভাল লেগেছে তা না বলে পারছিনে। তাঁর সুসংযত অভিনয়ধারা ও কৌশল, তাঁর চলনভঙ্গী ও অভিজাত আদব কায়দা সবারই প্রাণে একটা অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, এনেছিল একটা নূতন সাড়া।

তাঁর প্রথম অভিনয় 'মহানিশায়' নির্মলের ভূমিকা থেকে 'নন্দরাণীর সংসারে' মতিলালের ভূমিকা অবধি অভিনয় অপূর্ব। 'তটিনীর বিচারে' বসন্তের ভূমিকা তুলনাহীন। 'ভোলামাষ্টারে' সমরের অভিনয় তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি। তাঁর প্রথমকার অভিনয় রঙমহলে, মিনার্ভার রাষ্ট্রবিপ্লবে...ঔরংজেব, দেবদাসে...চুনীলাল খুব হৃদয়গ্রাহী অভিনয়।

সিনেমা জগতেও তার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি সিনেমায় সর্বপ্রথম বিল্বমঙ্গল-এ অভিনয় করেন। সর্বাঙ্গ সুন্দর না হলেও এ ভূমিকাটিও নিন্দনীয় নয়। 'সোনার সংসারে' প্রফেসার, গরমিলে একটি ভূমিকা এবং রাঙাবউ-এরও একটি ভূমিকায় তাঁর অভিনয় তুলনা হীন। মোট কথা তাঁর অল্প বিস্তর প্রত্যেক ভূমিকাই আমার চোখে সুন্দর রূপ ধরে দাঁড়িয়েছিল।

কে জানে কখন কার কি হয়। হঠাৎ দেখলুম খবরের কাগজের মারফৎ রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলোনা, কথাটা ভাল লাগলো না বলেই। যে গেল সেতো গেলই, শুধু রেখে গেল একটা কীর্তির ছাপ সবার অন্তরপটে চিরদিনের জন্যে।

কাগজের মারফতেই শুনলাম তাঁর এক কন্যা ও স্ত্রী

আছেন কাশীতে। রতীন বাবুর পরলোকগত আত্মার সদগতি এবং তাঁর স্ত্রী কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য গতি কামনা করি।

[পাঠক পাঠিকাদের অন্যান্য চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া বর্তমান সংখ্যায় সম্ভবপর হ'লো না। কেবলমাত্র রতীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যাঁরা চিঠি লিখেছিলেন, তাঁদের চিঠির মাত্র কয়েক খানাই উধৃত করা হলো। সম্পাদকের দপ্তরে পাঠকদের বহু চিঠি এসে জমা হয়ে আছে—আগামী সংখ্যা থেকে সেগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করবো। অনেকে, সব চিঠির জবাব পান না বলে অভিযোগ করে চিঠি দিয়েছেন, তাঁদের অভিযোগকে নেহাৎ অমূলক বলে উড়িয়ে দিতে চাই না। তবে Paper Control (Economy) orderএর দয়ায় আমরা যে হাত পা বাঁধা এই কথাটুকু আমাদের সপক্ষে বলতে চাই। তবু সম্পাদকের দপ্তরে যাতে আরও বেশী সংখ্যক চিঠির জবাব দেওয়া যায়, এজন্য আমরা চেষ্টা করছি। শারদীয়া সংখ্যার জন্য আমরা তৈরী হচ্ছি। শারদীয়া সংখ্যাতে পাঠক পাঠিকারা মাত্র একটি করেই প্রশ্ন করতে পারবেন। এবং এই প্রশ্ন আগামী ১লা ভাদ্রের ভিতর সম্পাদকের দপ্তরে পৌঁছানো আবশ্যক। প্রশ্নপত্রে শারদীয়া রূপমঞ্চ উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়া শারদীয়া সংখ্যাকে নিখুঁত করে তুলতে যদি কোন পাঠক পাঠিকার কোন বিশেষ পরিকল্পনা থাকে আমাদের জানালে বাধিত হবো। সম্পাদক : রূপ-মঞ্চ।]

মঞ্চ ও পর্দায় যে সব চরিত্র চিত্রণে রতীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন

ছায়াচিত্র

বিল্বমঙ্গল ছায়াচিত্রে সর্বপ্রথম নাম ভূমিকায়। মন্ত্রশক্তিতে—অম্বর। পণ্ডিত মশাই—বৃন্দাবন। ইম্পষ্টার-নায়ক। সোনার সংসার—প্রোফেসার। পরিচয়—একটি ভূমিকা। চাণক্য—মহারাজ নন্দ। শেষ উত্তর—ক্রূর চরিত্রের একটি ভূমিকা। মাটির ঘর—কল্যাণ। শেষরক্ষা—চন্দ্র। দোটানা—একটি ভূমিকা। শ্রীদুর্গা—মারুতি। ভাবীকাল—মনোহর মাষ্টার। (এই শেষ ছুটি ছবিতে তিনি অভিনয় করতে করতে অসমাপ্ত রেখে গেছেন)

রঙ্গমঞ্চ

১৯৩১ সালে "রঙ্গমহল" থিয়েটার লীজ নিয়ে শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক "মহানিশা" নাটক মঞ্চস্থ করেন।

মহানিশা নাটকে 'নির্মলের' ভূমিকায় সর্বপ্রথম পেশদার রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন।

পতিব্রতা নাটকে—রণেন। বাংলার মেয়ে নাটকে সত্যেন। অশোক নাটকে—কুনাল। রাবণে—বিদ্যুৎ-জিহ্ব ও পরে মেঘনাদ। পথের সাথী নাটকে—হিরণ্ময়। নন্দীরাণীর সংসার নাটকে—মতিলাল। চরিত্রহীন নাটকে—সতীশ। অভিষেক—দশরথ প্রলয় নাটকে "সুস্থিরের" ভূমিকায়।

[রঙ্গমহল ছেড়ে বিমল পাল পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করে অভিনয় করেন।]

বিদ্যাপতি—শিবসিংহ। কালেরদাবী—প্রতাপ।

দ্বিতীয় বার রংমহলে যোগ দিয়ে—"মেঘমুক্তি" নাটকে "প্রদ্যোতের" ভূমিকায় অভিনয় করেন। "তটিনীর বিচার" নাটকে—নায়ক বসন্ত।

তারপর নাট্যভারতীতে যোগদান করে—সংগ্রাম ও শান্তি—অবিনাশ। নার্সিংহোম—প্রদ্যোত। পি, ডব্লিউ, ডি নাটকে—সোম্যেন। কঙ্কাবতীর ঘাট নাটকে—প্রবীর। পুনরায় রঙ্গমহলে এসে—মাইকেল নাটকে—আর্ডেন। ভোলা মাষ্টারে—ভোলামাষ্টরের ছেলে।

শেষ রংমহল ছেড়ে মিনার্ভায় যোগদান করেন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানেই যুক্ত ছিলেন।

দেবদাস নাটকে প্রথম চুনীলালের ভূমিকায় পরে "বসন্ত", রাষ্ট্র বিপ্লব—ঔরঙ্গজীব। ছুই-পুরুষ নাটকে—মহাভারত। ধাত্রীপান্নায়—বিক্রমজিৎ (মঞ্চে এই তাঁর শেষ অভিনয়) এ ছাড়া বিশেষ অভিনয় উপলক্ষে বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন চরিত্রেও অভিনয় করেছেন।

চিত্র সংবাদ ও নানাকথা

রতীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চের শ্রদ্ধা নিবেদন

"বৃহস্পতিবার ৩১ জৈষ্ঠ "শ্রীরঙ্গমে" "তুলসীদাস" নাটকের 'প্রেস শো'র ব্যবস্থা হয়েছে। বেলা ৬টার সময় হঠাৎ মর্মান্তিক সংবাদটি কানে এল যে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নেই। কিন্তু এসম্বন্ধে কেউই কোন খবরই জানতেন না। যাঁকেই জিজ্ঞাসা করা যায় সেই বলে, কৈ জানি না তো! শ্রীযুক্ত তারাকুমার ভাদুড়ী মহাশয় ও যোগিনী রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তুলসীদাস নাটকের নাট্যকার শ্রীযুক্ত সুরেশ চৌধুরীকে ঢুকতে দেখে প্রশ্ন করেন "থিয়েটার মহলের কোন সংবাদ রাখেন!" সুরেশ বাবু উত্তর দিলেন, হ্যাঁ রাখি, রতীন বাবু অত্যন্ত অসুস্থ। কানুবাবুর সঙ্গে দেখা, তিনি ডাক্তারের জন্য ছোটাছুটি করছেন, বল্লেন ডাক্তার পর্যন্ত টিকবে বলে মনে হয় না।"

তারপর সাড়ে ৬টার সময় মর্মান্তিক সংবাদটি চরম বলে মেনে নেওয়া হ'ল। নট শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য শ্রীরঙ্গমের তরফ থেকে প্রেক্ষগৃহে মৃত্যু সংবাদটি দর্শকগণের নিকট ঘোষণা করেন।

রাত্রি ৮টার সময় বিরাট শোভা যাত্রার সঙ্গে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব শ্রীরঙ্গমে আনা হয়। অভিনয় কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা হয়। দর্শকবৃন্দ সংবাদিসকল এবং শ্রীরঙ্গমের অভিনেতৃবর্গ রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব দেখতে তাঁর পার্শ্বে ভীড় করেন।

শ্রীরঙ্গম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তত্ত্বাবধায়ক শ্রীঅশোক কুমার ভাদুড়ী রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃতদেহ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

শ্রীরঙ্গমের সঙ্গে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় জড়িত না থাকলে ও, খ্যাতনামা নট্ হিসাবে অল্প বয়সে তাঁর এই মৃত্যুতে শ্রীরঙ্গম নিজেদের আত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যাথাই অনুভব করেছেন।

জনপ্রিয় দেশনেতার মৃত্যু হলে তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রাখবার বহু প্রকার ব্যবস্থা আছে কিন্তু অভিনেতা, যাঁরা নিজেদের প্রতিভায় দর্শকদের দিনের পর দিন হাসান কাঁদান তাঁদের স্মৃতির কোন ব্যবস্থাই নেই।

এত অল্প সময়ে আপনারা "রতীন স্মৃতি সংখ্যা" প্রকাশের ব্যবস্থা করে নিজেদেরই গৌরব বাড়িয়েছেন। আপনাদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হ'ক আমাদের এই ঐকান্তিক কামনা।"

"শ্রীরঙ্গম"

খ্যাতনামা সাংবাদিক অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ সরকার 'রতীন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা' প্রকাশে আমাদের যে উৎসাহবাণী পাঠিয়েছিলেন রূপমঞ্চের চলার পথে এই বাণী যে দৃঢ়তা এনে দিয়েছে রূপমঞ্চের কর্মীরা সেজন্য কৃতজ্ঞ। তাই লেখকের অনিচ্ছা সত্বেও পত্র প্রকাশের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

শিল্পী প্রকৃত মর্যাদা পেয়েছে রূপমঞ্চে। সর্বদেশে সর্বকালে প্রতিভার আদর চির দিনই হয়ে এসেছে এবং হবেও। আমাদের পোড়া বাংলাদেশে হতভাগ্য শিল্পীর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বড় করে দেখা হয়, প্রতিভা যায় হারিয়ে। তাই যখন অজিতের মুখে শুনলাম যে রূপ-মঞ্চের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে রতীন বাবুর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার আয়োজন করেছেন, তখন শুধু শুনে বিস্মিত হইনি, গর্বও অনুভব করেছি। তাই বলছিলাম যে, শিল্পী প্রকৃত কদর পেয়েছে আপনাদের রূপ মঞ্চে। চিরদিনই শিল্পীরা এই ভাবেই রূপমঞ্চে মর্যাদা পাক কামনা করি। ব্যক্তিগত জীবনের অনেক উর্ধে যে প্রতিভা—তা রূপমঞ্চের পাতায় শিল্পীর প্রতিভাকে চিরদিনের জন্য অমর করে রাখুক। আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হোক। নাট্য ও চিত্রজগতের ভবিষ্যতে সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করুক। রূপমঞ্চ আদর্শ ও অনুপ্রেরণা রেখে যাক। নাট্যামেদী ও সাংবাদিক হিসাবে এই আমার মর্মের কামনা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার

১৭ই জুলাই ৪৫

রতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ আমাদের যে উৎসাহবাণী পাঠিয়েছেন।

রূপমঞ্চ সম্পাদক মহাশয়,

শিল্পী যতক্ষণ পাদ প্রদীপের আলোকে দর্শকের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি প্রশংসা পান, বাহবা পান, কিন্তু নাটমঞ্চ থেকে, (বাস্তব নাটমঞ্চই বলুন, বা জীবন নাট-মঞ্চই বলুন) যখনই তিনি সরে দাঁড়ান সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথা আমরা সম্পূর্ণ ভুলে যাই; এমনি বিচিত্র আমাদের অভ্যাস।

আপনারা, পরলোকগত শিল্পী রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে যে "রতীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতি—

মহেন্দ্র গুপ্ত

ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ও শিল্পীবৃন্দের পক্ষ থেকে।

পরলোকে শ্রীযুত গণেশরাও ম্যালভেলী

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে চৌরঙ্গী অঞ্চলে একখানি বাস ও একখানি মিলিটারী লরীর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এক দুর্ঘটনায় এম্পায়ার টকী ডিষ্টি বিউটর্সের ম্যানেজার শ্রীযুত গনেশ রাও ম্যালভেলী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হ'লেও শুক্রবার পূর্বাহ্ন পর্যন্ত কেউ এই সংবাদ পান নাই। শ্রীযুত গণেশ রাও গত বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ১০টার সময় তাঁর বাসভবন হতে বাসযোগে আলীপুর আদালতে গমন করেন। আলীপুর আদালতে কার্য সমাপনান্তে তিনি বাসযোগে প্রত্যাবর্তনকালে থিয়েটার রোডের নিকটে এক মোটর দুর্ঘটনায় পতিত হন। তাঁকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু ঘটনাস্থলেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৩৮ বৎসর হয়েছিল। শ্রীযুত গনেশ রাও এককালে 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকার কলিকাতাস্থ প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি সিনেমা ব্যবসায়ী মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

সাত নম্বরের বাড়ী

পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত এম, পি প্রডাকসন্সের 'সাত নম্বর বাড়ী' নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমরা ইতিমধ্যে সাত নম্বর বাড়ীর এক দৃশ্যপটে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। স্থানাভাব বশতঃ বর্তমান সংখ্যায় তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হ'য়ে উঠলো না। আগামী সংখ্যায় 'সাত নম্বর বাড়ী' সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ দেবার ইচ্ছা রইল। 'সাত নম্বর বাড়ীর' বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন, মলিনা দেবী, ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী, শ্রীমতী সাবিত্রী, সন্তোষ সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে। গত সংখ্যা রূপ-মঞ্চে ভুলক্রমে 'সাত নম্বর বাড়ী'কে এস, ডি, প্রডাকসন্সের চিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

পথের সাথী

অরোরা ফিল্মের 'পথের সাথী' শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র মহাশয়ের পরিচালনায় সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। চিত্রখানিতে অনেক হাসির খোরাকও পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ভূমিকায় 'পথের সাথীর' যাত্রির দলে আছেন, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, সন্ধ্যারাণী, জহর গাঙ্গুলী, ইন্দু মুখো, মিহির ভট্টাচার্য, রেণুকা, লীলা, রাজলক্ষ্মী, মীরা দত্ত, ছায়া, রবি রায় প্রভৃতি। এঁদের আর একখানি চিত্রের প্রাথমিক কাজ শেষ করে পরিচালক চিত্ত বসু প্রস্তুত হ'য়ে আছেন। শীঘ্রই তার চিত্রগ্রহণের কাজ আরম্ভ হবে।

মানে না-মানা

আজকালকার জগতে রাষ্ট্রগত, জাতিগত ও ব্যক্তিগত বড় বড় সমস্যা, প্রশ্ন ও কথার অন্ত নাই। আজকালকার মানুষের মন অশান্তি, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার আবর্তে থেকেও কি যেন সন্ধান করতে আগ্রহান্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে কিসের যেন আকুলতা আর কোন বাধা মানতে চায় না।

তার শিল্প এবং ব্যবসা দুটী রূপ নিয়ে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হ'য়েছে। দেশে দেশে তার অভিনবত্ব ও নিখুঁত রূপদানের পরিকল্পনা ও নানান গবেষণা চলছে। অথচ ভারতবর্ষে আজও এর উন্নতির জন্য সেরূপ কোন বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা আরম্ভ হয়নি। কয়েকজন ব্যবসায়ী মিলে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার ফাঁকা আওয়াজ করছেন মাত্র। বাংলার বিশেষজ্ঞগণ এবিষয়ে অগ্রণী হ'য়েছেন জেনে আমরা খুবই আশান্বিত হ'য়ে উঠেছি। যুদ্ধের এই ডামাডোলে ভারতীয় চিত্রের মান যে অনেকখানি নেমে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যুদ্ধকালীন আবহাওয়ায় ভারতীয় চিত্রের যা উন্নতি অনেকের চোখে পড়ে—তা এর কৃষ্টি বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবসায় ক্ষেত্রে—মুষ্টিমেয় ধনী মোটা মুনাফা লাভে সমর্থ হ'য়েছেন—এই মাত্র। বাংলার বিশেষজ্ঞগণ এই শিল্পটীর ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা, মুনাফাখোরদের স্বেচ্ছাচারিতার পর না চাপিয়ে নিজেরাই যে রূপ দিতে উদ্যোগী হ'য়েছেন, তাতে দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ যে আশার আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই নবজাত প্রতিষ্ঠান—চিত্রশিল্পের সর্বপ্রকার উন্নতিতে সাফল্য অর্জন করুক—তাই আমাদের কামনা।

শিল্পী-সংঘ (Artists' Association)

শিল্পীদের সর্বপ্রকার স্বার্থ সংরক্ষণে শিল্পীসংঘের জন্ম-লাভ। এই স্বার্থ রক্ষা করতে তাঁদের বেতার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংঘর্ষে যোগদান করতে হয় এবং এই সংঘর্ষের ফলে কোন্ পক্ষের জয়লাভ হয়েছে তা বলা কঠিন। তবে শিল্পী সংঘ যে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বেতার কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যায় জুলুম শিল্পী এবং শ্রোতারা এতদিন সহ্য করে এসেছেন, বৈদেশিক সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার কেন্দ্রের এই জুলুম সহ্য করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই বলে যাঁরা বিধাতার দোহাই দিয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, তাঁদের সংগে আমরা কোনদিনই একমত হ'তে পারি না। পারবোও না। শিল্পী সংঘের উদ্যোগী কর্মীরাও পারেন নি। তাঁরা বুঝেছেন, সত্যিকারের শক্তি কোথায়, মুষ্টিমেয় জনকতক সরকারী স্তাবকদের হাতে না জন-সাধারণের হাতে। তাই নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন—এজন্য তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সাময়িক ভাবে শিল্পীদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না বলে বেতার কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে থাকেন, এ জয় তাঁদের, তাহ'লে তাঁদের নির্বুদ্ধিতার সীমা নেই, কারণ সত্যিকারের শক্তি যাঁদের হাতে এবং তাঁরা যখন এবিষয়ে অবহিত হ'য়ে উঠেছেন, তখন এ শক্তির বিরুদ্ধে বেতার কর্তৃপক্ষের সমস্ত অন্যায় জুলুমই যে ফুৎকারে উড়ে যাবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। আবার সাময়িক ভাবে বেতার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিজেদের দাবী মিটিয়ে নিতে পেরেছেন বলে, যদি সংঘ আত্মপ্রসাদের মহিমায় বিভোর থাকেন, তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবশিত হবে। সংঘকে এমনিভাবে শক্তিশালী হ'য়ে উঠতে হবে, আত্ম-নিষ্ঠা এবং আত্মবিশ্বাসে তাঁরা এমনি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হ'য়ে দাঁড়াবেন, যখন যে কোন সময়ে, যে কোন অন্যায় জুলুম তাঁদের সামনে আসুক না কেন, যার বিরুদ্ধে দাড়িয়ে লড়তে তাঁদের সুনিশ্চিত জয়ের ইংগিত পাওয়া যাবে। শুধু বেতার প্রতিষ্ঠান নয়, চিত্র, মঞ্চ, গ্রামোফোন, সর্বক্ষেত্রে শিল্পীদের স্বার্থ যেখানে দলিত হবে, শিল্পী-সংঘ যেন তার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করতে পারেন। শুধু শিল্পীই নয়, এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মীর স্বার্থ সংঘকে দেখতে হবে। ষ্টুডিওর ইলেকট্রিসিয়ান, মেকআপম্যান, মিস্ত্রী ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মী, মঞ্চের গেট-কীপার, বুকিংএর কর্মী, চিত্রপ্রযোজক ও পরিবেশনা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরও যেন সংঘ দলে টেনে আনেন। এঁরা শিল্পী না হলেও শিল্পের সাধক, তাই এঁদের স্বার্থ শিল্পীদেরই দেখতে হবে।

শুধু শিল্পী সংঘ কেন, জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ এরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের সংগে রূপমঞ্চের যে আদর্শগত যোগ রয়েছে, শিল্পী

সংঘকে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে আমরা আবার তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব, সে বিপ্লব জয়ী হউক !

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা—ভারত সরকার নিয়ন্ত্রিত কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায়—আলোচনার বিষয় বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রত্যেকটী পত্র পত্রিকা, শিল্পী ও শ্রোতারা এর প্রতিকারের জন্য সচেতন হ'য়ে উঠেছেন। শিল্পীদের স্বার্থ নিয়ে যে সংঘর্ষের জন্ম হ'য়েছিল, রূপ-মঞ্চের পাঠক পাঠিকারা অল্পবিস্তর সে সম্পর্কে অবহিত আছেন। শ্রোতাদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে—শ্রোতাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহু আলোচনা হয়েছে—হচ্ছে এবং যত দিন এর কোন প্রতিকার না হবে—ততদিন এ আলোচনা চলবে। যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা চিন্তা করে এতদিন আমরা কোন সম্পাদকীয় মন্তব্য করিনি। কারণ জনস্বার্থের চেয়েও—সরকারের যুদ্ধ-স্বার্থকে যে তাঁরা বড় করে দেখবেন, এ আর নূতন কথা কী—যদিও তাঁরা বড় গলায় বলেন এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ—মানব সমাজের কল্যাণ ও মুক্তি যুদ্ধ ! যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল—মানব সমাজের কল্যাণ ও মুক্তি সত্যিই আসে কি না সেজন্য আমরা উৎসুক হ'য়ে আছি। কিন্তু এই যুদ্ধ-

স্বার্থের দোহাই দিয়ে কলিকাতা কেন্দ্র থেকে যে সব অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'তো—যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তা কতখানি কার্যকরী হ'য়েছে এবং আদৌ হ'য়েছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে—কারণ যুদ্ধ প্রচেষ্টার অনুকূলে যখনই কোন অনুষ্ঠান লিপি প্রচারিত হ'য়েছে, সে অনুষ্ঠান লিপি শ্রোতাদের কাছে এতই আকর্ষণীয় (-) ! হ'তো যে শ্রোতারা অগুণী মনে সেটটী বন্ধ করে রাখতেন। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বেতার কতখানি সাহায্য করেছে—তা অতি সহজেই আমরা অনুমান করে নিতে পারি। সরকারের পক্ষে প্রচারের প্রয়োজন ছিল—সে প্রয়োজনকে আমরা অস্বীকার করি না—তবে সে প্রয়োজন মিটাবার জন্য সুষ্ঠু ও বিজ্ঞান সম্মত পথে যদি কর্তৃপক্ষ অগ্রসর হতেন আমাদের বলবার কিছু ছিল না। যাঁদের জন্য প্রচার কার্য তাঁদের কানেই যদি একটী কথাও না পৌছায় সে প্রচারের সার্থকতা কোথায়? এ ঠিক উলু বনে মুক্তা ছড়াবার মত নয় কী? এজন্য দায়ী কে? মূলতঃ সরকার—বাহ্যত বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান লিপি যিনি বা যারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, তিনি বা তাঁরা। সরকারকে দোষারোপ কচ্ছি এইজন্য যে—যে সব লোক বা প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়—তাঁদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার পরিমাপ করে তবে তাঁদের নিয়োগ করা উচিত। এবং তা করা হয় না বলে মূলতঃ সরকারই দায়ী। বাহ্যতঃ দায়িত্বশীল প্রতিনিধিরা—তাঁদের অযোগ্যতাই বেতারকে লোকচক্ষুর সামনে হেয় করেছে—এবং প্রচার উদ্দেশ্যে কি ভাবে অনুষ্ঠান লিপি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত সে বিষয়ে আদৌ তাঁদের কোন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান নেই। অবশ্য শুধু বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই আমাদের এই অভিযোগ নয়—সরকার নিয়ন্ত্রিত বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের দায়িত্বশীল কর্তারা এই অযোগ্যতা ও অসাধুতার অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবেন না।

বেশী দিনের কথা নয়—জাপানের আত্মসমর্পণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান লিপির প্রতিই আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই আনন্দোৎসব উপলক্ষে যাঁদের দিয়ে যে প্রোগ্রাম করানো হ'য়েছে—

তার কোন প্রোগ্রাম কী শ্রোতাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হ'য়েছে, না মনে কোন আনন্দ সঞ্চার করতে পেরেছে? চিত্ত রায়ের বিজয় গান আর কবি কামাক্ষী প্রসাদের বিজয় কবিতা (কয়লার পাউডার মাখা মেয়ে ইত্যাদি) এবং অনুরূপ প্রতিটি অনুষ্ঠান শুনে শ্রোতারা রেডিও সেটটি বন্ধ করে তবে আনন্দ উপভোগ করেছেন। অথচ কলিকাতা Armed forces Radio Station থেকে বিজয় উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হ'য়েছে—অনেক শ্রোতাদেরই তা প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। এতেই যদি আমাদের মনে হয় এবং আমরা বলি, কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান লিপির দায়িত্ব যাঁর ঘাড়ে তাঁর নিজের ঘটে কতটুকু বারুদ আছে এবং আদৌ আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ—তবে সে অভিযোগ খণ্ডন করতে কর্তৃপক্ষ কী জবাব দেবেন? কোন্ অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কতখানি আনন্দ দিতে পারে—কোন্ অনুষ্ঠান বেতারের প্রতি শ্রোতাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে—সরকারের প্রচার কার্য বেতার মারফত কোন পথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে—কলিকাতা কেন্দ্রের যিনি অনুষ্ঠান লিপি রচনা করেন সে বিষয়ে যে তাঁর অজ্ঞতা প্রচুর এবিষয়ে আরো কয়েকটী অনুষ্ঠানের উল্লেখ করে প্রমান দিচ্ছি। যেমন মনে করুন, মোহিত লাল মজুমদার একজন নাম করা কবি, অধ্যাপক। ছন্দ ও ভাষা সম্পর্কে তাঁর প্রচুর জ্ঞান আছে। তাঁকে দিয়ে কোন্ ধরণের প্রোগ্রাম করালে জনপ্রিয় হবে সে বিষয়ে প্রোগ্রাম ডিরেক্টরের যদি কোন জ্ঞান থাকতো, তবে অধ্যাপক মজুমদারকে দিয়ে ভাষা এবং ছন্দ সম্পর্কেই আলোচনা করতে অনুরোধ করতেন। পর পর কবিতা আবৃত্তি করতে দিয়ে শ্রোতাদের বিরাগ ভাজন হতেন না। কারণ শ্রীযুক্ত মজুমদারের কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি মোটেই শ্রুতি মধুর হয় না এবং যখন তিনি টান বা তান ধরেন অন্য কোনো জীব বলে কেউ যদি ভুল করেন, তাঁকে দোষারোপ করতে পারবো না। কবিতা আবৃত্তি না করে ছন্দও ভাষা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মজুমদার কিছু বলুন, এবং কেবল মাত্র উদাহরণ উপলক্ষে কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করুন আমাদের আপত্তি থাকবে না। অধ্যাপকদের দ্বারা এবং ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে যাঁদের জ্ঞান আছে তাঁদের দ্বারা যদি কর্তৃপক্ষ কবিতা আবৃত্তি করাতে চান, বঙ্গবাসী কলেজের বাংলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চক্রবর্তী এবং এই ধরণের অধ্যাপকদের দ্বারা করাতে পারেন।

পণ্ডিত অশোকশাস্ত্রীকে দিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংগীত সম্পর্কে যে প্রোগ্রামটী করানো হচ্ছে, কথোপকথোনের ভিতর দিয়ে এই ভাবে প্রগ্রামটী পরিচালনার জন্য বিষয়টীর গাম্ভীর্য যেমনি নষ্ট হয়েছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তার আবেদন শূন্যতা, অথচ এই বিষয় বস্তুটীর আলোচনা খুবই প্রয়োজন। উপযুক্ত অনুষ্ঠান পরিচালক যতদিন না কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করতে পারবেন, শ্রোতাদের কাছে প্রতিটি অনুষ্ঠানই আবেদন শূন্য হ'য়ে প্রকাশ পাবে! এবিষয়ে কর্তৃপক্ষ যদি অবহিত না হন সমস্ত শ্রোতারা প্রত্যেকটী অনুষ্ঠান লিপির (অবশ্য যে অনুষ্ঠানটী ব্যর্থতার রূপ নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করবে) বিরুদ্ধে যেন প্রতিবাদ করেন। শ্রোতাদর স্বার্থ বেতার কর্তৃপক্ষের সেচ্ছাচারিতা ও অজ্ঞতার চাপে নিষ্পেষিত হচ্ছে, শ্রোতারা যদি সেবিষয়ে অবহিত হ'য়ে, সংঘ বদ্ধ হ'য়ে, প্রতিবাদ জানান শ্রোতাদের স্বার্থের দিক দৃষ্টি রেখে প্রত্যেকটী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হবেন।

শ্রীযুক্ত হেমেন গুপ্ত : দ্বন্দ্ব ও তকরার খ্যাত পরিচালক শ্রীযুক্ত হেমেন গুপ্ত ৫০শের মন্বন্তরের পটভূমিকায় এক-খানি চিত্রগ্রহণের অনুমতির জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। শ্রীযুক্ত গুপ্তের এই আবেদন সর্বোত-ভাবে যুক্তি সংগত। এবং পঞ্চাশের পটভূমিকায় একখানি চিত্র গৃহীত হলে, পঞ্চাশের কবল থেকে যাঁরা কোনরকমে বেঁচে উঠেছেন তাঁদের কাছে এই চিত্র যে জন-প্রিয় হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তেমনি সরকারের অবিমৃশ্যকারীতার সাক্ষ্যরূপে আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজের কাছে এই চিত্র সরকারের কলঙ্কের কথা বলবার অবকাশ পাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, নিজের লজ্জার কথা প্রচার কর-বার অনুমতি কি সরকার দেবেন? এতখানি উদার মনোভাব তাঁদের থাকলে ত বাংলায় ৫০শের ধ্বংস-লীলার কোন সম্ভাবনাই থাকতো না।

চলচ্চিত্র-শিল্পের ক্রমবিবর্তন

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পকলায় শিল্পীর স্থান, মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্যের সংযোগ স্বীকৃত, কেননা শিল্পগত উৎকর্ষতা এবং কলা-নৈপুণ্য, যার জন্য জনসাধারণের কাছে শিল্পের আবেদন ও সমাদর তা শিল্পীর কৃতিত্ব ও সৌন্দর্যসৃষ্টির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। শিল্পীকে বাদ দিয়ে শিল্পবিচার যেমন সম্ভব নয়, তেমনই শিল্পীর ভাবাবেগ, সৌন্দর্যানুভূতি এবং কলানৈপুণ্যের উপর শিল্পের সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি ও রূপকলা আবেদনে ও লালিত্যে বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করে। শিল্পের উৎকর্ষতার সংগে শিল্পীর কল্পনা ও নৈপুণ্য অংগাংগীভাবে জড়িত,—তাই শিল্পক্ষেত্রে শিল্পীকে অস্বীকার করবার উপায় নেই, আপনার সৃষ্টির অন্তরালে শিল্পীর মূর্ত-কল্পনা ও রূপ-শিল্পীর পরিচয় উজ্জল করে তোলে।

শিল্প হিসাবে ছায়াছবি আজ আনন্দ-নিবেদন এবং উচ্চতর কল্পনার প্রতীকরূপে বিদগ্ধ সমাজ ও সাধারণের নিকট সর্বতোভাবে স্বীকৃত। গতিশীল জীবনাট্যের অপরূপ আলোছায়া ছায়াছবির মধ্য দিয়ে আনন্দ বেদনার সংমিশ্রণে আজ যে বর্ণময়তা ও রসসৃষ্টি করেছে—তার আবেদন ও প্রভাব জনচিত্তে ছায়াছবিকে শিল্প হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ করে তুলেছে। ছবি—আজ জীবন ছায়াছবি হয়ে অগণিত মানুষের মনে যে আনন্দ সঞ্চার করছে, তার মধ্যেই ছায়াছবির বিপুল সম্ভাবনা, আবেদন ও শিল্পচাতুর্য নিহিত রয়েছে। ছবি আজ শুধু পটে আঁকা জীবন-স্পন্দনশূন্য ছবি নয়,······ছবি আজ মানুষের আশা—আনন্দ, বেদনা ও অশ্রুসিক্ত এই জীবনের বহু ও বিচিত্র রূপ।

ছায়াছবির বর্তমান প্রসারতার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, মুষ্টিমেয় শিল্পীর একান্ত অনুরাগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে চিত্রশিল্প আজ বৃহত্তর জনচিত্তে প্রভাব বিস্তার করেছে। ছায়াছবির সুরু থেকে যে সব শিল্পীরা চিত্রশিল্পের প্রগতির পথে আপ্রাণ ও আন্তরিক চেষ্টা করেছেন.····তাদের উৎসাহ ······অনুরাগ······শিল্পবোধ ও কৃতিত্ব যেমন সিনেমার ইতিহাসে উজ্জল হয়ে থাকবে—তেমনি আগাগোড়া চিত্রশিল্পের সংগে সংশ্লিষ্ট না থেকেও যে সব শিল্পীরা চলচ্চিত্রে সাম্প্রতিক উন্নতি ও কৃতকার্যতা প্রদর্শন করে শিল্পের দিক থেকে চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন··· ···কৃতীশিল্পী হিসাবে তাঁদের অবদান চিত্রশিল্পের ইতিহাসে অক্ষুণ্ণ থাকবে। চিত্রশিল্পের গোড়ার দিকে যাঁরা চলচ্চিত্রের প্রভূত উন্নতিসাধনে একান্তভাবে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের যত্ন, উৎসাহ ও অনুরাগ আজ পরিপুষ্টরূপে চলচ্চিত্রকে বৃহত্তর সার্থকতায় পূর্ণ করে তুলেছে।

চিত্রশিল্প এদেশে শিল্প হিসাবে প্রথমে দেখা দেয়নি—চলচ্চিত্রের প্রথম আবির্ভাব হয় বিজ্ঞানের পরম বিস্ময়-রূপে এবং বৈজ্ঞানিক বিস্ময়টাই ছিল সে যুগের চলচ্চিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ। যাঁরা চলচ্চিত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরাও কিন্তু শিল্পের পরিপূর্ণ সার্থকতা ও বৃহত্তর কল্যাণাদর্শের স্বরূপ রূপে চলচ্চিত্রকে দেখেন নি—বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক কলাকুশলতার উপর চলচ্চিত্রের যে শিল্প মূল্য ও সম্ভাবনা আছে সে বিষয়ে প্রবর্তকগণ সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন না। বৈজ্ঞানিক কলাকুশলতা ছাড়া ছবির শিল্প ধর্ম সম্বন্ধে জনসাধারণ এবং চিত্র সংক্রান্ত ব্যক্তিগণ কেউই অবহিত ছিলেন না।—নির্বাক······স্থির চিত্রের চলমান রূপটাই ছিল সর্বসাধারণের পরম বিস্ময়······জনসাধারণ অতৃপ্ত আগ্রহে ও অপরিসীম বিস্ময়ে গতিশীল ছবির দিকে তন্ময় হয়ে দৃষ্টিপাত করে বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিকে অকুণ্ঠ প্রসংশা জানাত······। ছবি নির্মাতারা জনচিত্তের এই বিস্ময় বিমোহিতার সুযোগ নিয়ে আশ্চর্য ঘটনা সম্বলিত চমকদার চিত্র তৈরী করে অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করতেন।—চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বৃহত্তর সার্থকতা ও শিল্প নৈপুণ্য সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন ছিলেন তাই শিল্পদৃষ্টিতে চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করবার ও উন্নত করে তোলবার মত দায়িত্ব বোধহয় তাঁদের ছিল না,—চিত্র ব্যবসায়ে ক্ষিপ্র ও বিপুল অর্থোপার্জনটাই একমাত্র উপলক্ষ ছিল বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

তারপর ধীরে ধীরে চিত্রের বৈজ্ঞানিক বিস্ময় জনচিত্তের উপর পুরানো হয়ে শিথিল হয়ে এল—শুধু ছবির জন্যই আর ছবি দর্শকচিত্তকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হল না—দর্শক অন্বেষণ করতে লাগল বৈচিত্র——বিষয় বস্তু ও ঘটনার বিচিত্র ও নব আকর্ষণ। চলচ্চিত্রের শিল্পের ইতিহাসে সুরু হল এক যুগসন্ধি-ক্ষণ। দর্শকচিত্তের দাবীর উপর ভিত্তি করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করবার জন্য জনপ্রিয় কাহিনী সমন্বিত ঘটনার ছবি তোলা সুরু হল। দেখা গেল শুধু খণ্ডচিত্র অপেক্ষা ঘটনা সম্বলিত (Dramatic Episode) ছবির চাহিদা প্রবল এবং জনপ্রিয় ঐতিহাসিক ও পৌরানিক ঘটনা অবলম্বনে গৃহীত ছবি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করল। ঠিক এইখান থেকেই চলচ্চিত্রের শিল্পগত দিকটীর প্রতি চিত্রনির্মাতারা অবহিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা দেখলেন, শুধু ছবি সাধারণকে তৃপ্তি দেয় না, ছবির জন্য কাহিনী ও ঘটনার প্রয়োজন নতুবা শুধু গতিশীল চলচ্চিত্র জনসাধারণকে বেশীদিন আকৃষ্ট করতে পারবে না। ··· চলচ্চিত্রের যে একটা ধর্ম ও নিজস্বরূপ আছে ধীরে ধীরে চিত্রনির্মাতারা তা উপলব্ধি করলেন। বিশিষ্ট পদ্ধতিহীন হয়ে, কোন আদর্শ স্থির না করে, এলোমেলো ভাবে চিত্রনির্মাণের দ্বারা জনসাধারণকে তৃপ্ত করা যাবে না, একথা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারলেন।

সমস্যা হল চলচ্চিত্রের মধ্যদিয়ে সাধারণ কি চাইবে? এবং কি ভাবে তা ছবির মধ্যদিয়ে জনসাধারণের কাছে বহন করা হবে? অর্থাৎ কি বলব? পূর্বেই বলেছি চলচ্চিত্রের এই সময়টিই একটী সন্ধিক্ষণ······ এবং ছবির রূপপরিকল্পন,

নিয়ে এই সময় চিত্র নির্মাতারা বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেন। দেখা গেল খণ্ডিত চিত্রের আবেদন শূন্যতা জনপ্রিয় নাটক এবং কাহিনীর দ্বারাই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। মানুষ পরিপূর্ণ জীবনের ছবি দেখতে চায়…খণ্ডচিত্রের অসংলগ্নতা বৈচিত্র হিসাবে সাময়িক পরিতৃপ্তি দিলেও, দর্শক চায় সম্পূর্ণ নাটক… সম্পূর্ণ কাহিনীর ছবি। পূর্বেই বলেছি, চলচ্চিত্র নির্মাতারা এই সময় থেকেই চলচ্চিত্রের স্বকীয় বৈশিষ্টতা এবং শিল্পধর্ম সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠতে সুরু করেন এবং জনপ্রিয় ঘটনা ও কাহিনী অবলম্বনে চিত্র নির্মাণ কার্য সুরু হয়।

বিদেশীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথম প্রথম সাগরপারের দৃষ্টান্তে ছবি তোলা সুরু হয়—অর্থাৎ চমকদার ঘটনা, শিভ্যালরিক কাহিনী, নদী, বন, পাহাড়, ইত্যাদির পট-ভূমিকায় যেমন তেমন ভাবে কোনরকমে একটা ছবি শেষ করা হত—বিষয় বৈচিত্রে এবং নূতনত্বের মোহে আর্থিক দিক দিয়ে এধরনের ছবির সবকটাই সাফল্য মণ্ডিত হয়ে উঠলেও…চিত্রনির্মাতারা লক্ষ্য করলেন যে, দর্শকচিত্তের মধ্যে ধীরে ধীরে অসন্তোষের আবহাওয়া সঞ্চারিত হচ্ছে। তাঁরা আরও লক্ষ্য করলেন, অবাস্তব কাহিনী এবং বিদেশী ধাঁচের সঙ্গে দর্শকরা কোথায় যেন একাত্ম হতে সক্ষম হচ্ছে না,…ছবিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পাচ্ছে না। আবার সমস্যা এবং চিন্তা সুরু হল।

ছবির সঙ্গে দর্শকের নিবিড় আত্মীয়তা কি উপায়ে সম্ভব? অনেকের ধারণা হল হয়ত এদেশের বিশিষ্ট কাহিনীগুলি যার সঙ্গে জন-মনের নিবিড় সংযোগ আছে, সেগুলি যদি সম্পূর্ণ এদেশীয় আবহাওয়ায় তোলা যায় তবে হয়ত চিত্তাকর্ষক হতে পারে। আয়োজন সুরু হল—জনপ্রিয় ঐতিহাসিক ও পৌরানিক কাহিনী অবলম্বনে সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় পরিবেশে চিত্রনির্মাণ সুরু হল। তখনকার দিনে ব্যাপারটা সহজ ছিল না… প্রথমতঃ শিল্পীর স্থান সেযুগের চলচ্চিত্রে স্বীকৃত ছিল না। শিল্পী বলতে তাঁরা যন্ত্রশিল্পী (Camera man)-কেই বুঝতেন··অভিনয় শিল্পীর কোন স্থান এবং হয়ত প্রয়োজন ছিল না। তাঁদের ধারণা ছিল যে কোন ব্যক্তি শুধু অবয়বিক ভঙ্গিগুলো প্রদর্শন করে গেলেই চলবে…তার উপর কোন কাহিনীকে চিত্ররূপ দেবার জন্য কাহিনীর একটা ছবির খসড়া তৈরী করা প্রয়োজন হল অর্থাৎ কি ভাবে ছবির মধ্যদিয়ে গল্পটাকে বলা যায় তার জন্য একটা নির্দিষ্ট খসড়া প্রস্তুত করতে হল। তার পর প্রয়োজন হ'ল সেই নির্দিষ্ট ছবির ঘটনাগুলিকে অভিনীত করবার জন্য উপযুক্ত শিল্পী এবং কথোপকথন গুলি সংক্ষিপ্ত অথচ ভাব ব্যঞ্জক করে ঘটনার আগে এবং পরে সাজিয়ে তোলবার জন্য শিরোনামা লেখক (Titlewriter) এবং সর্বশেষে খণ্ড-খণ্ডভাবে তোলা ছবিটার অংশ ও লেখা গুলি পর পর সাজিয়ে ছবিটাকে সম্পূর্ণ করে তোলবার জন্য একজন সম্পাদক যাকে এখন Editor বলা হয়। এইত গেল সর্বপ্রথম কথা। তারপর প্রয়োজন হল দৃশ্য-পট…রূপসজ্জা…অর্থাৎ চলচ্চিত্রের শিল্প ও যান্ত্রিক সব উপকরণই প্রয়োজন হল। নিজ নিজ প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে চিত্র নির্মাণ চলতে লাগল……ক্রমে অনেক বিষয়েই অসুবিধা অনুভূত হতে লাগল। প্রথমতঃ দেখা গেল চলচ্চিত্রের আবেদন বিষয়বস্তুর বৈচিত্র এবং উপযুক্ত বর্ণনার উপর নির্ভর করে—চিত্র নির্মাণে ত্রুটি ও অসঙ্গতিগুলি ছবিতে পীড়াদায়ক হয়ে উঠে এবং ছবির মাধুর্য নষ্ট করে। চিত্র নির্মাতারা দেখলেন, ঘটনাটাকে বেশ সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো করে যদি তোলা হয় এবং তার মধ্যে অনাবশ্যকতা ও অসঙ্গতি যদি না থাকে তবে তা নিশ্চয় জনপ্রিয় হবে। কিন্তু তাঁরা দেখলেন ছবিকে সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো করে তুলতে হলে সর্বপ্রথম খসড়াটি অর্থাৎ যার উপর ভিত্তি করে ছবি তোলা হবে সেটাকে সুষ্ঠ ও সুরচিত করতে হবে। না হলে ঘটনার আবেদন ব্যর্থ হবে এবং ছবি জনপ্রিয় হবে না। তাঁরা আরও দেখলেন যে, চিত্র গ্রহণের উৎকর্ষতা এবং অনুকর্ষতার উপর ছবির আবেদন স্থিতিশীল নয়—

Photography খুব ভাল না হলেও ছবি ভাল হতে পারে যদি ঘটনাটীকে ভালভাবে সাজিয়ে তুলতে পারা যায়। ঠিক এই সময় থেকেই দেখা যায় যে কাহিনীর অসাড়তা যাতে সুষ্ঠ ও সুন্দর হয়, সেজন্য চিত্র নির্মাতারা অবহিত হয়ে উঠেন এবং বিশিষ্ট প্রয়োগ পদ্ধতি অর্থাৎ কি ভাবে সাজালে সুন্দর হবে, তা অনুসন্ধান করে প্রয়োগ করবার জন্য তৎপরতা দেখা যায়। ছবি তোলবার পূর্বে ঘটনার একটা সম্পূর্ণ রূপ ও খসড়া প্রস্তুত করে নিয়ে তবে ছবি তোলা হবে। পরিচালকরা এবিষয়ে মনোযোগী হয়ে উঠেন এবং Shooting script writing অর্থাৎ চিত্র গ্রহণের জন্য চিত্রনাট্য রচনার প্রচলন সুরু হয় এবং script writing এর উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পন করা হয়।

নির্বাক ছায়াছবির জন্য অভিনয়ের দিক থেকে শুধু দেহ সৌন্দর্য এবং ভাবাভিব্যক্তির প্রয়োজন হয়। নিছক শিল্পী বলতে যারা আজ অভিনয় শিল্পীকেই মর্যাদা দেন……ছায়াছবির প্রথম যুগে কিন্তু শিল্পীর সে মর্যাদা ছিল না—কেননা নির্বাক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বিশেষ শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দেবার কোন অবকাশ ছিল না—তাই দেহসৌন্দর্যই তখনকার দিনে Cinema actorএর একমাত্র কৃতিত্ব বলে পরিগণিত ছিল। তৎসত্ত্বেও শুধু দৈহিক সৌন্দর্যসম্পন্ন শিল্পীর সমস্যা তখনকার দিনে আজকের মতই প্রবল ছিল কিম্বা এর চেয়েও বেশী বলে মনে হয়। তখন দেশে চিত্রশিল্পের প্রভাব ও আবহাওয়া গড়ে উঠেনি……তাই শিল্পী সংগ্রহ করা রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার ছিল এবং মঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাই মাঝে মাঝে নির্বাক চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হতেন—কিন্তু তাহলেও মঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কদাচিত চিত্রাবতরণ করতে দেখা যেত। এর কারণ দু'টী বলে আমার মনে হয়। দৃষ্টি গ্রাহ্য (ocular) ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে চিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দেহ-সৌন্দর্যের প্রয়োজনই ছিল চিত্রের বড় আকর্ষণ এবং মঞ্চের মধ্যে অনুরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংখ্যাল্পতা কিম্বা চিত্রে অভিনয় করতে অনিচ্ছার জন্য চলচ্চিত্রের গোড়ার দিকে মঞ্চ-শিল্পীদের কদাচিত চিত্রে দেখা যেত এবং চলচ্চিত্রের জন্য শিল্পী সংগ্রহ সম্পূর্ণরূপে মঞ্চের বাহির থেকেই হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। মঞ্চে অনেক খ্যাতনামা নট নটী থাকলেও একমাত্র প্রিয়দর্শন দুর্গাদাসকেই চলচ্চিত্রের সুরু হতেই নায়করূপে তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত প্রশংসা ও বিপুল খ্যাতির সংগে ছায়চিত্রে অধিষ্ঠিত দেখা গিয়েছিল। মহিলা শিল্পী প্রধানতঃ Aaglo-Indiansদের মধ্য থেকে চলচ্চিত্রের জন্য নেওয়া হয় এবং এদের মধ্যে প্রায় সকলেই অভিনেত্রী হিসাবে চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে বিপুল খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন এবং দু' একজন আজও সবাকচিত্রে প্রশংসার সংগে অভিনয় করছেন। Anglo Indian অভিনেত্রীদের মধ্যে Miss Lalita, Miss Sabita, Miss Patience Cooper, Miss Indira প্রভৃতিরা রূপলালিত্যে ও অভিনয় নৈপুণ্যে এক সময় বাংলাদেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এবং একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, নির্বাক যুগের ক্রমবর্ধমান চলচ্চিত্রশিল্পে এদের অবদান অবিস্মরনীয়।

নির্বাক যুগে ম্যাডান কোম্পানীর (Madan & co) "চণ্ডীদাস," "হরিশ্চন্দ্র," "কপালকুণ্ডলা," জয়দেব, প্রভৃতি চিত্র এবং দুর্গেশনন্দিনী, নৌকাডুবি, স্বামী, পূজারী, আধারে আলো, প্রভৃতি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাংলাদেশে চিত্রশিল্পের আদি জনক বলতে ম্যাডান কোম্পানিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যাঁরা জনপ্রিয় উপন্যাস, প্রচলিত গীতিনাট্য…গাথা এবং

পৌরানিক কাহিনী অবলম্বনে প্রভূত চিত্র নির্মাণ করে চিত্রশিল্পকে একদিক থেকে যেমন পরিপুষ্ট করে তোলে, তেমনি বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে ছায়াছবির প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহকে ক্রমবর্ধমান করে তোলে। অধুনা film-public বলতে যা বোঝায়—তা নির্বাক যুগে ম্যাডান কোম্পানীর অকৃত্রিম প্রচেষ্টা ও বিপুল অধ্যবসায়ের ফল। মূক ছায়াছবির যুগে ম্যাডান কোম্পানী ছাড়াও অন্য ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠান (যেমন Radha films, Kali films, International films craft) চলচ্চিত্র নির্মাণ কার্যে অক্লান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল কিন্তু কি সংখ্যাধিক্যে, কি জনপ্রিয়তার দিক থেকে ম্যাডান কোম্পানী বাংলা তথা ভারতে সে যুগের চিত্র ভারতে (Film-India) অদ্বিতীয় ছিল বললেও বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না।

চিত্রব্যবসায়ে ম্যাডার্ন কোম্পানীর সার্থকতা ও অর্থসৌভাগ্যে অনেক ধনী ব্যবসায়ীর দৃষ্টি চলচ্চিত্রের প্রতি নিবদ্ধ হয় এবং শুধুমাত্র ব্যবসাগত সাফল্য অর্জন করবার জন্য অনেক ব্যবসায়ী চলচ্চিত্র গঠনে মনোযোগী হয়ে উঠেন, যদিও চলচ্চিত্রের শিল্প এবং আর্টে'র দিকটার প্রতি এঁদের বিশেষ ধারনা ও অনুরাগের পরিচয় ছিল না। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে এটী একটী শুভ লক্ষণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। মুষ্টিমেয় কতকগুলি কোম্পানীর একচেটীয়া লাভের বস্তু-থেকে চিত্রশিল্প বৃহত্তর ব্যবসায়বস্তু হিসাবে গড়ে উঠবার অবকাশ পায় এবং এর ফলে কতিপয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ চিত্রশিল্পের ভাবধারা, গঠন সৌন্দর্য এবং বিষয়বস্তুর সংকীর্ণতা ও স্বল্প পরিসর নব নব বৈচিত্রে অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠবার অবকাশ পায়। অর্থাৎ বাজারে ভাল ছবি তৈরী করে দ্রুত অর্থ উপার্জন ও ব্যবসায়গত প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য বিভিন্ন কোম্পানীতে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে চলচ্চিত্র শিল্পের সর্ববিষয়ে ক্রমিক উন্নতির পথ সুগম হতে থাকে এবং শিল্পহিসাবে ছায়াছবির মূল্য ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে।

তারপর পুনরায় চলচ্চিত্র শিল্প বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার নিদর্শন নিয়ে একদিন নির্বাক ছায়াচিত্র থেকে সবাক চলচ্চিত্রে রূপান্তর গ্রহণ করে। সে এক পরম বিস্ময়। আমাদের দেশে সবাক চিত্রের আবির্ভাব বড় আকস্মিক এবং গতিময় নির্বাক চলচ্চিত্রের যে বিস্ময় একদিন জনসাধারণকে মুগ্ধ করেছিলো তা কথায় ও গানে পরিপূর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ জীবন নাটকের অত্যুগ্র বিস্ময় নিয়ে দর্শকের চোখে প্রতিভাত হয়ে উঠে। কান্নাহাসিগানের মধ্যদিয়ে জীবনের স্পন্দনে ছায়াছবি প্রাণ প্রাচুর্যে বিকশিত হয়ে উঠে।

বোধহয় ১৯২৮ সাল হ'তে আমাদের দেশে সবাক চিত্রের যুগ সুরু হয়। সবাকচিত্রের আবির্ভাবের ফলে নির্বাক ছায়াছবির গঠন পদ্ধতি ও নির্মাণ কৌশলের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়ে নূতন পরিবেশের মধ্যে উপযুক্ত প্রয়োগ পদ্ধতির অনুসরণ করে সবাকচিত্র গ্রহণ সুরু হয়।

সবাকচিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট অভিনয় কলা এবং সুবিন্যস্ত চিত্রনাটক রচনা (Scenario)। যার মধ্যে কাহিনীর আগাগোড়া ও সম্পূর্ণ চিত্ররূপ, আলো, শব্দ ও দৃশ্যপটের উপর পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এবং যা অনুসরণ করে চিত্র গ্রহণ সুরু হবে। নির্বাক ছায়াছবিতে মূকাভিনয়ের মধ্যে কোন শব্দ ও উচ্চারণ ছিল না তাই ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত সাক্ষাৎভাবে (Driect) চিত্রে ফুটিয়ে তোলবার প্রয়োজন হত না বলে—শুধুমাত্র title এর মধ্যে অনেক সময় পরবর্তী ঘটনা এবং নাটকীয়তার স্বরূপ ও আভাস দেওয়া হলেই চলত... কিন্তু সবাকচিত্রে, ঘটনা ও ঘাতপ্রতিঘাত সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করবার ফলে একদিক থেকে যেমন চলচ্চিত্রধর্মী বিশিষ্ট প্রয়োগ পদ্ধতির (Method of approach) প্রয়োজন হল, অন্যদিকে সেই প্রয়োগ পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করে তুলে ঘটনাটীকে পরিস্ফুট করবার জন্য চিত্রাভিনয়ের film-acting প্রয়োজন হল। অর্থাৎ সবাকচিত্রে উল্লেখযোগ্য দুটী পরিবর্তন দেখা গেল; প্রয়োগ পদ্ধতি (Technique, Execution ইত্যাদি) এবং অভিনয়রীতি।

সবাক ছায়াছবির গোড়ার দিকে চিত্রগ্রহণে যদিও নবনব প্রয়োগ পদ্ধতির চেষ্টা চলছিল এবং সবাকচিত্রকে সর্বতোভাবে নির্বাক ছায়াচিত্র পদ্ধতি হতে সতন্ত্র করে উন্নতধরণের করে তোলবার জন্য যন্ত্র এবং কারুকলার দিক থেকে অভিনবত্বের সন্ধান চলছিল, তথাপি প্রথম দিকের সবাকচিত্র মঞ্চ নাটকের গতিশীল চিত্ররূপ ছাড়া আর্ট ও শিল্পের প্রতীক হিসাবে দেখা যায় নি। নাটকের যেমন বিভিন্ন দৃশ্য থাকে এবং তার ঢালা অভিনয়ের মধ্যেই নাট্যকলার শিল্পবস্তু রসপুষ্টি লাভ করে। প্রথম যুগের ছায়াছবির মধ্যে মঞ্চ আদর্শ ও প্রয়োগরীতি। পরিপূর্ণ কাহিনীর ছবি দেখা যেত। অর্থাৎ প্রথমদিকে ছায়াছবির স্বধর্ম এবং স্বাভাবিক প্রকাশরীতির কোন বালাই ছিল না...মঞ্চের আদর্শ অনুসারে নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের ফটোগ্রাফীই সবাকচিত্র বলে পরিগণিত হত। কি অভিনয়, কি প্রয়োগ কৌশল, কোন দিকদিয়েই সবাকচিত্র নিজস্ব শিল্পসৌকার্যের পরিচয় দিতে পারে নি। প্রতি পদেই মঞ্চ আদর্শের অনুসরণ করে ছবি তোলা হত।

চিত্রনাটক সুরচিত ছিল না এবং ফটোগ্রাফীর কলা কৌশলে কাহিনী ও অভিনয়ের আঙ্গিক সৌন্দর্য কত বৃদ্ধি পায় সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারনাই ছিল না। সে যুগের সবাক চিত্রের চিত্র গ্রহণ যারা দেখেছেন, তারা সকলেই জানেন Shot এর প্রাচুর্য (অর্থাৎ close up, fade in, medium shot, longshot, diosolve, ইত্যাদি) ও ছায়াচিত্রে তার উপযোগিতা সম্বন্ধে চিত্র শিল্পীগণ অবহিত ছিলেন না। সমস্ত shotই পুরোপুরি ভাবে মঞ্চে অভিনীত দৃশ্যের মত করে কোনরকমে নেওয়া হত এবং সেগুলি পরপর জুড়ে দিয়ে ছবি তৈরী হত। আজ কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। সটের (shot) পরিকল্পনা এবং চিত্রগ্রহণ পদ্ধতির উপর দৃশ্যের বক্তব্য ও মাধুর্য কত কলাময় ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে তা বহু বিভিন্ন ধরণের চিত্রে আমরা দেখেছি। চিত্রগ্রহণের আজ সর্বাপেক্ষা বড় জিনিষ এই shotএর পরিকল্পনা এবং উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ (angle) থেকে চিত্রগ্রহণ—এর উপর সমগ্রভাবে কাহিনীর সৌন্দর্য আবেদন সব কিছুই নির্ভর কচ্ছে। অধুনা এক একটী shot, কি কাহিনীর দিক থেকে, কি শিল্পকলায় ছায়াছবির অলঙ্কার স্বরূপ......এবং প্রায় প্রত্যেক ছবিতেই দেখা যায় নাটকীয়তা সৃষ্টির দিক থেকে এবং ছবির কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য এক একটী shot এমনভাবে ঘটনা ও চরিত্রের বিশেষভাব ও দিক অবলম্বন করে নেওয়া হয়েছে যে তার মূল্য ও গুরুত্ব অনেকখানি। এমনও দেখা যায় যে, একটা ছবি হতে মাত্র কয়েকটী shot বাদ দিলে ছবির গতি ও আবেদন শ্লথ হয়ে যায়—অথচ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না যে এই shotটীর নাটকীয় শিল্পমূল্য এত গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বেই বলেছি, সবাক চলচ্ছিত্রের প্রচলনের সংগে সংগে ছায়াছবির বিভিন্ন দিকে পরিবর্তন দেখা দেয়। অনেক চিত্র-নির্মাণ প্রতিষ্ঠান এই সময় গড়ে উঠে সবাক চিত্র নির্মাণ করতে সুরু করে। নির্বাক চিত্র-ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা প্রযোজক সবাকচিত্র নির্মাণের হুল্লোড়ে পড়ে চিত্র-নির্মাণ ব্যবসায়ে প্রভূত নব-আগন্তুক প্রযোজকদের সংগে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে সক্ষম হন না এবং তার ফলে তাঁদের যশ ও প্রতিষ্ঠা সবাক-চিত্রের আমলে ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে এবং ব্যবসায়ে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়ে অনেকে এ চিত্রজগত পরিত্যাগ করেন। নির্বাক যুগের প্রখ্যাতনামা চিত্র-ব্যবসায়ী Madan & Co, এই-ভাবে সবাক-চিত্রের গোড়ার দিকেই চিত্রজগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। সবাক-চিত্রের অভ্যুদয়ে Madan & Coএর শোচনীয় পরিণতি চিত্রশিল্পের দিক থেকে যেমন বিরাট ক্ষতি, তেমনি মর্মান্তিক। সারা ভারতবর্ষে Madan & coএর মত বিস্তৃত ব্যবসা এবং একচ্ছত্র

আধিপত্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ছিল না এবং New theatres ছাড়া অন্য কোন চিত্র প্রতিষ্ঠান Madan & coএর মত বিপুল ব্যবসা ও অপরিসীম জনপ্রিয়তার সামান্যতম অংশও অদ্যাবধি অর্জন করতে সক্ষম হন নাই।

সবাক চলচ্চিত্রের অভ্যুদয়ের সংগে New theatres (প্রথমে International film craft), Radha films, Kali films, East India film Co. প্রভৃতি কোম্পানী বিপুল উৎসাহে চিত্রগ্রহণ সুরু করে। N. T.র প্রথম দিকের ছবি 'দেনা পাওনা', কালী ফিল্মসের "নরমেধ যজ্ঞ", রাধা ফিল্মসের "শ্রীগৌরাঙ্গ" প্রভৃতি সবাকচিত্র জনপ্রিয় হয়।

N. T.র 'নটীর পূজা', "চিরকুমার সভা" প্রভৃতি চিত্রও বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। প্রচুর উৎসাহ ও পরিশ্রমের সংগে চিত্রনির্মাণ চলতে থাকে এবং ক্রমশঃ মঞ্চ-আদর্শ অনুসরণ না করে ভিন্নতর প্রয়োগপদ্ধতি অবলম্বন করে চিত্রনির্মাণের প্রয়াস দেখা যায়।

এই সময় N. T.র 'চণ্ডীদাস' বাংলা চিত্রজগতে যুগান্তর আনয়ন করে। দেবকীকুমার বসু পরিচালিত "চণ্ডীদাস" বাংলার জনসাধারণকে অপূর্ব সুরমূর্চ্ছনায় এবং তন্ময়তায় মুগ্ধ করে……বাংলার প্রিয় কবি চণ্ডীদাস তাঁর প্রেম বিরহ ও ত্যাগের অপরূপ মূর্তি নিয়ে দর্শকের সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে উঠেন। 'চণ্ডীদাসের' অপূর্ব Lyrical ভাবব্যঞ্জনা এবং ছন্দময় প্রকাশভঙ্গি ছবিটীকে কি মাধুর্যে, কি আবেদনে সুমধুর করে তোলে। সবাক চিত্রের প্রথম যুগে 'চণ্ডীদাস' একখানি স্মরণীয় চিত্র। 'চণ্ডীদাস' চিত্রের মধ্যে সর্বপ্রথম আমরা গুণাবলী সম্বলিত [qualitative picture] ছায়াছবির সন্ধান পাই। 'চণ্ডীদাসের' মধ্যে সচ্ছন্দ অভিনয় ও সুললিত সঙ্গিত রসপুষ্ট ছৈবিক কলাশিল্পের (Pictorial artistry) পরিচয় সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। সঙ্গিত ও অভিনয়ে ছায়াছবির যে একটী বিশেষ ধর্ম ও ছন্দ আছে তা চণ্ডীদাসই সর্ব প্রথমে ব্যক্ত করে। যদিও বর্ণনার (art of story telling) দিক থেকে এবং চিত্রগ্রহণের দিক থেকে চণ্ডীদাসের মধ্যে যাত্রা ও মঞ্চের প্রভাব দেখা যায়। যাই হোক, সবাক চিত্রের প্রাথমিক যুগে চণ্ডীদাস একখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছবি। N. T. র হিন্দী ছবি (প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত) "ইহুদী কি লেড়কী" যদিও বিলাতী ছবির আদর্শে এবং ভঙ্গিমায় তোলা হয়েছিল, তবু এই চিত্রের মধ্যে বর্ণনার উজ্জ্বলতা এবং অভিনবত্ব ছিল এবং চিত্রনাট্যের দিক থেকে ছবিটী অনেক উন্নত ছিল। এইচিত্র বাংলার বাইরে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেবকী বসুর "পুরাণ ভকত" একখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছবি।

শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত N.T. র রূপ-লেখা ছবিটীকে সর্ব প্রথম আধুনিক ছায়াছবি বলা যেতে পারে। চিত্র নাট্যরচনা, অভিনয় ও প্রয়োগ কৌশলের দিক থেকে আমার মতে রূপ-লেখাই প্রথম আধুনিক ছায়াছবি—যার মধ্যে অনেক বিশেষত্বের, নূতনত্বের আভাস ও ইঙ্গিত ছিল। প্রথমতঃ, অভিনয়। এযাবত সকল সবাকচিত্রের মধ্যে মঞ্চ ঘেসা অভিনয় বর্তমান ছিল এবং ছবির জন্য সম্পূর্ণ পৃথক প্রণালীর ও অভিব্যক্তি মূলক (Expressive) অভিনয়ের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং চিত্রাভিনয়ের জন্য ভাবাভিব্যক্তিই একমাত্র উপজীব্য বাক্য বাহুল্য নয়···প্রমথেশ বড়ুয়া এই সত্যকে তাঁর রূপলেখা চিত্রে প্রমাণিত করেন। আমার মনে আছে যখন "রূপলেখা" চিত্র মুক্তিলাভ করে তখন অরূপের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার অভিনয় দর্শনে অনেকে বলেছিলেন—"বড়ুয়া আসামী ভাল বাংলা বলতে পারেন না। তাই বেশী কথা বলেন নি। সমগ্র চিত্রের মধ্যে বড়ুয়া ভাবাভিব্যক্তির উপর অল্প কথায় কত চমৎকার এবং মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছেন তা "রূপ-লেখা" চিত্র যিনি না দেখেছেন তাঁকে বোঝান সম্ভব নয়। বড়ুয়ার আশ্চর্য অভিনয় প্রতিভা এবং ছায়াচিত্র উপযোগী ভঙ্গি ও ভাবাভিব্যক্তিময় অভিনয়ের প্রথম স্ফুরণ আমরা পাই সবাক 'রূপ-লেখা' চিত্রে। আজ যে উন্নত ধরণের ভাবানুভিনয় চিত্র শিল্পের সৌষ্ঠব বলে পরিগণিত হয়েছে, তার প্রথম বিকাশ দেখা

যায় "রূপলেখা" চিত্রে। সুতরাং ছায়াছবির বৈশিষ্ঠের এবং প্রগতির ইতিহাসে রূপলেখা একখানি স্মরণীয় চিত্র।

"রূপলেখা" র পর "মীরাবাঈ" "চিত্র দেবকীবসু কর্তৃক পরিচালিত হয়,...কিন্তু চিত্রোপযোগী যথেষ্ঠ উপদান এবং পূর্বাপেক্ষা উন্নত প্রয়োগ কৌশলে তোলা হলেও মীরাবাঈ আশানুরূপ জনপ্রিয় হয় নাই। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে "চণ্ডীদাস" অপেক্ষা "মীরাবাঈ" উন্নত শিল্পকলার পরিচায়ক।

এপর্যন্ত (N.T. র মীরাবাঈ প্রভৃতি) যে রীতিতে চিত্রগ্রহণ চলছিল তার মধ্যে আধুনিকতার আভাস দেখা গেলেও পুরোপুরি আধুনিক বলা যায় না—বলা যেতে পারে প্রাক আধুনিক যুগ। এই যুগের মধ্যে চিত্রগ্রহণে ক্রমবর্ধমান প্রগতির স্বরূপ পরিস্ফুট হতে থাকে এবং প্রায় প্রত্যেক চিত্রই গতানুগতিকতার কবল মুক্ত হয়ে নূতনত্ব সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ে উঠতে থাকে।

ঠিক এমনি সময় প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'দেবদাস' চিত্র কি বর্ণনার দিক থেকে, কি উপস্থাপন কৌশলে, কি পরিচালনায়, কি কলা কুশলতায় ও অভিনয়ে যুগান্তর সৃষ্টি করে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এপর্যন্ত যে রীতিতে চিত্রগ্রহণ চলছিল "দেবদাস" চিত্রে তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা গেল এবং আরও দেখা গেল বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে বাছাবাছা Shot এই চিত্রের আঙ্গিক ভাব ও মাধুর্য যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি করেছে। Flat Scene বা ঢালাদৃশ্য যা এযাবত প্রায় সব ছবিতেই মঞ্চ প্রভাবের ফলে দেখা যেত... দেবদাস চিত্রে তা দেখা গেল না এবং ঘটনার স্থিতি ও গুরুত্ব অনুসারে Shot taking শুধু যে ঘটনা ও কাহিনীকে ব্যক্ত করতে সাহায্য করল তা নয়...নাটকীয়তা ও ঘাতপ্রতিঘাতকে কত সুস্পষ্ট আবেদনময় করে তুলতে পারে, "দেবদাস" চিত্র তা প্রমাণিত করলো। সমান্তরাল দৃশ্য এবং flash back Scence ও (অর্থাৎ আগের ঘটনার খণ্ডদৃশ্য) 'দেবদাস' চিত্রে দেখা গেল এবং Emotion অনুসারে Shot গ্রহণ করবার ও সাজাবার অপূর্ব নৈপুণ্যের ফলে "দেবদাস" একদিক থেকে যেমন অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পকলাময় তেমনি আবেদন মধুর ছায়াচিত্র হয়ে যুগান্তকারী হয়ে উঠল।

বস্তুতঃ চলচ্চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও কারুকলার একটা শ্রীমণ্ডিত রূপ 'দেবদাস' চিত্রের মধ্যে দেখা যায়। ছায়া ছবি গল্প বলায়, উপস্থাপন কৌশলে (Presentation) বিন্যাস রীতিতে এবং সর্বোপরি অভিনয় কলায় কিরূপ হওয়া উচিত "দেবদাস" সারাভারতে তা পরিব্যক্ত করে এবং একথা আজ কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে অধুনা ভারতীয় চিত্রাকাশে "দেবদাসের" প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজিত। অনেক সমালোচকের মতে "দেবদাসই" অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি ইহা মনে করি না।

শ্রীযুক্ত বড়ুয়া চলচ্চিত্রে বিভিন্ন দিকে ক্রমবর্ধমান প্রগতি ও অভিনবত্ব আনয়ণ করেন এবং তার মধ্যে আধুনিক ছায়াচিত্রাভিনয় যে সর্বশ্রেষ্ঠ একথা পূর্বেই বলেছি। শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার পরবর্তী অবদান 'গৃহদাহ' Technical নৈপুণ্য অত্যুৎকৃষ্ট হয়ে কাহিনীর আবেদন শূন্যতার (অবশ্য বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে) জন্য জনপ্রিয় হয় নাই। শ্রীযুক্ত নীতীন বাবু পরিচালিত "ভাগ্যচক্র" চিত্র সুচরিত চিত্রনাট্য এবং উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফীর নিদর্শন। এই চিত্রটী সারাভারতে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। "ভাগ্যচক্রের" মধ্যে কাহিনীকে চিত্র উপযোগী গঠন করে সুমধুর করে তোলবার জন্য সুবিন্যস্ত চিত্রনাট্য সর্ব প্রধান বৈশিষ্ঠ। বড়ুয়ার "মুক্তি" চিত্র পুনর্বার কি শিল্পকলায় কি আর্টের দিক থেকে সারাভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। "দেবদাস" অপেক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে "মুক্তি" বিশেষ উন্নত এবং ত্রুটীহীন এবং Shot Taking এর দিক থেকে "মুক্তি" অধিকতর উন্নত এবং স্বচ্ছন্দ। "মুক্তি" চিত্রের আর একটী বৈশিষ্ঠ্য এর আকর্ষণীয় সঙ্গীত—"দেবদাস" চিত্রে যা দেখা গিয়ে ছিল অর্থাৎ সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে Situation সৃষ্টি করবার প্রয়াস মুক্তি চিত্রে তা পরিপুষ্টি লাভ করে। মুক্তি চিত্রের আর একটি বৈশিষ্ঠ্য প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী কাননদেবীর বিপুল খ্যাতি।

শ্রীযুক্ত দেবকী কুমার বসু পরিচালিত N.T."বিদ্যাপতি' নানাদিক দিয়ে সমৃদ্ধ ও উচ্চতর শিল্পনৈপুণ্য মণ্ডিত এবং ভাবাভিব্যক্তিময় অভিনয় ও সঙ্গীত রস পুষ্ট একখানি উচ্চশ্রেণীর চিত্র। কি কল্পনায়, কি ভাবের গভীরতায়, কি বর্ণনার দিক থেকে, "বিদ্যাপতি"র মত অপরূপ ও বিরাট চিত্র আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে নির্মিত হয় নি। "বিদ্যাপতি" দেখতে দেখতে মনে হয় সত্যই 'Poetry in motion picture।' পরিচালক দেবকী-বসুর আশ্চর্য নৈপুণ্য বিস্ময় বিমোহিত করে। সখি অনুরাধার ভূমিকায় শ্রীমতী কাননদেবীর অসাধারণ অভিনয় "বিদ্যাপতির" একমাত্র আকর্ষণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। পরিচালকের অমূর্ত ভাব ও কল্পনা শ্রীমতী কাননদেবীর অপরূপ অভিনয়ের মধ্যদিয়ে মূর্ত ও প্রাণ প্রাচুর্যে বিকশিত হয়ে উঠছে। বিভিন্ন পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার চিত্রশিল্প যে পর্যায়ে আজ উপস্থিত হয়েছে তা মোটামুটি ব্যক্ত করা হল। আধুনিক চিত্রশিল্পের ভূমিকা বা খসড়া হিসাবে এটিকে অভিহিত করা যেতে পারে।

প্রগতিশীল চলচ্চিত্রের ইতিহাসে N.T. র অবদান অবিস্মরণীয়। সারাভারতে আজ যে চিত্র অনুকূল জনমত ও বিপুল জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেছে তা প্রধানতঃ New theatres এর অক্লান্ত ও আন্তরিক শিল্প সেবার ফল। সারাভারতবর্ষে New theatresই তার যুগান্তকারী চিত্র যথা "চণ্ডীদাস" "দেবদাস" "ভাগ্যচক্র" "মুক্তি" "বিদ্যাপতি" ইত্যাদি প্রভৃত চিত্র নির্মাণ করে চিত্রশিল্পে সকল সম্ভাবনা ও সুবিপুল শিল্পলোকে পরিপুষ্ট করে তোলেন। বাংলার গৌরব New theatres এর অক্লান্ত শিল্পসেবা ও আত্মনিয়োগ আজ সারাভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের মূল্য ও উপযোগিতাকে পরিস্ফুট করে দিয়েছে এবং চিত্রশিল্পকে উন্নত ও প্রগতিশীল করে তুলেছে।

বাংলার চিত্রশিল্পের ক্রম বিবর্তনের ইতিহাসে New theatres বিশিষ্ট ও গৌরবান্বিত স্থান অধিকার করে আছেন এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান বলতে New theatres ছাড়া কিছুই বোঝায় না...চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এমনি অপরিসীম ও একচ্ছত্র প্রভাব New theatres কে গৌরবান্বিত করেছিল। আমরা আশা করি সারাভারতের বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠান বাংলার গৌরব New theatres তার পূর্ব খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখে প্রগতিশীল ছায়াছবি নির্মাণ করে বাংলার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা অটুট রাখবেন।

সিনেমায় গল্প বলা

অ, রায়

প্রথম কবে ও কি বায়স্কোপ দেখেছিলাম আমার মনে নেই ; শুধু এটুকু জানি যে আমি তখন রূপকথার পাঠক। তখন ছবি দেখে ফিরলে কেউ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করতো না, অমুক বইটা কেমন ? জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয় বলতাম, চমৎকার! ভাল-মন্দর বিচার তখনও গড়ে ওঠেনি, মনে ছিল গল্পকে সত্যরূপে অভিনীত হতে দেখার সাধ। শিশু বুদ্ধিও ছিল তরল, যে পাত্রেই রাখ বেমানান হবার আশঙ্কা ছিল না। মন কিছুতে শেকড় গেড়ে বসেনি, ভাল লাগা, মন্দ লাগা ছিল হাওয়ায় ভাসমান।

আজও গল্প শোনার ইচ্ছাটা মরেনি,—গল্পটা আবার বাস্তবে চিত্রিত হতে দেখলে তো কথাই নেই। কিন্তু আজকাল মনকে সহজে তোষ দেবারও উপায় নেই। মনটা ক্ষুত ক্ষুত করে,—চরিত্রটা ওই বইএ ফুটে ওঠেনি, এ বইটা মিথ্যে মিথ্যে বড় করা হয়েছে, খেলো রসিকতা বিরক্তিকর—কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা অনেক সময় দেখি গল্পটাই পরিচালক বলতে পারেন নি। পরিচালকের যেটা প্রধান গুণ সেইটাই তাঁর নেই, আর সব আছে। অনেকগুলো ছবি তুলে তিনি যেন একের পর এক বসিয়ে গেছেন, তাদের যোগসূত্র হয় কষ্টকৃত, না হয় একেবারে নেই। গল্প লেখা বা গল্প বলায় যদি আনন্দ না থাকে, তবে তাতে যত কারুকার্যই থাক না, সে গল্প গল্পই নয়। কোন বইকে যদি ছবিতে রূপায়িত করতে হয় তবে শুধু বইটা তুললেই হবে না, নিভৃতে যে রয়েছে লেখকের লেখার ও পরিচালকের ছবি তোলার অসীম আনন্দ, সেটাকেও ফুটিয়ে তোলা চাই। সৃষ্টির অবাধ গতি (Spontauiety) যেন বাধা না পায়। ছবি তোলা যদি শুধু ফটোগ্রাফ আর শব্দের কারসাজি, কায়দা কানুনের যদি নিখুঁত অনুষ্ঠান হয়, শিল্প যদি বিজ্ঞান হয়ে ওঠে, তবে সে ছবির মূল্য নেই। তাতে স্থানে স্থানে Effectivenessএর পরিচয় থাকলেও, একাগ্রতা থাকে না, একতা থাকে না, কারণ সেখানে জীবনের স্পন্দন নেই ; আনন্দের বন্ধন নেই, যেমন অভিজ্ঞতার সমগ্রতা না থাকলে, লেখকের প্রকাশ-শিল্প বৃথাই হয়ে যায়।

সাহিত্য যেমন সৃষ্টি হয়, সিনেমাও তেমনি সৃষ্টিরই জিনিষ। কিন্তু শুধু কালি ও কলমের সাহায্যে লেখক যে গভীর ভাবের ও অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারেন, পরিচালক তার নানা আসবাব পত্র ও নানা সরঞ্জাম নিয়েও সেভাবের গভীরতাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। 'Lost Horizon'-এ গাম্ভীর্যে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু Hiltonএর অভিজ্ঞতার গভীরতাকে ফুটিয়ে তোলা যায়নি। 'Sons and Lovers' বইএ Lawrenceএর অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতা পাওয়া যায়, কিন্তু সে বইএর ছবি তুললে, কয়েকটা চরিত্রের, কয়েকটা আবহাওয়ার নিখুঁত প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু এ সব যার ওপর দাড়িয়ে আছে তার প্রায় কিছুই প্রকাশ পায় না, অন্ততঃ আজ পর্যন্ত এমন বই দেখা যায়নি। আজও পর্যন্ত Cinema, Stageএর ধর্মানুযায়ী চলেছে ; impersonal ও dramatic বইএর কদর Cinema পরিচালকের কাছে বেশী (যদিও Cinemaর উপন্যাস ধর্মী হবার সম্ভাবনা আছে)। তাই লেখা সৃষ্টির কাছে, এ সৃষ্টি এখনও নিকৃষ্ট, এরও কারণ আছে। চরিত্রাভিনয়ে, কথায়-বার্তায়, আর পরিচালনার গুণে যেটুকু ফোটে তা অনেকখানি বাস্তব,সত্য জীবনের মত real। কিন্তু এ প্রকাশ সীমাবদ্ধ। পাঠক তার নিজের মনমত করে বইএর কোন ঘটনা বা চরিত্রকে ভাববার সময় পায়, দর্শকের কিন্তু সে উপায় নেই, তার সামনে একটা সম্পূর্ণ জিনিষ তুলে ধরা হয়েছে, তাই তার স্বাধীনতার একটা সীমা আছে। সংকেত অসীমের দুয়ার খুলে দেয়, তাই সাহিত্যে সংকেতের এত প্রচার। সিনেমায় সংকেত সুলভ নয় সেইজন্যই সে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সংকেত ও বিস্ময় সৃষ্টি করবার সুবিধা সিনেমা পরিচালকের আছে, শুধু তাঁর সময়ের অভাব। Selectionই উপন্যাসকে রূপায়িত করবার প্রধান অনুষ্ঠান, তাই অনেক জিনিষই বাদ পড়ে যায়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেও গভীর ভাবের প্রকাশ হতে পারে যদি পরিচালকের সৃষ্টি শক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার দৃষ্টি থাকে। পরিচালককে শুধু স্রষ্টা হলে চলবে না, হতে হবে স্রষ্টা

সমালোচক (Creative critic)। শরৎচন্দ্রের কোনও বই তুলতে হলে, সে বইএ শরৎচন্দ্রের মনভাবের ও অভিজ্ঞতার কতখানি প্রকাশ পেয়েছে তা জানা চাই, বইটার ব্যবচ্ছেদেই পরিচালকের বিশেষ গৌরব নেই।

আজকাল বেশীর ভাগ বই এই গল্পটাকে সোজাভাবে না বলে তার মধ্যে technique খেলা দেখান হয়, কিন্তু সেইটেই কি আসল? 'দেবদাস' চরিত্র নিয়মের সঙ্গে অসদ্ভাবের tragic ইতিহাস,—শরৎচন্দ্রের কঠিন নীতি-বিরোধীতার নিরুদ্ধ প্রকাশ। শরৎচন্দ্র এ সময়ে বন্ধনকে সহ্য করতে পারেন না, কিন্তু সমাজের বাঁধনকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে সক্ষম নন—এই মনভাব থেকে দেবদাসের সৃষ্টি। গল্পটার মধ্যে techniqueএর কারিকুরি না করেও দেবদাসের মধ্যে ওই বিরোধীতার সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলেই সে বইএ প্রমথেশ বড়ুয়া সার্থক হয়েছেন।

আধুনিক সাহিত্যিকদের মত সরল ও সোজা ভাবে ভাব প্রকাশ করাই পরিচালকদের নীতি হওয়া উচিত, আর পরিচালকদের এটুকুও জানা থাকা চাই যে, গল্প বলায় তো শুধু গল্পই নেই—তাতে একটা অভিজ্ঞতার আদর্শ আছে—সেইটেই আসল।

সুদর্শন রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

[রতীন্দ্র স্মৃতি-সংখ্যার জন্য নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত যে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠিয়েছিলেন সময়মত তা' আমাদের হস্তগত না হওয়াতে, সে সংখ্যায় স্থান করে দিতে পারিনি, তাই বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা হ'লো।]

চার বছর আগেকার কথা। তখন আমি রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে আসিনি। সৌখীন সম্প্রদায়ে থিয়েটার করার প্রবল বাতিক ছিল। কোন একটা নাটকের কোন এক জটিল ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য তদানিন্তন রংমহলের খ্যাতিমান্ অভিনেতা শ্রীযুক্ত সন্তোষ সিংহের কাছে উপদেশ নেওয়ার জন্যে যেতাম। রংমহলের সাজঘরের পার্টিসান করা ছোট্ট এক ফালি ঘরের মধ্যে সন্তোষ সিংহ আর তাঁর সহকর্মী রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সাজসজ্জা করতেন। সে সময়ে যদিও প্রায়ই আমি রংমহলে যেতাম কিন্তু রতীন বাবুর সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার হয়নি। তবে দেখেছি লোকটির সরল, অমায়িক, নম্র এবং ভদ্র ব্যবহার।

তারপর গত ১৩৫১ সালে যখন ঘনিষ্ঠভাবে রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে এলাম, তখন সন্তোষ বাবুর ক্ষুদ্র Counter এর মধ্যে কেবল তিনিই একা। রতীন বাবু তখন রংমহল ছেড়ে মিনার্ভায় এসে যোগদান করেছেন। আমার নাট্যরূপায়িত শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' মঞ্চস্থ হওয়ার পর রতীন বাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। সেদিনের প্রথম আলাপে তিনি আমায় হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "বাপের কাছে (অর্থাৎ সন্তোষ সিংহের কাছে) শুধু পার্ট দেখিয়ে নিতেই আসতেন না, লুকিয়ে লুকিয়ে পার্ট লিখতেন ও! আপনার এ বিদ্যেটা কিন্তু আমার জানা ছিল না।"

তারপর তাঁর সঙ্গে ট্রামে, বাসে, পথে, ঘাটে, কতবার যে দেখা হয়েছে তার আর ঠিক নেই। যখনই দেখা হয়েছে তখনই মুখে সহজ সুন্দর হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। মিষ্ট কথায় ও ব্যবহারে পরিতৃপ্ত করেছেন।

শ্রীরঙ্গমে 'বিন্দুর ছেলে' অভিনীত হওয়ার পর একদিন আমি মাণিকতলা ষ্ট্রীট দিয়ে বাড়ী আসছি। শুনতে পেলাম পেছনে কে বলছে "এই থামা"। ফিরে দেখি একটা রিক্সা জোড়া করে রতীন বাবু। আবার মুখে সেই হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন "Congratulation!" জিজ্ঞাসা করলাম—"কিসের? কি বাবদ?" বললেন "বিন্দুর ছেলের জন্যে"। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন "কোথায় যাবেন?" বললাম "আপিস ফেরতা বাড়ী চলেছি"। রতীন বাবু জিজ্ঞেস করলেন—"সে-কতদূর"? বললাম "মিনার্ভা থিয়েটারের একটু আগে।" রতীন বাবু বললেন "আসুন রিক্সায়, আমিও থিয়েটারে যাব।" বললাম, "এক রিক্সায় ধরবে কেন?" এক মুখ হেসে রতীন বাবু বললেন, "আপনার মত মানুষকে জায়গা দিতে পারবো না এত মোটা নই।" বাধ্য হয়ে রিক্সায় উঠলাম। রিক্সাওয়ালা বোঝার ওপর শাকের আঁটি নিয়ে ঠুং ঠুং করে এগিয়ে চলল। রিক্সায় বসে বললাম, "দেখুন রতীন বাবু রাস্তার লোকে কিন্তু হাসছে।" সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে রতীন বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেন"? বললাম, "ওরা মনে করছে এ বাজপাখীর কাছে দুর্গা টুনটুনিটা এল কোথা থেকে?" তারপর উচ্ছ্বসিত হাসি।

তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে মিনার্ভা-থিয়েটারে তাঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' গল্পের নাট্যরূপ যেদিন আমি পড়ে শোনাই, সেদিন মিনার্ভার রঙ্গমঞ্চে গিরিশ পরিষদের উদ্যোগে 'বলিদান' নাটক অভিনীত হচ্ছে। রতীন বাবু সেদিন সে অভিনয়ের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে এসে তিনি নাটক শুনে গেছেন। তার পর 'কাশীনাথ' নাটকে কে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তাই নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের বর্তমান নাট্য পরিচালক, কীর্তিমান অভিনেতা ছবি বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে আমার গোপনে অনেক আলোচনা হয়েছে। যে ভূমিকাটি তাঁর ওপর ন্যস্ত করার কথা হয়েছিল, কাশীনাথ নাটকের সেটি একটি জটিল অংশ।

তারপর সেই চরিত্রের ওপর নানারূপে নানাভাবে কলম চালিয়েছি। বিশ্বাস ছিল, সে ভূমিকায় রতীন বাবু নিশ্চয়ই একটা রেখা পাত করতে পারবেন। আমার দুর্ভাগ্য যে কাশীনাথ মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই রতীন বাবু পরপারে যাত্রা করলেন।

আজ তাঁর স্মৃতি সংখ্যায় বিগত দিনের এই স্মৃতি টুকুই লিপিবদ্ধ করে রাখলাম।

কি চিত্রে, কি মঞ্চে, সর্বত্রই রতীন বাবু সুঅভিনেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আজ তাঁর মৃত্যুতে রঙ্গমঞ্চের যে ক্ষতি হ'ল, তা সামান্য নয়।

প্রতিধ্বনি

(গল্প)

শ্রীসনৎকুমার মৌলিক।

সুশ্রী চঞ্চলা, সে সব সময়েই উতলা। যৌবনের জোয়ার তার দেহের কানায় কানায়। অধ্যাপক অভিজিৎকে দিয়ে তার চলেনা,—চলতে পারে না। অভিজিৎ কেমন যেন অন্য ধরণের। সময়মত কাজ করে। রাত জেগে থিসীস লেখে। ও যেন ঠিক ঘড়ির কাঁটা। অভিজিৎ বসে লিখছে। সুশ্রী এসে কলম কেড়ে নেয়। অভিজিৎ গম্ভীর হোয়ে বলে—"বয়সত দিন দিন বেড়ে চলছে। এখন একটু শান্ত হও সুশ্রী।" সুশ্রী চাবুকের মত লাফিয়ে উঠে বলে—"বয়সের বিচার করতে গেলে মেয়েদের জীবন কতটুকু—একটা বুদ্বুদমাত্র। আমি চাই ছুটে বেড়িয়ে যেতে অবাধে। সমস্ত, অকারন বন্ধনকে বন্যার মত ভাসিয়ে দিতে।" অভিজিৎ গালে হাত দিয়ে বলে, "তাই বলে তার একটা সীমা থাকবে না?" সুশ্রী বাধা দিয়ে বলে—"আমার মনের সীমা নেই—সংখ্যা নেই—সংজ্ঞা নেই—সে অসংখ্য—সে অসীম," অভিজিৎ কলমটা টেনে নিয়ে বলে, "এমনি উদ্দেশ্যবিহীন হোয়ে মরীচিকার পেছনে ছুটতে নেই সুশ্রী।" খাকির পোষাক পরা পিয়ন এসে উপস্থিত। পিয়ন চিঠি দিয়ে চলে যায়। হলদে খামে সুশ্রীর নামে চিঠি। সুশ্রী খুলে মনে মনে পড়ে। এ কি? এ যে বাবা লিখেছেন। অশেষদা বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন। তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে আগামীকাল। চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠে। সে বলে, "জানো বাবা কি লিখেছেন? কে আসছে?" অভিজিৎ বলে "না ত। কে আসবেন?" উচ্ছ্বাসে সুশ্রী ফেটে পড়ে। অভিজিতের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বলে—"আমার, এই মানে আমাদের অশেষদা। নাম শোননি? সে কি! সে একজন ওয়াণ্ডার ফুল ফুটবল প্লেয়ার। কাগজে কাগজে তাঁর কত ছবি উঠেছিল। বল পেলে সে তুফান মেলের মত ছুট ত। উঃ মার্ভেলাস!" একটা অপরূপ ভঙ্গী করলো। অভিজিৎ চিন্তিত মুখে বলে—"অশেষ বলে তোমার কোন দাদা আছেন, এত আগে শুনিনি।" সুশ্রী বিরক্ত হোয়ে যায়—"ধ্যেৎ। সে আমাদের পাড়ার ছেলে। আমি তাঁকে অশেষদা বলি।" অভিজিৎ চেয়ারে হেলান দিয়ে বলে—"ও, তাই বলো।" যেন কত বড় একটা সমস্যার সমাধান হোয়ে গেলো। সুশ্রী পায়ের উপর পা নিয়ে বলে— "অশেষদা সব খেলায় এক্সপার্ট। অশেষদার গুণের শেষ নাই। তবে একটা খেলায় বরাবর আমার কাছে হেরে গেছে। কোন দিনই আমায় হারাতে পারে নি।" মুখে আনন্দ। ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি। অভিজিৎ বিস্মিত না হোয়ে পারে না। সে বলে—"বলো কি? তোমার সঙ্গে খেলায় পারে নি? কি খেলা?' সুশ্রী হেসে জবাব দেয়—"ফ্ল্যাশ। ফ্ল্যাশ।" দার্শনিক অধ্যাপকের মনে হোল সুশ্রী যেন তার সামনে এথিক্সের বইখানিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। চোখের সামনে বইখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে। অভিজিৎ আহত হোয়ে বলে—"তুমি ফ্ল্যাশ খেলো? ছিঃ—"এর বেশী সে আর এগুতে পারে না। অতি অদ্ভুত ভঙ্গী করে সুশ্রী বলে—"বাঃ রে, খেলব' না! ভারি ইণ্টারেষ্টিং। দাদা, আমি, অশেষদা, মা, বাড়ীতে সবাই খেলতাম। তুমিত তাশও চেনোনা। তোমার উচিত ছিল একজন গ্রাম্য মেয়ে বিয়ে করা, বুঝলে।" মুখ লাল করে সুশ্রী উঠে যায়।

* * *

পরের দিন অশেষ এলো। অভিজিৎ তাকে অভ্যর্থনা করলো। কিছুক্ষণ আলাপ করে কলেজে চলে যায়। সুশ্রী অশেষকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। দু'জনে মুখোমুখি বসে রয়েছে। অশেষের স্যুটপরা। দুরন্ত বাতাসে টাইটা দুলছে। বামদিকে ভুরুর নীচে সেই ছোট তিলটা বেশ বড় হোয়েছে। অশেষ বলে—"বিলাতে যখন শুনলাম তুমি বিয়ে করেচ, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি"

সুশ্রী উত্তর দেয়—"আমি নিজেই অবাক হোয়ে যাই, কেন যে বিয়েতে মত দিয়ে ফেলেছিলাম। তোমার চিঠি বিলাত থেকে দিন দিন কম আসতে লাগল।

ম্যালেরিয়া

৩৫ মিলিমিটার সাউণ্ড ফিল্ম্,
৩ রীলে সম্পূর্ণ

'শেল ফিল্ম্ য়ুনিট্'-এর নতুন ছবি। এতে ডায়াগ্রাম, সিনেমাইকোগ্রাফি এবং ভারতে ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তোলা দৃশ্যাবলির সাহায্যে বোঝানো হয়েছে কী ক'রে মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়ার বিষ প্রবেশ করে এবং কী করলে এই রোগের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। **প্রথম খণ্ড: ম্যালেরিয়া জীবাণু, দ্বিতীয় খণ্ড: ম্যালেরিয়াবাহক মশা, তৃতীয় খণ্ড: ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।** 'লণ্ডন স্কুল অব হাইজীন অ্যাণ্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এই ফিল্মটি তৈরি হয়েছে। ভারতের সর্বত্র স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তাদের এই ফিল্মের সাহায্য নেবার জন্য ভারত সরকারের 'কমিশনার অব পাব্লিক হেল্থ' নির্দেশ দিয়েছেন। এই ফিল্ম্ **বার্মা-শেলের** 'লেণ্ডিং লাইব্রেরি'র অন্তর্গত। শিক্ষাদানের জন্য কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এবং স্বাস্থ্যনীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনা ভাড়ায় এই ফিল্ম্ ধার পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধীয় ফিল্ম্ 'বার্মা-শেল ফিল্ম্ লাইব্রেরি'তে আছে। ৩৫ মিলিমিটার ও ১৬ মিলিমিটার ফিল্ম্ ধার নিতে হ'লে প্রচার বিভাগে আবেদন করুন।

বার্মা-শেল

মাদ্রাজ বোম্বাই কলকাতা দিল্লী করাচি

BSMK 11

হয়তো সেইজন্যই অভিমানে বিয়েতে মত দিয়ে ফেলেছিলাম। অশেষ ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলে "বাঙ্গালী মেয়েরা বিয়ে করলে বদলে যায়। ভুলে যায় পূর্বের কথা।" সুশ্রী দাঁড়িয়ে উঠে বলে—"আমি ভুলে যাইনি অশেষদা। আমি ট্রেনের গতিতে চলতে চাই। মাঝে মাঝে চাই ষ্টেশন বদলাতে। একটা ষ্টেশন চিরকাল আমায় আগলে থাকতে পারবেনা তা আমি চাইনে—এ আমার অসহ্য।" সুশ্রী বসে হাঁপাতে থাকে। অশেষ হাসি মুখে বলে—"আমিও ঠিক তোমার মত। জীবনে একজনকে পেয়ে সুখী হোতে চেয়োনা। ওর চেয়ে বড় ট্রাজেডি আর কি হোতে পারে? শোনো, উশ্রী, আমি অশেষ—আমার চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই।" সুশ্রীর মনে পড়লো অশেষ তাকে 'উশ্রী বলে ডাকত'। এখন থেকে সুশ্রীর হোক পতন, উশ্রীর হোক জয়যাত্রা অনির্দিষ্ট কালের জন্য। অভিজিৎকে নিয়ে একবছর অনর্থক সময় নষ্ট হোয়েছে। প্রথম কিন্তু অভিজিৎ কে নেহাৎ মন্দ লাগেনি। ও ভালবাসে বইকে, পড়ার ছোট্ট ঘরটিকে আর হ্যাঁ, আর সত্যিই অভিজিৎ তাকে ভালবাসে। অশেষ বলে—"কি ভাবছ' উশ্রী?" সুশ্রী চমকে উঠে। তারপর কি যেন ভেবে নিয়ে অশেষের হাত নিজের হাতে নিয়ে বলে—"তোমার কাছে আমি উশ্রী। আমার প্রতিবিম্ব তোমার মাঝে। তোমার প্রতিবিম্ব আমার মাঝে। এই প্রতিবিম্বকে জীবন্ত করে তোলাই আমাদের কাজ। তাই নয় কি?" অশেষ বলে—"এই ত আমি চেয়েছিলাম।"

তারপরের দিনের কথা। অভিজিৎ তখনো কলেজ থেকে ফেরেনি। সেই সময় তারা দু'জনে হাত ধরাধরি করে বেড়িয়ে পরে। টেবিলের উপর রেখে যায় সুশ্রী ছোট্ট একটা চিঠি। তাতে লিখে রাখে, অভিজিৎ একনিষ্ঠতার আদর্শে গৌরব অনুভব করতে পারে, কিন্তু সুশ্রী তা পারে না। তাই সুশ্রী আজ চলেছে জয় যাত্রায়। অভিজিৎ তাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে—সেজন ধন্যবাদ।

* * *

ট্রেন চলছে। দু'জনে একটা কামরায়। সুশ্রী আর অশেষ পাশাপাশি। জানালার বাইরে দু'চোখ মেলে সুশ্রী দেখছিল' গাছপালা, ঘরবাড়ী সব দৌড়ে পালাচ্ছে। অশেষ সুশ্রীকে বুকের কাছে আকর্ষণ করে বলে—"ট্রেনটা যদি কলিসন হোয়ে চুরমার হোয়ে যায় তবে—?" সুশ্রী লতার মত অশেষের বুকে এলিয়ে পড়ে বলে,—'তবেত জানিনা।" দু'জনেই হেসে উঠে একসঙ্গে।

তাজমহল, কুতুবমিনার, কোনারক, ভূস্বর্গ, সীতাকুণ্ড এ রকম নানাজায়গা ঘুরে একদিন তারা এলাহাবাদে নেমে পড়ে। অশেষ সুশ্রীকে নিয়ে ডাক-বাংলোতে উঠে। সে বলে "এখানেই প্র্যাকটিশ সুরু করা যাক কি বলো?" সুশ্রী মিষ্টি হাসিতে বলে—"মন্দনা জায়গাটা।" অশেষ বলে—"এখানে কিছুদিন দম নিয়ে আবার বেড়িয়ে পরা যাবে যেমন ফুটবলকে পাম্প করে নিতে হয়। পসার আমার মন্দ হবে না।" সুশ্রী খোঁপায় হাত দিয়ে বলে,"একটা নিজস্ব বাড়ী কেনো।" অশেষ হেসে জবাব দেয়—"আমরা যে যাযাবর উশ্রী।"

সুশ্রী ঠোঁট ফুলায়—"তবে একটা ছোট দেখে বাড়ী ভাড়া করো। ব্যারিষ্টারের অন্ততঃ একটা বাড়ী থাকা চাই।" অবশেষে তাই হোল। দিন বেশ কাটছে। বিকেলে টেনিশ, সন্ধ্যায় ইংরাজী সিনেমা। রাতে চলে ফ্ল্যাশ। বাড়ীর পাশের আর দুজন অবাঙ্গালী তাদের খেলায় যোগ দেয়।

রাত তখন নটা। ফ্ল্যাশ খেলা চলেছে। সুশ্রী আজ খেলাতে হেরে গেল। অশেষ হেসে উঠল। সে বলে—"কি গো গর্ব খর্ব হোল। ও গো বিজয়িনী হোলে পরাজিতা। আমার জয়, তোমার পরাজয়।" সুশ্রী অবাক হোয়ে যায়—"আরে তুমি এমন ওয়াণ্ডারফুল খেলা শিখলে কেমন করে?" অশেষ বলে—"তুমিত জাননা উশ্রী, আমি যে দিন দিন এগিয়ে চলেছি; আই য়্যাম প্রগ্রেসিং।" নাটকীয় ভঙ্গীতে কথাটা শেষ করে। আবার খেলা সুরু হয়। তাশ বাটা আরম্ভ হয়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়। কে একজন যেন উপরে আসছে। তাদের ঘরে এসে হাজির হয়

একটি মেয়ে। মেয়েটিররং সাদা—কাগজের মত সাদা। গাল বেগুনের মত ফুলো। চুলগুচ্ছ সোনালী। চোখ নীল। বুকের অনেকাংশ অনাবৃত। মেয়েটি সিনেমা তারকার অনুকরণে শিষ দিয়ে অশেষের নাম ধরে ডাকে। তাশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অশেষ সবার সায়ে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে, কপালে, গালে চুম্বন করে বারবার। "এক্সকীউসমী" বলেই মেয়েটার হাতধরে তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায়। খেলা হয় না; মোটরের হর্ণ সুশ্রীর কানের ভিতর দিয়ে বর্মার খোঁচার মত এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে যায়। হাতের তাশ কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায়। দু'জন অবাঙ্গালী ধীরে ধীরে চলে যায়!

সুশ্রী বারান্দায় চলে আসে। সেখান থেকে টেনিসলনের কাছে চলে আসে। মাথার উপর অসংখ্য তারা, তার দুপাশে অগনতি জোনাকী—সম্মুখে গাঢ় অন্ধকার। সুশ্রী আবার ঘরের ভিতর চলে আসে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। সময় কেটে যায়। সুশ্রীর খেয়াল নেই। সে বসেই আছে। রাত একটা। অশেষ ঘরে ঢুকে। টুপি টেবিলের উপর রাখে। জলন্ত সিগ্রেট ছুঁড়ে ফেলে জানালা দিয়ে অশেষ বলে—"একি! এই ভাবে বসে রয়েছে?" সুশ্রী ভুরু জোড়া কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে—"ও মেয়েটি কে?" অশেষ ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটা ইংরাজী নাম করলো। সুশ্রী এবার ভেঙ্গে পড়লো। সেবলে—"তুমি আমাকে এইভাবে ডোবালে!" গলাটা ধরে আসে। স্বর বেরুতে চায়না। অশেষ বলে—"কেউ কাউকে ডোবায় না উশ্রী। আমি একটা ষ্টেশন বদলালাম মাত্র। তোমারওত ক্ষমতা রয়েছে ষ্টেশন বদলের", সুশ্রীর মনে হোল ইঞ্জিনের কয়লার গুঁড়ো তার দু' চোখে এসে পড়েছে। দু' চোখ কিচ্‌ কিচ্‌ করছে। জ্বালা করছে। রঙ্গীন কল্পনার জীবন্ত প্রতিবিম্ব দেখে সে শিউরে উঠল'। বহু পুরানো দিনের পিছনে ফেলে আসা একটা ষ্টেশনের কথা মনে হোল, যাকে সে একদিন হেলায় ত্যাগ করে এসেছিল। আজ কি সেখানে ফিরে যাবার মত সাহসটুকু তার আছে?

বেতার বিভ্রাট

[উত্তর]

সুধীপ্রধান

রূপ-মঞ্চের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বেতার ধর্মঘট নিয়ে আমাদের এক বন্ধু কতগুলি কথা লিখেছেন। লেখক যে শিল্পী সংঘ (Artists' association) এবং শিল্পীদের বন্ধু সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য তিনি সেই জন্যই বোধ করি সংঘ সম্পর্কে দুচারটে মিঠে কড়া কথা খুব সহজেই বলতে পেরেছেন।

প্রথমেই তিনি বলেছেন যে, সংঘ দলবেঁধে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি কারণ সংঘের একজন কর্মীও সংঘ পরিচালনার উপযুক্ত নন। এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপ তিনি একটি সভার উল্লেখ করেছেন এবং তাতে নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণের বা অন্যান্যদের বক্তৃতার অস্পষ্টতা সম্পকে মন্তব্য করেছেন। লেখকের যা মনে এসেছে তাই লিখেছেন, তবু সংঘের একজন কর্মী হিসাবে পাঠকদের অবগতির জন্য আমাকে কিছু বলতে হল।

প্রথমতঃ সংঘ দুইবছরের শিশু। ইতি মধ্যে সে এমন কোন আন্দোলন করেনি যাতে করে কোন রকম সংঘর্ষ কারো সঙ্গে ঘটে। তারপর বাংলা দেশে শিল্পীদের অর্থনৈতিক দাবী নিয়ে সংগ্রামশীল আন্দোলন বোধ করি এই প্রথম হল। কাজেই অভিজ্ঞতা যে কোন কর্মীরই নেই তা বলতে বা মানতে কারো আপত্তি হওয়া উচিত নয়। আমার ধারণা আন্দোলনের মারফতেই নেতা বা নেতৃত্বশালী কর্তৃপক্ষ গড়ে ওঠে। তাই যাঁরা রাতারাতি নেতৃত্ব করতে আসেন তাদের মধ্যে থেকে ২।১ জন বিশ্বাস-ঘাতক বা অক্ষম পরিচালক বেরোবেন এতে আশ্চর্যের কি আছে। রূপ-মঞ্চের লেখকের যদি এই অভিজ্ঞতা থাকে তো তিনি নিজে পরিচালনার মধ্যে এগিয়ে এসে শিল্পীদের তাঁর নেতৃত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং এক হিসাবে ক্ষতি করেছেন বলতে হবে।

শিল্পীদের অর্থনৈতিক দাবী নিয়ে লড়াই করার সংগঠন শুধু বাংলায় কেন সারা ভারতবর্ষে এই প্রথম সৃষ্টি হয়েছে। একটা অস্পষ্ট প্রয়োজনের তাগিদে এবং সারা দেশে জনজাগরণের ঢেউ এ এই আন্দোলনের জন্ম। তবু আঁতুড়ঘরের ছাপ এখনো যায়নি এর গা থেকে। শিল্পীরা ছাত্রও নন এবং মজুরও নন। ছাত্রদের এক একটা কলেজে এক সঙ্গে অনেককে পাওয়া যায়। এক একটা শ্রেণীর নেতাদের অধিকাংশ ছাত্র চেনে। তারপর তাদের কেবল স্কুল বা কলেজ কামাই করলেই হল। পেটের ভাতের জন্য অবিলম্বে বাড়ীতে গোল-যোগের ঝুকি তাদের পোয়াতে হয় না। মজুররাও এক কারখানায় বা একই শিল্পে অনেকে কাজ করে। এক বস্তিতে বা পাশাপাশি বস্তিতে থাকে। অধিকাংশের কাজের অবস্থা এবং বেতনের হার একই রকম। দ্বিতীয়তঃ যে জিনিষ তারা উপার্জন করে তার সঙ্গে তার মনের যোগ থাকেনা।

কিন্তু শিল্পীরা অধিকাংশই প্রত্যেকে এক এক জন। হয়তো আধুনিক ও ক্লাসিকাল গাইয়ের দল হিসাবে দেখা যায়, যন্ত্রী ও অভিনেতা হিসাবে ধরা যায় কিন্তু গুণাগুণ বিচারে প্রত্যেকের দাবী এত রকমের হয়ে পড়ে যে তার মধ্য থেকে সকলের জন্য এক সূত্র খুঁজে বার করা মুস্কিল হয়। তা ছাড়া সমস্ত শিল্পীরা এত দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকেন যে তাড়াতাড়ি একত্র করা মুস্কিল। এবং সর্বোপরি শিল্পীরা যা সৃষ্টি করেন তার সঙ্গে রয়েছে তাঁর অন্তরের যোগ। পয়সাকড়ি না পেলে হয়তো ভাল গায়ক দারোগার চাকুরী করতে যেতে পারেন কিন্তু যিনি একবার জনপ্রিয়তার সাধ পেয়েছেন তিনি অন্য ব্যবস্থার দিকে ঝুকবেন। সংক্ষেপে শিল্পীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন করার সমস্যা সম্পর্কে আমি ২।৪ টা কথা বল্লাম। এবিষয়ে আলোচনা চল্লে ভবিষ্যতে আরো বলা যাবে এবং লেখাও যাবে।

যাই হোক এতগুলি অসুবিধার মধ্যেও এই সংঘ গড়ে উঠেছে এবং বলা যায় যে বেতার ধর্মঘটের সময় জনপ্রিয় না হলেও বোধ করি সকলের কাছে পরিচিত হতে পেরেছে। তার একটা কারণ অবশ্য বেতার কর্তৃপক্ষের কাজের খামখেয়ালির প্রতি সমস্ত শিল্পীর এবং শ্রোতাদের সাধারণ অসন্তুষ্টি।

কিন্তু প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বেতার যন্ত্রীদের কাছে নূতন ষ্টেশন ডিরেক্টরের দেওয়া কাজের মধ্যে নূতন সর্ত। আর গায়কদের প্রোগ্রামে টাকার পরিমান ঠিক রেখে যথেচ্ছ সময় গাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা। এই দুইটিই প্রধান কারণ যার জন্য খুব অল্প সময়ে সমস্ত শ্রেণীর শিল্পীর মধ্যে যতদূর সম্ভব ঐক্য গঠিত হয়েছিল। এইখানে স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, এমন অনেক শিল্পী—যেমন মঞ্চশিল্পী এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন, যাঁদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে সংঘের কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। এই ত্রুটির জন্য সংঘ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমি মঞ্চ শিল্পীদের কাছে ক্ষমা চাই এবং আশা করি সংঘের অন্যান্য কর্মীরাও আমাকে সমর্থন করবেন। কিন্তু আসল কথা তাই নয়। সমস্ত শিল্পীরা দেখতেও যান নি তাঁদের সকলের দাবী আলোচনার মধ্যে উঠেছে কিনা। বহুদিনের এক অন্যায় ও অত্যাচারমূলক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কয়েকজন শিল্পী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাই যথেষ্ট হল, অন্য শিল্পীদের সমর্থন পেতে। মঞ্চ শিল্পীদের এই ধর্মঘটের সমর্থনে নিপীড়িত মানবের সৌভ্রাতৃত্ববোধ। প্রকাশ পেয়েছে। নিজেদের শ্রেণীগত দাবী আছে কিনা তা ভেবে দেখার কথা তখনো ওঠেনি।

অবশ্য এইগুলিই ছিল সংগঠনের দুর্বলতা যা প্রাথমিক অবস্থায় সর্বত্র ঘটে থাকে। এবং ভবিষ্যতে এইগুলি যেমন করেই হোক কাটিয়ে উঠতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণীর শিল্পীর সংগে সংঘের যোগাযোগ—তাঁদের দাবী দাওয়ার সংগে পরিচয় সংঘের চাই। তাই আজ সংঘও সমস্ত শ্রেণীর শিল্পীকে আহ্বান করছে, আপনারা সকলে আসুন, আপনাদের এই শিশু প্রতিষ্ঠানটিকে সবল করে তুলুন।

কিন্তু প্রাথমিক দুর্বলতা নিয়ে এই সংঘ যা করতে পেরেছে তাকে ছোটকরণে সংঘকে শক্তিশালী করা যাবে না। কাজেই ধর্মঘটের সময় যে দাবী তোলা হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। রূপ-মঞ্চের লেখকের বোধ করি স্মরণ থাকতে পারে যে, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের বক্তৃতার পর তিনি নিজে এবং সন্তোষ সেনগুপ্ত মহাশয় আমাকে ধর্মঘট আরম্ভ করার আগেকার ঘটনা এবং ধর্মঘট করা হবে কিনা সে সম্পর্কে বলতে বলেন। প্রকৃতপক্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে সেদিন আমিই ছিলাম প্রধান বক্তা। আমার অক্ষমতার কথা গোড়াতেই স্বীকার করে নিয়ে এইটুকু আমি বলতে চাই যে. সেদিন বক্তৃতার যে note আমি আগে তৈরী করে ছিলাম এবং যে দাবী type করে বলেছিলাম তাও এখনো আমার Fileএ আছে। তাই বলেছিলাম কি ভাবে ষ্টেশন ডিরেক্টর নূতন নীতি প্রবর্তন করতে চান, আমরা কতদিন আপোষ আলোচনা চালাই—আমাদের পক্ষে কি কি যুক্তি আছে—কোন গুলি আমাদের দাবী হওয়া উচিত এবং কেন উচিত। দাবীর যে তালিকা আমরা পড়েছিলাম তাতে আছে সিফট প্রথায় যন্ত্রীরা কাজ করতে পারবেন না। সিফট প্রথা তুলে দিতে হবে এবং যন্ত্রীদের আবার পুরাণো প্রথায় কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে। যন্ত্রীরা বেতারের বাইরেও কাজে যোগ দিতে পারবেন। কোন বেতার শিল্পীকে কর্মচ্যুত করতে হলে একমাসের নোটিশ অথবা একমাসের মাইনা অগ্রিম দিতে হবে। নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে যথেচ্ছ গান গাওয়ানো চলবেনা। শিল্পীদের মূল্য সময়ের দ্বারা নিরুপিত না হয়ে উৎকর্ষের দ্বারা হবে। গায়কেরা কি গান গাইবেন তা তাঁরা নিজেরাই তালিকা করে দেবেন। যিনি যে ধরনের গান জানেন না তাঁকে দিয়ে সেই ধরণের গান গাওয়ানো চলবেনা। অন্যায়ভাবে কোন শিল্পীকে Black-listed করা চলবেনা। কোন শিল্পীকে এইরূপ করতে হলে তাঁকে এবং শিল্পী সংঘকে জানাতে হবে। শিল্পীর মত না নিয়ে কোন Studio-record নেওয়া চলবেনা। শিল্পী কোন প্রোগ্রামে অনুপস্থিত হলে কেবল তাঁর Studio-record বাজানো চলবে—অন্য সময় বাজাতে হলে তার জন্য শিল্পীকে মূল্য দিতে হবে। একই দিনে যদি কোন শিল্পীকে একবারের বেশী প্রোগ্রাম দেওয়া হয়, তা'হলে সমস্ত প্রোগ্রাম গুলির মাঝখানের সময় এমনি কমিয়ে দিতে হবে যাতে করে শিল্পীকে বারবার বেতার ষ্টেশনে না আসতে হয়। মহিলা শিল্পীদের রাত্রে

প্রোগ্রাম দিলে বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। কোন শিল্পীকে ১০৲ টাকার কম পারিশ্রমিক দেওয়া চলবেনা। সংঘ মনে করে যে, বেতার প্রোগ্রাম ভাল করতে হলে ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের ৪৫ মিনিট, আধুনিক ৩০ মিনিট এবং অন্যান্য সঙ্গীতের জন্য ২০ মিনিট এই হারের বেশী কোন শিল্পীকে নিয়োগ করা উচিত নয়। এ ছাড়া Compostion Programme যে শিল্পী পরিচালনা করেন তাঁর জন্য তাঁর Solo-programme এর পারিশ্রমিক থেকে বেশী পারিশ্রমিক দিতে হবে।

এই দাবী গুলির উপর ধর্মঘট চলে এবং এই ধর্মঘটের মীমাংসা করেন শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, তুষার কান্তি ঘোষ, নির্মল চন্দ্র ও বিধভূষণ সেনগুপ্ত। রেডিও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে মিঃ বোখারী সিফট প্রথা ছাড়া অন্যান্য সব দাবীর যৌক্তিকতা প্রথমেই মেনে নেন এবং তিনি "ভদ্রলোকের কথা" দেন যে তাঁর সাধ্যমত তিনি যা করার তা করবেন এবং যে গুলি ভারত সরকারের হাতে আছে সে গুলির জন্য তিনি লেখালেখি করবেন। কিন্তু যে প্রশ্ন নিয়ে সব থেকে সমস্যা বাধে তা হলো সিফট প্রথা। সিফট প্রথায় কাজ করতে হলে যন্ত্রীদের দুপুরের অধিকাংশ সময় বেতার কেন্দ্রে থাকতে হয়, ফলে তাঁরা গ্রামোফোন বা সিনেমাতে যোগদান করে রোজগার করতে পারেন না। বেতার কর্তৃপক্ষ বলেন যে, তাঁরা এই ক্ষতির পুরা না দিতে পারলেও বিশেষ নামকরা বাজিয়েদের মাইনা বেশ কিছু বাড়িয়ে দিতে পারেন। সংঘের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কোন যন্ত্রী এই সর্তে কাজ করতে পারবেনা। কারণ এই ক্ষতি সকলের পক্ষেই হবে, অর্থের দিক থেকে—নামের দিক থেকে এবং শিল্পী হিসাবে সম্ভবনা প্রকাশের দিক থেকে। সামান্য অর্থে একটী শিল্পী বেতারে আটকা পড়ে থাকলো, যতদিন হাত যশ থাকলো, তারপর বেতার তাঁকে তাড়িয়ে দেবেন। কাজেই শিল্পী ভবিষ্যত ভেবে তাঁর সুনামের দিনে যথাসম্ভব নিজেকে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে চান এবং তাঁদের আনন্দের দানও যথাসম্ভব পাওয়ার আশা করেন। এইখানে সালিশীরা একটা কথা তোলেন। তাঁরা বলেন, "কোন Employer তার নিজের সর্তে লোক রাখতে পারে সেই সর্ত ভাল না লাগলে কাজ করনা।" তাঁরা দেখাতে চান যে বেতার কর্তৃপক্ষ এই সর্তে অনেক বাজিয়ে পাবেন। তাঁরা অবশ্য প্রথম শ্রেণীর না হতে পারেন কিন্তু তাঁরা কাজ চালাতে পারবেন। আমরা তখন বলি যে, যেদিন ঐ বাজিয়েরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করবেন সেই দিন তাঁরা আবার এই সব দাবী তুলবেন। এই কথাটী সালিশীরা মানেন। তাই তাঁরা মীমাংসা করেন যে, বেতার কর্তৃপক্ষ অপেক্ষাকৃত নূতন বাজিয়ে রাখবেন এবং তার সঙ্গে পুরানো বাজিয়েদেরও রাখবেন তাঁদের সর্তে। অর্থাৎ সিফট প্রথার অকাট্যতা সম্পর্কে যে যুক্তি বেতার কর্তৃপক্ষ উত্থাপিত করেন, তা খণ্ডিত হয়ে যায় এবং আমরাও যে বলেছিলাম কোন শিল্পী এইভাবে কাজ করতে পারেন না, সে যুক্তিরও কিছু পরিবর্তন সাধন করতে হয়। অর্থাৎ নূতন বাজিয়ে কিছু কালের জন্য এই প্রথায় কাজ করতে পারেন। সেই সময় স্বভাবত তাঁদের সিনেমার বা গ্রামোফোনের কাজ করার সুযোগ কম থাকে। এটা মেনে নিতে হয়।

কাজেই আপোষ যখন হ'ল তখন নূতন ও পুরাতন দুই দল নিয়ে কাজ করতে হবে তা মানতে হ'ল। বেতার কর্তৃপক্ষ যে ইচ্ছা করে মানলেন, একথা বলি না। তাঁরা বরং এই ব্যবস্থাকে অচল করার জন্য অনেক কিছু করবেন এবং এখনো করছেন। আমরা জানি এখনো সমস্ত শিল্পীকে ডাকা হয় নি, এখনো অনেক শিল্পীকে ৫৲ টাকা দিয়ে ৩০।৪০ মিনিট প্রোগ্রাম করানোর চেষ্টা চলছে। এখনো যিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারেন, তাকে বাউল ও ভাটিয়ালি গাইতে দেওয়ার প্রোগ্রাম পাঠানো হয়েছে এবং নানাধরণের প্রচার করে সংঘ ভাঙ্গার চেষ্টা চলছে। চুক্তি করার পরদিন থেকেই চুক্তি ভাঙ্গার চেষ্টা হয়েছে এর নজির আছে। রূপ-মঞ্চের কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকলে ভবিষ্যতে আরো ভাল করে এবিষয়ে লেখা যাবে। যাই হোক যখন দেখা গেল

কার্যতঃ ধর্মঘট কোন যন্ত্রীদের ব্যাপার নিয়ে চলছে এবং তাঁরাই চালাচ্ছেন, যখন দেখা গেল পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ব্যক্তিগত চেষ্টায় বেতার কর্তৃপক্ষ গায়কদের মনে ভরসা জাগাতে পেরেছেন এবং তাদের অধিকাংশ দাবীকে স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন আমাদের সম্মানীয় সাল্লিশীদের কথায় ও তাঁদের ভরসায় আমরা ধর্মঘট বন্ধ করি। তবু ধর্মঘট শেষ করার দিন কার্যকরী সমিতির প্রধান বক্তা হিসাবে এবং তারপর আর একটি সাধারণ সভাতে এটা আমি বলতে আদিষ্ট হয়েছিলাম যে, আমরা বেতার কর্তৃপক্ষের কথাতেই শুধু ভরসা করছিনা, ভরসা করছি আমাদের সংঘ-শক্তির উপর এবং জন সাধারণের সমর্থন থাকলে শুধু বেতার কর্তৃপক্ষ কেন গ্রামোফোন বা সিনেমা যেখানেই শিল্পী নিগৃহীত হবে সেইখানেই সংঘের শক্তি তার বিরুদ্ধে লড়বে। যদি এক বা দুই জন সংঘের আদর্শ সবক্ষেত্রে না মেনে থাকেন, সালিশীর কাজ করতে গিয়ে যদি কেউ চাকুরীর চেষ্টা করে থাকেন বা ধর্মঘট পরিচালনার মধ্যে গিয়ে যদি সংঘের দুর্বলতা দেখে কেউ নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সর্বসাধারণের স্বার্থ ভুলে যান তাতে সংঘের খুব বেশী ক্ষতি হবে না যদি অধিকাংশ শিল্পীর সমর্থন সংঘের প্রতি থাকে।

কর্তৃপক্ষের কথা আমারা বিশ্বাস করিনি, করেছিলাম নিজেদের শক্তিতে। এই শক্তিতে এতগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন ধরণের শিল্পীকে এক করে কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের প্রোগ্রাম বানচাল করে দিয়েছিলাম। জনসাধারণের সামনে শিল্পীর সংগ্রামশীলতার পরিচয় ঘটিয়েছিলাম এবং তার মধ্যে থেকে কয়েকজন অক্লান্ত কর্মীর সাক্ষাত শিল্পীরা পেয়েছেন এটা বড় কম কথা নয়—একটা নূতন সংগঠনের পক্ষে। এখন দরকার হল এই যা পাওয়া গেছে তাকে কাজে লাগানো। বেতার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের যা চুক্তি হয়েছে তা ছাপিয়ে আমরা প্রত্যেক শিল্পীকে পাঠিয়েছি। তাতে বলেছি, তাঁদের যে কোন অসুবিধা হলে সংঘে আসবেন এবং আমাদের জানাবেন তাঁদের অভিযোগের কথা, গায়করা খারাপ বাজিয়ে দেখলে জানাবেন আমাদের। বেশীক্ষণ গাইয়ে বা বাজিয়ে অল্পপয়সা দিতে চাইলে জানাবেন এবং কোন শিল্পী কিছুতেই ৫৲ টাকার প্রোগ্রাম নেবেননা—এই ধরণের প্রোগ্রাম নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। সব সময়ে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকবেন এবং সংঘের মারফতে সকলে মিলে যাতে প্রতিকার করা যায় তার চেষ্টা করবেন।

রূপ-মঞ্চের লেখককে জানাচ্ছি যে এছাড়া যদি অন্য কিছু উপদেশ থাকে তো তিনি আমাদের দিতে পারেন, আমরা সানন্দে তা শুনবো। কিন্তু একটা কথা আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, শিল্পীরা সারা কলিকাতার বাইরে ছড়িয়ে থাকেন, তাঁদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করার জন্য যে কর্মী দরকার তাই আমাদের এখনো নাই এবং সেইটা যতক্ষণ করার লোক পাওয়া যাচ্ছেনা ততক্ষণ অনেক ভাল কাজ হচ্ছেনা, এটা আমরা জানি তবু সংবাদপত্র মারফত যদি শিল্পী ও জনসাধারণের দরদী আলোচনা চলে তাহলে আমরা খুসী হব।

বেতার বিভ্রাট

(জিজ্ঞাসা)

মিষ্টভাষী

শিল্পী সংঘের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুত সুধীপ্রধানের কাছ থেকে আমরা একটা চিঠি পেয়েছি। এ চিঠিটা আমাদের 'বেতার বিভ্রাট' সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধের জবাব। পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য সুধীপ্রধানের পুরো চিঠিটা আমরা এই সংখ্যাতেই ছাপলুম। সুধীপ্রধান খুঁটিনাটি করে শিল্পী সংঘের দাবী দাওয়া সম্বন্ধে জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে যদিও বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে শিল্পী সংঘের মত বিরোধের কারণ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তবুও সুধীপ্রধানের এই চিঠিটা বর্তমানে ঘটনাটি আর একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবে বলে আমাদের ধারণা।

সুধীপ্রধানের কয়েকটি কথার জবাব আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার রূপ-মঞ্চে শিল্পী সংঘের সভা পরিচালনা নিয়ে সমালোচনা করেছিলাম। বলেছিলাম, শিল্পীসংঘের একজন কর্মীও সংঘ পরিচালনার কাজের উপযুক্ত নন্। সে কথা আমি আজো বল্‌ছি। যেভাবে কর্মসূচি তৈরী হ'য়ে সাধারণত সভার কাজ চলে, শিল্পীসংঘের সভা সেভাবে পরিচালিত হয়নি। এবং এই না হবার দরুণই শিল্পীসংঘের দাবী পুরোপুরি ভাবে মেটেনি। আমি বলতে চাই যে, শিল্পী সংঘের সভা অ-সাধারণ ভাবে পরিচালিত হয়ে ছিল। এই খাপছাড়া পরিচালনার ত্রুটির জন্যে শিল্পী সংঘের জয় হয়নি। সমালোচনা করার অধিকার আমার আছে, অতি নগণ্য হলেও নিজেকে আমি শিল্পী বলে দাবী করতে পারি। শিল্পীসংঘের জয় আমার ও আমার অন্যান্য শিল্পীবন্ধুদের জয়। শিল্পীসংঘের হার, অন্যান্য শিল্পীদের মত আমারও হার। বর্তমানের পরাজয় যাতে ভবিষ্যতের ঘোরতর পরাজয়ের সূত্রপাত রূপে পরিগণিত না হয়, তার জন্য যে সাবধানতা গ্রহণ করা দরকার, আমার প্রথম প্রবন্ধে তারই ইঙ্গিৎ ছিল। শিল্পীসংঘের ওপর কোনা অন্যায় আক্রমণ ছিল না। সুধীপ্রধানের বুঝতে ভুল হয়েছে।

সমগ্র শিল্পীসমাজের মঙ্গলের জন্য আমরা শপথ গ্রহণ করতে চাই। সেই শপথ অনুযায়ী কাজে যোগ দিতে চাই। যেখানে শিল্পীদের ওপর অবিচার হবে, সেখানে আমরা একতাবদ্ধ হয়ে প্রতিকারের দাবী করবো। সুধীপ্রধান আমার সমালোচনার মর্ম বুঝতে না পেরে আমাকে সংঘের পরিচালক হিসাবে যোগদান দিতে আহ্বান ক'রেছেন। কিন্তু এ কথা তাঁর বোঝা উচিত যে সমালোচক স্রষ্টা নয়, স্রষ্টার কাজের ত্রুটি নিয়ে সমালোচনাই তাঁর কাজ। এতে স্রষ্টার ভুলত্রুটি বর্জনের সম্ভাবনা থাকে। সংঘের নেতৃত্বের গলদ দেখিয়েছি ব'লেই নেতৃত্ব গ্রহণের মত যোগ্যতা অর্জন করিনি।

সুধীপ্রধান দরদী সমালোচনা চেয়েছেন। শিল্পীদের ওপর আমাদের আন্তরিক দরদ আছে ব'লেই, শিল্পী সংঘের কর্মপরিচালনার ত্রুটির কথা উল্লেখ ক'রেছিলাম। কেননা সংঘের কাজের গলদের জন্যই সমগ্র শিল্পী তাঁদের ন্যায্য মর্যাদা পান্‌নি। যে উনিশজন যন্ত্রী নিয়ে এবারকার হাঙ্গামা শুরু হ'য়েছিল, তাঁরা কি তাঁদের পুরো দাবী মিটিয়ে নিতে পেরেছেন? আমি যতদূর জানি তাঁরা তা পারেননি। এর কি প্রতিকার কিছু নেই, প্রতিকার অবশ্যই আছে। সংঘের কাজ সুপরিচালনা দ্বারা সংঘকে শক্তিশালী করে তোলা। শিল্পীসংঘ শিশু প্রতিষ্ঠান ব'লে বরাবরই যেন শিশুসুলভ চপলতা না করে, দিনে দিনে তার শক্তি ও সামর্থ যেন বাড়ে, তার কথার ও কাজের মধ্যে দায়িত্বশীলতা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এই আমাদের আশা। শিল্পীসংঘের শক্তির ওপর শিল্পীদের ভাগ্য ও স্বার্থ নির্ভর করছে—শিল্পীরা জনে জনে এবং শিল্পীসংঘ যেন একথা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের পরিচালক (ষ্টেশন ডিরেক্টর) মিঃ বোখারী এখানে আসার পর থেকে গোলযোগ শুরু হয়েছিল। শুনছি, তিনি নাকি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন (এই প্রবন্ধ ছাপা হবার মধ্যে তিনি হয়ত

চ'লে যাবেন)। সেখানে আবার যিনি আস্‌ছেন তিনি নতুন কোন গোলমাল শুরু করবেন কিনা বলা শক্ত। যদি করেন, শিল্পীসংঘ সে পরিস্থিতির সম্মুখে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার মত মজবুত প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে কিনা আমাদের জানার ইচ্ছা। এখানে প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার যে কলকাতা বেতার কেন্দ্র—বাঙ্গালার বেতার কেন্দ্র। বেতার কেন্দ্রকে অনেকটা শিল্পের ও কৃষ্টির কেন্দ্র বলা যায়। কিন্তু সেই কেন্দ্রের পরিচালক হিসাবে কোনো বাঙ্গালীকে দেওয়া হয়না কেন? বাঙ্গালীর নাড়ীর সঙ্গে যোগ আছে, বাঙ্গালীর চাহিদার সঙ্গে পরিচয় আছে, বাঙ্গলার জনগণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এমন বাঙ্গালী কি বাঙ্গলা দেশে নেই? শুনছি, নতুন পরিচালক যিনি আস্‌ছেন (বা ইতিমধ্যে এসেছেন) তিনিও অবাঙ্গালী। শিল্পীসংঘের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া দরকার। বাঙ্গলার জনসঙ্গীতের পদ এই সব অবাঙ্গালী দ্বারা বোঝা কঠিন। বাঙ্গলার সেন্টিমেণ্টের খোঁজ এঁরা পাবেন কি করে। বাঙ্গলা গানের পদ ইংরিজি ক'রে তাঁদের বোঝাতে হয় বেতার কেন্দ্র সম্বন্ধে বাঙ্গলায় সমালোচনা হ'লে তাঁদের চোখে সেটা পড়েনা। এবং একটা প্রতিকার হওয়া দরকার।

বিকাশচন্দ্র রায়ের নাম শুনেছেন? ইনি কলকাতা বেতার কেন্দ্রের একজন কর্মী ছিলেন। শিল্পীসংঘের যখন বেতারের সঙ্গে অসহযোগিতা হয়েছিলো, তখন এই বিকাশচন্দ্র রায়ই শিল্পীদের বিরুদ্ধে অনেক কটুক্তি ক'রেছিলেন ব'লে আমরা শুনেছি। এই বিকাশ রায় নাকি বেতার কেন্দ্রের থেকে পদত্যাগ ক'রেছেন। কারণ? যিনি শিল্পীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁদের তীব্র সমালোচনা ক'রেছিলেন বলে গুজব, তিনি তাঁর কাজে বাহাল থাকতে পারলেননা কেন? নিশ্চই এর পিছনে রহস্য আছে। সে রহস্য ভেদ করা কি কঠিন? কেন্দ্রের যে-কর্মী এক বা দেড় মাস আগে কেন্দ্রের তরফ থেকে শিল্পীদের কটুক্তি ক'রেছিলেন, আজ তিনি সেখানে টিকতে পারলেননা। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে, কেন্দ্রের অভ্যন্তরে কিছু একটা গোলমাল আছে। সেটা কি? বিকাশবাবু তো আজ সে কথা বলতে পারেন। তা'হলে শিল্পী-সংঘ যে নব পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত হ'যে নিতে পারে। বিকাশবাবু কিছু বলবেন কি? যদি বলেন। তবে আমার কাছে লিখে পাঠাবেন। আমার ঠিকানা আগে ও জানিয়েছি C/O সম্পাদক, রূপমঞ্চ। তা'হলে আমরা পাঠক-পাঠিকাদের উৎসুক্যও মেটাতে পারব। আর একটা কথা। সুধীপ্রধান তাঁর চিঠিতে অনেক ঘটনা পরিষ্কার ক'রেছেন। কিন্তু একটা মুখ্য ব্যাপারের কোনো ইঙ্গিৎ দেননি। সংঘের কর্মী হিসেবে তিনি কি জানাবেন, যাঁরা শিল্পিসংঘের মর্যাদা নষ্ট ক রেছেন—শিল্পীদের ইজ্জৎ হানি ক'বে বেতারের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রেছেন—তাঁদের সেই সুবিধাবাদীতার জন্যে কি সাজার ব্যবস্থা শিল্পীসংঘ করছেন? গতবার এই সুবিধাবাদীদের নামের তালিকা দিয়েছি। কিন্তু ভুলক্রমে তিনটি নাম সেবার বাদ গিয়েছিল যথা শ্রীযুক্ত বিমান ঘোষ, শ্রীযুক্তা আঙ্গুরবালা ও শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা। নতুন ক'রে এবার পুরো তালিকা আবার দিলাম।

১। রথীন রুদ্র। ২। সৌরেন রায়। ৩। পৃথ্বীশ মুখার্জি ৪। কান্তি বল। ৫। বেচু দত্ত ৬। রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭। অণিমা মিত্র ৮। আঙ্গুর বালা ৯। দীপ্তি ঘোষ ১০। অমিয়া রায় ১১। ইন্দুবালা ১২। মীরা চাটার্জি ১৩। লীলা দেবী (রায় নয়) ১৪। বিমান ঘোষ।

এঁদের বিরুদ্ধে শিল্পীসংঘের নির্দেশ আমরা শোনার জন্যে উৎসুক। আমাদের পাঠকপাঠিকা এঁদের চিনে রাখুন। এঁরা বে-দরদী শিল্পী, এঁরা সুবিধাবাদী। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এঁরা লালায়িত। এঁরা সমগ্রভাবে শিল্পীর স্বার্থের দিকে নজর না দিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে বেতারের দলে ভিড়েছিলেন। শিল্পী সংঘের সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে দিয়ে এরা আজ বেতার কেন্দ্রের শিল্পী পদে উন্নীত হ'য়ে নিজেদের সৌভাগ্যবান ও বতী মনে করছেন। এঁদের সে সৌভাগ্য চুর্ণ করা দরকার। সুধীপ্রধান তাঁর চিঠিতে বলেছেন যে, বেতার কেন্দ্রের কাজ বানচাল ক'রে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আমি বলি, বানচাল করতে ঠিক তিনি পারেননি উপরোক্ত চৌদ্দজন গাইয়ের জন্যে। এঁদের বিপক্ষে কি নীতি গ্রহণ করছেন, শিল্পীসংঘ জানাবেন কি? আমরা অধৈর্য ও ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছি।

কর্ণ

(প্রাচীন নাটক)

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যাচার্য

(পরশুরামের আশ্রম)

কর্ণ, পরশুরাম ও অন্যান্য ছাত্রছাত্রী বৃন্দ

পরশুরাম। আজি তব শিক্ষা সমাপ্তির দিনে, এক
প্রশ্ন তোমারে শুধাবো আমি, বৎস সেই
সে প্রশ্ন অন্তরতলে দিবস রজনী
ধরি' উদ্বেলিয়া হানিছে অধরদ্বারে
উন্মত্ত প্রবাহ তার, তবু বাঁধ ঝাঁপি'
কভু বহেনি অবাধ স্রোতে, অহর্নিশা
রুধিয়াছি বিকল প্রানান্ত বলে, তবু
সন্দেহ সংশয় ক্রুর ফেনায়িত হয়ে
অধীর কল্লোল তুলি' সৈকতের রূঢ়
রুক্ষ নিমিষের মুখোমুখি হ'য়ে
তুলিছে মুক্তির দাবী, তবু মাঝে মাঝে
ছলকিয়া উঠিয়াছে, ব্যাকুল জিজ্ঞাসা
মোর, তাই বারে বারে শুধায়েছি তোর
গোত্রের সংবাদ, লভিয়াছি অর্থহীন
উদাসীন মূঢ় প্রত্যুত্তর, অতৃপ্ত সন্ধান
মোর মাঝে মাঝে অকস্মাৎ উঠিয়াছে
জ্বলি, নিভিয়াছে নিমেষেই অনাসক্ত
নিরুচ্ছাস কথনে তোমার—

কর্ণ। ভগবন,
ক্ষীনতম নাহিক স্মৃতির লেশ চিত্তে
মোর, কোনদিন সঙ্কুচিয়া ফিরে যাবে
ত্রাসে কলঙ্কের পঙ্ককুণ্ডে ক্লেদলিপ্ত
অপরাধ, ব্যথিত শঙ্কায় তব পদ
তলে আজীবন সেবিয়াছি অকৃত্রিম
বহিয়াছি সকল প্রশ্নের তব যথা
সাধ্য যথাজ্ঞাত সদুত্তর মোর, আজি
বিদায়ের দিনে কহ কি আছে তোমার
মনে, বেদনার মত অব্যক্ত বিপুল
দিয়াছে অজস্র পীড়া পেষনে অধীর
আজি উঠিছে বিদ্রোহী হয়ে মত্তপ্রায়
দুর্বিসহ ক্ষোভ।

পরশুরাম। শত প্রশ্ন শঙ্কাহারা
প্রশ্নি সম রুধিয়াছে শতবার ধারা
আবেগের, করুণার, স্নেহের, প্রীতির
ক্ষনেকের অকুণ্ঠিত অবারিত শুভ্র
উদ্দাম শ্রদ্ধায় ভাসিয়া গিয়াছে দূরে
পরক্ষণে আবার সংশয় নাহি জানি
উদ্বেলিয়া শতস্রোতে উঠিছে চঞ্চলি'
মুখর অধীর, কুণ্ঠায় জড়িত তবু
দ্বিধায় শাঙ্কিল, তবু একেবারে আজি
দ্বিধাহীন নির্লজ্জ বিষাদ তার স্ফীত
হয়ে জিজ্ঞাসিছে, যাহারে দিয়েছ স্নেহ
সে কাহার স্নেহের পীযুষধারে পূর্ণ
পরিপূর্ণতায় নিয়াছে তোমার প্রীতি
অকৃপণ, অকুণ্ঠ অসীম—আজি কহ
তোমারে শুধাই, কেবা তুমি, কোন কুলে
জন্ম তব, এই অপরূপ উদ্ভাসিত
তরুণ সৃষ্টির অপূর্ব সৌভাগ্যবান
স্রষ্টা তব কোন মহাজন, কহ মোরে
কে বা তব গোত্র অধীপতি, কোন পুণ্যে
ঋকচ্ছন্দে অনশ্বর সত্য বাণী সুধা
স্নিগ্ধ ছন্দযায় গাহিয়াছে সুমহান
প্রণব ঝঙ্কার মঞ্জু মহিয়ষী গাথা।

কর্ণ। শত রূপান্তরে অপরিবর্তিত রহে
সত্যের স্বরূপ, শত প্রশ্ন শতবার
একটী সংশয় আঁকি গিয়াছে বিবিধ
ছন্দে বিবিধ সরনি ধরি' এক লক্ষ্য
পানে আপনার অলক্ষিত দূরে, প্রভু
পরিহাস কর নাই অলক্ষে আমারে
লয়ে নিত্যদিন, যথার্থ কাহিনী মোর
লোক মুখে প্রতিবেশী স্বজনের পাশে

শুনিয়াছি অদ্বিজ শোণিতে হয় নাই
পরিপুষ্ট অঙ্গ মোর, নাহি জানি আর
কিছু, কোন কালে কোন অন্ধকার গৃহ
কোণে মাতৃজঠরের উত্তান আশ্রয়
হতে বঞ্চিয়াছি জীবনের একমাত্র
উত্তরাধিকার বংশপরিচয় হায়
প্রভু নামহীন, গোত্রহীন জাতিকুল
সমূহ প্রবোধহীন জন্মিয়াছি কবে
নাহি জানি বিন্দুমাত্র যাথার্থ তাহার,
শুধু জানি জননীর পুষ্ট অঙ্গ হ'তে
যে ধাত্রী আমারে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল
ছিন্ন সে করেছে মোর সর্ব পরিচয়
জানি সাড়ম্বরে উদাত্ত উৎসব শঙ্খ
দিগন্তর শীহরিয়া গভীর নিঃস্বনে
গাহে নাই আগমনী মোর।

পরশুরাম। থাক্ থাক্
আজি তব বিদায়ের দিনে আর আমি
শুধাবো না পিতৃপরিচয় তোর, যে বা
হও ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কিম্বা নীচ অতি
অতিম্লান শুদ্রের সন্তান, তাহে কোন
ক্ষতি নাই, নাম শুধু আবরণ অতি
ক্ষীণ দুর্বল বন্ধন রজ্জু, বেঁধে রাখে
জীবনেরে আজীবন অচ্ছেদ্য বন্ধনে
নামচিহ্ন মানবের ব্যর্থ অহঙ্কার
অবন্ধন প্রবাহের বিফল বন্ধন
বন্ধন প্রয়াসে রটে নামের দুর্নাম।

কর্ণ। আশীর্বাদ কর প্রভু নামসার
সারমেয় সম আবর্জনাস্তূপে যেন
নাহি রয় প্রবৃত্তি আমার, আমি যেন
নাম আবরণ ভস্ম করি' বিশ্বলোকে
জাগিয়া উঠিতে পারি উদ্দীপ্ত গৌরবে
প্রখর কিরণস্বরে জর্জরিয়া পূর্ব
পরিচয় ভূক রোমন্থনে সুখসুপ্ত
মেদস্ফীত ক্লীব ভগ্নজানু আভিজাত্য পরে।

পরশুরাম। বৎস, এ, আশ্রমে আবার আসিবে
যবে ক্ষত্রিয় রুধির লিখা জয়টীকা
পরি প্রদীপ্ত ললাটে তব শরতের
শুভ্রমেঘে আরক্ত মধ্যাহ্নে রেখা দীপ্ত
ভাস্বর ভাস্কর রেখা ক্ষত্রিয় রুধির
রক্ত-চন্দনে ত্রিপুণ্ড্র আঁকি অমলিন
উদ্ধত গর্বিত ভালে, তাদের কর্কশ
কৃষ্ণ স্নায়ু উপবীত পরি' নিঃক্ষত্রিয়
ধরিত্রীর পরে, লব আমি প্রাপ্য মোর
সেই দিন গুরুর দক্ষিণা।

কর্ণ। আশীর্বাদ
কর মোরে মনস্কাম পুরাব তোমার
ক্ষত্রিয় নিধনতরে ধনুর্বেদ শিক্ষা
করি ক্ষত্রকুল ধ্বংসসত্রে যেন রহি
নীলাম্বর পুরোহিত স্থির অবিচল
উদ্গত সাধনা চির সমুদ্রের মত
অপূর্ব অপরিশ্রান্ত মন্ত্র কলস্বনে।

পরশুরাম। আজি পড়িতেছে মনে বহুপূর্ব গত
ইতিহাস, সেদিন প্রভাত রবি ধূম্র
মেঘে তখনও জ্বালেনি তার হোমবহ্নি
শিখা, তখন কিশোর এলো সন্তর্পনে
প্রভাত শিশির ধৌত অপরাজিতার
মত অকস্মাৎ ধ্বনিয়া উঠিল মোর
আঁধার প্রাঙ্গনতলে নবীন কামনা
সেই দিন ব্যগ্রচিত্তে অনন্ত উৎসাহে
নীরবে পড়িয়াছিনু কোন অনাদ্যন্ত
মধ্যাহ্নে গগনচুম্বি আকাঙ্খার সুপ্ত
ইতিহাস, সে যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল
যুগ যুগ ধরি মোর রূঢ় করস্পর্শে
অপরূপ জাগরণ তার, বহু যত্নে
একে একে শিখায়েছি নিত্য একবিংশ
নিঃক্ষত্রিয় সংগ্রামের লব্ধ অভিজ্ঞতা
বহু পরীক্ষিত অভ্রান্ত কৌশল মোর—
কে জানিত, সে দিনের সেই সরল

কোমল কিশোর তনু আজি হবে বজ্র
সম সুকঠিন, সেই দিন বিপ্রপুত্র
কম্রকরে পুনর্বার ধনুঃশর ধরি'
খড়্গ বর্ম-শেল প্রাণপণে দিনে দিনে
শিখায়েছি তোরে অতিগূঢ় সকলের
একান্ত অপরিজ্ঞাত লুপ্ত লুক্কায়িত
প্রহরণ-বেদ, অপূর্ব মেধাবী শিশু
মুহূর্তে শিখিয়া লয় কি আগ্রহে পূর্ব
জন্ম অধিকারে অত্যন্ত জটিল অতি
গূঢ়তত্ত্বকথা, কেমনে বুঝিতে নারি।

কর্ণ। বিন্দুমাত্র নাহি তাহে গৌরব আমার
অরাতির বক্ষ যবে ভেদ করে শূল
দুন্দুভিগর্জিত ঘন সংগ্রাম প্রাঙ্গণে
কতটুকু কৃতিত্বের ন্যায়মতে দাবী
তার শত্রুবিনাশের চরিতার্থতায়
আপনার জড়ত্বের অহঙ্কারে কভু
যদি বা গর্জিয়া উঠে শাণিত ভাষায়
অপ্রকৃত মর্যাদার অর্থহীন দাবী
ততটুকু ব্যর্থ হয়ে যায় শূলহস্ত
বীরহৃদয়ের ভাষাহীন স্তব্ধতার
আত্মমগ্নতায়, তারি মত প্রভু
আমারে করেছ কৃতী তাই আমি কীর্তি
পথগামী, তোমারি কৃতিত্ব প্রভু মোর
সার্থক পথিক সনে দূরে চলিবার
অব্যাহত পুণ্য অধিকার, এখনও সে
নামে নাই পথে, বদ্ধপরিকর নাহি
চলে আপনার লক্ষপানে স্থির ধীর
অবিচল, আজিকে প্রভাতে আয়োজন
তার দূর অভিযান লাগি জ্বালায়েছে
লক্ষ লক্ষ বহু পুরাতন গরীয়ান
পথিকের বহুপূর্ব দৃঢ় ব্রতস্মৃতি
সাফল্য মণ্ডিত বিশ্বশ্রুত কীর্তি
আজি নবীন কর্তব্য মাঝে মেলিতেছে শিখা।

পরশুরাম। আজীবন মহাব্রত সাধিয়াছি
আমি, তিলে তিলে আপনারে নিঃশেষিয়া
দুঃসাধ্য সাধনা মাঝে বনস্পতি যথা
প্রতি পত্রে প্রতি বৃন্তে প্রতি পুষ্পলতা
কিশলয়ে সংসারিছে স্নিগ্ধ মুঞ্জরন
ঝড় ঝঞ্ঝা সহি' মধ্যাহ্নে অনল বহি'
দুঃসহ ব্যথায় মোর জীবন সত্যের
অশ্রান্ত প্রতীক, জানো বৎস যুগ যুগ
বসুমাতা বক্ষে বহিতেছে নিত্যদিন
সাশ্রু বেদনায় অহঙ্কারী ক্ষত্রিয়ের
অনার্য আচার—বেদবিধি লুপ্তপ্রায়
ভারতের ভারতীর বুকে হানিয়াছে
প্রখর লাঞ্ছনা তার ব্যর্থ অভিমানে,
একদিন তাই শাস্ত্র চর্চা পরিত্যাগ
করি' ধনুঃশর লয়ে বাহিরিনু বিশ্বে
এত অপমান লাঞ্ছনার প্রতিকার তরে
ধরিত্রীরে বার বার একবিংশ
নিঃক্ষত্রিয় করি সাধিয়াছি মোর
সাধিত-অসাধ্য ব্রত, অকস্মাৎ কবে
একদিন জীবনের ম্লান সন্ধিক্ষণে
হেরিলাম আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি কবে
রাখি নাই বারতা তাহার, জরাতুর
ক্ষীণ অকস্মাৎ জাগিল অন্তরতলে
ধীরে ভূকম্প সংঘাতে বহু পরিত্যক্ত
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতৃষ্ণা অনন্ত অতৃপ্ত
ব্যথা, শেষ নাই, সীমা নাই, কোনদিন
নাহি জানে হৃদয়ের মাঝে আপনারে
প্রাণের প্রাচুর্য লয়ে বিদ্যুত চমক
রাগে ঝলসিয়া প্রাণের আঁধার ঘোর
অতি ধীর, অত্যন্ত মন্থরতায় মন্দ
মন্দ জাগরণ ধ্বনিল হৃদয়তলে
একদিকে ক্ষত্রিয় নিধন ব্রত অন্য
দিকে সহসা জাগ্রত মোর অন্তরে
অসীম বেদনা উদ্ধত গর্জনে আর

নীরব ক্রন্দনরোলে উচ্ছসিল মোর
শব্দহীন রোদনের কূলে কূলে শুষ্ক
গরজিত কল্লোলের উন্মত্ত তরঙ্গ ভঙ্গ।

কর্ণ। হে ব্রাহ্মণ, পবিত্র মহান একি
একি অপরূপ বাণী আজি শুনিলাম
বিদায়ের দিনে প্রতিদিবসের সূর্য
হেরিয়াছি এতদিন আমি যেন শেষ
শরতের অস্পষ্ট কুহেলি লয়ে ম্লান
রচিয়াছে অপার রহস্যময় দীপ্ত
অন্ধকার, আজিকার নবরৌদ্র করে
অকস্মাৎ উদ্ভাসিল পল্লব প্রচ্ছায়
ঘণ যুগান্তের মূর্চ্ছিত তিমির রাত্রি।

পরশুরাম। বৎস, ভুলে যাও, ভুলে যাও দীন হীন
ব্রাহ্মণের দৌর্বল্য বিকার। আয়, আয়
পুত্র কোলে আয়, প্রাণ দিয়ে তোরে আমি
বাসিয়াছি ভালো স্নেহমুগ্ধা জননীর মত
স্নেহাতুর অতিবৃদ্ধ পিতার মতন—
পিতা হয়ে মাতা হয়ে পিতৃমাতৃহীন
বালকেরে ঢালিয়া দিয়াছি মোর সর্ব
স্নেহ সর্ব আশা, বিপ্রবংশজাত তুমি
সুনিশ্চয়, হে তরুণ অমল গৌরাঙ্গ
কান্তি ঐ তেজ ঐ দীপ্তি ঐ দৃপ্ত
দেহতটে উচ্ছলিত প্রাণের উল্লাস—
মিথ্যা, মিথ্যা, মোর সন্দেহ সংশয় দ্বিধা
আয় বৎস কোলে আয়, তুই মোর নিঃস্ব
বার্ধক্যের শেষ তীর্থ পুণ্য বরুনাসী
তবু, তবু পুত্র আবার শুধাই তোরে
কেহ কি রে জীবিত নাহিক আর জন
প্রাণী তোর জনমভূমির দেশে, যদি
একবার কোন মতে জানিবারে পারো
একবার, শুধু কোন কূলে জন্ম তব
না, না, থাক, থাক, যে বা হও হে অজ্ঞাত
তুমি মোর অন্তরের সর্বস্নেহ সুধা
লুণ্ঠিয়া লয়েছে আজি দস্যুর মতন
কিসের সন্দেহ তবু কিসের সংশয়
জগদ্দল পাষাণের মত গুরুভারে
গড়ায় অন্তরতলে, নিষ্ঠুর পেষনে
চূর্ণ চূর্ণ করি অবাধ্য সংশয় দ্বিধা—
যদি কোন মতে জানিয়া আসিতে পারো
তব জন্ম কাহিনীর অতি ক্ষীণ অতি
দীন দুর্বল সংবাদ, কিম্বদন্তি কিম্বা
ক্ষীণতম জনশ্রুতি, কোন অতিলঘু
লোককথা অর্থহীন ভঙ্গুর আশ্রয়
সেই মোর বরণীয় রমনীয় অতি
নিরালম্ব প্রাণ ধারণের একমাত্র উপাদান—

জনৈক ছাত্র। ভগবন কে, এক দর্শন প্রার্থী বহু
দূর হতে আসিয়াছে গোপন মন্ত্রনা
তরে, কিবা তব অভিলাষ নিবেদিব তাঁরে?

পরশুরাম। অপেক্ষা করিতে বল, অবিলম্বে
সাক্ষাৎ লভিবে মোর (কর্ণের প্রতি) সুচিন্তিত
স্থির অভিপ্রায় অভিপ্রেত একান্ত আমার।
(প্রস্থান)

কর্ণ। (দূরে জনৈক বৃদ্ধের প্রতি লক্ষ করিয়া)
একি হেরি অদূরে আমার অদৃষ্টের
লোলচর্ম অস্থিসার পক্ক কেশ শুষ্ক
বার্ধক্যের জরাজীর্ণ জীবন্ত কৌতুক
(বৃদ্ধের প্রবেশ)
চাহিওনা, চাহিওনা মোর পানে অতি
হিম নিহার করকাঘাতে আকাঙ্ক্ষার
মর্ম লক্ষ্য করি, যাও দূরে সরে যাও
সহিতে পারি না আমি শীতল পরশ
তব মৃত্যু বিভীষিকা হে বৃদ্ধ নিষ্ঠুর
তরুণের প্রমত্ততা পরিহাস করা
তব দৃঢ় মুষ্টি ক্ষণেক শিথিল কর
আলো চায়, প্রাণ চায়, মুক্ত সমীরণ
চায় আবদ্ধ নিশ্বাসে চায় (বৃদ্ধ প্রস্থানোদ্যত)
—কে যেন দানব
রূঢ় হস্তে মোর স্তব্ধ হৃদপিণ্ড ধরি'

নিঙাড়িছে জীবনের শোণিত সঞ্চয়
পাকায়ে পাকায়ে তারে টানিতেছে মাঝে
অকস্মাৎ অতর্কিত উন্মত্ত প্রয়াসে
অস্তসন্ধ্যা কিরণের ধূসর মুকুরে
হেরি দীর্ঘ ছায়া-মূর্তি তার অগণিত
অনুচর পশ্চাতে তাহার অবিচল
পাষাণ নয়নে চাহি আকাশের পানে
চূর্ণ করে রজনীর তিমির সঞ্চার

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশুরাম। প্রতারণা—প্রতারণা
এখনও নিস্তব্ধ আছে আকাশ বাতাস
মেঘের কন্দরে বন্দীর শৃঙ্খলগলে
হাতে পায়ে অষ্ট অঙ্গে বন্ধন জর্জর
কারাগারে অপ্রয়াস, হে আত্মবিস্মৃত
মূঢ় ঝড় ঝঞ্ঝা কালাগ্নি অনল বজ্র
ভেঙ্গে ফেল সবে যুগান্ত সঞ্চিত তোরা
প্রলয় পয়োধি বাঁধ-ড়ুবে যাক বিশ্ব
বসুন্ধরা-বল মোরে সুত পুত্র, ওরে
জঘন্য জারজ, বিশ্বাসঘাতক ক্রুর
এই প্রতারণা বিদ্ধ করি কেন মোরে
আমর্ম বিদীর্ণ করি ঝকরিছ
উন্মত্ত নিষ্ঠুর বলে উত্তিক্ষ বড়িশ
দন্তে বাধায়ে কর্ষিছ তারে আপ্রান্ত
আয়াসে এমন ভীষণ—

বৃদ্ধ। বার্ধক্যের
ক্রুর ছলনায় স্মৃতি আর বিস্মৃতির
অনিরূপ সত্যের মিথ্যার দ্বন্দ্ব চলে
অহর্নিশী—(কর্ণের প্রতি) হে তরুণ, সত্যাশ্রয়ী
ভ্রান্তি নিত্য লুব্ধ কর্ণে মুগ্ধচিত্তে শোনে
মোহমন্ত্রে সুস্বাদিত মিথ্যার ভাষণ
যদি মিথ্যা বলি ভ্রান্তির কুহকে
ভুলি তবে তুমি সত্য বহ্নি শলাকায় তবে
বিঁধিয়া রসনা তার শতছিদ্র কর
বৎস কর্ণ কি তোমার নাম বহুপূর্বে
একদিন গিয়াছিনু তব জন্ম গ্রাম
দেশে সমৃদ্ধ সুভিক্ষ পল্লী শুনিলাম
সেথায় এক উঠিয়াছে বড় কোলাহল
অধিরথ নামে সারথী কে এক সুত
নীচ বংশজাত পেয়েছে জাহ্নবী কূলে
মনোহর সুকুমার শিশু।

কর্ণ। কহ কহ বিপ্র আরবার অকরুণ
নির্মম বারতা তব, পেয়েছে জাহ্নবী
কূলে আমারে আমার পিতা?

ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধ আমি
তবু বিপ্র আমি বৎস, ব্রাহ্মণের ভুল
এখন নিখিল বিশ্বে হয়নি প্রচার।

পরশুরাম। সত্য সত্য সত্য তুমি
যথার্থ বলেছ বিপ্র স্বার্থমগ্ন নহে
যেইজন সে কেন কহিবে মিথ্যা, কেন
কি উদ্দেশ্যে হে বৃদ্ধ, (কর্ণের প্রতি)
বল মোরে কেন
কবে তোর একদা কোমল পুষ্প কিশোর
দেহের মাঝে লুকায়ে আনিয়াছিলি
শত অজগর, সত্য বহ্নিতাপে আজি
অনল কাতর মিথ্যা মেলিছে লোলহজিহ্বা
এসেছিলি তুই মোর নিশীথতন্দ্রার
মাঝে স্নেহমুগ্ধ মূর্চ্ছাতুর অবসরে
ধীরে ধীরে হৃদপিণ্ডে ভেদি অতি তীক্ষ্ণ
কেশাগ্র মসৃণ চঞ্চু স্বপ্নঝরা পক্ষ
পুটে ঝাপটি গভীর নিদ্রা নিশাচর
অসমর্থ মোর প্রাণের শোণিত ধারা
পান করি ঝলকে ঝলকে রিক্ত করি
মুমূর্ষু জীবন অকস্মাৎ শুভাকাঙ্ক্ষা
জাগরিত প্রাতে হেরিলাম দীপ্ত তোর
জলন্ত শ্বাপদ চক্ষু জীঘাংশু করাল

কর্ণ: বঞ্চনার চাক্ষুষ প্রমাদে হে আচার্য
অপরাধী প্রবঞ্চক আমি, যদি প্রভু
চেয়ে দেখ অন্তরের মাঝে নেহারিবে
আজিকে নিখিল ধরা সাজিয়াছে শঠ প্রবঞ্চক।

পরশুরাম। মিথ্যাবাদী আজন্ম বঞ্চক
বঞ্চনায় প্রতারণা রুধিতে অক্ষম
হায় বিপ্র এ কি সত্য বহিতেছ
ধীরে ধীরে তুলিতেছ বিমুগ্ধ নয়ন
পথে রহস্যের মসী আবরণ নব
নব সত্য হেরি জ্বলিতেছে উজ্জ্বলিত
মধ্যাহ্ন্য উল্লাসে মাতৃপিতৃহীন তুই
জঘন্য জারজ কোন অভিশাপে তোরে
জর্জ্জরিত করি বিষাক্ত বিষাদ লোকে
যাতনায় রুধিব আদ্যন্তকাল তিলে
তিলে মরিতে আছাড়ি, উর্দ্ধাকাশে শোন
দেবদেবী আজি হতে অভিশাপে দিও
সবে শুষ্ক করে নারীর ধমনী মাঝে
নব জীবনের শুভ সম্ভাবনা, আজি
হতে মরুভূমি সম যেন শীর্ণ হয়ে
যায় সৃষ্টির নির্ঝর ধারা চিরতরে
উষর ধূসর বন্ধ্যা রমণীরা যেন
বিশ্ব প্রকৃতির অমোঘ নির্বন্ধ যদি
নাহি ভোলে একেবারে, যদি না মুছিতে
পারে প্রকৃতির দুল্য'ঙ্ঘ আদেশ দেহ
হতে, তবে যেন তারা প্রসবিয়া ক্লেদ
পিণ্ড দানবীর মত সবে দয়াহীন
মিটায় দারুণ ক্ষুধা, পান করি পঙ্গু
তাহাদের বিষাক্ত শোণিত।

বৃদ্ধ। ধৈর্য ধর
ক্রোধে কেন আত্মহারা, বৃদ্ধ আমি কত
ভুল নিমেষে করিতে পারি
(কর্ণের প্রতি) অধিরথ
সে কি তব পালক পিতার নাম?
যাহারে জেনেছ তুমি স্নেহময়ী মাতা
মাতার মতন যাঁর পূজেছ চরণ
অনন্ত শ্রদ্ধার রাধা কি তাহার নাম?

পরশুরাম। এ কি আজি শুনিলাম ব্রাহ্মণের মুখে
শত বরষের পুঞ্জিভূত নৈরাশ্য ঝরিয়া
পড়ে সাশ্রু বেদনায়, একদিন আত্ম
গরীমায় বিশ্ববিধাতার বক্ষে যারা
পদাঘাত করেছিল আমি কি তাদের
কেহ, তাহাদের কূল পঞ্জিকায় আছে
কি আমার নাম, রে শূদ্রজারজ ঘৃণ্য
নতমুখে নীরবে দাঁড়ায়ে কেন, হান
এই বক্ষে মোর পাদুকায় যত পার
অপমান হীন লাঞ্ছনায়, কত ধৈর্য
দেখি আমি আছে দেবতার—কেমনে না
মহাশূন্য দেখিব বিদীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে
পড়ে চূর্ণ চূর্ণ অনলকণায়, শোন
তবে অভিশাপ মোর আজীবন মহা
সাধনায় কাটিয়াছে নিদ্রাহীন রিক্ত
সুখ নিরাহার নিত্য জীবন আমার
অবিলাসী শান্তিহীন জীবন সন্ধ্যায়
আমি অকস্মাৎ হেরিলাম মুহূর্তে'কে
ব্যর্থ হয়ে গেল সকল সাধনা সেই
মত একদিন চিরজন্ম ব্যর্থতার
কারাগারে বন্দী রবে কীর্তির বিকাশ
অবশেষে আসন্ন সায়াহ্নকালে যবে
মৃত্যুমুখে শেষোদ্যমে বিফল ব্যাকুল
বলে যুঝিবি যখন, রথচক্রভূমি
তলে অকস্মাৎ গ্রাসিবে মেদিনী
(কর্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান,)

(অধিরথের প্রবেশ)

অধিরথ। বৎস কর্ণ, অন্তরাল হতে সবই আমি দেখেছি, সবই শুনেছি। দুরদৃষ্ট যে এমন ভাবে আসবে এ কোন দিনই ভাবি নি। সে আক্ষেপে কোন ফল নেই বৎস—সারা বিশ্বজগত তোমায় অভিশাপে জর্জ্জরিত করলেও আজও পিতার আশ্রয়, মায়ের কোল দু'হাত বাড়িয়ে তোমায় ডেকে নেবার জন্যে ব্যাগ্র হয়ে আছে। বিদ্যাশিক্ষা অভিলাষে কতকাল পূর্বে তুমি আমাদের ছেড়ে এসেছ। সব গ্লানি ভুলে আজ ফিরে চল বৎস তোমার সেই ছেলেবেলার খেলাঘরে, এই দরিদ্রের আশ্রয়ে।

কর্ণ। গুরুর চরণে সমাগত বৃদ্ধ যে বারতা নিবেদন করলেন, সত্য বল পিতা সেই কি কঠিন সত্য? তাই যদি হয় তবে সত্য করেই আমাকে জানতে দাও আমি কে, কোথা হতে এলাম এবং কি ভাবেই বা তোমাদের পিতামাতা জ্ঞান করতে শিক্ষা করলাম।

অধিরথ। বাবা কর্ণ, তোমার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না, কারণ যতটুকু ঘটনা আমার চোখের সমুখে ঘটেছে তার আগের বৃত্তান্ত আমার জানা নাই, অনুসন্ধানে যে জানব সে পথেও বাধার সৃষ্টি করেছিল আমার মমতা। নদী বক্ষে ভাসমান অসহায় অবোধ শিশুর প্রতি অসীম স্নেহমমতা শুধু তাঁকে দু'হাতে করে বুকে তুলে নেবার প্রয়াসই দিয়েছিল— সেই অবধি হারাই হারাই এই ভয়েই শুধু তোকে বুকে চেপে রেখে তিলে তিলে বড় করে গেছি—কোনদিন কোন অনুসন্ধানেই মন আমার সচেষ্ট হয় নি পাছে বুকের ধনকে আমার হারিয়ে ফেলি।

কর্ণ। বুঝেছি পিতা, যে আশ্রয়ে বাস করে অসীম স্নেহমমতার মাঝে প্রাণ ধারণ করেছি, বড় হয়েছি, মনে মনে সে আশ্রয়ের প্রতি অমর্যাদা প্রকাশের দুঃসাহস যেন আমার এ জীবনে কোনদিন না আসে। কিন্তু কোন আশ্রয় অবলম্বন করে এ ধরার বুকে প্রথম নেমে এসেছিলাম তা যতদিন না জানতে পারি ততদিন আমি নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় নিঃসহায় নিরবলম্ব বলেই জ্ঞান করব পিতা।

অধিরথ। (ব্যাকুল ভাবে) ওরে তবে তুই সত্যই হারিয়ে গেলি? আজ এতদিন পরে সত্যই কি তোকে হারালাম? কিন্তু এ আশা করে তো এতদূর ছুটে আসি নি। অনেক চেষ্টায় অনেক কৌশলে আশ্রমের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছেছি—অন্যের সাহায্য নিয়ে বহুদিন পরে আজ আবার তোকে দেখতে পেয়েছি। এর পরেও শুধু কি তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমার হবে না। নিজে ব্রাহ্মণ নই বলে, ব্রাহ্মণের পদতলে সাহায্য ভিক্ষা করে যতদূর এগিয়েছি, ঠিক তত পথ কি শূন্য হাতে আমায় ফিরে যেতে হবে, মা বলে যাকে এতদিন জেনে এসেছিস তাকে গিয়ে জানাতে হবে যে পাখী বন থেকে উড়ে এসেছিল সে খাঁচার মায়া করলে না আবার বনেই ফিরে গেল।

কর্ণ। তোমার এ আক্ষেপ মিথ্যা নয় পিতা, অকপট সত্য তোমায় বলি যে মমতা আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধান গ্রহণে তোমার এতদিন বিরত রেখেছিল, আজ আমি যদি ঘরে ফিরে যাই তবে সেই মমতাই আমাকে সারা জীবন বিরত রাখবে সেই উদ্দেশ্য হতে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গুরু গৃহে এসেছিলাম, শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছি, এমন কি যার ফলে অভিশাপের গুরুভার মাথায় নিয়ে আজ সম্পূর্ণ রিক্ত আমি একাকী বিশ্বপথে চলতে সুরু করলাম শুধু এই আশীর্বাদ কর পিতা, তোমার আমার মত নানা ভাবে জর্জরিত যারা সর্বাধিকার বর্জিত হয়ে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে যুগ যুগ ধরে পিষ্ট দলিত মথিত হয়ে পড়ে আছে তাদের মানুষের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে যেন শেষ রক্ত বিন্দু দেহে থাকা পর্যন্ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে পারি এবং শত অভিশাপ সহস্র দিক হতে যদি বাধা সৃষ্টি করে পিতৃ আশীর্বাদে যেন সে বাধা চূর্ণ করে নিজ উদ্দেশ্যে সাফল্যলাভ করি। (প্রণামান্তে কর্ণের দ্রুত প্রস্থান)।

অধিরথ। চলে গেল— কি চাইলে, আশীর্বাদ— ওরে আশীর্বাদ, যদি আশীর্বাদ করবার অধিকার আমার থাকে, আমি সেই দিনই তোকে দিয়েছিলাম যে দিন স্রোতের মুখ থেকে জ্ঞানহীন, ভাষাহীন, অবোধ শিশু তোকে আমি তুলে এনেছিলুম আমার সেই ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে।

(প্রস্থান, অপরদিক হইতে কর্ণের পুনপ্রবেশ)

কর্ণ। দিবা অবসান প্রায় মুমূর্ষু কিরণ
রেখা মিলায়ে যেতেছে ধীরে সন্তর্পণে
সঙ্গোপনে, মলিন বধির অতি ক্ষীণ
রুদ্ধ দীর্ঘ শ্বাস ধরণীর অন্তরস্থল
হতে উঠিতেছে ধীরে ধীরে ম্লান সন্ধি-
ক্ষণে হেমন্তের কুহেলিকা সম, আয়
তবে অন্ধ নিশীথিনী সবেদন সাশ্রু
নেত্রে বিষণ্ন বেদন মেলি লুকাইয়া
রাখ দেবী রৌদ্রকরে উদ্দীপিত বিশ্ব
বসুধার রুদ্র পরিচয়, ঢেকে রাখ
তোমার অঞ্চলতলে ছিন্ন ভিন্ন শীর্ণ

সঙ্কুচিত মর্মের কামনা রাশি, ছায়া
অন্ধকার চাহিনা চাহিনা আর খর
রৌদ্র করে উজ্জলিত উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা
আশা আবলিত জটিল গ্রন্থিল যত
মোহন বন্ধনজাল, আজি মুক্ত আজি
শুভ্র ম্লান চন্দ্রালোকে নির্বাপিয়া দাও
মোর প্রাণের কামনা তৃষা, মূর্চ্ছাহত
নিঃসীম তিমির তলে লুকায়ে রাখিব
মোর জীবনের উদ্দাম সঙ্গীত'। আজি
যাক মুছে যাক জীবনের আপ্রভাত
সকল সঞ্চয়, এতদিন ছিনু আমি
মাতৃপিতৃ পরিচয় হীন, সত্য আজি
জানিলাম মাতৃপিতৃহারা সর্বহারা
আমি জঘন্য জারজ, বন্ধন যা কিছু
ছিল অঙ্গে অঙ্গে স্তরে স্তরে, দীর্ঘ শীত
নিদ্রোত্থিত স্ফীত জাগরণে একে একে
গিয়াছে টুটিয়া, ক্ষতি নাই ক্ষয় নাই

যার অনশ্বর অন্তহীন তার ক্ষতি
কে পারে আনিতে বিশ্বে মানব জীবন
চলে অন্তহীন নির্ঝরিনী সম কূলে
কূলে গেয়ে গেয়ে মৃত্যুর বন্দনা গান
তারপর একদিন সমুদ্রে অর্পিয়া
দেয় জীবনের ঐশ্বর্য সম্ভার, কোথা
বল পরিচয় কহিবার পরিচয়
শুনিবার বাধাহীন নিরঙ্কুশ দীর্ঘ
অবসর, নিতান্ত অপরিচিত একে
একে অগণ্য লহরীদল সমুত্থিত
একে একে সমাহিত শেষে, তবে এক
পরিণাম যার একই যার পরিশেষ
তারা কেন নাম পরিচয়ে রাখে সবে
বাঁধিয়া জীবন, তার চেয়ে জাতিকুল
হীন প্রচণ্ড উর্মীর মত উদ্বেলিয়া
পরিচয় গর্বিতের উদ্ধত শিখরে
মুহূর্তেকে পড়িব ভাঙ্গিয়া পরিহাস
ফেনোচ্ছাসে কৌতুক বুদ্বুদে আজি তবে
উচ্ছসি উঠুক এ অজ্ঞাত কুলশীল
উন্মত্ত তরঙ্গ উর্ধে রুদ্র আকর্ষণে
অগ্রে আপুঞ্জিয়া যত সম্মুখের ঢেউ
সম্মুখে আবহি যত পশ্চাতের ঢেউ
সর্ব উর্মী সম্মিলিত করি আবর্তিয়া
চলে যাব বিশ্বলোক পদতলে দলি
নিষ্পেষিয়া পরিচয় নিবীড় অজস্র
নগর নগরী পল্লী, শুধু এক মত্ত
পরিচয় কহি প্রলয় কল্লোলে, আমি
নিত্য পরিচয় হারা প্রলয়ের দূত
মোর পরিচয় অশনি সংঘর্ষে বাজে
আকাশ বিদারি আকাশ বিদীর্ণ করা
উদ্দাম অক্ষরে লেখে বিদ্যুৎ লেখনী
ধরি মহাকাল আকাশের পটে মোর
সর্বরিক্ত সর্বঅন্তহীন রিক্ততার
নিঃসীম প্রাচুর্য দীপ্ত জীবন কাহিনী।

সম্পাদকের দপ্তর

প্রভুল পোদ্দার (শ্রীরামপুর, হুগলী)

আমি Cinematography শিখিতে চাই, কলিকাতায় এরূপ কোন শিখিবার স্কুল আছে কিনা জানাইবেন।

: কলিকাতায় এরূপ কোন স্কুল নেই। নিউথিয়েটার্সের কর্ম সচিব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মিত্র (ছোটাই বাবু) কে এবিষয়ে রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করে চিঠি লিখতে পারেন। তিনি হয়ত কিছুটা সাহায্য করতে পারেন।

সোমনাথ, বৈদ্যনাথ, অজিত, বাদল, বগলা, মুটু, টাথ (হৃদয় কৃষ্ণ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া)

আমরা স্বর্গত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন কথা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। এতদ সম্পর্কে আমাদের অনুরোধ এই যে স্বর্গত যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের জীবন কথা সম্পাদন করিয়া পুনরায় আমাদের আনন্দদান করুন।

: আপনাদের আবেদন সর্বতোভাবে যুক্তিসংগত। কিন্তু যে সব পরলোকগত শিল্পীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পূনাংগ ভাবে আমরা কোন স্মৃতি-সংখ্যা প্রকাশ করতে পারিনি, বর্তমানে সেগুলি প্রকাশ করা খুব সহজ সাধ্যনয়। তবে তাঁদের প্রতিভা এবং জীবনী নিয়ে যদি কেউ আলোচনা করতে চান—রূপ-মঞ্চ সব সময়ই সেজন্য স্থান করে দেবে। ভবিষ্যতে শিল্পীদের স্মৃতির রক্ষা কল্পে রূপ-মঞ্চ নিজের শক্তি অনুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

রথী দেবী (১১৩৫, কলিকাতা)

(১) লতিকা মল্লিক একজন ভারতীয় খৃষ্টান একথা কী সত্য? (২) নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের পরিচালনায় মাদ্রাজের যামিনী ষ্টুডিওতে 'কল্পনা' নামে যে বইটা তোলা হচ্ছে তাতে মৃদুলা গুপ্তা নামে যে শিল্পী অভিনয় করছেন, তিনি থাকেন কোথায়, তাঁর সঠিক ঠিকানা জানাবেন?

: (১) হ্যাঁ, একথা সত্য। (২) শ্রীমতী মৃদুলা গুপ্তা কলকাতাতেই থাকতেন। ইনি কবি আভাদেবীর মেয়ে। ঠিকানা সঠিক আমার জানা নেই। তবে আপনি শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচার সচিব, এম্পায়ার টকী ডিসট্রিবিউটর্স ৯৫নং, সেণ্ট্রাল এ্যাভেনিউতে চিঠি লিখে জানতে পারেন।

মলয় কুমার মহলানবীশ (কালীঘাট রোড, কলিকাতা)

(১) পরিচালক শৈলজানন্দের বাড়ীর ঠিকানা কি?

(২) সন্ধ্যারাণীর পাত্তা পাওয়া যায় না কেন? তিনি কি সিনেমা জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন?

: (১) শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ২।বি, পশুপতি বসু লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

(২) সন্ধ্যারাণীকে পর পর তিনিখানি চিত্রে দেখতে পাবেন। 'মানে-না-মানা', 'সাত নম্বর বাড়ী', 'পথের সাথী।'

ডি, ব্যানার্জি (১১৬৯)।

(১) গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'গৃহলক্ষ্মী'তে যে চন্দ্রাবতী অভিনয় করিতেছেন তিনি কি নবাগতা? (২) সুমিত্রা দেবী কি বোম্বাইয়ের কোন বইতে চুক্তি বদ্ধ হইয়াছেন। (৩) রাধামোহন ভট্টাচার্য ও বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী চিত্র কি? (৪) লীলা দেশাই কি মণিকা দেশাইর বোন? (৫) মানে-না-মানায় কে কে অভিনয় করিয়াছেন? : (১) না। ইনি সেই চন্দ্রাবতী, বাংলা ছায়া চিত্র জগতে অভিনয় প্রতিভায় যিনি সকলের উচুতে স্থান করে নিয়েছেন। (২) না। (৩) রাধামোহন ভট্টাচার্য—হামরহী ('উদয়ের পথে'র হিন্দিরূপ), বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়—রামানুজ (দেবকী বসু পরিচালিত হিন্দি চিত্র)। (৪) দিদি। (৫) মলিনা,

আবার
হাসি
ফুটে উঠলো
তখনও তার পরিপূর্ণ যৌবন
— কিন্তু নৈরাশ্যের অন্ধকারে
তার মনের আকাশ হোয়ে
উঠ্‌লো আচ্ছন্ন। সামান্য অসুখ নিয়ে
এলো ক্রমে জটিল ব্যাধি যার ফলে তার স্বাস্থ্যের
ঘট্‌লো অকাল মৃত্যু। ...কিন্তু যেদিন থেকে সে অমৃত
সালসা সেবন করতে সুরু করলো, তার ব্যধি-পঙ্গু জীবনে
ফিরে এলো স্বাস্থ্য — আবার ফুটে উঠ্‌লো হাসি। রক্তদুষ্টি,
চর্মরোগ, বাত, মেয়েদের অসুখ ও যাবতীয় দুর্বলতায়
একমাত্র নির্ভরযোগ্য মহৌষধ। প্রতি শিশি এক টাকা।
অমৃত সালসা
(স্বর্ণ ঘটিত) গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড
কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কবিরত্নের
মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৪৪।১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
প্রতি ফোঁটাই
অমৃততুল্য
COMARTS
NIP·A5

রেণুকা, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ফণী রায়, নবদ্বীপ হালদার, তুলসী চক্রবর্তী সন্তোষ সিংহ, আশু বসু, প্রভা, রাজলক্ষ্মী এবং আরো অনেকে আছেন।

সুধাংশু কুমার রায় (১১২৪, খুলনা)।

(১) বুদ্ধদেব কি এখনও লেখাপড়া করে। আমার এক বন্ধুর কাছে শুনলাম সে নাকি 3rd yearএর ছাত্র। (২) প্রমথেশ বড়ুয়া এখন কি করছেন? 'তকরার' কি প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনাধীনে গৃহীত? (৩) ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রবীন মজুমদার ও অসিতবরণকে পর পর সাজিয়ে দিন। দুর্গাদাস স্মৃতি-রক্ষা কল্পে কিছু ব্যবস্থা হয়েছে কি? ফাল্গুনের রূপ-মঞ্চে দেখেছিলাম বিধায়ক ভট্টাচার্য দুর্গাদাস সম্বন্ধে একটা বই লিখবেন—তার কি হ'লো?

: (১) হ্যাঁ বুদ্ধদেব কলেজে পড়ছে। কোন শ্রেণীর ছাত্র সেটা সঠিক আমার জানা নেই।

(২) প্রমথেশ বড়ুয়া একসংগে ৪।৫ খানা চিত্রের পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। 'তকরার' চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন 'দ্বন্দ্ব'খ্যাত পরিচালক হেমেন গুপ্ত।

(৩) ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, অসিতবরণ, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রবীন মজুমদার।

(৭) না বিধায়ক এখনও লিখে উঠতে পারেননি।

হরিদাস মুখোপাধ্যায় (রাসবিহারী এ্যাভেনিউ, কালিঘাট)

যে কোন একখানি সাধারণ শ্রেণীর বাংলা ছবি তুলতে আনুমানিক কত খরচ হ'তে পারে?

: আজকাল কমপক্ষে আশী হাজার টাকা।

শ্রীমতী ভিতালী বন্দ্যোপাধ্যায় (বাবুগঞ্জ, হুগলী)

(১) ফিরোজাবালা কি মুসলমান? (২) ভারতী দেবী কি নিজে গাইতে জানেন?

(১) না। হিন্দু। ইনি শ্রীমতী পূর্ণিমার ছোট বোন। (২) হ্যাঁ।

মঈদ-উর-রহমান (আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা)

ছবির Shooting দেখবার জন্য কোন ষ্টুডিওর প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করে দিতে পারেন কি?

'মানে-না-মানা' চিত্রে সাবিত্রী ও ফণী রায়

: ৩০, গ্রে ষ্ট্রিট, রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে আমার সংগে বেলা ১০—১২টার ভিতর দেখা করলে এবিষয়ে যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

রমা রসাক (ডালিমতলা লেন, কলিকাতা)

কিছুদিন পূর্বে মিনার্ভা থিয়েটার কলিকাতার রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্মেলনে দুইদিন বিশেষ অভিনয় রজনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ দুইদিনের টিকিট বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ যে সাধারণ রজনীর

অপেক্ষা দ্বিগুণ, তা সেইদিন দর্শক সমাগম দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ঐ টাকার সামান্য অংশও কি রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারে গিয়াছে? আমার মনে হয় আজ পর্যন্ত কোন রঙ্গালয় থেকেই উক্ত ভাণ্ডারে কোন সাহায্য যায় নাই। অথচ ঐ রকম বিশেষ অভিনয় রজনীর ব্যবস্থা করে রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষগণ সহজেই মোটা রকমের চাঁদা রবীন্দ্র-স্মৃতিভাণ্ডারে দিতে পারেন। এবিষয় রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষগণ উদাসীন কেন? তাঁদের সচেতন করিবার জন্য আপনারাই বা কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

: বাংলার রঙ্গালয় ও চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা যদি এবিষয়ে একটু অগ্রণী হ'তেন, বাংলা থেকে ১০ লক্ষ টাকা তুলতে রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারের সম্পাদকের এতখানি হাবুডুবু খেতে হ'তো না। ব্যক্তিগতভাবে—কাগজের মারফৎ এদের এবিষয়ে অবহিত করতে আমরা বহু চেষ্টাই করেছি—কিন্তু তাঁদের বধির কর্ণে—আমাদের মত অনেকের প্রচেষ্টাই আঘাত খেয়ে ফিরে এসেছে। অবশ্য সংঘবদ্ধ ভাবে না দিলেও তবু কয়েকটা চিত্র প্রতিষ্ঠান ব্যাক্তিগতভাবে রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারে সাহায্য করেছেন—কিন্তু আমাদের পাঁচটি রঙ্গালয় ৫টী কাণা কড়িও দিয়েছেন কিনা সে বিষয়ে কোন খবর জানা নেই।

এস, এম্, গুপ্ত (রেসকিউ অফিসার, এ, আর, পি, ডিপার্টমেণ্ট, বজবজ)

(১) পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের খবর কি? শুনলাম তিনি বম্বেতে বিবাহ করিয়াছেন, খবর টাকি সত্য? (২) পরিচালক সুকুমার দাসগুপ্তের খবর কি? (৩) পরিচালক সুশীল মজুমদার বর্তমানে কি করিতেছেন? (৪) পরিচালক নরেশ মিত্রের ছবির খবর কি?

: (১) পরিচালক প্রফুল্ল রায় বম্বেতে ভারত সরকারের অধীনে চিত্রবিভাগে কাজ কচ্ছিলেন, এটুকু জানতাম। তাঁর বিবাহ সংক্রান্ত কোন খবরই আমরা জানিনা। তবে সম্প্রতি তিনি কলকাতায় আসবেন ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওর হ'য়ে একখানি চিত্র পরিচালনা করতে। (২) এম, পি, প্রোডাকসন্সের 'সাত নম্বর বাড়ী' নিয়ে পরিচালক সুকুমার দাসগুপ্ত ব্যস্ত আছেন। (৩) পরিচালক সুশীল মজুমদার বম্বেতে তাজমহল পিকচার্সের "বেগম" চিত্রখানির পরিচালনা করছেন। চিত্রখানি ফিল্মিস্তান ষ্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন, নাসিম, অশোককুমার, প্রভা, ভি, এইচ, দেশাই, বিক্রমকাপুর প্রভৃতি। (৪) অরোরা ফিল্মের 'পথের সাথী' শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

শ্রীরাণু পুরকায়স্থ (আড়গাও, গৌহাটী)

(১) শুনিলাম মণিকা গাঙ্গুলী নাকি লেখাপড়ার জন্য বম্বে গিয়াছেন। অভিনয় শিক্ষা না লেখাপড়া? শ্রীযুক্ত ডি, জির শৃঙ্খলের খবর কি? (২) শ্রীমতী লতিকা মল্লিক কি অমর মল্লিকের কন্যা? (৩) কাশীনাথের ছোট বিন্দু শ্রীমতী বিজলীর পরবর্তী ছবি কি? (৪) গুজব শুনলাম যে সাধনা বোস ও মধু বোসের বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়াছে ইহা কি সত্য?

: (১) শ্রীমতী মণিকা গাঙ্গুলী হায়দ্রাবাদে তার জ্যেঠামশায় শ্রীযুক্ত জে, এন গাঙ্গুলী (চীফ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার) এর কাছে পড়াশুনা (কেম্ব্রিজ) করতে গেছে। শ্রীযুক্ত ডি, জি, শৃঙ্খলকে শৃঙ্খলিত করে এখন কাহিনীর দালালী' করছেন। (২) না। কোন সম্পর্কই নেই। (৩) শ্রীমতী বিজলী বর্তমানে আর কোন চিত্রে অভিনয় করছেন না। (৪) সম্পূর্ণ মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে—যাঁরা গুজব রটিয়েছিলেন তাঁদের চিঠি লিখে শ্রীযুক্ত মধু বোস তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

শ্রীবিজয়কুমার পাল (রাজা ব্রজেন্দ্র রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

আপনি যে কোন দিন বেলা ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে রূপ-মঞ্চ কার্যালয় ৩০, গ্রে ষ্ট্রীটে আমার সংঙ্গে দেখা করতে পারেন। আপনার রিপ্লাই কার্ডখানি পোষ্ট অফিসের দৌলতে ছাপ নিয়ে এসে হাজির হওয়াতে ব্যবহার করা গেল না।

দুর্গাচরণ দাস, শঙ্করকুমার দাস (বেলেঘাটা)

(১) সহর থেকে দূরে, উদয়ের পথে, দোটানা, অভিনয় নয় এই চিত্রগুলির মধ্যে কোনটির পরিচালনা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে? (২) উমাশশী ও শ্রীলেখা কি চিত্রজগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন? (৩) শ্রীমতী মলিনা প্রথম কোন চিত্রে রূপদান করেন। (৩) বর্তমানে শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী কে?

ঃ (১) উদয়ের পথে। (২) এঁরা দু'জনেই চিত্রজগত ছেড়ে সংসার-জগতে প্রবেশ করেছেন। (৩) নিউ থিয়েটার্সের 'চিরকুমার সভাতে' নির্মলার ভূমিকায় সবাক চিত্রে শ্রীমতী মলিনার প্রথম আত্ম-প্রকাশ। নির্বাক যুগে শ্রীকান্তে ছোট রাজ-লক্ষ্মীর ভূমিকাতে অবশ্য সর্বপ্রথম চিত্রাবতরণ। (৪) দর্শক সাধারণের বিচারে শ্রীযুক্ত শচীন দেব বর্মণ শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী নির্বাচিত হয়েছেন। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির আদর্শের সংগে রূপ-মঞ্চ সম্পূর্ণ একমত, তাই বর্তমান শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী রূপে শ্রীযুক্ত বর্মণকেই আমি মেনে নেবো।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী (দত্তপুকুর, ২৪-পরগণা)

(১) প্রমথেশ বড়ুয়া যত বই পরিচালনা করিয়াছেন তন্মধ্যে কোনটী সর্বাপেক্ষা সুনাম অর্জন করিয়াছে? (২) গীতীন বসুর কোন ছবিটা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্বামী-নাথ চিত্রে শোভনা সমরথ

(৩) বড়ুয়াকে নীতীন বসু অপেক্ষাও ভাল পরিচালক বলা চলিত কিনা!

: (১) দেবদাস, রূপ-লেখা, মুক্তি, অধিকার থেকে শেষ-উত্তর পর্যন্ত বড়ুয়ার কোন চিত্রটাই কম সুনাম অর্জন করেনি। তার মধ্যে দেবদাসই সম্ভবতঃ বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ব্যক্তিগত ভাবে রূপ-লেখা এবং অধিকার চিত্র আমায় বেশী মুগ্ধ করেছিল। (২) ভাগ্যচক্র (প্রথম যুগে), কাশীনাথ পরবর্তী যুগে। (৩) দু'জনের প্রতিভাই যেন সমান বেগে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ফণীন্দ্রনাথ সাহা (১১১৮, কান্দিপাড়, কুমিল্লা)

(১) কলিকাতাকে টলিউড বলা হয় কেন?

(২) B. M. P. P. Aএর সম্পূর্ণ ইংরেজী শব্দ এবং তার অর্থ কি?

(১) আমেরিকার হলিউডের অনুকরণে।

(২) Bengal Motion Pictures' Producers' Association বঙ্গীয় চিত্র প্রযোজক সমিতি।

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সৈদাবাদ রোড, বহরমপুর)

(১) মাস কয়েক আগে বম্বের কোন পত্রিকায় দেখেছিলাম, বাংলার ভূতপূর্ব অভিনেত্রী শ্রীমতী মেনকা দেবী বম্বেতে মুরারী প্রডাকসন্সের "কৃষ্ণ অর্জ্জুন যুধ" নামক একটী হিন্দী চিত্রে অভিনয় করিতেছেন? বইখানা কি মুক্তিলাভ করিয়াছে? (২) অশোককুমার ও কানন দেবী একসংগে কোন চিত্রে দেখিবার কি কোন সম্ভাবনা আছে? শুনিলাম অশোককুমার কলিকাতায় আসিতেছেন কথাটা কি সত্য? (৩) আমাদের দেশে রূপবতী নায়িকা এবং রূপবান নায়কের অভাব কেন?

: (১) মোহন সিংহ পরিচালিত মুরারী পিকচার্সের "শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন যুদ্ধ" চিত্রে নিউ থিয়েটার্সের ভূতপূর্ব মেনকা দেবী অভিনয় করছেন—চিত্রখানির কাজ এখনও শেষ হয়নি—মুক্তির বহু দেরী আছে। (২) বর্তমানে নেই। তবে এবিষয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখলে মন্দ হয় না। অশোক কুমারের বর্তমানে কলিকাতায় আসবার কোন সম্ভাবনাই নেই! (৩) যেহেতু রূপবতী এবং রূপবানরা পর্দার অন্তরালে থাকতেই ভালবাসেন।

শ্রীঅমরকুমার চক্রবর্ত্তী (নয়াদিল্লী)

(১) বর্তমানে বম্বে টকীজে কি কোন নূতন অভিনেতা বা অভিনেত্রী যোগদান করিয়াছে? (২) ধীরজ ভট্টাচার্য, রবীন মজুমদার, ছবি বিশ্বাস ও অশোককুমার, ইহাদের সিনেমায় যোগদান করিবার পূর্বে কাহার কি পেশা ছিল?

: (১) আগাজান ও মৃদুলার পর নূতন কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী বম্বে টকীজে যোগদান করেছেন কিনা আমরা জানতে পারিনি—তবে বহুদিন বাদে কোন জনপ্রিয় অভিনেত্রী পুনরায় বম্বে টকীজে যোগদান করেছেন। (২) ধীরাজ ভট্টাচার্য—পুলিশে কাজ করতেন। রবীন মজুমদারের কথা ঠিক বলতে পারি না। ছবি বিশ্বাস পাটের দালালি করতেন। অশোককুমার বম্বে টকীজের ল্যাবরেটরীর কর্মী ছিলেন।

আর, রহমন (ধুপাদীঘির পাড়, সিলেট)

বৈশাখের রূপ-মঞ্চে চন্দ্রমোহনকে ছবি বিশ্বাসের বহু পিছনে ফেললেন তার কোন মানেই বুঝি না। চন্দ্রমোহনের সংগে ছবি বিশ্বাসের কি কোন তুলনাই চলে না?

(২) মিসেস ওয়ালী সাহেবা সঙ্গীতে পারদর্শিনী বলিয়াও মনে হয় না। তাঁহার ছবি গুলিতে কি তিনি নিজেই গাহিয়া থাকেন?

(৩) প্রতিভাময়ী মলিনা দেবীকে পরিচালকেরা মঞ্চঘসা অভিনয়ের অভ্যাস ছাড়াতে পারেন না?

(১) চেহারা, অভিনয়ের ভংগিমা, অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বর সর্ববিষয়ে চন্দ্রমোহন থেকে ছবি বিশ্বাস উচু স্থান পাবার যোগ্য বলেই আমি মনে করি। উদ্ধত কর্কশ

টাইপের চরিত্রে চন্দ্রমোহনকে ভাল লাগে। মার্জারাক্ষী চন্দ্রমোহনকে তাঁর চেহারাও এবিষয়ে সাহায্য করেছে কিন্তু ছবিও ঐ ধরণের চরিত্রে চন্দ্রমোহন থেকে কম পারদর্শী নন।

(২) আপনার অনুমান সত্য। মিসেস ওয়ালী সাহেবা (মমতাজ শান্তি) পর্দায় ধার করা গলায় গেয়ে থাকেন অর্থাৎ "play back"। বসন্ত প্রভৃতি চিত্রে এবিষয়ে একটি বাঙ্গালী মেয়ে (পারুল ঘোষ?) তাঁকে গলা ধার দিয়েছিলেন।

(৩) মলিনা সম্পর্কে আপনার এই অভিমত স্বীকার করে নিতে পারি না। চরিত্রোপযোগী মলিনার সাবলীল অভিনয়ে মঞ্চের কোন ছাপই থাকে না।

'হেনরী দি ফিপ্‌থ' চিত্রে রেণী এ্যাসারসন

শ্রীমতী নীলিমা রায় চৌধুরী (মধুরা চৌধুরী রোড) প্রতিমা দাশগুপ্তা আর বই তুলছেন না কেন? গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজপথ কোন ষ্টুডিওতে তোলা হচ্ছে? রেণুকা রায় কি নিজে গেয়ে থাকেন না তার গান Play back করা হয়?

: প্রতিমা দাশগুপ্ত বম্বেতে P.d.c নামে একটী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তিনি নিজেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রযোজক। এবং এই প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে 'সামিয়া' নামে একখানি চিত্রের পরিচালনা করছেন। এই চিত্রে তাঁকে এবং বেগম পারাকে দেখা যাবে। রাজপথ আপাততঃ স্থগিত আছে। চিত্রে রেণুকার গান Placy back করা হ'য়ে থাকে।

নীরেন (শিলচর), আমার এক বন্ধু আপনার উপর ভীষণ চটা দেখলাম, কারণ আপনি নাকি শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়াকে দু'চোখে দেখতে পারেননা। যিনি একাধারে একজন খ্যাতনামা অভিনেতা এবং পরিচালক তাঁকে আপনি নিন্দা করেন। তাঁর উপর আপনার এত

খেদ কেন? তিনি N.T. ছেড়ে চলে গেছেন বলে? অথচ এই ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করে বৈশাখের রূপ মঞ্চে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার বলেছেন, 'He has got a good brain.' অথচ আপনি তাঁকে পছন্দ করেন না। আপনি বলেছেন, বড়ুয়া দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছেন। কাজেই সে আপনাকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। আর দেখুন, আপনাদের এই রূপ মঞ্চ পত্রিকা অনেকেই দেখলাম বেশ পছন্দ করেন, আবার সিনেমার পত্রিকা বলে অনেকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে থাকেন। আবার কেউ কেউ পছন্দও করেন বটে, তবে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম বলে মনে হয়। তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার ভার আপনাকেই দিচ্ছি। আপনার পত্রিকার উদ্দেশ্য ভাল করে তাঁদের বুঝিয়ে দেবেন আশা করি।

ঃ সাংবাদিক জীবনের এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে মস্তবড় অভিশাপ। কোন সাংবাদিক যদি নিরপেক্ষ ভাবে সত্যিকারের প্রতিভা বিচার করে কারোর সমালোচনা করেন, ব্যাক্তিগত ভাবে যদি তাঁর সেই সমালোচনা সাময়িক ভাবে কারোর মনোমত না হয়, তবেই তাঁর পর অনেকেই রুষ্ট হ'য়ে ওঠেন। আপনার বন্ধুটী যদি আমার প্রতি রুষ্ট হ'য়ে থাকেন আমার বলবার কিছু নেই! ব্যক্তিগতভাবে আমি শ্রীযুত বড়ুয়ার একজন অনুরাগী। বড়ুয়াব অভিনব প্রকাশভংগী আমায় অভিভূত করে—তাছাড়া ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় তাঁর যে শিল্পমনের পরিচয় পেয়েছি—তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে—বর্তমানে বড়ুয়া পরিচালিত কয়েকখানি চিত্র দেখে সম্পাদক হিসাবে একদম নিরাশ হ'য়েছি। তাই সাংবাদিকের ধর্মানুযায়ী বড়ুয়াকে বর্তমানে প্রশংসা করতে পারিনা, অবশ্য বড়ুয়ার একজন অনুরাগীরূপে শেষ পর্যন্তও বড়ুয়ার কাছ থেকে অনেক কিছু পাবার আশাও ছাড়বো না—সাংবাদিক রূপে যদি বুঝতেও পারি বড়ুয়ার আর কিছু দেবার নেই। বড়ুয়া N. T. ছেড়ে চলে যাওয়াতে আমি রুষ্ট হবো কেন? যদি বাংলা ছেড়ে যেতেন তাহলেও নয় রুষ্ট হবার কথা উঠতো। তবে পর পর বড়ুয়ার কয়েকখানি চিত্রের ব্যর্থতার জন্য যে ব্যথা অনুভব করেছিলাম, বড়ুয়ার একজন অনুরাগী হয়ে, বড়ুয়াকে N.T.তে যোগদান করবার কথা উল্লেখ করেছিলাম এই জন্য যে, বাইরের আবহাওয়ায় হয়ত তাঁর প্রতিভা স্তিমিত হয়ে পড়ছে। তাই যেখানে একদিন তাঁর প্রতিভা আত্মবিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিলো, সেখানে ফিরে এলে হয়ত তাঁর প্রতিভা বর্তমানের আবরণ কাটিয়ে উঠতে পারবে। এই নিয়ে সম্প্রতি বড়ুয়ার কোন অনুরাগী পরিচালকের সংগে অনেক আলোচনাই আমার হয়েছিলো। তার সংগে আলাপ করে বুঝতে পারলাম,

আমার ধারনা ভুল অর্থাৎ N. T. র বাইরে যেয়ে যে তাঁকে অসুবিধাকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়, সে কথা সত্য নয়। কারণ তিনি যেখানেই যান না কেন, সেখানেই সুবিধামত পরিস্থিতি তৈরি করে নিতে পারবেন স্বীয় ব্যক্তিত্বে। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে বড়ুয়া আমাদের সন্তুষ্ট করতে পাচ্ছেন না কেন? এই অসন্তুষ্টী চিত্রশিল্পের প্রতি তার ঔদাসীন্য থেকে উদ্ভূত না নিঃশেষিত প্রতিভার বিকাশ থেকে? বর্তমানে প্রায় ৪।৫খানি চিত্রের পরিচালনার ভার তিনি গ্রহণ করেছেন বন্ধুকে বলবেন, বড়ুয়া যদি নিজের প্রতিভায় এবার আমাদের মুগ্ধ করতে পারেন—সর্বাগ্রে রূপ-মঞ্চই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে মেতে উঠবে।

হেনরী দি ফিফ্‌থ' চিত্রে অলিভার লরেন্স ও রেণী এ্যাসারসন

সিনেমার পত্রিকা বলে রূপ-মঞ্চকে যাঁরা তুচ্ছ করে থাকেন—তাঁদের মতবাদকে আমাদের ও তাচ্ছিল্যের সংগেই উড়িয়ে দিতে হবে। কারণ চলচ্চিত্র তাঁদের সুনজরে পড়েনি তাই চলচ্চিত্র সম্বলিত পত্রিকা কি করে তাঁদের সমাদর লাভ করবে? কিছুদিন হ'লো আমাদের বিজ্ঞাপন বিভাগের কোন প্রতিনিধি কোন বিখ্যাত ক্যামিকাল প্রতিষ্ঠানের কাছে হাজির হয়েছিলেন—রূপমঞ্চে তাঁরা বিজ্ঞাপন দেবেন কিনা তাই জানতে। তাতে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রচার সচিব উক্তি করেছেন, 'সিনেমার কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে আমাদের Moral এ বাধে।' অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, এদের Moral-এর দোরটা ঐ পর্যন্তই। সিনেমার অভিনেত্রী ত দূরের কথা, Extra girls দের সংগে—কি যে সব মেয়েরা ষ্টুডিওতে যাতায়াত করতে করতে সিনেমার গন্ধ একটু গায়ে লাগিয়েছে—বে-পাড়ায় বে-অবস্থায় তাদের সংগে

ইয়াতীম চিত্রে ইয়াকুব

রাত কাটাতে এইসব ধুরন্ধর নীতিবিদদের Moral এ বাধে না। এইসব শ্রেণীর নীতিবিদদের যদি রূপমঞ্চ বিশ্বাস অর্জন করতে না পারে এবং সেজন্য যদি রূপ-মঞ্চের গতি রুদ্ধ হয়েও আসে, রূপমঞ্চের সম্পাদক হিসাবে আমি রূপমঞ্চের এই ব্যর্থতায় আনন্দ অনুভব করবো। সিনেমার পত্রিকা বলে যাঁরা নাক সিঁটকোন না—অর্থাৎ সিনেমার প্রতি যাঁদের আক্রোশ নেই অথচ রূপ-মঞ্চ তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করতে পাচ্ছেনা—তাঁদের অভিযোগ মাথা পেতে নিয়ে রূপমঞ্চের ভুল ধরিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ জানাবো, যাতে ভবিষ্যতে আমরা সেই ভুলটির সংশোধন করতে পারি। জানি আজও আমাদের চিত্রশিল্প পংকিলতা ভেদকরে সুষ্ঠ ও কল্যাণের রূপ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে উঠতে পারেনি। কিন্তু দুরবীণের দৃষ্টিতে যাঁরা এর সেই কল্যাণের রূপের আভাসও পেয়েছেন—তাঁরা কোনমতেই একে তাচ্ছিল্যের আঘাতে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না। রূপ-মঞ্চের কাছে আজ সব চেয়ে বড় আদর্শ, এই শিল্প প্রতিমাকে পংকিল থেকে উদ্ধার করে জনসমাজের কাছে তার কল্যাণ ও সুষ্ঠু রূপের প্রচার করা।

এম, রহমন (১৩৩০ হালীসহর, চট্টগ্রাম)

(১) অশোক কুমার বাঙ্গালী হ'য়ে বাংলার কোন ছবিতে অভিনয় করেন না কেন? বোধ হয় আমাদের পরিচালকেরা সে চেষ্টা করেন নি। সম্প্রতি শুনলাম বড়ুয়া নাকি তাঁর 'পয়ছান' চিত্রে অভিনয় করবার জন্য অশোককুমারকে মনোনীত করেছেন। সে সংবাদ যদি সত্য হয় তবে তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে সুসংবাদ বৈকী!

(২) শুনলাম শ্রীমতী চন্দপ্রভাকে পয়ছান চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। এসংবাদ কি সত্য? চন্দ্র প্রভা কী বাংলা জানেন?

(৩) গত বৈশাখ সংখ্যায় আবদুল মত্তালেব মোল্লার 'মমতাজ শান্তি কি মুসলমান' প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন নিশ্চয়ই, পাকিস্থান বিরোধী খাঁটী মুসলমান। এখানে পাকিস্থান বিরোধী কথার উপর এত জোর দেওয়া হল কেন বুঝতে পারলাম না। আশা করি সম্পাদক মহাশয় একথা পরিষ্কার করে বুঝাতে চেষ্টা করে আমাদের সুখী করবেন। আমরা রূপমঞ্চের পাঠক পাঠিকা আপনাকে চিত্র জগতের একজন খাটি সাংবাদিক রূপেই পেতে চাই। আপনার কাছ থেকে রাজনৈতিক অথবা

সাত নম্বরের বাড়ীর মহীয়সী নারী

জাতীয়তাবাদ কিছুই আশা করি না। আপনি কেন এত সস্তায় আমাদের পাঁচ মেশালী পরিবেশন করতে চান। আশা করি আপনি ভবিষ্যতে আপনার সেই মতবাদ প্রচার না করে বিজাতীয় পাঠক পাঠিকাকে সুখী করবেন।

: (১) শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় পয়চান চিত্রে অভিনয় করবেন বলে অশোককুমার সম্পর্কে যে গুজব রটেছিল তা গুজবেই পরিনত হ'য়েছে। পরিচালকেরা চেষ্টা করেন নি, না অশোক কুমারের আগ্রহের অভাব কোনটা সত্য কি করে বলবো।

(২) চন্দ্রপ্রভাকে 'পয়চান' চিত্রে দেখা যাবে বলে যে গুজব শুনেছেন এখন অবধি তা সত্য বলে মেনে নিতে পারেন—তবে চিত্রের কাজ আরম্ভ না হওয়া অবধি সম্পূর্ণ সত্য বলে একে গ্রহণ করবেন না। পয়চান হিন্দি চিত্র তাই চন্দ্রপ্রভার বাংলা জানা না-জানার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

(৩) এখানে পাকিস্থান কথাটীর উপর এই জন্য জোর দেওয়া হয়েছে—যে মুসলিমলীগের পাকিস্থান পরিকল্পনার বাইরেও বহু মুসলমান আছেন—যাঁরা হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে স্বাধীন ভারতে বাস করবার আকাঙ্ক্ষা করেন। হিন্দু বা মুসলমান বলে তাঁদের পরিচয় থাকবে শুধু ধর্মের বেলায়—তাঁদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হবে—ভারতবাসী। হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান কোন পৃথক স্থানেরই এঁরা পক্ষপাতী নন। তাই পাকিস্থান বিরোধী বলা হ'য়েছে। জাতীয়তাবাদ বা রাজনীতির সংগে রূপমঞ্চের কোন যোগাযোগ নেই বলে আপনি রূপমঞ্চের আদর্শ সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন—তার উত্তরে বলতে হয়, রূপ-মঞ্চের আদর্শ সম্পর্কে আপনি অবহিত হতে পারেন নি। রূপমঞ্চের সামনে জাতীয় আদর্শই সবচেয়ে বড় আদর্শ। অর্ধ শতাব্দীর উপর ভারতের মুক্তি আন্দোলনের জন্য জাতীয় কংগ্রেস যে নিষ্ঠার সংগে বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন, রূপমঞ্চ সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শেই অনুপ্রাণিত। চিত্রও নাট্যকলার ভিতর দিয়ে জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনকে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—চিত্র ও নাটকের মধ্যদিয়ে জাতিকে এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা—সর্বোপরি জাতীয় আদর্শ উদ্বুদ্ধ সর্ব প্রকার কৃষ্টিমূলক আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে তুলতেই—রূপমঞ্চের আত্মপ্রকাশ।

নাগরিক অধিকার যদি আমাদের থাকতে পারে—রাজনীতি থেকে আমরা দূরে থাকতে পারি না। এ যে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। তবে কথা হচ্ছে—ব্যাক্তিগত ভাবে আমি যে কোন রাজনীতি মতবাদের পৃষ্ঠপোষক হইনা কেন—রূপমঞ্চের সম্পাদক হিসাবে রূপমঞ্চের পাঠক পাঠিকাদের যাতে ভ্রান্ত পথের নির্দেশ না দেই এইটুকু শুধু আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। রাজনীতি আর সাম্প্রদায়িকতা এক জিনিষ নয়। 'রূপমঞ্চ' যদি এই সাম্প্রদায়িকতার বিষে দুষ্ট হ'তো আপনার অভিযোগ আমি মাথা পেতে নিতাম। হিন্দু মুসলমানের একতায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হউক—রূপমঞ্চের এই হচ্ছে রাজনীতি আদর্শ।

'বিজাতীয়' পাঠক পাঠিকা বলতে আপনি কি মনে করছেন জানিনা। আপনার নাম দেখে মনে হচ্ছে আপনি মুসলমান ধর্মাবলম্বী। 'পাকিস্থান' বিরোধী কথাটিতে মনে হয় আপনি একটু অসুখী হ'য়েছেন। তাই আপনি কি আপনাকে অর্থাৎ রূপমঞ্চের মুসলমান পাঠক পাঠিকাদের 'বিজাতীয়' বলে মনে করেছেন? ছিঃ ছিঃ—তাই যদি করে থাকেন মস্তবড় ভুল করেছেন। 'বিজাতীয়' বলতে অভারতীয় বোঝায়। জাতি হিসাবে হিন্দু বা মুসলমান এক। যদি আমার উত্তরে আপনি খুশী হতে না পেরে থাকেন—অর্থাৎ যদি আমি কোনস্থানে অস্পষ্ট থেকে থাকি, আবার চিঠি লিখলে আপনার মনের ভুল ভাঙ্গাতে চেষ্টা করবো। সব সময়েই মনে রাখবেন, 'পাকিস্থান' বা 'হিন্দুস্থান' আমাদের কাম্য নয়, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আমরা উদ্বুদ্ধ হবো না, আমাদের কাম্য, আমাদের সংগ্রাম--আমরা সেই স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হবো, যে স্বাধীনতা ভারতবাসীর ভিতর কোন বিভেদের সৃষ্টি করবে না।

সমালোচনা ও নানা কথা

২৬শে জানুয়ারী

বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'কালিকার' নূতন নাটক '২৬শে জানুয়ারী' আমরা দেখে এসেছি। নাটকখানি নিয়ে বহু বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হ'য়েছে। আমাদের ভিতর যাঁরা নাটকখানি দেখে এসেছেন, তাঁরা সকলে আবার একমত হ'তে পারেননি। তাই আমাদের বর্তমান সমালোচনার বিরুদ্ধে যদি কারো কিছু বলবার থাকে, দর্শকসাধারণের সে মতবাদ রূপমঞ্চ সাদরে গ্রহণ করবে। শুধু '২৬শে জানুয়ারী' সম্পর্কেই আমাদের এই কথা নয়, রূপমঞ্চের যে কোন চিত্র ও নাট্য সমালোচনায় দর্শক সাধারণের সন্দেহ জাগবে, তাঁরা যেন প্রতিবাদ জানান। কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার না করে, সমগ্র দর্শক সমাজের মতবাদ যাতে রূপমঞ্চে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে—সে দায়িত্ব বাঙ্গালী দর্শক সমাজের।

জাতির মর্মভাঙা রক্তরাঙ্গা দিন এই '২৬শে জানুয়ারী'। প্রতিবছর এই দিনে জাতি নূতন করে তার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়—তারই পাটভূমিকায় রচিত নাটকের জাতির কাছে যে বিশেষ আকর্ষণ থাকবে একথায় কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে কর্তৃপক্ষ নাট্যামোদীদের একটু বিভ্রান্ত করেছেন নাটকখানির নাম '২৬শে জানুয়ারী' রেখে। '২৬শে জানুয়ারীর' মর্মভাঙা কথা নিয়ে আলোচ্য নাটকখানি রচিত হয়নি—নাটকটী রচিত হ'য়েছে প্রবঞ্চনা ও শঠতার উপর ধনীদের জন্মলাভ এই সত্যটীকে কেন্দ্র করে। এই সত্যটীকে '২৬শে জানুয়ারীর' উদ্যাপন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে। এই সত্যটীরও প্রয়োজন আছে—এবং এর আবেদন আমাদের শোষিত সমাজের কাছে কোন অংশে কম নয়। তাই কর্তৃপক্ষ অযথা '২৬শে জানুয়ারী' নামটার সুযোগ গ্রহণের লোভ না ছাড়তে পেরে, তাদের আন্তরিকতা বা শিল্প-মনের পরিচয় দেননি বরং দিয়েছেন সহজ 'বেনিয়া বৃত্তির'। তবু যতটুকু জাতীয়তাবাদ প্রকাশ পেয়েছে—এবং নাটকের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে '২৬শে জানুয়ারী'কে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এবং নাট্যকারের যে সদইচ্ছার আভাষ পেয়েছি—সেজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জাতির মর্মভাঙা অব্যক্ত বেদনা নাটকের মাঝে রূপ লাভ করুক—জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ যে কোন নাট্যামোদীরই তা আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু বৈদেশিক শাসনের দৌলতে যা আমরা বলতে চাই, বলতে পারি না, যা শুনতে চাই শোনাতে চাই—তা মনের মাঝেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে থাকে। পরাধীনতার জগদ্দল পাষাণ যাদের বুকে চাপানো, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা যে তারই ভারে নিষ্পেষিত। আমাদের নাট্যকারদেরও অযথা তাই দোষারোপ করলে চলবে না। প্রেস-এ্যাক্ট, স্টেজ এ্যাক্ট, সকল এ্যাক্টের হাত এড়িয়ে সুচতুর ভাবে নাট্যকার যতটুকু প্রকাশ করতে পেরেছেন, দেখতে হবে আমাদের জনগণ বা জনসাধারণের উপর তা কতখানি প্রভাব বিস্তার করলো এবং এই প্রভাব যদি আমাদের অনুকূলে হয়, আংশিক হ'লেও সে নাটকের সার্থকতা আছে। তাই ২৬শে জানুয়ারীর সার্থকতাকে অস্বীকার করতে পারি না।

'২৬শে জানুয়ারীর' বিরুদ্ধে আমাদের বন্ধুরা যে সব অভিযোগ করেছেন তার ভিতর প্রধানতঃ (১) গণ-আন্দোলনের কথা স্থান দিয়ে ইতিহাসকে অবমাননা করা হ'য়েছে অর্থাৎ নাটকে গণ-আন্দোলনের যে ইংগিত দেওয়া হ'য়েছে, যে সময়ের আখ্যানভাগ নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে তখন গণ-আন্দোলন রূপ নেয়নি।

(২) একজন কংগ্রেস সেবিকার হাতে হিংসাত্মক অস্ত্র দিয়ে কংগ্রেসের অহিংসা আন্দোলনের আদর্শকে ম্লান করা হ'য়েছে। (৩) মিলের কর্মীদের '২৬শে জানুয়ারী' উদ্যাপনে বাধাদান সম্পূর্ণ অবাস্তব। কারণ কোন দিনই দেশীয় কোন প্রতিষ্ঠান কোন জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করেনি। তাছাড়া আমাদের যা সংঘর্ষ তাত বৃটিশ সরকারের সংগে। (৪) মাইক্রোফোনের সাহায্যে যে নূতন প্রকাশ ভংগির পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে তাতে নাটকের মূল ধর্ম নষ্ট হ'য়েছে। এই গুলি ছাড়া আর যে যে অভিযোগ আছে তা গৌণ।

তাই এই চারটী অভিযোগ সম্পর্কে নাটকের সপক্ষে আমাদের কিছু বলবার আছে।

(১) ১৯৪০ এর পরের আখ্যানভাগ নাটকে স্থান পেয়েছে। নাটক অভিনীত হবার সময় দেয়ালে বা টেবিলের পর একখানি ক্যালেণ্ডার টাঙ্গিয়ে রাখা হয়, সুচতুর নাট্যামোদীরা এদিকে লক্ষ্য করে থাকবেন, তাহ'লে এ বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকবে না।

(২) ইন্দু মুখার্জি অভিনীত মিঃ মজুমদার একটি বিশেষ টাইপের ধনীর চরিত্র। তার উপর উত্তক্ত হ'য়ে প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে একজন কংগ্রেস সেবিকা রিভলভার হাতে উত্তেজিত ভাবে যখন বেরিয়ে পড়েন, তখন নাট্যকারের প্রতি আমাদের সন্দেহ জাগাটা স্বাভাবিক, কিন্তু পরের দৃশ্যে যখন দেখতে পাই, নাট্যকার পিছু পিছু উক্ত সেবিকার ভুল সংশোধন করাতে আর একজন কংগ্রেস সেবককে পাঠিয়েছেন, তখন কংগ্রেসের আদর্শ তিনি ক্ষুন্ন করেছেন বলে তাঁকে অভিযুক্ত করতে পারি না। কারণ কংগ্রেসের ভিতর এরূপ কর্মীর সংগে যথেষ্ট পরিচয় আছে, যাঁরা মনে প্রাণে কংগ্রেসের আদর্শকে উজ্জল করে তুলতে, সার্থক করে তুলতে প্রাণপাত করছেন অথচ মাঝে মাঝে এমন ভুল করে বসেন যে, যাতে কংগ্রেসের মর্যাদা অনেকখানি ক্ষুন্ন হয়। তাইবলে তাদের কর্ম প্রচেষ্টা, কংগ্রেসের বা দেশের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রতি সন্দেহ জাগবার কোন কারণ থাকতে পারে না, বরং যাঁরা এরূপ ভুল পথে পা বাড়ান না তাঁরা এদের এই ভুল সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এখানেও নাট্যকার সেই নির্দেশই দিয়েছেন। এবং আলোচ্য নাটকে কংগ্রেস সেবিকাকে ভুলের

'দুই-পুরুষ' চিত্রে চন্দ্রাবতী

মাঝে টেনে এনে যে দৃশ্যের অবতারণা করেছেন তাতে মিঃ মজুমদারের চরিত্রের নীচতা আরও স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। (৩) আমাদের সংগ্রাম বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু বৃটিশ সরকারের অন্নেপুষ্ট যে সব পরভোজীর দল দেশের প্রগতিবাদের কণ্ঠ রোধ করে রেখেছে তাদের সংখ্যা কী দেশে কম? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই সব পরপুষ্টদের সম্পর্কে দুঃখ করে বলতেন, 'ঘরের ইন্দুরে বাঁধ কাটলে সে বাঁধ টেকে না।' আমাদের ঘরের এই বিভীষণদের বিরুদ্ধেও আমাদের যে সংগ্রাম আছে তাকে অস্বীকার করতে পারি না। দেশীয় বা বিদেশীয় শোষক শ্রেণীতে কোন প্রভেদ নেই

এক বাইরের কালো আর সাদা রং ছাড়া। তাছাড়া যদি কেউ বলেন, দেশীয় কোন ধনী বা মিল মালিক জাতীয় সংগ্রামে কোনদিন বাধাদান করেন নি তাও স্বীকার করে নিতে পারবো না। যিনি এই অভিযোগ করবেন তাঁকে বলবো, কোন জাতীয় আন্দোলনের সংস্পর্শে তিনি আসেন নি। মিলের মালিকত দূরের কথা, অনেক স্কুলের কর্তৃপক্ষও স্কুলের প্রাঙ্গণে জাতীয় অনুষ্ঠানে বাধাদান করে থাকেন।

(৪) সংস্কৃত নাটক, সেক্সপীয়র বা সমসাময়িক ইংরাজী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বহু বাংলা নাটকে স্বগোক্তির প্রচলন ছিল। তখন, যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মঞ্চকে নিখুঁত রূপ দিতে সাহায্য করেনি এই স্বগোক্তি সহ্য করেছি। একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে একজন স্বগোক্তি করছেন, চীৎকার করে (দর্শকদের কানে যাওয়া চাইত!) অথচ তার পাশ্বে দাঁড়িয়ে আর একজন অভিনেতা তিনি কিছু শুনছেন না, এটা কী রস গ্রহণে অনেকখানি বাধা দান করে না? ধীরে ধীরে এই স্বগোক্তি নাট্যকারও দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়তা হারালো। পরবর্তী কালের নাটকে তাই স্বগোক্তি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বর্জন করা হয়েছে। মানুষের মনের দু'টো গতি আছে। বহিঃপ্রকাশ ও অন্তরপ্রকাশ। যেটা আমরা বলি বা করি বহিঃপ্রকাশ, যেটা আমরা বলি না বা করি না অন্তরপ্রকাশ। মনের এই দু'টো গতি পাশা পাশী চলে। যখনই কোন কিছু বলি বা করি তখনই আর একটি মনের মাঝে বলে চলে, এই বলটা বা করাটা কী উচিত হলো? স্বাগোক্তি

হচ্ছে এই অন্তরপ্রকাশ জিনিষটী। স্বগতোক্তির দ্বারা মনের ভিতর যে দ্বন্দ চলে তাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই নাটকে স্বগতোক্তির প্রচলন ছিলো। কিন্তু নূতন নূতন প্রকাশ ভংগীতে যখন মঞ্চ গরীয়ান তখন ৫।১০ মিনিটের স্বগতোক্তি রস সৃষ্টির চেয়ে রসহানিই করতে লাগলো। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে, বিজ্ঞানের সাহায্যে আধুনিক নাটকে যে ভাবে তাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রসসৃষ্টির দিক দিয়ে তা অপূর্ব। 'সবশিশুদের দেশে' শিশুনাটিকাভিনয়ে কয়েক বছর পূর্বে রূপমঞ্চ কর্তৃপক্ষ এই টেকনিক গ্রহণ করেছিলেন, আমাদের সে শিশু-নাট্যাভিনয় নানাকারণে সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও এই টেকনিকের প্রশংসা অনেকেই করেছিলেন। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের হাতে তার পূর্ণ বিকাশ দেখে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যশস্বী কবি ও অভিনেতা হরীন্দ্রনাথকে এই টেকনিক প্রবর্তনে দেখেছি। পিপ্‌লস থিয়েটারের বন্ধুরাও এর আংশিক সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন—। তবে এর পূর্ণ বিকাশ দেখলাম ২৬শে জানুয়ারীতেই সর্ব প্রথম। যাঁরা এই টেকনিককে গ্রহণ করতে পারেননি, তাদের রসগ্রাহী দর্শক বলতে পারবো না।

নাটকটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে নাট্যকার এবং কর্তৃপক্ষ যে চেষ্টা করেছেন, সেদিক থেকে কৃতকার্য হ'লেও নাটকের মূল আদর্শ যেমনি ক্ষুন্ন হয়েছে তেমনি একটা ডিটেকটিভ সস্তা প্যাঁচ এসে মর্যাদা হানিও যথেষ্ট করেছে। চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে রঞ্জিতরায় অভিনীত চরিত্রটী, মিঃ মজুমদার এবং মলিনা অভিনীত নায়িকার চরিত্রটী যেমনি অপূর্ব তেমনি অভিনয়ে আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। নায়িকার ভুমিকায় শ্রীমতী মলিনার অভিনয় যে কোন দর্শকের মন কেড়ে নেবে। নাট্যকারের নূতন টেকনিক যে সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে তাতে শ্রীমতী মলিনার যে অনেকখানি কৃতিত্ব রয়েছে, এই কথা যদি বলি একটুকুও অত্যুক্তি করা হবে না। তারপরই বলতে হয় ইন্দু মুখার্জি এবং রঞ্জিৎ রায়ের কথা। এঁদের চরিত্র দু'টো আমাদের বহু চেনা—যেন আশপাশে ঘুরে বেড়ায়—অভিনয়ে আরও নিখুঁত হ'য়ে ফুটে উঠেছে। নায়কের ভূমিকায় ধীরাজকেও প্রশংসা করবো। চরিত্রটীর মূল আদর্শ তাঁর মাঝে একটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। মাষ্টার মিন্টু এবং বেলারাণীও প্রশংসার যোগ্য। নরেশ মিত্র মহাশয়ের কথাও উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস সেবিকা রূপে 'বন্দনা'কে মানিয়েছে, তবে তার হাব ভাব, কথাবার্তা—চরিত্রটীর মর্যাদাহানী করেছে। এসব চরিত্রে একটু শিক্ষিত অভিনেত্রী, অন্ততঃ জাতীয় আন্দোলনের সংগে যার প্রাণের যোগাযোগ আছে—তার উপর ভার পড়লে চরিত্রটীর সার্থকতা ফুটে উঠতো। জ্যোতির্ময় কুমারের মেয়েলীপনা অসহ্য। নীতীশ চৌধুরীকে কোন অভিনেতার পদমর্যদা দিতে পারি না।

আর একটী অভিযোগ নাটক সম্পর্কে, সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় আন্দোলন প্রচার করা হয়েছে এরূপ কোন দিন ত শুনিনি—এখানটায় নাট্যকার খুব সস্তা প্যাঁচ কসতে গেছেন। ফণী রায়ের রূপ-সজ্জা এবং অভিনয় প্রশংসনীয়—তবে তার চরিত্রটীর জন্য নাটকে ডিটেকটিভ-এর গন্ধ এসে গেছে। নাটকের দৃশ্যপট সম্পর্কেও আমাদের কোন অভিযোগ নেই।

কঙ্কাবতীর ঘাট—নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত লিখিত সর্বপ্রথম সামাজিক নাটক কঙ্কাবতীর ঘাট-এর পঞ্চাশৎ রজনীতে আমরা উপস্থিত ছিলাম। এই নাটকখানি সর্বপ্রথম অধুনালুপ্ত নাট্যভারতী রঙ্গ-মঞ্চে অভিনীত হয়। অহীন্দ্র চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণীবালা, সাবিত্রী প্রভৃতি অভিনেতা অভিনেত্রীরা বিভিন্ন অংশে অভিনয় করেন। নাটকখানির বিষয় বস্তুর সংগে আমরা একমত হ'তে না পারলেও, নাটকখানি যে—জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাকে অস্বীকার করতে পারি না। ষ্টারের আবহাওয়ায় কঙ্কাবতীর অভিনয় কিরূপ সাফল্য অর্জন করে তা দেখবার আমাদের কিছুটা আগ্রহ ছিল। এবং অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনীত মিঃ মুখার্জি, রবি রায়ের অভিনয়ে কিরূপ রূপ লাভ করে তা দেখবার জন্যও উৎসুক ছিলাম। নাট্য ভারতীর ঘূর্ণায়মান রঙ্গ-মঞ্চে অভিনীত নাটক ষ্টার রঙ্গমঞ্চের স্থিতিশীল মঞ্চে অভিনীত হওয়াতে

বন্দিতা নারী—

যুগে যুগে ভারতীয় নারী তাঁর প্রেম, সেবা ও আত্মত্যাগের মহিমায় মানব সমাজে পরম শ্রদ্ধার আসন লাভ করে এসেছে। পুরুষের জন্য, স্বামী ও সন্তানের জন্য আকণ্ঠ গরল পান করতেও দ্বিধা করেনি—সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা হাসিমুখে এই নারী বুক পেতে নেয়। নারীর এই ত্যাগের মাঝেই তার নারীত্ব—তার সার্থকতা।

পশ্চিমের বিষ-বাষ্পে আজিও এ-নারীর অপমৃত্যু হয়নি—আজিও তার নারীত্ব অম্লান। অরুণালোকিত উষার পবিত্রতা তার সর্বাংগে—আরক্তিম সন্ধ্যার মাধুর্যে সে ভরপুর—সর্বংসহা ধরিত্রীর প্রতীক সে। তাইত সে সর্বজন বন্দিতা।

এই বন্দিতা নারীর মহিমা নিয়ে গেথে উঠেছে নিউ টকীজের সর্বজন প্রিয় বাণীচিত্র বন্দিতা, এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্স পরিবেশিত এই বন্দিতা-নারীর বন্দনায় মিনার—ছবিঘর—বিজলী প্রেক্ষাগৃহ দর্শক সমারোহে মুখরিত—আপনিও এই বন্দনায় যোগদান করে তার সার্থকতাকে উপভোগ করুন!

একটুকুও তার গতি রুদ্ধ হয়নি এজন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদই জানাবো। মিঃ মুখার্জির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবি রায়, চামেলীর ভূমিকায় অপর্ণা, গুণ্ডার ভূমিকায় কমল মিত্র, শীলার ভূমিকায় শ্রীমতী পূর্ণিমা, লালমোহন আঢ্যের ভূমিকায় ভূমেন রায়, এবং প্রবীরের স্ত্রীর ভূমিকায় বীণা দেবী আমাদের আনন্দই দিয়েছেন। রবি রায়ের কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়—অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনীত চরিত্রটীর মর্যাদা রবি রায়ের অভিনয়ে একটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। তবে এই ধরণের নাটকের কোন সার্থকতা আছে কি না আমরা মনে করি না। ওদিন অভিনয় প্রারম্ভে কঙ্কাবতী ঘাটের অভিনেতা ও অভিনেত্রী ও অন্যান্য কর্মীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। কর্তৃপক্ষের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

ধাত্রী পান্না—শচীন সেনগুপ্ত রচিত ঐতিহাসিক নাটক ধাত্রী পান্নার পঞ্চাশৎ অভিনয় রজনীতে আমরা উপস্থিত ছিলাম। ধাত্রী পান্না নাটকের সমালোচনা ইতিপূর্বে আমরা প্রকাশ করেছি। 'ধাত্রী পান্নার' সার্থকতা প্রত্যেক নাট্যামোদীই স্বীকার করবেন। বর্তমানের হিংসা লোলুপ—প্রতিহিংসা পরায়ণ জাতির কাছে মহিমময়ী ধাত্রী পান্নার আত্মপ্রকাশ খুবই সময়োপযোগী হ'য়েছে। খ্যাতিমান নট ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় ধাত্রীপান্না নাট্যামোদীদের আনন্দ দানে সমর্থ হয়েছে। এরূপ একখানি সার্থক নাটক উপহারের জন্য আমরা কর্তৃপক্ষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওদিন উৎসব বাসরে মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ অভিনেতা, অভিনেত্রী, শিল্পী ও কর্মীদের পুরস্কৃত করেন। এই পুরস্কারের ভিতর 'ক্রাঙ্কস করনা'র থেকে ছবি বিশ্বাসকে যে অভিনন্দন পত্রটী দেওয়া হয় তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ক্রাঙ্কস করনার' অর্থাৎ ছিটগ্রস্তদের আড্ডা। বেশীর ভাগ শিল্পীরা একটু ছিটগ্রস্ত, তাই শিল্পীদের নিয়েই গড়ে উঠেছে এই 'ক্রাঙ্কস করনার'। ক্রাঙ্কস করনার এর বন্ধুদেরও আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি।

ভারত নাট্যম—মিঃ বি, শেষাপ্পার প্রযোজনায় কলিকাতায় বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত 'ভারত নাট্যম' নৃত্য জলসা দেখবার সুযোগ আমাদের হ'য়েছে। ভারতীয়

নৃত্যে 'ভারত নাট্যম' একটী বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ভারতীয় নৃত্যে দাক্ষিণাত্যের দান প্রচুর। আলোচ্য নৃত্যানুষ্ঠানে যোগম এবং মঙ্গলম এই দুইজন শিল্পীর সংগেই আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। এই দুইজন শিল্পী নিয়েই এই নৃত্য জলসা অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। এবং 'ভারত নাট্যম' এর নিখুঁত রূপ এরা ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। ক্লাসিক নৃত্য যাঁরা পছন্দ করেন—তাদেরই উক্ত অনুষ্ঠান আনন্দ দেবে। তবে কথা হচ্ছে, সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে এই দলটী কলকাতায় এসেছেন—তাদের কয়েকটী বিষয়ে আরও সতর্ক হ'য়ে আসা উচিত ছিল। অবশ্য এক যদি 'ভারত নাট্যম' এর প্রচার উদ্দেশ্যেই হয় এই অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত সত্য, তবে আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু যেখানে 'Public Show' করা হচ্ছে সেখানে public এর মনোরঞ্জনের দিকে দৃষ্টিপাত দেওয়া উচিত ছিল। presentationএর দিক থেকে কর্তৃপক্ষের বহু অজ্ঞতাই সহজে ধরা পড়ে। তারপর মাত্র দু'জনশিল্পীর পক্ষে সবগুলি নৃত্যানুষ্ঠান যেমনি কষ্টসাধ্য তেমনি দর্শকদের চোখেও তারা একঘেয়ে হ'য়ে ওঠেন। আলোচ্য শিল্পীদের ভিতর শ্রীমতী যোগমকে glamour এবং নৃত্যের সংগতির দিক থেকে প্রশংসা করবো—তবে তার অভিব্যক্তির অভাব। শ্রীমতী মঙ্গলম এর অভিব্যক্তি এবং সংগতির অভাব হয়নি। কিন্তু তাঁর নৃত্য দেখে মনে হয়, এখনও সব নৃত্যগুলি সে রকম করায়ত্ব হয়নি। মোটের উপর কর্তৃপক্ষ যে নিখুঁত 'ভারত নাট্যম' নৃত্য পদ্ধতির সংগে আমাদের ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ দিয়েছেন এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং শ্রীমতী যোগম ও মঙ্গলম ভবিষ্যতে আরো উন্নতি লাভ করুন তাই আমরা কামনা করি।

হেনরী দি ফিপথ—ব্রিটিশ ডিসট্রিবিউটরস পরিবেশিত লরেন্স অলিভার প্রযোজিত সেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটক 'হেনরী দি ফিপথ' এর চিত্ররূপ আমরা দেখে এসেছি। অমর কবি এবং নাট্যকার উইলিয়াম সেক্সপীয়রের সম্পর্কে নূতন করে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। ষোড়শ শতাব্দীর সেক্সপীয়র আজও সমানে জনপ্রিয়তা নিয়ে বিরাজ করছেন আমাদের অন্তরে। ১৫৯৯ খৃঃ ইংলণ্ডে গ্লোব থিয়েটারে সর্বপ্রথম 'হেনরী দি ফিপথ' অভিনীত হয় এবং বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মঞ্চ আদর্শে আলোচ্য চিত্রখানির প্রকাশ ভংগি ভারী চমৎকার। ষোড়শ শতাব্দীতে গ্লোব থিয়েটারে 'Henry the 5th' অভিনীত হচ্ছে—আর তারই যেন একটা চিত্ররূপ দেখানো হচ্ছে। এতে তদানীন্তন ইংলণ্ডের মঞ্চ ও তার অভিনয় পদ্ধতি সম্পর্কেও আমাদের খানিকটা জ্ঞান জন্মে। এবং ছবিটী দেখতে দেখতে যেন সেই যুগেরই একজন, এরূপ অভিভূত হ'য়ে পড়তে হয়। বর্ণ বৈচিত্রে—অভিনয় নৈপুণ্যে—দৃশ্য পরিকল্পনায় সব দিক দিয়ে হেনরী দি ফিপথ একখানি আদর্শ চিত্র। যে কোন class-cinema-goers দের যে 'হেনরী দি ফিপথ' ভাল লাগবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এরূপ একখানি মনোরম চিত্রোপহারের জন্য আমরা বিটিশ ডিসট্রিবিউটর্সের কর্তৃপক্ষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অভিনয়ে হেনরীর ভূমিকায় খ্যাতনামা অভিনেতা লরেন্স অলিভার এর নামই সর্বাগ্রে বলতে হয়। অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরাও প্রশংসনীয়।

'নিউ সেঞ্চুরীর মানে-না-মানা'—

হাসির আড়ালে মানুষের মনের প্রত্যেকটি অনুভূতিই আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারে। ভয়, লজ্জা, ভালবাসা, মর্মন্তুদ বেদনা, রাগ অভিমান, বিপদের সম্মুখীন অস্থিরতা, সব কিছুরই ছায়া হাসির মুকুরে ফুটে উঠতে দেখা যায়। যেমন ভূতনাথ ওরফে ভুতুর কথা শুনে বা ভাব-ভংগী দেখে মাঝে-মাঝে না হেসে উপায় নেই, অথচ সে ছোট গ্রামের সীমার মধ্যে থেকেও একটি বৃহত্তর কল্যাণের রূপ নিয়ে যেতে উঠেছিল। সে চেয়েছিল লাঞ্ছিত মানবাত্মার মুক্তি, হতাশা থেকে মুক্তি, অবিচার মানুষকে যে সমান অধিকার হ'তে বঞ্চিত ক'রে সেই বঞ্চনা থেকে মুক্তি।...

দেবু মুখুজ্জের স্নেহশীল মনের আত্মপ্রকাশের ধারাটি, হাস্যোদ্দীপক। দেবুর শাশুড়ীর কথায় ও ব্যবহারে যে কোনও মানুষ রাগে জ্বলে উঠতে পারে—কিন্তু দেখবো আপনারা হাসছেন। শিবানী ও রাণীর যৌবনের সংগে হাসিও যেন উপচে পড়ছে—অবশ্য সে হ'চ্ছে তাদের যৌবন প্রফুল্লতার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, প্রাণ চাঞ্চল্য। হাসি

দিয়ে আপনারা তা' সামলাবার চেষ্টা করবেন। পাশের গাঁয়ের শিক্ষিত তরুণ প্রণয়-পীড়িত জমিদারটির ভাব-ভংগী দেখলে হাসতেই হয়—কিন্তু প্রণয়ের যে হাসির খোরাক জোগায় সে হাসি কৌতুক মধুর।...এ ছাড়াও আছে বৃদ্ধ মামা ফণী রায় ও তার দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা শ্রীমতী সাবিত্রী আর আছে নবদ্বীপ হালদার, রঞ্জিত রায় ও আশু বসু।

এত হাসির মধ্যেও আপনার-আমার প্রতিদিনের জীবন, হৃদয়ের বেদনা ও রহস্য 'মানে-না-মানা'-র কাহিনীটিকে নিজেদের জীবনের কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছে। আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে 'উত্তরা' 'পূরবী' ও পূর্ণ-র রূপালী পর্দায় ছবিখানির প্রদর্শন সুরু হবে। (এ, টি, ডি,)

সাতনম্বর বাড়ী—পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তকে এক কথায় বলতে হয়—চতুর-শ্রেষ্ঠ। পাঠক পাঠিকারা যখন তাঁর খুব বেশী খোঁজাখুঁজি কচ্ছিলেন—কী খবর তাঁর, কোথায় আছেন—কী করছেন—এমনি একদিন দুপুরে খোঁজ নিতে বেরিয়ে পড়লাম। ৮৭নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট এম, পি প্রডাকসন্সের অফিসে। নন্দ বাবুকে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি বল্লেন, হ্যাঁ সুকুমার বাবু এখানেই আছেন তবে তার দেখা পাবেন—সাত নম্বর বাড়ীতে বেলা ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা অবধি।' পরের দিন যথাসময়ে একটু পূর্বেই বেরিয়ে পড়লাম—কারণ নন্দবাবু লোকটী আবার বিশ্বাস-যোগ্য নন—যা বলেন তিনি, তাতে তাঁর নিজেরই বিশ্বাস নেই। এ হেন মানুষটীকে কী আর বিশ্বাস করা চলে? তবু যখন উপায়হীন, করতে হলো। সাত নম্বর বাড়ী খুঁজে কড়া নাড়লাম। বন্ধুবর বিমল ঘোষ বেরিয়ে এলেন—তিনি আশ্বাস দিলেন, "হ্যাঁ সুকুমার বাবু এখানেই আছেন—আসুন অতি সন্তর্পণে।" চুপি চুপিত ঢুকলাম। সুকুমার বাবুর সাক্ষাৎ মিল্লো—চেয়ারে বসে একটা খাতা নিয়ে পড়ছিলেন। খব খব হয়ে একটী বুড়ি তাঁর সামনে বসে রূপকথার কাহিনীর সেই পবন-বুড়ির মত—চুলগুলি তাঁর সাদা। বার্ধক্যের জীর্ণতা চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। কলেজ-পড়া একটী মেয়ে তাঁর পার্শ্বে। এক মাড়োয়ারী ওখানে এখানে ঘুরছেন—স্যুট পরে আর এক

ভদ্রলোক খুব গম্ভীর চালে পাখার কাছে মাথা দিয়ে শুয়েছিলেন—তিনি নাকি কোন মিলের মালিক—তার পার্শ্বে অর্ধপক্ক কেশ বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক, খুব চেনা মনে হলো, ওর ম্যানেজার—গেরুয়া বর্ণের পোষাক পরিহিত কয়েকজন ছেলে এখানে ওখানে চলা-ফেরা কচ্ছে। কিছুই ঠাহর করতে পারলুম না। কোথায় এসে পড়েছি—আবার ক্রেধা ক্রেধা ধা ধা ধা তেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক ধাগিন ধা তেরে কেটে ধাতি কৎ থুন্না কেটে তাক তেরে কেটে তাক ধাগিন ধা ধাগিন ধা ধাগিন ধা—ধ্বনি এসে কান ঝালা পালা করে দিচ্ছিল। সবই যেন একটা হেঁয়ালীর মত মনে হলো। বন্ধুবর বিমল ঘোষকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, একোথায় এলাম? নন্দ বাবু কোথাকার ঠিকনা দিলেন? বেপাড়ায় এসে শেষ কালে প্রাণটা দেবো। বন্ধুবর বিমল ঘোষ ভরসা দিয়ে বল্লেন, 'ভয়নেই বেপাড়ায় আসেননি, বাড়ীও ভুল হয়নি। এই, সাত নম্বরের বাড়ী। এই সাত নম্বর বাড়ীর মালিক ছিলেন একজন নাম করা দেশখ্যাত গায়ক। আজ সংগীতে যেসব শিল্পীরা ভারতে খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁরা অনেকেই এই ওস্তাদের ছাত্র ছিলেন। তিনি আজ আর নেই—ঐ যে দেখছেন বৃদ্ধাটী ওনি তার বিধবা স্ত্রী। আর ঐ একমাত্র মেয়ে তার পার্শ্বে। এই বাড়ীটী এখনও সংগীতচর্চার প্রধান কেন্দ্র—এখানে যে সব ছাত্রেরা সংগীত চর্চা করেন তারাই ঐ বৃদ্ধার ছেলে। এবার আরো খোলসা করে বলি, এরই পট ভূমিকায় সুকুমার বাবুর বর্তমান চিত্রের কাহিনী গড়ে উঠেছে। ঐ বৃদ্ধার রূপসজ্জায় যাকে দেখছেন, তিনি আর কেউ নন, ভারতীয় ছায়া জগত ও নাট্যমঞ্চের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মলিনা দেবী। কলেজীপড়া মেয়েটী আমাদের সাবিত্রী। মাড়োয়ারীর বেশে যাকে দেখছেন, ঐ দেখুন পাগড়ীটি খুলেছেন এবার চিনতে অসুবিধা হবে না—আমাদের সন্তোষসিংহ। ম্যানেজারটিকে এখনও চিনতে পারেন নি বুঝি? আমি বল্লাম, না—তবে মিল মালিকটিকে যেন দেখতে ছবি বাবুর মত মনে হচ্ছে।' 'হ্যা। আর ম্যানেজারটী হচ্ছেন, যাকে খেলার মাঠথেকে আরম্ভ করে ট্রামে, বাসে, চায়ের দোকানে, ছায়াছবি নাট্যমঞ্চ সর্বত্র দেখে থাকেন। বিমলবাবুর এত করে বিশ্লেষণেও ম্যানেজারটীকে আবিষ্কার করতে পারলুম না। চোখের 'পাওয়ার' বেড়েছে বলে নিজের অজ্ঞতাকে চাপা দিলাম। তখন বিমল বাবু বল্লেন, আরে ওযে আমাদের মুলালদা অর্থাৎ আপনাদের জহর গাঙ্গোপাধ্যায়।

এরা সব গেরুয়া পড়ে ঘুরছে কেন? কোন সম্প্রাদায়ভুক্ত নাকি? 'এরা ঐ বৃদ্ধার ৬টি ছেলের চরিত্রে অভিনয় করছেন, যে রং এর পোষাক পরে আছেন—ক্যামেরার চোখে ঐ রং খুব লোভনীয় নইলে সাদা কাপড় জামা পরলে তা ভাল আসবে না।' একথাটী আবিষ্কার করলাম বিমলবাবুর কাছে থেকে। একটু বাদেই স্যুটিং আরম্ভ হলো। কয়েকটী দৃশ্য গ্রহণের পর চায়ের জন্য সব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সুকুমার বাবু এবার এসে আমাদের পার্শ্বে বসলেন। আলাপ আলোচনায় বুঝলাম, সাত নম্বরের বাড়ীর মূল বা প্রাণ হচ্ছে সংগীত। এই সংগীতের অপূর্ব স্বর লহরীতে দর্শক-মনমুগ্ধ করবার সহজ উপায়টী সুকুমার বাবু গ্রহণ করেছেন, তাই তাকে চতুর শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যা দিলাম। সুকুমার বাবু আশ্বাস দিলেন, শুধু মন দেয়া নেওয়া সংগীতের আকর্ষণে আমি দর্শকদের মুগ্ধ করবো না। সংগীতের উৎকর্ষের পরিচয়ও তাঁরা পাবেন, এজন্য ভাল ভাল জনপ্রিয় ওস্তাদ গাইয়েদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। সুর সংযোজনার ভার দেওয়া হয়েছে শ্রীযুক্ত রবীন চট্টোপাধ্যায়কে। ঋতুভেদে রাগরাগিনীর বিভিন্নতার সংগে রবীন বাবু দর্শকদের পরিচিত করিয়ে দেবেন। যা আজ পর্যন্ত কোন সুর শিল্পী দেশীয় ছায়াচিত্রের মারফৎ করেননি। সাতনম্বরের বাড়ীর খুটিনাটি নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলাম। এর বিভিন্নাংশে সন্ধ্যারাণী, কমলমিত্র, মিহির ভট্টাচার্য, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা এবং আরো অনেকে আছেন। চিত্রগ্রহণের ভার পড়েছে নবীন চিত্রশিল্পী বিভূতি লাহার ওপর। শব্দগ্রহণ করছেন যতীন দত্ত। সাত নম্বরের বাড়ী তার স্বকীয়তায় দর্শকসাধারণের অন্তর জয়

করতে আত্মপ্রকাশ করুক সেই আশাই আমরা করি।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ সমিতি

(Cine Technicians Association of Bengal)

বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ সম্মিলিত হ'য়ে এই সমিতি গড়ে তুলেছেন। বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের সর্ব প্রকার টেকনিক্যাল উন্নতি, বিশেষজ্ঞদের ভিতর নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক পন্থা নিয়ে গবেষণা ও নিজেদের সর্ব প্রকার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখবার জন্য এই সমিতি গড়ে উঠেছে। গত ১১ই আগষ্ট শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর ৪২, হরিশ মুখার্জিরোডস্থিত বাসভবনে এদের প্রথম অধিবেশন হয়—এবং বিভিন্ন ষ্টুডিওর প্রতিনিধি নিয়ে একটা কার্যকারী সমিতি গঠিত হয়েছে। সভাপতি, শ্রীযুক্ত অতুল চাট্টাপাধ্যায় (এসোসিয়েটেড প্রডাকসন) সহ-সভাপতি, (১) বিমল রায় (নিউথিয়েটার্স), (২) নীরেন লাহিড়ী (পরিচালক) সাধারণ সম্পাদক : শম্ভূ সিং (অরোরা সটুডিও) যুগ্ম সম্পাদক : মান্না লাডিয়া (শ্রীভারত লক্ষ্মী পিকচার্স), কোষাধ্যক্ষ : পরিতোষ বোস (কালী ফিলমস্), কার্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (পরিচালক), গৌরদাস (ইন্দ্রপুরীষ্টুডিও), বাণী দত্ত (নিউথিয়েটার্স) বিভূতি লাহা (কালী ফিল্মস), জি, কে মেঠা (ইউনিটি প্রভাকসন্স) বি, কে মেঠা (ইউনিটি প্রভাকসন), কে, এন, পাঠক (এসোসিয়েটেড প্রডাকসন) বঙ্কুরায় (অরোরা ষ্টুডিও), বি, জি, শিন্ধা (রাধাফিল্মস), গোবিন্দ ব্যানার্জি (রাধাফিল্মস), সুহৃদ ঘোষ (ফিলম সার্ভিস) অনিল ব্যানার্জি (ফিলমসার্ভিস), জগৎরায়চৌধুরী (শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স) বিভূতি দাস, অমরদত্ত।

চিত্রবাণী লিঃ

গত ১৩ই শ্রাবন ১৩৫২ রবিবার ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এক-জন নবাগতাকে নিয়ে চিত্রবাণী লিঃ নবতম চিত্রের প্রারম্ভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীযুক্ত ধীরেশ ঘোষ ও মানু সেন এই চিত্রের যুগ্ম পরিচালক। চিত্রবাণীর কর্ণধার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস ও অপরাপর কর্তৃপক্ষ অভ্যাগত দিগকে আপ্যায়িত করেন। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দের, 'এই তো জীবন'এর কাহিনী অবলম্বন করে এই চিত্র খানা গেথে উঠবে।

ভ্যারাইটী পিকচার্স

ভ্যারাইটী পিকচার্সের হিন্দিচিত্র পি ডব্লিউ, ডির মহরৎ উৎসবদিনে স্যার এন, এন, সরকারের অকস্মাৎ মৃত্যুতে উৎসব বন্ধ থাকে। তবে প্রাথমিক মাঙ্গলিক কার্য শেষ করে রাখা হ'য়েছে। প্রবীন পরিচালক শ্রীযুক্ত জ্যোতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শীঘ্রই চিত্রটীর কাজ আরম্ভ হবে।

ভ্রম সংশোধন সম্পাদকের দপ্তরে আমাদের চিত্র ও নাট্য প্রতিষ্টানগুলি রবীন্দ্রস্মৃতি ভাণ্ডারে কোন সাহায্য প্রদান করেননি বলে যে অভিযোগ করা হ'য়েছে, আমরা তা সংশোধন করে নিচ্ছি। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রস্মৃতি ভাণ্ডারের সাহায্য কল্পে মিনার্ভা ও রংমহলের মিলিত প্রচেষ্টায় চিরকুমার সভা অভিনীত হ'য়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন চিত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ৪০ হাজারের উপর অর্থ সংগৃহীত হ'য়েছে।

রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার-এর

সাহায্যকল্পে রূপ-মঞ্চের পাঠক পাঠিকা ও পৃষ্ঠপোষকবর্গে'র নিকট হ'তে তৃতীয় দফায় প্রাপ্ত অর্থের তালিকা—

শ্রীযুক্ত এস, আর, ব্যানার্জি (এডেন, করাচী)র মারফত—

ক্যাপ্টেন পি, কে, মুখার্জি	(আই, জি, এইচ)	১৫৲
ক্যাপ্টেন কাসেম	(আই, জি, এইচ)	৫৲
মেজর চ্যাটার্জি	(আই জি, এইচ)	৫৲
এন, সি, ব্যানার্জি	(অর্ডন্যান্স ডিপ)	১০৲
টি, পি, দে	(আর, ই, এম, ই)	২৲
এস, আর, দে	(আর, ই, এম, ই)	২৲
ডাঃ এস, কে, সরকার	(এস, কে ওথমন)	১০৲
মিঃ সেন	(ক্রাটার)	২৲
এ, রহিম	(এডেন ডব্লিউ টি)	২৲
বেন ডি, ক্রুজ	(,,)	২৲
এইচ, সোনস	(,,)	১৲
এন, কে, স্বামী	(,,)	২৲
এম,এন, সি নায়ার	(,,)	১৲
এইচ, এ, সাব্বী	(,,)	১৲
আর, সি, নায়ার	(,,)	১৲
কে, এস, নারায়ণ	(,,)	১৲
টি, কৈলাস		২৲
এস, ডি, সিলভা		১৲
কে, ডি, কন্দচ্চাম	(,,)	১৲
পি, চিন্নান	(,,)	১৲
পি, সিংহ	(,,)	২৲
ভি, আউধাম	(,,)	১৲
আর, সি, জে, ডেভিস	(,,)	২৲
এম, সেফী	(,,)	১৲
ডি, সিংহ	(,,)	১৲
আলি আসগর	(,,)	১৲

এস, গোপালম	(„)	১৲
কে, বি, পিলাই	(„)	২৲
এ, কে, সি, ভৌমিক	(„)	৫৲
নুরজ্জামন চৌধুরী	(„)	৫৲
এস, কে, চ্যাটার্জি	(„)	৫৲
এস, আর দে	(„)	৫৲
এইচ, পি, দে	(„)	৫৲
এ, আর, ব্যানার্জি	(„)	১০৲

(সুদূর করাচীস্থিত রূপ-মঞ্চের সহৃদয় পাঠকবর্গ শ্রীযুক্ত এস, আর ব্যানার্জির মারফত ১১৩৲ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন)

যতীন দত্ত (ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড হ্যারিসন রোড) ২৲

বিমলচন্দ্র অধিকারী (বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিঃ) ১৲

হেমলাল সা (গুরুপ্রসাদ লেন কলিঃ) ১৲

সনৎকুমার সিংহ (অপার চীৎপুর রোড) ১৲

এ পর্যন্ত সর্বসমেত রূপ-মঞ্চ রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে আমরা ৩১৯৲ টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছি। রূপ-মঞ্চ পাঠক পাঠিকা বর্গের কাছে এই অর্থের পরিমাণ খুব সামান্য, তাই প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার সামার্থানুযায়ী রূপ-মঞ্চ রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে অর্থ প্রেরণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের কাছে যাঁরা টাকা পাঠাবেন— মূল সমিতির রসিদই তাঁদের দেওয়া হবে। এবং সমস্ত সংগৃহীত অর্থ মূল সমিতিতেই প্রদান করা হবে।—

কালীশ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক রূপ-মঞ্চ
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা।

ক্যালকাটা অলিম্পিক ক্লাব

এঁদের উদ্যোগে ডি, এল রায়ের সাজাহান স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে শীঘ্রই অভিনীত হবে।

প্রীতি-ভোজ

গত ১লা ভাদ্র শনিবার অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের সত্তাধিকারী শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসুর গৃহে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অজিত বসুর সহিত শ্রীমতী ইলা রাণীর শুভ পরিণয় উপলক্ষে এক প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হয়। সভায় বহু সাংবাদিক ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসুর তরফ হইতে সমবেত অভ্যাগতদিগকে সাদরে আপ্যায়ণ করা হয়।

দেবীকারাণী

বম্বে টকীজের প্রযোজক ও ভারতীয় চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবীকারাণী সম্প্রতি এক্‌জন রাশিয়ানের সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছেন। বম্বে টকীজের সমস্ত স্বত্ব বিক্রয় করে দেবীকারাণী তার নব রাশিয়ান স্বামীর সংগে হিমালয়ের পাদদেশে মধু যামিনী যাপন করতে যাত্রা করবেন।

এসোসিয়েটেড পিকচার্স লিঃ

এঁদের সর্ব প্রথম চিত্র আমীরী পরিচালানা করছেন শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া। বস্তী জীবনের পটভূমিকায় চিত্রের কাহিনীটা গড়ে উঠেছে। কাহিনীটী লিখেছেন সুসাহিত্যিক প্রবোধ সান্যাল। ইতিমধ্যে আমীরীর এক দৃশ্য পটে আমরা উপস্থিত ছিলাম আগামী সংখ্যায় তার বিষদ বিবরণ দেবার ইচ্ছা রইল।

রূপ-মঞ্চ

৫ম বর্ষ ঃ ৭ম সংখ্যা ঃ ভাদ্র ঃ ১৩৫২

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্য-কলার সচিত্র মাসিক।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মুখপত্র।

কার্যালয় ঃ
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা।
ফোন ঃ বি, বি, ঃ ৪২৯২

প্রতি বাংলা মাসের ৩০শে রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হয়।
বর্তমানে প্রতি সংখ্যার ঃ মূল্য আট আনা।
সডাক এক বছরের গ্রাহক মূল্য আট টাকা।
এক বছরের কম কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না।
নূতন লেখকদের উপযুক্ত রচনা রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হয়;
অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠাবার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি না।

—পৃষ্টপোষকতায়—
নিতাইচরণ সেন
এন, সি, ঘোষ
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
বিভূতি ভূষণ দত্ত
দীনেশ দত্ত
এস, কে, রায়
এইচ বোর্ণ

সুভাষচন্দ্র বসু—

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু সংবাদে দেশের বুকে যে বিষাদের ছায়া পড়েছে—তা কোন ভারতবাসীর অবিদিত নেই। সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি মতবাদের সমালোচনা করবার স্থান হয়ত 'রূপ-মঞ্চ' নয়—কিন্তু দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদে শোক প্রকাশ করবার অধিকার যে-কোন দেশপ্রেমিকের আছে বলেই আমরা মনে করি।

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুকে এখন অবধি অনেকেই সত্য বলে মেনে নিতে পারেননি—কিন্তু এই নির্মম সংবাদটীই যে মর্মান্তিক, সে বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকতে পারেনা। এই নির্মম সংবাদটী অনেকের মত আমাদেরও হৃদয় শোকাচ্ছন্ন করেছে।

'মানে-না-মানা' চিত্রে শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী

বেতার বিভ্রাট

মিষ্টভাষী

গত সংখ্যায় শিল্পী-সংঘের কর্মী সুধীপ্রধানের খোলা চিঠির কয়েকটি কথার জবাব দিয়েছি। সময় অভাবে সব কথার জবাব দেওয়া তখন হ'য়ে ওঠেনি। যেহেতু আমাদের বক্তব্য শিল্পীদের পক্ষে, সেইজন্যে সুধীপ্রধানের সব কথার জবাব দেওয়া সমীচীন মনে করি না। কেননা, তাঁর চিঠিতে অনেক অসম্ভব ও অপ্রাসংগিক কথা আছে। যেমন ছিল তাঁর বক্তৃতায়—যে বক্তৃতার কথা তিনি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন তাঁর চিঠিতে। আসল কথা এই যে বক্তৃতায় আর হুমকিতে যুদ্ধ জয় হয় না। তার প্রমাণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতি, আর শিল্পী-সংঘের এই দুর্গতি। জার্মানী ও জাপানের গলায় যে-জয়মাল্য ঝুলছে শিল্পীসংঘের কণ্ঠেও সেই মাল্যের গন্ধই পাচ্ছি। সেইজন্যেই আমরা বড় বড় কথা, লম্বা লম্বা বক্তৃতা চাইনে, আমরা চাই কাজ। তাই আমরা সমগ্র শিল্পীর স্বার্থরক্ষার জন্যে শিল্পীসংঘের কাছে সবিনয় অনুরোধ করেছি—তাঁরা যেন শিল্পীসংঘের মত এই শিশু প্রতিষ্ঠানটিকে সযত্নে লালন ক'রে পূর্ণাংগ ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেন! তাঁরা যেন নিজেকে নিজেই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কর্ণধার ভেবে চুপচাপ ব'সে না থাকেন। সুধীপ্রধান ব'লেছিলেন—'বেতারের প্রোগ্রাম বানচাল ক'রে দিয়েছিলাম।' মনে হ'লো তিনিই যেন বানচাল করার জন্যে একমাত্র কর্মী—তিনিই যেন সর্বেসর্বা। এই ডিক্‌টেটরি মতিগতির বদল দরকার। শিল্পীসংঘের কলহ ছিলো বেতারের ডিক্‌টেটরি নীতির বিরুদ্ধে। শিল্পীসংঘের মধ্যেও সেই ডিক্‌টেটরি গন্ধ পেয়ে আমরা হতাশ হ'য়ে প'ড়েছি। আমাদের হতাশা যে যুক্তিহীন, আশাকরি, শিল্পীসংঘ অবিলম্বে তা প্রমান করবেন।

শিল্পীসংঘের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তোষ সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত জগন্ময় মিত্রের কাছে আমাদের আবেদন আছে। তাঁরা উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন। যে কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে অনেক কষ্টভোগ, অনেক অসুবিধাবোধ আছেই। তারি ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। হোঁচটে হয়রান হ'য়ে পড়লে পথচলা যায় না। সেই কথা মনে ক'রে তাঁদের কাজ করতে হবে। অনেক অবাস্তর কর্মীর ওপর সংঘ পরিচালনার ভার দেওয়ার দরুণই, আমাদের মনে হয়, সেবারকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে। ইতিমধ্যে অবশ্য, আমরা লক্ষ্য করছি, শিল্পসংঘ মজবুত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ'ড়ে উঠ্‌বার জন্যে চেষ্টা করছে। সন্তোষবাবুর কথা আমরা গত জ্যৈষ্ঠ্য সংখ্যায় উল্লেখ ক'রেছিলাম। তিনি সংঘের দাবী দাওয়া সম্পর্কে সচেতন। জগন্ময় মিত্রের সম্বন্ধে কিছু বলার সুযোগ আজ পর্যন্ত পাইনি। তিনি যেন কিঞ্চিৎ নেপথ্যবাসী। আড়ালে থেকে কাজ করার হয়ত পক্ষপাতী তিনি। কিন্তু আড়ালে লুকিয়ে থেকে কাজ করার অসুবিধে অনেক। তাঁকেও পাদপ্রদীপের সামনে এগিয়ে আসতে হবে। শ্রীযুক্ত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথা এর আগে উল্লেখ না করায় লজ্জিত। বেতারের সঙ্গে অসহযোগের সফলতা (যদিও আংশিক) অনেকটা নির্ভর করেছে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার ওপর। তিনি সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে আসর মাৎ করার চেষ্টা করেন নি। তিনি নিয়মিতভাবে পরিশ্রম ক'রেছেন। কর্মী চাই এই রকমের। আমরা কথা চাইনে, কাজ চাই—বলেছিলাম, সে এই ধরণের কাজ। হেমন্তবাবু কিন্তু একবারও বলেননি—বেতারের প্রগ্রাম বান্‌চাল ক'রে দিয়েছিলাম। বান্‌চাল যদি কিছুটা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে হেমন্তবাবুদের মত কর্মীদের জন্যই হ'য়েছে। সুধীপ্রধানের মত বাক্যবাগীশের জন্য নিশ্চয় হয়নি। আশাকরি সুধীপ্রধান নিজের ত্রুটি নিজেই দেখার চেষ্টা করবেন। তাঁর ত্রুটি দেখাতে গিয়ে আমাদের বক্তব্য বিপথে না চ'লে যায়—এই ভয়ে সুধীপ্রধান-প্রসঙ্গ আমরা বন্ধ করলাম।

এবার আমরা আসল কথায় ফিরে আসি। গত সংখ্যার রূপমঞ্চ সম্পাদকীয় স্তম্ভে বেতারের স্বেচ্ছাচারিতার কথা উল্লেখ ক'রেছেন রূপমঞ্চের সম্পাদক। এই স্বেচ্ছাচারিতার মাত্র কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। সব রকমের স্বেচ্ছাচারিতার কথা বলতে গেলে, রূপ-মঞ্চের একটা বিশেষ সংখ্যা বার করতে হয়। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন আমরা শিল্পীসংঘকে অনুরোধ করতে পারি—

এদিকে তাঁরা যেন নজর দেন। শিল্পীর স্বার্থ রক্ষাই শিল্পীসংঘের একমাত্র দায়িত্ব নয়, শিল্পের স্বার্থ রক্ষাও হ'চ্ছে কিনা, তাও দেখা দরকার। বেতারের বিবিধ স্বেচ্ছাচারিতার দরুণ, আমাদের মনে হয়, শিল্পীর ও সেই সংগে শিল্পের ইজ্জৎ নষ্ট হ'চ্ছে! এ-কথা অবশ্য আমরা স্বীকার করবো যে বেতার নতুন নতুন অনুষ্ঠান প্রচার করবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু অনুষ্ঠান সুপরিচালনার ও প্রয়োজনার ব্যঞ্জনার অভাবে, আগাগোড়া অনুষ্ঠানটিই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই হয়ত যথেষ্ট হবে। গত জন্মাষ্টমীর দিন, জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র ক'রে যে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল—তা এত অশ্রাব্য হ'লো কেন? আগাগোড়া প্রহসনের মত শোনালো অনুষ্ঠানটি। এটা ঠিক জন্মাষ্টমীকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই বিশেষ অনুষ্ঠান কিনা, আমরা সঠিক বুঝতে পারলাম না। সম্মুখে আবার মহালয়া আসছে—জানিনে সেদিনের ভোরের বিশেষ অনুষ্ঠানটি আবার কি ধরণের হয়। শিল্পীসংঘকে এদিকে নজর দিতে হবে। বেতারের হাতে ক্ষমতার চাবি আছে ব'লেই তারা শিল্পের উপর বেআইনী ভাবে অবিচার করতে পারবে না—এই সাধারণ তথ্যটি জানিয়ে দিতে হবে বেতারকে। জানিয়ে দেবার ভার আর কারো নয়, শিল্পীসংঘের। আমরা কি আশা করতে পারি যে শিল্পীসংঘ এদিকে মনোযোগী হ'য়েছেন, আর তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ আছেন! এ বিষয়ে জনসাধারণও যেন কিছু জানতে পারে, সংঘ একটি অধিবেশন বসিয়ে তার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু এবারকার অধিবেশনে যেন কোনো অপটু কর্মীর হাতে দায়ীত্বভার না পড়ে। সংঘ পরিচালনার জন্যে সম্পাদকদ্বয় যেন সভাপতির ওপরেই ভার দেন। যখন যার খুশি ও যা খুশি এলোমেলো বক্তৃতা দেওয়ার পরিণাম যে ভাল হয় না—তার প্রমাণ তো আমাদের চোখের সামনে।

আমরা আশা করি শিল্পীসংঘ অবিলম্বে তাঁদের নীতি নির্ধারণের জন্যে একটি জরুরি সভার অধিবেশন করবেন। সেই সভায় বেতারের স্বেচ্ছাচারিতা ও সুবিধাবাদী শিল্পীদের বিরুদ্ধে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। হয়ত ইতিমধ্যে নীতি তাঁরা নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু জনসাধারণের ও বেতার শ্রোতৃমণ্ডলীর অবগতির জন্যে সাধারন সভা হওয়া দরকার ব'লে আমাদের মনে হয়।

বেতার যেভাবে প্রোগ্রাম পরিচালনা করছেন, শ্রোতাদের কাণে তা শ্রুতিসুখকর হচ্ছে না। অর্থ ব্যয় ক'রে রেডিয়ো সেট্ কিনে সকলেই আজকাল অনুতাপ করছেন। তাঁদের অর্থব্যয় যে সার্থক হয়েছে—তা প্রমাণ করার দায়িত্ব অবশ্য রেডিয়ো কর্তৃপক্ষের। কিন্তু যদি দেখা যায় যে সে কর্তৃপক্ষের অপটুতা ও অদক্ষতার জন্যে তাঁরা দায়িত্বভার গ্রহণ করার উপযুক্ত নন্—তখন এগিয়ে আসতে হবে শিল্পীসংঘকে। শিল্পীসংঘের সংগে পরামর্শ করে অনুষ্ঠান লিপি প্রস্তুতের প্রয়োজন আমরা বোধ করছি। বেতার কর্তৃপক্ষ যদি শিল্পীসংঘের পরামর্শ গ্রহণে স্বীকৃত না হন্, তাহলে শিল্পীসংঘকে এমন কঠোর নীতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে বেতার কর্তৃপক্ষ শিল্পীসংঘের সহযোগিতা নিতে বাধ্য হন। সংঘ শক্তিশালী হ'লে তাকে ভয় না করবে কে? বেতার মেনে চলতে বাধ্য হবে তার নির্দেশ, সুবিধাবাদী শিল্পীরা মেনে চলতে বাধ্য হবে তার আদেশ। তাই আশু প্রয়োজন সংঘের সভ্য সংখ্যা বাড়ানো আর মাঝে মাঝে সাধারণ সভা আহ্বান করা। প্রত্যেক সভ্যকে সচেতন ক'রে তুলতে হবে যে শিল্পীসংঘই তার কর্ণধার। সংঘের নির্দেশ সর্বদা পালনীয়।

আমরা সুবিধাবাদী শিল্পীদের তালিকা দাখিল ক'রেছি, গত দুই সংখ্যার রূপমঞ্চে। এ-তালিকা আমরা দিয়েছিলাম, সাধারণের অবগতির জন্যে। শিল্পীসংঘও নিশ্চয় তালিকা প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন। কিন্তু এতদিনের মধ্যেও আমরা জান্তে পারলাম না, সংঘ এঁদের সপক্ষে বা বিপক্ষে কি ধরণের আচরণ গ্রহণের নির্দেশ দিবেন।

পরিশেষে আর একটা কথা বলবো। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কি পরিস্থিতির মধ্যে বেতারের সংগে সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়েছেন—তার খোলসা একটা বিবৃতি তিনি কি দেবেন? শ্রীবিকাশ রায় কি জানাবেন, কেন তিনি বেতার প্রতিষ্ঠান ছাড়লেন? শুন্লাম, নৃপেন বাবুকে এমন একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলা হয়েছিল

যাতে তিনি বেতারে যোগ দিতে বাধ্য হ'য়েছেন—স্বেচ্ছায় যোগ দেন্ নি। এ কি শুধুই গুজব, না, সত্যতা তাছে কিছু? নিজের অপরাধ ক্ষালন করার চেষ্টায় নৃপেনবাবুই হয়ত এ গুজব ছড়াচ্ছেন। কিছু বলা যায় না।

আধুনিক গানের কথা-প্রসংগে

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

বাংলার আকাশ বাতাশ বেয়ে গ'লে গ'লে পড়ছে গান। পথে প্রান্তরে ফকির, বৈরাগী, বাউল,—হাটে মাঠে তরজা, কবি, কথকথা,—নদী-নালায় গেঁয়ো ভাটিয়াল,—বনে বনান্তে ঝুমুর-সাওতালী—আর ভজন, কীর্তন, রামপ্রসাদী জমে আছে দেবালয়ে দেবালয়ে। তার ওপর সুরের সোণার পাঁচিল দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘিরে দিয়ে গেছেন এই দেশ।

আজকের দিকে দিকে যে নয়া-জীবনের ঝড় উঠেছে: সামন্ত-তান্ত্রিক ঘুণ ধরা বনিয়াদ তা'তে ঝপ ঝপ করে খসে পড়ছে পলকা বালিয়াড়ের মত। তবু ভারতীয় সামন্ত-তন্ত্রের কাছে কৃষ্টির এই একটী ঋণ, আমাদের চিরকালের হ'য়ে থেকে গেলো: গীতি-বিজ্ঞানের। গীতি-বিজ্ঞানের সেই সাত-আকাশের ওপরের চন্দ্রলোকের সম্পদ: উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। নোতুন ভাষায় যা, ক্লাসিক। কিন্তু তার আকাশ পৃথিবী দুই আলাদা: ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিনীর দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে অভিজাত তার অবস্থান, সম্রাটের মত। সেখানে আপনার—আমার প্রবেশাধিকারের স্বপ্ন দেখাও দুঃস্বপ্ন মাত্র। অন্য রকমের মানুষ তৈরী হয় তাকে বুঝবার জন্যে, আরেক শ্রেণীর মানুষ তৈরী হয় তাকে গাইবার জন্যে। তবু সেই ছয় রাগ আর ছত্রিশের গা বেয়ে বেয়ে যেটুকু রস এদিকে ওদিকে চুইয়ে পড়ছে: তাতেই বাংলা বিভোর, বাংলা মাতোয়ারা মাত্র ঐটুকুতেই। আর কোন দেশের মাটি পায়নি এ-জিনিষের স্বাদ। ভারত মহাসাগরের এ মৌসুমী সম্পূর্ণ আশ্চর্য রকমের মিষ্টি।

আধুনিক গানকে আমরা তৈরী ক'রে নিয়েছি। এ গান নগরের। নগর তৈরী ক'রছে এ গানকে সাধারণের জন্যে, আপনার—আমার মত অল্প মগজী, অল্প আনন্দপায়ী, অল্প-সময়ী সাধারণ নাগরিকের জন্যে। চন্দ্রলোকের পথ আপনার-আমার কাছে চেনা নেই, নেই সুর সাধনার সেই দুরন্ত পাখা: তাই বলে কি মাখতে চাইবো না সমস্ত গায়ে জ্যোৎস্নার চন্দন, চাইবো না চিনতে অপরূপ সেই চন্দ্র-কলাকে! অনেক নক্ষত্রের পাঁচিল ডিঙিয়ে, এখানে ঘাসে এসেও ত' পৌছোয় চাঁদ। তাই ঘাসের মতই সোজা, সরল, নরম জিনিষ: তৈরী ক'রে নিলাম এই আধুনিক গান।

কথা এসে পড়ে আরেকটা: কী বা এমন যাদু জড়ানো আছে আধুনিক গানে যা বিদ্যুতের মতই ছুঁয়ে দিয়ে যায় নিমেষে? হৃদয়কে এমন ক'রে দুলিয়ে দেবার কোন্ মন্ত্র জানা আছে তার? উচ্চাঙ্গ রাগ-সংগীত আর আধুনিক, এখেনেই বোধহয় একেবারে দু'জনে দু'দিগন্তে দাঁড়িয়ে। ক্ল্যাসিকের চন্দ্রলোক-যাত্রা শুধু সুরের সিঁড়ি বেয়ে, মাঝে মাঝে কেবল একটা দুটো 'কথার' অনুজ্জ্বল তারা ফুটে আছে সেই স্বপ্ন মার্গের দু'পাশে। সেই এক-আধটা 'কথার' তারাকে আলতোভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে—সুরের হাওয়ায় আর সুরের দোলনে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে ক্ল্যাসিক। আর 'কথা শিল্পের' জরিদার ওড়না উড়িয়ে, মিশ্রত সুর-লালিত্যের পেলব প্রসাধনে সেজে, স্বপ্ন-লোকের মধ্যে থেকে, পায়ে পায়ে লঘু ছন্দে নেমে আস্‌ছে আধুনিক—রাজকন্যার মত।

রবীন্দ্রনাথের কারণেই কি রবীন্দ্র সংগীত ছড়িয়ে পড়লো এদেশে এমন বিলোল হয়ে? আধছায় শুনেছি এ-কথা যার তার মুখে—অবশ্য যে-সে যা তা' কথা বলবার অধিকার এদেশে রাখে—এদেশের অধিকার অপরের হাতে যাওয়ার কারণ থেকেই বোধহয় জন্মেছে এইটে কিংবা যে কারণে অপরে অধিকার নিতে কষ্ট পায়নি এদেশের। স্মৃতি থেকে যতদূর উদ্ধার করা যায়: রবীন্দ্রনাথ বোধহয় নগরের দ্বারে দ্বারে এসে তাঁর গান শুনিয়ে যায় নি এবং সেই মহাজীবনের সবটুকু সাধন-প্রচেষ্টাও বোধহয় তাঁর গীতি-প্রচারের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে বেড়াননি রেকর্ড, রেডিয়ো আর বাণীচিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের কাছে ধর্ণা দি:য় দিয়ে? ব্যবসায়ে লক্ষী-লাভের সাধু উদ্দেশ্যে রেকর্ড এবং সিনেমা-প্রতিষ্ঠান বরং রবীন্দ্রনাথের কারণেই রবীন্দ্র-গীতি কিছু কিছু আমদানী করবার সুযোগ নিয়েছেন বিশ্বভারতীর দু'হাত জড়িয়ে ধরে—তবু জন সাধারণ তাকে না নিলেও পারতো,

জন-সাধারণের এখেনে কোনো চক্ষুলজ্জার কারণও ছিল না—অথচ আশ্চর্য এই যে, তবু চল্‌লো, রবীন্দ্র সংগীত, তবু ছড়িয়ে পড়লো হু হু করে বঙ্গোপসাগরের তীর থেকে বঙ্গীয় সমস্ত আর্যাবর্ত'টা জুড়ে।

আশ্চর্য রবীন্দ্রনাথের কথাই—সংগীতটা হয়ত তত নয়। এমন চিনি মাখানো কথা আর কে কবে কোথায় শুনেছে? কথাই যেখেনে ঝরে পড়েছে সুর হয়ে—সংগীতের সেখেনে আর বাকী রইলো কী?

প্রতিটী 'কথার' ধ্বনি বিচ্ছুরণের নুপুর বাজছে যেখেনে প্রতিটী গানের প্রতিটী ছত্রে। 'দিনের শেষে—ঘুমের দেশে—ঘোমটা পরা ঐ ছায়া: এইটুকু শুনতে শুনতেই যদি ঢুলে পড়লো মন, ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠলো হৃদয়—সংগীত বিজ্ঞানের আধিসূক্ষ্ম নিয়মকানুনের দারুণ ব্যাকরণখানা খুলে ধরবার তখন আর অবকাশ থাকে! হৃদয়ের আকাশ জুড়ে যে অনন্ত কথার বলাকা—মিছিল উড়ে চলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে—তাদের গায়ে শুধু একটু কনে দেখা-আলোর রঙ মাখিয়ে পৃথিবীর আকাশে তাদের লীলাভরে উড়িয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা একদৃষ্টে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি।

আধুনিক গানেও এই কথা-শিল্পই প্রধান। কথার কারুকলার ওপরই নির্ভর করতে হয় সুরের মুন্সীয়ানাকে। মসৃণ, নরম বাংলার সমুদ্র থেকে ডুবুরির মত বেছে বেছে কুড়িয়ে আনতে হবে মণিময় রঙিন কথার ঝিনুক। আর সেই প্রতিটী ঝিনুকের অন্তরালে টলমল করবে লাল নীল মুক্তা প্রবাল। আর সেই এককেটী প্রবালে-গাঁথা একেকখানি গান হবে দ্যুতি-ঝলোমলো একেকটী প্রবাল-মালা। যদিও অর্থহীনতা অমার্জনীয়; তবু কতখানি তা সাহিত্য হ'লো—সেইটেই বোধহয়

সবচেয়ে' বড় প্রশ্ন নয় আধুনিক গানের। লালিত্য, ধ্বনি আর ধ্বনি-প্রাধান্যের ভেতর দিয়ে সহজ আবেদন সৃষ্টি করাটাই হচ্ছে গীতিকারের সেরা কোয়ালিফিকেশন। মনের এক কোণের একটীমাত্র ছোট অনুভাবকে কটী কথার আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলছে গান। যা দিয়ে সুরুঃ তাতেই শেষ। তুলোর মত লঘু, মেঘের মত মোলায়েম একটীমাত্র রঙীন চিন্তাঃ কথা আর সুরের হাওয়ায় তাকে খেলানো—সেও বড় কম আর্টিষ্টের কাজ নয়। তবু গান কেন কবিতা নয় এবং কবিতাই বা গান হয় না কেনঃ এমন প্রশ্ন ওঠে বৈকি—না উঠলেও ওঠানো যায়।

কবিতার লীলাক্ষেত্র কোথাও কোন পরিনির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বাধা থাকতে রাজী নয়। বিশাল তার ডানা, অগাধ আর অবাধ তার সঞ্চরণ।

গভীর থেকে গভীরে, নিরীক্ষা থেকে দুর্নিরীক্ষ্যে, চিন্তনীয় থেকে অব্যয়-অচিন্ত্যে তার যাত্রা—কোথাও বাধা মানবে না, মানাতেও পারা যায় না।

আর একটিমাত্র লঘু লীলা চাঞ্চল্য নিয়ে গানের কারবার। চঞ্চলা কিশোরীর মত সুরের বেণী দুলিয়ে ছট্‌ফট করে ঘুরে বেড়াতে চায়—এখেন থেকে ওখেনে বড় জোর এপাড়া থেকে ও-পাড়া। তার গাঁয়ের সীমানার পরেও পৃথিবী আরো বড় কিনা—তা সে জানতেও রাজী নয়, জানবার কোনো প্রয়োজনও তার আসে না। এবং ঠিক এই কারণেই কবিতা লিরিকের ধার ঘেঁসে চল্‌লেও—কবিতা গান নয় এবং গানও তাই কবিতা নয় তার লালিত্যের সহজ আবেদন নিয়েও।

গীতিকার সাধারণতঃ সুরের দায়িত্ব খোলাখুলি ভাবে না নিলেওঃ সুরলোকের ছায়াপথে ঘোরাঘুরি তাঁর আছেই, থাকেই। কথার নরম ফুলঝুরি কিছুতেই তিনি জ্বালাতে পারেন না, যদি না টলোমল হয়ে উপ্‌চে না পড়ে হৃদয়ের সুরাপাত্র। গীতিকার এ হিসাবে কতকটা টেলিগ্রাফিষ্ট। বাছা বাছা একমাত্র নিছক জরুরী কথাকটীকে হৃদয়ের কোণ থেকে তুলে নিয়ে আলতো আঙুলে আস্তে আস্তে সুরের বিজলী তারে তাদের ছেড়ে দিচ্ছেন আর অনুভূতির খাতায় একচ্ছত্র মনোযোগে তাকে টুক্‌ টুক্‌ করে লিখে নিচ্ছেন সুরশিল্পী। সুরও গাঁথা হ'য়ে চলেছে অমনি মনে মনে।

খবরের কাগজের ভাষায় যাকে 'তার' বলি, ইংরেজীতে যাকে বলিঃ 'মেসেজ'—সেই একটী 'মেসেজ' ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক ব'লে গণ্য হয় না, যতক্ষণ না তারের অপর প্রান্ত, সে দার্জিলিঙই হোক আর ভিজাগাপট্টমই হোক, তারের অপর প্রান্ত থেকে রিসিভার ব'লে পাঠায়ঃ 'আর টি' (রাইট)।

কোন একটীমাত্র কথার আবেদন অনুভূতিতে তাই স্পষ্ট হয়ে না উঠলেঃ সুরশিল্পী বার বার ক'রে তার নিষ্কর্ষটী বুঝে নেন্‌ গীতিকারের কাছ থেকে। গীতির বাণী সুরের কাছে সার্থকতার অভিনন্দন পেলেই—তখনই সুরের খেলা। তারপরই সে 'মেসেজে'র ডেলিভারি আসে রেকর্ডে, রেডিওয়, পর্দায়। আপনি-আমি শুনি। হাসি, কাঁদি, দীপ্ত হই।

কথা-প্রসংগে বুক বাজিয়ে বল্‌তে দেখেছি অনেক নাম করা সুরকারকেঃ গান যখন শিখেছেন পয়সা ব্যয় ক'রে, কথা গানের যাই হোক না কেন, নিছক গদ্য হলেও তাকে তেইশা সুর দিয়ে একেবারে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন তাঁরা।

কতখানি তা সম্ভব হ'তে পারে এবং হ'লেও তা কি হয়ঃ ঈশ্বর তার তারিফ করুন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুন এই সব প্রতিভাধরেরা কিন্তু এই সমস্ত ঢক্কানিনাদের আর বহ্বাড়ম্বরের কৈফিয়ৎ দেবার বোধহয় সময় এসেছে এখন। 'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজালে বনে' আর 'আমার যৌবন মন বাগানে, জোয়ার লেগেছে ফুল-জাগানে'র যুগ বহুকাল ধোঁয়া হ'য়ে উবে গেছে নগরের মাটী এবং মন থেকে।

ছায়াচিত্র শিল্পেরও যেমন উৎকর্ষ-অনুৎকর্ষের কৈফিয়ৎ দেবার সময় হয়েছে, সময় সমুত্তীর্ণ হয়েছে তেমনি রেকর্ড-রেডিয়ো সিনেমা'র আধুনিক গানেরও জবাবদিহি করবার।

এদিকেও যেমন দেখি পরিচালক 'যেদো' মুদি থেকে

।রুচরণ কর্মকার সবাই, ওদিকেও তেমনি সুরকার শয়ার মার্কেটের দালাল থেকে আলু-ওলা যে কেউ। শিক্ষা, রুচি এবং সংস্কৃতির কথা বাদ দিলেও, এমন এক ংকীর্ণ বৃত্ত ও গণ্ডীর মধ্যে এদের পরিক্রমণ, যেখেনে ালীনতাবোধ ব'লে জিনিষটা কোন কালেই বোধহয় ।কতে সাহস পায়নি। কথাই যে আধুনিক গানের প্রথমতম প্রাণ সমষ্টি—এদের মগজে একথা প্রবেশ করাতে াওয়া দিগদারী মাত্র। কথাকে অবলম্বন করেই সুর যে এখেনে ফুটে উঠবে: একথা শুনলেও বোধহয় তাঁরা াশ্চর্য হবেন। এঁদের এই পণ্ডিত মূর্খতার জন্যেই বাধহয় আধুনিক গান আজ মার খাচ্ছে আরো বেশী। াধু মাত্র কমল দাশগুপ্ত আর শচীন কর্তার মত উচ্চ রুচি ার সংস্কৃতির লোক আর কতদিন এই অবশ্যম্ভাবী াতনকে ঠেকিয়ে রাখবেন ?

রেডিয়োকে বাদ দিয়ে কথা বলছি। দরিদ্র ভারত গভর্ণমেণ্টের এই সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানটী চার আনার বেশী গীতিকারকে দিতেই পারেন না, শিল্পীকে কোনরকমে গোটা পাঁচেক মুদ্রা ঠেকান—সুতরাং এঁদেরকে আলোচনার বাইরে রেখেই কথা বলি।—বাংলার তিনটী বিখ্যাততম রেকর্ড প্রতিষ্ঠানের সংগে গভীরভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছি কিছুদিন। আলোচনা-প্রসংগে, কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে যে মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়েছি—তার কিছুটা এখেনে সন্নিবেশ করবার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। আমার কারবারও কথা নিয়ে, সুরের চেয়ে কথা নিয়ে কথা কয়েছি তাই বেশী। কিন্তু কথা সম্পর্কে তাঁরা বোঝেন যা—তার চাইতে বোঝাতে কথা খরচ করেন এত বেশী, যার পরে কোনো কথা বলাই মুস্কিল। ঝুড়ি ঝুড়ি রেকর্ড বেরুচ্ছে বাজারে প্রতিমাসে: তার সুরের দিকেও তাকান, কথার ত' বালাই-ই নেই। সেই চাঁদ, সেই ফুল, সেই বুকের ব্যথা, সেই নাকে কাঁদুনি, সেই পচা প্রেম! প্রেম যুগে যুগে, কালে কালে তবু ন্যাক্যামিপনারও ত একটা হদিস আছে। কিন্তু এ ভিন্ন আর কোনো বিষয়বস্তু নিয়েও যে সার্থক গান রচিত হ'তে পারে এবং প্রেমের গানেরও আবো কোনো দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে: এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে এঁরা। এমনকি আজকের যুগে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'কার্বন কপি' করারই প্রয়োজন এবং এদিক থেকে অধুনাতম কোনো এক গীতিকার যে বিশেষ সিদ্ধ হস্ত এবং সেইমাত্র কারনেই তাঁর আত্মগৌরব করার সংগে সংগে কোনো বিশেষ রেকর্ড প্রতিষ্ঠানও যে গৌরব অনুভব করেন তাঁর জন্যে, এ-ও শুনতে হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশের কবিরা কেন এ কাজে অগ্রণী হন্ না? তার উত্তর দিতে গেলে এইটুকু বল্লেই বোধহয় যথেষ্ট হবে, কবিতা-লেখা নাম করা কোনো কবি যে কোনো গান রচনা কোরতে পারেন, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান তা বিশ্বাস করতেই পারেন না। সেইজন্যই কোনো কবিকে আমল দেননা, রবীন্দ্রনাথের পরে তদানিন্তন দু' তিনজনের বেশী কবির নামও জানেন না এবং তৈল প্রদান ও হাত কচলানো নামক দু'টী জিনিষের

যে প্রচুর কারুকলার অধ্যবসায় থাকা দরকার, দুর্ভাগ্যবশতঃ কবিদের ভিতর সেই বিশেষ গুণটীরও বিশেষ ভাবেই অভাব।

বোধ হয় আরেকটা জিনিষও আমরা একেবারেই চিন্তা করিনিঃ এই গানের দেশেও, গানের আরো একটা বড় জাতীয় দায়িত্ব ছিলো। জাহাজ ঘাটের কুলি অথবা একটী মিল মজুর অথবা একটি অতি সাধারণ চাষাকে ডেকে এনে একটি পেলব বা রুক্ষ আধুনিক কবিতা শুনবার আবেদন করলে প্রচুর অস্বীকৃতি তাঁর তরফ থেকে ওঠা খুব স্বাভাবিক এবং সম্ভব হ'লেও, একটী আধুনিক গান শুনতে তার উদারতা কিছু প্রকাশ পাবেই। গানের সহজ ডেফিনিশন শুনেছিঃ হৃদয়ের ভাষা আর তা-ই যদি হয়, তা হ'লে গানের ভেতর দিয়ে এদের প্রাণের কথা এদের প্রাণের কাছে পৌঁছে দেবারও সহজ উপায় ছিলো। 'ছিলো'র অর্থে অবকাশ এখনো প্রচুর সম্ভাবিত। আমরা সে-কথা বোধ হয় কোনোদিন ভেবেও দেখিনি। এদের কাছে ঋণ-শোধেরও দিন এসেছে আজ। ঋণ প্রচুর জমা হ'য়েছে। চুরি ক'রেছি এদের নিজের জিনিষ বাউল, ভাটিয়াল, জারি—ছড়িয়ে দিচ্ছি তা'কে নকল ক'রে রেকর্ডে, রেডিয়োয় কিন্তু এদেরকে কি দিয়েছি তার বদলে? এই নিরেট নিরক্ষতার মাটিতে গানের কিছু এমনতর ফসল ফলাবার বিশেষ এবং বিশেষতম প্রয়োজন নিশ্চয়ই র'য়েছে। গানের ভিতর দিয়ে কাণ, এবং কাণের ভেতর দিয়ে প্রাণকে জানাবার এতবড় সহজ উপায়টাকে আমরা কি অত্যন্ত উদাসীনতার সংগেই এতদিন ধ'রে এড়িয়ে চলে যাচ্ছি না?

কথা প্রসংগে অনেক কথাই বলা হ'লেও আরো অনেক কথাই হয়ত বাকী থেকে গেল। পরে আলোচনা করবার জন্যে তার অবসরও আছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সংগে এই বলে শেষ ক'রতে হ'চ্ছে যে বাংলা গানের রচনা-দিগন্ত আজ বড় অন্ধকার। নজরুল ভাগ্যবিড়ম্বনায় আজ বিপর্যস্ত, দেশে থেকেও প্রবাসী, অন্ধকার গৃহ প্রাচীরের অন্তরালে, অজয়কে ছোঁ মেরে সরিয়ে নিয়ে গেল মহাকাল দুরন্ত দুপুরে, প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বাদ দিলে (গীতি রচনার একনিষ্ঠ দায়িত্বও তিনি নেন নি) আর যারা র'য়েছেন—এঁদের কাছ থেকে কতটুকুই বা আশা ক'রতে পারি, যা পেয়েছি বা পাচ্ছি তার পরে আর কোনো বৃহত্তর ভরসাই বা করি কোথা থেকে?

রূপান্তর

(নাটিকা)

প্রভাতকুমার গোস্বামী

প্রথম দৃশ্য

[সন্ধ্যার কিছুটা আগে। কোন একটী সম্ভ্রান্ত হোটেলের একটী সুসজ্জিত কক্ষ। মীনা বোস একলা অর্গান বাজাচ্ছিল। থেকে থেকে একটু সুরও ভাঁজছিল এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো মোহিত]

[মোহিতের প্রবেশ]

মীনা। [বাজনা থামিয়ে]···মোহিত ?

মোহিত। তোমার সংগীত আরাধনায় বাধা সৃষ্টি করলাম মীনা।

মীনা। নাও নাও আর বিনয় করতে হবে না। বোস এবার···নতুন একটা গান বাজাতে শিখেছি···তোমাকে ভাল করে শোনাই। শুনবে ?

মোহিত। রক্ষে কর মীনা...আর যাই কর, গান বাজনা জিনিসটাকে দয়া করে আমার ধাতে থাপ খাওয়াতে যেও না তুমি। আমাকে তো ভাল করেই জান, ঐ শৃঙ্খলাবদ্ধ গণ্ডগোলকে রীতিমত ভয় করি আমি।

মীনা। [একটু অভিমানের সুরে] তোমার এই সব বুড়োটে কথা শুনলে আমার রীতিমত রাগ হয়।··· দেখছি তুমি মানুষও খুন করতে পার।

মোহিত। কেউ গান না ভালবাসলে যে সে মানুষ খুন করবে এটা একজন সংগীত রসিকেরই উক্তি। একজন মাতাল যদি বলে---'যে মদ খায় না, মানুষ খুন করতে তার আটকায় না', তা হলে কি সে কথা মেনে নিয়ে মদ খেতে আরম্ভ করবো ?

মীনা। তর্ক করে যে তোমার সংগে পারবার উপায় নেই, সে আমি জানি।

মোহিত। যেখানে জান যে পরাজয় অনিবার্য সেখানে তর্ক করতে যাওয়াটাই বোকামি নয় কি ?...সে কথা যাক্। আচ্ছা বলতে পার মীনা তোমার এ বয়সে নূতন করে সংগীত অনুশীলনের এ প্রাণান্ত প্রয়াস কেন ?

মীনা। [অভিমানের সুরে] কেন আমি কি বুড়ী হয়ে গেছি নাকি ?

মোহিত। না—না আমি সে কথা বলছি না। কথাটা কি জান, সংগীত চর্চাই বল আর বিদ্যা চর্চাই বল সবই মেয়েরা বিয়ের আগেই করে থাকে। কারণ ওগুলিকে বর্তমান সমাজের বিবাহ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার পাসপোর্ট হিসেবেই ধরা হয় কি না, বিয়ে হবার পর খুব কম ক্ষেত্রেই এই সব চর্চা মেয়েরা বজায় রাখে বা রাখতে পারে। তবে হ্যাঁ তথাকথিত অ্যারিষ্টোক্রেট সমাজের পোষাকে স্ত্রীদের কথা আলাদা। তোমার বেলায় দেখছি সব জিনিষেরই ব্যতিক্রম। সব চর্চাই তুমি সুরু করেছ বিয়ের পর থেকে।—বিয়ের পর থেকেই বা বলি কেন, আমার যতদূর মনে পড়ে বছর খানেক আগে থেকে তোমার সংগীত অনুশীলন আরম্ভ হয়েছে। মনে কর আমিও যদি আজ থেকে তোমার মত গান শিখবার জন্য প্রাণপাত করে চেঁচাতে সুরু করি তা' হলে আশপাশের বাড়ীর সকলের রাতের ঘুম বন্ধ হয়ে যাবে। ইচ্ছে করে কারও বিরক্তিভাজন হবার আর ইচ্ছা আমার নেই।

মীনা। সাধনাতেই সব সিদ্ধি হয়। তাকে প্রাণপাত করা বলে না। তা' ছাড়া তোমার মত সারাদিন টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ে গালে হাত দিয়ে নীরবে কাব্য চর্চার চেয়ে আমার গান শেখা ঢের ভাল। এ নাবালিকা বয়েসে কামনা বাসনা মনে পুরে কল্পনার কল্পিত বলে বানপ্রস্থ নেবার সাধ আমার নেই।

মোহিত। তুমি কি আমায় সেই দরের কচি মনে কর—যারা সর্বদা ভাবরাজ্যে সমাধিস্থ শত চড়েও যারা 'রা' করে না ? সর্বদা একটা উদাস ভাব, যেন এ-লোকের জীব সে নয়...সুদূর কল্পলোক থেকে ভেসে আসা এক টুকরো ছন্দ···আমি যে ধরণের কচি তোমার মত মেয়ে ইচ্ছা করলেও তা হতে পারে না।

মীনা। সবই আমার দেখা আছে···যে যতই বক্তৃতা করুক মূলতঃ সবই এক। তুমি যত বড় দরের কবিই হও না কেন ; ইচ্ছা করলে যে তা হওয়া যায় না এ আমি

বিশ্বাস করি না। সাধনায় কি না হয়। তোমার জানা উচিত যে "genius is one percent inspiration and ninety nine per cent perspiration"

[দরজার মুখে দাঁড়িয়ে রেখা]

রেখা। ভেতরে আসতে পারি ?

মীনা। (উৎফুল্ল হয়ে) ও তুই ? বাইরে দাঁড়িয়ে আবার ঢং করছিস কেন ? ভেতরে আয় না।

[রেখার প্রবেশ]

রেখা। আমি ভেবেছিলাম তোকে বোধ হয় পাওয়াই যাবে না।

মীনা। কেন আমি কি সারাদিন টো টো করে বাইরে ঘুরে বেড়াই নাকি ?

রেখা। অতশত জানি না বাপু !

মীনা। (ব্যস্ত হয়ে) আরে তোর সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো না তো। ইনি হচ্ছেন মোহিত ব্যানার্জি, নামজাদা ইঞ্জিনিয়ার; তবে একেবারে নীরস যান্ত্রিক লোক নন। যন্ত্রের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে কাব্য চর্চাও করে থাকেন...আর এ হচ্ছে আমার সহপাঠিনী এবং বিশেষ বান্ধবী রেখা। ওর গুণাগুণ আর আমার মুখ দিয়ে ব্যক্ত করতে চাইনে ও নিজেই করবে, কি বলিস ?

রেখা। আমার কোন গুণও নেই তাই তা ব্যক্ত করবারও দরকার করবে না।

মোহিত। আর কোন গুণ না থাক, আপনি মীনা দেবীর যখন বান্ধবী, তখন সংগীত চর্চা নিশ্চয়ই কিছু কিছু করে থাকেন এটা আশা করা যেতে পারে।

রেখা। আশা করলে নিরাশ হবেন। সংগীত রসিক তো দূরের কথা আমি বরং সংগীত বিরোধী।

মোহিত। তা হলে তো আপনি আমার দলে পড়ে গেলেন। তা ভালই হলো। এমনি এক একজন করে যদি দলে ভেঁড়াতে পারি তা হলে একদিন একটা সংগীত বিরোধী প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে পারবো।

মীনা। দাঁড় করাতে পার, কিন্তু দেশে popularity gain করবার আশা নেই। প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করবার সংগে সংগেই তার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটবে।

মোহিত। তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল নাও হতে পারে। যাই হোক আর একদিন এসে আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করবো রেখা দেবী... আজ আমি আসি...রাত হয়ে গেছে।

রেখা। আমাকে দেখেই পালাচ্ছেন না কি মিঃ ব্যানার্জি ?

মোহিত। আপনি বাঘও নন ভালুকও নন...আপনাকে ভয় করবার কোন কারণ তো দেখছি না। একটু পরেই আমার একটা engagement আছে ভুলেই গিয়েছিলাম...আচ্ছা নমস্কার।

[প্রস্থান]

রেখা। নমস্কার, [একটু পরে] ইনিই তোর মোহিত বাবু ?

মীনা। হ্যাঁ। কেমন লাগলো ?

রেখা। আমার লাগা না লাগায় তো কিছু যায় আসে না। তবে একটা কথা আমি না বলে পারছি না। যতই তোর ভাল লাগুক, ওঁকে প্রশ্রয় দেওয়া তোর মোটেই উচিত হয় না।

মীনা। প্রশ্রয় কি বলছিস তুই ? আমি যে ওকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি।

রেখা। আবার বিয়ে ?

মীনা। কেন তাতে কি হয়েছে ?

রেখা। স্বামী থাকতে ?

মীনা। যাকে লোকের কাছে স্বামী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে চিরদিন স্বামীর আসনে রেখে পূজো করতে হবে নাকি ?

রেখা। তবুও স্বামী তো।

মীনা। আমি স্বীকার করি না।

রেখা। আইনতঃ…

মীনা। আইন রদ করতে কতক্ষণ?

রেখা। তুই যা বলিস মীনা, তোর এ মতিগতি আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। বিবাহিত জীবনে অনেকেই নিরাশ হয়, অনেক ব্যর্থতা আসে কিন্তু তাই বলে কেউ ফিরে বিয়ে করে না। বিয়ে মানুষের একবারই হয়।

মীনা। অতটা মহৎ হতে আমি পারি না রেখা। কি পাপ করেছি আমি যে সারাজীবন অমন একটা বুনোকে স্বামীরূপে পূজো দিয়ে যাব।

রেখা। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে অমিয় বাবুর ওপরে তোর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।

মীনা। অমন একটা লোকের ওপরে কারও শ্রদ্ধা থাকে? ও আমার সারাটা জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে।

রেখা। তাই বুঝি আজ সেই ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করছো।

মীনা। নিতে পারলে ভালই হতো, যখন উপায় নেই, তখন সে কথা তুলে লাভ নেই, দুজনে মিলে যে ভুল করেছি, আজ সময় থাকতে তা শুধরে নিতে চাই।

রেখা। হৃদয় ব্যাপারে একবার ভুল হলে তার সংশোধন হয় না। সে ভুল শোধরাতে গিয়ে আর একটা বড় ভুল ও তো হয়ে যেতে পারে।

মীনা। তুই ভুল বুঝছিস্ রেখা। হৃদয় নিয়ে যে কারবার তাতে ভুল হলে তৎক্ষণাৎই তার শেষ করে দেওয়া উচিত। নইলে দৈনন্দিন জীবনে সে এমন ভাবে বিষ ছড়াতে থাকে যে শেষে তার সংশোধন হয় না।

রেখা। কিন্তু তাই বলে তোর মত এমনি পারিবারিক জীবনকে নষ্ট করে দিয়ে কেউ ভুল সংশোধন করে না।

মীনা। আমি জীবন নষ্ট করছি কে বললো। ভেংগে জীবনকে আবার নূতন করে গড়তে চাই। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর কি দুর্গতি, তুই নারী হয়েও তা বুঝতে পারিস না এতেই আমার দুঃখ হয় রেখা। বাঙলা দেশের অধিকাংশ পারিবারিক জীবনই জোড়াতালি দেওয়া। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক যেখানে পুরুষ সেখানে বিদ্রোহ করে লাভ নেই। করলে কিছুটা Concession আদায় ছাড়া আর কিছু হয় না। তাই শতকরা ৯৯জন মেয়ে মুখ বুঁজে সেই জোড়াতালি দেওয়া জীবনটাকে মেনে নেয়।

রেখা। তোর দুর্ভাগ্য যে কোন সুখী পরিবারে তুই মিশিস নি তাই একথা বলছিস্।

মীনা। সুখী পরিবার তুই কাকে বলিস? যৌবনে সব অসংগতিকে তারা মানিয়ে নিতে পারে…জীবন যাত্রায় বড় ফাটল ও তাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু হিসেব আরম্ভ হয় প্রৌঢ় অবস্থায়…যখন শুধু গত জীবনের হিসাবের জমা খরচ হয়…তখন আর প্রথম জীবনের উচ্ছ্বাস থাকে না।

রেখা। Desperate যে, যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝান যায় না।

মীনা। তার চেয়ে স্বীকার কর যুক্তি তুই দিতে পারলি না।

রেখা। দুজনের স্থির বিশ্বাস যেখানে পৃথক সেখানে যুক্তি তর্ক না তোলাই ভাল। আর এ ব্যাপার নিয়ে তর্ক করে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটাতে চাই নে। তার চেয়ে বরং তুই একটা নতুন শেখা গান শোনা।

মীনা। না ভাই আজ আর গান গাইতে ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে চ' দুজনে বেড়িয়ে আসি খানিকটা। সারাদিন ঘরের মধ্যে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। আজকাল আবার ব্ল্যাক আউটের রাত্তির। সকাল সকাল একটু ঘুরে তোকে পৌছে দিয়ে আমি হোটেলে ফিরে আসব।

রেখা। যথা আজ্ঞা মহারাণী…

মীনা। আ-হা হা, আর ঢং করতে হবে না এখন চল।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কয়েক দিন পরে—

[হোটেলের কক্ষ। মীনা ও অমিয় দুজনে মুখোমুখি বসে...একটা নিথর নিস্তব্ধতা। দেওয়ালের ক্লক ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে]

মীনা। চুপ করে বসে রইলে কেন, আমার কথার উত্তর দাও।

অমিয়। আমি বলেছি তো তা হয় না।

মীনা। তুমি বললেই হলো হয় না ?

অমিয়। তবে আর আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবার কি দরকার।

মীনা। দরকার না থাকলে বলতে যেতাম না তোমায়, এ আমিও বুঝি তুমিও বুঝতে পারছো।

অমিয়। আমি সব বুঝেই বলছি তা' হয় না।

মীনা। ভাল করে ভেবে দেখলে এ কথা তুমি বলতে পারতে না।

অমিয়। আমি ভাল ভাবে ভেবেই বলছি, তুমি যা চাও তা হয় না।

মীনা। তুমি বললেই হলো হয় না। আমি অনেক দিন তোমায় বলেছি তোমার সংস্রব আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। একজনের নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে আটকে রাখতে চাও তুমি ? আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি আমি তোমায় ভালবাসতে পারবো না ; সমাজ বা আইন কোন বাঁধন দিয়েই আমায় আটকে রাখতে তোমরা পার না; আমি বাঁধন থেকে মুক্তি চাই।

অমিয়। তোমার কোন কাজেই তো আমি বাধা দিইনি মীনা। আর তুমি মুক্তিই বা নও কিসে ? কেবল—

মীনা। অমন মুক্তি আমি চাইনে। এখনও লোকে জানে তুমি আমার স্বামী ; মুখে তুমি যতই বল, সামাজিক ও আইনের দিক থেকে এখনও তুমি আমার ওপর স্বামী হিসেবে অভিভাবকত্বের দাবী করতে পার। আমি চাই তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করতে।

অমিয়। তারপর ?

মীনা। তারপর আবার আমি বিয়ে করবো।

অমিয়। কি বল্লে ? বিয়ে (হেসে উঠল) তা সবুর কর না কিছুদিন, আমিও একটা পাত্রী খুঁজে নিই তারপর এক লগ্নেই—

মীনা। আমায় অপমান করবার জন্যে তুমি হাসচো। কিন্তু তুমি ঠিক জেনো আমি একজনকে ভালবাসি এবং তাকে বিয়ে করবার ন্যায়সংগত অধিকার আমার আছে।

অমিয়। [শ্লেষের সুরে] সে ভাগ্যবানটি কে বলতো, যার গলায় মালা পরাবার জন্যে তুমি এত অধীর হয়ে উঠেছ ?

মীনা। [ধমক দিয়ে] ঠাট্টা রাখ।

অমিয়। ঠাট্টা ? (একটু হেসে) মনে আছে মীনা আজ যাকে গলায় দড়ি দিয়ে টানছো, ছ' বছর আগে তাকেও গলায় ফুলের মালা দিয়েই বরণ করে নিয়েছিলে ?

মীনা। সেদিন আমি ভুল করেছিলাম' কিন্তু আজ আমার চোখ মেলেছে ; সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবো আমি।

অমিয়। বলতে পার মীনা দেবী যার সাহচর্য থেকে মুক্ত হয়ে আজ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, কি দেখে তাকে একদিন অভিনন্দন জানিয়েছিলে ?

মীনা। তুমি ভুল করেছ ; আমি তোমায় অভিনন্দন ও জানাইনি, ভালও বাসিনি, আমার কাঁচা মনের সুযোগ নিয়ে তুমি আমায় ভুল বুঝিয়েছিলে।

অমিয়। তুমিই ভুল করছ মীনা, তা নয়। সেদিন ছিলে তুমি সামান্য একজন কিশোরী স্কুলের ছাত্রী, আর আজ তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপে পৌছে গেছ।

সেদিনের পর্ণকুটীরে আজ সহরের বিজলী আলো প্রবেশ করেছে ; আজ তোমার মনে লেগেছে নানা রংএর ছোপ। সেদিনের সে সরল মন তোমার আজ নেই মীনা। অবশ্য তোমায় আমি দোষ দিই না। আমার শিক্ষিত জীবনের ব্যর্থতা আজ তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তুমি আজ ভাল করেই বুঝতে পেরেছো যে সেই ব্যর্থ জীবনের উপার্জিত অর্থে তোমার বিলাসী মন পরিতৃপ্ত হতে পারে না।

মীনা। (বাধা দিয়ে) তোমার বক্তৃতা রাখ।

অমিয়। কেন শুনতে খারাপ লাগছে এই অপ্রিয় সত্য কথাগুলি ?

মীনা। তোমার এ সন্দেহ ভুল। আমার অনুরোধ, একটা মিথ্যা সন্দেহ মনে রেখে তোমাকে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিতে হবে না।

অমিয়। বক্তৃতা নয় মীনা। এ নির্মম সত্যের ইতিহাসের একটী পৃষ্ঠা মাত্র, যেদিন তুমি বাসা ভেংগে দিয়ে হোটেলে উঠে এলে, সেইদিনই বুঝেছি তোমার এ হোটেলে বাস নির্জন একাকীত্বের মাঝে আত্মনিমগ্নের প্রয়াস নয়, এর পেছনে রয়েছে বিলাসের পসরা সাজানো। আমি তখনও বাধা দিইনি, আজও দেব না।...আমি জানি আজ আমি নিজে না খেয়ে যে টাকা দি'ে তোমায় এখানে রেখে তোমার লিপ্সা চরিতার্থ করবার সুযোগ দিয়েছি, সে সামান্য ক'টী টাকা যদি বন্ধ করে দিই, তা হলেও তোমার কোন ক্ষতি হবে না ; বরং সুবিধাই হবে। এমন কি এই সাধারণ হোটেল থেকে কোন বিখ্যাত হোটেলেও প্রোমোশন পেয়ে যেতে পার। সব জেনে শুনেও তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না কেন জান ? সে হচ্ছে আমার একটা বড় রকমের দুর্বলতা।

মীনা। দুর্বলতাটা তোমার···আমার নয়। তাই তার ফল ভোগের জন্যেও আমি প্রস্তুত নই।

অমিয়। দুর্বলতার এ অর্থ করো না তুমি যে, তোমার প্রতি ভালবাসা বা আকর্ষণ। এর কোনটাই যে নয় আমি জোর করেই বলতে পারি। যে স্বামীর নিজের স্ত্রী অপরের দিকে আকৃষ্ট জেনেও মনে কোনরূপ ঈর্ষা সৃষ্টি হয় না, তার মনে যে পত্নীপ্রেম থাকতে পারে না, একথা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পার। কিন্তু তবুও তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না কেন জান ?...একদিন অভিভাবকদের মত অগ্রাহ্য করে, সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাকে বরণ করে নিয়েছিলাম, আজ যদি তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিই তবে তার থেকে বড় পরাজয় আমি কল্পনাও করতে পারিনে মীনা। আজও আমি সবার সামনে মুখ তুলে চাইতে পারি...কারণ এখনও সকলে জানে তুমি আমার স্ত্রী।

মীনা। সেটা তোমার পক্ষে গৌরবের হতে পারে··· আমার কাছে নয়।

অমিয়। তাই নাকি ?

মীনা। নিশ্চয়ই। তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে একজন বামুনের মেয়ে বিয়ে করার সৌভাগ্য তোমার হয়েছিল।

অমিয়। (হেসে) বাঃ বাঃ মীনা অনেক নূতন কথা শোনাচ্ছ দেখছি।

মীনা। এ আর নূতন কথা কি ?

অমিয়। আমার কাছে তো নূতন বলেই মনে হচ্ছে। আমাকে যে তুমি বিয়ে করেছিলে, সে কি বামুন হিসেবে কৃতার্থ করবার জন্যে ? বরং তোমারই মনে রাখা উচিত যে তোমাকে যে সামাজিক সম্বন্ধ দিয়েছি তাতেই তুমি কৃতার্থ হয়েছো। তুমি আজ আমায় কোথায় নিয়ে এসেছ জান ? তোমাকে সুখী করবার জন্যে আমি কি না করেছি। আমার উপার্জনের একটা বৃহত্তর অংশ ব্যয় হয়েছে তোমার ভোগলিপ্সার পিছনে।

মীনা। এটা আর একটা বড় কথা কি ? স্বামী হিসেবে তোমার কর্তব্য পালন করেছ।

অমিয়। আর তুমি ? স্ত্রী হিসেবে কি কর্তব্য পালন করেছ শুনি। আমার আত্মত্যাগের কি মূল্য দিয়েছ তুমি ? আমায় পথে বসিয়েই তুমি ক্ষান্ত হওনি···লোকের মুখ হাসিয়েছ, জানি মানুষ চিরদিন এক রকম থাকে না। কিন্তু পরিবর্তনেরও একটা সীমা আছে এবং গতিও আছে। তোমার এই অধঃমুখী পরিবর্তনকে সমর্থন করা যায়না মীনা।

মীনা। বার বার তোমায় বলে দিচ্ছি, আমার চরিত্র সম্বন্ধে তুমি ইংগিত করবে না।

অমিয়। করবো না? আমি করবো না তো কে করবে? আমার চেয়ে তোমাকে ভালভাবে কে চিনতে পেরেছে বল? আমার কি ইচ্ছা হয় জান? তোমার শিক্ষা সংস্কৃতির ভদ্র আচরণের নীচে তোমার যে কুৎসিৎ স্বরূপ লুকিয়ে রয়েছে তাকে সবার সামনে নগ্ন করে তুলে ধরি। সতী সাধ্বী রমণীর কলংকিত রূপটা সবাই এক-বার ভাল করে দেখুক।…কিন্তু তা পারি না। কারণ এখনও তুমি আমার স্ত্রী।

মীনা। কিন্তু স্ত্রীর এ অভিনয় অসহ্য।

অমিয়। যেটাকে তুমি আজ বাস্তব হবে বলে মনে করছো তার পরিণতিটা কি একবার চিন্তা করে দেখেছ?

মীনা। চিন্তার কোন দরকার করে না। এখন তোমার শেষ কথার অপেক্ষা শুধু। তুমি বিবাহ আইনের হাত থেকে আমায় মুক্তি দেবে কি না? যদি আপোষে সম্মত না হও তা হলে বাধ্য হয়ে আমায় সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ বেছে নিতে হবে।

অমিয়। তুমি যা ইচ্ছা করতে পার‥আমি ভেবে দেখেছি আমার ঐ কথাই শেষ কথা।

মীনা। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আইনের বাঁধন খুলতে তুমি অক্ষম?

অমিয়। হ্যাঁ…আমি যাচ্ছি, আমার অনুরোধ রইলো এই একথার মীমাংসার জন্যে বারে বারে আমায় ডেকে পাঠিও না…[কয়েক সেকেণ্ডের স্তব্ধতা]…একি? দেখছি এ ছবিখানা এখনও ফেলে দাওনি। বেশ যত্ন করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এ অভিনয় কেন?

মীনা। তার কৈফিয়ৎ কি তোমায় দিতে হবে না কি?

অমিয়। নিশ্চয়ই। আমার ছেলের ছবি, তার কৈফিয়ৎ আমায় দেবে না তো দেবে কার কাছে?

মীনা। ছেলে তোমার একার নয়।

অমিয়। ও তাই বুঝি আমাদের দাম্পত্য জীবনের ওই মৃত নিদর্শনটী স্মৃতি রক্ষা করেছো। শত শত ধন্য-বাদ জানাচ্ছি তোমায়।…কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসা করি তোমায়—এ অভিনয় কেন?

মীনা। নিজের ছেলের ছবি রাখা অভিনয় নয়।

অমিয়। বলতে লজ্জা করছে না তোমার। মনে কর ঐ ছেলে যদি আজ বেঁচে থাকতো? তার কাছে তুমি মুখ দেখাতে কি করে?

মীনা। সে কথা এখন ওঠে না।

অমিয়। কিন্তু তবুও তুমি তার স্মৃতির অবমাননা করতে পারবে না। বাইরে থেকে না হলেও মনের দিক থেকে যে সম্বন্ধ স্বেচ্ছায় তুমি মুছে দিয়েছো, সে সম্বন্ধের কোন নিদর্শনই তোমার কাছে থাকতে পারবে না। তোমার এ ভণ্ডামি অসহ্য। এক এক করে অনেক ভণ্ডামিই তোমার সহ্য করেছি। তোমার ফোটা তিলক কেটে বৈষ্ণবী সাজাও বরদাস্ত করা যায়। কিন্তু যেখানে আমার সম্পর্ক নিয়ে ভণ্ডামি চালাচ্ছো সেখানে আমি চুপ করে থাকতে পারি নে। মনের দিকে যে সম্পর্ক চুকে গেছে তার শেষ নিদর্শনটুকু সাজিয়ে দাম্পত্য জীবনের Demonstration দিতে তোমায় আমি দেবো না…কখনই না।

[ছবিটাকে অমিয় টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে মেঝেয় সজোরে নিক্ষেপ করলো ছবির কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেয় ছড়িয়ে পড়লো। মীনা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো]

তৃতীয় দৃশ্য

[হোটেলের রুদ্ধ দ্বার কক্ষে মীনা একাকী, দরজার বাইয়ের দিকে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল]

মীনা।…কে?

মোহিত। (বাইরে থেকে গলার স্বর) দরজা খোল আমি মোহিত।

মীনা। (দরজা খোলার শব্দ হলো) এস। [মোহিতের প্রবেশ]

মোহিত। সন্ধ্যাবেলা ঘুমুচ্ছিলে নাকি?

মীনা। না…এমনি শুয়েছিলাম।

মোহিত। কেন শরীর খারাপ নাকি?

মীনা। না মন খারাপ।

মোহিত। মন খারাপ মেয়েদের একটা বিশেষ রোগ।

মীনা। কেন ছেলেদের বুঝি মন খারাপ করে না।

মোহিত। ছেলেদের নার্ভ মেয়েদের মত দুর্বল নয় তাই মন খারাপ করলেও বাইরে ঘটা করে তারা Display করতে যায় না।

মীনা। আমি কি ঘটা করে display করছি বলে তোমার মনে হচ্ছে?

মোহিত। তুমি ইচ্ছা করে না করলেও তোমার চোখ মুখে সর্বদাই মন খারাপের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। তোমায় দেখে তো আমি প্রথম ঘাবরে গিয়েছিলাম।

মীনা। কেন ভয় পেয়েছিলে নাকি? (হাসি)

মোহিত। না না ভয় পাইনি, কিন্তু তোমার চেহারা আজ অমন দেখাচ্ছে কেন বলতো?

মীনা। তোমার কি মনে হয়?

মোহিত। আমার কিছু মনে হয় না কারণ আমি এতখানি জ্যোতিষবিদ্যাবিশারদ নই যে কারও মনের কথা বলতে পারবো।

মীন। (একটু হেসে) কিন্তু তোমার পারা উচিত ছিল।

মোহিত। তা হবে,—

মীনা। কথাটা আমি বলতে পারি। তোমার বলতে পারা উচিত ছিল বলছি এই জন্যে যে সে ব্যাপারে তোমারও সংস্রব রয়েছে।

মোহিত। ভূমিকা না করে বলে ফেল না কেন?

মীনা। বলছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা কথার জবাব দাও আমার জন্যে তুমি কতটা দূর যেতে পার?

'ঘর' চিত্রে শ্রীমতী যমুনা

মোহিত। তার মানে?

মীনা। তার মানে, আজ আমি ওকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি যে তার সংস্রবে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়, তুমি জান আমাদের বিয়ে রেজেষ্ট্রী করে হয়েছিল হিন্দুমতে হতে পারেনি। সুতরাং অনায়াসেই আমরা পারস্পরিক অনুমোদনে ডাইভোর্স করতে পারি।

মোহিত। তারপর?

[অমিয়র প্রবেশ]

অমিয়। তারপর আমি বলে দিচ্ছি। যাক ভালই হয়েছে Oh I am just in time আবার ফিরে আসতে

হলো মীনা। আমি ভেবে দেখলাম তোমায় মুক্তি দেওয়াই উচিত। (একটু হেসে) তা ভাল হলো দুজনকে একসংগে পেয়ে। I congratulate Mr. Banerjee, wish your good luck.

মোহিত। (অবাক হয়ে) আপনাদের কোন কথাই তো বুঝতে পারছিনা মিঃ বোস।

অমিয়। (সশব্দে হেসে উঠলো) আমার মনে কোনই দুঃখ নেই মিঃ ব্যানার্জি। কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে রেখে কোন লাভ নেই, বিশেষ করে সে যখন desperate হয়। যা হবেই, তাকে রোধ করতে না গিয়ে সসম্মানে সম্মতি দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই আমি আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি।

মোহিত। আপনি এসব কি শোনাচ্ছেন আমায়?

অমিয়। (আবার হাসি) তা আপনি ভালই করেছেন। অর্থ থাকলে হিন্দুশাস্ত্রে বহু বিবাহ যখন নিষিদ্ধ নয়, তখন কাজকি মশায় পরের ঘর ঘুরে ঘুরে মধু অন্বেষণ করে। তাতে বিপদও আছে, ভয়ে ভয়েও চলতে হয়। বিশেষ করে আমার মত উদার গৃহস্বামী খুব বেশী মিলবার আশা নেই।

মোহিত। (রেগে) ভদ্রভাবে কথা বলবেন, মিঃ বোস, আমাকে অপমান করবার অধিকার আপনার নেই।

অমিয়। (শ্লেষের হাসি) অপমান! আজ একটা নূতন কথা শোনালেন মিঃ ব্যানার্জি। অপমান জ্ঞান আপনাদের আছে নাকি?

মোহিত। তার মানে, আপনি কি বলতে চান?

অমিয়। রাগ করছেন কেন, বলবার আমার কিছুই নেই। কারণ আমাদের মত ভদ্রলোক যখন জেনে শুনে আমাদের কুলবধু কুলকন্যাদের সুপরিচিত লম্পটের কবলে ছেড়ে দিয়ে গর্ব অনুভব করি, তখন সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্বৃত্ত অর্থ যাদের আছে তারা তার সদ্ব্যবহার করবে এতে আর আশ্চর্য কি?

মোহিত। মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন মিঃ বোস।

অমিয়। মাত্রা এখনও ছাড়িয়ে যাইনি' ছাড়িয়ে যেতাম যদি জানতাম আপনি কাপুরুষ—যা করেছেন তার মূল্য দেবার মত শক্তি আপনার নেই। বিশেষ করে আপনার ওপরে আমার শ্রদ্ধা আছে এই জন্যে, যে শুনেছি ইতিপূর্বেই আপনারা আপনাদের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছেন! তাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিঃ ব্যানার্জি যে মধু নিংরে নিয়ে ফুলকে তৃপ্তমনের বাইরে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেননি।

মোহিত। কি যা তা বলছেন।

অমিয়। যা তা বলছি না মিঃ ব্যানার্জি। অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে আপনাদের নব জীবন যাত্রার প্রারম্ভে। আর ভূতপূর্ব স্বামীর আশীর্বাদ তোলা রইলো, শুভলগ্নে গিয়ে জানিয়ে আসবো।

মোহিত। আপনি ভুল করছেন মিঃ বোস। আমরা দুজনে দুজনকে বিয়ে করবো বলে এখনো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হইনি আর হবার আশাও নেই। এ কথা উঠলো কি করে ?

মীনা। আমি বলেছি।

মোহিত। কিন্তু তোমার সংগে আমার এমন কিছু understanding হয়নি যাতে তুমি এ-কথা বলতে পার।

অমিয়। (বিস্মিত হয়ে) বলেন কি মশাই। আমি তো জানতাম সব কিছুই শেষ, শুধু আমার স্বামীত্বের দাবী হস্তান্তর বাকি।

মীনা। এর আবার understanding এর কি আছে !

মোহিত। আমার স্ত্রী পুত্র সব থাকতে—

মীনা। কেন তাতে কি হয়েছে।

মোহিত। অনেক কিছু আসে যায়। নিজের কুলে একটা কালির আঁচর দেবার আগে নানাদিক চিন্তা করবার আছে।

মীনা। তুমি তা'হলে বলতে চাও বিয়ে হতে পারে না ?

মোহিত। নিশ্চয়ই। আমাদের বিয়ে অসম্ভব। তা ছাড়া এসব কথা তো ওঠা উচিত নয়।

[সিগারেট ধরালো মোহিত]

অমিয়। (সিগারেট টান দিয়ে) ...আ···আমার বাচালেন মিঃ ব্যানার্জি...যেন ঘাম হয়ে জর ছেড়ে গেল, তা হলে দেখছি আপনার সম্বন্ধে যা Compliment দিয়ে ছিলাম, তা সব withdraw করে নিতে হয়।

[মীনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো]

অমিয়। তা হলে আমি উঠি মিঃ ব্যানার্জি। আপনার অবশ্য কিছুক্ষণ বসা দরকার। বেচারী হঠাৎ একটা আঘাত পেয়েছে।

মোহিত। না-না আমারও বসবার দরকার নেই।

অমিয়। তা বেশ। কিন্তু একটু বসে গেলে ভাল করতেন, আর দেখুন এ ক্ষেত্রে যা করেছেন বা করলেন ভবিষ্যতের জন্য আশা করি একটু সাবধান হবেন। একটা দাম্পত্য জীবনে ভাঙন এনেছেন তাও না হয় ক্ষমা করা চলে ; কিন্তু একটা অবলা সরলা নারীর কোমল প্রাণে যে আঘাত হেনেছেন এর ক্ষমা হয় না, কোন যুগেই হয়নি। তা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমা জিনিষটাকেই বিশ্বাস করি না, কারণ ক্ষমা জিনিষটাই মৌখিক, আন্তরিক ক্ষমা হয় না।

মোহিত। (উত্তেজিত হয়ে) আমি কোন দাম্পত্য জীবনে ভাঙন আনিনি, কারও কোমল প্রাণে আঘাত ও করিনি। এই সব অসংগত ইংগিত করে আমায় অপমান করবেন না বলে দিচ্ছি।

অমিয়। রাগ করতে আমরাও জানি মিঃ ব্যানার্জি, আপনার লজ্জা করা উচিত ছিল একজনের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আপনি তার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। অন্য কেউ হলে আপনাকে গুলি করে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতো কিন্তু আমি তা করিনি কারণ রক্তে সে উষ্ণতা নেই সে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

মোহিত। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন মিঃ বোস, আমি লম্পট হতে পারি, তাই বলে অভদ্র বা অকৃতজ্ঞ নই।

অমিয়। মূল্য যদি দিতে পারতেন তা হলে আপনার বিরুদ্ধে আমি কোন অভিযোগই আনতাম না। কিন্তু ততদূর যাবার মত সাহস, শক্তি বা আপনার মনের জোর নেই তার প্রমান তো কিছুক্ষণ আগেই আপনি দিলেন।

মোহিত। বিয়েটাকেই আপনি বড় করে দেখছেন মিঃ বোস্। আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমি বেইমানী করিনি, আমি টাকা দিয়েছি।

[মোহিতের প্রস্থান]

[যন্ত্রসংগীতে ছন্দপতন নির্দেশ]

[কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ]

অমিয় ! মীনা, [মীনার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো]

মীনা। (কান্না বিজড়িত স্বরে) বল···?

অমিয়। কেঁদোনা মীনা।

মীনা। [ভেংগে পড়লো] বল বল তুমি আমায় ক্ষমা করবে ? বল ?

অমিয়। তোমার সব দোষই তো আমি ক্ষমা করেছি। মীনা।

[মীনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কান্নার বেগ ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। অমিয় তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো]

সৌন্দর্য্য ও
অলঙ্কার শিল্পে
হরিচরণ দত্ত
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস্
১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

সম্পাদকের দপ্তর

সরোজ কুমার ঘোষ (ভাবাচার্য)

বৈশাখ মাসের "রূপমঞ্চে" আপনাদিগের আদর্শ ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে বিবৃতি বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনাদিগের পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে প্রত্যেক কলাসেবীরই আপনাদিগকে সাহায্য করা কর্তব্য। বিশেষ করিয়া (গ) চিহ্নিত তৃতীয় উদ্দেশ্যটি সম্বন্ধে গত শারদীয়া সংখ্যা "রূপমঞ্চে" প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হইয়াছে। চলচ্চিত্র ও নাট্যকলা সম্বন্ধীয় একটি আধুনিক সময়োপযোগী বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্পর্কে আমি দুই বৎসর পূর্বে এক পরিকল্পনা করিয়াছিলাম। পরে ক্রমশঃ অনেকের সহিত এ সংক্রান্ত আলাপ আলোচনায় জানিতে পারিয়াছি যে এখন আমাদের দেশে এ ধরনের উচ্চাঙ্গের একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আগ্রহ, ধনী প্রযোজক দিগের কাহারও বিশেষ নাই। কিন্তু সময় আসিতেছে যখন এই জাতীয় শিক্ষায়তন ও গবেষণাগার এই দেশে স্থাপিত হইবে। যতদিন না তাহা হইতেছে ততদিন আমরা কি করিব? সকলেই যদি হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকেন ও মনে করেন যে এ বিষয়ে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁহারাই এ কাজ করিবেন অপর কাহারও এবিষয়ে কিছু করিবার নাই তাহা হইলে তাঁহারা বড় ভুল করিতেছেন। প্রত্যেক কলাসেবীরই এসম্বন্ধে একটা কর্তব্য আছে ও তাই মনে করিয়া যদি এখন হইতে ইহার জন্য অন্ততঃ প্রচার মূলক কার্য আরম্ভ করা যায়, তাহাতে সেই আগতপ্রায় দিনের আগমনকে অনেক সাহায্য করা হইবে।

এ সম্বন্ধে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কথা ত অনেক শোনা যাইতেছে। যুদ্ধ ত শেষ হইয়াছে। যুদ্ধ প্রযুক্ত যে সকল নানান অভাব অসুবিধার মধ্য দিয়া দেশের শিল্পকলাকে কালক্ষেপ করিতে হইতেছিল তাহা অনেকাংশ বিদূরিত হইবে। আমদানি রপ্তানি ও যানবাহনাদির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক শিল্পেরই অবস্থার পরিবর্তন দেখা যাইবে। কিভাবে ও কি উপায়ে সেই উন্নত পরিবর্তন গুলিকে দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলকর করিয়া তোলা যায় এখন হইতে তাহার বিভিন্ন পরিকল্পনা চলিতেছে ও কি ভাবে তাহা কার্যে পরিণত করা যায় তাহারও উদ্যোগ আয়োজন এখন হইতে নির্দিষ্ট হইতেছে।

যতদূর জানা যায় গভর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট বেতার বার্তা ও প্রচারমূলক ফিল্ম ব্যতীত রঙ্গমঞ্চ অথবা চলচ্চিত্র শিল্পের অপর কিছু ব্যাপক ভাবের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কথা শোনা যাইতেছে না। দুএকজন প্রযোজক বা পৃষ্ঠপোষক হয়ত ব্যক্তিগতভাবে বড়রকমের একটা মতলব আঁটিতেছেন যথা বোম্বাই প্রদেশের খ্যাতনামা পরিচালক ভি, শান্তারামের বিশাল এক ষ্টুডিও নির্মাণের পরিকল্পনা, সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশের Independent film producers' Assocation দেশের গন্যমান্য ব্যক্তিদিগের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে একটী কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা। বোম্বাই ত চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে ভারতবর্ষে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে কিন্তু বঙ্গদেশে কি হইতেছে? বাঙ্গালী কি চিরকাল ঘুমঘোরে অচেতন থাকিবে?

রাশিয়ার সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের ন্যায় আমাদের দেশে কোনও দিনই বিজাতীয় শাসন পরিষদ নাট্যকলার, সঙ্গীত

অথবা ছায়াচিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করে নাই। দেশের বিশ্ববিদ্যাগুলি ও এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। জন শিক্ষার এই সুন্দর স্বাভাবিক আনন্দদায়ক বাহন ও উপায়-গুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের যে কোন দায়িত্ব আছে এ তাঁহারা মনেই করেন নাই সুতরাং জনসাধারণের উদ্যম উদ্যোগেই উহা আপন আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া প্রাচীন প্রথায় ধীরে ধীরে পরিস্ফুট ও পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছিল। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অনেকেই এ সম্বন্ধে চিন্তা ও অবধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শিক্ষার দিক দিয়া, আনন্দদানের দিক দিয়া ও লাভের দিক দিয়া বিশেষ করিয়া চলচ্চিত্র শিল্পকে কি উপায়ে উন্নত ও অধিক চিত্তাকর্ষক করা যায় সে সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি হইতেছে। ইহার ফল যে কিছু হইবে না তাহা নয়, অন্ততঃ ধনী প্রযোজক পরিবেশকবর্গ এ শিল্পকে কি উপায়ে আরও লাভজনক করিতে পারিবেন তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। প্রয়োজনার উৎকর্ষতা অথবা পরিচালনার নিপুণতার দিকে তাঁহাদের খেয়াল নেই।

যাহাদের লইয়া এই সকল শিল্পকলা গড়িয়া উঠিতেছে অর্থাৎ দেশের দর্শক সাধারণের অভিনেতৃবৃন্দ ও সর্ব শ্রেণীর কলা ও শিল্প কুশলীগণ তাঁহাদের অবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি না হইলে কি প্রকৃত উৎকর্ষ সম্ভবপর হইবে? মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আমরা যেরূপ একই ভাবের চলচ্চিত্র ও মুষ্টিমেয় কয়েকটি অভিনেতা, অভিনেত্রীকে লইয়া একই ধরনের পরিচালনা দেখিয়া আসিতেছি তাহাতে ত সেরূপ আশা করিবার মত কিছু দেখা যায় না।

বেতার শিল্প, রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষিত ও ভদ্রবংশীয় যুবক যুবতীগণ-ও ক্রমশই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই; এখন হইতেই তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে। এই বিষয়ক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ, সমালোচনা ও বিশেষভাবে পাঠকবর্গের প্রশ্নাবলীর দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা প্রতীয়-মান হইবে। পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী লোক আজ-কাল এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন ও আপন আপন মন্তব্য দিতেছেন। রঙ্গালয় ও চলচ্চিত্র পেক্ষাগৃহগুলি অবসর বিনোদনের প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিতেছে। চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকাগুলিতে কত যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের যোগদান সম্পর্কীয় জিজ্ঞাসাবাদ পত্র আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রশ্নের উত্তর পাইয়া অনেকেই নির্দেশমত প্রবেশলাভের চেষ্টার ত্রুটি করি-তেছেন না, অথচ কার্যতঃ তেমন সুযোগ না পাইয়া ক্রমশঃ হতাশ হইতেছেন। কোথাও যে একটা বড় রকমের গলদ আছে তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে কিন্তু গলদটি কি ও কোথায়?

ভারতীয় ছায়া জগতের উদীয়মানা অভিনেত্রী চন্দ্রপ্রভা

এসম্পর্কে কিছুদিন পূর্বে আপনাদিগেরে পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন তাহা পরিহাসমূলক শুনাইলেও
জনৈক শ্রদ্ধেয় লেখক "যদি তারকা হতে চান" শীর্ষক অনেকাংশে সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে। এক্ষেত্রে দেশের

রিমঝিম বৃষ্টিতে ধারা স্নানের আনন্দ কে না পেতে চায়? বৃষ্টির দিনে গ্রামের মেয়ে-ছেলে-বৌ আজও এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত নয়। কিন্তু শহরবাসীদের ধারা স্নানের ক্ষোভ মেটাতে হয় যান্ত্রিক উপায়ে— শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে। তবে ভালো সাবান মেখে শাওয়ারের নিচে বা কলতলায় স্নান করে তৃপ্তি যে বড় কম তা নয়। 'রেণু' সাবান—যেমন তার মিষ্টি গন্ধ, তেমনি সুপ্রচুর তার ফেনা—মেখে স্নান করলে শরীর এমন স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন মনে হয় যে স্নানের আনন্দ যায় শতগুণ বেড়ে। তার ওপর সাবানটি সুলভ। তাই 'রেণু' গায় মাখায় বিলাস আছে, বিলাসিতা নেই।

রেণু

Renu

শিশির সোপ ওয়ার্কস দমদম

সোল সেলিং এজেন্টস : হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল কর্পোরেশন লিঃ, ৭৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

SRK 2

ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থী শিল্পী ও কর্মীরূপে যোগদানেচ্ছু যুবক যুবতীগণ কি উপায়ে তাঁহাদিগের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারেন? সৎপথে থাকিয়া জীবিকা উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে কলাসৃষ্টির দ্বারা আনন্দ উপভোগ ও পরকে আনন্দদান খুবই ন্যায্য ও স্বাভাবিক। শিক্ষা ও স্বাধীন মনোবৃত্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ও বৃদ্ধি পাইবে।

এবিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে বিশেষ করিয়া চলচ্চিত্র সংক্রান্ত শিক্ষা ও সহায়তামূলক মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠানের কথা। বিশেষ প্রণালীবদ্ধ ভাবে স্বদেশের কৃষ্টি অনুযায়ী শিক্ষা দীক্ষার অভাবে আমাদের দেশের প্রায় সর্বশ্রেণীর শিল্পী ও কলাকুশলীগণ অথবা বিদেশীয় কাহিনীও ভাবভঙ্গির অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠিতেছেন ও তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া আমাদিগের অধিকাংশ প্রযোজনা অস্বাভাবিক ও অতি অভিনয়দুষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত পরের একটি বিষয় সম্বন্ধেও আমাদিগের ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। সেটী ধনী বৈদেশীক প্রযোজকদিগের সংগে প্রতিযোগিতা। 20th Century Fox pictures এর মাতব্বরMr. Dorryl F Zanuck সাহেবের ভারতক্ষেত্রে মূলধন খাটাইয়া আধুনিক ভাবে ষ্টুডিও প্রস্তুত করিয়া এদেশীয় ও তাঁহার স্বদেশীয়দের লইয়া ভারতীয় চলচ্চিত্রগঠণের যে পরিকল্পনা আছে তাহা কি ভারতবাসী প্রযোজক ও জনসাধারনের পক্ষে হিতকর হইবে? তাই মনে হয় একটি বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন গড়িয়া তোলা বিশেষ আবশ্যক হইলেও এ সদিচ্ছা হয়ত পরিকল্পনাতেই পর্যবসিত হইবে। তাহার পূর্বে কিছুকাল এই জাতীয় একটি কোন প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করা আবশ্যক।

আমি এইরূপ নূতন ধরণের প্রতিষ্ঠানের একটি পরিকল্পনা করিয়া তাহার এক প্রতিষ্ঠা পত্র প্রস্তুত করিয়াছি। তাহা সমূহভাবে প্রকাশ করা এই অল্পপরিসর পত্রিকাস্তম্ভে সম্ভবপর হইবে না। যাঁহারা এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়া ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে ইচ্ছা করেন আমি

শুনো শুনাতাহুঁ চিত্রে উল্লাস

সেরূপ উৎসাহী মহিলা ও ভদ্রলোকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া ইহাকে সুচারুরূপে কার্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করি ও তজ্জন্য তাঁহাদিগের সহিত একযোগে কার্য করিতে প্রস্তুত আছি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানিতে হইলে এই ঠিকানায় (১১ বি সাদার্ণ এভেনিউ, কালীঘাট) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে অথবা পত্রব্যবহার করিলে আমি বিশেষ সুখী ও বাধিত হইব। সাক্ষাৎ করিবার সময় সাধারনতঃ প্রাতে ৭টা হইতে ৯টাও বৈকালে ২টা হইতে ৬টা পর্যন্ত।

উত্তর কলিকাতার অধিবাসীগণ ইচ্ছা করিলে রূপমঞ্চ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ৩০নং গ্রে ষ্ট্রীটে বেলা ১০টা হইতে ১২টার মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

: চিত্র ও নাট্যকলার বিভিন্ন বিভাগের উপযোগী করে তুলতে উৎসাহী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা রূপমঞ্চ বিভিন্ন পরিকল্পনার অন্যতম। এব্যাপারে যে কোন সত্যিকারের উৎসাহীর সংগে সহযোগীতা করবার প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি। শ্রীযুক্ত ভাবাচার্য যদি ব্যাক্তিগত ভাবে অগ্রসর হ'ন, তিনি আমাদের সহ-

যোগীতা পাবেন এবং অপরাপর উৎসাহী পাঠকদেরও এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীমতী ইন্দ্রানী দেবী (বাঁকুড়া)

বাংলা কাগজে চিঠি পত্র বাংলায় লিখবেন। বিশেষকরে সম্পাদকীয় দপ্তরে যদি কিছু লিখতে হয়। বাংলায় প্রশ্ন করেন নি বলে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না বলে ক্ষমা করবেন।

হেমন্ত কুমার দাশ (সালিখা, হাওড়া)

রূপমঞ্চ পত্রিকার মারফতে ছোটদের উপযোগী ছবি তুলিবার জন্য বহু আলোচনাই হইয়াছে। কিন্তু চিত্র ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি তথাপি এদিকে পড়িতেছেনা। আপনার—আমার কথা শুনিবার মত হয়ত তাহাদের অবসর নাই। আমাদের ছোট ভাইদের কথা তাদের কানে পৌঁছায় না। তাই আপনাদের অনুরোধ করিতেছি, আপনারা অগ্রণী হইয়া ছোটদের ছবি তুলিবার জন্য এক কম্পানীর প্রতিষ্ঠা করুন, রূপমঞ্চের পাঠক পাঠিকাদের সাহায্য যে পাবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

ঃ ছোটদের প্রতি আপনার দরদের পরিচয় পেয়ে খুবই আনন্দিত হলুম। রূপমঞ্চকে যে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন, রূপমঞ্চের পক্ষে অন্যদিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ রূপমঞ্চের নিজেরই এখন পর্যন্ত এত গলদ আছে যা আমরা শুধরে নিতে পারিনি। রূপমঞ্চকে যতদিন না নিখুঁত রূপদান করতে পারবো অন্য কোন পরিকল্পনায় নিজেদের নিয়োগ করতে পারি না। তবে ভবিষ্যতে সচেষ্ট থাকবো। তার পূর্বে আপনারা দর্শকেরা সচেতন হ'য়ে উঠুন, সংঘবদ্ধ হ'য়ে দাবী জানান। কর্তৃপক্ষের বধির কর্ণের পরদা আমাদের দাবীর আঘাতে খান খান হয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী (আশুতোষ মুখার্জি রোড, ১১৭৩)

বর্তমানে বাংলার ডিরেক্টরদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল ?

ঃ ব্যক্তিগত ভাবে প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনা আমার ভাল লাগতো। বর্তমানে সবচেয়ে কে ভাল এপ্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন—কারণ—কেউই কাউকে ছাড়িয়ে যাবার স্পর্ধা করতে পারেন না, তাঁদের পরিচালনার নিদর্শন থেকে তা নির্ভয়ে বলতে পারি। তাই দর্শক এবং সাংবাদিকদের দ্বারা নির্বাচিত বিমল রায়েরই আপাততঃ নাম করবো।

দুর্গেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় (লীলাবাস, কাটোয়া)

অশেষ শ্রদ্ধার সংগে জানাচ্ছি রূপমঞ্চে রতীন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা পাঠক ও নাট্যামোদিগণের ব্যাথার প্রলেপ হয়ে কিছুটা শান্তি দিয়েছে। করুণাময় ভগবান 'রূপ-মঞ্চে'র মঙ্গল করুণ এই প্রার্থনাই করি। রূপমঞ্চের রতীন্দ্র স্মৃতি সংখ্যার ৬০ পৃষ্ঠায় মঞ্চও পর্দায় যে সব চরিত্র চিত্রণে রতীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন' শীর্ষক স্তম্ভে শেষ রংমহল ছেড়ে মিনার্ভায় যোগদান করবার পর রতীন্দ্রনাথ কৃষ্ণ দাস বিরচিত 'পুরোহিত' নাটকে সমরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সেটির উল্লেখ নেই, এবিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ঃ মাটির মানুষ আমরা, মাটির দেবতার চেয়ে আর কিছু বড় নেই আমাদের কাছে। আপনাদের শুভ কামনাই আমাদের পক্ষে শুভ। রতীন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা আপনাদের খুশী করতে পেরেছে, সেখানেই আমাদের সার্থকতা। রতীন্দ্র সংখ্যায় চিত্র ও নাটকে যে সব চরিত্রে রতীন্দ্রনাথ অভিনয় করেছিলেন, তার সবগুলির নাম যে ওতে স্থান পেয়েছে তা নয়। তবু পুরোহিতের নামোল্লেখ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গরমিল, রিক্তা ছাড়া আরও কয়েকখানি চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছিলেন।

নিঃ এস, এস, বি (আলীপুর)

বর্তমানে যে কজন মঞ্চাভিনেত্রী আছেন তাদের মধ্যে কাকে আপনারা শ্রেষ্ঠস্থান দেন।

ঃ সরযূবালা—রাণীবালা—মলিনাদেবী।

ললিতা বসু (শাঁখারী টোলা ষ্ট্রীট, ইটালী)

কিছুদিন পূর্বে কোন দৈনিকে দেখিয়াছিলাম রূপমঞ্চ পত্রিকা 'ইনসাফকি মসনদ' অভিনয় করিবে। আমাকে ঐ অভিনয়ে গ্রহণ করিবেন কি।

ঃ কলিকাতার কোন কোন এ্যামেচার ক্লাব রূপমঞ্চের সুনামের সুযোগগ্রহণ করে এরূপ প্রচার করছেন। তাদের এই হীন মনোবৃত্তির যাতে কোন প্রশ্রয় দেওয়া না হয় সেজন্য সহৃদয় জনসাধারণকে অনুরোধ জানাচ্ছি। রূপমঞ্চের বর্তমানে এরূপ অভিনয়ের কোন পরিকল্পনাই নেই। কোন্ পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে এবং তাতে রূপমঞ্চ পত্রিকার নামোল্লেখ করা হ'য়েছে সেটা যদি জানাতেন, তাহলে সে পত্রিকার দৌড় টা একটু দেখে নিতাম।

মায়াপুরী (শিশু নাটিকা)—শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত। রূপমঞ্চ প্রকাশিকা কর্তৃক ৩০নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। দাম একটাকা।

বাঙ্গালার নাট্যসম্পদ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী পরিপুষ্ট হওয়া সত্বেও এখানকার শিশুদের জন্যে অভিনয়োপযোগী ভাল পুর্ণাংগ নাটক যে খুবই কম, এ কথা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করা যায়। একদা শিশুদের জন্যে স্ত্রীভূমিকা বর্জিত কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক অবশ্য রচিত হয়েছিল, কিন্তু তার সংখ্যাও যেমন কম আধুনিক যুগের প্রয়োজনের কাছে তা তেমনিই অকিঞ্চিৎকর। প্রসিদ্ধ শিশু সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী বাঙ্গালার সেই অভাব দূর করবার জন্যে সম্প্রতি উদ্যোগী হ'য়েছেন এবং আলোচ্য নাটিকাটি তার নিদর্শন। রূপকথার টেকনিক্ অবলম্বনে নানা রসের সমন্বয়ে আলোচ্য নাটিকাটি বিশেষভাবে পরিপুষ্ট। শুধু তাই নয়, অভিনয়ের ভেতর দিয়ে কিশোর কিশোরীদের চিত্তে যাতে নৃত্যগীত প্রভৃতি চারুকলার প্রতি অনুরাগ বিকশিত হয় নাট্যকার সে দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন। মোটের ওপর শ্রীযুক্ত নিয়োগীর "মায়াপুরী" একখানি নিছক নাট্য গ্রন্থ নয়। এর অন্তর্নিহীত উদ্দেশ্যও সুদূর প্রসারী। সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা 'রূপমঞ্চ' কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করে পারি না। নাট্য ও চিত্রকলাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দানে তাঁরা এতকাল আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন তাই নাটকের এই অভাবটি সম্পর্কে তাঁরা সজাগ হওয়ায় দেশের কিছুটা যে উপকার হবে সে কথা অকুণ্ঠে স্বীকার্য। এই নাট্যকাটি যাদের জন্যে লেখা তাদের ও যথোপযুক্ত সমাদর পাবে বলেই আমরা আশা রাখি—প্রদ্যোত মিত্র।

ভারতের মুক্তিসাধক—শ্রীগোপাল ভৌমিক প্রণীত। বেঙ্গল পাব্লিশার্স কর্তৃক ১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম একটাকা বার আনা।

শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক বাঙ্গলা দেশের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। আধুনিক বাঙ্গলা কাব্যে ও সাহিত্যে তাঁর দানও নেহাৎ কম নয়। ইতিপূর্বে ছোটছেলেদের জন্যে তাঁর লেখা 'পৃথিবীর বড় মানুষ' এবং অন্যান্য দুই একখানা বই পাঠকমহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ ক'রেছে। আলোচ্য বইখানা যদিও প্রধানতঃ ছোট ছেলেদের জন্যে লেখা, তবু এর প্রয়োজনীয়তা এবং আবেদন সর্বজনীন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত ভারতের বারজন মুক্তিসাধকের জীবনী অবলম্বন ক'রে এই বইখানা রচিত। এতে শুধু মনীষীদের জীবনকথাই বিবৃত হয় নাই, তাঁদের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা এবং মুক্তিসাধনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাধনার কথাও বইখানিতে অত্যন্ত সহজও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে। যাঁরা দেশের ইতিহাস ও অবস্থা সম্পর্কে আগ্রহান্বিত আবাল বৃদ্ধ বণিতা নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই বইখানি পাঠযোগ্য। (প্রদ্যোত মিত্র)।

অন্তরাল (নাটক)—লেখক শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নলদময়ন্তী চিত্রে শোভনা সমরথ

প্রাপ্তিস্থান বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা, দাম দুইটাকা।

আলোচ্য নাটকের মূল সমস্যা হলো কানীন পুত্রকন্যা সমস্যা—অবশ্য আমাদের বাঙ্গালী সমাজের। আধুনিক কালের নানা জটিলতার মধ্যে এই সমস্যাটি যে সমাজের একটি চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিয়াছে এবং কোন কোন দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংগে ইহার একটি সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও এই সমস্যার দিকে সমাজ নেতা বা জাতীয় নেতা কোনদলই চিন্তা করেন নাই। কাজেই এই সমস্যা লইয়া আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়া গিয়াছে। নাট্যকারও কোন সমাধান-সূত্র দিতে পারেন নাই। শুধু একটা sentiment এর আবছায়া রচনা করিয়া যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন।

নাটকখানির প্রায় সবখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে শ্রমিক আন্দোলনের কথা এবং এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়াই যদি নাটকটি শেষ হইত তাহা হইলে শোভন হইত। উপসংহারে যে সমস্যাকে একবার টানিয়া আনিয়াই নিরাপদ দূরত্বে লেখক সরিয়া গিয়াছেন তাহা কোন দিক দিয়াই রূপ পরিগ্রহ করিল না। সমাধানের ইংগিত ত নাই-ই।

তবে লেখকের ভাষা খুব সাবলীল এবং ঘটনার আবর্ত গড়িবার একটি চমৎকার নিপুণতা আছে বলিয়াই পাঠ করিয়া আরাম পাওয়া যায়। আর তাহা ছাড়া সস্তা কোন Stunt দিবার চেষ্টা নাটকটির আগাগোড়া কোথাও নাই; সর্বশেষে একটি কথা বলিয়া শেষ করিতেছি যে, চিত্রনাট্য 'উদয়ের পথে'র দুইটী দৃশ্যের ছাপ বইটিতে আছে, তবে খুব প্রচ্ছন্নভাবে।—রাখাল দাস চক্রবর্তী।

দাদুর ঝোলা (শিশু গল্পিকা)—গণেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান মণ্ডল ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিঃ ৫৪-৮নং কলেজ ষ্ট্রীট। মূল্য ১৷০।

লেখক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ প্রবীণ শিক্ষক। স্কুল পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বর্তমানে শিক্ষকতা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শিশুশিক্ষার উন্নতি কল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শিশুমনের প্রতিটী অলিগলি তাঁহার ভাল করিয়া জানা আছে। তাঁর বৃদ্ধবয়সের রচনা 'দাদুর ঝোলা' যে শিশুদের কাছে সমাদর লাভ করিবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আলোচ্য পুস্তকে মনের পরশকে অবতারনা বলে বাদ দিলে দুইটি কাহিনী (হিজলগড় ও পাহাড়ের ডাক) স্থান পাইয়াছে। রূপ কথার এই কাহিনী দুটি বাস্তবের পরশ কাঠিতে লেখক অপূর্ব ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এর মধ্যে হিজলগড় কাহিনীটির ভিতর শিশুদের উপযোগী চিত্রের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। শিশুদের কাছে দাদুর ঝোলা সমাদর পাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।—প্রীতি দেবী।

চলচ্চিত্রে জাতীয়তা

শ্রীঅনাদি মিত্র

অনেকেই হয়ত বললেন চলচ্চিত্রে আবার জাতীয়তা কি? কেবল মাত্র রস পরিবেশনই কি যথেষ্ট নয়? তাঁরা হয়ত বলবেন আমাদের এই কর্মক্লান্ত দুঃখময় জীবনে যদি চলচ্চিত্র আমাদের সেই দুঃখ সেই ক্লান্তি সাময়িক ভাবেও দূর করতে পারে, তবেই ত চলচ্চিত্রের জীবন যথেষ্ট সার্থক মনে করতে পারি আবার বোঝা কেন? হয়ত একথা আংশিক ভাবে সত্য এবং চলচ্চিত্রও এ যাবৎকাল নানা ভাবেই আমাদের সেই রুচিমতন খোরাক জুগিয়ে আসছে।

কিন্তু আজ যখন আমাদের ভিতর নবজাগরণের সাড়া পড়েছে। আমরা যখন বুঝতে শিখেছি কেবলমাত্র বাঁচাই আমাদের চরম লক্ষ নয় পৃথিবীর সকল মানুষের ভিতর নিজেদের মাথা উচু করে তাদের সঙ্গে সমান ভাবে পা ফেলে আমাদের চলতে হবে, আমরা বুঝেছি তখন চলচ্চিত্রের কাছে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় চরিতার্থের উপাদান আমরা চাইনা। আজ চলচ্চিত্রকে গড়ে উঠতে হবে এক বিরাট জাতীয়তাবাদী অনুষ্ঠান হিসাবে। তার মধ্যে আমরা দেখতে চাইব আমাদেরই হাঁসি কান্না ভরা এই জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু সেইখানেই হবে না তার শেষ। সেখানে দেখাতে হবে কেমন করে এই জীবন এক বৃহত্তর জীবনের সূচনা আনতে পারে। যে জীবনে থাকবে মানুষের প্রতি মানুষের আন্তরিক স্নেহ, মায়া, মমতা। সেখানে থাকবে না কোনও হিংসা, দ্বেষ ঘৃণা। মানুষ মানুষ হিসাবেই মানুষকে ভালবাসবে। সে দেখতে চাইবে না তার জাত, ধর্ম, বর্ণ। আজ যখন আমরা দেখতে পাই আমাদের চারিপাশের এই হিংস্র পাশবিকতা তখনই কি আমাদের মনে হয়না এর অবসান যে আজই প্রয়োজন। কিন্তু কে আনবে এই যুগান্তর।

জহুরে জহর চিনবেন। 'সাত নম্বর বাড়ী'তে এ কে দেখতে পাবেন

যারা সত্যিই আনতে পারে তারা কি আজ নিজেদের স্বার্থ নিয়ে অন্ধনয় ?

সেই কাজের ভার এখন চলচ্চিত্রের নিতে হবে। রূপালি পর্দার উপর আমাদের দেখতে হবে কেমন করে এই পাশবিকতা কোটি কোটি জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে। কেমন করে মানুষ তাদের সব হারিয়ে শুধু এক মুঠ অন্নের জন্য অতি অসহায় ভাবে চেয়ে আছে। কেমন করে দুর্ভিক্ষে, রোগে কোটি কোটি লোক কঙ্কালে পরিণত হচ্ছে। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাব আমাদেরই দেওয়া দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে কত অসহায় শিশু জীবনের অঙ্কুরে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা আরও দেখতে পাব তাদের দীর্ঘশ্বাসের চাপে এই বিরাট পৃথিবীও কেঁপে উঠছে, তাদের প্রেতাত্মা আমাদের ডেকে বলছে "দেখরে গর্বিত দেখরে অত্যাচারি মানুষ তোরা চোখ মেলে দেখ—তোদের এই শষ্যশ্যামলা বসুন্ধরা কেমন করে আমাদের অভিসম্পাত মাথায় নিয়ে দ্রুত তালে চলেছে আজ ধ্বংসের মুখে। তোরা এখনও ফের ; তোরা এখনও তোদের মাকে ফিরিয়ে আন। তাকে এমনি করে তোদের ছেড়ে যেতে দিস না।

যখন আমরা রূপালি পর্দায় দেখব এই বিশ্বব্যাপি হাহাকার তখন আমাদের অন্তরতম তন্ত্রীতে দেবে এক অপূর্ব আঘাত। সদ্য জাগরিতের পবিত্রতা নিয়ে আমরা তখন উঠব জেগে। আমরা এক যোগে বলে উঠব না না কখনও না। এমনি করে আমরা আমাদের সব ছেড়ে দেব না। আমাদের শষ্যশ্যামলা বসুন্ধরাই যে আমাদের গর্ব। সেই বসুন্ধরারই সন্তান আমাদের ছোট ছোট ভাই বোনেদের মুখে আবার আমরা হাঁসি ফোটাব, নইলে আমরা কিসের মানুষ, কিসের আমাদের গর্ব ! তাই আজ আমরা আমাদের অন্তরের দেবতাকে স্পর্শ করে শপথ করছি আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভুলব। আজ থেকে সকলের দুঃখই আমরা মাথা পেতে নেবো। আজ আমরা নূতন করে শিখব চণ্ডীদাসের সেই অমোঘ বাণী 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

চলচ্চিত্র জগতের অনেকের ভিতর এই প্রেরণা আমরা দেখতে পাই। আর এও জানি, দেশের এই সমূহ বিপদকালে বাকি যারা আছেন যাঁরা চলচ্চিত্রকে কেবলমাত্র খেলার বা অর্থপিপাসা চরিতার্থের সামগ্রী হিসাবে দেখে আসছেন তাঁরাও এই প্রেরণার পথে নেমে আসবেন। পরিশেষে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন চলচ্চিত্রের কর্তৃপক্ষের, কর্মীদের শিল্পীদের ও আমাদের (দর্শকদের) এই জয়যাত্রা সর্বোত ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়, যেন আমরা সমবেত ভাবে তাঁরই দেওয়া এই জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারি।

বেতারের নূতন অনুষ্ঠানলিপি

সম্প্রতি বেতার কর্তৃপক্ষ তাদের অনুষ্ঠান লিপির পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু তাতে কোন নূতনত্ব নেই, আগেকার অনুষ্ঠানই উল্টেপাল্টে সাজানো হয়েছে। এতে শ্রোতাদের উপভোগ্য বা মনের খোরাক কিছুই বাড়েনি। কীর্তন ও কাওয়ালী গানের আসরের মাত্রাধিক্য হওয়ায়, তা শ্রোতাদের আগ্রহ বাড়ায়নি। হিন্দু ও মুসলমান শ্রোতাদের কাছে কীর্তন ও কাওয়ালী শ্রদ্ধার বস্তু। এই ধর্ম সংগীতের ভিতর দিয়ে ভগবানের অপূর্ব লীলারস আমাদের মনকে আপ্লুত করে দেয়। কীর্তন গানের ভিতর দিয়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, জয়দেব আমাদের মাঝে অমর হয়ে আছেন, কিন্তু রোজই আধঘণ্টা ধরে কীর্তন বা কাওয়ালী গান না দিয়ে মাঝে মাঝে (যেমন আগে করা হতো) হলে শ্রোতারা সত্যিই শ্রদ্ধার সংগে এই অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করবে। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কীর্তন রচয়িতাদের জীবনী আলোচনা মনমুগ্ধকর, এভাবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা থাকা সত্যিই প্রয়োজন। গীতা ও কোরাণ শরীফ পাঠের অনুষ্ঠানটীর পরিবর্তন করা উচিত। একএকজন পণ্ডিত একএকদিন তাঁদের ইচ্ছামত কোন অধ্যায় থেকে কয়েকটা সূত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করলে এতে কোন মাধুর্য থাকেনা বা তাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করাও যায় না। এই দুই ধর্ম শাস্ত্রেরই মর্মার্থ ধারাবাহিক আলোচনা করা যুক্তিসংগত, এর আদর্শ, মূল বক্তব্য, জীবনের প্রতিপদক্ষেপে এই দুই ধর্মের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে ধারাবাহিক ভাবে পাঠ ও আলোচনা করলে এই অনুষ্ঠান হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক ভক্ত শ্রোতার মনোরঞ্জন করবে এবং আলোচনাও হৃদয়গ্রাহী হবে।

নূতন অনুষ্ঠানলিপির নির্দেশে নাটক অভিনয়ের সময় আরো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভাল ভাল নাটকের শোচনীয় পরিণতি ঘটানোর চেষ্টা কমানো হয়নি একটুও। নূতন অনুষ্ঠানলিপি রচিত হওয়ার পর অভিনীত "মাটীরঘর" ও "রঘুবীর" নাটক দুখানির অভিনয় আমাদের মনকে ব্যথিত করে তুলেছে। এর মাঝে "মাটিরঘর নাটকখানারই অধিকতর শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। আমাদের পূর্বেকার সমালোচনার প্রভাবে নূতন অভিনেতা এবং রঙ্গমঞ্চের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীদের দিয়েই এই বইখানা অভিনীত হয়েছে। সরযূবালা, শান্তি গুপ্তা, উষাবতী প্রভৃতি অভিনেত্রীদের অভিনয় তাদের দক্ষতানুসারেই হয়েছে। একমাত্র অভিনেত্রীদের জন্যই "মাটিরঘর" শ্রবনযোগ্য হয়েছিল। প্রয়োজক নূতন অভিনেতাই এনেছেন, কিন্তু তাদের অভিনয় ক্ষমতা পরীক্ষা করেননি। "মাটিরঘরের" প্রত্যেকটি চরিত্র স্বকীয়তায় উজ্জল এবং বিষয়বস্তু কারোর কাছে অজানা নেই। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে এই নাটকখানি প্রত্যেকটী দর্শকের মন অভিভূত করেছিল, কাজেই এর বেতার অভিনয় যে এত নীচু স্তরের হবে তা কল্পনাও করা যায় নি। প্রথমতঃ মাত্র ৩০মিনিটে অভিনয় হয়েছে এজন্য এত ছেটেবাদ দেওয়া হয়েছে যে শেষাংশে এক একটী কথায় এক একটি দৃশ্য শেষ হয়েছে। কাজেই এতে শ্রোতাদের মন বিক্ষুব্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। "মাটির ঘর" নাটকখানা হলো Tragedy। সত্যপ্রসন্নের নিজের হাতের গড়া সংসার ভগবানের অভিশাপে ছাই হয়ে গেলো, বড়মেয়ে তন্দ্রা হলো পাগল, মেজমেয়ে নন্দা স্বামীর অত্যাচারে বিষখেলো, ছোট মেয়ে চন্দার বিয়ে ভেঙে গেলো। এরপর এলো কন্যাদের শোচনীয় মৃত্যু, তন্দ্রার বন্ধু অলকের মানসিক দ্বন্দ, তার পরিবর্তন, আঘাতের পর আঘাতে সত্যপ্রসন্নের অপূর্ব সহন ক্ষমতা, কল্যাণের মৃত্যুতে অভিমানে দুঃখে তার ভগবানকে উদ্দেশ্য করে চ্যালেঞ্জ করা, ইত্যাদি নিয়ে নাটকখানা কত সুন্দর অথচ কত মর্মস্পর্শী। কিন্তু বেতার রূপে এর কিছুই অবশিষ্ট নেই, অভিনেত্রীরা যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, তাতে তাদের উপযুক্ততা প্রমাণ করেছেন।

MEENA
TIL OIL
Scented
EASTERN CHEMICAL &
PHARMACEUTICAL CO.
CALCUTTA
'মীনা'

অভিনেতাদের কাছে থেকে এত নীচুস্তরের অভিনয় আমরা আশা করিনি, সত্যপ্রসন্ন, কল্যাণ, অলক প্রভৃতি চরিত্রের কোন একটী একবিন্দু ও ফুটে ওঠেনি অভিনয়ে। এই নাটকগুলির এই রূপ সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত না করে নাট্যকাদের দিয়ে বেতারের উপযোগী করে যেন নাটক লিখিয়ে নেন। সমাজের এক একটা দিক নিয়ে কিংবা যে কোন শিক্ষনীয় বিষয় নিয়ে ছোট ছোট নাটক লিখিয়ে নিলে তারা আর এভাবে শ্রোতাদের বিরক্তি কুড়িয়ে নেবেন না। যে সকল নাটক রঙ্গমঞ্চ বা সিনেমার উপযোগী করে লেখা হয় তার রচনভংগীমা বহুক্ষণব্যাপী অভিনয়ের জন্য এবং এজন্যই বেতাররূপে তা আমাদের কাছে ধরা দেয়না। গত ২৭শে আগষ্ট নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় শ্রোতাদের পত্রের উত্তরে জানিয়েছেন যে, পূর্বে বেতারেও তিনঘণ্টা ব্যাপী অভিনয় হতো, কিন্তু নানাদিক বিবেচনা করে ভূতপূর্ব কর্তৃপক্ষ জনৈক বৈদেশিক ভারতবন্ধু সিদ্ধান্ত করলেন নূতন টেক্‌নিকে বেতার অভিনয় কম সময়ে হবে এবং এই নিয়ে পরীক্ষা করতে বললেন। কাজেই পরীক্ষা চল্‌লো এবং আজও চল্‌ছে, কিন্তু পরীক্ষার নামে এভাবে নাটকের দুর্দশা আর কতদিন চল্‌বে? এসকল নাটক দিয়ে পরীক্ষা না করে পৃথক ভাবে লিখিত বেতারোপযোগী নাটকের সাহায্যে পরীক্ষা চালালে কর্তৃপক্ষের সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেতো এবং সহজেই সিদ্ধান্তের সমাধানে পৌঁছতে পারতেন। এটা বেতার ও শ্রোতাদের পক্ষে কল্যাণ করা হতো। দিনের পর দিন অসন্তোষের সৃষ্টি হতো না।

আমাদের সমালোচনা বেতার কর্তৃপক্ষকে কতখানি সচেতন করেছে তা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি, কিন্তু একজন বিশিষ্ট বেতার শিল্পীকে অনেকখানি বিচলিত করেছে, যার জন্য তিনি আত্মগোপনের পন্থা অনুসরণ করেছেন, "নিষ্কৃতি" নাটকে এর প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। অনুষ্ঠান লিপিতে তার নাম দেখা যায়নি, ঘোষকও তার অভিনীত ভূমিকাটি সহ তার নাম বাদ দিয়ে ভূমিকালিপি পাঠ করলেন। কিন্তু তার নিজস্বভংগীর অভিনয় বদ-লাতে না পেরে এই চেষ্টায় সফল লাভ করেননি, তাই আত্মগোপনের লজ্জাকর প্রয়াস কি ভীরুতার পরিচয় দেয়নি? আমাদের সমালোচনায় তিনি ক্ষুন্ন হয়েছেন কিন্তু আমাদের অভিযোগ অস্বীকার করতে পারবেনকি? "নৈবিদ্যে ঘিয়ের ছিটের" মত নীলিমা সান্যাল আজও সব জায়গায় একই ভংগীতে অভিনয় করে যাচ্ছেন। আমাদের সমালোচনার উদ্দেশ্য হলো সকলের দোষত্রুটী চোখের সামনে তুলে দিয়ে তার সংশোধনে ব্রতী করানো। কাজেই আমাদের চোখে তার দোষত্রুটী যা পড়েছে তা বলবার অধিকার আমাদের আছে, শুধু তিনি নন, প্রত্যেক শিল্পীর প্রতিই আমাদের এই কর্তব্য। তিনি যদি এই পন্থা অনুসরণ না করে নিজের দোষ সংশোধন করতেন উন্নততর অভিনয়ের পরিচয় দিতেন, তাহলে আমরা তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে নিতাম। সমালোচনা সহ্য করে নিজের সংশোধন করাই শিল্পীদের শিল্প মনের পরিচায়ক, শিল্পীদের অনেক রকম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু তা সহ্য করবার মত মনের জোর নেই কেন?

চিত্র সংবাদ ও নানাকথা

এসোসিয়েটেড পিকচার্স লিঃ

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে—বলতে গেলে তখনই এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। কয়েকজন উচ্চ-শিক্ষিত আদর্শবাদী যুবক চলচ্চিত্রের মারফৎ দেশ এবং জাতির সেবা আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন—চলচ্চিত্রের মারফৎ জনশিক্ষার যে সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্ভাবনাকে তারা দূরে ঠেলতে পারলেন না। জন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে খণ্ড অথবা পূর্ণাংগ চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে এঁরা আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯৪৪ 'কলকাতাকে আবর্জনা থেকে মুক্ত করো' সরকারী এবং বেসরকারী প্রত্যেক মহল থেকেই এই আবেদন উঠতে লাগলো। আমেরিকার খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা মেলভিন ডগলাস তখন কলকাতায়—এঁরা তার সংস্পর্শে আসেন। তাঁর পরামর্শ এবং প্রেরণায় এঁদের পরিকল্পনা বাস্তবের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল নগরের কলঙ্ক—বস্তী জীবনের দুর্দশার কথা এবং তার প্রতিকারের দাবী জানিয়ে একটী কাহিনী দাঁড় করালেন এঁদের জন্য। এঁদের প্রথম চিত্রের ভার গ্রহণ করলেন বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রয়োগশিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া। চিত্রের নাম হ'লো আমীরী। শুধু হিন্দি রূপের অনুমতি পাওয়া গেল সরকার থেকে। শিল্পী নির্বাচনে নবাগত হলেও কর্তৃপক্ষ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেননি। আমীরীর বিভিন্নাংশে অভিনয় করবার জন্যে যে খ্যাত নামা শিল্পীদের তালিকা দেখতে পাই, তা থেকে অতি সহজেই বিচার করা চলে। আমীরীর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন—প্রমথেশ বড়ুয়া, রমলা, যমুনা, মায়া ব্যানার্জি, মলিনা, অহীন্দ্র চৌধুরী, রণজিৎরায়, শৈলেন চৌধুরী, ফণী রায়, শ্যামলাহা প্রভৃতি। কিছুদিন পূর্বে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কয়েকজন সাংবাদিককে একভোজ সভায় আমন্ত্রণ করে চিত্রশিল্প সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন।

এই ভোজের পরে সাংবাদিকদের দিয়ে এসোসিয়েটেড পিকচার্সের পক্ষ থেকে মিঃ মজুমদার ও মিঃ এন, সি দত্ত আমীরীর দৃশ্যপটে উপস্থিত হ'তে অনুরোধ জানান। কর্তৃপক্ষের অনুরোধ আমরা সদলবলে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে হানা দিই। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর ব্যবস্থাপক মিঃ সুধীর সরকার আমাদের সাদরে গ্রহণ করেন। আমীরীর স্যূটীং চলছে। চুপি চুপি আমরা যেয়ে সামনে হাজির হলাম মায়া, শ্যাম লাহা, রাজলক্ষ্মী, বড়ুয়া, রমলা এদের নিয়ে চিত্রগ্রহণ চলছিল। শ্যামলাহা মায়া ব্যানার্জিকে নিয়ে কোন একখানি ছবি দেখাবার মতলব আটছিলেন। বলাই বাহুল্য, মায়া ব্যানার্জি তাতে সায় না দিয়ে পারেন নি। যমুনা দেবী বসেছিলেন এক পার্শ্বে—সেটের বাইরে। কিছুক্ষণ বাদে অহীন্দ্রবাবু আমীরী কায়দায় ঢুকলেন। সাংবাদিকদের অভিভাদন জানিয়ে তিনি মাইকের নীচে যেয়ে বসলেন। প্রথম দৃশ্যটী গ্রহণ করা হলে অহীন বাবু ও রমলাকে নিয়ে আর একটি দৃশ্য গ্রহণে বড়ুয়া মেতে পড়লেন। রসিক নাগর রণজিৎ রায় ভারী এক-লাঠি হাতে সাংবাদিকদের আদাপ দিতে এলেন। তার রূপ সজ্জা, হাতের লাঠি—তার চরিত্রকে প্রকাশ করে দিলেও কোন চরিত্রে তিনি অভিনয় করছেন সাংবাদিক দের এই উত্তরে বললেন, "বুঝতে পারছেন না; এই লাঠি—আজ্ঞে হ্যাঁ—ঠ্যাঙ্গান আমার কাজ। আমি বস্তীতে বস্তীতে ঘুরে জমিদারের খাজনা আদায় করি। জমিদারটি হচ্ছেন ঐ অহীনবাবু। তিনি এমনি দয়াশীল জমিদার, কলেরায় বস্তীতে লোক মরে যাচ্ছে—আমাকে তদারক করতে পাঠাচ্ছেন কলেরার হাত থেকে তাদের বাঁচবার জন্য নয়—কলেরায় যে মরলো জমিদারের কত খাজনা বাকী রেখে সে গেলো, জমিদারের এই ক্ষতির খতিয়ান করতে। আজ্ঞে হ্যাঁ, এবার বুঝলেনত জমিদারটী কিরূপ দয়াশীল।

শুধু জমিদারের দয়াশীলতার কথাই আমরা বুঝলাম না, শোষক এবং শোষিত এদের কথাই যে এসোসিয়েটেড পিকচার্সের বর্তমান চিত্রে স্থান পেয়েছে সে কথাও বুঝলাম। মাঝখানে বড়ুয়া এক ফাঁকে এসে কয়েকটী কথা বলে গেলেন। মেক আপ এর বাইরে বড়ুয়ার

টাকটী টাকার মত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছিল। বড়ুয়া বল্লেন, "বিপদ হচ্ছে আমার, এদের অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের দিক থেকে কোন প্রকার ত্রুটী হচ্ছে না। তাই আমীরী যদি সকলের প্রশংসা না পায়, সেজন্য জবাবদিহি একমাত্র আমাকেই দিতে হবে। তাই আমীরীকে যথা সাধ্য নিখুঁত রূপ দিতে আমিও কমচেষ্টা কচ্ছি না।" বড়ুয়ার কথায় একটু আশ্বস্ত হলুম। Art for art's sake কথার সত্যতা যদি বড়ুয়া এবার প্রমাণ করাতে পারেন।

স্যুটিং এর পর শ্রীযুক্ত দক্ষিণা রঞ্জন ঠাকুর এবার তার কেরামতি দেখবার জন্য সাংবাদিকদের নিয়ে projection রুমে হাজির হলেন, আমীরীর সংগীত পরিচালনা করেছেন তিনি। এদিকে থেকেও কর্তৃপক্ষের কোন ত্রুটী পেলাম না। আমীরীর সংগীতাংশের ভার যে উপযুক্ত লোকের হাতেই পড়েছে এবং কয়েকখানি গান শুনে সে ধারনা আরও আমাদের বদ্ধমূল হলো। আমীরীর যন্ত্র-সংগীতের ভার যাদের উপর ছিল তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে আমীরীকে নিখুঁত রূপদানে কর্তৃপক্ষ কোন খুঁতই রাখেন নি। যেমন, সারেঙ্গী—হামিদ হোসেন, তবলা—কেরামৎ খাঁ, বেহালা—শত্রু সূদন দোবে, স্পেনিস গীটার—কুমার বীরেন্দ্র নারায়ন, বাঁশী—ফ্রেড্রিক বসু, পিয়ানো—মনি চট্টোপাধ্যায়, হাওয়াই গীটার—অজিত বসু।

এবার আমাদের বিদায় নেবার পালা এলো। তার পূর্বে মিঃ মজুমদার চিত্রশিল্পের উন্নতি কল্পে এসোসিয়েটেড পিকচার্সের বিরাট পরিকল্পনার একটু আভাস দিলেন। বাঙ্গালীর শ্রমে ও অর্থে বিরাট একটী ষ্টুডিও নির্মাণের পরিকল্পনাও তাদের কার্য তালিকায় রয়েছে।

মিঃ মজুমদার, মিঃ দত্ত এবং ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর বন্ধুদের অভিবাদন জানিয়ে আমরা বিদায় গ্রহণ করলাম। রাস্তায় আসতে আসতে মনটা খুশীতে ভরে উঠেছিল, এই মনে করে যে এই অনাদৃত চিত্র শিল্প আজ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। তাই এই অনাদৃত শিল্পকে ঘিরে বাঙ্গালীর সকল পরিকল্পনা, সকল প্রচেষ্টা সার্থক ও জয়মণ্ডিত হয়ে উঠলে সে জয় ও গৌরবের কিছুটা কৃতিত্ব যে সাংবাদিকদেরও থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ম্যানসাটা ফিল্ম ডিসট্রিবিউটস

ম্যানসাটা ফিল্ম ডিসট্রিবিউটসের পরিচালনাধীন জ্যোতি সিনেমা সংস্কার কার্যের জন্য কিছুদিন বন্ধ ছিল। বর্তমানে সংস্কার কার্যের পর নবীন পিকচার্সের ভর্তৃহরি দিয়ে জ্যোতি সিনেমার দ্বারোদ্ঘাটন করা হ'য়েছে। এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে চিত্রজগতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, সাংবাদিক ও শিল্পীবৃন্দ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ম্যানসাটা ফিল্মসের প্রচার বিভাগের শ্রীযুক্ত সুকুমার ঘোষ, মিঃ ঝা, ও প্রডাকসন বিভাগের শ্রীযুক্ত সুখেন্দু বিকাশ ঘোষ প্রেক্ষাগৃহের সংস্কার কার্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের ঘুরিয়ে দেখান। জ্যোতি সিনেমার যে সংস্কার কার্য করা হয়েছে তা থেকে দর্শকবৃন্দ বুঝতে পারবেন—প্রেক্ষাগৃহের কিরূপ আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। আভ্যন্তরিন সমস্ত দেয়াল এবং ছাদ আধুনিক কায়দায় প্যারিস প্লাস্টার দিয়ে সাজানো হয়েছে। আলোক সজ্জাও নূতন পদ্ধতিতে করা হ'য়েছে। নূতন প্রদর্শক যন্ত্র—ওয়েসট্রেক্স এর শব্দ যন্ত্র—উচ্চশ্রেণীর আসনগুলির জন্য সোফা, প্রভৃতি নানান পরিবর্তনে জ্যোতি নবরূপে দর্শকদের এবার অভিভাদন জানিয়েছে। তাছাড়া – প্রেক্ষাগৃহের অংগসৌষ্টব বৃদ্ধি করেছে খ্যাতনামা শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর বিভিন্ন নয়নাভিরাম অংকন। প্রেক্ষাগৃহটি পবিদর্শন করবার পর উপস্থিত অভ্যাগতদের ভর্তৃহরি চিত্রখানি দেখানো হয়।—এবং জলযোগে অতিথিদের আপ্যায়িত করা হয়।

নীল-দর্পণ

আমরা শুনে আনন্দিত হলাম যে, প্রগতি শিল্পীর সংঘের দ্বিতীয় অবদানরূপে দীনবন্ধু মিত্রের অমর নাটক 'নীল-দর্পণ' ৺শারদীয়া পূজার আগেই স্থানীয় কোন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হবে।

নীল-দর্পণ বাংলার প্রথম সার্থক গণনাটক'। প্রায় ৯০ বছর আগে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এর প্রথম প্রকাশ হয়। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার চাষী সম্প্রদায়ের উপর নীলকর সাহেবের অমানুষিক অত্যাচারের পটভূমিতে এক বর্ধিষ্ণু প্রজা পালক, নিরীহ পরিবারকে কেন্দ্র করে এই নাটক লিখিত হয়েছে, কুঠিয়ালদের অত্যাচারের

নীলদর্পণের নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্র

ফলে উক্ত পরিবারের শোচনীয় পরিণামের ভেতরে 'নীল দর্পণ' নাটক পরিণতি লাভ করেছে। বাংলা দেশের দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় নীলকরদের নিদারুণ অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়ে যে আর্তনাদ তুলেছিল তাতে শিক্ষিত সমাজ পর্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিল। নীল দর্পণেই তাঁরা যেন সর্বপ্রথম প্রতিবাদের ভাষা খুজে পেলেন, এই নাটকখানীকে কেন্দ্র করে তখনকার সকলদেশের সকল জাতির মানবতার রুদ্ধ অভিযোগ প্রকাশ পেয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র একে বাংলার 'Uncle Tom's Cabin' আখ্যা দিয়ে গেছেন। 'টম কাকার কুটির' আমেরিকায় দাসত্ব প্রথা ঘুচিয়েছিল; নীল দর্পণ ও বাংলার চাষীদের নীলকরের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে অনেক সাহায্য করেছিল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ·ই ডিসেম্বর এই নাটক নটকুল গৌরব অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী প্রতিষ্ঠিত ন্যাশন্যল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, শুনা যায় যে, বিদ্যাসাগর মশায় একদিন উক্ত নাটক অভিনয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং সাহেবদের অত্যাচারের দুঃখে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে নীলকর উড্ সাহেবরূপী অর্ধেন্দু শেখরকে চটিজুতা ছুঁড়ে মেরেছিলেন, এই নাটকের অভিনয়ের

আয়োজন করে 'প্রগতি শিল্পী সংঘের' দীনবন্ধু মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বাংলার অতীত সংস্কৃতি পুনর্জীবিত করবার প্রয়াস প্রশংসনীয়।

ভর্তৃহরি—

চতুর্ভোজ দোষী পরিচালিত নবীন পিকচার্সের ভর্তৃহরি চিত্রখানি জ্যোতি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। রাজা ভর্তৃহরির কাহিনী অনেকেরই কাছে পরিচিত। এই কাহিনীর জনপ্রিয়তার দিক বিচার করেই কর্তৃপক্ষ হয়ত তার চিত্ররূপ দেবার জন্ম অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন—কিন্তু এই প্রাচীন কাহিনীগুলির রূপ দিতে এবং সেই প্রাচীন আমলের পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলতে যতখানি সূক্ষ্মকৃষ্টিবোধ ও পরিশ্রমের প্রয়োজন আমাদের চিত্র প্রযোজকেরা সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সচেতন নন। এক একটা জাকজমক দৃশ্যের অবতাড়না করেই এরা যেন কর্তব্য শেষ করলেন এবং এমন কিছু করলেন যে দেশীয় ছায়াচিত্রকে অনেকখানি উঁচুতে তুলে দিলেন—এই মনোভাব পোষণ করে আত্মপ্রসাদে বিভোর থাকেন। আলোচ্য চিত্র ভর্তৃহরিতেও এর ব্যতিক্রম দেখতে পাইনি। কর্তৃপক্ষ চিত্রখানির জন্ম যে যথেষ্ট পয়সা ব্যয় করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—অথচ চিত্রখানি দর্শক মনে কোন দাগই কাটতে পারেনি। চিত্রখানির সার্থকতা তাহলে কী করে প্রমাণিত হলো? চিত্রের গতিও মাঝে মাঝে খুব ঝুলে গেছে। অভিনয়ে রাজকুমারী পিংলারূপে মমতাজ শান্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অশ্বপালকরূপে অরুণের অভিনয় আমাদের ভাল লেগেছে। রাজা ভর্তৃহরির ভূমিকায় সুরেন্দ্র দর্শকদের মনে বিতৃষ্ণার ভাবই জাগিয়েছেন। শ্রীমতী কজ্জনের গান খানিকটা আনন্দ দেবে। সুরেন্দ্রের একখানা গান আমাদের ভাল লেগেছে।

চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ চলন সই। ভর্তৃহরি আমাদের খুশী করতে পারেনি কোন দিক দিয়ে, এক জাকজমক দৃশ্যাবলী ছাড়া। অথচ বম্বেতে চিত্রখানি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং বম্বের প্রায় সব পত্র পত্রিকাগুলিই এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিলেন। এইজন্যই মনে হয়—বাঙ্গালী দর্শকদের রুচিবোধ ওদেশীয়দের চেয়ে অনেক উন্নত।

ফুল—

কমল আমরোহি রচিত ফেমাস ফিল্মস্‌এর ফুল প্যারাডাইস সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন কে, আসিফ। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন বীণা, সিতারা, সুরাইয়া, দুর্গাখোটে, মজহর খাঁ, ইয়াকুব এবং দীক্ষিত। মুসলিম পরিবারের বিষয় বস্তু নিয়ে ফুল চিত্রখানি গ'ড়ে উঠেছে। প্রথম থেকে শেষ অবধি ছবিখানা দেখে, আমরা যা বুঝলাম তা এই, একজন মুসলমান কখনও বেইমান হ'তে পারেন না—পরিচালক এবং কাহিনীকার এই সত্যটুকু ফুটিতে তুলয়ে চেয়েছেন। এই আদর্শের দিক থেকে ফুলকে আমরা প্রশংসা করবো। কিন্তু এমন আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে পরিচালক এগিয়েছেন—যে প্রথম থেকে শেষ অবধি চিত্রখানি না দেখে কোন কিছুই স্পষ্ট করে বোঝা দায়। এবং এই এগিয়ে যাবার প্রতি পদক্ষেপে পরিচালকের অনিপুণ হাতের কথা দর্শক মনকে স্বতই ব্যাথিত করে তোলে। কোন একটা চরিত্রের পরিষ্কার ভাবে কোন স্থানেই পরিচয় করিয়ে দিতে পারেননি—পরিচালক। বহু অসংগতিই চোখে পড়ে চিত্রখানির। 'র‍্যানডম হার ভেষ্ট' থেকে আরম্ভ করে বহু চিত্রের ছাপই পাওয়া যাবে'ফুল' চিত্রে।

অভিনয়ে বীণা, দুর্গাখোটে মজহর খাঁ, পৃথ্বিরাজ উল্লেখযোগ্য।

চিত্রগ্রহণ ও শব্দ গ্রহণ চলনসই।

চিত্রবাণী লিঃ—

শৈলজানন্দের কাহিনী অবলম্বনে এদের বাংলা ছবি 'এই তো জীবনের কাজ' ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে—শ্রীযুক্ত ধীরেশ ঘোষ ও মান্নু সেনের পরিচালনায় এগিয়ে চলেছে। এইতো-জীবন চিত্রের নায়িকারূপে অভিনয় করছেন শ্রীমতী সুনন্দা দেবী। সংগীতে অভিজ্ঞা নবাগতা সীতা দেবীকেও দর্শক সাধরণ এইতো জীবন চিত্রে দেখতে পাবেন।

জনগণমনক অধিনায়ক জয় হে

'মহাজাতি-সদন' এর ভিত্তিস্থাপন উৎসবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ও মাইকের সামনে সুভাষচন্দ্র কে দেখা যাচ্ছে ————।

দেশ গৌরব সুভাষচন্দ্র বসু

প্যারাডাইস প্রেক্ষাগৃহে **"জীবন প্রভাত"**
চিত্রের উদ্বোধন উপলক্ষে বাংলার তরুণ-বীর
সুভাষচন্দ্র ও চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের সম্পাদক
শ্রীযুক্ত এস, এম, রাগড়ে কে দেখা যাচ্ছে।

আমাদের আজকের কথা

নাৎসীবাদের ধ্বংস যজ্ঞে পৃথিবীর মুক্তিকামী মানবাত্মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ছিল—সাম্রাজ্যবাদী জাপানের পরাজয়ের সূচনায় আমরা উল্লসিত হ'য়ে উঠছিলাম। বর্তমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুধু মিত্রশক্তির জয় ঘোষণা করলো না—ঘোষণা করলো নির্যাতিত মানবাত্মার। রাশিয়ার জন-শক্তি যে প্রভাবে জার্মাণীর দুধর্ষ শত্রুর সংগে লড়ে জয়পতাকা উড্ডিন রেখেছে—নিরীহ চীন দীর্ঘদিন শত্রুকে বাধাদান করে—শত শত তমসার রাত কাটিয়ে যে আদর্শের ইতিহাস রচনা করেছে—এই সার্থকতায়—নিপীড়িত ভারতের জনসাধারণ আমরা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠছিলাম। ভারতের সমস্যা আজ আন্তর্জাতিক সমস্যা—স্বাধীনতা অপহরণকারী শত্রুর সংগে লড়াই করে—বৃটেন ও আমেরিকা যে আদর্শের বাণী প্রচার করছে—এই বাণীর সার্থকতা প্রমাণ করবার জন্য কোন স্বাধীন দেশকে যে তারা আর বেশীদিন পদানত করে রাখতে পারবে না—এই কথা মনে করে, ভারতের সমস্যা সমাধানের ক্ষীণ আশার আলোকশিখা দেখে, মুক্তিকামী ভারতবাসীর আশাদীপ্ত হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়।

৭ই ভাদ্র। শুক্রবার। ১৩৫২। ভোরের পত্রিকাগুলি যে সংবাদ বহন করে আনলো—অবিশ্বাসের আঘাতে তাকে ফিরিয়ে দিলেও—এই মর্মান্তিক সংবাদ ভারতবাসীর অন্তরে যে বিষাদের ছায়াপাত করলো—তা ভারতবাসী ছাড়া অপরকে বোঝাই কেমন করে। তরুণ ভারতের প্রিয়তম নেতা—জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি—স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক বীর—দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ—দেশবাসীর অন্তরে যে শত বজ্রের শক্তিতে আঘাত হানলো, সে মর্মবেদনা—ভারতবাসী ছাড়া আর কে উপলব্ধি করবে? ঘূর্ণিবাতের মত প্রতিজনের অন্তরে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে—এই সংবাদটী যে করুণ বিষাদরাগিনীর সৃষ্টি করলো—তা ভারতবাসী ছাড়া আর কেই বা হৃদংগম করবে!

সুভাষ নেই—সুভাষের মৃত্যু হ'য়েছে—ব্যথাতুর দেশমাতৃকার স্নেহাঞ্চলে সে ফিরে আসবে

আপনার পরম সুহৃদ আলু

'আলু' আপনার শরীরে শক্তিতে পরিণত হয়। সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে ইহা মানুষের দেহকে কার্য্যক্ষম রাখে—মনকে চিন্তা করতে প্রেরণা দেয়। 'আলু' শরীরকে তাজা রাখে।

'আলু' অল্প দামে পাওয়া যায় ও অতি সহজে চাষ হয়। সমতল বা অসমতল যে কোন জমিতে আলুর চাষ করা সম্ভব। সাধারণতঃ প্রতি বিঘায় প্রায় ৪০ মণ 'আলু' পাওয়া যায়।

'আলুর' চাহিদা সকল সময়েই আছে এবং আলুর চাষ চাষীদের কাছে একটি নিশ্চিত আয়ের উপায়। কিন্তু এর চালান্ সমস্যার সমাধান না করলে কেবলমাত্র অতিরিক্ত উৎপাদন লাভজনক হবে না। কারণ তার জন্য চাই বহু ভাল রাস্তা যার সাহায্যে এই সব ফসল বাজারে আনা সম্ভব হবে।

অধিকতর পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ এবং উন্নত ধরণের শস্য উৎপাদন প্রবর্ত্তনের জন্য বার্ম্মা-শেল কর্তৃক প্রদত্ত।

ভাল রাস্তা জাতির সমৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করে

না—তাঁর সেই তেজোদীপ্ত উদাত্ত বাণী—আর প্রেরণার উৎস জোগাবে না—ত্যাগ এবং সহনশীলতায় দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে—সে আর নূতন ইতিহাস রচনা করবে না—আরো কত শত প্রশ্ন হাতুড়ীর আঘাতে বার বার আঘাতীত করে তুলতে লাগলো।

রাজনীতির পত্রিকা রূপ-মঞ্চ নয়—তা জানি, সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি মতবাদের বিশ্লেষণ করতেও আমরা আসিনি—নানান বাকবিতণ্ডাই হয়ত তা নিয়ে আছে, সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে সুভাষের দোষ ত্রুটিরও আমরা এখানে অবতারনা করবো না —কিন্তু দেশপ্রেমিক সুভাষ—ভারতের মুক্তিই যাঁর জীবনের একমাত্র সর্বপ্রধান কামনা—এই সার্বজনীন সুভাষের কথা ভুলে থাকবো কী করে? সুভাষ সম্পর্কে কত গুজবই না রটেছে, কিন্তু যারা সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সংগে সুভাষের নাম জড়িয়ে বিকৃত বিদ্বেষমূলক প্রচার করেছেন—আমাদের বক্তব্য তাদের বিরুদ্ধে। ভারতে থাকাকালীন দিনগুলির কথা ছেড়েই দিলাম, ভারত ত্যাগ করবার পর সুভাষ সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রচারিত হয়েছে—তাথেকে সহজেই আমরা বুঝতে পারি—ভারত আক্রমণে জাপানকে সহায়তা করবার হীন মনোবৃত্তি কোন দিনই তাঁর ছিল না। খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রী নেতা ইউসুফ মেহেরালী সুভাষের বিরুদ্ধে এই হীন অভিযোগ খণ্ডন করতে যেয়ে বার্লিনে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতাংশের খানিকটা উল্লেখ করে—সুভাষের মনোভাব পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হ'য়েছেন। এই বক্তৃতা প্রসংগে সুভাষ-চন্দ্র বলেছেন, "আমি ত্রিশক্তির সমর্থন করিয়া কিছু বলিতেছি না, ত্রিশক্তির সমর্থন করিয়া কিছু বলা আমার কাজ নহে। বৃটেনের ভাড়াটিয়া প্রচারকার্যকারিগণ আমাকে শত্রুর চর বলিয়া অভিহিত করিতেছে। আমার সমগ্র জীবনই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন এবং আপোষহীন সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস। চিরজীবন ব্যাপিয়া আমি ভারতবর্ষের সেবক। আমার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ভারতবর্ষের সেবকই থাকিব। পৃথিবীর যে অংশেই আমি বাস করিনা কেন, একমাত্র ভারতবর্ষের প্রতিই আমার আনুগত্য এবং অনুরাগ আছে এবং চিরকাল থাকিবে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯শে আগষ্ট, বুধবার)। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একবার বক্তৃতা প্রসংগে সুভাষ বলেছিলেন, "জীবন্ত অবস্থায় যদি কেউ আমার দেহ থেকে মাংস কেটে নিতে চান—এবং তাতে যদি দেশের মুক্তি-যুদ্ধের কোন মংগল হয় আমি হাসিমুখে সে মাংস কেটে দেবো।" এই সামান্য একটী কথার ভিতরই সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রীতির উগ্রতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

সুভাষের আজীবন ত্যাগ—কর্মদক্ষতা—দেশের মুক্তি-যুদ্ধে নির্ভীক বীরের কষ্টসহিষ্ণুতা—বৈদেশিক সরকারের চোখে যে অর্থ নিয়েই প্রকট হ'য়ে উঠুক না কেন, ভারতবাসীর কাছে—যে কোন দেশপ্রেমিকের জীবনে যে তা আদর্শ স্থানীয়, সেবিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। তাই ভারতের দুলাল—এই দেশপ্রেমিক বীরের মৃত্যু সংবাদকে ভারত অবিশ্বাসের সংগে মেনে নিলেও—ভারতের বুক ফেটে যে বাণী ধ্বনিত হ'তে চায়—অমোঘবর্মের মত সুভাষের মৃত্যুকে অমর করে রাখবার সে বাণী—'সুভাষের মৃত্যু হ'য়েছে—সুভাষ দীর্ঘজীবন লাভ করুক।'

বৈদেশিক শাসক সম্প্রদায়ের কত অবিচার—অত্যাচারে কত কণ্টকাকীর্ণ বছরই না আমরা

একদিকে প্রাচুর্য, উপকরণ বাহুল্য, অপচয়, বিলাস আর ভোগের

নগরের কলঙ্ক বস্তী জীবনের পটভূমিকায়

কাহিনী স্যালুলয়েডের ফিতায়

★

লাস্যময়ী রমলা উগ্র আধুনিকতা উপছে পড়ছে এমন একটী ধনী ও আভিজাত্য গরিমায় গর্বিত মেয়ে ডলীর ভূমিকায় রূপদান করেছেন।

★

★

হতাশায় জীবন যার ভরপুর, বস্তীর সেই অসহায় একটী মেয়ের ভূমিকা শ্রীমতী যমুনার অভিনয়ে প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে।

★

পরিচালনা

প্রমথেশ বড়ুয়া

●

কাহিনী

প্রবোধ সান্যাল

●

সুর সংযোজনা

দক্ষিণা ঠাকুর

এই হিন্দি চিত্রখানিকে সার্থক করে তুলতে প্রযোজকদের অকৃপণ হস্তে অর্থ ব্যয় আপনাদের বিস্ময়াভূত করবে।

ছবিটির বাংলা ভাষায় চিত্র গ্রহণের কার্য শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

আঞ্চলিক স্বত্তের জন্য প্রযোজকদের কাছে আবেদন করুন

"শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও...
জননী এসেছে দ্বারে" - - -
বাতায়ন পথে শরতের সোনালি আলো। কাশের বনে ঢেউ তুলে উড়ে যায় বলাকা-শ্রেণী। উৎসবের আমন্ত্রণ লিপি বয়ে নিয়ে আসে প্রস্ফুটিত কুমুদ কহ্লার। হাসিভরা মুখে উদ্বেল হয়ে ওঠে নতুন জীবনের আলো আর আকাশে বাতাসে উচ্চকিত হয়ে ওঠে শরতের আগমনী। শ্রীকল্যাণ ও ভৃঙ্গসার তৈলে দেহমন স্নিগ্ধ ও সুরভিত করবার এই ত সময়।
শ্রীকল্যাণ
এবং
ভৃঙ্গসার
কেশ তৈল
জেম কেমিক্যাল
লিকাতা

কাটিয়েছি। সরকারের অবিমৃষ্যকারিতায় দুর্ভিক্ষে—অনাহারে—মহামারীতে—মৃত্যুর ভয়াবহ তাণ্ডব-লীলায় কত মূল্যবান জীবনই না আমাদের নিষ্পেষিত হ'য়েছে। তবু আজও আমরা যারা বেঁচে আছি—তমসার আধার পারে— অরুণালোকীত প্রভাতের আশাদীপ্ত ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে মুক্তির দিন গুনছি—সুসুপ্তির কোলে সেই আশাদীপ্ত ভবিষ্যতকে বিলীন হ'তে দোব না—বাস্তবের নিগূঢ় বন্ধনে তাকে সার্থক করে তুলবো আমরা।

বাংলার দুয়ারে শরৎ এসে আঘাত দিচ্ছে। দিকে দিকে আজ উৎসবের বাঁশী। আমাদের সকল উৎসব—সকল আয়োজন—একই অনুষ্ঠানকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হউক—সে অনুষ্ঠান, ভারতের মুক্তি আন্দোলন-অনুষ্ঠান। চল্লিশ কোটী হিন্দু মুসলমানের মিলিত ভারত—চল্লিশ কোটী হিন্দু মুসলমানের হৃদয় রক্তে আজ তাঁকে অবগাহন করাতে হবে—তার স্বাধীনতা যজ্ঞের এর চেয়ে পবিত্র আহুতি যে আর নেই। তাই হিন্দু মুসলমানের মিলিত মুক্তিআন্দোলন ছাড়া আজ যে সব উৎসবানুষ্ঠানই আমাদের ব্যার্থতায় ভরে উঠবে। হিন্দু মুসলমানের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হউক—'বন্দেমাতর, বন্দেমাতরম' !

কালীশ মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক : রূপ-মঞ্চ

শারদীয়া—১৩৫২

তুমি আর-আমি
এম পি প্রডাকসন্সের
আগামীচিত্রের রূপ-সজ্জায়
কানন দেবী

বাংলা নাট্যশালার প্রগতির ধারা

শচীন সেনগুপ্ত

বর্তমান বাংলা নাট্য সাহিত্যে নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্তের বিশিষ্ট আসন অবিসংবাদিত। নাট্যমঞ্চের সংগেও রয়েছে তাঁর হৃদয়ের যোগ। বাংলা নাট্যমঞ্চের চিরগতানুগতিক গতির মোড় ফেরাতে তাঁর নাটক কম সাহায্য করেনি। জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই প্রগতিবাদী নাট্যকার তাঁর বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা নাট্যশালার প্রগতির ধারা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বাংলা নাট্যশালা অগ্রগামী হচ্ছে কি, এই কথাটি আপনারা অনেকেই জানতে চান। এতে আনন্দিত হবার কারণ আছে। বোঝা যায় নাট্যশালার প্রগতি অনেকেরই কাম্য হয়ে উঠেচে এবং নাট্যশালাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়াসের সহিত সংযুক্ত দেখবার আশা পোষণ করেচেন। এখন, প্রগতির কথা বলতে হলে গতির কথা ভাবতে হয়। আবার গতিও স্থিতিশীল মন থেকে আশা করা যায় না। তার জন্য চাই গমনেচ্ছু মন। এই গমনেচ্ছু মনের কি পরিচয় আজকার থিয়েটার পরিচালনা থেকে পাওয়া যায়, তাই দেখা যাক্। প্রথমে শ্রীরঙ্গমের কথাই বলি। কেননা শ্রীরঙ্গম হচ্ছে এমন একটি থিয়েটার যার মালিক এবং পরিচালক অসাধারণ নাট্যজ্ঞানের অধিকারী। অসাধারণ অভিনেতা এবং অত্যন্ত উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে প্রফেসারি ছেড়ে থিয়েটারে এসেছিলেন। এসে তিনি কি করেচেন, তা নিয়ে এখন আলোচনা করব না। করেছিলেন অনেক কিছু। বাংলা থিয়েটারে নূতন শক্তির সঞ্চার করে তিনি থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং বাঁচবার উপাদান যুগিয়েছিলেন। কিন্তু আজ তিনি কি করচেন? থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কোনো প্রয়াসের পরিচয় তিনি দিচ্ছেন কি? বিপ্রদাস আর বিন্দুর ছেলে ত অপর যে-কোনো একটা থিয়েটারও করতে পারত, যেমন দেবদাস, রামের সুমতি, বৈকুণ্ঠের উইল করেচে। শিশির কুমার পরিচালিত থিয়েটার কোন্ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে? বলবার মতো আজ আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে। অথচ বৈশিষ্ট্য একটা ছিল। নাট্যমন্দির যেন একটা আদর্শেরই প্রতীক হয়ে উঠেছিল। আজ সেই আদর্শ কোথায়? কেন তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না? কারণ হয়ত অনেকই আছে, ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গত। পরিচালকদের সেই ব্যক্তিগত উৎসাহ উদ্দীপনা হয়ত ব্যক্তিগত জীবনের আঘাত ও আশাভংগ থেকে মন্দীভূত হয়েচে, হয়ত সম্প্রদায় শিথিল হয়ে গেছে, হয়ত নাটকের এবং নাট্যকারের অভাব ঘটেচে, হয়ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী দুষ্প্রাপ্য হয়েচে, হয়ত আর কিছু, যা আমি ধরতে বা বুঝতে পারচি না। কারণ আমার আলোচ্য নয়। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রগতির পরিচয়। বিপ্রদাস, তাইতো, বিন্দুর ছেলে, তুলসীদাস একই মঞ্চে দেখা দিলে প্রগতির ধারা কোন্ খাত বয়ে চলেচে তা কেমন করে ঠিক করবেন বলুন ত? আপনারাই একটা থিসিস খাড়া করবার চেষ্টা করুন, দেখবেন তা ভেংগে পড়বে।

শ্রীরঙ্গমের পাশাপাশি রঙমহল রয়েচে। রঙমহলে নটসূর্য রয়েচেন। নাট্য-নৈপুণ্য তাঁরও কিছু কম নয়। থিয়েটার ভালো চললে, দর্শকের অভাব হয় না। কিন্তু ধারাটা কি? ভোলামাষ্টার, রিজিয়া, বিংশ শতাব্দী, রামের সুমতি, সন্তান একটার সংগে আর একটার কি যোগ রয়েচে? কি থেকে শুরু করে নাটক কোন্ পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েচে? থিয়েটার কতটুকু এগিয়েচে, কতটুকু পিছিয়েচে, নাটক ও অভিনয় থেকে তার ধারাবাহিক কোন বিবরণ যুক্তি গ্রাহ্য করে দেওয়া যায় না। নটসূর্য থাকা সত্ত্বেও না।

রঙমহলের অনতিদূরে হাতীবাগানে রয়েচে ষ্টার থিয়ে-

টাও এই থিয়েটারের পরিচালক একজন নাট্যকার। এই থিয়েটারেই দেখা যায় এক নাটকের সংগে অপর এক নাটকের কিছু সংগতি রয়েচে। একটা প্ল্যানের আভাস এইখানেই পাওয়া যায়। একটা ক্ষীণতোয়া ধারা দৃষ্টি গোচর হয়। এ থিয়েটারের একটা জাত আছে।

বিডন ষ্ট্রীটে রয়েচে মিনার্ভা থিয়েটার। বিশিষ্ট একটি ধারা সেখানেও খুঁজে পাবেন না। মাটির মায়া, মোপাসাঁ থেকে নেওয়া কাঁটাকমল, বঙ্গেবর্গী, দেবদাস, মিসরকুমারী, দুই পুরুষ, দেবীদুর্গা, ধাত্রীপান্না একটার পর একটা এমন আকস্মিক দেখা যায় যে একটা কিছু ধারণা ক'রে নিতে না নিতে অন্য এক পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। সেখানে কোন ধারার সন্ধান করতে গেলে হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই থিয়েটারের পরিচালনার কাজে আগে দেখা গিয়েচে বাণী-বিনোদকে, এখন দেখা যাচ্ছে ছবি বিশ্বাসকে, কাল হয়ত অপর কোন দিকপালকে দেখা যাবে।

'ওয়াসীয়াৎ-নামা' চিত্রে অসিতবরণ

অভিজাতদের পাড়া দক্ষিণ কোলকাতায় কালিকা নাম ধরে যে থিয়েটার গড়ে উঠেচে, তাও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবার অবসর এখনো পায় নি। বৈকুণ্ঠের উইল, অচল প্রেম, আর ছাব্বিশে জানুয়ারী একের পর আরেকটি থিয়েটারকে কোনো গতি দিয়েচে কিনা এবং দিলে কোন দিকে দিয়েচে তা নির্ণয় করতে হলে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়।

* * *

এতক্ষণ যা বল্লাম, তা দিয়ে কিন্তু আমি এ-কথ বোঝাতে চাইনে যে কোন থিয়েটারেই ভালো নাটক হয়নি অথবা ভালো অভিনয় হয়নি। বিপ্রদাস, বিন্দুর ছেলে রামের সুমতি, বৈকুণ্ঠের উইল, দেবদাস যে নাটকীয় উপা দানের দৈন্য প্রকাশ করে, তা কিন্তু আমি মোটেও ব না। বিংশ শতাব্দী, সন্তান, দুই পুরুষ, ধাত্রীপান্না, ছাব্বি জানুয়ারী অভিনীত হওয়া উচিত নয়, এমন কথাও আ বলতে চাইনে। আমার বলবার কথা হচ্ছে এই যে, নাট্য প্রগতির দিকে দৃষ্টি রেখে এদের পরম্পরাগত আবির্ভাব আদে হয় নি। হাতের মাথায় যখন যা এসেচে তাই বাদ বিচা না করে মঞ্চস্থ করা হয়েচে। এ থেকে নাটকের, নাট্যগঠনের অভিনয়ের বিশিষ্ট ধারার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। ত একটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। তা হচ্ছে রজত ধারা যুদ্ধের দিনে থিয়েটারের বাইরে এই রজত-ধারাকে দুকু ছাপিয়ে বয়ে যেতে দেখে থিয়েটারের মালিকরা তা নিজেদের আঙিনা দিয়ে বইয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টার ক্র করেন নি। বহুদিন বাদে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যর প্রথম অভিনীত হোলো নাট্যভারতীতে। দেবদাস রজ ধারাকে থিয়েটারের সীমানার মাঝে টেনে আনতে সক্ষ হোলো। সংগে সংগে শ্রীরঙ্গম বিপ্রদাস খুল্লেন। এ দেবদাসের চেয়ে বেশী অর্থ আহরণ করলেন। তাই দেখে মিনার্ভা পুরোনো দেবদাসকে নতুন ভূমিকা-লি দিয়ে আকর্ষণের সামগ্রী করে তুলে অভিনয়ের দিক দি এবং অর্থের দিক দিয়েও সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিল দেবদাস মিনার্ভার পালে এখন হাওয়া বাধিয়ে দিল। মিনার্ভা তর্ তর্ করে এগিয়ে যেতে লাগল, রঙম ভাবল সেই বা পিছনে পড়ে থাকবে কেন? সে খুলে দি

রামের সুমতি, ছোটদের গল্প, তবুও তা পয়সা দিল। পর পর তিনখানির সাফল্য সকল মঞ্চমালিককে চঞ্চল করে তুলল। কালিকা করল থিয়েটারের উদ্বোধন "বৈকুণ্ঠের উইল" দিয়ে। সুখ্যাতি তেমন হোলো না কিন্তু অর্থ এলো প্রচুর। শ্রীরঙ্গম খুল্লেন বিন্দুর ছেলে। দর্শক ভেংগে পড়ল। থিয়েটারে থিয়েটারে রব উঠল, চাই শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্র। কিন্তু চাইলেই ত আর পাওয়া যায় না। রাইট অর্জন করা চাই, নাট্যরূপ দেওয়া চাই, রয়ালটির টাকা চাই। সন্ধান চলতে লাগল। শোনা গেল সব বইয়েব রাইট একটি ভদ্রলোক দখল করে বসে আছেন। এবং তিনি হচ্ছেন একটি থিয়েটারের মালিক। অপর থিয়েটার গুলি দমে গেল। এমন সময় জানা গেল শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্পের রাইট উক্ত ভদ্রলোকের আয়ত্তে নেই। শোনা যাচ্ছে তিনটি থিয়েটার চড়া রয়ালটি দিয়ে (থিয়েটার কোন কালে যা দেয় নি) তিনটি গল্পের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করবার অধিকার খরিদ করে নিয়েচেন। এবং পরবর্তী পূজোর পরেই রঙ্গজগতের আকর্ষণ হয়ে সেই তিনখানি নাটক তিনটি থিয়েটারের পাদপ্রদীপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে।

* * *

শরৎচন্দ্রের রচনার আকর্ষণ দুর্বার। কিন্তু শরৎচন্দ্রের চাহিদা থেকেও নাট্যশালার প্রগতির ধারা বোঝবার উপায় নেই। রামের সুমতি আর দেবদাস একই রসের বস্তু নয়। বিন্দুর ছেলে আর বিপ্রদাসে পার্থক্য ঢের। কোনখানি শরৎচন্দ্রের অল্পবয়েসে লেখা, কোনখানি অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়েসে। কতকগুলি কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা, কতকগুলি লেখা যুবক-যুবতীদের জন্য। কিন্তু নাট্যশালা সবগুলি একই সময়ে একই দর্শকদের সাম্নে অভিনয় করচে। প্রগতির ধারা কেমন করে পাব? রজত-ধারার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে নিশ্চিত করে। নাট্যশালার মালিকরা তাতেই খুসি।

ষ্টার থিয়েটার শরৎচন্দ্রের একখানি উপন্যাসেরও নাট্যরূপ দেন নি। কিন্তু তাই বলে রজত-ধারার তীরে বসে ষ্টার কেবল ঢেউ গুণেই সময় কাটায় নি। হয়ত

'ওয়াসীয়াৎ-নামা' চিত্রে শ্রীমতী ভারতী

তারই সিন্ধুকে টাকা উঠেচে সব চেয়ে বেশী। ছাব্বিশে জানুয়ারী, বৈকুণ্ঠের উইলের চেয়ে বেশী টাকা আনছে বলেই শুনতে পাই, রামের সুমতির চেয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব কম টাকা দেয়নি, দুইপুরুষ দেবদাসের বিক্রীকে ছাপিয়ে গেছে। তবে নাট্যশালায় মালিকদের শরৎচন্দ্রের বই পাবার আগ্রহাতিশয্য কেন? কারণ রয়েচে। আর সে কারণ এই যে, আজকার দিনে প্রচুর পেয়ে পেয়ে হারাবার ভয় বেড়ে গেছে। তাঁরা দেখচেন নাট্যরূপ ভালো হোলো কি মন্দ হোলো তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, অভিনয়ের দিকে দৃষ্টি দেবারও দরকার নেই। পোষ্টার একটা মারতে পারলেই হোলো। কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। নতুন বই সব সময়েই অনিশ্চিত। গতি এবং প্রগতি কোন দিকে কতটুকু, তা কেমন করে জানা যাবে? তা জানা না গেলেও একটি জিনিষ জানা যাচ্ছে। তা হচ্ছে গল্পের দাবী এখন প্রবল রয়েচে। এই গল্প যে নাটকে ভালো

মহোৎসবের
দিনে
দুর্গা পূজা! একটা দিনের মতো দিন! সমস্ত বছর আপনি এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করে' থাকেন। এমনি আনন্দময় দিনে আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে আপনার মধুরতর সম্পর্ক গড়ে' উঠুক, আর আপনার বাড়িতে হাস্যকলরবে মুখর নিত্যকার চায়ের মজলিশটি প্রচুর চায়ের পরিবেষণে প্রাণময় হয়ে উঠুক। এরূপ প্রত্যেক স্মরণীয় দিনেই অভ্যাগতদের চা দিয়ে অভ্যর্থনা করুন।
ভারতীয় চা
উৎসবে অতুলনীয়
ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
I K 150

করে বলা হয়, সেই নাটকই লোক টানে বেশী। তাও আবার অজানা গল্পের চেয়ে জানা গল্প অথবা নির্ভর করা যেতে পারে এমন লোকের গল্প হলে ভালো হয়। গল্প নাটকের ভিতর দিয়ে, অভিনয়ের ভিতর দিয়ে ভালো ভাবে বলা হোলেত ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই। বোধগম্য করে বলা হলেও আপত্তি নেই। আজ যেমন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপকে নাট্যশালার মালিকরা 'ব্যাঙ্কমানি' মনে করচেন, বছর কয়েক আগে অনুরূপা দেবীর উপন্যাসগুলিকে তখনকার মালিকরা 'ব্যাঙ্কমানি' বলেই জেনেছিলেন। মন্ত্রশক্তি, পোষ্যপুত্র, মা, মহানিশা, পথের সাথী কিন্তু পল্লীসমাজ, ষোড়শী, রমা, বিজয়া, গৃহদাহের চেয়ে অনেক বেশী অর্থ টেনেছিল। অনুরূপা দেবীর উপন্যাস কি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চেয়ে বেশী জোরালো ছিল? তাতে কি নাটকীয় সিচুয়েশন বেশী ছিল? অথবা সংলাপই কি ছিল বেশী মধুর? এক কথায় জবাব দেওয়া যাবে, না। তবে শরৎচন্দ্রের ওই বইগুলির বিক্রী ছাপিয়ে অনুরূপা দেবীর বইয়ের বিক্রী বেশী হোলো কেন? অভিনয়ের গুণে? শরৎচন্দ্রের কোন বইয়ের ত খারাপ অভিনয় হয়নি।

তারপর এখন আসুন কম্বিনেশন অভিনয়ের দিকে। এ-দিকে এই দুই বছরে 'মিশরকুমারী' সব চেয়ে বেশী দর্শক আকর্ষণ করেচে। তারপর 'সাজাহান', তারপর 'চন্দ্রশেখর', তারপর 'প্রফুল্ল', তারপর 'চিরকুমার সভা'। এথেকেই বা গতি এবং প্রগতির কি পরিচয় আপনি খুঁজে বার করবেন? পারবেন না। নাট্যশালার প্রগতি, আগেই বলেচি, নির্ভর করে নাট্যশালার মালিকদের এগিয়ে যাবার ইচ্ছার ওপর। এই ইচ্ছা যে কিছু আছে, তার পরিচয় আমি পাইনি। নাট্যমন্দিরের আমলে পেতাম, আর্ট থিয়েটারে পেতাম আধাআধি, শিশির মল্লিক পরিচালিত রঙমহলে প্রয়োজনার দিক দিয়ে তা পেতাম, গদাধর মল্লিকের কর্তৃত্বে পরিচালিত রঙমহলে এবং নাট্যভারতীতেও তা পেতাম। কিন্তু এখন পাইনা। না পাবার কারণ এই যে, আজ অর্থ কুড়োবার, মূলো তোলবার দিন এসেচে। নাট্যশালার মালিকরা আর কিছুই ভাবা প্রয়োজন মনে করেন না।

'ওয়াসীয়াৎ-নামা' চিত্রে শ্রীমতী সুমিত্রা

* * *

এখন প্রশ্ন উঠবে টাকার কথা না ভেবে কোন থিয়েটার চলতে পারে কিনা? থিয়েটার কেন, কোন মানুষেরই চলেনা। কিন্তু তা চলেনা বলেই কি মানুষ যে কোন উপায়ে টাকা উপার্জন করে? উচিত অনুচিত কি ভেবে দেখে না? নিশ্চিতই দেখে। যদি না দেখত তাহলে চোর, ঘুষখোর, চোরাবাজারের কারবারী, ভ্যাজাল জিনিষের বিক্রেতা নিন্দিত হোত না। টাকার কথা না ভেবেও থিয়েটার তার আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েচে এমন নজীর অনেক আছে। ওদেশে ত আছেই, এদেশেও আছে। এ-দেশে শিশিরকুমারকেই দেখেচি নাটকের দিকে দৃষ্টি দিয়ে অনেক সময় অর্থাগমের কথা বিচারেই আনেন নি। আর্ট থিয়েটারকেও দু-একবার তা করতে দেখিচি। শিশির মল্লিকের সাজাবার গোছাবার সখ ছিল বেশী। তিনি সাহেব বাড়ী থেকে ফার্নিচার এনে যেমন ষ্টেজ সাজিয়েচেন,

তেমন নাটকেও দৃশ্যপটের কাজে লাগিয়েছেন, অশোক নাটককে রূপায়িত করতে তিনি অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নি। গদাধর মল্লিকও আগে নাটকের প্রয়োজন বিচার করেছেন, তারপর করেছেন পয়সার হিসেব। প্রবোধ গুহ যেমন আর্ট থিয়েটারে তেমন মনোমোহনে এবং নাট্য-নিকেতনে মাঝে মাঝে দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন, অর্থের কথা না ভেবে। 'তপতী' নাটকে পয়সা পাওয়া যাবে না জেনেও শিশির কুমার তপতী খুলেছিলেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নাট্যমন্দির তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপরও দুর্দিনে মহাপ্রস্থান, পরে শ্যামা, দেশের দাবী খুলতে দ্বিধাবোধ করেন নি। প্রবোধ গুহ আর্ট থিয়েটারে শোধবোধ, গৃহদাহ খুলে মার খেলেও নাট্যনিকেতনে ঝড়ের রাতে, শুভযাত্রা খুলতে পশ্চাৎপদ হননি। শিশির মল্লিক রঙমহলে 'অশোক' আর 'রাবণ' ছাড়া অনুরূপা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী আর কুমার (এখন রাজা) ধীরেন্দ্র নারায়ণের উপন্যাসের নাট্যরূপ চালিয়েছেন। গদাধর মল্লিক রঙমহলে স্বামী স্ত্রী, মেঘ মুক্তি, তটিনীর বিচার, নাট্যভারতীতে সংগ্রাম ও শান্তি, মধুমালা এবং নার্সিংহোম দিয়ে তিন বৎসর সাফল্যের সংগে থিয়েটার চালিয়েছিলেন। এর মাঝে শিশির কুমার নাট্যমন্দিরে একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করে চলতেন, আর্ট থিয়েটার চালাতেন পাঁচমিশেলী, নাট্যনিকেতনও তাই, শিশির মল্লিক রঙমহলে নাটকের প্রগতির চেয়ে প্রযোজনার প্রগতির দিকেই ঝোঁক দিতেন বেশী, গদাধর মল্লিক নাটকের এবং প্রয়োজনার দিকে সমান দৃষ্টি রেখেই চলতেন।

* * *

এর পর এলো প্রধান অভিনেতাদের আধিপত্যের যুগ। অহীন্দ্র, দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু, ছবি বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে নাটক নির্বাচনের ও পরিচালনার ভার নিলেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এঁরা যখন ভার নিলেন, তখন নাটক কোন সুস্পষ্ট খাত বয়ে চলবার সুযোগ কেন পেলনা? কারণ অনেক। প্রথম কারণ, ভার এঁরা পেলেন সত্য, কিন্তু চাবী কাঠি ত মালিকদের হাতেই রইল। এঁদের মনোনীত একখানি নাটক যদি অর্থ আনতে অসমর্থ হোলো ত পরবর্তী নাটক চাপিয়ে দেওয়া হোলো এঁদের ঘাড়ে। দ্বিতীয় কারণ, এঁদের সকলেরই নাটক সম্বন্ধে ধারনা এক নয়, পছন্দও এক নয়। অহীন্দ্র প্যাঁচবহুল নাটক পছন্দ করেন, নির্মলেন্দু করেন বাণীবহুল-নাটক। দুর্গাদাস বিধায়ককে দিয়ে য়্যাবনর্মাল চরিত্রবহুল নাটক এক রকম জোর করেই লিখিয়ে নিতেন। একবার ত বিধায়ক নাটক পুরো শেষ না করেই পালিয়ে গেলেন, শূন্য অংশগুলো

আমাকেই পূর্ণ করে দিতে হোলো। এই প্রধান অভিনেতারা তাঁদের ধারণা এবং পছন্দ মত করে নাটক লিখিয়ে নেবার চেষ্টা করেন এবং নাট্যকাররাও এঁদেরকে খুসি করবার জন্য এঁরা যা চান, তাই দ্বিধাহীন হয়ে করে দেন। এমনও দেখিছি, এঁদের সময়ের অভাব ঘটেচে, তাই বেচারা নাট্যকারদের এঁরা ছেড়ে দিয়েছেন সহকারীদের হাতে। সহকারীরা নির্দেশ দিচ্ছেন আর নাট্যকাররা পরমানন্দে লাইন বদলাচ্ছেন, লাইন বাড়াচ্ছেন। বলুনত, এভাবে কি কোন সৃষ্টি সম্ভব হয়? তারপর যদি বলি প্রধান অভিনেতারা যশ চান, প্রতিষ্ঠা চান, থিয়েটার থেকে অর্থাগমও নিশ্চিত রাখতে চান, তাহলে আশা করি কেউ মনে করবেন না, আমি তাঁদের নিন্দা করচি। তাঁরা নিষ্কাম নন একথা তাঁরাও জানেন, আমরাও জানি। নাটক মনোনয়নের সময় এঁরা নিজেদের ভূমিকার কথা যেমন ভাববেন, বিষয় বস্তুর বা নাট্যগঠনের কথা তেমন ভাববেন না। দুর্গাদাস স্পষ্টই বলতেন, 'নাটক টেনে নিতে হবে আমাকেই। কাজেই আমার ভূমিকা ছাপিয়ে কোন ভূমিকা যেন না বড় হয়ে ওঠে।' স্ত্রী ভূমিকা-প্রধান নাটক সকল প্রধান অভিনেতা পছন্দ করেন না, সব ছাপিয়ে ওঠা কোন বৃদ্ধের ভূমিকা না থাকলে কোন নাটক কোন এক প্রধান অভিনেতার পছন্দ হয় না। এঁদের ওপর নাটক মনোনয়নের ভার থাকলে নাটক কতটা প্রগতিশীল হতে পারে? অথচ এঁদের উপেক্ষা করবার উপায় নেই। এঁরা ভালো করে অভিনয় করলে ত নাটক জমবে। এঁদের কথা না শুনলে, অভিনয় এঁরা মন দিয়ে করবেন না। নাটক প্রথম রাতেই ডুবে যাবে। মালিকরাও প্রধান অভিনেতাদের নাটকের সব চেয়ে বড় ভূমিকায় দেখতে না পেলে খুসি হন না। নাটকের জন্য তাঁরা যা ব্যয় করেন, তার চেয়ে ঢের বেশী করেন প্রধান অভিনেতাদের জন্য, নাটককে যা বুম করেন, তার চেয়ে ঢের বেশী বুম করেন প্রধান অভিনেতাদের। তাঁরা জানেন নাটক অস্থায়ী ও একশ রাতের পর অন্য নাটকের দরকার হবে, কিন্তু প্রধান অভিনেতাদের কাজে লাগবে তার পরের নাটকেও। প্রধান অভিনেতাদেরও নাটকের গুণের চেয়ে বিক্রয় বৃদ্ধির দিকে সচেতন থাকতে হয় বেশী। কেননা বিক্রী ভালো না হলে তাঁদের আসন টলে উঠবে। এই রকম নানা দিক থেকে নানা তাগিদ এসে নাটক নিয়ে এমনই টানাটানি করে যে নাটক নিশ্চিন্তে একটি ধারা বয়ে অগ্রসর হতে পারেনা।

এই বার সব শেষ কথাটিই বলি। সব শেষে বলচি বলে কথাটা কিন্তু তুচ্ছ করবার মতো কথা নয়। সে হচ্ছে আমাদের দর্শক সাধারণের কথা। আমার মতে সেইটেই হবে সব চেয়ে বড় কথা। এই দর্শকরা যেমন নাটক চাইবেন নাট্যশালা তেমন নাটকই যোগাবেন। আজও দর্শকরা যখন 'মিশর কুমারী', 'সাজাহান', 'চন্দ্রশেখর' পেলে খুসি হন, 'টিপুসুলতান', 'আনন্দমঠ' নাম শুনেই উদ্বুদ্ধ হন নাটকত্ব বা অভিনয়কে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন না, তখন নাট্যশালা ওই ধরণের নাটকই ঘুরে ফিরে নিবেদন করবে। নতুন কোন খাত দিয়ে নাটককে বইয়ে নেবার চেষ্টা করবে না। বলতে পারেন, নাট্যশালার দায়িত্ব রয়েচে দর্শকদের উন্নত করবার। নাট্যশালার প্রাইভেট ওনারশিপ যতদিন থাকবে ততদিন নাট্যশালার কাঁধে এই ভার চাপিয়ে দেওয়া নিরর্থক। ঘরের টাকা বার করে দর্শকদের রুচি উন্নত করবার জন্য সর্বস্বান্ত হতে চাইবেন নাট্যশালার এমন মালিক মিলবে না। নাট্যশালাকে সে দায়িত্ব দিতে হলে নাট্যশালাকে হয় সরকারী শিক্ষা বিভাগের, নয় পৌরসভার অন্তর্ভূত করে নিতে হয়। আর না হয় মিশনারী সোসাইটি গড়ে কয়েকটি নাট্যশালা পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে। তাহলেই নাট্যশালার গতি হবে, প্রগতি হবে এর প্রগতির একটা স্পষ্ট ধারারও সন্ধান পাওয়া যাবে।

সুগন্ধে
রূপ হবে রমনীয়
হোয়াইট রোজ
মনের মতন
বকুল
যুথী
লিলাক
P.A.S
পি,এম,বাকচি এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

মায়ারহোল্ড থিয়েটারে অভিনীত ওসট্রোভস্কির দি ফরেষ্ট নাটকের একটী দৃশ্য।

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

রূপ-মঞ্চ

সোভিয়েট থিয়েটারের কথা বলতে গেলে রুশ বিপ্লবের কথাই বলতে হয়। যে বিপ্লবে শুধু সমাজ জীবনই নয়—রাশিয়ার শিল্প, কলা, বিজ্ঞান সবকিছুই নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। যে বিপ্লব রাশিয়ার নাট্য-জগতকে নূতন ছাঁচে ঢেলে তৈরী করেছে। সোভিয়েট জনগণের মর্মভাঙা রক্তরাঙা কথা আজ নাট্যমঞ্চে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে—নৈরাশ্যের হাহাকার ধ্বনি ছাপিয়ে যে নাট্যমঞ্চ জনগণকে নূতন আশার বাণী শুনিয়েছে—দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরু দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে যেখানকার নাট্যমঞ্চ—জনসাধারণের ওপর তার প্রভাব যে অতুলনীয় সেকথা বলবার কোন প্রয়োজন নেই। জর্জিয়ার পার্বত্যাঞ্চল থেকে সাইবেরিয়ার তুষার সমাকীর্ণ প্রদেশের অধিবাসী-দের ওপর রাশিয়ার নাট্যমঞ্চ কম প্রভাব বিস্তার করেনি। দীর্ঘদিন জারতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার নিষ্পেষণে যে রাশি-য়ার শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে যায়নি—দীর্ঘদিন সামন্ততন্ত্রের শোষণে নিস্তেজ হ'য়ে পড়লেও যে রাশিয়ার প্রাণশক্তি নষ্ট হ'য়ে যায়নি, বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে সেই রাশিয়া, নিপীড়িত, দলিত জনগণের রাশিয়া, যখন নূতন আলোকের পথ খুঁজে পেয়েছিল—তখন অবধিও রাশিয়ার নাট্যমঞ্চ তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি। যে আশা ও আলোর সন্ধানে রাশিয়ার জনগণ সংঘবদ্ধ হ'য়ে সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তখন অবধিও রাশিয়ার নাট্যমঞ্চ তাদের সেই আশা ও আলোকের কথা শ্রদ্ধার ভরে মাথা পেতে নেয়নি। কারণ তখন অবধিও রাশি-য়ার নাট্যমঞ্চ তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো, যারা ছিল এই অন্যায় ও অত্যাচারের উৎস। দেশের শাসন ব্যবস্থার তারাই ছিল নিয়ন্তা। সুবিধাবাদী বুদ্ধি-জীবির দল নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল। ক্ষয়িষ্ণু জারতন্ত্রের আওতায় সৃষ্ট—লোলুপ বণিক সম্প্রদায় জন-গণের এই রুদ্ধ আবেগের টুটি টিপে মেরে ফেলে নিজে-দের স্বার্থ কায়েমী করবার জন্যেই বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠেছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের কথাই প্রথমে বলতে হয়। যে বিপ্লব থেকে রাশিয়ার এমন একটা থিয়েটারের জন্ম হ'লো যার ভিতর রাশিয়ার রাষ্ট্র জীবনের সুস্পষ্ট ইংগিত প্রচ্ছন্ন ছিল। আমি বলছি 'মায়ারহোল্ড' থিয়েটারের কথা। বণিকতন্ত্রের প্রভাবে জারের প্রভাব ধীরে ধীরে স্তিমিত হ'য়ে আসছিল। বণিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় যে মজুর এবং কর্মীদের সৃষ্টি হয়েছিল ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁরা বলসঞ্চার করতে লাগলো। বিদ্ধস্ত জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। সেণ্ট পিটার্সবর্গের রাস্তা অবরুদ্ধ হলো। চতুর্দিকে গোলা বারুদ···রাস্তায় রাস্তায় স্তূপীকৃত মৃতদেহ। বিপ্ল-বীরা মস্কোর রাস্তা অবরোধ করলো। কেউ জানতো না এর পরিণতি কোথায় এবং কি? রাস্তায় রাস্তায় এই বিক্ষুব্ধ জনতা নূতন জীবনের, নূতন জগতের নূতন জয়-গানে রাশিয়ার আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুললো। সমস্ত অন্যায় উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষের অধিকারে নূতন জগতে তারা প্রতিষ্ঠিত হবে—সেই আশায় বিভোর। এই জনতার মাঝে অপরাপরদের মত এক তরুণকেও দেখতে পাই—নূতন আশার উদ্দীপনায় যার মুখ উদ্ভাসিত। এই তরুণ যুবক আর কেউ নন—ভীসেভেলোড মায়ারহোল্ড (Vsevelod Meyerhold) নাট্য প্রয়োজনায় সোভিয়েট রাশিয়ার গণজীবনে যার প্রভাব এবং প্রতিভা সর্ববাদীসম্মত। জর্জিয়ার রাজধানী টিফ্লিস-এ নাট্যমঞ্চের সত্যিকারের রূপ আবিষ্কারে তিনি গবেষণারত ছিলেন। মস্কো আর্ট থিয়েটারে শিক্ষা পেয়েও তার বাস্তব-পদ্ধতি (Naturalistic Methods) এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে উঠতে পারেন নি। তাই নাট্যমঞ্চ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করবার জন্য ইটালী পরিভ্রমণ করেন। ইটালী থেকে প্রত্যাবর্তন করে নাট্য-মঞ্চের উন্নতি কল্লেই আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন—নাট্যমঞ্চকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে ছবির মত বাস্তবের রূপ দিলেই চলবে না, বাস্তবকে বাস্তব বলেই ফুটিয়ে তুলতে হবে। এজন্য মঞ্চের সংগে দর্শকদের আন্তরিক যোগ থাকার প্রয়োজন। তাই তিনি দর্শকদের অনুভূতির নাড়ীতে সাড়া জাগিয়ে—অনুভূতির

উৎস প্রবাহে নাট্যমঞ্চকে অবগাহণ করাতে চেয়েছিলেন। এই বিপ্লবে বিপুল জনতার একজন হ'য়ে তিনি জনগণের সমষ্টিগত আবেগের শক্তিকে কষ্টি পাথরে যাঁচাই করে নিলেন।

মেনসেভিকদের বিপ্লব বিমূখীনতা বিপ্লবীদের ভিতর বিভেদের স্থষ্টি করলো—মেনসিভিকেরা বুর্জোয়াদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠলো। বিপ্লব রুদ্ধ হ'য়ে এলো। কিন্তু মনের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা—আদর্শের আলোকে দৃঢ় হয়ে উঠলো। বলসেভিক পার্টির অমননীয় বিপ্লবী মনোভাব দূরীভূত হ'লো না কোন মতেই। বরং পরাজয়ে বুদ্ধিজীবি বিশ্বাসঘাতকদের চিনবার সুযোগ পেলো তারা—সুযোগ পেলো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের।

মস্কোর রাজপথে—বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝখান থেকে মায়ারহোল্ড যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন, তার প্রভাব তখনও মায়ারহোল্ডের মন থেকে স্তিমিত হয়নি। সেন্ট পিটার্সবার্গে এসে তিনি গ্রীক অভিনয়ের ভিতর দিয়ে জনগণের সেই দুর্দমনীয় শক্তিকে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পেলেন। সমষ্টিগত শক্তির মহিমা প্রচারে ১৯০৬ খৃঃ একটী প্রাদেশিক ছোট শহরে তিনি ইবসনের 'Ghosts' নাটকটী অভিনয় করেন। এই অভিনয় নানাদিক দিয়ে উত্তেজনা পূর্ণ হয়েছিল। এই অভিনয় থেকে তিনি উপলব্ধি করলেন, মঞ্চ এবং দর্শক তাদের পৃথক সত্তায় এগিয়ে এসে এক সাধারণ শক্তির সৃষ্টি করবে। Ghosts নাটকের অভিনয়ের পর তিনি অভিনয়ের নূতন উপায় উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করলেন—পরবর্তী অভিনয় সবগুলিই পরীক্ষামূলকভাবে চলতে লাগলো। এক এক করে মঞ্চের পুরোন পদ্ধতির প্রভাব মুক্ত ক'রে তিনি নূতনের প্রবর্তন করতে লাগলেন।

কোন পদ্ধতিই নিরধারা তাঁকে আটকে রাখতে পারলো না। রাশিয়ার তদানীন্তন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমস্ত কল্পনাই কাটা সুতোর মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলো। তখনকার বিশৃঙ্খলার ভিতর যেটা করলে ভাল হত—সেটা করা সম্ভব হয়ে ওঠত না। মঞ্চের প্রভাব প্রতিপত্তি শাসক-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এড়াত না। এমন কি সাজঘর অবধি পুলিশে অনুসন্ধান করে যেত অহেতুক! অবশ্য বিপ্লবোত্তর যুগে—সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্যমঞ্চের ইতিহাস নিয়ে বিনিয়ে দেখতে দেখতে আজ আমাদের সহজেই বোধগম্য হয়—১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর তদানীন্তন শাসক সম্প্রদায় মঞ্চের প্রতি যে কড়া নজর রেখেছিলেন তা নেহাৎ অহেতুক নয়। কারণ এই নাট্যমঞ্চ বিপ্লবকে যে অনেকখানি কৃতকার্যতার মাঝে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে

সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লবী নাট্যবীর
ভীসেভলড মায়ারহোল্ড
VSEVLOD MEYERHOLD

কোন সন্দেহ নেই। রাশিয়ার রাষ্ট্রজীবনে মঞ্চের প্রভাব আজ সুস্পষ্ট। আমার মনে হয়, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের নাট্যমঞ্চ তার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এত খানি প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে দাঁড়ায় নি। মায়ারহোল্ড মনে করলেন, পুরোন নাট্যকারদের নাটক নিয়েই কাজ চালানো যাক—নইলে নূতনদের যা কিছুই করা যাবে, রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হতে হবে। ১৯১৪ খৃঃ এলো। মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হলো। যুদ্ধের সংগে সংগে মায়ারহোল্ড সাজ সজ্জার 'পরিবর্তে' 'Constructivist' দৃশ্য সজ্জার ব্যবহার করতে লাগলেন। এবং এরপর কিছুদিন চলচ্চিত্রের দিকে দৃষ্টি দেন।

১৯১৭! রাশিয়ার ইতিহাসে একটী স্মরণীয় বছর। সর্বহারাদের একমাত্র বিপ্লবী দল বলসেভিক পার্টি—যুদ্ধ ক্লান্ত জার শক্তির বিরুদ্ধে গৃহ যুদ্ধে ব্যাপৃত হলো। নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সজাগ হয়ে রণ-ক্লান্ত জার শক্তিকে সময়োপযোগী আঘাত করতে তারা দ্বিধাবোধ করলো না। ১৯০৫-র বিপ্লবের তিক্ততার অভিজ্ঞতা এদের মন থেকে মুছে যায়নি—১৯১৭-র সুনিশ্চিত জয়ের আশাই এদের অনুপ্রাণিত করলো—জারতন্ত্রের নাগ-পাশ থেকে মুক্তি লাভ করে—এই সর্বহারার দল মুক্ত আলোহাওয়ায় মুক্ত মানুষের অধিকার লাভ করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে…তাদের অন্তরের এই দুর্দমনীয় আশা এবার সত্য সত্যই জয়মণ্ডিত হ'য়ে উঠলো। ক্রেমলিনের উপর বিপ্লবের লাল জয় পতাকা শোভা পেতে লাগলো—নূতন জগতের জন্মলাভ হলো। বলসেভিক পার্টি মজুর, কৃষক, সৈনিক, নাবিক, এই বিপ্লবী যোদ্ধাদের সহযোগীতায় বুর্জোয়া শক্তির কণ্ঠরোধ করে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলো। সর্বহারা কৃষকের দল তাঁদের জমি ফিরে পেলো— বন্ধ হ'লো বণিকের —ধনীকের সর্বপ্রকার শোষণ-নীতি। ধনতন্ত্রের ধ্বংস-সাধন করে ১৯১৭ বিপ্লবে—সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান হ'লো। শান্তি ফিরে এলো। মানুষের ইতিহাসে নূতন যুগের বাণী সূচিত হ'লো। মায়ারহোল্ডকে এই জয়-গৌরব থেকে বঞ্চিত করা চলে না। তিনিও এই বিপ্লবে ঝাপিয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করেন নি। বলশেভিক পার্টির লালফৌজে যোগদান করে তিনিও এই নূতন আদর্শের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যুদ্ধাবসানে ১৯২০ খৃঃ আবার থিয়েটারে ফিরে এলেন। তাঁর অন্তরে তখন এই আশাই বলবতী ছিল—একটী নূতন থিয়েটারের জন্য হাজার হাজার লোকের মুখপাত্র হ'য়ে তিনিই দাবী জানাবেন। দর্শক এবং নাট্যমঞ্চের ভিতর যে ব্যবধান বিরাজ কচ্ছিল, তা দূর করবার জন্য সকলেরই আগ্রহ দেখা গেল প্রচুর। এবিষয়ে তিনি তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করলেন—মঞ্চের যে রূপ হবে, যে মাল মশলা দিয়ে মঞ্চের নাটক লিখিত হবে—তা শুধু নাট্যকারের ব্যক্তিগত কল্পনার রূপ হবে না—শত শত মানুষের হাসি কান্নার কথা নিয়েই লিখতে হবে নাটক। মানুষের জীবনের ভাঙাগড়া থেকেই গ্রহণ করতে হবে নাটকের মাল মশলা এবং থিয়েটার সম্পর্কেও তিনি তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত জানালেন: "He would make the theatre a dynamic and powerful weapon and give it to the cause of Communisim."

বেলজিয়ামের কবি Verhaeren রচিত 'Dawn' গীতি নাট্যের অভিনয় করে মায়ারহোল্ড সর্বপ্রথম মঞ্চের সংগে দর্শকদের সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। গৃহযুদ্ধের জয় পরাজয়ের সংবাদ মস্কোতে যখন যা এসে পৌছোত—তিনি মঞ্চের মারফৎ তা পরিবেশন করে জনসাধারণের জীবন মৃত্যুর—আশা—আকাঙ্খার—ভীতি ও নৈরাশ্যের বাণী শোনাতেন। জনসাধারণের অনুভূতিতে তিনি এমনিভাবে আলোড়নের সৃষ্টি করলেন যে, মঞ্চ তাদের কাছে জীবন্তরূপ পরিগ্রহণ করলো। বক্তৃতা—হ্যাণ্ডবিল—সংবাদপত্র—সব কিছুর চেয়ে মঞ্চের আবেদন শতগুণ বেশী বেগে তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে যেয়ে আঘাত করতে লাগলো। এখানেই মায়ারহোল্ডের সার্থকতা। তিনি যা চেয়েছিলেন—তাঁর প্রচেষ্টা সার্থকতায় ভরপুর হ'য়ে উঠলো। অনেকে বল্লেন, মঞ্চের সংগে রাজনীতির কোন যোগাযোগ নেই—। মঞ্চ শুধু আনন্দ বিতরণ করবে—। কিন্তু মায়ারহোল্ড তাঁর বিপক্ষে নিজের

সুস্পষ্ট মত প্রচারে একটুকুও পিছু হটেননি। তাঁর মতে, "Art cannot be nonpolitical. Art is class art and the theatre" is the tribune of agitation.

মায়ারহোল্ডের স্বপ্ন—মায়ারহোল্ডের কল্পনা বাস্তবের রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে বহু বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসার ফলে সর্থক হয়ে উঠেছে। ক্ষয়িষ্ণু জার শাসকের কটাক্ষ—বুর্জোয়া সাম্প্রদায়ের শোষণনীতি--বিপ্লবের ক্লান্তি ও অবসাদ—কোন কিছুই মায়ারহোল্ডকে দমিয়ে রাখতে পারেনি—সুনিশ্চিত গৌরবের আলোক শিখার রক্তিমাভা সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝার মাঝখান থেকে নাট্যমঞ্চে নূতন আদর্শ প্রচারে যেন তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল—তাই বিপ্লবোত্তর যুগে—আনন্দ ও আয়াসের বুকে তিনি গা ঢেলে দিলেন না—পুরাতনের জীর্ণ কংকালকে প্রোথিত করে—তার ভংগ্ন স্তূপের পর তিনি যে পাদপীঠের জন্ম দিলেন—তার তুলনা হয় না। তখনকার বিশৃঙ্খলার ভিতর—হাহাকার ও চরম শোচনীয়তার ভিতরও মায়ারহোল্ডের রঙ্গমঞ্চের দ্বার একদিনও বন্ধ হয়নি। কাপড়ের অভাব—কাগজের অভাব—চারিদিকের অভাব অভিযোগের ভিতর মায়ারহোল্ড তলিয়ে যাবার মত দুর্বল নন! পুরোন কাগজ দিয়ে দৃশ্য রচনা করে—ছেড়া কাপড় দিয়ে পোষাক তৈরী করে—মায়ারহোল্ড তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন। এই কর্ম প্রেরণা—মায়ারহোল্ড পেয়েছেন তাঁর আদর্শ থেকে—এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় যেমনি মায়ারহোল্ড একদিনও ঝিমিয়ে পড়েননি--তেমনি তাঁর দর্শকদের মঞ্চ-মায়াও একদিনের তরে স্তিমিত হ'য়ে আসেনি। পেটে অন্ন নেই—পরিধানে বস্ত্র নেই—রাশিয়ার জনগণ তবু থিয়েটারে আসা বন্ধ করেনি। তাইত বলি, মায়ারহোল্ডের থিয়েটার বিপ্লবের থিয়েটার--রাশিয়ার জনগণের থিয়েটার—যে থিয়েটারের সংগে রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস—জনগণের সৌর্য ও বীর্যের ইতিহাস আজও রয়েছে—অচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছন্ন। মায়ারহোল্ডকে একথায় বলতে গেলে বলতে হয়, সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্যমঞ্চের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বীর—তাই শুধু তাঁর নিজের থিয়েটারেই নয়—সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্য জগতের ওপর তাঁর প্রভাব

ডুমাস ফিলস এর 'দি লেডী অফ্ দি ক্যামেলিয়াস' নাটকের এই দৃশ্যটী মায়ারহোল্ড থিয়েটারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগায় না কী ?

অতুলনীয়—সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্যমঞ্চের ইতিহাসের পাতা ওটালে সর্বপ্রথম Vsevelod Meyerhold এর নামই জ্বল জ্বল করে ওঠে।

রাশিয়ার ভারসকাইয়া (Tverskaiya) বর্তমানে যা গর্কী ষ্ট্রীট নামে পরিচিত—সেখানে এলে পুরাতনের ধ্বংস স্তূপের পর নূতনের বিজয় পতাকা পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—নূতনের জয়গান মাতাল করে তুলবে। পুরাতনকে পিছনে ফেলে নূতন নগর—নূতন জগতের অভ্যুত্থানের সুস্পষ্ট ছবি চোখের সামনে জেগে উঠবে। গর্কী ষ্ট্রীট দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে বাদিকে মোড় ঘুরলেই মায়ারহোল্ডের থিয়েটার নজরে পড়বে। লাল আলোতে বিপ্লবী থিয়েটারের নাম—অগ্নিশিখার মত নিজের শক্তি ও সাহসের কথা ব্যক্ত করছে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা যেমনি অসংখ্য বুদ্বুদকে ভাসিয়ে এনে তীরে পৌঁছে দেয়, তেমনি এখানকার জনসমুদ্র যে কোন পথচারীকে নিয়ে থিয়েটারের কাছে হাজির করবে। থিয়েটারের সামনে লেনিনের মূর্তি জনতাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। এই জন কোলাহলের মাঝে এসে বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়তে হয়। থিয়েটারের প্রবেশ পথ খুঁজে পাওয়া দায়। থিয়েটারের সংশ্লিষ্ট অফিসগুলির এতগুলি খোলা দরজা থাকে যে কোনটা দিয়ে 'করিডর'-এ যেতে হবে—তাতে দিশেহারা হ'য়ে পড়তে হয়। কিন্তু এই দিশেহারা ভাব বেশীক্ষণ থাকে না—জনতার চাপে কিছুক্ষণ বাদে দেখা যাবে ঠিক গন্তব্যে আপনিই পৌঁছে গেছেন। জনতার বেশীর ভাগ যুবক যুবতী। দৃঢ়তার ছাপ তাদের চোখমুখে সুস্পষ্ট। এদের বেশীর ভাগ লোকের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, যেন সবে মাত্র কর্ম শেষে তারা ফিরেছে—কলকারখানায় কাজের শেষে ক্লান্তির ছাপ এখনও তাদের অবয়ব থেকে মুছে যায় নি। কর্মশেষে সরাসরি তারা থিয়েটারে চলে এসেছে। প্রেক্ষা-গৃহের আর্শীর মাঝে নিজেদের প্রতিফলিত মূর্তির পানে তাকিয়ে কেউ কেউ হয়ত—সৌন্দর্যের মানদণ্ডে বিচার করে দেখে—বাস্তব অনেকেই হয়ত সে মানদণ্ডে উঠে টিকবে না, কিন্তু এদের অন্তরে অন্তরে যে আদর্শ স্বচ্ছ ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হচ্ছে তাই যে এদের সুন্দর, মধুর ও দীপ্তিমান করে তুলেছে। চতুর্দিকে কাঠের দেয়াল ঘেরা 'কাউণ্টার' নজরে পড়বে। এর মাঝে এখানে সেখানে গৃহে তৈরী পোষাক পরে মেয়েরা বসে আছে—আত্মতৃপ্তিতে তারা গরীয়সী—আবার হাত ধরে ধরে কেউ উপর থেকে নীচে আসছে—নীচ থেকে উপরে যাচ্ছে। এই কাঠের দেয়াল ঘেরা স্থানটীর ভিতর দাঁড়িয়ে দর্শকেরা দেখতে পাবেন—একটা পাম বৃক্ষ যেন জড়াজড়ি করে ছাদটাকে ঘিরে ধরেছে—তারই নীচে রেঁস্তোরা। মানুষের ভিড়ে যেন ভেংগে পড়ছে। তারপর চতুর্দিকের দেয়ালের দিকে তাকালে দেয়ালে অংকিত ছবিগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া দায়। প্রেক্ষাগৃহে এসে সাধারণতঃ মনমুগ্ধকর নয়ন ভুলানো ছবিই দেখতে পাওয়া যায়—রূপসী সুন্দরীদের অর্ধনগ্ন দেহ তুলির আচড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার কথা স্বতন্ত্র—বিশেষ করে মায়ারহোল্ড থিয়েটারের। এখানকার দেয়ালে অংকিত রয়েছে—মজদুর আর কৃষকের ছবি—প্রশস্ত বক্ষ—নিটোল দেহ—হলোৎ-কর্ষণের দৃশ্য—আর কতকগুলি সংখ্যা (Statistics) যার সংগে শিল্পের কোন সম্বন্ধ নেই। না থাক। সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা অনেক। এই অংকিত ছবিগুলি রাশিয়ার ক্রমবিবর্তনের ইংগিত দিচ্ছে। পুরোন ধরণের লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা হচ্ছে—এরূপ একখানা ছবি নির্দেশ দেয় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের। ১৯৩৩ খৃ নির্দেশ দিতে যে ছবি খানা অংকিত রয়েছে তাতে দেখতে পাওয়া যাবে—চামড়ার টুপি পরে ট্রাকটার চালিয়ে মেয়েরা জমি চাষ করছে। আরও কত ছবি রয়েছে। কলকারখানার ছবি - মেয়ে এবং পুরুষেরা একসংগে কাজ করছে। নিজেদের গড়া জগতকে কেমন সুন্দর ও মহিমান্বিত করে তুলছে। এই ছবিগুলি দেখে জনতার পানে তাকালে অতি সহজেই ধরা পড়বে—কাদের রূপ ফুটে উঠেছে শিল্পীর তুলির আচড়ে। এই কাউণ্টারের ভিতর এসে চতুর্দিকের আবহাওয়া দেখে কোন নবাগতের মনে কেবলই উঁকি মারবে, তবে কি

ভুল স্থানে এসেছি ? অবশ্য বিশেষ পোষাক পরিহিত থিয়েটারের নির্দেশকদের জিজ্ঞাসা করলেই অডিটরিয়ামের রাস্তা দেখিয়ে দেবে। কিন্তু এই অডিটরিয়ামে এসে আপনার আশ্চর্যের অবধি থাকবে না। উন্মুক্ত হলঘর। শক্ত শক্ত কাঠের চেয়ার। দর্শক সমারোহে অডিটরিয়ম পরিপূর্ণ। কিন্তু আপনি যদি নবাগত হন আপনার বারবারই মনে জাগবে, এই নাকি অভিনয়ের স্থান--এখানে আবার অভিনয় হবে কি করে ?

কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে—যখন পুরস্কার বিতরণ করা হয়—মঞ্চের ওপর প্রকাণ্ড একটা টেবিল লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। পুরস্কার বিতরণ হয়ে যাবার পরে অভিনয়ের জন্য উৎসুক মন নিয়ে দর্শকেরা অপেক্ষা করতে থাকে। যাঁরা নূতন—যাঁরা বৈদেশিক এই থিয়েটারের সংগে যাদের হৃদয়ের যোগ নেই অভিনয় আরম্ভ হচ্ছে না—অভিনয় আরম্ভ হ'তে বহু দেরী—এই মনে করে হয়ত অস্বস্তি বোধ করবেন। কিন্তু এই থিয়েটারের সংগে রয়েছে যাদের হৃদয়ের যোগাযোগ, প্রতিটি মুহূর্ত কাটবে তাদের অপূর্ব শিহরণের ভিতর দিয়ে।

মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা
প্রতিভাধর কন্সটানটিন ষ্টানিশ্লাভস্কি
CONSTANTIN STANISLAVSKY

থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বে আন্তর্জাতিক সংগীত গীত হয়—এই সংগীত আরম্ভ হবার সংগে সংগে যারা বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন সকলেই এসে নিজ নিজ আসন গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বসবার আসন গুলি সবই শক্ত কাঠের। মূল্যের তারতম্যানুযায়ী আসনের

পার্থক্য নেই। দর্শকদের ভিতর বেশীর ভাগ যুবক যুবতী। বয়স্কদের সংখ্যা খুবই কম। আশ্চর্যের বিষয়, এই সিনেমার যুগে—সিনেমার সর্বপ্রকার প্রলোভনের হাত এড়িয়ে রাশিয়ার এই যুবক সম্প্রদায় মঞ্চের মায়া পরিত্যাগ করতে পারেন না। মঞ্চের মূলে এমনি আদর্শ রয়েছে—সোভিয়েট রাশিয়ার যুবক সম্প্রদায় যাকে অস্বীকার করতে পারেন না কোনমতেই।

মঞ্চের আলো নির্বাপিত হয়ে আসে। মঞ্চের টেবিলটা সরিয়ে দেওয়া হয়। আরও কিছুক্ষণ দর্শকদের গুঞ্জন কানে আসে। তারপর সব নিঝুম। এবার মঞ্চের আলো স্তিমিত ভাবে জ্বলতে থাকে—মঞ্চের দিকে তাকিয়ে কোন বৈদেশিকের কাছে মনে হবে, যেন নাটক অভিনীত হচ্ছে না, হচ্ছে তার রিহার্সেল। মঞ্চের পিছনের দেয়াল থেকে হঠাৎ অভিনয় এবং তার স্থান কাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ঘোষণা ঠিক সিনেমার কায়দায় ঘোষিত হয়। তারপর সমস্ত আলো জ্বলে ওঠে—অডিটরিয়ামেরও। সে আলোর শক্তি এতই বেশী যে, অডিটরিয়ামে একটা স্ঁচ পড়লেও তাও খুঁজে বের করা যায়। অভিনয়ের সব কিছুই দর্শকদের সামনে হতে থাকে। সেখানে লুকোচুরির কিছু নেই। মায়ারহোল্ড থিয়েটারের বৈশিষ্ট একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করলেই আমাদের চোখে পড়বে। এসম্পর্কে তাঁর নিজের কথাই বলছি, কোন প্রশ্ন কারীকে জবাব দিতে যেয়ে মায়ারহোল্ড একদিন বলে ছিলেন, যখন কোন ভাস্কর্য শিল্প প্রদর্শনীর আমরা টিকিট ক্রয় করি, টিকিট ক্রয় করবার পূর্বেই আমরা জানি আমরা যে-আবক্ষমূর্তি দেখতে যাচ্ছি—তা সত্যিকারের রক্ত মাংসে গড়া নয়। তার চোখ আমাদের স্বাভাবিক চোখ নয়, কাঁচ দিয়েও তাকে কৃত্রিম উপায়ে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়নি। আমরা যে চোখ দেখবো তা পাথরের।" "We shall receive the impression of people of animals while fully realizing that they are *stone* people and *stone* animals."

এই ভাবে আমাদের Conventionগড়ে ওঠে। আমরা যেটা দেখতে যাচ্ছি, ঠিক সেই জিনিষটি না হলেও—সেই জিনিষটি বলে যে জিনিষটি আমাদের দেখানো হচ্ছে—তাকে মূল জিনিষটি বলে গ্রহণ করবার যে বোধশক্তি—সেইটেই Convention। মায়ারহোল্ড বলেন, মঞ্চে যে Convention বিরাজ করছে তা যদি আমরা অনুধাবন করি তাহলে মঞ্চের স্বাভাবিকতা (naturalism) ফুটিয়ে তুলবার প্রচেষ্টা নিরর্থক মনে হবে, কারণ তাহলেই বৈপরীত্য (Contradiction) গুলি দেখা দেবে।' তিন ঘণ্টার ভিতর দিন, তারিখ, মাস, বছরের স্বাভাবিকতা ফুটিয়ে তোলা নাট্যকারের পক্ষে যেমনি অসম্ভব, তেমনি প্রয়োজকের পক্ষেও। কোন স্থানে নাট্যকার হয়ত লিখেছেন তার নায়ক কলকাতা থেকে দিল্লী গেল—কলকাতা থেকে দিল্লীর ব্যবধান হয়ত ডদিনেরও বেশী অথচ প্রয়োজক অভিনয়ের সময় একদৃশ্যের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৫ মিনিটেই হয়ত নায়ককে নিয়ে দিল্লী হাজির করলেন—। দর্শকেরা একথা জানেন যে তাঁরা থিয়েটার দেখতে এসেছেন তাই ঐ ১৫ মিনিটে দিল্লী যাওয়াটাই মেনে নেবেন। এইযে মেনে নেওয়া এইটেই Convention। তবে দর্শক মনে নায়কের দিল্লী যাওয়াটা প্রযোজককে কতগুলি সাংকেতিকের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে। যিনি যত গভীর ভাবে এবং সু-চতুর ভাবে দর্শক মনে দিল্লী যাবার সুস্পষ্ট ছাপ দিতে পারবেন তিনিই ওস্তাদ প্রয়োগ কর্তা। এই ছাপ বা ধারনা (impression) পাবার জন্যই দর্শকেরা প্রেক্ষাগৃহে আসেন। কী ভাবে দর্শকমনে এই ছাপ দিতে হবে—অন্য কথায় কী ভাবে দর্শকের Conventionকে জাগিয়ে তুলতে হবে, সেটা নির্ভর করে প্রযোজক বা প্রয়োগকর্তার উপর। মায়ারহোল্ড বলেন, তাই যদি সত্যি হয় তবে বাস্তবের একটা ফটোগ্রাফিক রূপের কী প্রয়োজন? মনে করুন মঞ্চের উপর কোন বনের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে—বনের কতগুলি Symbol বা নিদর্শন দিয়ে বন ফুটিয়ে তুলতে হবে—এবং এই Symbol বা নিদর্শন—কোনটা কী জন্য গ্রহণ করা হ'লো মায়ারহোল্ড তা তার দর্শকদের জানিয়ে দিতে চান 'Meyerhold does not wish to make a forest but he wants

to make us see a forest. মায়ারহোল্ডের মতে, বাস্তবতা মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে হবে না—তুলতে হবে দর্শকদের মনে। মঞ্চ হচ্ছে একটা আর্শী—বা Convention—প্রতিফলক—তার ভিতর আমরা বাস্তবকে অনুভব করবো। যে যে উপায়ে এই বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে হবে—তা নির্ভর করে প্রয়োগকর্তা বা প্রযোজকের নৈপুণ্যের উপর। এই জন্য প্রয়োগকর্তা বা প্রযোজকের অংকন, ভাস্কর্য, সংগীত, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সর্ববিষয়েই জ্ঞান থাকা চাই প্রচুর।

"The producer must have a knowledge of painting; sculpture, music, architecture, literature, history etc, so as to have at his finger tips all and every means with which to conjure in the mind of the spectator what he and the author have collectively agreed upon."

প্যাভলোভের (Pavlov)-এর Theory of Associationএর প্রভাব রয়েছে মায়ারহোল্ডের পর যথেষ্ট। এই থিয়োরী নাট্যমঞ্চকে যথেষ্ট সাহায্য করছে, বিশেষ করে তাঁর নিজের নাট্যমঞ্চকে। এই থিয়োরীর মূল সূত্র হচ্ছে, দর্শকদের একীভূত শক্তি। দর্শকদের এই একীভূত শক্তি যেন অতি সূক্ষ্ম তারের একটি যন্ত্র। সুনিপুণ যন্ত্রীর হাতেই এ যন্ত্র বাজবে—নইলে বেসুরো গাইবে। তাই প্রয়োগশিল্পী এই যন্ত্রটীকে খুব সতর্কতার সংগে নাড়াচাড়া করবেন। বহুলোকের সমষ্টি নিয়ে দর্শকমণ্ডলী। বিভিন্ন রুচি—বিভিন্ন চিন্তা ও ভাব রয়েছে বিভিন্ন জনের মনে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে পৃথক। এক দৃশ্য দেখে একজনের মনে যে ভাবের উদয় হচ্ছে, অপর জনের মনে তার বিপরীত ভাব দানা বেঁধে উঠছে। একই দৃশ্য দেখে সকলের মনে যাতে একই ভাবের উদয় হয় এবং যে অর্থে ঐ দৃশ্যটীর অবতারণা করা হয়েছে সেই অর্থই যাতে দর্শকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেইটেই হচ্ছে প্রয়োগকর্তার লক্ষ্য

মস্কো আর্ট থিয়েটারে অভিনীত ওসট্রোভস্কির 'দি স্টরম' নাটকের একটা দৃশ্য

সেকেণ্ড মস্কো আর্ট থিয়েটারে অভিনীত জর্জ ফ্লেচার রচিত 'দি স্পেনীস প্রিস্ট' নাটকের একটী দৃশ্য। এই নাটকটি প্রযোজনা করেছিলেন এস্, জি, বারম্যান্ ইনি একজন মহিলা

করবার। প্রয়োগকর্তাকে তার দর্শকদের প্রথমে জানতে হবে—দর্শকদের মনের প্রতিটি অলিগলির সন্ধান রাখতে হবে—তাদের ঘুমন্ত বোধশক্তিকে জাগাতে হবে—এমনকি উপলব্ধি করবার নূতন পদ্ধতি বা শক্তিও সৃষ্টি করতে হবে।

আমরা প্রত্যেকে জানি এবং বুঝি যে থিয়েটারে যেয়ে কতকগুলি বিষয় আমাদের মেনে নিতে হবেই। যেমন অভিনেতা অভিনেত্রী হয়ত গোপনে পরামর্শ করছেন—এই গোপন কথাটা গোপন হ'লেও এমনি ভাবে তাদের বলতে হবে—যে প্রতিটি দর্শকের কাণেই যাতে পৌঁছায়—চীৎকার করে বলা ঐ গোপন কথাটী ভাব এবং অবস্থার কথা মনে করে গোপন কথা বলেই আমাদের কাছে প্রকাশ পায় বা আমরা মেনে নি। এইটেই হচ্ছে Convention। এই Conventionই থিয়েটারের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। এই Convention যদি ঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত না হয়—তখনই দর্শকদের মনে বিপরীত ভাবের উদয় হয়—নাট্য-রস গ্রহণে যেমনি তা ব্যাঘাত ঘটায় তেমনি রস পরিবেশনের দিক থেকেও তা হ'য়ে উঠে নিরর্থক।

মায়ারহোল্ড এই Convention সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন, "The Convention is all important. For this is the means whereby the audience is made to see what we want to see." মায়ারহোল্ড বলেন, মাতালের চরিত্রে অভিনয় করতে হ'লে মাতালের সবকিছুই যে অভিনেতার অনুকরণ করতে হবে তার কোন অর্থ নেই। অভিনেতা যে একজন মাতাল চরিত্রে অভিনয় করছেন, এইটুকু বুঝিয়ে দিতে হবে তার অভিনয়ের ভিতর দিয়ে দর্শকদের। মাতাল চরিত্রের বৈশিষ্টগুলি ফুটিয়ে তুলতে হবে তাকে। এই ভাবেই নাটক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভ করে।

দর্শকদের কাছে মায়ারহোল্ডের দাবী অনেক। দর্শকের ব্যক্তিত্বকে তিনি অবমাননা করতে চান না—তিনি চাননা যে তাঁর দর্শকেরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ

'দি স্টেট জুয়িস থিয়েটার অফ্ মস্কো'তে অভিনীত সেক্সপীয়র রচিত 'কীংলীয়র' নাটকের একটী দৃশ্য। এস, এম, মিখোয়েলস নাটকখানি প্রযোজনা করেন এবং কীংলীয়ারের ভূমিকায় অভিনয় করেন

করবেন। তিনি চান, সমস্ত বিষয়গুলি খোলাখুলি-ভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে। দর্শকদের কী তিনি বলছেন—কীভাবে বলছেন—কী বলতে চেয়েছেন—কীভাবে বলতে চেয়েছেন—সবই দর্শকদের তিনি জানিয়ে দিতে চান পরিষ্কার করে। মায়ারহোল্ড সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ নাট্য-রসিক, Andrevan Gyseghem বলেছেন, "The theatre is a place of illusions—true, but Meyerhold wants his audience to know that fully. He wants us to see how he creates that illusion'." তাই কীভাবে মঞ্চে আলোক নিয়ন্ত্রণ করা হয়, দৃশ্য রচনা করা হয়—পট পরিবর্তন করা হয় কোন কিছুই মায়ারহোল্ড দর্শকদের লুকিয়ে করেন না। অভিনয়ের সময় দর্শকদের সামনেই এসব করা হয়। তবে খুব সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোকদ্বারা। তাই মায়ারহোল্ড বলেন, কোত্থেকে আলো আসছে—দৃশ্যটী কীভাবে পালটে দেওয়া হচ্ছে, এগুলি যদি দর্শকেরা দেখেন তাতে লজ্জার কিছু নেই—কারণ তাঁরা জানেন, তাঁরা থিয়েটার দেখতেই এসেছেন। মায়ারহোল্ড বলেন, যখনই কোন দর্শক থিয়েটারে আসেন, তাঁর মনে রাখতে হবে বাড়ী বা রাস্তায় যা ঘটতে পারে বা ঘটে এখানে তা ফুটিয়ে তোলা যায় না হুবহু। এখানে বাড়ী বা রাস্তার ঘটনা-গুলিকে ঘটিয়ে দেখানো হয়—It is being done-created-worked.

মায়ারহোল্ডের মতে, 'Art must be scientific otherwise we are fooling people' প্রত্যেক থিয়েটারের সংগে সংশ্লিষ্ট একটি করে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের তিনি পক্ষপাতী। মায়ারহোল্ডের নিজের থিয়েটারেও এর ব্যতিক্রম নেই। আলো, পোষাক, পরিচ্ছদ, দৃশ্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে গবেষণা করবার জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ রয়েছে।

ইগর বুলিচেভ-এর রূপসজ্জায় ভাখতানগোভ থিয়েটারের খ্যাতনামা অভিনেতা ভি, ইউ সুচকীন

এছাড়া আর একদল লোক আছেন, যাঁদের কর্তব্য হচ্ছে মায়ারহোল্ড যখন কোন নাটক পরিচালনা করতে থাকেন—পোষাক-পরিচ্ছদ—আলো, নাটকের প্রয়োজন এবং চাহিদানুযায়ী যে যে উপদেশ তিনি দিতে থাকেন, এঁরা তা টুকে নেন। তারপর বিভিন্ন বিভাগের গবেষকদের ডাক পড়ে, তাঁরা সেইমত সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ঠিক করে রাখেন। মায়ারহোল্ডের কাছে যারা শিক্ষানবীশ ভাবে থাকেন—এই রিহার্সেলই হচ্ছে তাদের শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস। এছাড়া অবশ্য দৈহিক ব্যায়াম থেকে আরম্ভ করে কি ভাবে হাসতে হয়, কথা বলতে হয়, কাঁদতে হয়, চলতে হয়, দৌড়তে হয়, প্রত্যেক বিষয়ে হাতে কলমে কার্যকরী শিক্ষা (practical training) গ্রহণ করতে হয়।

নাট্যকার এবং প্রয়োগকর্তা এই দুইয়ের ভিতর কার দায়িত্ব বেশী এ বিষয়ে মায়ারহোল্ডকে জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে, মায়ারহোল্ড তার সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন ;

"Neither—it is the thought contained in the play which must hold first place in our plan while working on a play, This thought has determined the play. Dialectically, the thought appears first and from this develops the play."

বিপ্লব আমলের নবীন মায়ারহোল্ড—আজ পৌঢ়ত্বের সীমানা পেরিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের সজীবতা এখনও কালের গহ্বরে নির্জীব হয়ে যায়নি—১৯০৫এর বিপ্লবী মায়ারহোল্ড আজও—তেমনি বিপ্লবী মন নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্যমঞ্চকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। পৃথিবীর নানা দিগদেশাগত নাট্যানুরাগীরা মায়ারহোল্ডের প্রতিভার কথা শুনে—ভীড় জমায়—সোভিয়েট রাশিয়ার এই ভরতমুনির কাছে নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য। মায়ারহোল্ডের থিয়েটারে যেয়ে উপস্থিত হ'লে—বিশেষ করে যখন কোন নাটকের মহলা চলে—মায়ারহোল্ড যখন তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দিতে বসেন—মনে হবে যেন একটা আন্তর্জাতিক মেলা বসেছে। বর্তমান যুদ্ধের পূর্বের কথাই বলছি—জাপান, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, চেকোশ্লাভাকিয়া—সব দেশের শিক্ষার্থীরা এসে এই প্রতিভাধর বিপ্লবী নাট্যগুরুর পদপ্রান্তে হাজির হয়েছে। মঞ্চের উপর নাটকের রিহার্সেল বসেছে—তিনি অডিটরিয়ামের এক কোনে এক টেবিলের সামনে বসে আছেন। চার পার্শ্বে সব শিক্ষার্থীরা। অভিনেতাদের সামান্য একটা কথা অস্পষ্ট হলে—সামান্য একটা ভুল চুক হলে—মায়ারহোল্ড—অমনি বাধা দিয়ে ওঠেন—"না—না, কিছু হচ্ছেনা"—তারপর নিজে মঞ্চের ওপর উঠে বারবার দেখিয়ে দিতে থাকেন। যতক্ষণ না অভিনেতা

ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারবেন - মায়ারহোল্ড তাকে সহজে ছাড়বেন না। এমনি ভাবে একখানি নাটকের রিহার্সেল চলে মাসের পর মাস। প্রয়োজন হলে বছর কেটে গেলেও আপত্তি নেই। যতক্ষণ না নিখুঁত হবে, সে নাটক পাদপ্রদীপর সামনে আর আত্মপ্রকাশ করবে না। আমাদের প্রযোজকেরা এর আংশিক যত্নবান হলেও কোন কথাই ছিল না। অবশ্য—"It is only possible in a country where the economic position of the whole theatre staff is secure.

* * *

বৈদেশিকদের কাছে রাশিয়ার নাট্যজগত সম্পর্কে যখনই কোন ছবি জাগে—মস্কো আর্ট থিয়েটারের কথা সর্ব প্রথমে তাদের মনে ভেসে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। এখানকার পরিচালক ও শিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্যের কথা আমাদের কাণে এসেও আঘাত করে। সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্যমঞ্চের ইতিহাসের মূলে মায়ারহোল্ড থিয়েটার এবং ষ্টানিশ্লাভস্কি পরিচালিত মস্কো আর্ট থিয়েটার বেশীরভাগ স্থান অধিকার করে আছে। "Meyerhold and Stanislavsky can be called the two main springs of the Soviet theatre in so for as its formal development is concerned. The influence of one or the other is to be felt in every theatre."

ইউজেন ভাখ্তানগভ্

ভাখ্তানগভ্ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা—সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্য জগত যাঁর কাছে অনেকদিক দিয়ে ঋণী। আজ আর ইহলোকে তিনি নেই—কিন্তু তাঁর প্রতিভা তাঁকে অমর করে রেখেছে—তাঁর সমস্ত কাজের ভার গ্রহণ করেছেন তাঁর সুদক্ষ স্ত্রী।

মায়ারহোল্ড থিয়েটারের কথা প্রারম্ভেই বলেছি। মস্কো আর্ট থিয়েটার সম্পর্কে—এখন দু'চারটী কথা বলতে প্রয়াস পাবো। মায়ারহোল্ড এবং মস্কো আর্ট থিয়েটারের পার্থক্যটুকু পাঠক সাধারণ অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। মস্কোতে যতগুলি থিয়েটার আছে তার ভিতর মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রবেশপত্র সংগ্রহ করাই বোধহয় সবচেয়ে বেশী কঠিন। অবশ্য বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। এই যে ভীড় —এ যে বিশেষ কোন নাটক বা বিশেষ কোন অভিনেতার আকর্ষণে তা নয়—এ ভীড় চিরাচরিত। এ থেকেই সোভিয়েট রাশিয়ায় মঞ্চের জনপ্রিয়তা আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি। আমাদের এখানকার মতো গুণ্ডার উপদ্রব না থাকলেও, অনেকে পূর্বে থেকেই টিকিট কিনে পরে চড়া দামে বিক্রী করে থাকে। তবে এখানে যেমন কর্তৃপক্ষ বা দর্শক তার প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় তার ব্যতিক্রম দেখতে পাই। সে

রকম দর্শকের নজরে পড়লে এই চড়াদামে যে টিকিট বিক্রী করে এবং যিনি কেনেন—দুজনেরই নাস্তানাবুদের শেষ থাকে না। তারপর কর্তৃপক্ষের নজরে পড়লে ত কথাই নেই। এজন্য যতপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করতে একটুকুও গাফিলতি করেন না।

মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রবেশপথে এসেই মায়ারহোল্ড থিয়েটারের পার্থক্য চোখে পড়তে থাকবে। শুধু 'মঞ্চ'ই যে দু'য়ের পৃথক তা নয়—প্রেক্ষাগৃহেও এই পার্থক্যের ছাপ সুস্পষ্ট। চতুর্দিকে তাকিয়ে জার আমলের ছাপ চোখে পড়াটাও এখানে অস্বাভাবিক নয়। এখানকার দর্শকেরাও যেন ভিন্ন প্রকৃতির—অন্ততঃ এখানে আসবার সময় যেন খুব সতর্ক হয়ে এসে থাকেন। অডিটরিয়ামটিও আভিজাত্য গরিমায় গরীয়সী। বৈদেশিকদের কাছে মস্কো আর্ট থিয়েটার যতই খ্যাতি লাভ করুক—মায়ারহোল্ড এবং মস্কো থিয়েটারের পার্থক্য বোঝা যেতে পারে মাত্র একটী কথায়—মায়ারহোল্ড থিয়েটার সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণের—প্রাণের থিয়েটার, মস্কো আর্ট থিয়েটার তাদের শ্রদ্ধার থিয়েটার। শিল্প নৈপুণ্যের দিক থেকে মস্কো আর্ট থিয়েটার যে অনেক উন্নত এবিষয়ে অনেকেই একমত। এবিষয়ে Andre Van Gyseghem এর অভিমত হচ্ছে, "Meyerhold can re-interpret a classic and contribute some thing valuable to a new audience, but to show something new in an old manner is no advance in theatrical art. It is not even marking time. It is a step backward. Stanislavsky's method has been developed to the point of perfection."

আমরা অনেকেই মনে করতে পারি, বিপ্লবের হাত থেকে মস্কো আর্ট থিয়েটার কী করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখলো—যে বিপ্লব রাশিয়ার পুরোন ভাবধারাকে সমূলে ধ্বংস করে তার স্তূপের উপর নূতন জগত তৈরী করেছে—এই পুরোন ভাবধারাই প্রবাহিত হতো মস্কো থিয়েটারের ভিতর দিয়ে। কিন্তু এবিষয়ে একটু অনুধাবন করলে সহজেই অনুমান করা যাবে—কম্যুনিষ্ট পার্টি ভবিষ্যৎ সমাজের পক্ষে

ভাগতানগোভ থিয়েটারে অভিনীত ম্যাক্সিম গর্কী রচিত 'ইগর বুলিচেভ'এর একটী দৃশ্য

'থিয়েটার অফ্ রিভোলিউশন'-এ সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' নাট্যাভিনয়ের একটী দৃশ্য।

যা মঙ্গলজনক—যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাকে ধ্বংস করে কোন দিনই অদূরদর্শীতার পরিচয় দেননি। বলসেভিক পার্টির নেতারা বুঝেছিলেন, রাশিয়ার ঐতিহ্য এবং কৃষ্টির ক্ষেত্রে মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রচুর—তাই তাকে ধ্বংস না করে—নূতন রূপে তাকে সংস্কার করে নেবার জন্যেই বিপ্লবের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছিলেন। তাই বিপ্লবী নেতা লেনিনের দূরদর্শীতার কথা আজ মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, এই "মস্কো আর্ট থিয়েটার তার যে আভিজাত্য ও অভিজ্ঞতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে কথা চিন্তা করে তাকে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করতেই হবে—একদিন এই মস্কো থিয়েটার বিপ্লবী থিয়েটার গুলিকে বহু দিক দিয়ে যে সাহায্য করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। নূতন নূতন অভিনেতারা এসে একে নূতন দীপ্তিতে দীপ্তিমান করে তুলবেন।" লেনিনের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। ১৯১৮ খৃঃ থেকে মস্কো আর্ট থিয়েটার নূতনের আগমন বার্তা শোনাতে লাগলো। লেনিনগ্রাদের 'এ্যাকাডেমিক থিয়েটার' কে যে উদ্দেশ্যে রক্ষা করা হয়েছিল মস্কো আর্ট থিয়েটারকে সেই উদ্দেশ্যেই বাঁচিয়ে তোলা হয়েছিল। মায়ারহোল্ড থিয়েটার থেকে মস্কো আর্ট থিয়েটারের পার্থক্য অস্পষ্ট নয়। "In the theatre of Meyerhold a very vital principle in the Soviet theatre becomes clear—the aim of drawing the majority into an active relationship with the art of the theatre where they shall participate emotionally not in isolated instances but in unified co operation. Such an aim is in absolute opposition to those theories which actuated the naturalistic School of the Moscow Art Theatre, where the performance was conceived as a complete whole,

independent of the reaction of the audience who might as well not have been in the theatre at all."

পঞ্চাশেরও বেশী মস্কো আর্ট থিয়েটারের বয়স হতে চললো। রাশিয়ার Maly Theatreকে এর সমবয়সী বলা চলে। একমাত্র এই Maly Theatre ছাড়া আর কোন থিয়েটারই এর চেয়ে বেশী বয়সের নয়।

১৮৯৮ খৃঃ। দু'জন প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর আদর্শগত নিষ্ঠা—ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই—মস্কো আর্ট থিয়েটারের জন্ম হয়। মস্কো আর্ট থিয়েটারের ইতিহাস ঘাটতে ঘাটতে Slavonic Bazaar এর একটী রেঁস্তোরার কথা স্বতঃই ভেসে ওঠে। আগন্তকদের ভীড়ে রেঁস্তোরাটী গমগম হ'য়ে উঠেছে। 'ওয়েটার'গুলো ব্যতিব্যস্ত। এখান থেকে ওখানে—ওখান থেকে সেখানে। লোক আসছে—যাচ্ছে। বিরামহীন। এই রেঁস্তোরার এক কোণে একটী টেবিল দখল ক'রে দু'জন লোক বসেছিল, যাঁদের আর উঠে যাবার খেয়াল নেই। বসে আছেত আছেই। নিঃশেষিত সিগারেটের খণ্ড স্তুপীকৃত হয়ে উঠেছে পাশে—যেন পাল্লা দিয়ে এক একজন পর পর কাফির অর্ডার দিয়ে যাচ্ছেন। কাফি আসছে। শেষ হচ্ছে। আবার আসছে। বিরামহীন ভাবে দুজনে কথা বলে যাচ্ছেন। কাফি শেষ করছেন —আর সিগারেট পোড়াচ্ছেন। এঁদের আলাপ আলোচনার হাবভাব দেখে মনে হয়—কোন একটা জটিল সমস্যা নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে উত্তেজিত হ'য়ে উঠছেন। এই উত্তেজনা দিনের পর রাত—

লালফৌজের ভিস্নেভস্কী রচিত 'দি অপটিমিসটিক ট্রাজেডী'র একটী দৃশ্য। নাটকটী ক্যামারণী থিয়েটারে অভিনীত হয়।

ভাখতানগোভ থিয়েটারে অভিনীত সেক্সপীয়রের হেমলেটের একটী দৃশ্য।

রাতের পর দিন—এমনিভাবে তাঁদের ঐ একই বিষয় নিয়ে আলোচনায় মত্ত রেখেছে।

এঁরা হচ্ছেন নেমীরোভিচ দাঁসেঁকো (Nemiro-Vitch-Danchenko) এবং কন্সটানটিন ষ্টানিস্লাভস্কি (Constantin Stanislavsky)। রাশিয়ার তদানীন্তন মঞ্চের অবস্থা তাঁদের ব্যথিত করে তুলেছিল—আদর্শহীন মঞ্চকে আদর্শ মহিমায় মহিমান্বিত ক'রে তুলবার জন্য এঁরা বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠেছিলেন। দাঁসেঁকো প্রতিভা-সম্পন্ন সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং Philharmonic Dramatic Theatre এর ছিলেন সর্বময় কর্তা। এঁর ভাষার স্বচ্ছ ও সুন্দর গতি তখন অনেককেই মুগ্ধ করেছিল। সেন্ট পিটার্সবার্গের State Academic Theatre এর 'Pseudo classicism' এবং Maly Theatreএর 'Conventional realism' তাঁর অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। ষ্টানিস্লাভস্কি তদানীন্তন থিয়েটার জগতের সর্বপ্রকার পদ্ধতির উপরই বিরূপ ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে একটী করে নূতন অভিনয় তদানীন্তন মস্কো থিয়েটারে প্রায়ই দেখা যেত। একমাস ধরে খুব কম নাটকেরই মহলা চলতো। অভিনেতারা মেসিনের মত পরিচালিত হতে লাগলো। একএকটি বিশেষ চরিত্রের জন্য যেন ফরমুলা বেঁধে দেওয়া হলো। যেমন, খলচরিত্রের অভিনয় করবার জন্য কতকগুলি হাব ভাব এর তালিকা করে দেওয়া হলো। অধঃপাতিত শিল্প প্রতিমার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁসেঁকো এবং ষ্টানিস্লাভস্কি প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হলেন। নিজেদের আজীবন সাধনার দ্বারা নাট্য শিল্পের উন্নতির জন্যে তাঁরা বদ্ধ পরিকর হলেন।

রাশিয়ার ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটা বছর নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধিজীবীদের,আভিজাত্যগরীমায় গর্বিত জারতন্ত্রের প্রাধান্য ধীরে ধীরে লোপ পেতে লাগলো। বণিক শক্তির প্রাধান্যে বুর্জোয়া শক্তির ধীরে ধীরে আত্ম-বিকাশ দেখা দিল, পুরোন মালিকদের হাত থেকে জমি নূতন বুর্জোয়া মালিকদের হাতে এসে পড়তে লাগলো। শাসক সম্প্রদায় নানান অসাধুতায় জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। ক্ষমতা লোলুপ বুর্জোয়া দল জারের বিরুদ্ধে মাথা উচু করে দাঁড়ালো। বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করলো। সুবিধাবাদী বুর্জোয়াদের আপোষ রফা—বিপ্লব বিমুখীনতার ইতিহাসও আমাদের অজানা নেই—তাই সেকথা যাক। সমস্ত প্রগতিবাদীরাই এই বিপ্লবে

যোগদান করেছিলেন—তবে একমাত্র বলসেভিক পার্টি ছাড়া—শেষপর্যন্ত অন্য কোন দলের সেরূপ বিপ্লবী মনের আমরা পরিচয় পাই না। দাঁসেঁকো বুদ্ধিজীবিদের (Intelligentsia)র পক্ষ থেকে এবং ষ্টানিশ্লাভস্কি বুর্জোয়া বণিকতন্ত্রের (Trade-Capitalism)এর পক্ষথেকে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন। এঁরা যখন থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন তখন বড় গলায় প্রচার করলেন যে, সর্বপ্রকার রাজনীতির বাইরে তাঁরা। কিন্তু এঁদের প্রথম নাটক Alexi Tolstoi এর Tsar Feodar যখন অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হ'লো—তখন থেকে কারোর বুঝতে বেগ পেতে হ'লো না যে এঁরা বণিকতন্ত্রের নরমপন্থীর দলের (Liberal-trade-Capitalism) প্রতি সহানুভূতিশীল। এই নাটকখানিতে Tsar Nikolaiর রাজত্বকালই স্থান পেয়েছে। এবং এর প্রথম রচনাকালে সরকার থেকে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল—অবশ্য অভিনয়ের সময় দাঁসেঁকো এই নিষেধাজ্ঞা তুলিয়ে নিতে পেরেছিলেন! Old Hermitage Theatre, Popular Art Theatre এই নূতন নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। অবশ্য পরবর্তীকালে ম্যাক্সিম গর্কী মস্কো আর্ট থিয়েটার নাম দেন।

সে কী উত্তেজনা! অন্ধকারের ভিতর যবনিকা উঠে গেল। যা কেউ কোনদিন শোনেনি। এর পূর্বে প্রজ্বলিত আলোকমালার সামনে যবনিকা উঠতো। আর আজ! তার বিপরীত! এতে আশ্চর্যের কারণ আছে বৈ কী? শুধু এই পর্দা উত্তোলনই নয়, এতদিন যে পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে অভিনয় হ'তো—তার বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদ স্বরূপ যেন এদের আত্মপ্রকাশ। ষ্টানিশ্লাভস্কি দেখিয়ে দিলেন, উন্নত চিন্তাশক্তি ও প্রতিভার সমন্বয়ে নাট্যমঞ্চকে কতখানি উন্নতপর্যায়ে টেনে নেওয়া যায়। অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয়ের সময় পরস্পরের দিকে চেয়েই কথা বলছে—দর্শকদের দিকে চেয়ে নয়। প্রতিটি চরিত্রই যেন ঘটছে চোখের সামনে। অভিনীত হচ্ছে না। স্বগতোক্তির অস্বাভাবিকতা পর্যন্ত নেই। এবং যে পদ্ধতিতে অভিনেতারা উচ্চারণ কচ্ছিলেন—তা শব্দ এবং ভাবের দিক লক্ষ্য রেখে—ছন্দের দিক থেকে নয়। এরূপ অভিনয় কেউ কোনদিন দেখেনি। পুরোন দল প্রতিবাদ জানালো—নূতনের অভিনন্দনে দাঁসেঁকো ও ষ্টানিশ্লাভস্কির সকল পরিশ্রম আশার আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। সারা সহর এই নূতন অভিনয় পদ্ধতির জল্পনা কল্পনায় মেতে উঠলো। পুরোন থিয়েটারগুলির অস্বাভাবিকতাকে দূরে ঠেলে তিনি বাস্তবকে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অভিনেতারা এখানে অভিনয় করতে আসবেন না—তাঁরা হবেন এক একটী চরিত্র, এই হ'লো ষ্টানিশ্লাভস্কির মূল কথা। মঞ্চের বাইরে ব্যক্তিগত জীবনে যেমনি তারা চলাফেরা করেন, কথাবার্তা বলেন, এখানেও ঠিক তেমনি ভাবে তাঁরা চলবেন। অভিনয়ের সময় অভিনেতারা তাঁর চরিত্রের সংস্পর্শের লোক ছাড়া বাইরের কারোর সংগে কথাবার্তা বলতে পারবেন না। তিনি কেবল চিন্তা করবেন তাঁর চরিত্র—ডুবে থাকবেন তাঁর চরিত্রে, এমনি ভাবে নাটকের চরিত্রকে রূপায়িত করতে হবে। অভিনীত চরিত্রকে তাঁর নিজের মাঝে সৃষ্টি করে নিতে হবে। "The actor will be the creator of his character. যে চরিত্রটী তাঁকে অভিনয় করতে হবে—সেটী কোন যুগের—তখনকার রীতিনীতি সব কিছুই অভিনেতাকে আয়ত্ব করতে হবে। এই বোধ হয় সর্বপ্রথম রাশিয়াতে অভিনেতারা নাটকের চরিত্রের আনুগত্য স্বীকার করলেন অর্থাৎ যে চরিত্রে তাঁদের অভিনয় করতে হবে—সেই চরিত্রানুযায়ীই তাঁদের চলতে হবে—তাঁদের অনুযায়ী চরিত্রকে নয়। সমাজ এবং শিল্পের দিক দিয়ে ষ্টানিশ্লাভস্কি থিয়েটার ছিল প্রগতিবাদী। তাঁর অভিনেতারা আর যন্ত্রের মত পরিচালিত হলোনা—স্বাধীন চিন্তাশীল হয়ে উঠলেন তাঁরা—হয়ে উঠলেন নিজের নিজের চরিত্রের স্রষ্টা।

এঁদের দুজনের সংগে এসে যোগ দিলেন চেকভ—Anton Tchekov। যাঁর নাম সাহিত্যানুরাগীদের কাছে অপরিচিত নয়। তিনি একটী এরূপ থিয়েটারই খুঁজছিলেন। মস্কো আর্ট থিয়েটার—এবং চেকভ তাই

শুধু বর্তমানকে নিয়েই নয়—সোভিয়েট রাশিয়ার ভবিষ্যৎ জনগণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও সোভিয়েট সরকার কম চিন্তাশীল নন—তাই সোভিয়েট নাট্যমঞ্চে ছোটদের কথা একটী বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এর সাক্ষ্য দেবে মস্কোর 'Central House of Children's Art Education.' এদের হাতেই ছোটদের নাট্যমঞ্চের ভার মস্কো চিলড্রেনস থিয়েটারে অভিনীত 'দি টেল অফ দি ফিসার ম্যান এ্যাণ্ড ফিস' নাটকের একটী দৃশ্য।

পরস্পরের কৃতকার্যতায় কনেকখানি দায়ী। চিরাচরিত ধারা থেকে চেকভ নূতন ইংগিত দিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যে। সমসাময়িক জীবনের কথাই স্থান পেতে লাগলো তাঁর সাহিত্যে অর্থাৎ Disillusion & Pessimism of the Intelligentsia। ম্যাক্সিম গর্কী (Mxim Gorki) এর বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করলেন। তিনিই নাটকে সর্বপ্রথম শ্রেণী সংঘাত, শ্রেণী-বৈষম্য ফুটিয়ে তুললেন। মালিক এবং কর্মচারীর সম্বন্ধ ফুটিয়ে তুলতে—কর্মীচারিদের প্রতি তাঁর দরদী মনের পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর সাহিত্যে।

নাট্যকার হিসাবে গর্কীর সার্থকতা এখানেই। নাট্যরসের দিক থেকে যে গর্কী অপূর্ব রস পরিবেশন করলেন শুধু তাই নয়—শোষিত জনগণের প্রতিদিনকার মর্মভাঙা বেদনার কাহিনী তাঁর সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পেলো। এই কাহিনী নিছক কল্পনা নয়—শোষিত জনগণের প্রতিদিনের—প্রতি জনের বাস্তব জীবনের নির্মম সত্য কথা। চেকভ এবং গর্কীর পার্থক্য—মায়ারহোল্ড আর ষ্টানিশ্লাভস্কির পার্থক্য প্রায় একই। চেকভ তাঁর থিয়েটারকে উন্নত শিল্প গরীমায় গরিয়সী করবার জন্যে গগল, পুসকিন, অসট্রোভস্কি, ইবসন প্রভৃতির নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। মস্কো আর্ট থিয়েটারে অভিনীত নাটকগুলি দেখে তখন তার আদর্শ সম্পর্কে আমরা সহজেই অবহিত

হতে পারি। এবং এর ভিতর দিয়ে ১৯০৫ বিপ্লব ও তার পরবর্তী কালেও বুদ্ধিজীবিদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের সুস্পষ্ট ইংগিত পাই। অক্টোবর বিপ্লবের সময় এদের খোলস খসে সত্যিকারের রূপটা দেখা দিল। সর্বহারার দল যখন অস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো—ক্রাসনাইয়া প্রেসনিয়া (Krasnia Presnya)র রাস্তা যখন রক্তাক্ত হয়ে উঠলো তখন এরা আর আত্মগোপন করে থাকতে পারলো না। সংখ্যালঘিষ্ট পরাজিত বিপ্লবী দল থেকে প্রতিক্রিয়াশীলেরা সরে দাঁড়ালো। হামসুম (Hamsum) এর নাটক, এ্যাণ্ড্রেয়েভ (Andreyev)এর The life of man নাটক মস্কো আর্ট থিয়েটারকে জনসাধারণের কাছে পরিচিত করিয়ে দিল। 'দি লাইফ-অফ-ম্যান' নাটকের মূল আদর্শ, হচ্ছে—যার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই—অর্থাৎ মানুষ ভাগ্যকে অস্বীকার করতে পারে না!

১৯১৪ খৃঃ-এ দোস্তয়েভস্কীর (Dostoievsky) Devil নাটক অভিনীত হলো। গর্কী এই নাটকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। দাঁসেঁকো তার উত্তরে আর একবার চড়া গলায় বল্লেন, আমরা রাজনীতির ভিতর নেই। শিল্পের সংগে রাজনীতির কোন যোগ নেই। 'Our theatre is not concerned with politics but with ethics.' যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবিদের নৈরাশ্যবাদই মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রচার করতে লাগলো। এই মস্কো আর্ট থিয়েটারই ১৯১৭ বিপ্লবের কৃতকার্যতায় কীভাবে Proletarian Dictatorshipকে মেনে নিল সেইটেই হচ্ছে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। অবশ্য এই মস্কো আর্ট থিয়েটার, জনগণের হাতে যখন দেশের ক্ষমতা এলো—তখনও একবার চীৎকার করে জানিয়ে দিতে ভোলেনি, "এই সব কুলি মজুরের দল—যাদের শিল্পকলা সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই—দেশের কৃষ্টি—কলা তাদের হাতে একদম ডুবে যাবে।" কিন্তু সত্যিই কী ডুবে গেল! অন্ততঃ এদের এই ভুল ভাঙল তখন, যখন কমিসার অফ এডুকেশন (Commissar of Education)এর তরফ থেকে লুনাকারসকী (Lunacharsky) এলেন এঁদের সংগে শিল্পকলা ও থিয়েটারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে। তখন তাঁকে একজন সাধারণ শ্রেণীর কৃষ্টির সাধক বলেই এঁরা গ্রহণ করলেন্ না—এঁরা বুঝলেন দাঁসেঁকোর চেয়ে বহু বিষয়েই তিনি মঞ্চ সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ।

দেশের নূতন শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনে মস্কো আর্ট থিয়েটার এবার অংশ গ্রহণ না করে পারলো না। পূর্বের চেয়ে দেশের উন্নতির জন্য মস্কো আর্ট থিয়েটার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলো। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ধ্বংস যজ্ঞ সমাধান করে যে নূতন আদর্শ স্থাপিত হলো—তার জয় গানে মস্কো আর্ট থিয়েটার মেতে উঠলো। ষ্টানিশ্লাভস্কি তাঁদের অতীতের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের কথা নূতন করে দর্শকদের শোনালেন। মস্কো আর্ট থিয়েটার অতীত রাশিয়ার যেন একটা প্রতিফলক হয়ে রইলো। অতীতের শাসক সম্প্রদায়ের শোষণ নীতির কথা—বণিক ও বুদ্ধিজীবি প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতালোলুপ লোকেদের অত্যাচারের কাহিনী—পুরাণের উপাখ্যানের মত মস্কো আর্ট থিয়েটার বলে যেতে লাগলো—এই অতীত কাহিনী শুনে নূতন রাশিয়ার কত লোকই না অভিভূত হয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে গৃহে ফিরেছে। যে সব নাটক জারতন্ত্রের লজ্জা ও দুর্নীতির কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছিল—যে সব নাটক বুর্জোয়া শাসক সম্প্রদায়ের অত্যাচারের নির্মম সত্য নিয়ে লিখিত হয়েছিল—অথচ তা এতদিন অভিনীত হবার সুযোগ পায় নি—আজ তার অভিনয় দেখে রাশিয়ার জনগণ নিজেদের অতীতের দুঃখ দুর্দশার কথা বর্তমানের অরুণালোকিত প্রভাতে—তার রূপ দেখে—নিজেদের সংঘশক্তির কাছে পরম শ্রদ্ধার সংগে মাথা অবনত না করে পারলো না। অবশ্য ১৯২৭ খৃঃ পূর্ব পর্যন্তও মস্কো আর্ট থিয়েটারে কোন সোভিয়েট নাটক অভিনীত হয়নি। ১৯২৭ খৃঃ ইভানোভের (Ivanov) এর Armoured train অভিনীত হয়। এই নাটকটীর সময় ষ্টানিশ্লাভস্কি এবং সমাজতন্ত্রীদের ভিতর মতানৈক্য দেখা দেয়। ষ্টানিশ্লাভস্কির

মূল সূত্র হচ্ছে অভিনেতা অভিনীত চরিত্রের ভিতর একদম ডুবে যাবেন—তার পৃথক্ কোন সত্তা থাকবে না। তিনি চরিত্রটীর অভিনয় করবেন না, তিনিই হবেন চরিত্র। He does not paly the role, he is the role. সমাজ-তন্ত্রীদের বাস্তববাদ হলো—অভিনেতা চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যক্তিত্বকে ডুবিয়ে দেবেন না—শুধু বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়ে তুলবেন।

আজ মস্কো আর্ট থিয়েটার শুধু সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণেরই নয়—পৃথিবীর সর্বদেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। তার ঐতিহ্য, তার শিল্প নৈপুণ্য—সম্পর্কে আজ আর দ্বিমত কারো নেই। একটী জাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে রঙ্গমঞ্চ কতখানি কাজে আসতে পারে, রঙ্গমঞ্চের দায়িত্ব কতখানি—তার সাক্ষ দেবে সোভিয়েট রাশিয়ার মায়ার-হোল্ড থিয়েটার ও মস্কো আর্ট থিয়েটার। মায়ারহোল্ড এবং ষ্টানিশ্লাভস্কি হচ্ছেন সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্যমঞ্চের উৎস। এঁদের প্রভাব আজও মঞ্চের ওপর অপ্রতিহত গতিতেই বিরাজ করছে।

* * *

সোভিয়েট ইউনিয়নে যতগুলি মঞ্চগৃহ আছে সবগুলিই state দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটী মঞ্চগৃহও ব্যক্তিগত পরিচালনাধীনে নেই। সোভিয়েট ইউনিয়নের Comissariat of Education সংক্ষেপে যাকে Narkompros বলা হয়—এই বিভাগটীর হাতেই সমস্ত মঞ্চগুলির দায়িত্ব। কতগুলি মঞ্চগৃহ নারকমপ্রোসের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে—কতগুলি আবার পরোক্ষ কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। যে সব থিয়েটারগুলি শিল্প নৈপুণ্যে খ্যাতি অর্জন করেছে—যেমন মনে করুন মস্কো আর্ট থিয়েটার, মায়ারহোল্ড থিয়েটার, ভাখথানগভ থিয়েটার, দি অপেরা, ব্যালট থিয়েটার এগুলি নারকমপ্রোসের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে এবং এগুলিকে State theatres বলা হয়। দি থিয়েটার অফ রিভলিউসন, দি থিয়েটার অব স্যাটায়ার, মস্কোর রিয়ালিসটিক থিয়েটার এগুলি সোভিয়েট মস্কোর শিক্ষা বিভাগ এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্বারা পরিচালিত। অনেক সময় মঞ্চের পরিচালনায় দেখা যায়, যেমন ন্যাশনাল মাইনোরিটি থিয়েটার এগুলির

জীপ্সি থিয়েটারে অভিনীত একটী নাটকে সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী লাইলীয়া কোরনীয়া

উপর state এর পরোক্ষ কর্তৃত্ব রয়েছে। মঞ্চ পরিচালনায় যে শিক্ষা বিভাগের কথা বললাম—এরা নারকম-প্রোসেরই অধীনে—এবং এদের জবাবদিহি যা কিছু তা নারকমপ্রোসের কাছেই দিতে হবে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্তৃত্বের যে পার্থক্য রয়েছে এজন্য অনেক সময় ভারী রগড় দেখা যায় সোভিয়েট রাশিয়াতে। একবার রিয়ালিসটিক থিয়েটার একখানি নাটক মঞ্চস্থ করলেন—প্রযোজনার দিক থেকে নাটকখানি নিখুঁত রূপ পেলো। দর্শক এবং সাংবাদিকের প্রশংসা বাণী—ঐ নাটক এবং সংগে সংগে রিয়ালিসটিক থিয়েটারের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। নারকমপ্রোসের সভ্যরাও অনেকে এলেন নাটকখানি দেখতে। তাঁরাও মুগ্ধ হলেন। এবার কথা উঠলো Realistic theatre কে নারকমপ্রোসের প্রত্যক্ষ

কর্তৃত্বের ভিতর আনা হবে। সভ্যদের আগ্রহ খুব বেশী—কিন্তু Realistic theatre এর কর্তৃপক্ষ বসলেন বেঁকে। এই নাটকখানির অভূতপূর্ব সাফল্যের গৌরব তাঁরা নিজেরাই উপভোগ করবেন। নারকমপ্রোসকে অংশ দিতে যাবেন কেন? চলতি থিয়েটার কী ভাবে নারকমপ্রোসের কর্তৃত্বে আসে এ থেকে সে সম্পর্কে আমরা একটু আভাস পেলাম। নারকমপ্রোসের পরোক্ষ কর্তৃত্বাধীনে যে সব মঞ্চ রয়েছে—তারা যদি উন্নত শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারে তবেই তাদের নারকমপ্রোস বা কমিসারিয়াট অফ এডুকেশনএর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে আনা হবে। এবার প্রশ্ন জাগে, নূতন থিয়েটারের জন্ম হয় কী করে? সে কথাই বলছি। যেমন মনে করুন আপনি মস্কো আর্ট থিয়েটার বা অন্য কোন মঞ্চের একজন অভিজ্ঞ অভিনেতা। আপনার কয়েকজন যুবক ভক্ত Ostrovoskyর একখানা নাটক অভিনয় করবে বলে তাদের অভিলাষ জানালো—এবং আপনাকে নাট্য প্রযোজনার সকল দায়িত্ব গ্রহণে অনুরোধ জানালো। আপনি সে অনুরোধ রক্ষা না করে পারলেন না। নাটকের মূল সূত্র নিয়ে এই যুবকেরা আপনার অবসর সময়ে আপনাকে নিয়ে আলোচনা করলো। নাট্যকার—তাঁর ভংগিমা—নাটকের বিষয় বস্তু—উদ্দেশ্য এ সব নিয়ে আলোচনা করে প্রায় বছর খানেক কাটিয়ে দিল। তারপর রিহার্সেল দিয়ে—তারা নাটকটির অভিনয়ের ব্যবস্থা করলো। এই অভিনয়ে সাংবাদিক—নারকমপ্রোসের সভ্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করা হলো—এঁরা অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলেন। এই নূতন উৎসাহীদের উন্নত রুচিজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে—state তাদের জন্য স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। এবং প্রতিশ্রুতি মত সাহায্য করেন। প্রথমে এরা ছিল সৌখীন সম্প্রদায়—এদের বেশীর ভাগ কলকারখানায় বা অন্যত্র কাজ করতো—এখন সে সব ছেড়ে দিয়ে তারা থিয়েটারে যোগদান করলো—পেশারূপেই নাট্যকলাকে গ্রহণ করলো। এই ভাবে সোভিয়েট রাশিয়াতে নূতন থিয়েটারের জন্ম হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেকটী থিয়েটারে একজন করে artistic-director আছেন। থিয়েটারের শিল্পোৎকর্ষের জন্য তিনিই দায়ী। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে থিয়েটারের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনিই artistic director রূপে কাজ করেন। যেমন ষ্টানিস্লাভস্কি ছিলেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের, মায়ারহোল্ড তাঁর নিজের থিয়েটার—টাইরোভ (Tairov) কেমারনী থিয়েটারের (Kamerny Theatre), ওকলোপকোভ (Okhlopkov) রিয়ালিসষ্টিক থিয়েটারের ইত্যাদি।

যদি তিনি থিয়েটারের ব্যবস্থাপনার ভারগ্রহণ করতে না চান—তবে একজন ব্যবস্থাপক (administrator) নিয়োগ করা হয়। থিয়েটারের আর্থিক এবং অর্থনৈতিক সর্ববিষয়ের দায়িত্বের জন্য এই administrator এর জন্ম। নারকমপ্রোস আর থিয়েটারের ভিতর তিনি হলেন যোগসূত্র। তার দু'জন সহকারী থাকবে। এর একজন থাকবেন Communist partyর সভ্য। সাধারণতঃ প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী থিয়েটারগুলি সারা বছরের বাজেট তৈরী করে। প্রত্যেক থিয়েটারের এক একজন Literary-advisor থাকেন—তার কাজ হচ্ছে অভিনয়োপযোগী নাটক সংগ্রহ করে Literary-committe কে পড়িয়ে শোনানো। এই Literary committe বেশীর ভাগ সভ্যের নাটক এবং সাহিত্য সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান আছে। এরা সারা বছরের নাটক নির্বাচন করে, সেই অনুযায়ী বাজেট করে নারকমপ্রোসের কাছে পাঠাবে। নারকমপ্রোস সেটা অন্যায় মনে না করলে তাড়াতাড়িই পাশ করিয়ে দেন।

মঞ্চগৃহগুলির টিকিট বিক্রয়ের জন্য সোভিয়েট রাশিয়াতে ব্যাপক ব্যবস্থা দেখতে পাই। মস্কোতে এজন্য Central ticket office রয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে এদের অসংখ্য শাখা ছড়িয়ে আছে। এদের কাজ কী ভাবে চলে তারও একটু আভাস দিচ্ছি। কোন নাটকের ৬মাসের টিকিটই হয়ত এই Central Office কিনে নেবে। তারা তারপর এক একটা Block ঐ একই মূল্যে Trade Unions এর কাছে বিক্রী করবে। Trade Unions আবার অপেক্ষাকৃত অল্পদরে তার সভ্যদের কাছে বিক্রী করবে। এজন্য Box officeএ টিকিট

পাওয়া দায় হয়।—Box Office Manager অভিনেতা অভিনেত্রী এবং আরো অনেকের জন্য তার নিজের কাছে কতকগুলি free pass রেখে দেন। সাধারণতঃ ৯০% আসন বিক্রীর নিয়ম আছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার মঞ্চগৃহ গুলির কতকগুলি statistics এর উল্লেখ করে আমি আমার আলোচনা শেষ করবো। ১৯৩৪ সালের মাত্র R. S. F. S. Rতে ৩৫১টি পেশাদের রঙ্গমঞ্চ ছিল। হোয়াইট রাশিয়া, ইউক্রেন, ককেসাস, ইজবেকিস্তান, তাজিকীস্তান এবং তুর্কীস্তানের কথা ছেড়েই দিলাম। ১৯৩৫শের জানুয়ারী অবধি ছিল ৩৭৩টী। ১৯৩৬ খৃঃ ৪২৮টী।

সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্যমঞ্চের ইতিহাস বিপ্লবের ইতিহাস—সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যুত্থানের ইতিহাস। তাই সামান্য একটা প্রবন্ধে সে সম্পর্কে সবকথা ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। সোভিয়েট রাশিয়াতে যে দুটী থিয়েটারের প্রভাব সবচেয়ে বেশী, আমার বর্তমান প্রবন্ধে সেই মায়ারহোল্ড ও ষ্টানিস্লাভস্কির থিয়েটার সম্পর্কে দু'চারটী কথা বলবার প্রয়াস পেলেও এথেকে বোঝা যাবে রাষ্ট্র গঠনে—দেশের কৃষ্টি ও শিল্পের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্যমঞ্চের প্রভাব কতখানি। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রাধীনে বলেই সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্যমঞ্চ বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের মত পরাধীন দেশে যার কল্পনা করাও বাতুলতা। সারা ভারতবর্ষে মাত্র কলকাতার পাঁচটি পেশাদার স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ আমাদের নাট্যমঞ্চের দৈন্যতার সাক্ষ্য দেবে। ব্যক্তিগত পরিচালনাধীনে—এরা দেশ এবং জাতির কতখানি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছে—সেকথা আর নাই বা বল্লাম। কিন্তু এই বিরাট দেশে—বিরাট জনশক্তির মাঝে মায়ারহোল্ডের মত কোন বিপ্লবী নাট্যবীরের কি কোনদিনই আবির্ভাব হবে না—? এই বিরাট জনশক্তিকে যে বীর—যে প্রগতিবাদী প্রয়োগকর্তা—তাঁর নাট্যমঞ্চের মারফতে উদ্বুদ্ধ করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জয়মণ্ডিত করে তুলবেন?

কোথায় সে বীর? নিষ্পেষিত শোষিত—পদদলিত ভারত চাতকের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে তার নাট্যমঞ্চের দিকে—সুস্বাগতম হে বীর! তোমার আগমন—তমসার অন্ধকার দূর করে অরুণালোকিত প্রভাতের মত নূতন আশার বাণী ঘোষণা করুক—দিকে দিকে বাজুক তোমার বিজয় ঢক্কা—নগরে নগরে—পল্লীতে পল্লীতে—প্রাসাদ ও পর্ণ কুঠিরে উড়ুক তোমার সত্য—সাম্য—ও ন্যায়ের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত বিজয় পতাকা—ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতের জাতীয় পতাকা।

RAVISHINGLY
BEAUTIFUL
Because
ZULF-E-PUNJAB
HAIR OIL
adorns her pretty head, with the crowning glory of luxuriant hair &
OTTO MOOLCHAND
&
QUEEN OF THE NIGHT
spread her charms, all round, through the active agency of their romantic perfumes.
Beniram Moolchand
PERFUMERS
ITRA FACTORY • 32, KANAUJ

স্বকুমার দাসগুপ্তের
সাত নম্বর বাড়ীতে
দেখতে পাবেন শ্রীমতী
সাবিত্রীকে

ইউরোপে নব-নাট্য আন্দোলন

শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র

ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চ যে আন্দোলনে মেতে উঠেছিল নূতন নূতন প্রয়োগ পদ্ধতির প্রবর্তন করে—বর্তমান প্রবন্ধে বাংলার খ্যাতনামা নাট্যরসিক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র তাঁর যে আভাস দিয়েছেন—পাঠক সমাজ এথেকে এই নূতন প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারবেন বৈকী !

ইউরোপে নব নাট্য আন্দোলন সুরু হ'য়েছে প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর আগে থেকে। রাশিয়া, জার্মানী এই নব নাট্য-আন্দোলনের প্রথম অগ্রদূত এবং তারপর এই আন্দোলন ক্রমশঃ প্রসারিত হ'তে হ'তে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা সকল দেশেই ছড়িয়ে পড়ে এবং আজও নাটক ও নাট্য-প্রযোজনার নূতন নূতন ধারা ও পদ্ধতি নিয়ে উপরোক্ত সবকটি দেশেই পরীক্ষা চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বত্র যে একটি বিশেষ ধারায় নাট্য-প্রযোজনা হ'ত এবং রঙ্গমঞ্চের যে সমস্ত চিরানুচরিত পদ্ধতি ছিল তা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হ'তে হ'তে বর্তমানে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে আগেকার দিনের রঙ্গমঞ্চের টেকনিকের সংগে তার যোজনব্যাপী ব্যবধান ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না।

নব নাটক রচনার কৌশল প্রথম প্রদর্শন করেছিলেন ইব্‌সেন। তাঁর সময় থেকে নবভাবে নাট্য-প্রয়োগ পদ্ধতিও সুরু করেন ইউরোপের বহু শিল্পী। এঁদের মধ্যে 'এলেন টেরির' পুত্র গর্ডন ক্রেগের নাম যদিও সকলের কাছে সর্বাগ্রে মনে পড়ে তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁরও পূর্বে বহু খ্যাত ও অখ্যাত প্রযোজক এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট নূতনত্ব দেখানোর প্রচেষ্টা করেছিলেন।

১৮০৮ সালে জার্মান সমালোচক উইল্‌হেল্‌ম শ্লেজেল্ (Schlegel) লিখেছিলেন, "রঙ্গমঞ্চে যেভাবে দৃশ্যপট আঁকা হয় তা চক্ষুর পীড়াদায়ক—গীতিনাট্যে বরং সেগুলি চ'লতে পারে কিন্তু অপর বিষয়ে তার সার্থকতা খুবই অল্প। প্রথমতঃ উইংস থাকার দরুন দৃশ্যের অংকিত লাইনগুলো খাপছাড়া ঠেকে, তাছাড়া পাশের এবং সামনের আলোক থাকায় কোন রকম আলোছায়ার খেলা দেখতে পাওয়া যায় না। পেছনের পটভূমিতে যে ছবি আঁকা হয় তা বিশেষ হাস্যকর হ'য়ে ওঠে যখন তার ধারে গিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীরা দাঁড়ান। অতি সহজ এবং সরল পন্থা গ্রহণ না করার ফলেই রঙ্গমঞ্চ এগিয়ে যেতে পারছে না। তাছাড়া রঙ্গমঞ্চের একটা মস্ত অসুবিধা হচ্ছে প্রাসাদ এবং কুটির একই সাইজের মধ্যে আনতে হয় সেটুকুরও কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন।"

উপরোক্ত সমালোচনার পর অবশ্য রঙ্গমঞ্চের বহু পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে, এবং এর থেকে বোঝা যায় যে রঙ্গমঞ্চ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন থেকে দেশের সুরসিক সমালোচক ও শিল্পীরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ফিউয়েরবাক্ (Feuerback) নামক এক জার্মান চিত্রকর লিখেছিলেন, "আমি নাট্যশালাকে অত্যন্ত অপছন্দ করি তার একমাত্র কারণ, সেখানে গেলেই আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কার্ড বোর্ড ও রং ভেদ ক'রে এর অসারতা অতি স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায়। দৃশ্যপট সজ্জার নামে অতি অসম্ভব ও অবাস্তব সজ্জায় দৃশ্যগুলিকে যেভাবে সজ্জিত করা হয় তার ফলে হয় কি, It spoils the public, frightens away the last remnant of artistic feeling and encourages barbarisms of taste, from which real art turns away and shakes the dust off its feet." এই প্রসংগে তিনি আরও ব'লেছিলেন যে,

প্রকৃত শিল্প দক্ষতার পরিচয় দিতে গেলে রঙ্গমঞ্চে অতখানি কৃত্রিমতা দেখানোর প্রয়োজন নেই। "Unobtrusive suggestion is what is needed not bewildering effects" সামান্য সহজ ইংগিত যেখানে যথেষ্ট, সেখানে চিত্তবিভ্রমকারী দৃশ্য রচনা নিষ্প্রয়োজন।

এই সমস্ত সমালোচকবর্গের সমালোচনার সূত্রপাত হবার পর থেকেই নাট্যপ্রয়োগ কৌশলের রীতি পরিবর্তিত হ'তে আরম্ভ করে। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে (Appia) এপিয়া প্রথমে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটাদি কি রকম তৈরী হওয়া উচিৎ তাই অংকন করে এবং তাঁর মতবাদের যুক্তি দিয়ে ফরাসী ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পরে তাঁর একটি বিরাট গ্রন্থ জার্মানীতে অনুদিত হ'য়ে জার্মান রঙ্গমঞ্চের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরপরে গর্ডন ক্রেগ তাঁর নবনাট্য-আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

(Gordon Craig) গর্ডন ক্রেগ্ ছিলেন এলেনটেরির পুত্র। ১৮৮৯-৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি হেন্‌রি আরভিং-এর সম্প্রদায়ে কাজ করতেন। তারপর রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার কৌশল শিক্ষা ক'রে ১৯০০ সালে তিনি প্রথম রঙ্গমঞ্চে নিজস্ব প্রযোজনা করেন এবং ১৯০২ সালে দৃশ্যপটের নূতন পরিচালনা ক'রে রঙ্গমঞ্চে নবধারার সূত্রপাত ক'রলেন। ইতিমধ্যে (William Poel) উইলিয়াম পোয়েল এবং লণ্ডনের আর একজন শিল্পী Henri Wilson (হেনরি উইলসন) যথাক্রমে সেক্‌শ্‌পীয়ার ও অন্যান্য নাটকের প্রয়োগপদ্ধতিতে যথেষ্ট নূতনত্ব প্রকাশ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আর একজন সুবিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ প্রযোজক ম্যাক্স্ রাইন্‌হার্ড (Max Reinhard) রঙ্গমঞ্চে বাস্তব পরিকল্পনা সহযোগে ক্রেগ্ এবং এপিয়ার নব-নাট্য প্রয়োগভংগী প্রদর্শন করতে আরম্ভ করলেন। জার্মান নাট্যশালা এই প্রয়োগকর্তার নবসৃষ্টি সৌন্দর্যে বিমুদ্ধ হ'ল। রাইন্‌হার্ড নিজে ছিলেন অভিনেতা, পরিকল্পনাকারী ও প্রয়োগকর্তা সেইজন্য রঙ্গমঞ্চের সমস্ত

খুঁটিনাটি তাঁর আয়ত্বে ছিল। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে জার্মানীতে আরও কয়েকজন প্রযোজক রঙ্গমঞ্চে নূতনত্ব প্রদর্শন ক'রতে আরম্ভ করেন।

১৮৯৮ সালে ষ্টানিশ্লাভ্‌সকি (Stanislavsky)ও নিমিরোভিচ্ দাঁসেঁকোঁ (Nyemirovich Dantchenko) মস্কোতে যখন আর্টথিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন তখন তাঁরা শুধু দৃশ্যপটেই বাস্তবতার সূচনা করলেন না, অভিনেতাদের স্বাভাবিক অভিনয় পদ্ধতি শিক্ষা করিয়ে রঙ্গমঞ্চের কৃত্রিমতাকে দূর করতে বাধ্য ক'রলেন। মেটারলিঙ্কের (Meterlink) এর ব্লুবার্ড প্রযোজনা ক'রে এবং গর্ডন-ক্রেগ্‌কে তাঁর পর্দার সাহায্যে সেক্‌শ্‌পীয়ারের হ্যামলেট্ প্রয়োগ কৌশল প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করে তাঁরা সত্যই রঙ্গমঞ্চে একটি অভিনব ধারার প্রবাহ বইয়ে দিলেন। এঁদেরই দল থেকে আর একজন সুবিখ্যাত প্রযোজক আর এক নতুন ধরণের নাট্যপ্রয়োগ ক'রতে আরম্ভ করেছিলেন তাঁর নাম মায়ারহোল্ড। এই সময় ফরাসীদেশে জেক্‌স্ রূশে এবং জেক্‌স্ কোপে (Jacquis Caopeau) অভিনব নাট্য প্রযোজনা ক'রতে আরম্ভ করলেন।

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপের সর্বত্র একটা নব-নাট্য আন্দোলনের সৃষ্টি হ'চ্ছে দেখা গেল। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের পূর্বেই এই অভিনব নাট্য প্রয়োগ-ভংগী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলে। এই ভংগীর বিশেষত্ব এই যে, রূপ, রং, কল্পনা ও নাটকের গভীরতা প্রকাশ ক'রতে এ হ'ল অদ্বিতীয়। ফটোগ্রাফীতে যে বাস্তবতার সৃষ্টি করে সে বাস্তবতার সন্ধান এতে মিললো না সত্য কিন্তু তার চেয়ে বাস্তবকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার পরিচয় পাওয়া গেল। এই সময়ে আমেরিকায় আর্থার হপ্‌কিন্‌স (Arthur Hopkins) এবং লিট্‌ল্ থিয়েটারের প্রযোজক মরিস্ ব্রাউন (Maurice Browne) যথাক্রমে আমেরিকান্ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে ও লিটল থিয়েটারে নূতন প্রয়োগরীতিতে অভিনয় ক'রে এই-নূতন ধারাকে আরও প্রসারিত করতে সাহায্য ক'রলেন।

মরিস্ ব্রাউন নব-নাট্য প্রয়োগভংগীর কৌশল বোঝাতে একটি বই লিখেছিলেন, সেটির নাম 'How is your-second act'। তাতে তিনি এক জায়গায় লিখছেন যে, রঙ্গমঞ্চে বাস্তব ছবি ফোটাতে গেলে শুধু বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ করলেই চ'লবে না—তাতে কল্পনার রং দিতে হবে। আমরা বাস্তব একটি ঘরের যে রূপ দেখি ঠিক তারই খুঁটিনাটি সব কিছু যদি রঙ্গমঞ্চের ওপর দেখাই তাহ'লে দর্শক ভাববেন—হ্যাঁ' এটা ঠিকই বাস্তবের অনুরূপ হ'য়েছে বটে কিন্তু তবু এটা বাস্তব নয় কারণ এটা থিয়েটার। এই যে দর্শকের মনোভাব যে he is in a theatre witnessing a very acurate reproduction only remarkable because it is not real—এই মনোভাবের দরুন বাস্তব পরিবেশ পদ্ধতির ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। তিনি তাই লিখেছেন, "So the upshot of the realistic effort is further to emphasize the unreality of the whole attempt setting, play and all. So I submit that realism defeats the very thing to which it aspires. It emphasizes the faithfulness of unreality." প্রযোজক যে জিনিষটা ফুটিয়ে লোককে বাস্তব জগতে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রছেন সেই জিনিষটাই যদি লোকের মনে না জাগে তাহ'লে এ প্রচেষ্টার মূল্য কতটুকু হ'তে পারে তা সহজেই বিচার্য।

নবনাট্য-প্রয়োগপদ্ধতির মূল কথা হল যে নাট্যকার তাঁর নাটকের দৃশ্যাবলীতে যে ভাবকে (mood) পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করছেন তার সংগে সামঞ্জস্য রেখে দৃশ্যে রং, আলো ও পটের লাইনের সব-কিছু তৈরী করতে হবে। অভিনেতার পূর্ণভাব প্রকাশ করার উপযোগী পারিপার্শ্বিক দৃশ্য সজ্জার মধ্যে কল্পনার ইংগিত থাকবে যথেষ্ট কিন্তু সেটা বাস্তবের প্রতিচ্ছায়া হবে না কোন মতে। নাট্যকারের যেমন নূতন ভংগী থাকবে রঙ্গশিল্পীরও ভংগী থাকবে ঠিক তারই অনুরূপ। প্রতি নাটকে দৃশ্যপটের ও আলোক নিক্ষেপের মধ্যে নাট্যকারেরই মত নূতন ভংগীতে শিল্পী তাঁর প্রযোজনা কৌশল দেখাতে পারেন। অর্থাৎ নাট্যকার, প্রযোজক ও শিল্পী প্রত্যেকেরই স্রষ্টা হিসাবে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করে যদি একটা ছাপ রেখে যেতে পারেন এবং সমগ্রভাবে একটা অখণ্ড রসের অবতারণা ক'রতে পারেন তবেই সেই নাটক অভিনয় প্রকৃত রসজ্ঞদের নিকট শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হ'তে পারবে।

ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কোং
২৯, ল্যান্সডাউন রোড
কলিকাতা

যুদ্ধোত্তর ভারতীয় চিত্র

ও

নাটকের রূপ

শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য, এম-এ

অধ্যাপক স্কটীশচার্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

●

অর্থনীতি শাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মল ভট্টাচার্যের আসন সুধী সমাজে সু-প্রতিষ্ঠিত। চিত্র ও নাট্যকলার ভিতর দেশের কল্যাণের যে বীজ নিহিত রয়েছে এই আদর্শবাদী শিক্ষাব্রতীকেও তা আকৃষ্ট না করে পারেনি। আমাদের অন্যান্য সুধীবৃন্দ যাঁরা আজও চিত্র ও নাট্যকলাকে সুনজরে দেখতে পারেননি, তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

●

কয়েক বৎসর পূর্বে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলচ্চিত্র পাঠাগারের উদ্বোধন উপলক্ষে বলেছিলেন যে, ছায়ার মায়া আদিম যুগ থেকে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। যেদিন মানুষ নিজের বা অন্যের ছায়া দেখে তার রহস্য উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছিল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ছায়া মানুষকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। বিজ্ঞান শক্তির প্রয়োগে মানুষ এই ছায়াকে সম্পূর্ণ— করায়ত্ত করে মানুষের আনন্দ বর্ধনের কাজে নিয়োজিত করেছে। তাই আজ চলচ্চিত্র উচ্চশ্রেণীর শিল্পের আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে।

অনুকরণপ্রিয়তা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি থেকেই নাটকের উদ্ভব হয়েছে। আদিম যুগে মানুষ নিজেদের অতীতকীর্তি কাহিনী প্রথমতঃ গল্পচ্ছলে ও ক্রমে আবৃত্তিমূলক অনুষ্ঠান বা অভিনয়ের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে। শুধু যে মনোরঞ্জন নাটকের উদ্দেশ্য ছিল তা নয়। তার একটা প্রধান দিক ছিল—অতীতের গৌরবময় স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তার ভিতর দিয়ে সমাজ ও ধর্মের আদর্শগুলিকে প্রাণবন্ত করা।

আনন্দসৃষ্টি নাটক ও চলচ্চিত্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু পরোক্ষভাবে চলচ্চিত্র ও নাটক ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের উপর যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে তা অস্বীকার করা চলে না। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, চলচ্চিত্র ও নাটকাভিনয়ের সাহায্যে দেশের আদর্শ ও মনোভাব পরিবর্তন করা সম্ভব। ইটালী, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে কথাচিত্র ও নাটক শিক্ষার বাহন হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই সব দেশের কৌশলী শাসকসম্প্রদায় রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্রের সহায়তায় জনসাধারণের মধ্যে একটা নূতন মনোভাব ও জাগরণের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাটক ও ছায়ামঞ্চ তাঁদের হাতে লোক শিক্ষার যন্ত্র হিসাবে কাজে লেগেছে।

আজ সারা ভারতবর্ষে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলেছে। শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতির পথনির্দেশ কল্পে দেশের মনীষিগণ নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। এই পুনর্গঠনের কাজে চলচ্চিত্র ও নাট্যসাহিত্যের একটা বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। আমরা যদি জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চাই তাঁহলে শ্রেণীনির্বিশেষে সমগ্র জনসাধারণের নিকট নূতন আদর্শের বাণী প্রচার করতে হবে, নূতন মনোভাবের সৃষ্টি করতে হবে। এই বিরাট কর্মক্ষেত্রে চলচ্চিত্র ও নাটকের অভাবনীয় সুযোগ রয়েছে। আজ যুগসন্ধিক্ষণে যদি রঙ্গ ও ছায়ামঞ্চ দেশ সেবার এই গুরুতর দায়িত্ব উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ না করে, তারা গতানুগতিক পুরাতন পন্থায় অগ্রসর হতে থাকে, তাঁহলে দেশের যে

অপূরণীয় ক্ষতি হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সোভিয়েট রাশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র প্রযোজক অধ্যাপক ইসেন্‌ষ্টিন্ কথা-চিত্র জগতে যুগান্তর এনেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি তাঁর যুগান্তকারী প্রয়োগ কৌশল ও অভিনব দৃষ্টিভংগির জন্য রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে (অর্ডার অফ লেনিন্) ভূষিত হয়েছেন। সোভিয়েট চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অধ্যাপক ইসেনষ্টিন্ বলেছেন যে, সোভিয়েট ছায়াচিত্র যে শুধু জনসাধারণের জীবনের একটা বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তোলে তা নয়, অন্যান্য চারুশিল্পের চেয়েও কথাচিত্র রাশিয়ার জনগণের সংগী ও চালক হিসাবে কাজ করে চলেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার মানুষের জীবন গঠনে ছায়াচিত্রের দান সত্যই অতুলনীয়।

রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মস্কভিন্‌ও অধ্যাপক ইসেন-ষ্টিনের ন্যায় অর্ডার অফ লেনিন উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তিনি বলেন যে, চারুশিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবনের শিল্প-রূপ দেওয়া, তার অন্তর্নিহিত বাণীকে প্রস্ফুটিত ক'রে তোলা। মস্কভিন আরও বলেছেন যে, জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ধারনা সৃষ্টি ও জনগণকে সেই আদর্শানুযায়ী উন্নতির পথে চালনা করা সোভিয়েট নাটক ও অভিনয়ের লক্ষ্য।

ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প ও নাট্য সাহিত্যকেও তদনুরূপ কর্তব্যগ্রহণ করতে হবে। ভারতবর্ষে বিপরীত সামাজিক, রাষ্ট্রীক ও ধনিক-তান্ত্রিক পরিবেশের সংঘাতে জনগণ আজ নিপীড়িত। অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতার নাগপাশে জনসাধারণ মূর্চ্ছিত ও অধঃপতিত। অত্যাচারিত মানুষকে তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই আজ আমাদের দেশে চাই সেই নাট্যকার, অভিনেতা ও চলচ্চিত্রের প্রযোজক—যাঁরা শিল্পাদর্শের ভিতর দিয়ে মানুষের জয়যাত্রার পথ সুগম করে দেবে এবং সর্বসাধারণকে স্বাধীনতার ও সাম্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করে জীবনের জয়গান শোনাবে।

জাতীয় জাগরণ ও নাটকে তাহার স্থান

শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়

'জীবন-রঙ্গ' খ্যাত নাট্যকার শ্রীযুক্ত তারা-কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বর্তমান প্রবন্ধে জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নাটক রচনায় যে ইংগিত দিয়েছেন, সেদিকে আমাদের নাট্য-কারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আজকের দিনে 'গণ-সাহিত্য' ব'লে একটা কথা উঠেছে। ও-বস্তুটা আমদানি হয়েছে রাশিয়া থেকে। সেখানকার সমষ্টিজীবন মূলতঃ রাষ্ট্রীয় জীবন এবং সেই রাষ্ট্রীয় জীবন সাম্যতন্ত্রের দ্বারা শাসিত। সাম্যনীতি এমন একটা নীতিশাস্ত্র যাকে পুরোপুরি সার্থক করতে হ'লে সমষ্টি জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রূপান্তর ঘটাতে হয়। সেইজন্যই ম্যরিস্ হিণ্ডাস্ রুশ-তন্ত্রকে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থের নাম করণ করেছেন Humanity uprooted অর্থাৎ মানুষের সমাজবন্ধনের মূলোৎপাটন। সাম্যনীতি নূতনতর অর্থনীতি মাত্র নয়, সমগ্র মনুষ্য জীবনকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখবার ফলেই সাম্যনীতি এতো বেশী স্বয়ংস্বতন্ত্র। রাষ্ট্রকে সাম্যনীতির শাস্ত্রে চালাতে গেলেই সমাজের পারিবারিক জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। আধ্যাত্মিকতার স্থান সেখানে থাকে কি না সন্দেহ। অবশ্য বিল্‌কুল সাম্যবাদী এখনো কোনো দেশই হয়ে উঠেনি। সেরকম শ্রেণীবিহীন সমাজ এখনো কোথাও দেখা দেয় নি। সমগ্র মানবের সর্বাঙ্গীন সুখ সমৃদ্ধি ও অন্তর স্ফূর্তি এখনো কোথাও ঘটে ওঠেনি। সেটা সম্পূর্ণ সম্ভব কিনা তা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর বিচার্য— যেমন বিচার করেছেন দার্শনিক অয়্‌কেন তাঁর Communism গ্রন্থে। কিন্তু রাশিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে ঐ নীতি হাতেকলমে অর্থাৎ জীবনের রক্ত দিয়ে পরীক্ষিত হচ্ছে। সে দেশের সমষ্টি জীবনে ধর্মভাব, পারিবারিক আবহাওয়া, নৈতিক নিয়মকানুন—অনেকই পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই সেখানকার সাহিত্য-ও এখন নতুন রূপ নিয়েছে এবং নিচ্ছে। গণসাহিত্য রাশিয়ার সৃষ্টি।

রাশিয়ার দৃষ্টান্তেই দেশে দেশে সাম্যবাদ ছড়িয়ে পড়ছে। পরাধীন ভারতবর্ষও সে-প্রভাব থেকে রেহাই পায় নি। সাম্যবাদ কোনো এক রকম ক'রে এদেশেও এসে জুড়েছে এবং দেশের যুব মনকে অধিকার করেছে।

ভারতের আর কিছু থাক্ আর নাই থাক্, একটা স্বাধীন সাহিত্য তার আছে। পরাধীন ভারত তার সাহিত্য সৃষ্টিতে স্বাধীন চিত্তের যে পরিচয় দিয়েছে পৃথিবীর আর কোনো দেশ তা দিয়েছে কি? কাজেই দেশের স্বাধীনতাকামী সাম্যবাদী রাষ্ট্রীয় সাধকরা সাহিত্যে গণতন্ত্র আনতে চাইছেন। তাঁরা বলছেন অভিজাত ও মধ্যচিত্ত সাহিত্য ছেড়ে এবার গণসাহিত্য রচিত হোক্।

এদিকে মামুলী কংগ্রেসসেবী রাষ্ট্রীয়সাধকরাও সাহিত্য ক্ষেত্রটা অকর্ষিত রাখতে চান না। তাঁরাও হল চালনা সুরু করেছেন সাহিত্যে স্বাধীনতাসংগ্রামের কথা বলে।

অর্থাৎ যে রাষ্ট্র সাধনা ভারতবাসী এতোদিন ধ'রে ক'রে আসছে তাকে সাহিত্যে রূপ দেবার একটা তাগিদ এসেছে অনেকের মনে। এরকম প্রেরণার মূলে সস্তার প্রচার প্রবণতা থাকতে পারে। তারফলে যে সাহিত্য রচিত হবে তার দাম বিশ্বের সাহিত্য ভাণ্ডারে খুব বেশী নয়। তার মূল্য রাষ্ট্রীয় মূল্য, সাহিত্যিক মূল্য নয়।

সত্যিকারের গণসাহিত্য সৃষ্টি করতে হ'লে গণবাদকে বাক্ বিতণ্ডার সদরবাড়ি থেকে বাগ্দেবীর অন্দর মহলে নিয়ে যেতে হবে। গণতন্ত্র বা কংগ্রেসতন্ত্র যদি মাত্র রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হয় তবে তা থেকে খুব বড়ো সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হবে না, "ত্বংহি প্রাণাঃ" শরীরে যদি সত্যি সত্যি

স্রোতস্বতী হ'য়ে ওঠে তবে সাহিত্যে জাতীয় জাগরণের পাঞ্চজন্য নির্ঘোষিত হবে।

পুনর্জাগ্রত ভারত রামমোহন থেকে সুরু ক'রে বিবেকানন্দ পর্যন্ত যে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ঘোষণা করলো, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ চিত্র শিল্পীরা যে অন্তদৃষ্টির পরিচয় দিলেন, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যে মর্ম সাহিত্য রচনা করলেন—তারই সংগে সংগে জাগ্রত ভারত সংস্কৃতির অন্যতম যন্ত্র মঞ্চকেও প্রতিষ্ঠিত করলো। আমরা থিয়েটর গড়লুম। রচিত হতে থাকলো নাটক।

সে সব নাটকে সমাজের গ্লানি ও দীপ্তি ফুটে উঠলো নানা নাট্যকারের সামাজিক নাটকে। নতুন ক রে আবার পুরাণকে পেলুম নানা পৌরাণিক নাটকে। নতুন ক'রে দেখলুম দেশকে, জাতিকে নানা ঐতিহাসিক নাটকে। দীর্ঘকালের নিদ্রা ভেঙে জাতি যখন চোখ মেললো তখন সুরু হ'লো অধ্যাত্মের অন্বেষণ, শিল্পেকলার রেখা-রং, গদ্য পদ্যের বচন-রচনা। কাজেই 'মঞ্চ'ই বা বাদ থাকবে কেন? বিশেষ ক'রে বাংলা দেশই জাতিজাগরণের আদি কেন্দ্র; তাই বাংলা দেশেই থিয়েটর হয়েছিলো এবং এখনো পুরোদমে আছে।

জাতির জাগরণের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ তার স্বাধীনতা সংগ্রাম। কোন কালে কোনো বিদেশী জাতিই আমাদের আত্মসাৎ করতে পারে নি। শক-হূনদল-পাঠান মোগল এলো গেলো কিন্তু কই ভারত তো এখনো মরে নি। গ্রীস, ইটালী আছে কিন্তু গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতার সে রূপ কোথা? আয়র্লণ্ড স্বাধীন হ'লো কিন্তু তার স্বকীয় ভাষার সাহিত্য কই? পরাধীন ভারতের সাহিত্য কিন্তু স্বাধীন। পাঠান-মোগল-ইংরেজ আমাদের পরাধীন করলেও সংস্কৃতিহীন করতে পারেনি। বরং পাঠান মোগলের সংগে আমাদের সংস্কৃতির আদান প্রদান হ'য়েছিল। বিজেতৃগণ ভারতীয়ই হয়ে গিয়েছিলো। এমন কি সমগ্র ভারতকে ইংরেজের একাকার শাসনেও ফৈরঙ্গ করতে তো পারলো না। ধর্মসভায় বিবেকানন্দের বাণী তো শুনতে হলো—রবীন্দ্রনাথতো পুরস্কৃত হলেন।

তা ছাড়া অধীনতাকে তো কোনোদিনই আমরা নির্বিবাদে স্বীকার করিনি। রাজপুত—মারাঠা—শিখ অভ্যুদয় কিসের সাক্ষ্য দেয়? সেকি অবনমনের না উজ্জীবনের? অনাত্মীয় বিজাতীয়তায় গর্বোদ্ধত ইংরেজও অধঃপতিত ভারতের জীর্ণ অস্থি সঞ্চালনে বিব্রত হ'য়েছে বৈ কি। পরাধীনতার শিকল আমরা পরেছি, কিন্তু অন্তর আমাদের বিকল হয় নি।

সম্পূর্ণ-সম্পন্ন জাতি পৃথিবীতে ছিলোনা, নেই-ও। আমাদেরও বৈদিক বৈদান্তিক-বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-পৌরাণিক ভারতবর্ষ কোনো কালেই নিশ্ছিদ্র ছিলো না। নিজের ভাবাদর্শকে রূপ দিতে দিতে দীর্ঘজীবনের ক্লান্তিতে জাতি যখন অবসন্ন তখন বর্বর জাতির আক্রমনে এবং পাঠান—মোগল—ইংরেজের শাসন শোষণেও আমরা রাজপুত, আমরা মারাঠা আমরা শিখ, আমরা বিবেকানন্দ গান্ধীর উদ্ভব সম্ভব করেছি। একটা সুচিরাগত প্রাণধারা আমাদের জীর্ণ দেহেও অমর আত্মার বিজয় ঘোষণা করেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই পটভূমিকায় বৃহৎ ও মহৎ চরিত্রের তো কোনো কার্পণ্য ঘটেনি ভারত ধাত্রীর। ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে ও সমাজকর্মে যেমন মহান্ ব্যক্তি এদেশে চিরকালই এসেছেন, চলে গেছেন তেমনি বহু বহু মস্ত মস্ত মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামের তূর্যধ্বনি করেছেন এদেশে। তবে কেন জাতীয় চরিত্রের সেই দিকটা নাটকে ফুটছে না? গণসাহিত্যও নয়, কংগ্রেসী সাহিত্যও নয়;—কোনো উদ্দেশ্যমূলক নাট্য নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে যদি দেশের নাড়ীর স্পন্দন থাকে তবে 'আনন্দমঠে'র পর 'গোরা'র পর 'পথের দাবী'র পর বৃহত্তর মহত্তর জাতীয় সাধনা পতাকা-চিহ্নিত নাটক কই?

পটভূমিকা আছে, কাহিনী আছে, চরিত্র আছে, তবে অভাব কিসের? সে কি নাট্যকারের?

শ্রীমতী কৌশল্যা

ইউনিটি প্রডাকসন্সের রাজমাতা চিত্রে
দর্শক সাধারণকে অভিবাদন জানাবেন।

সকলের আগে
মনে পড়ে...
রঙে ও গন্ধে ভরে উঠেছে আলোবাতাসের উৎসব।
দিগন্তপ্রসারিত সবুজ মাঠের উপর মনের সমস্ত ভাঁজগুলি
খুলে দিয়ে তাকে বিস্তৃত করে দেবার দিন এলো। এই যে
সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় বিজড়িত সুগভীর অবকাশের
মধুতে ভরা শরতের উজ্জ্বল মধ্যাহ্নটি সুদূরবিস্তৃত মাঠের উপর
বিহ্বল হয়ে পড়ে আছে, এরই অনুভূতির পেছনে পরিব্যাপ্ত
হয়ে থাকে যার স্নিগ্ধ সৌরভ, তাকেই আজ সকলের
আগে মনে পড়ে। না বল্‌লেও চলে, সেটি বাথগেটের
ক্যাষ্টর অয়েল—প্রতিদিন প্রতি ঋতুতেই যার আবেদনের
নূতনত্ব নিবিড় বিস্ময়ে আমাদের মনকে পূর্ণ করে তোলে।
Bathgate's
PURIFIED
CASTOR OIL
THE BEST HAIR OIL
CHEMISTS
CALCUTTA
RD/B-1

বর্তমানের মঞ্চ-অভিনেতা

শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত

নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর বর্তমান প্রবন্ধে মঞ্চ-অভিনেতাদের আদর্শহীনতার কথা প্রকাশ করে, শিল্পাদর্শে তাঁদের উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতেই নির্দেশ দিয়েছেন।

গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু-অমৃতলাল দানীবাবুর যুগ চলে গেছে। তারপর অভিনেতৃ জীবনে নবযুগ এনেছিলেন নাট্যাচার্য শিশির কুমার। শিশির কুমারের সমসাময়িক যুগের অভিনেতা অহীন্দ্র-নির্ম্মলেন্দু রাধিকানন্দ-নরেশ-তিনকড়ি-দুর্গাদাস মনোরঞ্জন-বিশ্বনাথ-যোগেশ-রবি-ভূমেন-জীবন শৈলেন শরৎ-প্রভাত-স স্তো ষ- জ হ র-জয়নারায়ণ প্রভৃতি। এঁদের কেউ বা সংসার রঙ্গমঞ্চ হ'তে অবসর নিয়েছেন; কেউ বা নাট্যমঞ্চের সংগে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবসর যাপন করছেন—কেউ বা মঞ্চ-লোকের সংগে বিজড়িত থেকে শুধু পূর্ব-গৌরবের অস্তাচল পানে স্মৃতি-ভারাতুর হৃদয়ে তাকিয়ে আছেন। এঁদের মধ্যে যারা মঞ্চলোকের সংগে আজও সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, হয়তো তাঁরা অনেকেই আমার এ উক্তিতে প্রীত হবেন না। কিন্তু তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা আমায় ভুল বুঝবেন না; তাঁদের সকলেরই যে অভিনয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে সে কথা আমি বলি না। আমি বলছি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বয়সের জন্য, কেউ বা উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার যোগাযোগ না ঘটাবার দরুণ... যে কোন কারণেই হোক না,—দু'চার বছরের মধ্যে এমন কোন চরিত্র রূপায়িত করতে পারেন নি...যা নাকি তাঁর অভিনেতৃ জীবনের পূর্ব গৌরবকে ম্লান করে দিতে সক্ষম হয়েছে।

পূর্ববর্ণিত অভিনেতাদের বিষয়ে আমার কোন নালিশ নেই। তাঁদের অনেকেই শক্তিমান, রঙ্গজগতের অভিনয় ধারা তাঁরা অনেকখানি পরিবর্ত্তিত করেছিলেন; উপযুক্ত সুযোগ পেলে হয় তো তাঁদের অনেকে এখনো শক্তির বিকাশ দেখাতে পারবেন। আমার এ আলোচনা তাঁদের জন্য নয়,—এ আলোচনা পরবর্তী যুগের অভিনেতাদের সম্বন্ধে।

কিন্তু কৈ? কোথায় অভিনেতা? ছবিবাবু প্রভৃতি আমায় মাফ করবেন, Every Law has its exception একটি বা দুটী অভিনেতার আবির্ভাবকে accident এর পর্যায়ে ফেললে বোধ হয় দোষ হবে না। আমার অভিযোগ ব্যক্তিগত নয়—সমষ্টিগত ভাবে মঞ্চের আধুনিকতম অভিনেতৃ গোষ্ঠি সম্বন্ধে। আধুনিকতম অভিনেতাদের বিষয়ে যদি কেউ বলেন যে, তাঁদের অনেকেই ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মনোভাব নিয়ে কর্ণওয়ালিস ষ্টীট, রাজকিষণ ষ্টীট বা বিডন ষ্ট্রীটে আশ্রয় নিয়েছেন...তা হলে কি খুব অন্যায় বলা হবে? সেই দশটা-পাঁচটার মনোভাব, সেই মাসকাবারের টাকার হিসাব, কোম্পানীর সেই মামুলি অবিচারের বিষয়ে জটলা, অন্য কোম্পানীর বোনাস্ ও বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে উদারতার কল্প-কথা—এইতো আধুনিকতম শিল্পীর গবেষণার বস্তু। নাট্যশিল্পীর মনের মধ্যে বসে যদি কেরাণী-শিল্পী কেবল লেজার (Ledger) বইএর পাতা ওল্টায়—তা হলে রঙ্গমঞ্চের আর্ক ল্যাম্প, স্পট লাইট, ফুট্ লাইট সমস্তগুলি আলো একসংগে জ্বেলে দিলেও—কারও সাধ্য নেই সে মঞ্চকে আলোকিত করে।

অমল, ভুপেন, সিধু, মিহির, পঞ্চানন, জীবেন এঁরা ঠিক এই যুগের অব্যবহিত পূর্বে এসেছেন, এঁরা তবু খানিকটা শক্ত বনিয়াদের ওপর দাঁড়াতে পেরেছেন। ভয় হয় শুধু তাঁদের কথা ভেবে, (যদিও তাঁরা সংখ্যায় এক আধ জনের বেশী নন্) যাঁরা শিল্পমন নিয়ে এই অন্ধকারের মধ্যে দৈবাৎ এসে পড়েছেন। এই আকাশ জোড়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে, কে জানে,-তাঁরাও কখন শিল্প-মনের জ্যোতিটুকু হারিয়ে ফেলবেন।

অভিনেতা কে? কি তার স্বরূপ? সে স্রষ্টা, সে স্বয়ম্ভূ; আপনাকে সে সৃষ্টি করে বহু বার, বহু রূপে, বহু ভাবে। রূপের ধ্যান না করলে রূপ-সৃষ্টি হয় না। তাই অভিনেতার প্রয়োজন নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সাধনা এবং সব চেয়ে বেশী করে প্রয়োজন, নিজের শিল্পকলাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা। শুধু কি তাই?—নাট্যশালা তার সাধনার মন্দির; এ মন্দিরের প্রতিটি ইঁট, পাথরকে পর্যন্ত নিজের বলে ভালবাসতে হবে। নাট্যমন্দিরের সংগে অভি-

হিমানী
নারিকেল তৈল
সুপরিষ্কৃত সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ ও পরিপাটীরূপে ভারতীয় সুরভিতে নিষিক্ত।
হিমানীর প্রস্তুত সমস্ত প্রসাধন উপকরণ বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষের জন্য সুপ্রসিদ্ধ।
বাজারের বাজে তেল ব্যবহার না করিয়া হিমানী নারিকেল তৈল ব্যবহারে আপনি সত্যই আনন্দিত হইবেন।
হিমানী ওয়ার্কস্‌, কলিকাতা
BAKUL
Himani
HIMANI WORKS
CALCUTTA

নেতার এই অচ্ছেদ্য একাত্মবোধই তার রূপ-সাধনাকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করে দেবে। কিন্তু আজ সে নিষ্ঠার অভাব, রঙ্গমঞ্চকে শিল্পীর সাধনা মন্দির-জ্ঞানে ভালবাসার অভাব। নাটমঞ্চে প্রদীপ জ্বলবে কেমন করে?

কোনো নাটকে পার্ট পেলে বাড়ীতে সে পার্ট উল্টে দেখবার আগে খবরের কাগজ উল্টে দেখবেন, থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে নাম বেরিয়েছে কি না? নাম কার আগে পড়ল? কার নামের নীচে পড়ল? নামের হরফ কত বড়? স্মল পাইকা, পাইকা, না গ্রেট্ টাইপে? গৃহীত ভূমিকার রূপ সম্বন্ধে নিজে কখনও চিন্তা করা দূরে থাক্ রিহার্সেলে বসে লাষ্ট্-ট্রাম চলে গেল কি না—সেই চিন্তা, আর সেই ধ্যান। রূপসজ্জা করতে বসে—সজ্জার চেয়ে বেশী দৃষ্টি সজ্জার উপকরণের ওপর। কোম্পানী কাকে বেশী পাউডার দিল, ব্রাশ, লিপষ্টিক, তোয়ালে, বসবার চেয়ার, সাজাবার আয়না এগুলো কার তুলনায় নিকৃষ্ট হয়ে গেল—এই তো রূপসজ্জার প্রধানতম লক্ষ্য করবার বিষয়! সৈনিক সেজে মঞ্চে দাঁড়াতে জানেন না বলে যে ব্যক্তি দর্শকের কাছে তাড়া খেয়ে এলেন,—ভেতরে এসে তিনিই বলবেন, "পার্টে কিছু নেই; আমাকে এ প্যার্টে নামানো হয়েছে শুধু লোক হাসাবার জন্য।" অশিক্ষাকে ক্ষমা করা চলে কিন্তু অশিক্ষার দম্ভকে নয়। এই দম্ভ, এই vanity, এই মূঢ়তা,—সব চেয়ে মর্মান্তিক। মঞ্চশিল্প যদি সমবেত সৃষ্টি না হ'ত—এই রূপ-লোকে যদি একক সৃষ্টির অবকাশ থাকতো, তাহলে এতখানি ভয়ের কারণ ঘটত না। অনধিকারীর মঞ্চলোকে এই স্পর্ধিত পাদক্ষেপ—সমস্ত শিল্প পূজারীর প্রচেষ্টাকে অশুচি করে দিচ্ছে! তাই বলছিলুম, মঞ্চের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে।

চরিত্র রূপায়ণ করবার জন্য যে ধ্যান ধারণার প্রয়োজন তা এঁদের নেই। চরিত্রের প্রতি কথা, প্রতি কার্য কেন এ রকম হচ্ছে, কেন অন্য রকম হবে না—সে বিষয়ে এঁদের অধিকাংশই ভেবে দেখবার প্রয়োজন বোধ করেন না। গৃহীত চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা নেই; চরিত্রকে জামার মত গায় চাপিয়ে দিলেই হ'ল! চরিত্রের বহিরাবরণটুকু ধরবার চেষ্টা—তাও কি এঁদের নিখুঁত হয়? চাঁদনীর কেনা জামার মত কোনটার হাত লম্বা, কোনটার ঝুল কোমর পর্যন্ত উঠেছে কোনটা বা হাঁটু অবধি নেমে এসেছে। পরমানন্দে এই অপরূপ রূপ নিয়ে তাঁরা মঞ্চের ওপর চলাফেরা কচ্ছেন, বিজ্ঞাপনে নামের হরফ ছোট হ'লে কোম্পানীকে পদত্যাগের নোটীশ দিচ্ছেন।

অনেক সময় আধুনিকতম অভিনেতাদের সঙ্ঘশক্তি বা "টিমওয়ার্কের' দোহাই দিতে শোনা যায়। মঞ্চে "টিম ওয়ার্কের" মানে? সমবেতভাবে রূপসৃষ্টির প্রয়াস; সবাই মিলে ছন্দ, গতি সকল দিক দিয়ে অসামঞ্জস্য আনবার প্রয়াস নয়। আগের যুগেই বলুন, বা আজকের যুগেই বলুন, "টিম ওয়ার্ক" ব্যতীত কোন নাটকই যথাযথ ভাবে অভিনীত হতে পারেনি। নাট্যকার যে চরিত্রকে যতটুকু প্রাধান্য দিয়েছেন, সেই চরিত্রের রূপায়ণে অভিনেতার ঠিক তদুপযুক্ত প্রাধান্য আরোপ করবার নামই অভিনয়ের টিমওয়ার্ক। নাট্যকার যাকে নায়করূপে অংকিত করেছেন—অন্য চরিত্রকে তার অনুবর্তী হয়ে শৃঙ্খলার সংগে কাজ করতে হবে। প্রহরী পিছনের মঞ্চ ছেড়ে রাজার কথায়, চালচলনে—সমান তালে এগিয়ে আসবার নাম—নাটকীয় ক্রিয়ার সাম্য রক্ষা নয়। এই সহজ সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারলে "টিম ওয়ার্কের' দোহাই দিয়ে নিজেদের দৌর্বল্য ঢাকবার হাস্যকর প্রচেষ্টা হতে আধুনিকতম অভিনেতা হয়তো বিরত থাকতেন।

শিশিরকুমারের অপরূপ চরিত্র বিশ্লেষণ অথবা চরিত্র সৃষ্টি, নট-সূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অতুলনীয় রূপ-সজ্জা এবং সর্বশ্রেণীর দর্শককে মঞ্চমায়া বা illusion এ অভিভূত করবার অপূর্ব দক্ষতা,—বাণী বিনোদ নির্ম্মলেন্দুর শিশুর সারল্যের সংগে অপরাজেয় বাদশাহী dignity এবং ধীরোদাত্ত কণ্ঠের অননুকরণীয় বাচন ভংগী! তার সংগে আধুনিক অভিনেতাদের শক্তির তুলনা করতে চাই না। ফিরীঙ্গী চরিত্রের রূপদানে ভূমেন রায়ের অসাধারণ নৈপুণ্য এবং আধুনিক যুগের শিল্পী ছবি বিশ্বাসের বাচন ভংগী ও ভাবাভিব্যক্তির অপূর্ব সংযম! এঁদের অভিনয় শক্তির সংগেও

আধুনিক যুগের অভিনেতার শক্তির তুলনা করব না। তুলনামূলক বিচার ছেড়ে দিলেও, প্রত্যেক অভিনেতা অভিনয় কলা সম্বন্ধে সাধারণ-জ্ঞান আয়ত্ব করবেন—এবং নিজেদের শিল্পী বলে ভাবতে শিখবেন অন্ততঃ এটুকুও কি আশা করা চলে না?

অভিনয়ের সাধারণ জ্ঞানের সব চেয়ে সাধারণ কথা... বাচন ভংগীর স্পষ্টতা এবং ভাব-বাহকতা। কবিতা আবৃত্তি তো অভিনেতা-সমাজ হতে লুপ্ত হতে বসেছে। অথচ প্রতিদিন যদি মাত্র এক পৃষ্ঠা করেও রবীন্দ্র-কাব্যের আবৃত্তি অভ্যাস করা যায়—তাতে অভিনেতার বাণী শুদ্ধি তো হবেই এবং সেই সংগে কবিগুরুর ভাব-তরঙ্গিত অপূর্ব শব্দ-ঝঙ্কার অভিনেতাকে শব্দ-বৈচিত্র্য দ্বারা ভাব ব্যঞ্জনায় যথেষ্ঠ সাহায্য করবে। এই সহজ কথাটা যদি আধুনিক অভিনেতা মেনে চলেন, ত'হলে আর কিছু না হোক, দর্শকেরা অভিনয় দেখতে এসে অন্ততঃ কর্ণপীড়া বোধ করবেন না।

মঞ্চে আজ শিল্পীর অভাব; তার চেয়েও বেশী অভাব শিল্প মনের। বাইরের জগৎ থেকে অভিনয় কলা সম্পূর্ণ আয়ত্ব করে, সুদক্ষ অভিনেতার দল মঞ্চে অবতরণ করুন এমন অদ্ভুত প্রত্যাশা রঙ্গমঞ্চের নেই। রঙ্গমঞ্চ চায় তেমন শিক্ষিত তরুণদের, যাঁদের দেহ মঞ্চের উপযোগী, সুগঠিত; যাঁরা স্পষ্ট করে কথা বলতে পারেন এবং অভিনয় কলাকে যাঁরা ভালবাসেন। পূর্ণাংগ চরিত্রাভিনেতা, অথবা "টাইপ চরিত্রে" রূপদান-দক্ষ শিল্পী প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চেই হয়তো এখনো দু'একজন আছেন; কিন্তু সুদর্শন, তরুণ, নায়ক চরিত্রের রূপদান করবার উপযুক্ত শিল্পীর যে কতখানি অভাব তা প্রতিটি রঙ্গমঞ্চ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে! হয়তো দৈবাৎ একটী চেহারা পাওয়া গেল কিন্তু কণ্ঠ পাওয়া গেল না: হয়তো কণ্ঠ মিলল, চেহারা মিলল না; কদাচিৎ হয়তো দৈবক্রমে কান্তি ও কণ্ঠ দুইই মিলল; কিন্তু তার ভেতর শিল্পীর অন্তরটা খুঁজে পাওয়া গেল না। কান্তি, কণ্ঠ ও শিল্পমন এ যাঁর আছে—রঙ্গমঞ্চ তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় সাদরে, পরম আগ্রহের সংগে। হয়তো এমনও হতে পারে—রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থলের একটি আসন শুধু তাঁর জন্যেই শূন্য পড়ে রয়েছে।

অভিনেত্রীর আদর্শ

শ্রীমতী মলিনা

চিত্র ও নাট্যামোদীদের কাছে শ্রীমতী মলিনার নূতন করে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। যে আদর্শ মহিমায় শ্রীমতী মলিনার আজীবন শিল্প সাধনা আজ সার্থক মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে—অভিনেত্রী জীবনের সেই আদর্শ সম্পর্কেই তিনি বলতে চেয়েছেন বর্তমান রচনায়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অভিনেত্রীদের কথা আমি আমার এই ছোট বক্তব্যটুকুতে উল্লেখ করতে চাইনা, যেহেতু তাঁদের জীবনের সংগে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়াও নিরাপদ হবে না, কেননা সে সম্বন্ধেও আমরা কিছু জানিনে; যেটুকু জানি—চিত্রপত্রিকাগুলির মারফৎ—তার মধ্যে শতকরা নব্বইটা সংবাদই অতিরঞ্জিত অথবা প্রীতিরঞ্জিত ভক্তদের মনে অনুরাগের শিখা উজ্জ্বল করে রাখবার জন্যে একটা পাবলিসিটী ষ্টাণ্ট্। অতএব ওদেশের অভিনেত্রীর আদর্শের আইডিয়ার ছাঁচে ঢালাই করা এদেশের অভিনেত্রীর আদর্শের কথা বলে কোন লাভ নেই। তাই আমি শুধু আমাদের বাংলাদেশের, এই কোলকাতার অভিনেত্রী জীবনের আদর্শ নিয়েই আলোচনা করবো। বক্তব্যটা হয়তো অভিনেত্রীর আদর্শ না হয়ে আদর্শ অভিনেত্রীর মত শোনাবে।

কিন্তু কথা হচ্ছে অভিনেত্রী জীবনের কোন আদর্শ নিয়ে লিখবো? তার প্রকাশ্য জীবনের আদর্শ, না নেপথ্য জীবনের আদর্শ? প্রকাশ্য জীবনের আদর্শের মধ্যে পড়ে মঞ্চ, পর্দা, রেডিও, রেকর্ড। নেপথ্য জীবনের মধ্যে পড়ে তার প্রিয়, প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-সংসার। পাঠক-পাঠিকা যদি বলেন "আমরা তোমার মঞ্চ-পর্দার জীবনের আদর্শের কথাই শুনতে চাই, কেননা তোমার সেই জীবন আমাদের ভাল লাগে," - আমি তার উত্তরে হয়তো বলবো, "আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত, কেননা সে জীবন আমার ভাল লাগে না। (অবিশ্যি আমার কথাগুলি সবই হয়তোর পর্যায় ভুক্ত)। মঞ্চে গ্রীনরুমে রূপসজ্জা শেষ করে ঘণ্টাতিনেক ধরে দর্শককে আনন্দ দেয় যে আমি, ষ্টুডিওর খণ্ড খণ্ড Shot-এ অভিনয় করে অখণ্ড চিত্রের চরিত্র সৃষ্টি করে যে আমি, রেকর্ড রেডিওতে কণ্ঠাভিনয় দ্বারা অগণিত শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণ পরিতৃপ্ত করে যে আমি আর কর্মক্লান্ত দিনের অবসানে ঘরের শান্ত বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে ফিরে পায় যে আমি, এই দুই আমি কি এক? এর মধ্যে কোন আমি সত্য? যে আমিই হোক, দু'টোই অভিনেত্রীর আমি। কাজেই ও সব চুলচেরা তর্কের মধ্যে না গিয়ে সাধারণ ভাবে অভিনেত্রীর আদর্শ সম্বন্ধে আমার যা ধারনা তাই বলবো। এর মধ্যে ভুল যদি থাকে, কিম্বা ভুল যদি না থাকে, উভয়ক্ষেত্রেই আমি যেন "রূপমঞ্চ" পাঠক পাঠিকার সানুগ্রহ মার্জনা পাই, এই প্রার্থনা।

সাতনম্বর বাড়ীতে লেখিকা

আমি বাংলাদেশের সামান্য একজন অভিনেত্রী, আমার সামান্যতম উপলব্ধির কথাই আমি লিখবো, বিদ্যার জোরে একটা সার্বজনীন সত্য উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা আমার নেই।

প্রথমেই ধরা যাক্ অভিনেত্রীর কাজটা কি? না, অভিনয়ের দ্বারা রসপিপাসু জনসাধারণের মনে আনন্দ সঞ্চার করা এবং নিজে আনন্দিত হওয়া। এই শেষোক্ত ব্যাপারটিই আমার বক্তব্য। অভিনয়ে নিজে আনন্দিত হতে না পারলে অন্যলোক তা থেকে আনন্দ আহরণ করতে পারেনা। যেহেতু আনন্দ বস্তুটী সংক্রামক, সূর্যের আলোর মত; যেখানেই পড়ুক উজ্জ্বল করে দেবেই, যে আনন্দের জোয়ারে সমস্ত প্রেক্ষাগার পরিপ্লাবিত হবে সেই আনন্দের বেগকে সব আগে কেন্দ্রীভূত করতে হবে নিজের মনে। শিবের জটায় আবদ্ধ জাহ্নবীর মত। প্রথমে তার স্থিতি, তারপরে গতি। প্রথমে তার বিচার, তার বিশ্লেষণ, তার পরে পরিবেশন।

এর জন্য চাই ধ্যান। ধ্যান বলতে আমি যৌগিক কুম্ভক, রেচক পূরক অথবা প্রাণায়ামের কথা বলছিনা, আমি বলছি যে চরিত্র আমাকে অভিনয় করতে হবে, নিজের মনের মধ্যে তার তীক্ষ্ণ তীব্র এবং সুস্পষ্ট অনুভূতি; এই অনুভূতির ইন্ধনে ধীরে ধীরে সেই চরিত্রের মনের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ রূপ নেবে—আমি তাকে দেখতে পাব, তার কথা শুনতে পাব, তার হাবভাব ভাষাভংগী মনোযোগ দিয়ে আমি লক্ষ্য করবো। আমার ধ্যানের চোখে সে মঞ্চের ওপর অভিনয় করবে, হাসবে, কাঁদবে হাততালি কুড়োবে। যেখানে তার ভুল, যেখানে তার ত্রুটি, সেখানে আমি তাকে সমালোচনা করবো, পরে তাকে সংশোধন করে আমি অভিনয় ক্ষেত্রে উপস্থিত হবো। এমন করলে কোন চরিত্রের প্রতিই অবিচার করা হবে না, এবং সে তার যথার্থ রূপটি নিয়েই আমার অভিনয়ের মধ্যে ফুটে উঠবে।

চাই জ্ঞান। এরজন্য আমাকে ছবি দেখতে হবে, দেখতে হবে ওদেশের বড় অভিনেত্রীরা মনের কোন আবেগকে কোন্ কোন্ কৌশলে ফুটিয়ে তুলছেন; শিখতে হবে বলা এবং চলার মধ্য দিয়ে ওরা কেমন করে এত লাবণ্য বিস্তার করছেন, গহন মনের গোপন কথাকে কেবল একটিমাত্র ভ্রূভংগীর দ্বারা কেমন করে সাধারণের কাছে প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আমাকে পড়তে হবে দেশের সাহিত্য ও নাটক। জানতে হবে গিরীশচন্দ্রের সাধনা, তাঁর নাট্যারম্ভ কেমন করে কোন্ চিন্তাধারার প্রণালী অনুসরণ করে নাট্যকার শচীন-বিধায়কের রচনার মাঝে ক্রম-পরিণতি লাভ করলো। জানতে হবে বলিদান ও মাটির ঘরের ট্রাজেডির মধ্যে পার্থক্য কি? সে দিনের নাট্য সম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী যে ঢংয়ে অভিনয় করে বাংলা বিজয় করেছিলেন, আজকের মলিনা সেই ধারা অনুসরণ করবে কিনা। এর মধ্যে দর্শকের রুচির কোথায় পরিবর্তন ঘটলো। আজকের

'সাত নম্বর বাড়ী'র একটী দৃশ্যে ছবি, জহর ও সাবিত্রী।

নাটক মানুষের কাছে কি কথা বলতে চায়, কি তার দাবী, এ সব জানা না থাকলে আমি যুগের চাহিদা মেটাতে পারবো না। আর যুগের দাবী মেটাতে না পারলে আমার অভিনেত্রী জীবনের সার্থকতা কোথায়? চাই রুচি। অভিনেত্রীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগত, পরিচ্ছন্ন রুচি। সেই রুচি দিয়ে আমার অভিনয়ে, আমার পোষাক পরিচ্ছদে, আমার কথায়, গানে, হাসিতে এমন একটী ভংগীর সৃষ্টি করবো যে ভংগী সর্বত্র সমাদৃত হবে, অনুসৃত হবে। একটুকু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, আজকাল প্রায়ই ছায়াছবির নামে শাড়ীর নাম শুনতে পাওয়া যায়। এই কৃতিত্বের জয়মাল্য সেই অভিনেত্রীর প্রাপ্য যিনি এর প্রথম প্রচলন করেছিলেন, অলঙ্কার প্রচলনও এই রুচির পর্যায়ে পড়ে। শুদ্ধ, শুচি, মার্জিত রুচিসম্পন্ন অভিনেত্রীই আজকের দিনে মানুষের মনে রাজত্ব করবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চাই ব্যবহার। মধুর ব্যবহার। কোন কারণেই অভিনয় ক্ষেত্রের কোন তিক্ত পরিবেশের মধ্যেও মন খারাপ করলে চলবে না। যাঁর কাছে সামান্য কিছুও জেনে নেবার আছে, তিনি যত খারাপ মানুষই হন না কেন, তাঁর কাছে তা জেনে নিতেই হবে। আমি বড়, আমি গুণী, আমি আবার কার কাছে কি শিখবো, অভিনেত্রীর পক্ষে এই আত্মাভিমান সর্বনাশা। গত যুগের অভিনেত্রীদের দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা এবং সহনশীলতার কথা স্মরণ করলে, আজকের দিনের অভিনেত্রীদের মনে হবে স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা। অভিনয় দ্বারা মানুষকে আনন্দ দানের পথ সঙ্কটময়—নিন্দাপ্রশংসার অসমতালে সে পথ নিত্য দোলায়িত।

এসোসিয়েটেড পিকচার্স লিঃ এর হিন্দি
আমিরির একটি বিশিষ্ট চরিত্র চি

শ্রীমতী রমলা

জনক পিকচার্সের নলদময়ন্তী চিত্রে
শ্রীমতী সোভনা সমরথ।

প্রগতির দিনে ভারতীয় ছায়াছবি

অধ্যাপিকা বাণী ঘোষ এম, এ

লেখিকা বেথুন কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা। আমাদের অনেকের মত বাংলা চলচ্চিত্রের বর্তমানের পরিস্থিতি এঁকে ব্যথিত করে তোলে। আজকের প্রগতির দিনে বাংলা চলচ্চিত্রের সত্যিকারের রূপ কী হওয়া উচিত—তিনি সেই সম্পর্কে বাংলা চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন—এবং কর্তৃপক্ষের কাছে জন-স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে কৃষ্টিমূলক চিত্র নির্মাণের আবেদন জানিয়েছেন, তা নানাদিক দিয়ে প্রণিধান যোগ্য।

আজকাল ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের প্রয়োগ প্রণালী (Technique) বিষয়ে কতক উন্নতি সাধিত হইলেও ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নির্মিত অতিসাধারণ চলচ্চিত্রের সহিত তুলনা করিতে হইলে, আরও অনেক বিষয়ে উন্নত হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে এমন একটি সুসংঘবদ্ধ জনমত গঠিত হওয়া উচিত যাহা চলচ্চিত্রকে কৃষ্টির দিক দিয়া বিশ্লেষণ ও সমালোচনা দ্বারা প্রযোজক পরি-চালক বর্গকে বুঝাইয়া দিতে পারে যে, সাধারণের পরি-তুষ্টির জন্তে তাঁহারা যদিচ্ছা ও যে ভাবেরই হউক চল-চ্চিত্র পরিবেশন করিলে আর চলিবে না, আরও উচ্চা-ঙ্গের প্রযোজনার সময় আসিয়াছে। ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালনা যে অধোগতির দিকে যাইতেছে তাহা রোধ করিবার জন্তে নির্ভীক ও সংগত সমালোচনার আবশ্যক।

চলচ্চিত্র নির্মাণ এক কলাবিদ্যা এবং যে কোনও ধনী ইচ্ছা করিলেই এরূপ চলচ্চিত্র প্রযোজনা করিতে পারেন না যাহা জনসাধারণের মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। আজকাল ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রধান অভাব হইতেছে সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ পরি-চালকের। যে সকল অগণিত ধনী প্রযোজক বর্গ গণ্ডায় গণ্ডায় তৃতীয় শ্রেনীর চলচ্চিত্র বাজারে বিতরণ করিতেছেন, তাঁহারা অভিনয় বা পরিচালনা বিদ্যার কিছু জানেন বলিয়া বোধ হয় না।

চলচ্চিত্র শিল্প প্রধানতঃ ব্যবসায় ও লাভের দিক দিয়া কিরূপ দাঁড়াইবে তাই দেখা হয়। ব্যবসায়ের খতিয়ান অত্যাবশ্যকীয় হইলেও তাহার জন্য কৃষ্টির ক্ষেত্র হইতে চলচ্চিত্রকে নির্বাসন দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। অভি-নয়, রূপসজ্জা ও উন্নততর প্রয়োগ প্রণালীর দিকে যখন আরও অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইবে—তখন ভারতীয় চলচ্চিত্র তাহার সুষ্ঠু প্রকটন প্রভাবে আপন স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইবে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে অনেক ক্ষেত্রেই অভিনয়ের বড় দুরবস্থা দেখা যায়—যাহাকে অভিনয় বলা হয়, তাহা নায়িকার বিলাসলীলা ও অর্থহীন অংগভংগীমাত্র ও নায়কের চর্বিতচর্বণ ও ভাবপ্রকাশে অসরল ব্যঞ্জনা বলা যাইতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই যে ইহাতে অভিনেতৃবর্গের অভিনয় ক্ষমতার অভাব বোঝায় তা নয় (যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও অনেক স্থলেই দেখা যায়) কিন্তু পরিচালকের ভূমিকাগুলি সুচারুরূপে পরিচালনা করিবার অক্ষমতাই প্রতীয়মান হয়।

উচ্চাংগের চলচ্চিত্র প্রযোজনার্থ উত্তম কাহিনীর আব-শ্যক। অভিনয় যতই ভাল হউক না কেন, গল্প ভাল না হইলে প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্র গড়িয়া উঠিতেই পারে না; এবং আজকাল ভারতে নির্মিত অধিকাংশ চলচ্চিত্র সম্বন্ধেই এ কথা বলা যাইতে পারে যে—কাহিনীর দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য মন ভুলানো হাল্‌কা গান অথবা যৌনভাবোত্তেজক—এমন কি অশ্লীলতাদুষ্ট দৃশ্যও জুড়িয়া দেওয়া হয়। একালে আরও বিশুদ্ধ রুচির চলচ্চিত্রের জন্য প্রচারমূলক কার্য শীঘ্রই আবশ্যক। যদি প্রযোজক পরিচালকবর্গের উত্তম চলচ্চিত্র নির্মাণ করিবার মত বিচারবুদ্ধি না থাকে এবং তাঁহারা প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট—অপেক্ষাকৃত নিম্ন-

শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে কামোদ্দীপক দৃশ্য দেখাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বোঝান আবশ্যক যে কোনও চিন্তাশীল মার্জিত রুচির ভারতীয় দর্শক এরূপ দৃশ্য দেখিতে ঘৃণা বোধ করেন এবং প্রত্যেক সুবিবেচক ব্যক্তিই মনে করিবেন যে, এরূপ প্রযোজনা ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রগতির পক্ষে সমূহ ক্ষতি করিতেছে। কর্তৃপক্ষের অর্থলালসায় একটী শিল্পের এই অধোগতির জন্য প্রত্যেক চিন্তাশীল দর্শকই ব্যাথিত হইবেন।

অনেক স্থলে ভাল কাহিনীও প্রানহীন অভিনয়ের দোষে নষ্ট হইয়া যায়। চিত্রনাট্যের চিত্তোদ্দীপক ঘটনার দৃশ্যগুলি অতি-অভিনয়দুষ্ট হইয়া দূষিত হাবভাবই প্রকাশ করে। উচ্চাঙ্গের কলাশিক্ষাপ্রসূত সংযত, সংগত মনোভাব বিকাশ যাহা মানব চরিত্রের গভীরতমতন্ত্রীতে সাড়া জাগায়—তাহার বড়ই অভাব দেখা যায়। সেই জন্যই যখন শতকরা একটি চলচ্চিত্রে হয়ত ভাবপরিবেশের কিছু সুসংগত পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়—বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে আসা যায়—তখনই তাহা দর্শকদের অভ্যর্থনা পাইয়া থাকে। ইহার দ্বারা বেশ বোঝা যায় যে, অধিকাংশ দর্শকই আমাদের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে যে সকল চিত্র সপ্তাহের পর সপ্তাহ ও মাসের পর মাস চলিতেছে তাহার অনেক গুলিরই—সুলভ, অবাস্তব চমকপ্রদ দৃশ্যে, অস্বাভাবিক অভিনয়ে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে ও আরও উন্নততর চিত্রের প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া আছে।

'শ্যামরাহী' চিত্রে, বিনতা বসু

আধুনিক ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি প্রধান ত্রুটি—যাহা সর্বদাই চোখে পড়ে—তাহা বাস্তবতার সম্পূর্ণ অভাব। এই ত্রুটির জন্যই অনেক চিত্তাকর্ষক চলচ্চিত্রও ব্যর্থ হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই একজন স্ত্রীলোক অজস্র অশ্রুপাত করিতেছে কিন্তু তাহার মুখ ভাবহীন, সুন্দর ও অবিকৃত আছে। আমরা দেখি বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইবার পর হয়ত পুরুষটি বৃদ্ধ হইয়া পড়িল—কিন্তু তাঁহার স্ত্রী এতকাল অতীত হইলেও স্থিরযৌবনা রহিয়া গেলেন। কাহিনীর প্রথমাংশে নায়িকাকে দরিদ্র ও বন্ধুবান্ধবহীন, হয়ত কোনও পরিবারে চাকরাণীর কাজ করিতেছে দেখা গেল, কিন্তু তাহার পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্যে স্বতঃই তাহাকে পরিবারস্থ কন্যা রন্ধনকার্যে হাত পাকাইতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। দরিদ্র মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন যে, তাঁহার শিশু দুগ্ধাভাবে শীর্ণ ও মলিন হইয়া যাইতেছে—কিন্তু দেখান হয় একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট নধর শিশু দোলনায় শুইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া বেশ আনন্দে সুস্থকায় শিশুসুলভ শব্দ করিতেছে। দরিদ্র অথবা গ্রাম্য বালিকা বলিয়া যাহাদিগকে উপস্থিত করা হয় তাহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া মনে হয়, আমরাও চলচ্চিত্রের ঐরূপ দরিদ্র বালিকা হইতে পারিলে মন্দ হইত না। ভারতীয় চলচ্চিত্রে খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য সমূহের দিকে মোটেই নজর দেওয়া হয় না এবং

বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসার আবশ্যকতা পরিচালক-দিগের তপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয়। সেইজন্যই 'উদয়ের পথে'র ন্যায় কোনও চলচ্চিত্রে সাধারণভাবে সাদা শাড়ী পরিহিত কোনও দরিদ্র বালিকাকে সেইভাবেই তাহার বাটীতে দেখিলে—যেন কোনও জায়গায় নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ ধার করা পোষাকী সজ্জায় সুসজ্জিত বলিয়া মনে হয় না—এবং সেইজন্যই আমরা মুগ্ধ হই। আমাদিগের চলচ্চিত্রে আরও অধিক সাবলীল বিকাশ দেখিতে চাই।

একটি বিষয় দর্শক-দিগের উপভোগার্থ ক্রমাগত সমীচীন ও কলাজ্ঞান বর্জিতভাবে ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে—সেটি হইতেছে দ্বৈত-সঙ্গীত। চলচ্চিত্রের নায়ক নায়িকা বার দুই সাক্ষাতের পরই যে কোনও অশোভন মুহূর্তে বেশ সহজভংগীর সহিত উভয়ে মিলিয়া গান জুড়িয়া দিয়া থাকে। এবং এই ভাবের অধিকাংশ চলতি গীতি-নাট্যেই নায়িকার হাবভাব ও চালচলন অত্যন্ত লজ্জাকর ও অভারতীয় হয়। সংগীতের অবশ্যই আবশ্যকতা আছে। ইহা হালকা ধরণের চলচ্চিত্রের মনোমুগ্ধকারিণী শক্তি বাড়াইয়া দেয়—কিন্তু কাহিনীর ঘটনা বিশেষের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গীত যথাস্থানে দেওয়া উচিত—অসংগতভাবে যথাতথা, অনবধানতার সহিত গীত জুড়িয়া দিলে তাহা রসভঙ্গই করিয়া থাকে। এবং অত্যাবশ্যকীয় প্রেমের ব্যাপারও অবশ্য থাকিবে। সারা জগতই প্রণয়ীর প্রেমমুগ্ধ। কিন্তু নায়িকাকে একটি স্বাভাবিক নম্রস্বভাবা ভারতীয় বালিকা দেখাইতে হইবে—হাস্যবিলাসময়ী লজ্জাহীনা রমণী—কথায় কথায় কারণে অকারণে কেবল গান গাহিতেছে এরূপ নয়।

'হামরাহী' চিত্রে, 'রাধামোহন

ভাল-লাগা-না-লাগার মাপকাঠি সঠিক সমালোচনা ও কলাসৌষ্ঠবে প্রভাবান্বিত চলচ্চিত্রের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রযোজক পরিচালকবর্গ যে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন তাহার জন্য দর্শক সাধারণের প্রতি তাঁহাদিগের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। তাঁহাদিগের সৎ ও একনিষ্ঠভাবে চলচ্চিত্রকলার সেবক হওয়া উচিত—এবং এ কথা মনে রাখা উচিত যে, যদিও এই ক্ষুব্ধ জগতের অশান্তির হাত হইতে ক্ষণিকের বিরাম-লাভার্থ—জনসাধারণ নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ ও হাল্কা ধরণের ও মনোজ্ঞ চলচ্চিত্র চায়—তথাপি তাহারা নিশ্চয়ই এমন চলচ্চিত্র দেখিতে চায় যাহা তাহাদের আদর্শবাদীতার স্বপ্নকে বাস্তব সমালোচনায় ব্যক্ত করে ও যাহা তাহাদের হৃদয়ে সংগোপনে এমন রেখাপাত করিয়া দেয়—যাহার দ্বারা তাহারা মানবাত্মার মহত্তর বাণী শুনিতে পায় ও হৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় গভীর প্রদেশের এমন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখিবার সুযোগ পায়—যা তাহাদের অনেকদিন পর্যন্ত স্মরণ থাকে—যখন অপর সব হালকা নিম্নশ্রেণীর চলচ্চিত্রের কথা স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায়।

বাঙলা ছবির ভবিষ্যৎ

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

পরিণীতা, শেষরক্ষা খ্যাত পরিচালক শ্রীযুক্ত পশুপতি চটোপাধ্যায় যাঁরা বাংলা ছবির তুলনায় হিন্দি ছবিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন—বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে যেয়ে তাঁদের সেই ভ্রান্ত ধারনার কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি।

"অপরাপর প্রদেশের সংগে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে হ'লে বাঙলাদেশের প্রযোজকদের হিন্দী ছবি তৈরী করা ছাড়া গত্যন্তর নেই"—এই কথা বলায় জনৈক চিত্র-সমালোচক প্রশ্ন করলেন, "তা'হলে আপনি কি বলতে চান, বাঙলাদেশে বাঙলা ছবি তোলা বন্ধ করতে হবে?" হিন্দী ছবি তোলার দিকে মনোনিবেশ ক'রলে প্রযোজকরা বাঙলা ছবি আর তুলতে চাইবেন না—এই আশঙ্কাই সম্ভবতঃ বন্ধুর প্রশ্নের ভিতর থেকে উঁকি মারছে। বন্ধুর মনে এ-রকম আশঙ্কা জাগবার যে কোনোই কারণ নেই—অমন কথা আমি বলি না।—কারণ চেষ্টা-চরিত্র ক'রে একখানি হিন্দী ছবি তৈরী ক'রতে পারলে প্রযোজক তার থেকে যে-পরিমাণ অর্থের আমদানী আশা ক'রতে পারেন, সমগুণ-বিশিষ্ট (অর্থাৎ সমান Standard এর) একখানি বাঙলা ছবি যে তার এক চতুর্থাংশ টাকাও প্রযোজকের করতলস্থ ক'রতে সমর্থ হবে না, এটা অত্যন্ত জানা কথা। সারা ভারতবর্ষের ছবির বাজারের কথা ছেড়েই দিলুম। মাত্র এই বাঙলা দেশে—যেখানে প্রধানতঃ বাঙালীই বাস করে এবং বাঙলা ছবি তৈরী করা হয় প্রধানতঃ যেখানে দেখানোর জন্যে, সেইখানেই—একখানি জনপ্রিয় হিন্দী ছবি যতখানি টাকা তুলতে পারে, ততখানি অর্থ কি এনে দিতে পারে একখানি জনপ্রিয় বাঙলা ছবি? বোম্বে টকীজের "বসন্ত" বাঙলাদেশ থেকে যে-টাকা পেয়েছে, ইষ্টার্ণ টকীজের "শহর থেকে দূরে" বা নিউ থিয়েটার্সের "কাশীনাথ" সেই টাকা পেয়েছে কি? "কিস্‌মৎ" কাপুরচাঁদ লিমিটেডকে যে-পরিমাণ অর্থ এনে দিয়েছে বাঙলাদেশ থেকে "উদয়ের পথে" অরোরা ফিল্মস্‌কে সেই টাকা দিতে পেয়েছে কি?

১। বসন্ত—বাঙলাদেশে প্রথম প্রদর্শিত হয় কল্‌কাতার "রক্সী" সিনেমায়।

২। শহর থেকে দূরে—প্রথম প্রদর্শিত হয় কল্‌কাতার "রূপবাণী"তে ডিসেম্বর, ১৯৪৩

৩। কাশীনাথ—প্রথম প্রদর্শিত হয় কল্‌কাতার "চিত্রা"য়

৪। কিস্‌মৎ—বাঙলাদেশে প্রথম প্রদর্শিত হয় কল্‌কাতার "রক্সী" সিনেমায়

৫। উদয়ের পথে—প্রথম প্রদর্শিত হয় কল্‌কাতার "চিত্রা" এবং "রূপবাণী"তে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

ওপরের ছবিগুলির অর্থপ্রাপ্তির তুলনা মূলক আলোচনা করবার সময়ে আমাদের কিছুতেই ভুললে চলবে না যে, এদের সব ক'টিই প্রদর্শিত হয়েছে যুদ্ধান্তর্গত কালে—যে সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি সম্ভাব্যতার সীমাকে অতিক্রম করেছিল এবং বাঙলাদেশে অবাঙালীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল প্রচুর পরিমাণে, যুদ্ধের সংগে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের উপস্থিতির দরুণ। সত্যি কথা বলতে কি, সুদূর প্রাচ্যের রণক্ষেত্র অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার ফলে বাঙলার পূর্ব প্রান্তসীমাস্থ জনপদগুলিতে অসামরিক বাঙালীর সংখ্যা অসম্ভব রকম কমে গিয়ে বাঙলা ছবির প্রদর্শনক্ষেত্রকে বেশ খানিকটা সংকুচিত ক'রে তুলেছিল। কাজেই আশা করা নিশ্চয়ই অসংগত হবে না যে, আবার যখন দেশে স্বাভাবিক শান্তির অবস্থা ফিরে আসবে, তখন বাঙলায় বাঙলা এবং হিন্দী ছবির অর্থপ্রাপ্তির মধ্যে এতখানি বৈষম্য থাকবে না। কিন্তু সংগে সংগে একথাও আমি হলপ ক'রে ব'লতে পারি, বাঙালী দর্শকদের ভিতর সাধারণভাবে হিন্দী ছবির প্রতি হেতুক এবং অহেতুক প্রীতি এমন আশ্চর্যভাবে বেড়ে গেছে যে, বাঙলা ছবির দিকে আগেকার মতো সহানুভূতিপূর্ণ নেক-নজর করবার মন তাঁদের আর নেই। নেহাৎ ভালো না হ'লে বাঙলা ছবির প্রতি তাঁদের বরং বিরাগের মাত্রাটাই বেশী ক'রে চোখে পড়ে। বাঙলা ছবির অবস্থা এখন বাঙালীর কাছে অনেকটা 'গেঁয়ো যোগীর ভিখ্‌ না পাবার' মতো। হিন্দী

রূপ-রশ্মি

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কলিকাতা

ছবির প্রতি আমাদের অনেকের মনে একটা অহেতুক প্রীতি জন্মেছে, এ-কথা কেন বললুম, তার ব্যাখ্যা দরকার।—লক্ষ্য ক'রলে দেখতে পাবেন—পশ্চিমবঙ্গবাসীরা পূর্ববঙ্গের কথা—অর্থাৎ বাঙাল কথা—শুনতে এবং অনেক সময় কইতে (ঠিকভাবে কইতে না পারলেও কইতে চেষ্টা ক'রছে) ভালো বাসেন। আজকাল কল্‌কাতার ট্রামে বাসে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, হাফ্-প্যাণ্ট হাফ্-সার্ট-পরিহিত অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যুবকেরা সিগারেট মুখে দিয়ে অম্লানবদনে বেপরোয়াভাবে ইংরেজ বা আমেরিকান সৈন্যদের সংগে ভাঙা ইংরেজীতে কথা কয়ে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেন। ঠিক সমানই মনোবৃত্তি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বহু বাঙালী দর্শকের ভিতর। আজ যখন হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখন হিন্দী (বা হিন্দুস্থানী) কইতে বা বুঝতে পারা নিশ্চয়ই একটা বড়ো রকম বাহাদুরীর কথা বৈ কি। হিন্দী ছবির সংলাপের (ডায়ালোগের) এক-দশমাংশ বুঝতে না পেরেও এঁরা হিন্দী ছবির তারিফ করেন এবং সংগে সংগে নিজেদের অপরের কাছে হিন্দী ভাষার বিশ্বাসাগর হিসেবে জাহির করতে পেরে প্রচণ্ড আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন। 'ম্যয় তুম্‌সে প্রেম (আর একটু জবর দস্ত করে বলতে হলে মহব্বৎ করতিহুঁ', 'পেয়ারে তুঝে বিনা মেরা ছাত্তি (দিল) ফাট্ যাতা হায়' গোছের কথাবার্তার ভিতর থেকে রসাস্বাদন করবার ক্ষমতা যে বাঙালীর আছে, তাঁকে প্রশংসা করতেই হবে। হিন্দী ছবির প্রতি আমাদের এই অহেতুকী প্রীতির কথা বাদ দিলেও একথা কোনোমতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বাঙালা দেশে হিন্দী ছবি একটী স্থায়ী এবং ক্রম-বর্ধমান চাহিদার সৃষ্টি করতে পেরেছে। সংগে সংগে এ-কথাও স্বীকার্য যে একদিন যেমন বাঙলা ছবি ভারতীয় ছবির রাজ্যে অপ্রতি-দ্বন্দী ছিল, তেমন অবস্থা আজ আর নেই ; আজ বাঙলা ছবিকে হিন্দী ছবির সংগে তীব্র প্রতিদ্বন্দীতায় সম্মুখীন হতে হয়েছে। এবং অত্যন্ত পরিতাপের কথা যে এই প্রতি-দ্বন্দীতায় বাঙলা ছবিকে অনেকখানি পেছু হেটে যেতে হয়েছে। আর এই কারণেই আজকে বাঙলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্থিরভাবে চিন্তা করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বাঙলা ছবি তোলা কি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব—না, কিছুতেই। হিন্দী ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ক'রে তোলবার দরুণ যদি কোনো দিন বাঙালীর পক্ষে বাঙলা ভাষা ভুলে যাওয়া অপরিহার্য হয়, সেই দিন হয়ত সংগে সংগে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে ব'লে বাঙলা ছবি তোলাও বন্ধ হবে। কিন্তু বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম প্রভৃতি থেকে সুরু করে ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, বঙ্কিম মধু, হেম, নবীন, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মনীষীরা যে ভাষাকে বিশ্বসাহিত্য দরবারের সুউচ্চ আসনে সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই ভাষা একদিন হিন্দী ভাষার প্রতাপে বাঙলা দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে, একথা যেমন স্বপ্নেও কল্পনা করা দুষ্কর, তেমনি হিন্দী ছবির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ বাঙলাদেশের প্রযোজকরা বাঙালী জনসাধারণের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে বাঙলা ছবির নির্মাণ একেবারে বন্ধ ক'রে দেবেন, এ কথাও একেবারেই অচিন্তানীয়। না—বাঙলা ছবি তোলা কোনো দিনই বন্ধ হবেনা।

কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, একসময়ে যেমন একসংগে অগুন্তি বাঙলা ছবি তৈরী হ'ত, বর্তমানে ঠিকততটা আর হচ্ছেনা এবং ভবিষ্যতেও হবেনা। নিউথিয়েটার্স ছাড়া বাংলা দেশের অপরাপর প্রযোজকরা আগে প্রধা-নতঃ বাঙলা ছবি তোলার দিকেই মনোনিবেশ করতেন। হিন্দী ছবি তোলবার কথা তাঁদের কল্পনাতেই স্থান পেতনা। নিউথিয়েটার্স বহু ছবিই তুলেছেন একসংগে বাংলা এবং হিন্দীতে। মাত্র একক হিন্দীতে এঁরা আগে খুব কম ছবিই তুলেছেন (পুরণ ভকত, মিলিওনিয়ার, ডাকু মনসুর, কারওয়ান্-ই হায়াদ্, ব্লাড ফ্যুয়েড, জিন্দালাস, দুলারী বিবি এবং অনাথ আশ্রম হচ্ছে নিউথিয়েটার্সের পূর্বতন একক হিন্দীতে তোলা ছবির সম্পূর্ণ তালিকা।) কিন্তু বর্তমানে বাঙলার বহুচিত্র প্রযোজকই হিন্দী ছবি তোলার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কারণ, আজকের দিনে হিন্দী ছবির প্রায় মার নেই বললেই চলে। একটা

চলনসৈ গোছের হিন্দী ছবিও প্রয়োজকের টাকা ঘরে ফিরিয়ে আনেই, উপরন্তু কিছুলাভও এনে দেয়। আর দৈবাৎ যদি ছবিটা কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে (ধরুন, ছবির একখানা গান লোকের ভালো লেগে গেল), তাহলেও কথাই নেই—প্রয়োজক যেন ডার্বির টিকিট পেয়ে গেলেন। একখানা ভালো হিন্দী ছবি প্রযোজককে অর্থ এবং যশ দুইই এনে দেয় অপরিমিত মাত্রায়। এছাড়াও হিন্দী ছবি তোলার দিকে ঝোঁকবার একটি প্রকাণ্ড সংগত কারণ আছে। গতানুগতিকতার বশবর্তী হয়ে বাঙলা ছবির উদ্বোধন আজও পর্যন্ত হয়ে থাকে একমাত্র উত্তর কলিকাতার পাঁচটি চিত্র-গৃহের একটিতে। চিত্রা, রূপবাণী, উত্তরা, শ্রী এবং মিনার এই পাঁচটি চিত্রগৃহ ছাড়া বাংলা ছবির মুক্তিলাভের অন্য গতি নেই। প্রত্যেক ছবির উদ্বোধন গৃহে একটানা চলার আয়ুষ্কাল গড়্পড়্তা ন্যূনকল্পে তিনমাস করে ধরলেও দেখা যাচ্ছে, বর্ত্তমানে এক বছরে কুড়ি খানার বেশী বাঙলা ছবির প্রয়োজন নেই আদপেই। তার ওপর এই কুড়িখানির ভিতর যদি খান চার পাঁচ ছবি জনপ্রিয়তার দোহাই দিয়ে এক একটা চিত্রগৃহকে বৎসর খানেক কাল অধিকার করে বসে থাকে, তাহলে বাকি ছবিগুলিকে যে কি ভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মুক্তি পাওয়ার অপেক্ষায় বাক্সবন্দী অবস্থায় থাকতে হয়, তা ভুক্তভোগী প্রযোজক মাত্রই জানেন। কাজেই আজ যখন কোনো প্রযোজক একখানি বাঙলা ছবি নির্মাণে ব্রতী হবেন, তখন তাঁর প্রথম ভাবনা হবে সেই ছবির মুক্তিলাভের বন্দোবস্ত তিনি কি ভাবে করতে পারেন। অবশ্য এই সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে যদি ছবিখানি চিত্রগৃহের মালিকদের মনে ধরে। কিন্তু একখানি ছবি পুরোপুরি তৈরী করার পর চিত্রগৃহের মালিকদের তা দেখিয়ে যদি ছবির উদ্বোধনের বন্দোবস্ত করতে হয়, তাহ'লে সে ছবির উদ্বোধনের তারিখ ছবিশেষ

হবার বছর খানেকের ভিতর পাওয়া যাবেনা—এটা ধ্রুব সত্য। এ বিষয়ে প্রচলিত রীতি যেটা আছে, সেটা হচ্ছে—ছবি আরম্ভের সংগে সংগেই কোন না-কোন চিত্র-গৃহে তার উদ্বোধনের বন্দোবস্ত পাকা ক'রে ফেলা।—এবং এই কাজটা সহজ হয় তখনি, যখন প্রযোজক, পরিচালক, গল্প লেখক বা অভিনেতা-অভিনেত্রী সমাবেশের উপর চিত্রগৃহের মালিকের কিছুটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রতে পারা যায়। কোন রকমে 'দু'কুড়ি সাতের খেলা' বজায় রেখে ছবি হয়েছে এটা বুঝতে পারলে কোন চিত্রগৃহের মালিকই সহজে সেই ছবির মুক্তি দিতে রাজী হন না।—তার উপর আবার এক একটী চিত্রগৃহ আজকাল এক-এক বিশেষ প্রযোজক বা পরিবেশকের আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। যেমন, চিত্রা—নিউ থিয়েটার্সের ; শ্রী এবং উত্তরা—এক্জিবিটর্স সিণ্ডিকেটের (এম, পি ; এস্, ডি, এবং ডিল্যুক্স্ প্রভৃতির পরিবেশক রীতেন কোম্পানীর অধীন) ; মিনার—এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্সের সংগে চুক্তিবদ্ধ এবং রূপবাণী—প্রাইমা ফিল্মসের। কাজেই আজকের দিনে ছোটখাটো প্রযোজকের পক্ষে ছবির মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করা রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার।

'মানে-না-মানা' চিত্রে সন্ধ্যা ও ধীরাজ।

হিন্দী ছবির দিক থেকে মোড় ঘুরিয়ে বাঙলা ছবির দিকে বাঙালী দর্শকের মনকে নূতন ক'রে আকৃষ্ট করবার জন্যে বাঙলার শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্স আজ বদ্ধপরিকর।—তাঁদের প্রতিশ্রুতি, প্রিয়-বান্ধবী, কাশীনাথ এবং উদয়ের পথে ('দুই-পুরুষ' এখনও আমরা দেখিনি) তাঁদের এই শুভ প্রচেষ্টার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাঙলার অপরাপর প্রযোজককে বাঙলা ছবির নির্মাতা হিসাবে যদি নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে হয়, তাহ'লে তাঁদের মধ্যে প্রত্যেককেই নিউ থিয়েটার্সের এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উন্নততর শিল্প-কলার পরিচায়ক রসসমৃদ্ধ ছবিই প্রস্তুত ক'রতে হবে—যে কোন উপায়ে জোড়াতালি দিয়ে ছবি তৈরী ক'রলে চলবে না।—প্রযোজনা থেকে সুরু ক'রে পরিচালনা, গল্প এবং চিত্রনাট্য রচনা, সংগীত রচনা এবং পরিচালনা, অভিনয়, অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন, দৃশ্য-সংস্থাপনা, চিত্র-গ্রহণ, শব্দ-গ্রহণ, সম্পাদনা এবং পরিস্ফুটনা—চলচ্চিত্র নির্মাণের কোনও একটি বিভাগেও ফাঁক এবং ফাঁকি রাখলে চলবেনা—চলচ্চিত্র—নির্মাণের সংগে সংশ্লিষ্ট প্রতিটী শিল্পী এবং কর্মীকে হ'তে হবে একনিষ্ঠ, উন্নতিশীল, আন্তরিকতাপূর্ণ, প্রগতিপন্থী (শিল্প বিষয়ে), সজীবতাপূর্ণ এবং সত্যসন্ধী রূপ ও রসের পূজারী এবং ধেয়ানী। চলচ্চিত্র-শিল্পের বাজারে মেকী এবং ভেজালের দিন ফুরিয়ে এসেছে।—শিল্প এবং ব্যবসায়—এই দুইয়েরই উন্নতির দিকে দৃঢ় লক্ষ্য রেখে যে প্রযোজক চল্‌তে পারবেন, মাত্র তাঁরই ভবিষ্যৎ

আশাপূর্ণ; এ ছাড়া বাকী সকলকেই পথ দেখতে হবে।

সুক্ষ্ম রসানুভূতি বাঙালীর যতটা আছে, দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যক্রমে ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসীরই তা নেই। —এবং সেই কারণেই বাঙলা ছবির ভিতর দিয়ে যে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম রসের পরিবেশন সম্ভব, তা হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ছবির ভিতর দিয়ে কোন দিনই সম্ভব হবে না।—বাঙালী দর্শকের মন রসের খোরাকের জন্যে নিত্য লালায়িত এবং হিন্দী ছবি দেখে সে যতই আনন্দলাভ করুক না কেন, তার রসের ক্ষুধার পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। এবং এরই জন্যে হিন্দী ছবিকে সে যতই বাহবা দিক না কেন, বারবার সে ফিরে আসে বাঙলা ছবি দেখে তার রস-ক্ষুধাকে মেটাবার জন্যে। তার এই রস-সন্ধানী মনকে পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত করবার গুরু দায়িত্ব নিতে হবে ভবিষ্যৎ বাঙলা ছবির প্রযোজকদের।

বন্যা

প্রবোধ কুমার সান্যাল

(সিনেমার গল্প)

●

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল যে দাবী নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যের পরিচয় পেয়ে বাঙ্গালী সাহিত্যানুরাগীরা সে দাবী অগ্রাহ্য করতে পারেননি। বাংলা চিত্র জগতে কাহিনীর দুর্বলতা দর্শক সাধারণকে পীড়া দেয়। এই দুর্বলতা দূর করবার জন্য 'রূপ-মঞ্চ' বাংলা সাহিত্য জগতের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের চিত্রজগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বহুদিন থেকেই চেষ্টা করছে। রূপ-মঞ্চ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়ে শ্রীযুক্ত সান্যাল —চিত্ররূপের সম্ভাবনার দিক দৃষ্টি রেখে 'বন্যা' গল্পটী রচনা করেছেন।

●

মেয়েটা মনে প্রাণে ছিল দুষ্ট, দুরন্ত আর অসামাজিক। অপরের ক্ষতি করতে পারলে খুশী হোতো,—অবাধ্য ছিল সকলের, অন্যায় উদ্‌ভাবনের শক্তি ছিল তার সহজাত। গ্রামে ছিল তার অখ্যাতি, অপযশ—সবাই তাকে ভয় করতো, সে কাছে এলে লোকে আতঙ্কিত হোতো। গ্রামের কুকুরটা পর্যন্ত তাকে দেখে প্রহারের ভয়ে দৌড় মারতো।

চুরি বিদ্যায় সে পাকা। অন্ধকারে লোকের বাগানে ঢুকে আম পাড়তে গিয়ে সে পা ভেঙেছে, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করেনি। নদীর পাড় দিয়ে নেমে সে জেলেদের জাল কেটে দিয়ে আসে, জমিদারী সেরেস্তার কাঁচা ঘরের দেওয়ালে বাঁশের বাঁধা দড়ি কেটে দিয়ে পালায়, মাঠের আল ভেঙে জল বের করে দিয়ে ক্ষতি করে, সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুব জলে থেকে পুরুষ ছেলের পা ধ'রে টেনে জলে ডুবিয়ে জব্দ করে—ইত্যাদি ইত্যাদি। মেয়েটা রোগা, শ্রীহীনা, কিন্তু হাত পায়ের হাড়গুলো মজবুত। চুরি ক'রে খেয়েছে সে অনেকবার, মার খেয়েছে তার চেয়েও বেশী—কিন্তু মার খেয়ে সে কাঁদেনা। গ্রামে সে ছিল সর্বত্র নিন্দিত, ঘৃণিত। কিন্তু সেও ঘৃণা করতো সবাইকে। নিষ্ঠুর হ'তে তা'র একটুও কুণ্ঠা ছিল না।

মেয়েটার বাপ ছিল ঘরামি, মা ছিল না। দিনরাত বাপের তাড়না খেতো, মা'র খেতো। মেয়েটা বাপের কাজ পণ্ড ক'রে দেয়, আর বাপ তাকে মারে। শেষ অবধি কাদার তাল বাপের মুখে মাখিয়ে মেয়েটা ছুটে পালায়। বাপ বলে, মর, মর, মরে যা, তোর মা যেখানে গেছে সেইখানে যা—বাপ তা'র জন্তে রান্না ক'রে বসে থাকে, মেয়ে ঘরে আসেনা, আসতে চায় না। বাপ শেষ পর্যন্ত মেয়ের খাবারটা কুকুরকে দিয়ে খাওয়ায়। মেয়ের ওপর তার এতই রাগ।

সেই গ্রামে ছিল এক কুমোর। সে তা'র চাকা ঘোরাতো। মাটির ভাঁড় তৈরি করতো, হাড়ি তৈরি করতো—আর সেগুলো চালান দিত নৌকায়। সেই নৌকা চালিয়ে নিয়ে যেতো তা'র ভাগ্নে। ছেলেটা বাঁশী বাজাতো, গরু চরাতো, মামাকে লুকিয়ে মাটির পুতুল গড়তো। গরুর দুধ দুইয়ে সে বিক্রী করতে যেতো। মামা যখন নদীর খাঁড়িতে বাঁশ বেঁধে জাল ফেলতো, ছেলেটা তাকে সাহায্য করতো, আর জাল পাহারা দিতে বসে বাঁশী বাজাতো। একদিন মেয়েটা গোপনে জাল কাটতে এসে অলক্ষ্য বাঁশীর আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ায়, মেয়েটা বিমনা হয়ে ওঠে বাঁশীর সুরে, তা'র আত্ম চেতনা যেন ফিরে আসে, কিন্তু অবশেষে ভাবের বৈলক্ষণ্য কাটিয়ে সহসা ছেলেটার প্রতি একটা মস্ত মাটির ঢেলা ছুঁড়ে পালায়। কিন্তু বাঁশীটা সে যেন বার বার শোনে মনে মনে।

একদিন ছেলেটার এক হাঁড়ি দুধে মেয়েটা পাতি লেবুর রস টিপে দিয়ে নষ্ট ক'রে দেয়। কিন্তু ছেলেটা তা'র হাত ধ'রে ফেলে। দুজনে বচসা হয়। মেয়েটা ছেলেটার বাঁশীটা কেড়ে নিয়ে মট্‌কে ভেঙে ফেলে। ছেলেটা রাগ করে ওঠে। মেয়েটা বলে, এবার আমাকে মারো,—সবাই মারে, তুমি মারবেনা কেন? মারো!

ছেলেটা বলে, না, মারবো না।

কেন?

মারলে বাঁশী ফিরে পাবোনা।

কিন্তু অন্যায় করেছি, শাস্তি দেবেনা?

ছেলেটা বলে, অন্যায় করলে কি শুধু শাস্তিই দিতে হয়?

মেয়েটা চিন্তিত হয়ে ভাবে, শাস্তি ছাড়া আর কীই বা তার পাওনা? মুখে বলে, তবে আর কী, বলোত?

ছেলেটা বলে, আবার যখন দেখা হবে, ব'লে দেবো।

মেয়েটা ভাবে। তার ভয়ানক কৌতূহল! সে স্থির থাকতে পারে না,—কৌতূহল তাকে স্থির থাকতে দেয় না।

একদিন সে কুমারের বাসায় এসে ঢুকলো। ছেলেটা তখন পুতুল গড়ছে, মামা গেছে হাটে। মেয়েটা পিছন থেকে বলে, এসব পুতুল তুমি গড়েছ? বাঃ—চমৎকার ত!

ছেলেটা বলে, নেবে একটা?

মেয়েটা বলে, না। চাইনে!

কেন?

পুতুল আমি রাখবো কোথায়? পুতুল নিয়ে কী হবে?

খেলা করবে?

মেয়েটা বলে, না, গ্রামের যারা পুতুল তাদের নিয়ে আমি খেলি। ভাঙি আর গড়ি। কই, কী যে বলবে বলেছিলে?

ছেলেটা বলে, আগে হাত পেতে আমার পুতুল নাও, তা'হলে বল্‌ব।

মেয়েটা হাত বাড়িয়ে একটা পুতুল নিল। ছেলেটা তখন হাসিমুখে বললে, তোমাকে শাস্তি না দিয়ে পুতুল দিলুম, এই কথাটা মনে রেখো।

মেয়েটা একথার অর্থ বুঝতে পারে না, অথচ কী যেন একটা অসহ্য অস্বস্তি অনুভব করে। যেন একটা রহস্য দেখে চোখের সামনে, তার যেন ভয় হয়।

মামা এসে দাঁড়ায় পিছনে। চেঁচিয়ে বলে, তুই—তুই এখানে কেন? যা, যা বেরো, দূর হ—হতচ্ছাড়ি, বদমায়েস—

মামা তেড়ে যায়, ভাগ্নে বাধা দেবার চেষ্টা করে। মেয়েটা পালায়,—যাবার সময় একটা ফুলগাছ উপড়ে দিয়ে চলে যায়। বাইরে এসে রাগে পুতুলটাকে ভেঙে একটা গাছতলায় ফেলে হাঁটতে থাকে। আজ যেন সে প্রথম অপমানিত বোধ করলো। জীবনে এই প্রথম।

এই বন্য মেয়েটা গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাইকে শত্রু বানিয়েছিল। একদিন কোন একটা ছোট ছেলের গায়ে বিছুটি পাতা ঘষে দিয়ে সে ছুট দিল। ছুটতে ছুটতে এলো নদীর ধারে এক বটতলায়। নদীতে তখন কুমোরের ভাগ্নে নৌকা নিয়ে চলেছে বাঁশী বাজিয়ে। বাঁশীর মধুর তানে মেয়েটা চমকে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। ছেলেটাকে দেখলো দূরের থেকে। ভাঙ্গা পুতুলটা দেখলো সেই বটের তলায়। মেয়েটা নিশ্বাস ফেলে একদিকে চেয়ে রইলো। চারিদিকে তখন বসন্তকাল! মেয়েটার সর্বাংগে এসেছে তারুণ্য!

বাঁশীর আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে এলো।

ছেলেটার নাম মণিলাল, মেয়েটার নাম উমা

* * *

সেই গ্রামে গাজনের উৎসব। উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা। এ গ্রামে পটুয়ার কাজ বিখ্যাত। এখানকার মৃৎশিল্পশালা দেখার জন্য দেশ বিদেশ থেকে লোক আসে। বহু টাকার কাজ কারবার হয়। সেই মেলা দেখতে এসেছিল শহর থেকে একদল ব্যবসায়ী, তা'রা সকলেই ধনী। তারা মণিলালের ষ্টলে ঢুকে হাঁড়ী, তিজেল, ঘট ইত্যাদির কারুকার্য দেখে বিস্মিত হয়, এবং পুতুলের ছাঁচ ও শিল্পজ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়। একজন ব্যবসায়ীর মনে একটা প্লান আসে, এবং সে মণিলালকে একটা অফার দেয়। মণিলালের চোখে ভাসে স্বপ্ন। সে ধনী, সে খ্যাতিমান, সে প্রতিষ্ঠা-বান—ব্যবসায়ীর প্রস্তাবে অভিভূত হয়ে সে রাজী হয়।

যাবার আগে সে কলসী ক'রে যখন দুধ সরবরাহ করতে চলেছে, সেই সময় সহসা একটা ঢেলা এসে কলসীতে লাগে, কলসী ফেটে দুধ ছড়িয়ে পড়ে মণিলালের সংগে। ওদিক থেকে উমা নিজের নির্ভুল লক্ষ্য দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে।

দুজনে দেখা হয়। কাছাকাছি আসে।

মণিলাল সগর্বে ঘোষণা করে, সে শহরে যাবে। সে অনেক ধন দৌলতের মালিক হবে। তার যশ, তার প্রতিষ্ঠা।

উমা বলে, বেশ ত, যাও।

নদীতে নৌকা বেয়ে যাবার সময় বাঁশীর তান শুনে উমা আবার এসে বটতলায় দাঁড়ায়। বাঁশীর সুর ভাসে দূর থেকে দূরে। উমার কান্না পায়। তার সব শূণ্য মনে হয়।

উমা ঘরে এলে তা'র ঘরামি বাপ চেঁচিয়ে ওঠে। মারতে যায় মেয়েকে। দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়ে মেয়েটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাপ বলে, তোর জন্তেই আমার বদনাম। গাঁশুদ্ধ লোক বলছে, তুই নাকি কুমোরের ভাগ্নেটার সংগে ইত্যাদি।

উমা অবাক হয়ে যায়।

বাপ বলে, এতদিন তোর নষ্টামি সহ্য করেছি, এবার আর এ-কলঙ্ক সইবো না। তুই আমার এ গাঁয়ে বাস ওঠালি। আমি আর থাকবো না, যেদিকে দুচোখ যায়, চ'লে যাবো। চল্ তুই আমার সংগে।

যাবার সময় বুড়ি এক পিসি আর তার কাণা ও হাবা একটা ছোট্ট ছেলে সংগে জোটে। মোট চারজন মিলে একটা দল হয়। তারা গ্রাম ছেড়ে চল্লো ভাগ্য অন্বেষণে। ঘরামি বলে, গতর থাকলে ভাবনা কি? যেখানেই যাবো খেটে খাবো। তুই পোড়ার মুখি আমার সংগে কাজ করবি ত? খুব পেট ভরে খেতে দেবো, কাজ, কাজ করা চাই কিন্তু।

উমা বলে, হ্যাঁ করব বাবা।

তারা পথে বেরিয়ে পড়ে।

* * *

এদিকে মণিলাল আসে শহরে। তাকে নিয়ে এক কারখানা খোলা হয়েছে। কারখানার মালিক চৌধুরী সাহেব। তিনি ধনী ও সুকৌশলী। কারখানায় মিস্ত্রিরা কাজ করে, আর মণিলাল তাদের শেখায়। সেই পুতুল

বাজারে বিক্রি হয়, কারখানার খ্যাতি ও প্রসার বাড়ে। বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দেশ বিদেশ থেকে অর্ডার আসে।

চৌধুরী সাহেব প্রতিশ্রুতি পালন করেন না। তাঁর ধারণা, মিস্ত্রি ও কর্মীদের যদি ধন দৌলত বাড়ে, তবে তারা বিলাসী হবে, কাজে বিমুখ হবে—তারা সংযম হারাবে, তারা সমাজের কোন উপকারে আসবে না। সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসম্পদ তাদের হাতে না আসাই ভালো। তাদেরকে ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট করা মানে সমাজের শত্রুতা, কল্যাণের বিরোধিতা। চৌধুরী সাহেব বিচক্ষণ লোক।

একদিন এই নিয়ে মণিলালের সংগে তাঁর বিশেষ বচসা হয়। তিনি জানিয়ে দেন, মণিলাল চ'লে গেলে তাঁর এমন কিছু ক্ষতি হবে না—বিশেষজ্ঞ মিস্ত্রি তিনি তৈরী করে নিয়েছেন ইতিমধ্যে। তারা ভালো ছাঁচ শিখেছে!

ওদিকে অনেক প্রকার দুঃখ দারিদ্রের ভিতর দিয়ে উমাদের দল এসে পৌঁছায় মহকুমা শহরে। সেখানে ঘটনাচক্রে এক লেবার কনট্রাক্টরের কাছে উমারা এসে পৌঁছোয়। সামরিক লোকদের জন্য বাংলো তৈরীর কাজে লোক দরকার। উমার বাপ লখিন্দরের কাজ জুটে যায়। দৈনিক মজুরী আড়াই টাকা।

মজুরীর পরিমাণ শুনে লখিন্দর আনন্দে দিশাহারা। এ ছাড়াও আশ্বাস পাওয়া গেল, উমারও কাজ জুটতে পারে। সুতরাং সেখানে থেকে তাদের রিক্রুট করে বড় শহরে আনা হোলো।

শহরে এসে তারা মজুর আমদানি আপিসের এক দালালের পাল্লায় পড়লো। উমাকে দেখে দালাল ভদ্রলোকটি একটু বেশী রকম আগ্রহশীল হয়ে উঠলো। উমার ভাব-ভংগী সহজ, সরল এবং তা'র চলন ধরণ গ্রাম্য চপলতায় ভরা। দালাল তাকে ভুল বুঝলো।

তারপর]থেকে দালাল প্রায়ই আসে। উমার সংগে ঘনিষ্ঠ হবার প্রয়াস পায়। অকারণে টাকা দেয়, অহেতুক আনা গোনা করে, এবং একবার এলে সহজে নড়তে চায় না। উমা বলে, আমি কাজ করিনে, তবে টাকা দেন কেন?

লোকটা বলে, টাকার জন্যেই ত কাজ। ধরো, যদি কাজ না ক'রেই টাকা আসে, মন্দ কি?

উমা ভাবে, এরা শহরের লোক, হয়ত শহরের প্রকৃতি এইরূপ।

লোকটা শোবার ঘরেও আসে, রান্নাঘরেও ঢোকে। বলে, ভবিষ্যতে তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে, আমি যা বল্‌ব তাই করবে, কেমন?

উমা ভাবে লোকটা বুঝি বা সত্যিই ভালো।

এদিকে মণিলাল কাজ করে, কারখানার মিস্ত্রিদের মধ্যে সে খুব জনপ্রিয়। সে নিজের মজুরির পয়সায় ওদের খাওয়ায়, ওদের সাহায্য করে, অনেক সময় নেশার পয়সা জোগায়। তারা যখন অনুরোধ করে তখন বাঁশী বাজিয়ে তাদের আনন্দ দেয়। মণিলালের প্রতিপত্তি অসীম। তা'র সংসার নেই, অভাব নেই, দুশ্চিন্তা নেই,—শিল্পি-জনোচিত বেপরোয়া ও বিশৃঙ্খল ভাব তার। কিন্তু চৌধুরী মশায়ের সংগে তার বিরোধ যখন ঘন হয়ে উঠলো, তখন সে কাজে জবাব দিল। চৌধুরী সাহেব দুঃখিত হলেন না, কিন্তু যখন দেখলেন অন্যান্য মিস্ত্রিরাও আর কাজ করতে চায় না, তখন তিনি প্রমাদ গণলেন। মণিলাল ছাড়া মিস্ত্রিরা কাজ করবে না।

একদিন সন্ধ্যায় চৌধুরী মণিলালকে ধরলেন। মণিলাল দেখলো চৌধুরী মদ্যপান করেন। সোজা এসে চৌধুরী মণিলালকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। বোঝা গেল তিনি যতটুকু নেশা করেন, তার চেয়ে বেশী উল্লসিত হয়ে ওঠেন। মণিলালের সংগে যেন তার পূর্বজন্মের আত্মীয়তা, আর গলাগলি—এ জন্মে মণিলাল ছাড়া তার আর কেউ নেই। আদর ক'রে, আলিঙ্গন ক'রে, আপ্যায়িত ক'রে—তিনি ছোকরাকে একেবারে ভাসিয়ে দিলেন। মোটরে চ'ড়ে ঘোরালেন, হোটেলে খাওয়ালেন, পাশে বসিয়ে কোনো একটা নাচগানের আসরে আমোদ আহ্লাদে যোগ দিলেন। তারপর রাত্রে বাসায় এনে নেশার ঘোরে আপন কন্যার সংগে পরিচয় করালেন। মেয়েটি তরুণী ও সুন্দরী।

চৌধুরী বললেন, কমলা, কমলা—এই ছাখ মা, কা'কে ধ'রে এনেছি! ভারি ভালো ছেলে—সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে! মস্ত শিল্পি! চমৎকার বাঁশী বাজায়।

কমলা তখনি বাপের মতনই গদ্‌গদ্‌ হয়ে উঠলো। বলে, তাই নাকি, বাবা? শিল্পি! বাঁশী বাজায়? বাঁশী আমার খুব ভাল লাগে!—এসো তুমি আমার ড্রইংরুমে! তুমি বাঁশী বাজাবে, আমি খুব শুনবো।

মেয়েটা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত! অর্থাৎ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে তরুণ সুশ্রী মণিলালের প্রতি আসক্ত হোলো। সে যেন মণিলালের জন্যেই এতকাল বসেছিল!

অত্যন্ত যত্নের চোটে মণিলাল ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। চৌধুরী আবার তাকে ধরলেন। বললেন, আমার মেয়ে! একটিমাত্র মেয়ে!

মণিলাল বলে, তা দেখছি!

চৌধুরী বললে, আমার যা কিছু সব ওই মেয়ে পাবে, তা জানো?

জানলুম।—মণিলাল বলে।

যদি বলি তুমিও এর অংশ পাবে?

আমি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—ব'লে চৌধুরী আবার মণিলালকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, কথা দাও! আমার কথা শুনবে?

মণিলাল বললে, কী কথা?

আমার কারখানা তুমি চালাবে। আচ্ছা, আচ্ছা, যা চাও সব দেবো। মানে, একটা কথা। তুমি যদি আমার কারবারকে বড় ক'রে তোলো, কমলার সংগে তোমার বিয়ে দেবো।

কমলার সংগে? মণিলাল অবাক।

হ্যাঁ, আমার মেয়ে কমলার সংগে। তা হ'লে বুঝে দেখো তোমার সংগে আর কোনো বিরোধ নেই। আমার কারবার বড় হয়ে উঠবে……অনেক টাকা……প্রচুর টাকা……।

সকাল হোলো। চৌধুরী নামলেন। তাঁর চেহারা বদ্‌লে গেছে! তিনি গম্ভীর! তিনি হিসাবী। মণিলালকে ডেকে বললেন, তুমি কি-জন্তে আমার এখানে এসেছিলে বলো ত? মানে, আমার ঠিক মনে নেই। মানে, আমার কারখানায় আর তুমি কাজ করতে চাওনা, কেমন?

মণিলাল অবাক।

চৌধুরী বললেন, বেশ, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না। তুমি ছাড়াও লোক আছে!

মণিলাল ভাবলো, লোকটা অদ্ভুত প্রকৃতির বটে। নেশা করলে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়, আর দিনের বেলা যেমনি দাম্ভিক, তেমনি আত্মসচেতন। মণিলাল বলে, কাল রাত্রে আপনি কি বলেছিলেন আমাকে?

কাল রাত্রে! তোমাকে! আমি!—পাগল, পাগল তুমি একটা! যাও, যা বলবার থাকে, আমার আপিসে ব'লো।

মণিলাল বেরিয়ে আসে। পথে কমলা বাধা দিয়ে দাঁড়ায়। তুমি আসবে, নিশ্চয় আসবে, তোমাকে আসতেই হবে। বাবার কথায় কিছু মনো করো না। অনেক কথা আছে তোমার সংগে।

মণিলাল বলে, কিসের কথা?

কমলা বলে, সে অনেক, অনেক! তুমি আমাকে পাগল করেছ, আর আমাকে তুমি পাগল করো না!

কমলা অঙ্গভঙ্গী করে, কটাক্ষে বাণ নিক্ষেপ করে, সাজসজ্জার কৌশলে পুরুষের বাসনাকে খুঁচিয়ে তোলে।

মণিলাল চ'লে যায় চিন্তার জটিলতা নিয়ে।

চৌধুরী অফিসে বসে টেলিফোন করেন কোনো এক ব্যক্তিকে। বলেন, হ্যালো···কয়েকজন ভালো পটো মিস্ত্রি দিতে পারবে?

উত্তর আসে, হ্যাঁ, পারবো বৈকি?

চৌধুরীর কারখানায় নতুন লোক আসে। দু'চারজন স্ত্রীলোক কর্মী এসে জোটে। মণিলালের দলবল কারখানা থেকে বেরিয়ে যায়, তারা স্থির করেছে কোথাও নতুন কারখানা করবে। এমন সময় একদিন সেই দালালটি চৌধুরীর কারখানায় উমাকে এনে হাজির করে। দালালের সংগে চৌধুরীর পরিচয় ঘনিষ্ঠ।

শ্রীমতী লীলা দেশাই

দেবকী বসু পরিচালিত কালিদাসের অমর
কাব্য মেঘদূতে দেখা যাবে ———.

নিউ থিয়েটার্সের নার্স সি, সি, চিত্রে

শ্রীমতী ভারতী

উমা এই পুতুলের কারখানায় কাজ পায়। কাজেই তার আনন্দ। কিন্তু পুতুলগুলো দেখে সে বিমনা হয়ে ওঠে। এই পুতুলের ছাঁচ যেন সে কোথায় দেখেছে। মণিলালকে তার মনে পড়ে। সেই বাঁশী, সেই পুতুল, নদীর ধারের সেই বটতলা!

কিন্তু পুতুলের ছাঁচ তেমন আর ভালো হয়না—বাজারে বদনাম হয়। চৌধুরী চিন্তিত হলেন। ভবিষ্যতে তার কারবার নষ্ট হতে পারে, লভ্যাংশ কমে যেতে পারে। তিনি ছটফট করতে করতে গেলেন হোটেলে। সেখানে গোপনে নেশা করে গাড়ী নিয়ে ছুটলেন মণিলালের খোঁজে। কিন্তু মণিলালকে না পেয়ে বাড়ী ফিরলেন। বাড়ী ফিরে দেখেন, কমলার কাছে মণিলাল। মণিলাল চলে যাবার চেষ্টা করছে, কমলা নাছোড়বান্দা।

মণিলালকে দেখেই চৌধুরী আবার তাকে সোৎসাহে জড়িয়ে ধরলেন। চিৎকার ক'রে হেসে গদগদ হয়ে ওলোট পালট খেয়ে মণিলালকে লোফালুফি করে তিনি বললেন, এই নাও কারখানার চাবি···সব তোমার···সব তোমার আর কমলার···আর আমি কিছু বলবনা...আমায় ক্ষমা করো···কাজের ভার তুলে নাও...কমলাকে বিয়ে করো···।

কমলা বলে, তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না।

* * *

এদিকে দালাল বলে, তোমার কোনো ভাবনা নেই আমি সবঠিক করে দেবো। হ্যাঁ, মজুরির টাকা তোমার সংগে রেখোনা, তুমি মেয়েছেলে! মানে, এটা কলকাতা শহর কিনা···কত রকম প্রলোভন! টাকা কড়ি সব আমার হাতে থাকবে···আমি তোমার ঘরকন্না চালাবো। এবার আমাকে কি বকশিস দেবে বলো?

লোকটার মুখে চোখে শয়তানের চেহারা ফোটে।

উমা যেন লোকটার দয়া ও দানের উপর জীবন ধারণ করে। অনেক সময় ভয় দেখায়, শাসন করে, সতর্ক করে। এবং একথাও জানায়, তার মতন ত্রাণকর্তা না থাকলে উমা পথে পথে বেড়াতো,নোংরা জীবন যাপন করতে হোতো। লোকটা তাকে বিয়ে করতেও চায়না, দূরে যেতেও চায়না। বলে, তোমাকে নাচগান শেখাবো তোমার যশ হবে, টাকা হবে, মস্ত বড় বাড়ী হবে, গাড়ী হবে।

সত্য সত্যই উমাকে সে নাচগান শেখাবার ব্যবস্থা করে। মণিলাল কারখানায় আসতে চায়নি। কিন্তু চৌধুরীর ইংগিতে কমলা তাকে মোটরে ক'রে এনে কারখানায় ঢোকালো। সেখানে ঢুকে ভিতরে আসতেই এতকাল পরে উমার সংগে মণিলালের দেখা। দালাল লোকটী মনিব কন্যার সংগে সংগে ছিল।

উমা আর মণিলাল। যেন পরজন্মে এসে সহসা দুজনে মুখোমুখি দেখা।

কমলা বললে, মেয়েটাকে তুমি আগে চিনতে বুঝি?

মণিলাল বললে, হ্যাঁ...

কমলা বললে, কিন্তু এমন আর ওর সংগে তুমি কথা বলোনা! তুমি এখন বড়লোক...সম্ভ্রান্ত...দেশের চোখে তুমি মস্ত শিল্পী...চৌধুরী সাহেবের ভাবী জামাই···

কমলা ঈর্ষাতুর ভাবে মণিলালকে নিয়ে চলে যায়।

ঘরে এসে দালাল উমাকে বলে, মণিলাল তোমার কে?

উমা বলে, কেউ না।

তবে ওকে দেখে তোমার মন খারাপ হোলো কেন?

হয়নি।

দালাল ওর সংগে প্রণয় দৃশ্যের অবতারণা করতে যায়। উমা ওকে গ্রাহ্য করেনা, তার মন বিমুখ হয়ে ওঠে। দালাল কলহ বাধায়, শাসন করে, সতর্ক করে দেয়। অবশেষে বলে, পুতুলের কারখানায় তোমাকে আর কাজ করতে দেবোনা।

উমা প্রতিবাদ করে। কিন্তু দালাল চোখ রাঙায়। বলে, খবরদার! আমার অবাধ্য হলে ভয়ানক শাস্তি দেবো।

উমা ভয় পেয়ে চুপ করে। দালাল তাকে নাচগান সেখাতে নিয়ে যায়। সেখানে উমা গান গেয়ে কাঁদে।

দালাল তাঁকে উৎপীড়ন করে। অনাচার করে। তারপর কারখানায় এসে একসময় মণিলালের সংগে ভাব করে বলে, তুমি যার কথা ভাবো, তার মন কিন্তু অন্যদিকে মণিলাল তাকায়।

দালাল বলে, মেয়েটার স্বভাব চরিত্র ভালো নয় কত জায়গায় ঘুরে আমার হাতে এসেছে। আমার কাছেই থাকে !

মণিলাল প্রশ্ন করে, মানে ?

মানে বুঝতেই পারো, জলের মতন সোজা !

* * *

কমলা কাঁদো কাঁদো হয়ে বাপকে বলে, উমাকে তুমি কারখানা থেকে তাড়াও বাবা, নৈলে আমি বিষ খেয়ে মরবো।

ফলে উমার চাকরি যায়। আর তাকে দেখা যায় না। দালাল তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখে !

মণিলালের হাতে এখন অনেক টাকা ! কিন্তু কমলা তাকে চোখে চোখে রাখে। একটু ছাড়া পেলেই মণিলাল পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। অনাবশ্যক টাকা খরচ করে, দান করে, জুয়া খেলে, কার্ণিভালে যায়। উমা অসচ্চরিত্রা, একথা সে ভাবতেও পারে না। উমার আশ্চর্য পরিবর্তন দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল, ভালো বেসেছিল, কিন্তু উমা অসচ্চরিত্রা ! ওই শয়তানটার কাছে সে থাকে।

মণিলাল ফিরে এলে কমলা চেঁচায়, কাঁদে, ভালবাসা জানায়, শাসন করে, গান শোনায়, পায়ে ধরে। কদর্য দৃশ্যের অবতারণা করে।

কারখানার উন্নতি ঘটেছে অনেক। দিন দিন প্রসার হচ্ছে। জায়গা বেশী চাই। নতুন চালা বাঁধতে হবে। লোক লেগেছে।

এমনি সময় ঘটনা চক্রে উমার বাপ ঘরামির সংগে মণিলালের দেখা। দালালের বিরুদ্ধে ঘরামি তার কাছে অভিযোগ জানালো। মণিলাল শুনলো, উমার ওপর অনাচার অত্যাচার চলছে। উমা নিরুপায়, ঘরামি নিরুপায়। এদেশ থেকে তারা চলে যেতে চায়। শহর বড় ভয়ঙ্কর।

চারিদিকে যখন বিরোধ, চক্রান্ত, ঈর্ষা, সংশয় ও সংগ্রাম ঘন হয়ে উঠেছে, মণিলাল সেই সময় ছুটে যায় উমাকে উদ্ধার করতে। তারা নগর ছেড়ে পালাবে, সভ্যতার এই চক্রান্ত, দুর্নীতি, ঈর্ষা এদের হাত থেকে মণিলাল আর উমা আত্মরক্ষা করবে। ভালোবাসা তাদের পথ

শব্দ গ্রহণ

অতুল চট্টোপাধ্যায়, এম, এস-সি,

বিশেষজ্ঞ মহলে নিউ থিয়েটার্স লিঃ এর প্রবীণ শব্দযন্ত্রী শ্রীযুক্ত অতুল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় দেবার যেমনি কোন প্রয়োজন নেই—তেমনি চিত্রামোদীরাও এই নামের সংগে অপরিচিত নন। নিউ থিয়েটার্সের বহু চিত্রে শব্দগ্রহণের উৎকর্ষতায় তিনি বিশেষজ্ঞ ও চিত্রামোদীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। রূপ-মঞ্চের পাঠক পাঠিকাদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য শব্দ-গ্রহণ সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন—পাঠকবর্গের কাছে তা সমাদর পাবে বলেই আশা করি। রূপ-মঞ্চের অনুরোধ রক্ষা করে—রূপমঞ্চ পাঠকবর্গের তিনি যে ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ছায়াচিত্রের জন্য শব্দগ্রহণ বা শব্দ তরংগের চিত্রগ্রহণ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনীর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। সাধারণত ইহাকে দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—(১ম) পরিবর্তনশীল ক্ষেত্রফল (variable area) (২য়) পরিবর্তনশীল ঘনত্ব (variable density)। প্রথম উপায়ে শব্দ তরংগের অনুরূপ একটি তরংগের চিত্রগ্রহণ হয়; দ্বিতীয় উপায়ে শব্দ তরংগের কম্পন ও শক্তি অনুযায়ী সরু মোটা ও কম বেশী কাল সরল রেখা চিত্রিত হয়। মেট্রো গোল্ডউইন মায়ারের চিত্র সকলে (Western Electric) ওয়েষ্টার্ণ ইলেকট্রিক-এর ধারায় এই শেষোক্ত উপায়েই শব্দ সংরক্ষিত থাকে। আর, কে, ও পিকচার্স সাধারণত আর, সি, এ-এর ধারায় অর্থাৎ ১ম উপায়ে শব্দ সংযোজনা করিয়া থাকে। বাংলাদেশে ও বোম্বাই সহরে অধিকাংশ ষ্টুডিওতেই ১ম উপায়েরই আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

চিত্রনাট্যের কোনও দৃশ্য অভিনয়ের সময় অভিনেতৃবর্গের সম্মুখে ১টি বা কোন কোন সময়ে একাধিক মাইক্রোফোন নামীয় যন্ত্রটী দূর হইতে তিনপায়া এক বৃহদাকার বস্তুর (Boom) সাহায্যে ঝুলান থাকে এবং কথা বলার দিক-পরিবর্তনের সংগে সংগে মাইকগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অভিনেতৃদিগের সম্মুখে স্থাপনা করিবার কার্য "বুমম্যানকে" করিতে হয়। এই কার্যে অতি সুকঠিন এবং সুদক্ষ "বুমম্যান্‌কে"ও সময়ে সময়ে ভীষণ মুস্কিলে পড়িতে হয়। আমাদের দেশে এই "বুমম্যান্‌" দিগের অনেক ক্ষেত্রে কোনরূপ পদমর্যাদা নাই। কিন্তু শুনা যায় ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ইহাদের পদমর্যাদা ক্যামেরাম্যানের সমান এবং বেতনও ক্যামেরাম্যানের অনুরূপ। মাইকের কাজ শব্দ তরংগগুলিকে বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিণত করা। এই প্রবাহ এত ক্ষীণ যে উহার শক্তি অনেক শতগুণ বৃদ্ধি না করা পর্যন্ত চিত্র গ্রহণের উপযোগী হয় না। সেইজন্য ইহাকে পরিবর্ধক (ampli fier) জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে বহু-শতগুণ শক্তিশালী করিয়া তোলা হয় এবং এই শক্তিশালী করিবার প্রতিক্রিয়ায় শব্দ কতদূর বিকৃত হইল বা স্বাভাবিক রইল তাহা একটী লাউডস্পীকার বা হেড্‌ফোন যন্ত্রে শোনা হয়। এইখানে শব্দ-যন্ত্রীর কাণের পরীক্ষা হয়। শব্দজনিত বিদ্যুৎ প্রবাহকে খুব বেশী শক্তিশালী করিবার পূর্বে ইহাকে আর একটী যন্ত্রের মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া আনা হয়। এই যন্ত্রটীর নাম টোনফিলটার। ইহার কাজ শব্দকে যতদূর সম্ভব শ্রুতিমধুর ও স্পষ্ট করিয়া তোলা।

এখন যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দের চিত্র গ্রহণ হয় তাহাকে অসিলোগ্রাফ বলা হয়। তাহার গঠন ও কার্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। এই যন্ত্রে শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্রে অবস্থিত একখণ্ড ক্ষুদ্র লৌহের অগ্রভাগে একটি ক্ষুদ্র আরসি লাগান থাকে। এই ছাপার দুইটী পাশাপাশি অক্ষরের চতুর্দিকে একটী সমতলক্ষেত্র টানিলে যত বড় হয় আরসিটির আয়তন প্রায় ততবড় হইবে। একটী ত্রিকোনাকার আলোকরশ্মি আতস কাঁচের সাহায্যে

"...মেঘবরণ কেশ"
সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতার জন্য স্মরণাতীত যুগ থেকে "মেঘবরণ কেশ"এর কামনা সকলেই করে এসেছেন। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য আনে দেহে তৃপ্তি এবং মনে আনন্দ। এই আনন্দ তখনই স্থায়ী হয়, যখন আপনি নিয়মিত "লক্ষ্মীবিলাস" তৈল ব্যবহার করেন। স্বকীয় বৈশিষ্টে শতাব্দীর উপর জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত।
মহোপকারি সুবাসিত তৈল
লক্ষ্মীবিলাস
এম, এল, বসু এণ্ড কোং লিঃ কলিকাতা

ঐ আরসির উপর ফেলা হয় এবং আরসি হইতে প্রতিফলিত রশ্মিকে একটা সূক্ষ্ম সরল রেখা আকারের ফাঁকের (slit) উপর নিক্ষেপ করা হয়। এই ফাঁকটীকে (slit) আর একটা আতস কাঁচের সমষ্টি (bus system) দ্বারা ফিতার (Film) উপর ফোকাস করা হইয়া থাকে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে ইহাকে একটা আলোর সরল রেখার ন্যায় দেখায়। শব্দ-জনিত বিদ্যুৎপ্রবাহকে শক্তিশালী করিবার পর ঐ চুম্বক ক্ষেত্রের শক্তি হ্রাস বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নিয়োগ করা হয় ও সংগে সংগে আরসিটীর কম্পন আরম্ভ হয়। এই কম্পন ঠিক শব্দের অনুরূপ হইয়া থাকে। এখন পূর্বেকার অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রাখিলে, আলোর রেখাটী দ্রুত ছোট বড় হইতেছে দেখা যাইবে। এই চঞ্চল রেখাটীই সচল ফিতায় (Film) ফটোগ্রাফ করা হয়। ফটোগ্রাফ পরিস্ফুটনাগার (Laboratory) হইতে বাহির হইলে দেখা যাইবে ফিতার উপর শব্দতরংগের একটি চিত্র রহিয়াছে। এইটীকে বলে নেগেটিভ্ সাউণ্ড ও চিত্রিত বস্তুকে বলে সাউণ্ড ট্র্যাক্। এই সাউণ্ড পজিটিভ ছায়াচিত্রের ফিতার একটী পার্শ্বে ছাপান থাকে।

প্রয়োজনে গ্রামোফোনে পিন দিয়া যেমন শব্দ বাহির করা হয়, সেইরূপ ঐ পজিটিভ ফিতায় সরল রেখাকার আলোকরশ্মি দিয়া শব্দ বাহির করা যায়। এই স্থলে পিনের কাজ আলোকরশ্মি করিয়া থাকে ও সাউণ্ড বক্সের কাজ ফটো সেল দ্বারা করান হয়। আলোক-রশ্মি ফিতার মধ্য দিয়া শব্দতরংগের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ফটো সেলে শব্দের অনুযায়ী বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি করে এবং ঐ প্রবাহকে শব্দে রূপান্তরিত করা হয় প্রেক্ষণাগারে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই প্রকারে শব্দগ্রহণ করিয়া তাহাকে পুনরায় প্রেক্ষাগৃহে শোনা নয় সম্ভবপর হইল কিন্তু চিত্রের অভিনেতাদিগের কথা বলার মুখ ভংগির সহিত সেই শব্দের সঠিক সামঞ্জস্য কি করিয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ যখনই অভিনেতাদের ঠোঁট ও মুখ যে কথার জন্য যেভাবে নড়ে, ঠিক সেই কথাটী কি করিয়া প্রেক্ষাগৃহের যন্ত্রে বাহির হয়! ইংরাজীতে ইহাকে সিনক্রোনিজেসন বলা হয়। বাংলায় ইহাকে সমসাময়িকতা বা সময়ানুবর্তিতা বলা যাইতে পারে। ইহার একটি অতি সহজ উপায় এই যে, যখন শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ হয় তখন দুইটী যন্ত্রই অর্থাৎ ছবির ও শব্দের ক্যামেরা সম গতিশীল মটর দ্বারা চালিত করা ও কেহ কাহাকেও যাহাতে আগাইয়া পিছাইয়া না যায় তাহার জন্য দুইটীকে বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা 'লক' (Lock) করা থাকে। অপর প্রক্রিয়াটী আরও সহজ, তাহাতে দুইটী ত্রিধারণ কম্পনশীল তড়িৎ উদ্দীপক মটর (Three phase induction motor) ব্যবহার করিলেই শব্দে ও ছবিতে সময়ানুবর্তীতা বর্তমান থাকে। শব্দের ফিতায় ও চিত্রের ফিতায় দুইটী যন্ত্র চলিবার সময় আরম্ভ জ্ঞাপক একটী করিয়া চিহ্ন ও শেষে অন্তঃ জ্ঞাপক আর একটি করিয়া চিহ্ন দেওয়া থাকে। এই চিহ্ন ছবির ক্যামেরায় ও মাইকের সম্মুখে হাততালি বা বিশেষ যন্ত্র কাষ্ঠ তালিকা (clap stick) দ্বারা গৃহীত হয়। ছবিতে যেখানে দুইটী হাত বা কাষ্ঠ ফলক এক সংগে হইল সেইটাই হ'ল আরম্ভ চিহ্ন এবং শব্দে যেখানে হাততালি বা কাষ্ঠ তালিকার আওয়াজ পাওয়া গেল সেইটাই হ'ল আরম্ভ চিহ্ন। চিত্রের সম্পাদনার কাজ যাহারা করেন তাঁহারা এই দুইটী চিহ্নই সময়ানুবর্তীতার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পূর্বোল্লিখিত ত্রিধারার কম্পনশীল তড়িৎ (Three phase A. C. current) কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই সরবরাহ করিয়া থাকে। অন্যথায় নিজেদের ঐ তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করিতে নানা প্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন হয় এবং সেই সমস্ত যন্ত্র একটী মটর ভ্যানে সাজান থাকে। তাহাকে পাওয়ার ট্রাক্ বলা হয়। ষ্টুডিওর বহির্দৃশ্য সম্বলিত সবাক ছবি তোলবার জন্য এই Power truck একটী অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইরূপ একটীও ভাল ট্রাক্ কলিকাতায় কোনও চিত্র নির্মাতার ষ্টুডিওতে নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

অপ্রিয় সত্য না বলবার উপদেশ বাক্য যতই আপাত মধুর শোনাক, জাতীয় শক্তির পুনরুদ্বোধনে তাকে লঙ্ঘন করতেই হবে

তাই বাঙালীকে হাসাবার সঙ্গে ভাবাবে—

রূপশ্রীর

রঙ্গভরা ব্যঙ্গচিত্র

মৌচাকে ঢিল!

কাহিনী—

প্রমথ নাথ বিশী

বিভিন্নাংশে

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমীলা ত্রিবেদী

বেলা মুখোপাধ্যায়

সন্তোষ সিংহ

ইন্দু মুখোপাধ্যায়

নৃপতি চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা—

মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

সুর সৃষ্টি

গোপেন মল্লিক

বেচু সিংহ, আশু বসু, কুমার মিত্র, রাধারাণী, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন কুমার আরো অনেকে

সেইসঙ্গে আছে পাঁচটী নূতন 'তারকা', সুভদ্রা দেবী, শমিতা দেবী, কল্যাণ কুমার, চণ্ডী মিত্র, সমর রায়

চলচ্চিত্রের শব্দ গ্রহণ

যতীন দত্ত

কালী ফিল্মস লিঃ এর খ্যাতনামা শব্দ-যন্ত্রী শ্রীযুক্ত যতীন দত্তের সংগে চিত্রামোদী দের পরিচয় আছে। মূক ছবি যেদিন কথা বলতে শিখলো—আমাদের সেদিনকার সে বিষয় আজও অনেকের কাছে কৌতূহলের বিষয় হ'য়ে আছে। প্রাণহীন ছবি—কথা বলে কী করে, তার সেই—বিজ্ঞানের মায়াজাল দর্শক সাধারণের কাছে তুলে ধরবার দায়িত্ব নিয়েছেন আমাদের বিশেষজ্ঞ শিল্পীরা—রূপ-মঞ্চের মারফত। এজন্য রূপ-মঞ্চেরতরফ থেকে এঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শব্দগ্রহণের মায়াজাল সম্পর্কে পর পর দু'জন বিশেষজ্ঞের লেখার ভিতর দিয়ে পাঠকরা কিছুটা পরিচয় পাবেন বৈকী?

শব্দগ্রহণ বলিতে আমরা কি বুঝি? এইটাই আমাদের প্রথম প্রয়োজন। আমাদের অংগপ্রত্যংগের মধ্যে কর্ণই একমাত্র যন্ত্র যাহার সাহায্যে আমরা শব্দগ্রহণ করিয়া থাকি। এখন আমাদের বুঝিতে হইবে যে সেই কর্ণরূপ যন্ত্রটী কিরূপ। মোটামুটি রূপে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের কর্ণের মধ্যে কতকগুলি অনুভূতিশীল (Sensitive) স্নায়ু এবং অন্যান্য পদার্থ আছে, যাহার দ্বারা শ্রবণ অথবা শব্দ গ্রহণের কার্য হইয়া থাকে। যেমন, কর্ণের পর্দা এবং তৎসংলগ্ন কতকগুলি স্নায়ু-মণ্ডলী। এখন আমাদের বুঝিতে হইবে যে আমরা এই পদার্থগুলির দ্বারা কিরূপে শব্দগ্রহণ করিয়া থাকি। প্রথমতঃ আমাদের চারিপার্শ্বে বায়ুস্তর রহিয়াছে। কোন বস্তুর সাহায্যে শব্দ করিলে এই বায়ুস্তরগুলি পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক্রমান্বয় সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা তরংগের সৃষ্টি করে এবং এই তরংগগুলি বৃত্তাকারে চতুঃপার্শ্বে ছড়াইয়া পড়ে ও আমাদের কর্ণের পর্দায় আঘাত করে। পর্দার সহিত স্নায়ু-মণ্ডলীর সংযোগ থাকায় আমরা শব্দগ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। অতএব বুঝা যাইতেছে মানুষ একমাত্র কর্ণের দ্বারাই শব্দগ্রহণে সক্ষম হইয়া থাকে।

চলচ্চিত্রের শব্দগ্রণের জন্য 'মাইক্রোফোন' (Microphone) নামক একটি যন্ত্রের আবশ্যক যাহার তুলনা একমাত্র কর্ণের সহিত করা যাইতে পারে। প্রথমে মাইক্রোফোন যন্ত্রের মোটামুটি ধারণা এবং ক্রিয়াকলাপ বুঝাইতে প্রয়াস পাইব। মাইক্রোফোন বহু প্রকারের হয় কিন্তু চলচ্চিত্রে সাধারণতঃ 'Ribon Microphone' ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই মাইক্রোফোনটীর দুই পার্শ্বে দুইটি অত্যন্ত শক্তিশালী চুম্বক থাকে। এই দুই চুম্বকের মধ্যে একটি অত্যন্ত পাত্‌লা Duro Aluminium ধাতুর নির্মিত ফিতা অবস্থিত থাকে।

চুম্বক দুইটি এমন ভাবে অবস্থিত যে উহাদের বিপরীত মেরুদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন। দুইটি বিপরীত মেরুর (Northpole and Southpole) অবস্থিতির জন্য ইহাদের মধ্যে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র (Magneticfield) রচিত হয়। এই দুইটি চুম্বকের মধ্যে উপরিউক্ত Duro Alumnium ফিতাটি লম্বভাবে বর্তমান, এখন যদি কোন একটী শব্দ তরংগ ফিতাটীকে আঘাত করে তাহা হইলে ফিতাটী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে মৃদু মৃদু কম্পিত হয় এবং ইহার দ্বারা অতিক্ষীণ বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শব্দ তরংগটী বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিণত হইল। পরে এই বৈদ্যুতিক প্রবাহ তারের সাহায্যে Amplifier নামক একটী যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এই Amplifier যন্ত্রের কার্যই হইল কোন একটী ক্ষীণ বৈদ্যুতিক প্রবাহকে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন করিয়া তোলা। পরে এই বিশেষ শক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক প্রবাহটীকে Sound Camera নামক একটি যন্ত্রের মধ্যে প্রেরণ করা হয়।

এই Sound Camera শব্দ গ্রহণ যন্ত্রের একটি বিশিষ্ট

অংশ। ইহার কার্যপ্রণালী অত্যন্ত বিস্ময়কর ও চিত্তচমকপ্রদ। আমরা প্রায় সকলেই জানি Camera'র সাহায্যে ছবি তোলা হয়। কিন্তু Sound Cameraর দ্বারা যে কি প্রকার ছবি তোলা হয় তাহা বোধ হয় কেহই অবগত নহেন। Cameraর সাহায্যে ছবি তুলিতে যেমন আলোকের প্রয়োজন হয়। সেইরূপ Sound Cameraর জন্ত একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা Sound Cameraর মধ্যেই অবস্থিত আছে এবং Cameraর মত ও ছবি গ্রহণের জন্ত Sound Cameraর মধ্যেও filmএর ব্যবস্থাও আছে। এই filmএর উপর শব্দ তরংগের ছবি অংকিত হইয়া থাকে। এই অংকন কার্য কিরূপে সাধিত হয় তাহাই এখন আলোচনা করিব। এই Sound Cameraর একটি বিশেষ এবং প্রধান অংগ হইল আমাদের Miror Oscillograph. পূর্বেই বলা হইয়াছে যে Sound Cameraর মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই আলোক রশ্মি Oscillographএর (Miror) আয়নার উপর পাতিত এবং পরে প্রতিফলিত হইয়া আলোক তরংগের সৃষ্টি করে এবং এই তরংগগুলি Sound Cameraর মধ্যবর্তী filmএর উপর পতিত হয় ও শব্দ তরংগের ছায়া অংকিত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শব্দ তরংগ বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন করিয়াছিল তাহা পুনরায় আলোক তরংগে রূপান্তরিত হইল। এবং এই আলোক তরংগই Sound Cameraর মধ্যে শব্দ পথের (Sound track)এর সৃষ্টি করে।

তাহা হইলে এখন বুঝা যাইতেছে—এই আলোক তরংগই আমাদের পূর্ব বর্ণিত Microphone হইতে নির্গত শব্দ তরংগের অপভ্রংশ।

এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, শব্দ পথ বলিতে কি বুঝা যায় ও ইহার আকার কিরূপ উহা চিত্রে বর্ণিত হইল। আপনারা চিত্রে দেখিতে পাইতেছেন যে, শব্দ পথটি কয়েকটি কাল নিয়মিত রেখার দ্বারা প্রস্তুত। এই রেখার তরংগায়িত অবস্থাই হইল শব্দের বিভিন্ন ভাব ও গতি। আপনারা বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন যে, গ্রামোফন রেকর্ডের উপর কতকগুলি সরু রেখা চক্রাকারে বর্তমান।

শব্দপথ ও শব্দের বিভিন্ন ভাব গতি এ থেকে জানা যাবে।

কিন্তু ওগুলি শুধু রেখা নয়, ওগুলি কত অসংখ্য সূক্ষ্ম এবং বিভিন্ন গভীরতার গর্তের সমষ্টি। গর্তগুলির গভীরতা শব্দের গতির এবং Volumeএর উপর নির্ভর করে। সেইরূপ filmএর উপর এই রেখাগুলির (Lateral Compression and expansion) সংকোচন ও প্রসারণ এবং কোন কোন filmএ কৃষ্ণ 'বর্ণের' Densityর কম বেশী নির্ভর করে শব্দের শক্তির উপর। রেকর্ডের মত এই সূক্ষ্ম রেখাগুলিই শব্দ পথ ও শব্দ উৎপত্তির মূল কেন্দ্র। এখন আপনাদের এইটাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই শব্দ পথের তরংগগুলির আকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হইল কিরূপে? কারণ শব্দ মৃদু হইলে তরংগগুলি ক্ষুদ্র এবং শব্দ তীব্র হইলে তরংগও বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হয়।

তাহা হইলে মোটামুটীরূপে বুঝিতে পারিলাম যে শব্দ প্রথমে Microphone নির্গত হইয়া বৈদ্যুতিক তরংগে রূপান্তরীত হয় এবং পরে আলোক তরংগের রচনা করে এবং এই আলোক তরংগই filmএর উপর শব্দ পথে রূপায়িত হয় ইহাকে Conversion of energy বলিয়া থাকি। এই Theoryর উপর নির্ভর করিয়াই পাশ্চাত্য-দেশের পণ্ডিতগণ চলচ্চিত্রের,—শব্দামুলেখন যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত ও উদ্ভাবিত করিয়াছেন।

চলচ্চিত্র গ্রহণ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা

বিভূতি লাহা

কালী ফিল্মস স্টুডিওর নবীন চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতি লাহা—চলচ্চিত্র গ্রহণ সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে যেয়ে চলচ্চিত্র শিল্পীর দায়িত্ব সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা নানাদিক দিয়ে প্রণিধান যোগ্য।

আজকালকার চলচ্চিত্রের প্রধান গুণ আমার মতে এই যে, চিত্রশিল্পীর সৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ হ'ল তাঁর কলার মধ্য দিয়ে চরিত্র ও অনুভূতি অন্তঃ প্রবিষ্ট করা। চিত্র শিল্পীর এইটেই হ'ল শ্রেষ্ঠ অবদান যা তিনি তাঁর গৃহীত চিত্র কাহিনীর মাঝে সুপ্রকাশ করতে পারেন।

চলচ্চিত্রের সাধারণ গুণ সম্পদ অর্থাৎ তার সৌন্দর্য ও স্ফুরণ, যদি কাহিনী ও চিত্রনাট্য, অভিনেতা ও অভিনেত্রী ও পরিপার্শ্বিক আবহশিল্প রচনার পরিবেষ্টনীর মধ্যে না থাকে তবে চিত্রশিল্পীর পক্ষে তাঁর গৃহীত ছায়াচিত্রের মাঝে তাঁর অনুভূতি ও চরিত্রসৃষ্টির প্রকাশ চেষ্টা সম্ভব নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোন চিত্র-শিল্পী যদি তাঁর কলায় বিশেষ পারদর্শী হতে চান, তাহলে তাঁর নিজের একজন দক্ষ অভিনেতা ও পরি-চালক হওয়া প্রয়োজন। সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক; তবেই তিনি তাঁর শিল্পের সাহায্যে চরিত্রের বৈশিষ্টতা সুপ্রকাশে সক্ষম হবেন।

চিত্রশিল্পীর কর্তব্য হ'ল কোন নূতন কাহিনীর চিত্র গ্রহণের পূর্বে সেই চিত্রনাট্যটি বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করা, কারণ এই অধ্যয়নের মাঝেই লেখকের চিন্তাধারার সংগে চিত্রশিল্পীর প্রথম পরিচয় ঘটে। তারপর তাঁর উচিৎ কাহিনীর উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিভিন্ন চরিত্র মনে মনে নিজে অভিনয় করে বুঝে নেওয়া, কারণ একমাত্র এর দ্বারাই গল্পের অনুভূতি পাওয়া যায়। প্রত্যেক চরিত্রটি এই ভাবে নিজের মধ্যে অভিনয় করার পর, সেই সব চরিত্রের চিত্রগ্রহণের সময় তাদের অর্থাৎ সেই সব চরিত্রগুলিকে অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হয়। চিত্রশিল্পী তাঁর এই অধীত জ্ঞানের সাহায্যে চিত্র কাহিনীটিকে অধিকতর স্বাভাবিক করে তুলতে পারেন।

আমরা সবাই জানি যে, পর্দার উপর যে ছবি প্রতিফলিত করা হয় তাহা আলো ছায়ার বর্ণ বিন্যাস মাত্র—যতই সুচ্ছন্দ ও সুদৃশ্য করা হোক না কেন তবুও তাহা প্রাণহীন; কাজেই—এই সব জানা সত্বেও আমরা কি করে আশা করতে পারি যে দর্শকবৃন্দ আনন্দিত হবেন, যদি সেই আলোছায়ায় কুহেলীর অন্তরালে আমরা চরিত্র সৃষ্টি করতে না পারি।

চরিত্র সৃষ্টি কেবল একরূপেই সম্ভব; যেমন, চিত্র শিল্পীর মাঝে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত—অনুভূতির স্পন্দন বোধ থাকা প্রয়োজন এবং শুধু তাই যথেষ্ট নয়—চিত্র কাহিনীতে যাঁরা বিভিন্ন রূপ দিচ্ছেন তাঁদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও তাঁকে জানতে হবে, যাতে করে তিনি তাঁদের নির্ভুল চরিত্রসৃষ্টি করতে পারেন। চিত্রশিল্পীর অন্যান্য গুণের মধ্যে এটিও একটি বিশেষতর যে, তাঁকে ব্যক্তিত্বের একজন সুক্ষ্ম সমালোচক ও বিচারক হতে হবে।

দর্শকবৃন্দ যাতে অতি অল্প আয়াসে গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্যকরূপে বুঝতে পারেন তার জন্য চিত্রশিল্পীর আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত যাতে করে তিনি তাঁর গৃহীত চিত্রের মাঝে সকল চরিত্রকেই সজীব ক্রিয়াশীল চরিত্র করে প্রতিভাত করতে পারেন।

অনেকের মতে চিত্রশিল্পী জন্মায়, তাঁদের গঠন করা যায় না—একথাটি সর্বাবাদীসম্মত না হলেও, এটির কতকাংশ সত্য ও কতকাংশ মিথ্যা। সত্য এই কারণে যে, চিত্র শিল্পী যে কাহিনীর রূপ দেবেন, তাতে তাঁর যথার্থ চরিত্রগত রূপ ও নাটকের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ বুঝবার সহজাত ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। অন্য দিকে চিত্র-শিল্পীকে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে হয়, তাঁতে

সেই সব যন্ত্রবিজ্ঞার অনুশীলন ও গবেষণা দ্বারা যুক্তি সংগত ভাবে গ্রহণ করতে শিক্ষা করা উচিৎ। শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীই হ'ল বাস্তবতার পূর্ণাবয়ব জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-যেমন স্বাস্থ্যবান দৃষ্টিভংগি। প্রত্যেক দর্শনীয় বস্তুকেই পর্যবেক্ষণ করা, তার আকৃতি, বর্ণ বিন্যাস, তার গঠন কৌশল ইত্যাদি—এগুলির অভিজ্ঞতা লাভ হলে তবেই চিত্র-শিল্পী তাঁর চিত্রগ্রহণের মাঝে গল্পের আদর্শ বা নিদর্শনের মূর্তি ও কাহিনীর মূলগত অভিপ্রায় পূর্ণরূপে বিকাশ করতে সমর্থ হবেন।

চিত্রশিল্পীর পক্ষে তাঁর শিল্প অনুশীলনের ভিত্তি হিসাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হ'ল, প্রত্যক্ষ ও ক্রীয়া-শীল অভিজ্ঞতা। বিশিষ্টতর চরিত্র সৃষ্টির জন্য চিত্র-শিল্পীর পক্ষে দর্শন, অনুভূতি, স্পর্শ, নৃত্য ও গীত, অভিনয় প্রভৃতির জন্য বিশিষ্ট দৃষ্টি ভংগি থাকা দরকার। যদি আমরা পূর্বোক্ত কোন অভিজ্ঞতা লাভ না করেই চিত্র গ্রহণ সুরু করি তাহলে কাহিনীর বিষয় বস্তুর বক্তব্য অব্যক্তই থেকে যাবে এবং তার জন্য—চিত্রশিল্পীর সমস্ত পরিশ্রমই হবে, অনুভূতি-শূন্য, শক্তিহীন, ক্রীয়াহীন ও প্রাণহীন।

পরিচালকের দায়িত্ব

গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম চিত্রামোদীদের কাছে অজানা নয়। পরিচালকের সর্বপ্রধান দায়িত্বের তিনি যে ইংগিত করেছেন—সেদিকে আমাদের পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চিত্রের উন্নতির মূলে সাংবাদিকদের কর্তব্য সম্পর্কেও তিনি যে ইংগিত করেছেন—রূপ-মঞ্চ মাথা পেতে তা মেনে নিচ্ছে।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, আপনি আদেশ করেছেন পরিচালকের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাকে লেখা দিতে হবে শারদীয়া সংখ্যার জন্ত। বিষয় এবং আদেশ উভয়েরই গুরুত্ব, অপ্রমেয়,—কিন্তু দায়িত্ব প্রতিপালন করবার মত 'গুরুমুখী' বিদ্যা আমার নেই, যা কিছু লিখতে হবে তা নিরেট বুদ্ধির সাহায্যেই, অভিজ্ঞতার সাহায্যে নয়, কেন না অভিজ্ঞ হতে গেলে যে জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা ও কর্মযোগ সাধন করতে হয় তার হাতে খড়িও অন্তত পক্ষে আমার হয়নি বলে আমার ধারণা, কারণ কোন জিনিষের সাধন করলেই তার প্রয়োগ বিষয়ে একটা গভীর দায়িত্ববোধ স্বতই আসে। সে হিসাবে বিচার করতে গেলে আমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বজ্ঞানহীন, অতএব আমাদের কোন কিছু করাই জন-উন্নয়ণের জন্ত করা হয় না, হয় অধ-লোকরঞ্জনের খাতিরে এবং স্বকীয় নিম্ন স্তরের স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত।

বিষয়টার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার করতে গেলে আমাকে বহু শত্রু পরিবেষ্টিত হতে হবে বলে আশঙ্কা হয় তাই আত্মরক্ষা ও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত স্বামী বিবেকানন্দের একটী গল্পের উল্লেখ করতে হোলো।—"সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির"—(চিত্রগ্রহণের ষ্টুডিওগুলি মানবগণের সনাতন শিল্প প্রবৃত্তির বিকাশ-ক্ষেত্ররূপ মহামন্দির স্বরূপ)—"সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেথা নেই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হোতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব শক্তি, সুর্যিমামা, ইঁদুর-চড়া গণেশ, আর কচু দেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি নাই কি? আর বেদবেদান্ত, দর্শন, পুরাণ তন্ত্রে ঢের মাল আছে যার এক একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। তেত্রিশ কোটী লোক সেই দিকে দৌ-ড়োচ্ছে।" (পাণ্ডারা অবশ্য সুস্থ চিত্তে বহাল তবিয়তে বসেই আছে)—"আমারও কৌতূহল হোলো আমিও ছুটলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি……মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ড, একশত হাত, দুশ পেট, পাঁচশ ঠ্যাঙওয়ালা মূর্ত্তি খাড়া। সেইটার পায়ের তলায় সব গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম—'ঐ ভেতরে যে সব ঠাকুরদেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটী ফুল ছুঁড়ে ফেল্লেই যথেষ্ট পূজা হবে। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে; আর ঐযে বেদবেদান্ত, দর্শন, পুরাণ শাস্ত্র সকল দেখছ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এঁর হুকুম।' তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম তবে এ দেবদেবের নাম কি? উত্তর,—'এর নাম—'লোকাচার'।"……এখন পরিষ্কার বোঝা গেল—আমরা অর্থাৎ বর্তমান পরিচালক গোষ্ঠী কি করতে এসে কি করে চলেছি। হিন্দুর শাস্ত্র ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ যোগাযোগ স্থাপন করতে সম্পূর্ণ ভাবে সক্ষম কিন্তু মূঢ় হিন্দু লোকাচার নিয়ে মৃতপ্রায়। চিত্র পরিচালকগণও—চিত্রশিল্পের সাহায্যে বিশ্ব উন্নয়নের কার্যে প্রকৃত পথের নির্দেশ দিতে সক্ষম কিন্তু বিষয় বাসনা কেবলই হীন-প্রলোভন দেখিয়ে আমাদিকে পথভ্রষ্ট করে নিম্নতর স্বার্থের দিকে সমৃদ্ধ বেগে টেনে নিয়ে চলেছে।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়—"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যে প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত আমার মতামত আহ্বান করেছেন—বর্তমানে আমি তার যোগ্য নই। প্রাণ হাহাকার করছে, অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে ধ্বনি উঠছে—"হে ওজঃ স্বরূপ! আমাদিকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ? আমাদিকে বীর্যবান কর; হে বল স্বরূপ! আমাদিকে বলবান্ কর।"—কিন্তু

আমাদের অপবিত্র আত্মার এ আহ্বান বিশ্বনিয়ন্তার কাছে পৌঁছাতে পারছে না।

মুষ্টিমেয় কয়েকটী মহামতি ছাড়া—বাকি সব ভারতবাসীই জগতের সমস্ত জাতির তুলনায় ক্রমোন্নতির পথে লজ্জা জনক ভাবে যে পশ্চাৎবর্তি এ অতি কঠোর সত্য—কিন্তু এ অবস্থাও সত্যরই অংশ। –আমার মনে হয়, আমরা আংশিক সত্যের পথেও এগোচ্ছি না। ক্রম-সংকোচের হীম-শীতল ভাব আমাদিগকে চেতনাহীন জড়ভাবাপন্ন করে একটা বিরাট মিথ্যার পথে টেনে নিয়ে চলেছে। এর থেকে উদ্ধারের পথ এবং উপায় তামসিক প্রকৃতির জীবের পক্ষে ভয়াবহ—কারণ ক্রমোবিকাশের পথে যে ত্যাগ দাবী করে তা ভাবলেও, আমরা বিশেষভাবে চিত্র ব্যবসায়ীরা শিউরে উঠি। প্রলোভন ত্যাগ না করলে সুখ নেই; সুখ ত্যাগ না করলে শান্তি নেই, শান্তিকে ত্যাগ না করলে আনন্দ নেই—এই আনন্দ লাভের উপায় গুলিই আমাদের মহানিরানন্দের কারণ অথচ এই আনন্দই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ, ঐ আনন্দকে না পেলে আমাদের প্রেয়-প্রলুব্ধ বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা যাই গড়তে যাব তাই ক্রম বিকাশের পরিপন্থী হতে বাধ্য। লোলুপতার পথে শুভবুদ্ধি কখন গতায়াত করে না। পরিচালক গোষ্ঠিকে এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে। কর্তব্য আমাদের দেশের মহত্তর স্বার্থের কাছে—জাতির উন্নিতর কাছে। অশিক্ষিত, দুর্বলচিত্ত, বিবেকহীন জনতার মূঢ়তার সুবিধা নিয়ে এবং তাদের কুরুচিপূর্ণ আনন্দ-প্রবণতাকে প্রজ্বলিত করে যদি আমরা উদর পূর্তির পথেই চলতে থাকি তবে আমরা আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হব। তবে এ বিষয়ে কেবল পরিচালকদেরই দোষ দিলে চলবে না—প্রয়োজকদের আশু শুভবুদ্ধির সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন—জাতিধ্বংসী অর্থ-লালসার নিবৃত্তি হওয়া এখনই দরকার।—ব্যবসায় এবং ব্যবহারে প্রয়োজক-দের জাতির কাছে বিশ্বাসযোগ্য হোতে হবে। কিন্তু এর অপেক্ষাও কঠিন কর্তব্য বন্ধু আপনাদের, মানে প্রেসের—পার্থ সারথী কৃষ্ণের মত এই বিরাট-মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী সংগ্রামে আপনাদিকে কষাহস্তে রণক্ষেত্রে সারথ্য করতে হবে, যেন কোন রূপে ক্লৈব্যভাব আমাদিকে আশ্রয় না করতে পায়; এই মহাব্রত আপনারা পালন করুণ নির্মমভাবে, কঠোর কর্তব্যবোধে, আমার অনুরোধ।

পরিচালকের বহুমুখী দায়িত্বের যেটি মুখ্য তাই বলা হ'ল, আর যে সব টেক্‌নিক্যাল দায়িত্ব আছে তার আলোচনা সম্পূর্ণ নিস্প্রয়োজন—কারণ সে গুলির উন্নতি বা অবনতি মূলীভূত কারণকে আশ্রয় করেই চলতে বাধ্য।

সংগীতের ঘরোয়ানা

শ্রীশচীনদাস (মতিলাল)

★

সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শচীনদাস মতিলালের নাম কারো কাছে অবিদিত নেই। রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকারাও এঁর রচনার সংগে পরিচিত আছেন। সম্প্রতি চিত্র জগতে সুর সংযোজনার কাজে ইনি হস্তক্ষেপ করেছেন। সংগীতের ঘরোয়ানা নিয়ে লিখতে যেয়ে বর্তমান প্রবন্ধে শুধু সূচনারই অবতারনা করেছেন। ভবিষ্যতে রূপ-মঞ্চের পাতায় ধারাবাহিক ভাবে এঁর রচনার পরিচয় পাবেন।

ভারতবর্ষে বহু প্রকার সংগীতের প্রচলন আছে এবং বিভিন্ন জনপদস্থ লোকের রুচি ও সভ্যতা অনুযায়ী তাহাদের অবস্থারও পরিবর্তন দেখা যায়। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ চারি প্রকার সংগীত বিদ্যমান। যথা—হিন্দুস্থানী সংগীত, বাঙ্গলা সংগীত, মহারাষ্ট্রীর সংগীত ও কর্ণাটী সংগীত। কিন্তু এই কয় প্রকার সংগীতের মধ্যে হিন্দুস্থানী সংগীতই সবচেয়ে মনোহর এবং উৎকৃষ্ট। ভারতের উত্তর পশ্চিম ভূখণ্ডে পাঞ্জাব হইতে পাটনা পর্যন্ত স্থানকে হিন্দুস্থান বলা হয়। ভারতীয় সভ্যতার আদি স্থান হ'ল হিন্দুস্থান এবং এই স্থানেই অনেক দিন থেকেই সংগীতের নানা প্রকার চর্চা হওয়াতেই হিন্দুস্থানী সংগীতের এতপ্রকার এবং এতদূর উন্নতি সাধন সম্ভব হইয়াছে। তানসেন, বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল প্রভৃতি জগবিখ্যাত গায়কদের শিক্ষা দীক্ষা এই হিন্দুস্থানেই হয়। এই হিন্দুস্থানেই তাঁরা অসামান্য কীর্তি স্থাপন করে গেছেন। এইজন্য ভারতবর্ষের সর্বস্থানেই হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের এত আদর। এবং সকলে হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট হইতে সংগীত শিক্ষা পছন্দ করেন। আজকাল বাংলা দেশেও হিন্দুস্থানী সংগীত শিক্ষার প্রতি লোকের যথেষ্ট আগ্রহ হইয়াছে।

অনেকের এই ধারণা যে হিন্দুস্থানে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে হিন্দু সংগীতের যে প্রকারউন্নতিসাধন হইয়াছিল, মুসলমানদের আগমনের পর হইতে তাহার অবনতি হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ ইহার সাক্ষ্য দেয়। মুসলমানরা ঐ সকল সংস্কৃত গ্রন্থ চর্চা না করিলেও উহারা প্রধানতঃ হিন্দুদিগের নিকট হইতেই সমস্ত হিন্দু সংগীত শিক্ষা করেন। পাঠান রাজত্বের এবং প্রথম মোগল রাজত্বের সময় প্রধান প্রধান গায়কগণ হিন্দু ছিলেন। ক্রমে ক্রমে মুসলমানগণ হিন্দু সংগীত সমস্ত ভাল করিয়া শিক্ষা করিয়া লইলে বাদশাহী দরবারে মুসলমান গায়ক ও বাদকদের আদর ও প্রতিপত্তি হয়। এই প্রকারে হিন্দু সংগীত মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এ সকল মুসলমান গায়ক ও বাদকদের দ্বারা এবং বাদশাহদের উৎসাহ ও উত্তেজনা যোগে সংগীতের অনেক উন্নতি ও সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। উন্নতি হইলে প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে অতএব প্রাচীন সংগীত হইতে আধুনিক সংগীত অনেক বিষয়ে এবং প্রকারে যে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগীতের সংস্কৃতগ্রন্থগুলির ভিতর কেবল উপপত্তি ছাড়া, গান ও গত্ প্রভৃতি কর্তবাংশের উদাহরণ কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন বা আধুনিক সংগীতের মধ্যে কোনটি যে বেশী ভাল তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুসলমান সম্রাটদিগের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান সংগীতদের মধ্যে পরস্পর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিয়াছিল এইজন্য সেইকালে সংগীতের যে প্রচার চর্চা হইয়াছে তাহা তাহার পূর্ববর্তীকালাপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নয়। প্রতিদ্বন্দ্বীতাই উন্নতির প্রধান কারণ। সুতরাং তাহারই প্রভাবে হিন্দুস্থানী লোকের সংগীত জ্ঞান, রচনা কৌশল ও কর্তবশক্তির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কারণ নবাব বাদশারা অনবরত উৎসাহ ও উত্তেজনা দিয়ে বহুকাল ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীতার স্রোত বজায় রেখেছিলেন। সেই সময়েই নানাপ্রকার রাগ-রাগিনীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে নূতন নূতন সংগীত যন্ত্রেরও

সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সংগীতের দুর্বোধ্য সংস্কৃত গ্রন্থের অনুশীলন হয় নাই বলিয়া যে উহার অবনতি হইয়াছে ইহা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না।

দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট ও দ্রাবিড় প্রদেশে সংস্কৃত গ্রন্থানুসারে সংগীত চর্চা হইয়া থাকে। দ্রাবিড় গায়কদের গান কলিকাতায় অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুস্থানী কায়দার কাছে দ্রাবিড় কায়দা কখনই উৎকৃষ্ট বা তদ্রূপ মনোহর বলে মনে হয় না। অতএব শুধু গ্রন্থ দেখিলেই হয় না। সংগীত হচ্ছে সাধনা ও কর্তবের বিদ্যা। যে গ্রন্থে কর্তবের প্রকৃত ও বিস্তৃত উপদেশ ও সাহায্য পাওয়া যায় তাহাই আমাদের বিশেষ উপকারী কিন্তু সেই জিনিষেরই প্রকৃত অভাব। সংগীত সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় দু'চারটি অনুবাদ হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হইতে প্রকৃত উপকার আমাদের বিশেষ কিছুই লাভ বা জ্ঞান হয় নাই।

নিতাই সেন—

শ্রীযুক্ত নিতাই সেন রূপ-মঞ্চ পৃষ্ঠপোষকবর্গের অন্যতম সদস্য—এঁর রচনার সংগে রূপ-মঞ্চ পাঠক- পাঠিকারা ইতিপূর্বেই পরিচিত হ'য়েছেন—বর্তমান প্রবন্ধে হলিউডের বিভিন্ন স্টুডিওতে ব্যবহৃত কয়েকটী সাজ সরঞ্জাম নিয়ে ইনি আলোচনা করেছেন।......

●

চলচ্চিত্রের আবিষ্কারের প্রথম দিনের কথা মনে হ'লে সত্যই ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কে জানতো—সেদিনকার সেই ছেলেমানুষী আজ সারা বিশ্বের বিস্ময়ের উদ্রেক করবে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও এই চলচ্চিত্র মানুষের মনে আলাদীনের মায়ার প্রদীপের মত রহস্যের মায়াজাল বিস্তার করেছিল। কিন্তু এই রহস্য ও মায়াজাল আর বেশী দিন মানুষকে মুগ্ধ করতে পারলো না। শুধু ছবি দেখেই তারা সন্তুষ্ট হ'তে পারলো না। আবার আরম্ভ হ'লো বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা। মূক ছবিকে মুখরা করে তুলতে সকলেই মেতে পড়লেন। গবেষকদের সকল পরিশ্রম সার্থক মণ্ডিত হ'য়ে উঠলো। মূক ছবি কথা বলতে শিখলো। সে হ'লো মুখরা। সেই প্রথম দিন থেকে আজ অবধিও বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা চলছে। নিখুঁত রূপ-লাবণ্যে ছবি আমাদের মন কেড়ে নিতে কতই না ব্যস্ত। তাই নিত্য নূতন যান্ত্রিক আবিষ্কার তাকে নিখুঁত রূপ দানে কতই না সাহায্য করছে।

যন্ত্রের কচ্‌কচানি আজ এখানে আমি বলতে আসিনি—সুযোগ এবং সুবিধা হলে এ নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাবে। আমার আজকের আলোচনা হচ্ছে কয়েকটী সাধারণ সাজ সরঞ্জাম নিয়ে—যা ওদেশে এবং আমাদের দেশে চিত্রগ্রহণে এক রকম অপরিহার্য বললেই চলে। যেমন মনে করুন ক্যামেরা ট্রাকটার, ক্যামেরা-ক্লিমস্ মাইক্রোফোন—ফ্লাস লাইট—স্পট লাইট—এবং এগুলি কী ভাবে ব্যবহার করা হয়। হলিউডের বিভিন্ন স্টুডিওতে গৃহীত কতকগুলি ছবির মারফত আপনাদের তা বলতে প্রয়াস পাবো। এগুলির ব্যবহার—আকৃতি এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাহ'লে আপনারা একটা সাধারণ ধারণা করতে পারবেন বলেই বিশ্বাস রাখি। অবশ্য যাঁরা বিশেষজ্ঞ—বা যাঁদের এ সব বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের কথা বাদ দিয়েই বলছি।

বড় একটী ঘরের চিত্র গ্রহণ করতে হলে কী ভাবে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে—R. K. O-র 'Are these our children' চিত্রের এই ব্যবস্থা দেখেই তা বুঝতে পারবেন।

এই দৃশ্যের নায়িকা হচ্ছেন জন ক্রফোর্ড, একে কী ভাবে আলোকিত করা হয়েছে একবার লক্ষ্য করুন।

একটী খবরের কাগজের অফিসের দৃশ্য গ্রহণের জন্য চিত্রশিল্পীকে কী ভাবে আলো সাজাতে হয়েছে। ক্যামেরার অবস্থিতি লক্ষ্য করুন R. K. O-র 'Consolation Marriage চিত্রে এই দৃশ্যটীর প্রয়োজন হয়েছিল।

আসুন স্টুডিওর দৃশ্যপটে যেয়ে আমরা হাজির হই। দেখুন এই দৃশ্যটি গ্রহণের জন্য কি ভাবে আলোগুলি সাজানো হয়েছে।

চলচ্চিত্রের আলোক-রহস্য বিশেষজ্ঞরাই উদ্ঘাটন করতে পারেন। 'The Modern Age' চিত্রের এই দৃশ্যটী গ্রহণের সময় কী ভাবে আলো সাজানো হয়েছিল—আলোক রহস্যের কিছুটা পরিচয় এথেকে পাওয়া যাবে বৈকী?

মুষ্টিযুদ্ধের এই দৃশ্যটি গ্রহণ করতে ওয়ারনার ব্রাদার্সের স্টুডিওতে আলোক সজ্জার কেরামতীটা একবার লক্ষ্য করুন।

তারকাদের close-up নিতে আলোর প্রভাব —close-up এর জন্য আলোগুলি কী ভাবে সাজানো হয়েছে এথেকেই বুঝতে পারবেন।

চারটী চরিত্রকে কী ভাবে আলোর সামনে আনা হয়েছে। এই আলোক সজ্জার জন্য চিত্রশিল্পীর বাহাদুরী আছে বৈকী।

নায়িকার close-up নেবার জন্য কী সুন্দর ভাবে আলোগুলি সাজানো হয়েছে একটু লক্ষ্য রাখুন। এই দৃশ্যে চিত্রশিল্পী রূপে দেখতে পাচ্ছি—Hal Mohr. A. S. Cকে. আর নায়িকা হচ্ছেন এভ্লীন ব্রেণ্ট।

শীতের দৃশ্য গ্রহণের জন্য কী ভাবে দৃশ্য পট তৈরী করা হয়েছে। এই দৃশ্যটী R. K. O. স্টুডিওতে গৃহীত হয়েছিল। সমস্ত পরিবেশটাই যেন হিমেল হ'য়ে উঠেছে।

M. G. M. এর বিরাট ক্যামেরা ক্রেণটী দেখুন। এটা সম্পূর্ণ এলুমিনিয়ামের তৈরী। এতে হালকা হয়েছে অনেকটা। ক্যামেরা ক্রেণের গঠন এবং কী ভাবে কাজে লাগানো হয় তা সহজেই বুঝতে পারবেন!

রাস্তার দৃশ্যাবলী গ্রহণ করতে ক্যামেরা ক্রেণ যথেষ্ট সাহায্য করে। এখানেই দেখুন না, এঁরা একদম শূন্যে উঠে গেছেন। দৃশ্যটী United Artists -এর স্টুডিওতে গৃহীত।

আসুন চলন্ত ক্যামেরা এবং মাইকের সংগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। R. K. Oর 'Her Man চিত্রে এরা বেশ সাহায্য করেছিল।

M. G. M. Studioর এলুমিনিয়ামের তৈরী ক্যামেরা ক্রেণটাকে এবার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করুন।

ক্যামেরা ক্রেণটাকে এখানে একটা চলন্ত মঞ্চের পরে তুলে প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ দৃশ্য গ্রহণ করা হচ্ছে।

শব্দনিয়ন্ত্রিত ক্যামেরার সাহায্যে নায়িকার close-up নেওয়া হচ্ছে। মেট্রো গোল্ডুইন মেয়ারের একটী দৃশ্যে নায়িকারূপে দেখা যাচ্ছে Grace Mooreকে।

ক্যামেরাকে আবৃত করে তার শব্দ নিয়ন্ত্রণ করা হয় হলিউডে এই যন্ত্রের দ্বারা। এখানে চিত্রশিল্পী একটী মঞ্চের পর উপবিষ্ট আছেন।

Marian Davis এবং Lawrence Grayকে নিয়ে সট্‌টিকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করবার জন্য ক্যামেরাকে নিয়ে চিত্রশিল্পী কোথায় উঠেছেন!

উত্তেজনাপূর্ণ চিত্র-গ্রহণের সংগে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ক্যামেরাটীকে নিয়ে চিত্রশিল্পী যেখানে উঠেছেন তা দেখেই যে আমরা শিহরিত হয়ে উঠি !

চিত্রশিল্পী শব্দযন্ত্রী সকলেই এখানে চলন্ত মঞ্চের পর উঠেছেন।

ক্যামেরাটাও আবার ডুব দেবে নাকি? মঞ্চের একদম উপরে তাকে নেওয়া হয়েছে। ক্যামেরা ডুব দেবে না সত্য, ডুব যিনি দেবেন তাঁর চিত্র গ্রহণ করবে ক্যামেরা। অতল জলে ডুবুরী তলিয়ে যাবেন, তার পায়ের তলার তলিয়ে যাবার দৃশ্য গ্রহণের জন্যই ক্যামেরাটীকে এখানে হাজির করা হয়েছে।

সাইরেনের শব্দে এরা যেয়ে ট্রেঞ্চের ভিতর প্রবেশ করেননি, প্রবেশ করেছেন ফুটবল খেলার একটী দৃশ্য গ্রহণের জন্য।

★

Action Shot গ্রহণ করবার সময় ক্যামেরা reflectorকে চলন্ত 'Dolly' বা মঞ্চের উপরে তুলে নেওয়া হয়।

★

★

'Blimps'এর দ্বারা কী ভাবে ক্যামেরার শব্দ নাশ করা হয় তার একটা দৃশ্য দেখুন। ক্যামেরার নিজস্ব শব্দ-টুকুও রাখা হবে না। ক্যামেরটা আবরণ দিয়ে ঢাকা হ'য়েছে—

আসুন একবার মাইক বা শব্দ গ্রহণ যন্ত্রের সংগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। বাবুই পাখীর বাসার মত যে জিনিষটা ঝুলছে ওটাই মাইক। ঘোড়ার শব্দ গ্রহণ করবার জন্য খ্যাত-নামা প্রযোজক সিসিল, বি, ডি, মিল, লোকজন ও যন্ত্রপাতি সমেত জমায়েত হয়েছেন।

★

বহির্দৃশ্য গ্রহণের সময় মাইকের কাজ দেখুন। দলবল সমেত জমিতে এসে সব উপস্থিত। মাইকের অবস্থিতি লক্ষ্য করুন!

★

গোপন সলাপরামর্শ কিছু চলছে। চললোই বা—শব্দটা যদি মাইক গ্রহণ করতে না পারে আজকের মুখরা ছবির সবই যে তাহলে ব্যর্থ হবে। মাথার পর মাইকের অবস্থিতি লক্ষ্য করুন।

★

★

ফুটবল খেলার দৃশ্য গ্রহণের জন্য ব্লিমস, সাউণ্ড ট্রাক মাইক্রোফোন বুমস, এরা অনেকাংশে কাজে লাগে। দেখুন না—সবই হাজির করা হয়েছে।

★

চিত্র সম্পাদনা কী ভাবে করে এই দৃশ্যটী দেখে তা বুঝতে পারবেন। চিত্র সম্পাদক এখানে চিত্রের প্রতিটি কথা এবং দৃশ্যের সংগে সামঞ্জস্য রেখে তার কাজ করে যাচ্ছেন।

★

★

আভ্যন্তরীণ দৃশ্য গ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম। মাইক্রোফোনটা জন গিলবার্টের পর ঝুলছে। এটা আধুনিক 'bomb' মাইক্রোফোন।

★

নাট্যকারের বাধা বিপত্তি

বিধায়ক ভট্টাচার্য

তরুণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য, নাট্যকার হিসাবে আজ আর তরুণ নন। তাঁর অভিনব রচনাভংগী—মধুসংলাপী ভাষা নাট্যামোদীদের মোহিত করেছে। যে বাধা বিপত্তি আমাদের নাট্যকারদের—চলার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়—সে সম্পর্কে বিধায়ক বাবুকে স্বীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে বলা হয়েছিল। তিনি তাঁর জনৈক নাট্যবন্ধুর নাট্য-জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনীর কথা উল্লেখ করে, সমস্ত নাট্যকারদের বাধাবিপত্তি সম্পর্কে যে আভাস দিয়েছেন—ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন আমাদের নাট্যমঞ্চগুলির স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রগতিবিরোধী হীনমনোভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে এথেকে।

প্রিয় কালীশবাবু

কিছু মনে করবেন না, ছেলেবেলায় কি আপনার মৌচাকে খোঁচা মেরে মজা দেখবার বদ্‌স্বভাব ছিল! থাকলে সে স্বভাব দেখছি আজও আপনার যায়নি। নইলে কোন পেশাদার নাট্যকারকে দিয়ে 'নাট্যকারের বাধা বিপত্তি'—লেথাবার কৌতূহল আপনার হতো না। কি মুস্কিলে ফেলেছেন বলুনতো? পুজো সংখ্যায় না লিখলেও আপনি রাগ করবেন, অথচ লিখবার বিষয় বস্তু ক'রে রেখেছেন অস্পৃশ্য 'Which is play to you is death to us' যাইহোক-আমার ব্যক্তিগত জীবনের বাধা বিপত্তির কথা আমি কিছুতেই লিখতে পারবোনা, সে আপনি শত সহস্র মাথার দিব্যি দিলেও-না। আমি বাংলার বিশিষ্ট একজন নাট্যকারের বাধা বিপত্তির কথা, তাঁর মুখ থেকে যেমন শুনেছি তাই সাজিয়ে দিচ্ছি। যদিও এই তিক্ত অভিজ্ঞতার সংগে প্রায় সব পেশাদার নাট্যকারেরই পরিচয় আছে,-তবু, আবার বলছি, এ অভিজ্ঞতা আমার নিজস্ব নয়, নিছক পরস্ব।

●

একদা একটি নাট্যানুরাগী যুবকের সাধ হ'ল—সে নিজে নাটক লিখবে। যুবকের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিলনা। সে পল্লীস্থ একটি ক্লাবে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে তাদের হিসাব পত্র রাখার কাজ করতো। নিজে ভাল অভিনয় করতে পারতো বলে চাকরিটা পাওয়া তার পক্ষে কষ্টকর হয় নি। ক্লাবে তখন কোন একটি বিখ্যাত পৌরাণিক নাটকের মহলা চলছিল। মহলা দেবার কালে অভিনয় শিক্ষকের কাজ থেকে নির্দেশ আসতো, "এই জায়গায় একটু বাঁকা করে চাও"—"এইখানে শরীরটা শিউরে উঠবে"—"দেখোনি অহীনবাবু কি রকম করেন'-"। ছেলেটির মন বিদ্রোহ ক'রে উঠতো। সে ক্ষীণ প্রতিবাদের ভংগীতে বলতো, "অহীন বাবুর মুদ্রাদোষগুলোও কি ওই চরিত্রের অংগ?" অভিনয় শিক্ষক তপ্তগলায় জবাব দিতেন, "হ্যাঁ, তাই করতে হবে"। যুবক তাই করতো, কিন্তু সর্বদাই তার মনে হতো, কেন পাবলিক ষ্টেজের নাটকগুলির এই মাছিমারা অনুকরণ? নিজেরা কি নাটক লেখা যায়না? গভীর রাত্রে—গোপনে, তার টিনে ছাওয়া ঘরখানির ছোট্ট জানালাটির কাছে বসে কেরোসিন আলো জেলে, সে তার এই স্বপ্নকে রূপ দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। অবশেষে সত্যিই একদিন নাটক লেখা শেষ হ'ল। স্বামীস্ত্রীর ভুলবোঝা বুঝি নিয়ে হাল্কা একখানি নাটক। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে, অত্যন্ত সংকোচে একদিন সে ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন করলো তার এই ভীরু সঙ্কল্পের কথা। অভিনয় শিক্ষক সশব্দে হেসে উঠে বললেন, "গিরিশচন্দ্রের ভাত মারতে চাও? যাও, যাও, হিসেবপত্রে মন দাও। ওরে বাবা, কথায় কথায় যদি সবাই গিরিশচন্দ্র, ডি, এল, রায় হতে পারতো, তাহলে আর দুঃখ ছিলনা। হ্যাঃ।" ম্লান মুখে ছেলেটি সেথান থেকে চলে এসে আয় ব্যায়ের খাতায় মন দিলে। কিন্তু ক্লাবে তার একটি হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিল, যে এই প্রস্তাব

টিকে কার্যকরী করবার চেষ্টা করতে লাগলো। অবশেষে একসিকিউটিভ কমিটী একদিন বইখানি শুনলেন। রুচি-বাগীশ ধনাধ্যক্ষ বললেন, "এই বই মা-বোন সংগে নিয়ে দেখা যাবে না।" নাটক কোথায় অশ্লীলতা দুষ্ট, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বোঝা গেল—নাটক খানির একমাত্র অপরাধ, সেটি ক্লাবের চাকরের লেখা। যাই হোক, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক ঝগড়াঝাঁটি ক'রে নাটকখানি যখন সত্যিই মঞ্চস্থ হ'ল, তখন সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। পঞ্চমবার যখন ক্লাব নাটকখানি অভিনয় করছেন, সেই সময় বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গ্রীন রুমে এসে লেখকের সন্ধান করলেন এবং তার রচনাভংগীর ভূয়সী প্রশংসা ক'রে সেখানি পাব্লিক ষ্টেজে অভিনয় করতে দিতে তার আপত্তি আছে কিনা, জিগ্যেস করলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী যে এভাবে তাকে স্বেচ্ছায় বরণ করবেন একথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি, তাই সে কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল,—"না, আপত্তি কেন থাকবে?" "বেশ' তাহ'লে কাল বিকেলে অমুক থিয়েটারে আমার সংগে দেখা করবেন।" এই কথা বলে তিনি পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে চলে গেলেন।

●

হিসাবরক্ষী যুবক নাট্যকার হ'ল। তার বইখানি মঞ্চে অভিনীত হয়েছে, সুখ্যাতি পেয়েছে, এবং আরও নাটক লিখবার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়েছে। আশেপাশের বন্ধুরা একটু অবাক হ'ল,-পথেঘাটে তাকে দেখতে পেলেই তারা বলতো,-"এই যে বার্ণাড´শ কী খবর?" "নোয়েল কাওয়ার্ড কোথায় চলেছ?" যেন নাটক লিখে ফেলে সে মহা অপরাধ করেছে। এদের পরিহাসের কোন জবাব না দিয়ে সে বোধ করি ভগবানের কাছে মনে মনে

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর 'বঞ্চিতা' চিত্রে জহর, কেতকী ও রেণুকা

প্রার্থনা করতো—ভগবান! সত্যিই আমাকে তুমি নাট্যকার হবার যোগ্যতা দান করো। দেশের লোক যেন নাট্যকার বলেই আমাকে চিনতে পারে। মনে হয় ঈশ্বর যেন সেদিন এই ভীরু গ্রাম্য যুবকের সকরুণ প্রার্থনা শুনে ওপর থেকে বলেছিলেন-"তথাস্তু"।

ওপরের ঘটনাগুলি হ'ল নাট্যকার হওয়ার পক্ষে বাধা, অতঃপর যা লেখা হবে, তা হচ্ছে নাট্যকার হয়ে বিপত্তি।

যুবক দ্বিতীয়-নাটক লিখলো—এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ দুঃখ নিয়ে। বইখানি পড়াশেষ হ'য়ে গে'লে শুনলো—ছোট হয়েছে, আর একটা সিন বাড়াতে হবে। কাকে নিয়ে সিন বাড়ানো যায়, তার ধ্যানের মাঝে চরিত্রগুলি যে ভাবে ধরা দিয়েছিল, সব যেন কেমন গোলমাল হ'য়ে যেতে সুরু করলো। নাটকখানি ছিল

শারদীয়ার প্রীতি সম্ভার
এস, আর, হেমাদের নিবেদন!
মানে-না-মানা
নিউ সেঞ্চুরীর ছবি
রচনা ও পরিচালনা - শৈলজানন্দ
ভূমিকায় - মলিনা, রেণুকা, সন্ধ্যা, অহীন্দ্র, জহর
ধীরাজ, ফণিরায়, সাবিত্রী, সন্তোষ সিংহ
উত্তরা • পূরবী ও পূর্ণয় চলিতেছে
বিনোদ পিকচার্সের
নল-দময়ন্তী
ভূমিকায়-
শোভনা সমর্থ
পৃথ্বীরাজ
ডেভিড ও নায়াম পলি
মিনার্ভা ও গণেশ টকী-তে চলিতেছে
সেন্ট্রাল ষ্টুডিওর
ইয়াতিম
ভূমিকায়
চন্দ্রপ্রভা • উদয়কুমার
ইয়াকুব
সেন্ট্রাল-এ
চলিতেছে
বিনোদ পিকচার্সের
রতন
ভূমিকায়
স্বর্ণলতা • করণ দেওয়ান
ওয়াস্তি ও মঞ্জুলা
প্যারামাউন্ট-এ
চলিতেছে
ETD
EMPIRE TALKIE DISTRIBUTORS
SB

এসোসিয়েটেড পিকচার্স লিঃ-এর 'আমীরী' চিত্রে প্রমথেশ বড়ুয়া ও রমলা।

ঘণ্টা তিনেকের, তাকে চার ঘণ্টার না করলে নাকি দর্শক অসন্তুষ্ট হবে। সে বললে—"তিন ঘণ্টার নাটক যদি—যথার্থ রসঘন হয়, তবে দর্শক নেবেনা কেন?" উত্তর এল, "না তা নেবেনা। আমাদের চাইতে কি বেশী জানেন আপনি? আমরা দিনরাত এই করছি।" "কিন্তু বাড়াই কী ক'রে বলুন?" "কেন? নায়ককে মেরে ফেলুন।" "সে কি!" এই বিস্ময়ের ধাক্কা কাটতে তার বেশ কয়েকদিন সময় লেগেছিল। পরিশেষে অগত্যা নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে সে নায়ককে মেরে ফেললো। কর্তৃপক্ষ বললেন—"চমৎকার হয়েছে, কিন্তু আরও একটি কাজ করতে হবে যে!" "কি বলুন?" "একখানা নাচ, কোন রকম ক'রে ঢুকিয়ে না দিলে যে চলছে না ভাই!" স্তম্ভিত যুবকের মুখ দিয়ে পুনরায় নির্গত হ'ল—"সে কি!" "হ্যাঁ।" প্রযোজক উত্তর দিলেন,—"এই ব্যালে ষ্টাফটির জন্যে মাসে খরচ হয়—সাড়ে চারশো টাকা। আপনি কি বলতে চান, আপনার বই যদি ভগবানের ইচ্ছায় এক বছর চলে, তবে এই এক বছর ওদের বসে বসে মাইনে দিতে হবে?" "তাই বলে—?" "নিশ্চয়। নাচ একখানা দেওয়া চাই-ই। নইলে থিয়েটারের লোকসানের পরিমাণটা একবার ভেবে দেখুন। এদিককার প্রফিট ওদিক দিয়ে গলে যাবে।" "সখীর নাচ!" যুবকের চোখ ফেটে জল আসবার উপক্রম; "এই সুন্দর তক্‌তকে, ঝক্‌ঝকে সামাজিক নাটকে সেই আদ্যিকালের সখীর নাচ! জায়গা কোথায়? আর সখী নাচাবার যুক্তিই বা কী?" "আরে ভাই, কলম নিয়েতো বসুন, দেখবেন হ'য়ে যাবে। বলি ছোট মেয়েটা কলেজে পড়ে তো?" "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "তার কলেজের

কতকগুলি মেয়ে কি সিনে আসতে পারবে না?" "পারে।" এসে তাদের আগামী অভিনয়ের একখানা নাচ কি এই বুড়ো বাপকে দেখিয়ে যেতে পারে না?" "পারে।" যুবক নিজের নিবুদ্ধিতায় অবাক্ হ'ল!

যুবকের দ্বিতীয় বইখানি বাজারে খুব নাম করলো। তৃতীয় নাটক লেখা হ'ল দিন দশেকের মধ্যে। ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। একদিন সকালে রাস্তায় বেরিয়ে সে দেখলো—চারিদিকে বড় বড় পোষ্টার পড়ে গেছে—অমুক থিয়েটারে, জনপ্রিয় নাট্যকার অমুকের নূতন নাটক অমুক ইত্যাদি। ছেলেটি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না—নাট্যকারের নামটি তারই বটে, কিন্তু এ নাটক তো সে লেখেনি, বা এ নামও সে জানে না। তখুনি সে থিয়েটারের দিকে ছুটলো।

প্রযোজক হেসে বললেন—"ওতো তোমারই নাটক।" "আমার নাটক! কিন্তু কই আমি তো—!" "লেখনি? তাতে কী হয়েছে? লেখা নেই, লেখা হবে।" "ওই নামে?" "হ্যাঁ। নামটা ভাল নয়!" "তা' ভাল—কিন্তু!" "কদিন লাগবে? দিন সাতেক লাগুক।" "দিন সাতেকে এক নাটক! আপনি বলছেন কী?" "অন্যায় কিছু বলিনি।" অতএব পরদিন থেকে উক্ত থিয়েটারের ওপরতলায় যুবক বাস করতে লাগলো। পাঁচ সাত খানি শ্লিপ লেখা হয়, সংগে সংগে কপি হয়, এবং রাত্রে রিহারস্যাল হয়। এই ভাবে দশ দিনের মধ্যে বাংলার একখানি নাম করা নাটক লেখা হয়ে গেল—এবং সেটা মঞ্চ সাফল্যও লাভ করলো।

চতুর্থ নাটকখানি যুবক লিখতে আরম্ভ করলো একটি বিরাট সমস্যা নিয়ে। সামাজিক নাটক তার বিষয় বস্তু ছিল, বাঙালী যদি কোন বিদেশিনীর গর্ভজাত শিশুকে তার শৈশব থেকে বাঙালী পরিবারের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ ক'রে, বিয়ে দিয়ে, সিঁদুর পরিয়ে, তা'কে বাঙালী করতে চায়, তবে সে পুরোপুরি বাঙালী হয় কি না? নাটকখানির পরিচালক ছিলেন একজন নামজাদা টাইপ অভিনেতা। তিনি এই নাটকের পরিণতি নিয়ে ঘোরতর আপত্তি তুললেন এবং নায়িকাকে তাঁর (তাঁর গৃহীত চরিত্রের) শ্যালিকার অবৈধ সংসর্গজাত কন্যারূপে চিত্রিত করবার আদেশ দিলেন। যুবকের নাটকীয় দৃষ্টিভংগী ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।—এই অস্বাভাবিক আব্দারে তার মন তিক্ত হ'য়ে উঠলো। সে রাগ করে থিয়েটার থেকে চলে গেল। দিন দুই পরে তার বাড়ীর সামনে মালিকের গাড়ী থামলো। বিদ্রোহী নাট্যকার তবু বশ মানতে চায় না। অবশেষে তিনি নাট্যকারের সামনে একখানি চমৎকার ফরাসডাঙ্গার ধুতি ও পঞ্চাশটি টাকা রেখে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, "আমার খাতিরে তোমার একখানি নাটক বলি দাও।" সামনে পূজো, দরিদ্র নাট্যকার ওই পঞ্চাশটি টাকার লোভ তার স্ত্রী-পুত্র পরিবারের জন্য ছাড়তে পারলো না। সে ওই ভাবেই বইটি লিখে দিল। মাত্র চল্লিশ রাত্রি অভিনয় হ'য়ে বই খানির পরমায়ু শেষ হ'ল। সকলে নাট্যকারকে নিন্দে করতে লাগলো—ওই রকম জঘন্যভাবে

বইখানি শেষ করার জন্য। সে নীরবে ম্লান মুখে এই অপমান সহ্য করলো। কিন্তু কেউ এ কথা জানলো না—যে একজন বিখ্যাত পরিচালকের রসজ্ঞানহীনতাই এর একমাত্র কারণ। তিনি গঙ্গাজলে হাত পা ধুয়ে চারদিকে বলে বেড়াতে লাগলেন—"লেখকের দোষেই এমন ঘটেছে।"

পঞ্চম নাটকখানি একখানি প্রাচীন বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ। তাতেও সেই একই আব্দার। সখি থেকে সুরু ক'রে হিরো অবধি প্রত্যেকের প্রতি সুবিচার করতে হবে। কোন পার্টই unimportant হ'লে চলবে না। অভিনয় আরম্ভের দিন একজন বিখ্যাত অভিনেতা নাট্যকারকে গোপনে ডেকে দুখানি ফাউল কাটলেট হাতে দিয়ে বললেন—"তোমার বৌদি ভাজছিল, তাই তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।" কাটলেট দুখানি খাওয়ার পর তিনি বললেন—তাঁর পার্টের একটুখানি ডায়লগ লিখে এনেছেন,—নাট্যকারের অনুমতি পেলে তিনি সেটি বলতে পারেন। অনুমতি না দিয়ে নাট্যকারের উপায় ছিল না। অতএব সেই হাততালি পাবার passage টুকু তাঁকে বলতে দিতেই হ'ল। অদ্ভুত মেলোড্রামাটিক ভংগীতে চেঁচামিচি ক'রে তিনি হাততালি কুড়োতে লাগলেন,—আর প্রেক্ষাগৃহের এক কোণে বসে হতভাগ্য নাট্যকার শুধু নীরবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো।

এর পরে সেই নাট্যকারের আরও বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। কিন্তু কোনবারই তিনি নিজের ইচ্ছায় একখানি সম্পূর্ণ নাটক মঞ্চস্থ করতে পারেন নি। প্রযোজক পরিচালকের স্বয়ং-সৃষ্ট নাট্যরসবোধ বারেবারেই তার ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। কখনো শুনেছেন—"নায়িকার মুখে গান দাও, নইলে দর্শক চেয়ার টেবিল ভেংগে ফেলবে।" কখনো শুনেছেন—"এর নাম কি ড্রামা? এমন জঘন্য জিনিষ তোমার হাত দিয়ে কী ক'রে বেরোলো?" কখনো শুনেছেন—"অমুক অভিনেতা অমুক বিষয়ে বিখ্যাত, তাঁকে অমুক বিষয় দিয়ে কাজে লাগাও।" সকলের সব হুকুম তামিল করবার পর নাটকখানি দাঁড়ায় না-টক, ন'-মিষ্টি। তাঁরা লিখতে পারেন না, তাঁরা suggestion দিতে পারেন।

সুবর্ণভূমি চিত্রে স্বর্ণলতা।

এবং সেই suggestion মাথা পেতে মেনে নিতে যে নাট্যকার না পারলো, তিনি কিসের নাট্যকার? প্রযোজকের কথা শুনতে হবেই, তা তিনি কাঠের ব্যবসা ক'রেই থিয়েটার করুন অথবা মদের ব্যবসা ক'রেই থিয়েটার করুন, নাটক সম্বন্ধে বলবার অধিকার তাঁর থাকবেই। কেননা ষ্টেজ তাঁর, টাকা তাঁর, অতএব রসবোধও তাঁর।

এই অবধি বলে সেই নাট্যকার আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন-যে বাংলা দেশের নাট্যকার সম্বন্ধে আপনি যে কিছু লিখবেন বলেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, নাট্য কার? নাট্য কি নাটক রচয়িতার? না, নাটক-প্রযোজকের? এই জিজ্ঞাসায় আমি কোন জবাব দিতে পারিনি।

যাই হোক—আমি নিজেও একজন নাট্যকার। উপরোক্ত অভিযোগ সমূহের সব না মিললেও, কিছু কিছু মেলে। তাই এ সম্বন্ধে কোন রকম টিকা টিপ্পনি ক'রে আমার ভবিষ্যৎকে কণ্টকাকীর্ণ করতে চাই না।

শুধু একটি অনুরোধ, ভবিষ্যতে এই রকম প্রবন্ধ লেখবার অনুরোধ না ক'রে আমাকে একটি গল্প বা নাটিকা লিখতে আদেশ করবেন। কাজটি আমার পক্ষে সহজ হবে।

বাঙ্গালা নাটকের জাতীয়-রূপ

শ্রীঅজয় বসু, এম-এ

★

লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতীছাত্র। ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাংলা নাটকের উৎস বলে যাঁরা মনে করেন—তাঁদের এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

"Drama is life presented in action"

সমালোচকের এ কথাকে যদি সত্যি বলে মেনে নেয়া যায় তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে জীবনের সংগে নাটকের যোগ অত্যন্ত গভীর। জীবনের সাথে যোগ আছে বলেই নাটকের রসস্রোত আমাদের মনকে গভীর-ভাবে নাড়া দেয়। আমাদের জীবনকে আমরা সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না; তাই আমাদের ব্যক্তিসত্বা তৈরি হয়ে উঠেছে সমাজসত্বার নিগূঢ় পরিবেশে। সেইজন্যই সত্যিকারের নাটক আমাদের ব্যক্তিসত্বার উপ-লব্ধির মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজ জীবনকে রূপ দেয়। জাতীয় নাটক জাতীয় নাট্যশালার মূল উৎস এখানে।

বর্তমান যুগের বহু সমালোচকের কাছে একথা শুনতে পাওয়া যায় যে, আমাদের নাট্যশালার এবং নাটকের সৃষ্টির মূল উৎস হচ্ছে ইয়োরোপীয় সাহিত্য এবং সংস্কৃতি। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে রুষদেশীয় হেরাসিম লেবেডফ ২৫নং ডুমা-তলাতে (বর্তমান এজরা ষ্ট্রীট) "The Disguise" নামক ইংরাজী নাটকের বাংলা অনুবাদ করে অভিনয় করেন (Bengal Gazette 5th Nov. 1795)। আজকাল ঐ নাটক এবং নাট্যশালাকেই বর্তমান নাটক এবং নাট্য-শালার ইতিহাসের আরম্ভ পর্ব বলে ধরা হয়।

সভ্যতার আদিপর্ব থেকে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার রূপ এবং কাঠামো পরিবর্তনের এবং বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে সুতরাং জাতীয় জীবনের পরিবর্তনশীলতার সংগে সংগে আমাদের প্রমোদ ব্যবস্থারও পরিবর্তন হতে বাধ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলায় যে সুদূর-প্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছিল তার ছায়া তার সমাজ এবং সংস্কৃতির ওপরও এসে পড়েছিল। তার ফলে তার সাহিত্য এবং প্রমোদ ব্যবস্থাও পুরাতন রূপ পরিত্যাগ করে নবাগত সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাই বলে, পূর্ববর্তী প্রমোদ ব্যবস্থার সংগে তার কোন যোগ নেই, এ কথা স্বীকার করা যায় না। বিদেশী সভ্যতা আসার সংগে হয়তো রংগমঞ্চের দৃশ্যসজ্জা এবং কাঠামো বদলেছে কিন্তু বাংলার জাতীয় জীবনের, বাংলার সংস্কৃতির যে ছায়া আমাদের প্রমোদ ব্যবস্থার মধ্যে পড়েছিল, তা এখনও আমাদের নাটকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। সুতরাং বাংলা নাটকের ইতিহাস সুরু লেবেডফ থিয়েটার নয়, তার ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে অনেক আগে। সেই পুরাতন যুগ থেকেই বাংলা নাটকের ইতিহাসকে উদ্ধার করতে হবে। খৃষ্টিয় চতুর্দশ শতকে বাংলার প্রমোদ ব্যবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণে—

> নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
> কেহো বেদ পড়ে কেহ পড়এ মঙ্গলে॥
> নানা মঙ্গল নাটগীতি হিমালয়ের ঘরে।
> পরম আনন্দে লোক আপনা পাশরে॥
>
> —উত্তরকাণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ সং। পৃ ৬।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা। রচনা শৈলী নাটকের মত। এই বিরাট পুস্তকের চরিত্র মাত্র ৩টি - কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়াযি। এই তিনটি চরিত্রের উক্তি, প্রত্যুক্তি এবং অ্যাক্‌শনের মধ্য দিয়ে কাহিনী চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড ইত্যাদি দৃশ্য বিভাগেরই নামান্তর। এই তিনটি চরিত্রকে এক দৃশ্য হ'তে অপর দৃশ্যে নিয়ে লেখককে অ্যাক্‌-শনের অনুরূপ পরিবেশ (atmosphere) সৃষ্টি করতে হয়েছে।

জন্মখণ্ডকে প্রস্তাবনা বা epilogue বলা যেতে পারে। এই অতি-পুরাতন পুঁথি থেকে কয়েকটি পঙ্‌তি উদ্ধার করলেই বোঝা যাবে যে, নাটকীয় ব্যঞ্জনা কী রকম প্রাধান্য লাভ করেছে এই কাহিনীতে।—

আচে কাহ্নাঞি,

আছিলোঁ মো শিশুমতী　　না জানিলোঁ রঙ্গরতী
　　এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ।
অহো নিশি একমতী　　তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী
　　এবে কৃষ্ণ করহ আদেশ ॥১॥

আহে রাধা।

বাপ বসুল মোর　　গোকুল আহ্মার ঘর
　　গোপ লোকে আহ্মা ভাল জাণে।
শুনিলেঁ পাইব লাজ　　তোহ্মে মোর নাহি কাজ
　　মোর পাশ আইস অকারণে।

(চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহ খণ্ড)

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রংপুর, কুচবিহার অঞ্চলের কৃষ্ণ-ধামালীর মার্জিত রূপ। একথা সকলে স্বীকার না করলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে তৎকালীন প্রমোদের একটি নিদর্শন এবং এর মধ্যে যে নাটকীয় ব্যঞ্জনা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এ কথা অস্বীকার করা চলে না। চরিত্র চিত্রণের মধ্যেও আমরা নাটকীয় প্রণালী দেখতে পাই। অজ্ঞাতযৌবনা মুগ্ধা শ্রীরাধা কেবল উক্তি প্রত্যুক্তি এবং অ্যাকশনের মধ্য দিয়ে রাধা-বিরহ খণ্ডে প্রজ্ঞাপারমিতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু এই রূপান্তরের মধ্যে গ্রন্থকার কখনও স্বকীয় মন্তব্য analysis প্রয়োগ করেন নি। চরিত্রগুলি যেন স্বাধীনভাবে নিজের কথাবার্তা এবং কার্যকলাপের সাহায্যে পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে। লেখকের এই আত্ম-গোপনই হচ্ছে নাটকীয় গঠন-কৌশল এবং এখানেই উপন্যাসের সাথে নাটকের পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গ্রন্থকারের যবনিকার অন্তরালে অবস্থান সার্থক হয়েছে। এ হিসাবে দেখতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনই বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম নাটক-জাতীয় বই।

এর পরই আমরা বাংলাদেশের সত্যিকারের নাটক অভিনয়ের বিবরণ পাই বৃন্দাবনদাস কৃত চৈতন্য ভাগবতের (প্রায় চারশত বৎসর পূর্বে লেখা) অষ্টাদশ অধ্যায়ে। কবি বৃন্দাবন দাস একে 'লক্ষ্মীনৃত্য' বলে অভিহিত করে-ছেন (একথা সকলেই জানেন, নৃত্য থেকেই নাটকের উৎপত্তি)। যদিও এখানে একে 'নৃত্য' বলা হয়েছে তা যে আসলে একেবারে নাটকাভিনয়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যথা—

একদিন প্রভু বলিলেন সবা-স্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ্ অঙ্কের বন্ধনে ॥
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু, কাচ সজ্জা কর গিয়া ॥
শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটসাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সবাকার॥
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তল বুড়ী সখী সুপ্রভাত ॥

ওপরের বর্ণনা পড়লেই বোঝা যাবে যে মহাপ্রভু যে

নাটকটি অভিনয় করেছিলেন তা "অঙ্কের বন্ধনে" আবদ্ধ ছিল এবং এই নাটকাভিনয়ে চরিত্র অনুযায়ী সাজসজ্জা করা হয়েছিল, কেননা বর্ণনাতেই পাওয়া যাচ্ছে—শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটসাড়ী, অলঙ্কার ইত্যাদি—দিয়ে "যোগ্য যোগ্য করি" সাজ-সজ্জা করা হয়েছিল। এতে গদাধর রুক্মিণী, ব্রহ্মানন্দ বুড়ীর এবং মহাপ্রভু লক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কেবল তাই নয় এই অভিনয়ের জন্যে ষ্টেজ ও তৈরি হয়েছিল। যথা—

সেইক্ষনে কণিয়ার চান্দোয়া টানিয়া।
কাচ সজ্জ করিলেন সুচন্দ করিয়া॥

গ্রীণরুমের মতো সজ্জা গৃহ ও ছিল—

গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর॥

অভিনয়ের পূর্বে আধুনিক ঐক্যতান বাদনের মতো কীর্তন করা হয়েছিল—

কীর্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল-গোবিন্দ॥

পোষাক পরিচ্ছদ এবং রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতির সহযোগে বাংলা দেশে প্রথম নাটকাভিনয় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হয়, তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে চৈতন্যদেবের জীবিতকালে; এবং এইটিই প্রথম নয়, কেননা নাটকাভিনয় যদি প্রথম চৈতন্য-দেব প্রবর্তন করতেন, তবে চৈতন্য-ভাগবতে তার উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকতো। সুতরাং বাংলা নাটক এবং নাট্যমঞ্চ চৈতন্যদেবের পূর্বেও বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগের কর্তা অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু বলেন—"বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ইংরেজগণের নাট্যশালার অনুকরণে বাংলা নাট্যশালা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা বর্তমান যুগের কথা। এই সময়ে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহাই মাত্র বলা যাইতে পারে।" (ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩৭)

ওপরের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায়, বাংলা নাটকের আদিরূপ পাওয়া যায় "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" এবং বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় চৈতন্যদেবের সময়ে বা তারও পূর্বে।

স্বামীনাথ চিত্রে শোভনা সমরথ

এখন প্রশ্ন উঠবে, বাংলা নাটক এবং অভিনয় যদি এত-দিনের পুরাতন জিনিষ তবে সেই নাটক নিজস্ব বিবর্তনের পথ ধরে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে বাংলার জাতীয় রঙ্গ-মঞ্চে রূপান্তরিত হোল না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুব কঠিন নয়। পুরাতন সাহিত্য ও সমাজ ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ধর্মসংস্পর্শহীন কোন প্রমোদ ব্যবস্থাই পূর্ববর্তী যুগে আমাদের সমাজে জনপ্রিয় হতে পারে নি। মানুষের দুঃখ, মানুষের ব্যথা, কবির চিত্তকে আলোড়িত করতো, তবু তার প্রকাশ হতো দেবতার ছদ্মবেশে। তাই পুরাতন সাহিত্যে দেবতারা মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছেন। সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আধু-নিকতার লক্ষণই হচ্ছে মানব-জিজ্ঞাসা। মানুষের ওপরের কোন সত্যকে আধুনিক সাহিত্য স্থান দেয় না। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা বিবর্তনের পথে এগিয়ে আসবার সুযোগ পায় নি। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কাব্য, এবং তৎকালীন প্রচলিত গানের মধ্যে আধুনিকতার অস্পষ্ট-আলো মাত্র দেখা যাচ্ছিল। এমন সময়ে এলো ইংরেজী সভ্যতার প্রচণ্ড তীব্রতা। তার সমাজ, তার সংস্কৃতি, তার

সাহিত্য উগ্র আধুনিকতার রূপ নিয়ে এদেশে এসে উপস্থিত হোল। বাংলা সাহিত্যেও আধুনিকতা এলো ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে। বাংলা নাটকের সহজ বিবর্তনের পথ হোল রুদ্ধ; কেননা তার আগেই ইংরেজী স্টেজ, ইংরাজি নাটক আধুনিকতার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এদেশের বুকে। পুরাতন প্রমোদ ব্যবস্থাকে দূর করে বাঙ্গালী অবিকল অনুসরণ করলো ইংরাজ নাটকের গঠন-শৈলী, গ্রহণ করলো ইংরেজী রঙ্গমঞ্চের পরিপূর্ণ রূপ।

কিন্তু বাঙ্গালীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে; বাঙ্গালী অন্ধ-ভাবে অনুকরণ করে না। তাই ইংরাজী গঠনশৈলীগত নাটকের বুকেও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জেগে রইলো, তা বাঙ্গালীর নিজস্ব। ইংরাজী নাটকে গান নেই, বাংলা নাটকে গান আছে। এই গান এসেছে বাঙ্গালীর জাতীয় সহজ গীতিপ্রবণতা থেকে, যাত্রার ভেতর দিয়ে। প্রথম যুগের বাঙ্গালা নাটকে (বর্তমানেও দু-একটি নাটকে) নান্দী-সূত্রধর দেখা দিল। এখনও বাজারে চলছে ভক্তি মূলক এবং পৌরাণিক নাটক। এ রকম অনেক ছোট-খাটো নিদর্শন দেখলে বোঝা যায়, বাঙ্গলা নাটক আজও তার জাতীয়রূপের কোন কোন চিহ্ন অংগে ধারণ করে আছে। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলার নাটকের সংগে সত্যিকারের বাঙ্গালীর সামাজিক বা জাতীয় জীবনের কোন যোগ নেই। বাংলার নাটক আজ কাল ফরমাইশি বলেই cheap stunt ও সকল-শ্রেণী-মনোরঞ্জনের দিকে বেশী দৃষ্টি দেয়। সত্যি-কারের জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন—যেদিন নাটক হবে জাতীয় জীবনের সুখ দুঃখের বাহন; সমস্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি। সেই জাতীয় নাট্যশালাই সৃষ্টি করতে পারবে বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতিচ্ছবি যথার্থ জাতীয় নাটক।

ইম্প্রেসারিও জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা

হরেন ঘোষ

★

প্রতিভা জন্মগত, স্বীকার করি—কিন্তু কোন কিছুর আশ্রয় না পেলে প্রতিভা বিকশিত হতে পারে না—অথবা প্রতিভাকে বিকশিত করে তুলতে শক্তি বা প্রেরণার দরকার। নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর থেকে ভারতের বহু শিল্পীই ইমপ্রেসারিও শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষকে আশ্রয় করে প্রতিভাত হয়ে উঠেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ঘোষ যুদ্ধকালীন অবস্থায় তার শিল্পীদের নিয়ে পরিক্রমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানাতে চেয়েছেন।

পৃথিবীময় যখন অশান্তি, চারিদিকে অনাচার, অত্যাচার, মৃত্যুভয়, মহাযুদ্ধে ভারতের আইনত কোন স্থান না থেকেও ভারতের বুকে যখন লক্ষ লক্ষ নরনারী সর্বদাই সশঙ্কিত, তখন এই অশান্ত জগতের শান্তিস্থাপনার জন্য মৃত্যুকে বরণ ক'রে যে সকল সেনাদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তাঁদের আনন্দবর্ধন হেতু দক্ষিণ পূর্ব ভারতের G. H. Q. থেকে আমার ডাক পড়ে। তাঁরা চেয়েছিলেন এমন কিছু আমোদ প্রমোদ যা দেখে মৃত্যুমুখী সেনাদল ক্ষণিকের জন্যও আনন্দ পায়, উল্লাস করে। আমি একজন ভারতীয় ইম্প্রেসারিও—আমার নাচ গানের আসর বসে, ভারতের নানা সহরে—কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সংবাদপত্রের সংগে আমার পরিচয়। এই সুবাদেই আমি সিমলা গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অধিকার পাই আমার নাচ গানের দল সৈনিকদের জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পে, ভিন্ন ভিন্ন সহরে, নগরে ও পাহাড়ে নিয়ে যাব বলে। আমার ছুটী কথা বলবার ছিল। প্রথম, যাতায়াতের সুবিধার জন্য রেলপথে দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্ট, দ্বিতীয়, ক্যাম্পে নেমে একজন বিশিষ্ট অফিসারের সাহায্য, যাঁর ওপর নির্ভর করে আমার আর্টিস্টরা নির্ভয়ে তাদের কাজ করতে পারে।

এই ছুই প্রশ্নেরই সদুত্তর পেয়েছিলাম এবং বিশিষ্ট ব্যবস্থা আমার দলের জন্য হয়েছিল বলে আমি সত্যই G. H. Q.র নিকট কৃতজ্ঞ।

আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার আর একটী কারণ হচ্ছে যে গত ১৫ বছরের ইম্প্রেসারিও-জীবনে আমি যে সকল গুণগ্রাহীদের কাছে আমার নাচগানের আসর বসাতে পেরেছি তার সংখ্যা যদি চার লক্ষ হয়, তাহলে এই দেড় বছরের মধ্যে আমাদের ভারতীয় সেনাদলের ও সেই সংগে য়ুরোপীয় ও আমেরিকান সৈনিক মণ্ডলীর সংখ্যা হবে অন্ততঃ পক্ষে আট লক্ষ। এর মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকই গ্রামের ছেলে,—যাদের সংগে আমাদের পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়েছে G. H. Q এর মধ্যস্থতায়। দেশের মাটির ছেলেদের কাছে কি ধরণের নাচ গান তাদের মনোমত হবে এটা ছিল একটা সমস্যা এতদিন। এবার সেই অভিজ্ঞতা হল এবং বুঝতে পারলুম—তারা কি চায়, কিসে তাদের আনন্দ ও তৃপ্তি। কথাটা অতি সরল। তারা চায়, এমন কিছু যা বুঝতে বিলম্ব হয় না—তারা জটিল কিছুর মধ্যে যেতে চায় না। সহজে বোধগম্য এমন নাচ গানেরই তারা ভক্ত। তবে ভাল ও মনোরম পোষাক পরিচ্ছদে দেখতে তাদের ভাল লাগে। ছু'ঘণ্টার শোতে তারা ৮।১০টী বিভিন্ন নাচ, ২।৩টী বিভিন্ন গান ও এক আধটী বিশিষ্ট বাজনার পক্ষপাতী। আমাদের দলে যে সব গান গাওয়া হতো সবই হিন্দি বা উর্দ্দুতে। বাকী যা হ'তো তা সবই মূক নৃত্য। ভংগী সুদৃশ্য হ'লে তাদের আনন্দের সীমা থাকত না। তা ছাড়া বহুদিন গৃহত্যাগের ফলে এবং কয়েক বৎসর যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রায় সকলের মধ্যেই এমনই একটা নারী-প্রীতি গড়ে উঠেছিল, যেটাকে আর যাই

বলি কু ভাবতে পারি না। মাঝে মাঝে যে বীভৎস চীৎকার ও অ-কথা কু-কথা শুনিনি তা বলি না। তবে যে আদর, যে সহৃদয়তা, যে শ্রদ্ধাঞ্জলী মাঝে মাঝে পেয়েছে আমার সাথী শিল্পীরা, তারা সারা জীবন মনে রাখবে। সে শুধু তাদের sex appeal-এর জন্য নয়। তারাও যে রসগ্রাহী, তারাও যেভালকে ভাল মনে করে গ্রহণ করতে জানে, তাদেরও যে রুচিবোধ আছে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আমরা নানা জায়গায় গিয়ে পেয়েছি। পাঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশে এমন সব কেল্লায় আমাদের ছেলে মেয়েরা তাদের নাচ গানের পরিচয় দিয়ে এসেছে, অতীতে বা কোনো কালে কোন এদেশীয় লোক সে সব ফোর্টের ভিতরে যাবার অধিকারও পায়নি।

ভারতের সীমান্ত প্রদেশের কত জায়গাতেই আমার বিভিন্ন দলের ছেলে মেয়েরা কত উৎফুল্ল মনে—কখনো মোটরে, কখনো লরীতে, কখনো পাহাড় ভেংগে উঠেছে —কখনো বা আফ্রিদিদের দেখে তারা ভয় পেয়েছে, কখনো বা সেই সব বিকটাকায় মুসলমান কাফ্রিদের অসীম করুণা, দয়া ও ভদ্রতায় তন্ময় হয়ে গেছে। সারা রাত আমাদের ছেলে মেয়েরা যাতে নির্বিঘ্নে নিদ্রা যেতে পারে তারও কত না ব্যবস্থা সেই সব বিদেশী সেনাদল-ভুক্ত হিন্দু মুসলমান ভাইরা অতি আপন. ভেবেই করেছে।

যেদিন খাবার অসুবিধা হয়েছে তারা এনে দিয়েছে খাদ্য তাদের নিজের অংশ থেকে, দলের অসুবিধে হলে এনে দিয়েছে জল রাখার পাত্র, চা চিনি টিনের খাবার, কত কি?

মানুষের সত্যকারের পরিচয় পেয়েছি। কেউ কেউ বলেছেন, মেয়ে আছে কি না তোমার সাথে, তাই তোমার এত খাতির। মেয়ে ত আমার সাথের সাথী। বড় বড় সহরেও কতবার শো দিতে গিয়ে বড় বড় ঘরের সন্তানদের কাছেও কত ব্যথা, কত অপমান, কত আঘাতই না সহ্য করতে হয়েছে। সে সব কথা মনে হলে এখনো লজ্জা পাই। সে তুলনায় দেশের এই সহস্র সহস্র চাষী যুবকদের কাছে যে অভিনন্দন পেয়েছে আমার বাংলার ছেলে মেয়েরা —তাদের অ-বাংলা গান শুনিয়ে আর নয়া বাংলা নাচ দেখিয়ে, আমি পেয়েছি এমনই অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সামান্য বুদ্ধি খরচ করে তাদের সংগে মিলেমিশে তাদেরকে নিজের মত করে ভেবে—আমার জীবনে সে এক স্মরণীয় অধ্যায়।

প্রত্যেক স্টেশনে যখন আমাদের জন্য বিশেষ ট্রেণটি এসে দাঁড়াত—যে unit-এ আমরা শো দেব সেখানকার একজন officer এসে আমাদের নিয়ে যেখানে থাকা হবে তার ব্যবস্থা করতেন। কোথায় শো দিতে হবে তা বলে দিতেন। কোথায় খাবার পাওয়া যায় —কোথা থেকে order পাব H. Q-এর সমস্ত সংবাদ দিয়ে—আমাকে কত যে সাহায্য করতেন তা বলা যায় না। কথায় বলে military, আমাদের এই আমোদ প্রমোদের ব্যাপারেও military method এত কাজের মনে হত—যা ভোলা যাবে না জীবনে। যেটি যখন দরকার ঠিক সেটী পেয়ে যেতাম ঠিক সেই সময়ে। এও আমার জীবনের একটি

কয়েকজন অফিসার সহ
শ্রীযুক্ত ঘোষের কয়েকজন শিল্পী।

তরুণ রবীনের দৃঢ়তাব্যঞ্জক অভিব্যক্তি আশাদীপ্ত 'ভাবীকাল' এর নির্দেশ দেয় না কী?

শিক্ষা। যে সব পাহাড়ী পথে ট্রেণ চলে না, সেখানে আমরা যেতাম কখনো officerদের মোটরে, কখনো বা military lorryতে চেপে। পাহাড়ী পথে আমরা চলেছি—যেন একটা স্কুল কলেজের দল—পাহাড়ে যাচ্ছি গরমে changeএ। সবাই আনন্দে ভরপুর—কেউ গাইছে—কেউ গল্প কচ্ছে—কেউ হাসছে—কেউ নতুন দেশ পথ ঘাট দেখে মুগ্ধ হচ্ছে, কত নতুন সাঁকো, কতো নতুন ধরনের মানুষ তাদের কত রকমারী আদব কায়দা। জীবনে যে কত বড় শিক্ষা হল আমাদের কটী দলের,—তা লিখে শেষ করা যায় না।

আমাদের শো দিতে হত অনেক সময় মাঠের মাঝে, বনের ধারে, নদীর তীরে, পাহাড়ের গায়ে ও মাটির তলে। সকালে আমাদের stage managerকে যেতে হত যেখানে শো হবে, সেখানকার officer-in charge যথাসাধ্য লোক-জন জিনিষপত্র দিয়ে সাহায্য করতেন। কখনো বিজলী বাতি—কখনো মোটর গাড়ী থেকে current নিয়ে কাজ চালান হত। কখনো গ্যাস, কখনো কেরোসিনের হ্যারিক্যান, কখনো বা কাঠের আগুন জ্বালিয়েও আমরা শো করেছি। আবার দিন-করা চাঁদের আলোতেও ব'সেছে আমাদের শো। আমাদের মেয়েদের গান—সহরের হাজার বাতির আলোর অভাবে কখনো ঝিমিয়ে পড়েনি, এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট থিয়েটারী স্টেজের সরঞ্জামের অভাবে আমাদের ছেলে মেয়েদের কষ্ট করে শেখা নাচ কোন দিনই কম লোভনীয় হয়নি দেশী বা বিদেশী সৈনিকদের কাছে।

আমাদের দলের নাচ গানের আসর বসবে এ সংবাদে চঞ্চল হয়ে উঠতো এমনকি—পার্শিয়া, ইরাক, ইরাণের সেনাদল, অফিসার মণ্ডলী। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা Inspectionএ গেলে শুনতে পেতেন হরেন ঘোষের মজলিসি দলের সুনাম সুযশ। এক এক দিনের সভায় জমায়েত হত ৪ থেকে ৫ হাজার লোক, ৫০ থেকে ১০০ অফিসার।

প্রতি item এর পরই করতালি, বাহবা, বহুৎআচ্ছা, এই সব ভাষায় মুখরিত হয়ে উঠতো সারা দেশটা। শো কখন কবে কোথায় হবে আর্টিস্টদের জানান হত না নানা কারণে, কোন স্টেশনে যাব পরের, দিন তাও না বলাই রীতি ছিল।

তবুও মোটামুটি ছেলেমেয়েরা হপ্তায় হপ্তায় তাদের বাড়ী থেকে চিঠি পেত, লিখত নিজের জনকে। দুপুরে সকালে যখন সুবিধা মিউজিকের সংগে রিহার্সেল দিত তারা, নাচের মাষ্টার নাচের মহলা করতো। ছুটী থাকলে বড় সহরের সিনেমায় যেত। দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, পিণ্ডি, খাইবার, সীমান্ত দেশ, এমন কি রুশ সীমান্ত পর্যন্ত আমাদের ছেলেমেয়েরা সব জায়গাই বেড়িয়ে এসেছে। যেখানে যা দেখবার মত—যেখানে যে বিখ্যাত মিউজিয়ম, যেখানে ভাল মন্দির, স্তূপ, তক্ষশীলার সঞ্চয় কত সব কেল্লার ভিতরে মাটির তলের বাসা তারা নিজের চোখে দেখে এসেছে—সাধারণ শিল্পীর পক্ষে এযে কতখানি সৌভাগ্যের কথা, যারা দেশ ভ্রমণের উপকারিতা বোঝেন তাঁরা আনন্দিতই হ'বেন মনে হয়।

আর্টিস্টদের নিয়ে যাবার সময় বহু সাধ্য সাধনা কোরেই আমি তাদের সংগ্রহ করি। অনেকেই বাধা দিয়েছিলেন এই ভেবে—অসুবিধার অন্ত থাকবে না, মান ইজ্জৎ নিয়েও টানাটানি হবে—খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা, চলাফেরার ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটতে পারে। ঈশ্বরের কৃপায় ও নিজের কাজে আস্থা থাকায় কারোরই কোন অসুবিধা হয়নি। বরং অসুখ হলে আশাতীত বড় ডাক্তারের কাছে গিয়ে আর্টিস্টরা দেখাতে পেরেছে—যে সব ঔষধ পথ্য যুদ্ধের দিনে কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজে মোটেই মেলে না, পথের ক্যাম্পে তা অতি সহজেই পাওয়া গেছে। কারো একটী পয়সাও তার জন্য খরচ হয়নি। আবশ্যক হ'লে হাসপাতালে সুব্যবস্থা হয়েছে থাকবার, এবং সেরে উঠলেই মাসের মাইনে পেতে কখনো বিলম্ব হয়নি। সংবাদপত্রে নাম জাহির হয়েছে—ছবি ছাপা হয়েছে, unit এর O. C. হাতে লিখে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন—বাংলার ছেলেমেয়ে তাদের শিল্প শিক্ষায় পুরোদস্তর প্রমাণ দিয়ে জয় জয়কার করে দেশে ফিরে এসেছে। প্রত্যেকেই তারা গৃহস্থ পরিবারকে অর্থ দিয়ে, জিনিষপত্র দিয়ে নিজের অভাবনীয় অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতে পেরেছে এই আমার সবচেয়ে বড় শান্তি।

শ্রীমতী যমুনা
বাসন্তী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায়
"ঘর" হিন্দি চিত্রে একে দেখতে পাবেন।

এই সুদর্শনা নৃত্য শিল্পীর সংগে আপনাদের পরিচয় হবে **ইয়াতীম** চিত্রে——

সিনেমার প্রচারকার্য

শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ

★

(ম্যানেজার, অরোরা ফিল্ম্ কর্পোরেশন)

প্রবীণ চলচ্চিত্র সাংবাদিক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ তাঁর বর্তমান প্রবন্ধে ব্রহ্মদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিজ্ঞাপন-রীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমি রেঙ্গুন সহরের এক ভারতীয় পল্লীতে রাস্তার দিকের তেতলার ঘরে বসে-ছিলাম। সেদিন ছুটীর দিন। প্রায় ১০টা বাজে। হঠাৎ জানালায় সামনে দেখি আমেরিকান চিত্রাভিনেতা হ্যারোল্ড্ লয়েডের প্রকাণ্ড প্রতিমূর্তি আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। তার সেই চশমা, তার সেই হাসি মাখা মুখ, কলার টাই কোট সব যেমন ছবিতে আছে তাই বাঁশের বাখারি আর কাগজ ও রংএর সাহায্যে করা হয়েছে। জানালার পাশে এসে দেখি, সেদিন যে ছবি চলবে তার বড় বড় প্রচার পত্র নিয়ে ছোট একটি মিছিল যাচ্ছে। সংগে বর্মা বাজনারও ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য ছিল না 'পোয়ে' নাচবার মেয়ে। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি প্রাচীর পত্রের ছড়াছড়ি, তাতেও সেই অভিনেতার মুখ। খবরের কাগজে সেই মুখ আর সেই বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক খাবারের দোকান, পানের দোকান কফিখানায় সেই বিজ্ঞাপন। বিকেলে বেরিয়ে দেখি মোটর লরীতে পুতুল নাচের মত ব্যবস্থা সেই অভিনেতাকে নিয়ে। রয়েল লেকের দিকে বেড়াতে যাব। রাস্তা, ছাদে ঘুড়ি ওড়াবার খুব ধুম। অনেকগুলি ঘুড়িতে সেই ছবির বিজ্ঞাপন। আমি বর্মা হরপ্ জানতাম না। তবে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, প্রত্যেক পত্রিকায় সে ছবির বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি।

এই যে একটা মার্কিণী ছবির জন্য প্রচার কার্যে এত খরচ করা হ'ল, সেটা কে দিলে জানার ঔৎসুক্য হ'য়ে-ছিল। মার্কিণী পরিবেশক দেশে যাই করুন না কেন, নিজেদের সিনেমা হাউস না থাকলে বিদেশে বিশেষ কিছুই খরচ করতে চান না, এটা সবাই জানে। এর স্বার্থকতা আমরা জানি না, তবে একথা বলা যায় অনুকরণ প্রিয় ভারতবাসী তাদের নিজেদের ছবির প্রচারকার্যে খরচ কমাবার অজুহাত পায়। যাহোক, হ্যারোল্ড লয়েডের ছবির প্রচারকার্যের খরচ দিয়েছিলেন প্রেক্ষাগৃহের মালিক। সেদিন সুবিধে হয় নি, কিন্তু পরের দিন সে ছবি দেখতে গিয়ে বেশ মনে হ'ল বিজ্ঞাপনের আকর্ষণী শক্তি যথেষ্ট আছে।

অবাক হয়েছিলুম পুলিসের তথা শাসকশ্রেণীর ক্ষমা-শীলতায়। তখন Amusement Tax বা ঐ শ্রেণীর কোন কর ছিল না, তবে কিসের ভরসায় পথ প্রায় বন্ধ করে মিছিল বেরিয়েছিল জানি না। কয়েক দিন পরে সমগ্র ট্রাম ভাড়া করে বড় বড় ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন বার করাও দেখেছি। পুলিস ক্ষমাশীল ছিল, কারণ জন-সাধারণ সিনেমা ভাল বাসত। আমাদের দেশের মত গোঁড়ামী ও আমোদ বর্জনের ভাব সে দেশে নেই।

মাদ্রাজে দেখেছি প্রথমে ট্রাম ভাড়া করে ছবি দিয়ে বড় বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। ভাল ভাল মোড়ের নিকট বড় বড় বোর্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হত। মিছিল কিছু কিছু বার করত কিন্তু একটা কেমন যেন আড়ষ্টভাব ছিল। কয়েকদিন পরেই মাদ্রাজ কর্পোরেশনের অনেক নিশেধা-ত্মক আইন তৈরী হল। তাতে যে শুধু পয়সা তোলার অজুহাতে এ সব করা হয়েছিল তা নয়, ভারতীয় গোঁড়ামীর স্পষ্ট একটা ছাপ বাহির করবার যেন একটা চাপা আগ্রহ সর্বত্রই বর্তমান। পদে পদে যেন মনে করিয়ে দিতে চায় যে তাদের দেশ শঙ্করাচার্য ও রামানুজের। হাজার বছর কেটে গেলেও মনে করিয়ে দিতে চায় যে সেই মহাপুরুষের পূতআত্মা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সব দেখছে। মাদ্রাজের বাহিরে অন্য সহরে এত বিধিব্যবস্থা নেই বটে তবে সহরের নিয়ম মফঃস্বলে ছড়াতে বেশী দেরী হয় না। অবান্তর হলেও একটা ছোট কথা না বলে পারছি না। বিগত মহাপুরুষ ও মহামানবের আদর্শে আইন কড়াকড়ি খুব হয়েছে। সেখানে সারা প্রদেশে নিষিদ্ধ আলয় নেই,

'কলঙ্কিনী' চিত্রে শ্রীমতী রেণুকা ও জহর।

প্রদর্শকরা বহুপ্রকারে শক্তিশালী তথা কথিত গুণ্ডার সহায়তায় ব্যবসা করে। তথাপি প্রাচীর পত্রের ছড়াছড়ি, বাজনা ও মিছিল রীতিমত আছেই। সেখানে কুলি মজুর সস্তা নয় কাজেই খুব বেশী বুকে পিঠে আঁটা বিজ্ঞপন দেখতে পাওয়া যায় না। তাদের কাজ একবার কতক গুলি গাধাকে দিয়ে করা হ'য়েছিল দেখেছি। বলশালী ব্যক্তির সাহায্য সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলতে চাই। ভাল একটি হিন্দুস্থানী ছবি সেখানকার বড় সিনেমা 'জগতে' চলবে। আমায় একজনে খবর দিলে চারিধারে সব বড় বড় খোঁটা পোতা হচ্ছে! ব্যাপার দেখতে বিকেলের দিকে সেদিকে গিয়েছিলাম। মনে হ'ল প্রায় ৬।৭" পরিমিত মোটা ও লম্বা খুঁটি টিকট ঘরের চারদিকে পোতা হ'য়েছে যাতে তার মধ্য দিয়ে ছোট ছেলেও না যেতে পারে! আর তার ওপরে খুঁটির ছাতও তৈরী হল। খুঁটি দিয়ে যাওয়া আসার রাস্তা হল। এখন

রূপের ব্যবসায় আমার্জনীয় অপরাধ, কিন্তু সিনেমার অভিনেত্রীর অভাব হয় না, সন্ধ্যায় এমন কি বড় বড় ফাঁকা রাস্তা দালালদের উৎপাতে মুক্ত নয়। আর তাদের জাতের গোঁড়ামীতে হিন্দু আজ পৃথিবীর চক্ষে হেয় হ'য়েছে।

লাহোরে এত বিজ্ঞাপনের বোধ হয় দরকার হয় না। বোধ হয় শারীরিক শক্তিতে সব কিছু সেখানে হয়।

ব্যবস্থা যে টিকিট কেনার জানালার কাছে অতিরিক্ত ভিড় না হয়। টিকিট ঘরের মধ্যেও ২।১ জন পালওয়ান লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। খুঁটির গেটের কাছে ২।৩ জন ঐ শ্রেণীর লোক আছে। প্রায় ১৫ মিনিট এইভাবে টিকিট বিক্রী হবার পর দূর হতে শোনা গেল ভয়ানক চীৎকার। কোন ক্রেতা একটি খুঁটি

ভেংগে ফেলেছে। সেদিন আমি লাহোর থেকে চলে আসছি, ষ্টেশনে লাহোরের আমার একজন বন্ধু বলেছিলেন "আপনার দেশে শুধু কাগজে লেখে 'Smashing box office' কিন্তু এখানে এটা বাস্তব জিনিষ" আমার তখন সন্দেহ হ'য়েছিল যে এ পালোয়ানের দেশে পালোয়ানী বিজ্ঞাপন নয় ত? যেখানের লোক বলশালী, খায় ডাল রুটী, গোস্ত, লাঠি, শড়কী, তরওয়াল ছোরা ছুরি এই সব অস্ত্রশস্ত্রে সর্বদাই তৈরী থাকে, তারা যোদ্ধা—তা এ রকম একটা কিছু থাকবেই। আর হতভাগ্য বাংলাদেশে ছুরি, বঁটীর বেশী কিছু রাখাই নিষেধ, খাওয়া ডাল ভাত তাও অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য আর স্বাস্থ্যের কথা কিছু নাই বললাম।

নৃত্য-শিল্পী অমিতাকে পাঞ্চজন্য পিকচার্সের আলোক পথ চিত্রে দেখা যাবে।

সাতটি হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের ধ্বংশাবশেষ আর এখনকার ইংরাজ ভারতের রাজধানী দিল্লীর কথা বিশেষ কিছু বলবার নেই। সেখানে মোটামুটি সবই আছে শুধু পুতুলের ব্যবস্থা নেই। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের সুবিধা থাকায় তার পুরোপুরি উপকার তারা গ্রহণ ক'রতে পারে ও করে। পত্রিকার যথাযোগ্য মর্যাদা সেখানে অনেকটা আছে।

এ বিষয় বোম্বাই ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহের বিজ্ঞাপনচ্ছটায় প্রায় আদর্শস্থানীয়। সেখানকার করপোরেশন, সেখানকার পুলিস এ বিষয়ে উৎসাহী। গলা টিপে মারবার পক্ষপাতী নয়। কাগজে বিজ্ঞাপন, মিছিল, গাড়ীতে মাটির দৃশ্য সমেত পুতুল প্রভৃতির কোন দিকে অভাব তারা রাখতে চায় না। সমারোহে ভারতের অন্য কোন সহরের নিকট তারা নীচু হতে চায় না। যদিও বর্মার ন্যায় কাগজের বড় পুতুল এখানে হয় না।

সর্বশেষে আমাদের বাংলার কথা কিছু ব'লব। এখানে কিছু ইতর বিশেষ করা শক্ত। পত্রিকার মালিকরা বিজ্ঞা-

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'আমীরী' চিত্রে বড়ুয়া, যমুনা, রাজলক্ষ্মী ও মাষ্টার কেশবকে দেখা যাচ্ছে।

পনের হার পৃষ্ঠা বাড়াবার অনুপাতে কমাতে রাজী নন, যদিও সিনেমা প্রদর্শক ও পরিবেশকগণ দ্বিগুণ থেকে ৪ গুণ বাড়িয়ে ছিলেন—যখন শাসকের নির্দেশে পৃষ্ঠার পরিমাণ কমান হ'য়েছিল। কাজেই খবরের কাগজে যখন অনেক দিতে হয়, তখন অন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা সময় সাপেক্ষ। ইচ্ছামত কাপড় ও কাগজ পাওয়া যায় না কাজেই বড় প্রাচীর পত্র বা হাতে বিলি বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব না। শাসক নিয়ন্ত্রাধীনে আপাততঃ কিছু করা সম্ভব না হলেও ভবিষ্যতে কিছু উন্নতি হবে বলে মনে হয় না। যুদ্ধের পূর্বে খরচের পরিমাণ বোম্বাইএর মানদণ্ডে তেমন কিছু ছিল না। পুতুল দিয়ে বিজ্ঞাপন কিছু হয়েছিল কিন্তু পুলিশের শাসনে সে সব কমিয়ে দিতে হয়। কর-পোরেশন ও পুলিশ উভয়েই বোম্বাইএর তুলনায় এ সকল বিষয়ে—বিশেষতঃ সিনেমা বিষয়ে সহানুভূতিহীন। ট্রামে বিজ্ঞাপন পূর্বের মত সম্ভব না কারণ যাত্রীর জন্য আবশ্যক ট্রাম গাড়ী যখন পাওয়া যায় না তখন বিজ্ঞাপনে রাস্তা বন্ধ করা সম্ভবপর নয়। কয়েকটী দৈনিক পত্র ছবি ছাপেন না আরও কয়েকটি বিজ্ঞাপনের স্থান এতটা কমিয়েছেন যে বিশেষ কিছু লেখা সম্ভবপর নয়। দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের যে সকল পথ আছে তাহা স্থানাভাবে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যুদ্ধোত্তর সময়ে কি হয় এখন বলা কঠিন।

কথাকলি

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাস

★

সুধীসমাজে শ্রীযুক্ত দাস সুপরিচিত। ভারত এবং ভারতের বাইরে বহু পত্র-পত্রিকায় এঁর রচনাও নিজের অংকিত চিত্র বহু খ্যাতি অর্জন করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করেও এঁর কলানুরাগ স্তিমিতহয়ে যায়নি। সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য-গুরু ৺নাম্বুদ্রি শঙ্করমের শিষ্যত্ব লাভ করবারও এঁর সৌভাগ্য হ'য়েছিল।

★

কথাকলি নৃত্যে রাবণ

কথাকলি দাক্ষিণাত্যের একটী অতি প্রাচীন নৃত্যকলা। ।টী "কুদীয়ুত্যাম্" অর্থাৎ এ হলো সেই শ্রেণীর নৃত্য যা কবল দেব-মন্দির, রাজপ্রসাদ এবং ব্রাহ্মণ বাড়ীতে অভিনীত য়। কথাকলির আংগিক উৎকর্ষ একদিন সমগ্র ভারতকে গ্ধ করে দিয়ে ছিল। কলাটী অত্যন্ত জটিল, কিন্তু একদিন াদ্রঅঞ্চলের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব অংগাংগিভাবে ়ড়িয়ে গিয়েছিল। কথাকলির মুদ্রা, ভাব-ভংগী দৈনন্দিন ীবনের কার্য কলাপের ভেতর বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আজ সে-দিন অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। অল্প কিছু দিন হলো দাক্ষিণাত্যের জন কয়েক ৎসাহী নৃত্যবিদের আগ্রহে কলাটী আবার পুনর্জাগরিত য়ে উঠেছে, কিন্তু এর সে প্রাচীন উৎকর্ষ বোধ হয় আর কান দিনও ফিরে আসবে না। এর ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবাদ মাছে,—প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্বে আম্মু বলে এক পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জস্থ বালিদ্বীপের রাজা ভারতের পশ্চিমঘাট আক্রমণ করে এবং ত্রিবাঙ্কুরের এক কারাগার হতে কতকগুলি বন্দীকে বালীতে নিয়ে যায়। এই বন্দীরা বিশেষ এক রকম ভংগিময় নৃত্য জানত। বালিদ্বীপের লোকদের এরা এদের ভংগিময় নৃত্য শেখায়। এই নৃত্য ক্রমে বালি, জবদ্বীপ ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অপর দ্বীপে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ওদেশে এই ভংগিময় লোক-নৃত্যের নাম হয় "রামনাথম্। ই-এন্-মাসুদি নামক জনৈক আরব পরিব্রাজক বলেন, এই নৃত্যই কিছুকাল পরে পরিবর্তিতাকারে আবার ভারতে ফিরে এসে "কথাকলি" 'নাম ধারণ করে' চলতে থাকে। পরে কয়েকজন বিশিষ্ট কবি ও গীতকার এই নৃত্যের জন্যে মৌলিক সংগীত ও নাট্য-রচনা করে এর বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করে। (আগে কিন্তু সাধারণ লোক-সংগীত হতে এর উপকরণ সংগৃহীত হত)। এরপর ক্রমে একটী বিস্তৃত নাট্য-নৃত্যকলায় পরিণত হয়। এই কলা নিয়ে বিরাট বিরাট শাস্ত্র রচিত হয়। অতএব নামের পরিবর্তন হলেও দেখা যাচ্ছে, কথাকলি ভারতেরই একটী নিজস্ব কলা। এর আদি উন্মেষ নিয়ে বহু মতভেদ আছে।

বিখ্যাত কথাকলি নৃত্য বিশারদ ৺নাম্বুদ্রি শঙ্করম্

এটাকে দৈব উদ্ভূত কলা বলেই বিশ্বাস করতেন। কথাকলি নৃত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে তিনি এই উপাখ্যানটী বলতেন,—

শূদ্রমাতার গর্ভ ও ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসজাত এক শিল্পী কুমারিকা অন্তরীপে গিয়ে কন্যা-কুমারীর তপস্যায় মগ্ন হন। তপস্যার সপ্তম রাত্রিতে দেবী তার স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়ে পরদিন প্রত্যুষে সমুদ্রতীরে তাকে যেতে আদেশ দেন। শিল্পী যথা সময়ে সমুদ্র তীরে যেয়ে কাপ্‌লেংগাট্‌ সমুদ্র জলের মধ্যে কতকগুলি পাত্রপাত্রীর প্রতিবিম্বে বিচিত্র অংগরাগ ও অংগসজ্জা দেখতে পেলেন। এই প্রতিবিম্বের বিচিত্র বেশভূষার অনুকরণে বেশভূষা পরিকল্পনা করে তিনি এক নৃত্য-নাট্য সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। এই সম্প্রদায়ের নৃত্যকলাই "কথাকলি" নামে বিদিত, আর এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং কন্যাকুমারী, তাই আজও নৃত্যের প্রারম্ভে দেবী কন্যাকুমারীর আবাহন বা "তোটয়ম্‌" করার রীতি প্রচলিত আছে।

কথাকলি নৃত্যে সুগ্রীব

কথাকলি নৃত্যে পুরুষ অভিনেতারাই নারী ও পুরুষ উভয় ভূমিকাতেই অভিনয় করে থাকে। অবশ্য আজকাল এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। দিনের বেলা এ নৃত্যাভিনয় হয় না। সন্ধ্যায় অভিনয় আরম্ভ হয় এবং কয়েক ঘণ্টা পরে প্রকৃত কথাকলি নৃত্যের সূচনা হয়। উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম মুখে নৃত্যাভিনয় হয় কিন্তু দক্ষিণ মুখ হয়ে অভিনয় করার রীতি শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ। কোন একটি প্রশস্ত অতি সাধারণ প্রাংগণে কিম্বা গৃহে গোধূলী লগ্নে "কলি" অর্থাৎ ঐক্যতান বাদন সুরু হয়। ঘণ্টাতিনেক এমনি কলি চলার পর মঞ্চমধ্যস্থ একটী দীপাধারের ওপর বিরাট একটী প্রদীপ জ্বালান হয়। প্রদীপের মশালের মত বড় বড় সলতের আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দীপ জ্বালানোর পর "শুদ্ধ মদ্দলম্‌" বা করতালি বাদ্য সুরু হয়। এবং এইখান থেকেই প্রকৃত নৃত্যের সূচনা হয়। মঞ্চের তরংগঅঙ্কিত পটভূমিকার নিম্ন হতে অভিনেতারা বিচিত্র সাজসজ্জায় "তিরিশিলা" বা ঢেউ-আঁকা পেছনের পরদার তলা থেকে বাদ্যের তালে তালে একে একে মঞ্চে এসে উদিত হয়। এই সময় মনে হয় যেন ঢেউ ভেদ করে এক একটী নর্তকের উদয় হচ্ছে। কথাকলির পূর্ববর্ণিত আদি উপাখ্যানের সংগে এই তরংগ অঙ্কিত নাট্য ভূমিকার সামঞ্জস্য আছে।

নটদের উদয় হওয়ার পর সুরু হয় "তোটয়ম্‌" বা দেবীর আবাহন। দেবী কুমারিকা ছাড়াও গণেশ, সরস্বতী প্রভৃতির আবাহন হয়ে থাকে। এরপর সুরু হয় "নীলপদম্‌" বা "রামস্তুতি" – এতে নর্তকের হাত, পা ও চোখ সমতালে নৃত্য করে। রাগতাল সমন্বয়ে "মঞ্জুতরা" আরম্ভ হয়; কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" হতে "মঞ্জুতর—কুঞ্জতল—কেলিসদন" গীত হয়। এই সমস্ত সূচনামূলক প্রাথমিক অনুষ্ঠানের নাম "মেলপদম্‌"

কথাকলি নৃত্যে প্রধানতঃ চার রকম বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়ঃ—নাট্য শাস্ত্রবিদ ভরতের মতে,—(১) তন্ত্রীবদ, (২) অবনদ্ধ বা ঢাক্‌ (৩) সুষির বা বাঁশী এবং (৪) ঘন বা কাঁশার পেটা মৃদংগ, করতাল প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

কথাকলি নৃত্যে হনুমান

কথাকলি নৃত্যের মুদ্রা ও রূপসজ্জা বড় অদ্ভুত। সত্ব, রজো ও তমোগুণ অনুসারে নর্তকের সাজসজ্জা ও বেশভূষা স্থির করা হয়। মুদ্রা ও বেশভূষায় অতি নিখুঁতভাবে নৃত্যের বিষয়বস্তু সূচিত করা হয়ে থাকে।

নাচের "কসটিউম্"গুলি অতি বিচিত্র। নট 'পাদ্রী সাহেব'দের আলখাল্লার মত খুব ঝুলওলা একটা করে আলখাল্লা পরে। মালোয়ালী ভাষায় এর নাম "কুঞ্চুক"। আল্খাল্লার গলা ও কোমরের কাছে বাঁধা থাকে। মনে হয় যেন কোমর থেকে অভিনেতা মেয়েদের মত অনেক ভাঁজ (fold) আলা একটা ঘাঘ্রা পরেছে। নৃত্যের সময় ঘাঘ্রার এই প্রচুর ভাঁজের আন্দোলনের ঢেউয়ে এক কমনীয় ছন্দের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও নর্তকের গলদেশ হতে উত্তরীয় ঝোলে। হনুমান, সুগ্রীব প্রভৃতির ভূমিকায় লোম সন্নিবিষ্ট জামা পরার রীতি আছে। এ ছাড়া ধাতু ও দারুময় নানা রকম অলঙ্কার, শিরোভূষণ,—কিরীট, তাড়ংক, কবচ, কুণ্ডল, বলয়, কেয়ুর, নূপুর, পাণি, ত্রাণ, নখর, শ্রোণীবাস, বক্ষোবাস, মেখলা, প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করার সময় কৃত্রিম স্তনযুগ ব্যবহার করার রিতীও প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে নট নারীর কাপড়ই পরে থাকে। বেশভূষা ও সাজসজ্জায় অপর কোন নৃত্যে এত বৈচিত্র দেখা যায় না। কৃত্রিম শ্মশ্রু, গুম্ফ, পরচুলা ব্যবহারেরও রীতি প্রচলিত আছে।

কথাকলি নৃত্যের মুখমণ্ডলের সাজসজ্জা নিয়েই বিরাট এক শাস্ত্র হয়ে গেছে। অতি নিপুণ কথাকলি শিল্পী ব্যতীত এ রূপসজ্জা দেওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক অভিনয়ের চেয়ে কথাকলি নৃত্যের রূপসজ্জায় অনেক সময় ব্যয় হয় এবং বহু পরিশ্রম করতে হয়। এক এক ভূমিকায় মুখমণ্ডলের সাজসজ্জা এক এক রকম। এই রূপসজ্জায় নানা রকম অংগরাগ, লেপনী, বর্ণরেণু, এবং বহুবিধ অন্ত উপকরণের প্রয়োগ দেখা যায়। এই রূপসজ্জা কোথাও শান্ত, কোথাও বীভৎস, কোথাও ভয়ানক আবার কোথাও হাস্যরসের সূচনা করে থাকে।

কথাকলিতে এত রকমের সাজসজ্জা আছে যে তার technique নিয়ে বিরাট বিরাট শাস্ত্র রচিত হয়ে গেছে। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়; তাই এখানে অতি সংক্ষিপ্ত একটী বিবরণ দিচ্ছি। নৃত্যের কিছু পূর্বে নর্তক এক রকম ফলের বীজের রস চোখের শ্বেতাংশের ওপর লেপন করে দেয়; সংগে সংগে ঐ অংশ রক্তজবার মত লাল টকটকে হয়ে ফুলে ওঠে। নারী ভূমিকায় এমন রক্ত চক্ষু হতেই হবে, যেহেতু এটি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে (?) তারপর সুরু হয় plastic artistয়ের কারুকলার প্রয়োগ। নর্তক যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তার চরিত্র অনুসারে কৃত্রিম উপায়ে মুখের আকার দেওয়া হয়। এতে কলাশিল্পী চালের হরিৎ বর্ণে রঞ্জিত পিটুলির মণ্ড চিবুক, নাসিকা, গণ্ড প্রভৃতির ওপর নানা আকারে লাগিয়ে দেওয়া হয়। নাসিকা ও ভ্রুর সংযোগ স্থলে পিটুলীর দুটী ছোট মটরের মত গোলাকার বিন্দু বসিয়ে দেওয়া হয়। ওষ্ঠ খুব পুরু দেখানোর জন্যে ওষ্ঠের ওপর চাল পিটুলীর একটী পুরু বেড় দেওয়া হয়। উদ্ধত বা উগ্র চরিত্রে গোঁফের অনুকরণে নাকের দু' পাশে পুরু পিটুলি দিয়ে কৃত্রিম গোঁফ করে দেওয়া হয়। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, দৈত্য প্রভৃতি দুষ্ট চরিত্রের রূপসজ্জাএমনি পিটুলী বসান বিরাট থ্যাবড়া নাকটী উজ্জ্বল লাল রঙে রঞ্জিত করে' দেওয়া হয়। দেবতুল্য উদার চরিত্রের চোয়াল ও চিবুকে চওড়া করে চুন ও চালপিটুলীর একটী বেড় দেওয়া হয়। সমগ্র মুখে পীত বর্ণ ও ললাটে চুনের তিলক পরান হয়।

কথাকলি নৃত্যে বৈশ্রবণ

ঋষিদের নারী সুলভ সজ্জায় বিভূষিত করা হয় (?) অক্ষিগোলক রক্তবর্ণ, চোখের পক্ষে ও ভ্রু-যুগলে গাঢ়

কাজল, ওষ্ঠাধরে লাক্ষা, মুখমণ্ডলে রেণু (পীত কিম্বা রক্ত বর্ণে) লেপন করা হয়; তার ওপর চন্দনের বিন্দু পরিয়ে দেওয়া হয় এবং ললাটে পরিয়ে দেওয়া হয় তিলক।

বালি, দুঃশাসন প্রভৃতি চরিত্রে মুখমণ্ডলের আকৃতি ভীষণ করার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। কৃত্রিম শ্মশ্রু ও গুম্ফ ব্যবহার করা হয়। নাক ও চিবুকের মধ্যবর্তী স্থান কাপড়ের ফিতে বা কাগজের ফিতে জুড়ে মুখের ভয়ঙ্করতা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। চরিত্র বিশেষে শ্মশ্রু-গুম্ফের রং লাল, কাল ও সাদা হয়ে থাকে। হনুমানের চরিত্রে শ্বেত-কলাপ বিশিষ্ট কঞ্চুক বা "Costume" ব্যবহার করা হয়। নাসিকার নিম্নাংশে, অধরোষ্ঠ, ও চিবুক বাদ দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল কাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। মুখে কাপড় ও অপর বস্তুর ফিতে লাগিয়ে বিরাট একটী অর্ধ চক্রকার শ্মশ্রু রচনা করা হয়। ভ্রু ও নাসিকার সংযোগ স্থলে পিটুলীর দুটী মটরের মত বিন্দু সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। অধরোষ্ঠে অলক্তক রঞ্জিত করা হয় ও কপাল ও ললাটে চন্দনের রেখা এঁকে দেওয়া হয়। রাক্ষস চরিত্রের মুখ-মণ্ডলের সজ্জা অতি ভয়ানক। এ ছাড়া নানা রকম হাস্যোদ্দীপক সাজসজ্জাও আছে। পশুপক্ষীর চরিত্রেরও সাজসজ্জার নির্দিষ্ট শিল্প-রীতি আছে। এ ছাড়া দেবতা বা দেবতুল্য চরিত্রের মাথার পেছনে কারু কার্য করা এক-খানি করে থালার চক্রাকার বস্তু থাকে। এটী 'orb'য়ের অনুকৃতি। এর আকার দেখে চরিত্রের গুরুত্ব বোঝা যায়। ইন্দ্রের বেলা এই চক্র যত বড়, কার্তিকের বা গণপতির বেলা এ চক্র তার চেয়ে অনেক ছোট হবে। দেবতাদের বড় ভাইয়ের চেয়ে ছোট ভাইয়ের চক্র ছোট হবে,—যেহেতু দাদার চেয়ে ভাইয়ের পদ মর্যাদা কম।

কথাকলি নৃত্য প্রধাণতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়—যথা শাস্ত্রীয় (classical) ও লৌকিক বা (folk-dance)। এর প্রত্যেকটী আবার একক (solo dance) কিম্বা মিলিত (dance-drama) হতে পারে। রূপকের প্রভাব এ নৃত্যে অত্যন্ত বেশী। নৃত্যাভিনেতা অংগভংগি, চোখ, মুখ, হাত, হাতের আংগুল ও দেহের অন্যান্য অংশের মুদ্রা ও বিচিত্র পাদক্ষেপ বা 'কলাসম' যোগে একেবারে মূক অভিনয়

বঞ্চিতা চিত্রে শ্রীমতী রেণুকা

(Pantomime) নৃত্য করে যায়, আর নৃত্যশিল্পীর সংগীরা বাদ্য যোগে গীত ও গদ্যে অভিনয়ের আখ্যান ভাগ বর্ণনা করে যায়। তাদের গীত বা আবৃত্তি থামলে—নৃত্যাভিনেতা আবার নির্দিষ্ট মুদ্রাযোগে অখ্যাত অংশের অভিনয় প্রদর্শন করে; অভিনয় থামে, আবার আবৃত্তি ও গীত সুরু হয়; এই ভাবে কথাকলিতে নাট্যগুলি অভিনীত হয়। এই ভাবে বৎসরাজ, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি বড় বড় কাব্য-নাট্যকারের রচনা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও মালায়ালী ভাষায় অভিনীত হয়েছে। ইংরিজী ভাষায় এই শ্রেণীর নৃত্যকে 'Story-dance' বা 'Pantomime' বলে। কথাকলির শাস্ত্রীয় নৃত্য ছাড়া লোক নৃত্যেও এখনও ভাষার বিশুদ্ধি বজায় আছে। অভিনয় অন্তে নৃত্যাভিনেতা 'তিরশিলা'র তরংগে প্রবিষ্ট হয়ে' অন্তর্ধান করে। গুরু নাম্বুদ্রি শঙ্করম্ বর্তমান কালের একজন অদ্বিতীয় কথাকলি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় ভারত একজন বিশিষ্ট শিল্পী হারিয়েছে। তাঁর পুত্রকে অবশ্য তিনি তাঁর নৃত্যকলা শিক্ষা দিয়েছিলেন। হয়ত কালক্রমে সে তার পিতার নাম রক্ষা করতে পারে। দক্ষিণ ভারতের অপরূপ সুন্দরী নর্তকী বালাস্বরস্বতীও কথাকলি নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিনী।

মনিপুরী নৃত্য

নৃত্যশিল্পী প্রহ্লাদ দাস

●

শ্রীযুক্ত দাস মনিপুরী নৃত্যের ঐতিহাসিক দিকটারএকটু আভাস দিয়েয়েছেন। ভবিষ্যতে বিভিন্ন নৃত্য-পদ্ধতি নিয়ে রূপ-মঞ্চে লিখতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

●

মহাভারতে উল্লেখ আছে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন দেশ ভ্রমণ কালে নাগ কন্যা উলুপী ও মণিপুর কন্যা চিত্রাংগদাকে বিবাহ করেন, এই চিত্রাংগদার গর্ভে বীর বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। বভ্রুবাহনের ইসুকহোবাচেন্রূ নামক পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন তার নাম পান্থবা। ইনিই মনিপুরের মাইতাইদের আদি পুরুষ। অর্জ্জুনের বংশধর এই জন্য এরা ক্ষত্রিয় এবং চন্দ্রবংশীয় বলে নিজেদের প্রচার ক'রে। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তানহীরা নামক এক নাগা সর্দার মনীপুর সিংহাসন অধিকার করেন এবং রাজ পরিবার আমাত্যবর্গ সহ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন। তানহীরা পুত্র অজিত সিংহ তৎপুত্র গৌরসিংহ রাজ্যরক্ষার ভার জয়সিংহের হাতে অর্পণ করেন, কারণ ব্রহ্ম ও চীন দেশের সংগে মনিপুরের যুদ্ধ প্রায়ই লেগে থাকৃত। মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের মৃত্যুর পর, রাজ সিংহাসন নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়, বৃটিশ শক্তি মধ্যস্থতা করতে আসে এবং এক পক্ষ মেনে নেয় অন্য পক্ষ বিদ্রোহ করে—ফলে যুদ্ধ হয়। ইহাতে দুর্লভচন্দ্র ও সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ যুদ্ধে পরাজিত হয়। এবং বালক চুড়াচাঁদকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যাক্ এইবার মনীপুর দেশ সম্বন্ধে জানা দরকার, মনীপুর আসামের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি পার্বত্য রাজ্য, রাজধানী ইম্ফল। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের মনিরোড্ নামক ষ্টেশনে নেমে বাস্ যোগে মনিপুর যেতে হয়, এই দীর্ঘ রাস্তা নানা পর্বত কোহিমার ভিতর দিয়ে ইম্ফলে পৌছেচে, ইম্ফল মণিপুরের প্রধান শহর। মনিপুরবাসীর অধিকাংশই বৈষ্ণব এবং নিরামিসাসী, এদের ভাষা অন্য রকম হলেও অক্ষর বাংলার মত। মনিপুরীরা অন্যান্য পাহাড়ী জাতিদের চেয়ে অনেক সভ্য ও শিক্ষিত। এরা অতি সরল, বিনয়ী ও নম্র। এরা কৃষ্ণ উপাসক, তাই এদের নৃত্য কলাও ভক্তি-রস মূলক। মনিপুরে রাস দোল্, বসন্তরাস, রথযাত্রায় নৃত্য উৎসব হয়ে থাকে, এর মধ্যে মহারাস ও বসন্ত উৎসবই খুব জাকৃজমক সহকারে হয়ে থাকে। মনিপুরে রাস-পূর্ণিমাতে যারা নাচবে তাদের উপবাস থাকতে হয় আগের দিন হতে। পূর্ণিমার রাতে লতা পুষ্প দিয়ে সাজান হয় রাসমঞ্চ। সন্ধ্যা বেলা পুরোহিত রাসমঞ্চে নিয়ে আসেন বিগ্রহ, প্রথমে পূজা সমাপ্ত হয়—তারপর খোল বাজিয়ে বিগ্রহের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে ছেলের দল। তখন একজন মেয়ে এসে প্রথমে প্রদীপ ও ধুপদানি নিয়ে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে বিগ্রহের পদতলে প্রণত হয়। তখন দলে দলে মেয়েরা অতি সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে মঞ্চে প্রবেশ করে। এরা এক সংগে পঞ্চাশ ষাট জন মেয়ে (৭ বৎসর বয়স হতে আরম্ভ করে ৪০।৫০ বৎসের মেয়েরাও থাকে) এক সংগে নাচ্‌তে আরম্ভ করে—নিজেকে সখী কল্পনা করে নাচের ভিতর দিয়ে বিলিয়ে দিতে চায় তারা আপনাকে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পায়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে এদের নাচ—উপবাস ক্লিষ্ট মুখে তাদের আসে না একটুও ক্লান্তির ছায়া, নয়নে তাদের ভক্তির অশ্রু, নাচের ভিতর দিয়ে করে তারা আত্ম নিবেদন। সেই মনিপুরী নাচ আমাদের দেশেও দেখতে পাই, সেই রকম পোষাক পরিচ্ছদ প্রায় সবই অনুরূপ কিন্তু তবুও তাদের মত হয় না, তার কারণ আমাদের দেশে যারা নাচে—তারা নাচে অর্থের অথবা যশের আশায়—মানুষের মনস্তুষ্টি করবার জন্য। আর মনিপুরীরা নাচে ভগবানের মনস্তুষ্টির ও তাঁর কৃপাকণা লাভের জন্য—সুতরাং তফাৎ সেখানেই, মনিপুরে রাসনৃত্য সত্যি দেখবার মত, যারা না দেখেছেন তারা কল্পনা করতে পারবেন না—সে কী অপরূপ ভাব-ধারা ভক্তিরসের উৎস! রাস নৃত্য অগ্রাহায়ণ মাসে, বসন্তকালে বসন্ত রাস, রথ যাত্রায় খুবাক্ ইশে, দুর্গাপূজায় লায়হারবা। এ ছাড়াও বহু রকমের নৃত্য আছে। মনিপুরী নাচের আনু-সংগীত যন্ত্রের মধ্যে খোল ও মন্দিরা প্রধান, মনিপুরী নাচের বিশেষ কোন মুদ্রার প্রচলন নেই তবে ফুল শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী ইত্যাদি মুদ্রা দিয়ে দেখান হয়। মনিপুরী নাচকে দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে যেমন চালী ও ভংগী।

কবি চন্দ্রাবতী

অধ্যাপক—নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ

★

মৈমনসিংহ গীতি কাব্যেকবি চন্দ্রাবতী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় কবির কাহিনী নিয়ে শ্রীযুক্ত নরেশ চক্রবর্ত্তী এই নাটিকাটী রচনা করেছেন।

★

(১)

[ভোর হইয়াছে চারিদিকে প্রভাত পাখীর কূজন]

ছড়াদার—শুদ শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন,

বংশীবদন নামে ছিল এক যে ব্রাহ্মণ ॥

চন্দ্রাবতী কন্যা তার রূপে গুণে দড়।

খেলার সাথী জয়ানন্দ দেখিতে সুন্দর ॥

আবে করে ঝিলিমিলি সোণার বরণ ঢাকা।

প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা ॥

হাতেতে ফুলের সাজি কন্যা চন্দ্রাবতী।

পুষ্প তুলিতে যায় পোহাইয়া রাতি ॥

পুষ্প তোলে চন্দ্রাবতী হরষ অন্তরে।

কাহার পন্থ চাইয়া কন্যা কোন কাম করে ॥

চন্দ্রাবতী—বাবার শিবপূজার ফুল আগে তুইল্যা রাখি। বাবার শিবের মাথায় রক্তজবা, আর আমার শিবের গলায় মালতীর মালা। জয়ানন্দ অত সুন্দর হইল কেমন কইরা! জয়ানন্দ, কি সুন্দর নাম।

জয়া-(গান) আমার বাড়ী তোমারবাড়ী ঐনা নদীর ধার।

কি কারণে গাঁথরে চন্দ্রা মালতীর হার?

চন্দ্রা-(গান) আমার বাড়ী তোমার বাড়ী ঐনা নদীর ধার।

তোমারি জন্য গাঁথিরে মালা গলায় দিমু যার।

জয়া-(গান) ফুল তোল ডাল ভাঙরে কন্যা আমার কথা ধর।

পরেতে তুলিবা ফুল চম্পা নাগেশ্বর ॥

চন্দ্রা-(গান) ডাল না নোয়াইয়া ধর জয়ানন্দ সাথী।

তুলিবে মালতী ফুল তোমার চন্দ্রাবতী ॥

চন্দ্রা—বারে? তুমি বড় দুষ্টু হইছ—আচ্ছা—ডালখান নোয়াইয়া ধর না কেন? তোমার যে রোজ রোজ আইয়া আমারে বিরক্ত করা।

জয়া—বেশ, কওত চইল্যা যাইতেছি।

চন্দ্রা—বা-রে, আমি বুঝি চইল্যা যাইতে কই? যাওত দেখি কেমন যাইতে পার?

জয়া—হুঁ, ধইরা রাখছ ক্যান?

চন্দ্রা—হুঁ, ধইরা রাখছি ক্যান? বাবার শিবপূজার ফুল, আরও তুলতে হইবনা বুঝি? দেরী হইয়া গেলে বাবা যদি রাগ করে?

জয়া—আচ্ছা আমি তোমার ফুল তুইল্যা দিতাছি।

চন্দ্রা—তোমার ঐ নাগকেশরটা আমার খোঁপায় গুইজ্যা দাও না।

জয়া—চন্দ্রা!

চন্দ্রা—কি কইতাছ?

জয়া—আমার নাগকেশর—

চন্দ্রা—আর আমার মালতীর মালা। (উভয়ের হাসি) কিন্তু বেলা হইয়া গেলে বাসায় খুব রাগ করব।

জয়া—বেশ তো ফুল তুইল্যা ফেল।

চন্দ্রা—আমি পারুম না।

জয়া—আইস দুইজনে এক সংগেই তুলি।

ছড়াদার—জয়ানন্দ তুলে ফুল ঐনা সাজি ভরি।

বাইছা বাইছা ফুল তুলে রক্তজবা সারি ॥

এক, দুই, তিন কইর‍্যা ক্রমে দিন যায়।

সকাল সন্ধ্যা তোলে কেউনা দেখতে পায় ॥

দক্ষিণের হাওয়া বয় কুকিলে করে রা।

আমের বউলে বইয়্যা গুঞ্জে ভ্রমরা ॥

চন্দ্রাবতী তুলে ফুল মালা গাঁথি তায়।

সেইতনা মালা দিয়া নাগরে সাজায় ॥

(২)

ছড়াদার—বংশীবদন পূজা করে শংকরে ভাবিয়া।

চিন্তা করে মনে মনে নিজ কন্যার বিয়া ॥

এত বড় হইল কন্যা নাহি মিলে বর।
কন্যারে মংগল কর অনাদি শংকর॥
শুনিল শংকর যেন বংশীর প্রার্থনা।
পরদিননা ঘটক আইস্যা করে আনা গোনা॥

ঘটক—প্রণাম হই ভট্টাজ্জি মশাই, আমি সুমন্ত্র ঘটক। আরে শুনছি আপনার কন্যা বিবাহ-যোগ্যা হইছে। তা বিবাহের কি আয়োজন করতাছেন।

বংশী—আয়োজন আর কি করুম সুমন্ত্র? তেমন পাত্র তো খুইজ্যা পাই না।

ঘটক—হারে আমার পোরা কপাল—আপনে যে কি কন ভট্টাজ্জি মশাই—পাত্র খুইজ্যা পান না। তা আমরা রইছি ক্যান?

বংশী—ভাল পাত্র আছে নাকি তোমার খোঁজে?

ঘটক—পাত্র নাই অতি উৎকৃষ্ট পাত্র আছে। যেমন রূপ তেমন গুণ। নিকষ কুলীন। উপাধি চক্রবর্ত্তী।

বংশী—পাত্রের নাম কি? বাড়ী কই—কি গোত্র।

ঘটক—আরে পাশের এই সুন্ধাগ্রামেই—তাগো বারী, চক্রবর্ত্তী বারীর পোলা, বিষ্টু ঠাকুরের সন্তান, কাশ্যপ গোত্র, নাম জয়ানন্দ।

চন্দ্রাবতী—(প্রবেশ) বাবা মায় তোমারে খাইতে ডাকছে।

ঘটক—এই বুঝি আপনের কন্যা? বাঃ বেশ মানাইব। যেমন জয়ানন্দর রূপ তেমনি চেহারা আপনের কন্যার। কন্যার কি নাম রাখছেন ভট্টাজ্জি মশাই।

বংশী—চন্দ্রাবতী।

ঘটক—বাঃ, খাসা নাম চমৎকার নাম—জয়ানন্দ আর চন্দ্রাবতী যেন হর পার্ব্বতী।

চন্দ্রা—আমি যাই বাবা

ঘটক—মায়ের আমার সর্ব-সুলক্ষণ দেখতাছি ঠাকুর মশাই। কুষ্টি বিচার নি কইর‍্যা বিয়া স্থির কইর‍্যা ফেলাম।

বংশী—আচ্ছা সুমন্ত্র পাত্র যদি ভাল হয় আমার অমত নাই।

ঘটক—কি যে কন ঠাকুর মশাই পাত্র খুব উপযুক্ত। এই দেখেন আমি তার কুষ্টি লইয়াই আইছি। বিচার কইর‍্যা দেখেন আমিত কই রাজযোটক হইব।

ছড়াদার—সম্বন্ধ হইল স্থির কুষ্টি বিচারিয়া।
ভাল দিনে জয়ানন্দ চন্দ্রার হইব বিয়া॥
নয়া পাতা যত গাছে নয়া লতা ঘিরে।
পুলক অন্তরে কন্যা কোন কাম করে॥
জয়ানন্দ স্বামীরে তার প্রাণের দেবতা।
ফুলের বনে আপন মনে বলে মনের কথা॥

চন্দ্রা (গান) বাড়ীর আগে ফুইট্যা রইছে চম্পা নাগেশ্বর।
পুষ্প তুলিতে আইলাম আমি একেশ্বর॥
তোমারে দেখিব আমি নয়ন ভরিয়া।
তোমারে লইব আমি হৃদয়ে তুলিয়া॥
আজি হইতে হইলে তুমি হৃদয় দস্যর॥

চন্দ্রা—কতদিন হইয়া গেল জয়ানন্দ আর ফুল বাগানে আসে না। কি হইছে তার। এই ফুলের সাক্ষী কইরা যাই, জয়ানন্দর মত পতিই যেন জন্মে জন্মে পাই।

জয়া—চন্দ্রা—চন্দ্রাবতী

চন্দ্রা—কে, তুমি, কখন আইল্যা? কই আছিলা এতদিন আমারে ভুইল্যা গ্যালে নাকি?

জয়া— না না ভুইল্যা যামু ক্যান্?

চন্দ্রা—তোমার অমন চেহারা হইছে ক্যান? চোখে মুখে কালি ঢাইলা দিছে, কি হইছে তোমার।

জয়া—না না কিছু হয় নাই।

চন্দ্রা—কিছু হয় নাই, এদিকে সব শুনছ?

জয়া—শুনছি, কিন্তু আমি এখন যাইত্যাছি চন্দ্রা। আমার একটু কাজ আছে।

চন্দ্রা—এতদিন পরে আইয়াই চইলা গেল। বিয়ার কথা শুনিয়াও কোন কথা কইল না। কি হইছে ওর— আমার যেন কেমন ভাল লাগছে না। না জানি কপালে কি আছে।

(৩)

[ঢোল বাজিল ও জুকারের শব্দ]

ছড়াদার—ঢোল বাজে কাড়া বাজে জয়াদি জুকার।
মালা গাঁথে কুলের নারী মংগল আচার॥
বিবাহের যত কিছু করে আয়োজন।
যতেক দেবতাগণের করিল পুজন॥
অভ্যতিক হইল শেষ জানি এই মতে।
সোহাগ জাগিতে যায় যায় বিধিমতে॥

[ঢোল শানাই বাজিল এবং মাঝে মাঝে জুকারের শব্দ]

মা—বলি ও বৌয়া তোরা এইবার একটা বিয়ার গান গা। আলো রাংগা বৌ—ওমা—অগো এখনও পান আস নাই।

মেয়ে—চন্দ্রা কই মাসীমা? তারে লইয়াই আমরা গান করুম। কিলো চন্দ্রা, বাবা কি সংঘাতিক মাইয়া তুইরে শেষ পর্যন্ত জয়াদারে বিয়া করলি তবে ছাড়লি।

চন্দ্রা—আঃ চুপ কর আমার কিছু ভাল লাগতেছে না।

মেয়ে—হুঁ ভাল লাগতাছেনা—অখন তো ভাল লাগবই না। আমাগো লগে তোর গান গাইতে হইব। আমরা কিছুতেই ছাড়মুনা।

মা—তয়াই গা মা তুয়াই গা।

মেয়ে—ক্যান নিজের বিয়া দেইখ্যা চন্দ্রা বুঝি গাইব না।

মা—তোর যেদিন বিয়া হইব দেখিস সেদিন তুইও গাইতে পারবি না। বুঝরাখ।

মেয়ে—হুঁ মাসীমা য্যান কি? তা হইলে আমরাই গাই।

[সকলে জোকার দিল ও গান আরম্ভ হইল]

রাণী রাম সাজাইতে জান না
রামের সাজন ভাল হইল না।
ও সাজন খুইল্যা ফেইল্যা
মুকুট দিয়া সাজাইয়া ক্যান দেখ মা॥
শ্যামরূপ শ্যামেরই বরণ,
রামের অংগ আভরণ,
চন্দনেরই তিলক দিও মনেরই মতন
ও সাজন খুইল্যা ফেইল্যা
কুণ্ডল দিয়া সাজাইয়া ক্যান দেখনা।

[আবার জুকারের শব্দ ও ঢোল বাজিল]

বংশী—ওরে তোরা থাম্ তোরা, থাম্ আমার সর্বনাশ হইছে। আমার সর্বনাশ হইছে।

মা—একি তুমি অমন করতাছ কেন। কি হইছে?

চন্দ্রা—কি হইছে বাবা?

বংশী—আমি একি শুনতাছি গো, আমি একি শুনতাছি—

মা—কি শুনতাছ?

বংশী—আমার সব গেল গিয়া, আমার সব-গেল আমার সোণার কমল আমি জলে ভাসাইলাম।

মা—ওগো কি হইছে তারাতারি কও, আমার যে কাঁদন আইতাছে।

বংশী—তাই কর গো তাই কর, মাথায় হাত দিয়া কান্দ। চন্দ্রার তোমার বিয়া হইব না।

মা—অ্যাঁ—কও কি তুমি?

বংশী—জয়ানন্দ জাত খোয়াইছে। সে এক অনজাতের কন্যারে নাকি বিয়া করছে।

মা—জয়ানন্দ অন্য জাতের মাইয়ারে বিয়া করছে?

ওগো আইমাগো কি হব গো আমার এত আয়োজন—সব নষ্ট হইয়া গেল। চন্দ্রার কপালে এই আছিল।……ওহো—হো

ছড়াদার—হায় হায় শুন সভাজন।
কেমন কইর‍্যা বিধিরে হায় ঘটায় অঘটন॥
সুন্ধ্যা গ্রামে কুটিলা এক রমনী আছিল।
তুক-তাক কইরা জয়ানন্দে ভুলাইল॥
ভুলিয়া চন্দ্রারে জয়া কোন কাম করে।
বিবাহ করিল হায়রে অনজাত কন্যারে॥
মাণিয় হইল মনিভ্রম হাতীর খসে পা।
ঘাটে আইসা বিনা মেঘে ডুবে সাধুর না॥
থাইম্যা গেল জয়ঢুকার থাইম্যা গেল ঢোল।
পুরীতে জুড়িয়া উঠে ক্রন্দনেরি রোল॥

(৪)

ছড়াদার—জয়ানন্দ করল বিয়া অনজাত কন্যারে।
চন্দ্রা ভাবে কেমন কইর‍্যা সম্ভব হইতে পারে॥
না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি কয়েন বাণী।
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষানি॥
একদিন, দুইদিন, দিন কেটে যায়।
দিনে দিনে সোণার অংগ কালিতে মিশায়॥
সেই হাসি সেই কথা সদাই পড়ে মনে।
ঘুমাইতে চায় কন্যা পায় যদি স্বপনে॥
নয়নে না আসে নিদ্রা অঘুম রজনী।
আপনি কাঁদিয়া কহে আপন জীবনী॥

চন্দ্রা—জয়ানন্দ—
জয়ানন্দ সাথীরে আমার
কেন নিদয় হইলে॥
অভাগিনী চন্দ্রাবতী ভাসে
নয়ন জলে॥
কত কথা কত খেলা কত ফুল তোলা।
কেমন করে ভুলিরে বন্ধু যায় কিরে তা ভোলা॥
কোন রমণী ভোলাল হায় তোমারে কোন ছলে।
আমার খোঁপার দেওয়া তোমার নাগকেশরের ফুল।
কত করে সাজাতেরে আমার খোঁপার চুল।
মিছাই কিরে আমার মালা দিলাম তোমার গলে॥

বংশী—চন্দ্রা

চন্দ্রা—বাবা

বংশী—তোর চোখের জল আর যে দেখতে পারিনে মা! তুই যদি কস্—অন্য পাত্র দেইখ্যা তোর বিবাহের যোগার করি।

চন্দ্রা—বেশ তো আছি বাবা ভালই আছি। বিয়ার আর দরকার নাই।

ছড়াদার—চন্দ্রাবতী বলে পিতা আমার কথা ধর।
জন্মে না করিব বিয়া রহিব আইবর॥
শিবপূজা করি আমি শিবপদে মতি।
দুখিনীর কথা রাখ কর অনুমতি॥
অনুমতি দিয়া পিতা কয় কন্যার স্থানে।
শিবপূজা কর আর লিখ রামায়ণে॥

(৫)

ছড়াদার—শিবপূজা করে কন্যা স্থির কইর‍্যা মন।
অবসর কালে কন্যা লিখে রামায়ণ॥
শুধাইলে না কয় কথা মুখে নাই হাসি।
কার জন্য ফুইট্যা ফুল ঝইরা হইল বাসি॥

জয়ানন্দ—সাবিত্রী! ঐ সামনের মন্দিরেই চন্দ্রা শিব পূজা করে, এই চিঠিখানা লইয়া যা—যা কইছি মনে আছে তো?

সাবিত্রী—আছে! আমি অখন যাই তাহলে জয়দা—

জয়া—যা—চন্দ্রবতী দুইহাতে তুইল্যা আমি বিষ খাইছি। বিষের জ্বালায় আমি পুইরা মরতাছি। জীবণের সব আমার শেষ হইয়া গিয়াছে বাকী আছে মরণ, তাই ফিরা আইয়া চিঠি পাঠাইলাম, তোমারে শেষ দেখা দেখ্যা যামু। আমারে তুমি ক্ষমা কইরো।

(গান) ক্ষমা কর চন্দ্রা আমার ক্ষম অপরাধ।
কপাল দোষে বিধি রে হায় ঘটায় বিষম বাদ॥
সুধা ভাইব্যা খাইছি গরল অংগ হইল ছাই।
এ জীবণের শেষের দেখা তোমায় দেখতে চাই॥
দয়াকর চন্দ্রাবতী এখন মরণ শুধুই সাধ॥

সাবিত্রী—চন্দ্রাদিদি—চন্দ্রাদিদি দরজা খোল।

চন্দ্রা—কে, কেরে সাবিত্রী ?

সাবিত্রী—জয়দা আইছে—

চন্দ্রা—কে, কে আইছে ?

সাবিত্রী—জয়দাগো, জয়দা

চন্দ্রা—আমি শিবপূজা করতাছি, সাবিত্রী তো জয়াদাকে ত আমি চিনি না।

সাবিত্রী—আমার জয়দা হইব ক্যান, জয়াদা তো তোমারই।

চন্দ্রা—আমি দরজা দিয়া দিতাছি সাবিত্রী।

সাবিত্রী—তা দাও এই চিঠি জয়দা তোমারে দিতে কইছে। কইছে চন্দ্রা যদি পত্র না নেয় তাঐলে মন্দিরে ফেইল্যা রাইখ্যা আসিস। তুমি তো তারে চিনতেই চাও না। এই আমি পত্র ফেলাইয়া রাইখ্যা গেলাম।

ছড়াদার—মনে পড়ে চন্দ্রার আবার শৈশবকালের কথা।

কৌতূহল হইল মনে জানিতে বারতা ॥

দুয়ার করিয়া বন্দ কন্যা কোন কাম করে।

বক্ষে চাইপ্পা রাখি পত্র কান্দিল অঝঝরে।

চক্ষের জলে ছাপায় কন্যার নীল নয়নের দিঠি

কান্দিয়া পড়িল চন্দ্রা জয়ানন্দর চিঠি ॥

চন্দ্রা—জয়ানন্দ, জয়ানন্দর চিঠি—আমি জানতাম তুমি ফিরে আইবা কিন্তু—

বংশী—চন্দ্রা—(দরজা নাড়াইল)

চন্দ্রা—বাবা—(দরজা খুলিয়া দিল)

বংশী—রামায়ণ কতদূর লেখা হইল মা

চন্দ্রা—সীতার পাতাল প্রবেশ—

বংশী—শেষ হইয়া গেছে ?

চন্দ্রা—না—এইবার হইব। বাবা জয়ানন্দ একপত্র পাঠাইছে সে একবার আমার সাথে দেখা করতে চায়।

বংশী জয়ানন্দ পত্র দিছে—? সেই নিমকহারাম শয়তান? না না সে আমার মহাশত্রু, আমার সোণার প্রতিমা সে জলে ভাসাইয়া দিল। আমার জাত, আমার কুল আমার মান—আমি সে কথা কি ভুলতে পারি মা। সে কথা আমি ভুলতে পারি না। তার দুঃখে বনের পশু পাখী কাঁদব।

চন্দ্রা—বাবা—?

বংশী—না মা তুমি যা করতাছ তাই কর। জয়ানন্দ তোমার দেখা পাইব না। শিবের পূজা কর আর রামায়ণ লেখ—। তাই কর মা তাই কর।

চন্দ্রা—আচ্ছা তাই করুম বাবা তাই করুম।

(৬)

ছড়াদার—পিতার কথা জানায় চন্দ্রা জয়ের গোচরে।

পাগল হইল জয়ানন্দ চন্দ্রাবতী তরে ॥

চন্দ্রা চন্দ্রা বলে জয়ার বক্ষে বহে জল।

শিকলে বাঁধিয়া রাখে লোকে জানিয়া পাগল ॥

জয়া—ওরে তোরা আমারে বাঁইধা রাখলি ক্যান? আমি পাগল হই নাই, আমি পাগল হই নাই। চন্দ্রা এরা আমায় বাঁধিয়া রাখল চন্দ্রা—। আমারে বাঁইধা রাখল— আমি ছিড়া ফেলুম ছিড়িয়া ফেলুম এই দড়ি। ঐ চন্দ্রা আমায় ডাকে আমি যাইতেছি। আমি যাইতেছি চন্দ্রা—আমার চন্দ্রা—।

ছড়াদার—শঙ্করে পূজিতে চন্দ্রা মন্দিরে পশিল।

পুষ্প দূর্বা দিয়া কন্যা শিবেরে পুজিল ॥

মনেতে ভাসিয়া ওঠে জয়ানন্দর মুখ।

এ জীবনে বাঁচিয়া আর কিবা হইব সুখ ॥

কিসের সংসার কিসের বাস কিসের পিতামাতা।

ভাবিতে ভিজিল কন্যার দুই নয়নের পাতা ॥

হেন কালে পাগলা জয়া শিকল ছিড়িয়া।

চন্দ্রাবতী বলে ডাকে মন্দিরে আসিয়া ॥

জয়া—চন্দ্রা—চন্দ্রা—শিকল ছিড়িয়া আমি চইল্যা আইছি। চন্দ্রা ওরা আমারে বাঁইধা রাখছিল। দরজা খোল চন্দ্রা। খালি একবার তোমারে দেখতে দাও, খালি একবার।

চন্দ্রা—জয়ানন্দ মন্দিরে আইছে, কিন্তু কেমন কইরা আমি দরজা খুলুম। হে ঠাকুর তুমি আমারে কইয়া দাও। বাবায় যে মানা করছে—কেমন কইরা আমি দরজা খুলুম!

জয়া—চন্দ্রাবতী—চন্দ্রা দরজা খোল চন্দ্রা। খালি একবার তুমি আমার সামনে আইসা দাড়াও, দূরে থাইক্যা

তোমারে দেইখ্যা চইল্যা যামু। তোমারে আমি ছুমু না। তোমার থেকে অনেক দুরে থাকুম। কথা কও চন্দ্রা কথা কও—চন্দ্রা সাড়া দাও।

চন্দ্রা—না না—ওগো তুমি যাও—বাবায় আমারে মানা করছে, আমি যে তোমারে দেখা দিতে পারুম না। হে শঙ্কর আমার জয়ানন্দ আমায় ডাকে আমি কেমন কইর্যা যাই ঠাকুর, ওগো আমি কেমন কইর্যা দরজা খুলি? জয়ানন্দ আমার জয়ানন্দ—

জয়া—একবার দুরের থিকা তোমারে দেখতে চাইছিলাম চন্দ্রা, পাপিষ্ঠ যাইনা তুমি জাখা দিলে না। তবে অখন বিদায় দাও—চন্দ্রা শেষ বিদায়—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও বাকী রইছে—। মন্দিরের কপাটে রইল রক্তে লিখা—মন্দিরে রইলা তুমি, আমার চন্দ্রাবতী, অখন বিদায়, বিদায়—বিদায়—চন্দ্রা বিদায়—

ছড়াদার—সহসা চমকি উঠে কন্যা চন্দ্রাবতী।
পুবেতে হইল ফর্সা পোহাইল রাতি॥
বিদায় পত্র দেখে কন্যা কপাঠ খুলিয়া।
পড়িতে পড়িতে জল পরে চক্ষু দিয়া॥
কলসী লইয়া জলের ঘাটে করিল গমন।
নদীর জলে জোয়ার ডাইক্যা আসিল তখন॥
একলা জলের ঘাটে চন্দ্রা সংগে নাহি কেহ।
জলের উপরে ভাসে দেখে জয়ানন্দর দেহ॥

চন্দ্রা—কে জয়ানন্দ আমার পূর্ণ মসীর চাঁদ। কে কোথায় আছ দেখ্যা যাও আমার পূর্ণ মসীর চাঁদ জলে ভাসতাছে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—বিদায় পত্র লিখ্যে আমারে বুঝি তুমি ফাকি দিবা। তা দিতে পারবা না। মন্দির ছাইড়া আইছি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—এইবার বাবায় আমারে কিছুই কইতে পারব না, আর মানা করতে পারব না। ঐ যে জোয়ার, এইবার এইবার—।—[ঝাপের শব্দ]

ছড়াদার—(গীত) এই না বলে দিল চন্দ্রা নদীর জলে ঝাপ।
কোথায় রইল কাঁকের কলসী কোথায় রইল বাপ॥
স্বপ্নের হাসি, স্বপনের কান্না স্বপনে মিশায়।
জয়ানন্দ চন্দ্রাবতী মাগিল বিদায়॥
বিদায়, বিদায়, বিদায়॥

সমাপ্ত

মরা বাঁধ

(গল্প)

সুশীল রায়

অধুনালুপ্ত 'নাচ-ঘর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীল রায়ের সংগে রূপ-মঞ্চ পাঠক পাঠিকাদের পরিচয় আছে নিশ্চয়ই।

হেরম্ব বললো, 'একটা প্রাইভেট কথা ছিলো তোর সংগে, অমিয়।'

অমিয় বললো, 'বল্‌না।'

হেরম্ব একটু ভাবলো, ভেবে বললো, 'এখানে হয় না। একটু বাইরে আয়।'

অমিয় আশ্চর্য হ'য়ে গেলো। ঘরের মধ্যে ব'সে ছিলো তারা দু'জন মাত্র। প্রাইভেট কথা বলায় বাধা হ'লো কি ক'রে ভেবে পেলোনা অমিয়। হেরম্বর মুখের দিকে তাকিয়ে সে নির্বিকার ব'সে রইলো। হেরম্বর এই প্রাইভেট কথা আজ অবধি অমিয় শুনতে পায়নি অবশ্য।

অমিয়র প্রকৃতি অনেকটা ঠেলা গাড়ীর সামিল। সামনে থেকে টানা, বা পেছন থেকে ধাক্কা না পেলে সে চলে না। সামনে থেকে আজকাল তাকে টানছে হেরম্ব, আর পিছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে গীতা। গীতার সংগে অমিয়র বিয়ে হ'য়েছে মাত্র বছর খানেক আগে, কিন্তু হেরম্বর সংগে অমিয়র ঘনিষ্ঠতা আশৈশবের।

গীতার আবির্ভাব অমিয়র জীবনে চাঞ্চল্য আনেনি, এনেছে প্রশান্তি। এনেছে শুদ্ধতা। গীতার সৌন্দর্য তাকে মুখর করেনি, মৌন ক'রেছে। কিন্তু হেরম্বর আবির্ভাব গীতার মনে এনেছে উদ্বেগ আর আশঙ্কা।

অমিয় আর হেরম্ব সহপাঠী ছিলো এক কালে। অমিয়র নাম ছিলো তখন পড়ুয়া ব'লে, আর হেরম্বর নাম ছিলো খেলোয়াড় ব'লে। বেপরোয়া ফুটবল পিটতে পারতো হেরম্ব। বেপরোয়া ইতিহাস মুখস্ত করতে পারতো অমিয়। দু'জন দু'জাতের ছাত্র ছিলো, কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব ছিলো এক জাতের। তারপর তারা ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেলো আসন্ন কর্মজীবনের ঠিক সুরুতেই। হেরম্ব চ'লে গেলো বম্বাই, অমিয় আর কোথাও গেলোনা—এখানেই চাকরি খুঁজতে লেগে গেলো। হেরম্ব খেলোয়াড় ভালো, বম্বাই গিয়ে সে রঙের ব্যবসায় লেগে গেলো—জাপানী রঙ্। তারপর হঠাৎ বন্যাৎ-জোরে যুদ্ধ গেলো বেধে, জাপানী রঙের দাম গেলো ঝাঁ ক'রে চড়ে। হেরম্ব তার ষ্টক্-করা মাল বেচে রাতারাতি লাল হ'য়ে গেলো। এতদূর পর্যন্ত খবর অমিয় পেয়েছে। তারপর যুদ্ধ যখন আরো জোরালো হ'য়ে উঠ্‌লো, ইভাকুয়েশনের হিড়িকে সব ওলোট-পালোট হ'য়ে গেলো, অমিয়র জীবন থেকে হেরম্বও গেলো হারিয়ে। ইতিমধ্যে অমিয় একটা চাকরি বাগিয়ে নিলো কলকাতায়। যুদ্ধ একটু থিতিয়ে আসার মুখে হঠাৎ সে বিয়ে ক'রে বসলো গীতাকে। এতে তার জীবনে পরিবর্তন এলো, পরিবর্তনের মুখেই সে চাকরি দিলো ছেড়ে।

মুখস্ত করা ইতিহাস আওড়ায় আর ঘুরে বেড়ায় অমিয়। পায়ে ছেঁড়া চটি তো ছেঁড়া চটিই সই। গায়ে নোংরা জামা তো নোংরা জামাই সই। পরোয়া নেই কাউকে। এমনি বেপরোয়া হ'য়ে আরেকটা চাকরি যদি সে জুটিয়ে নিতে পারতো, তা হ'লেও একটা কাজের কাজ হ'তো। কিন্তু সেদিকে তার মন নেই। চাকরি সে নাকি আর চায়না। সে করবে ব্যবসা। ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া যায়, কিন্তু ফাঁকা পকেটে ব্যবসা হয় না—এ কথা তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারেনা গীতা। অমিয় কিন্তু ব্যবসা ছাড়া আর কিছু করতে রাজি নয়।

হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হ'য়ে গেলো হেরম্বর সংগে। হেরম্বকে সে দেখেই চিনলো, কিন্তু হেরম্ব তাকে প্রথমে চিন্‌তে চাইলো না। অবশেষে অমিয়র আপাদমস্তক লক্ষ্য ক'রে বললো, 'করছিস্ কি আজকাল?'

হেরম্বর কথার সুরে তাচ্ছিল্যের ভাব লক্ষ্য করলো অমিয়। কিন্তু মোটেও আপত্তি না ক'রে অমিয় বললো, 'কিছু করছিনে। তবে, ব্যবসা করবো ঠিক ক'রেছি। রঙের বাজার আজকাল কেমন, ভাই?'

হেরম্ব ফুৎকারে উড়িয়ে দিলো অমিয়কে, বললো 'রঙ্গ ছেড়ে বঙ্গভাষার কথা বলো তো—একটু শুনি। কি বলতে চাও?'

অমিয় বললো, 'করতে চাই হাতি!'

'হাতি করবে? অর্থাৎ হস্তী? হস্তিমুর্খ তুমি একটা। ব্যবসা যখন বন্ধের দিকে আসছে তখন বাই উঠলো হাতি হবার। 'বিয়ে-টিয়ে কিছু করা হ'য়েছে?' হেরম্ব অমিয়র দিকে একটু ঝুঁকলো।

'বাঙ্গালীর ছেলে হ'য়ে আউবুড় থাকার কি মানে আছে?'

'অর্থাৎ বিয়ে করেচ।' হেরম্ব একটু যেন ঘনিষ্ঠতা দেখালো। তার সম্বোধনের ধারা গেলো বদলে, বললো, থাকিস্ কোথায় তোরা?'

'এন্টালী।'

'ইটালী বল্। উঠে আয় রিকশায়, চল্ দেখে আসি তোর বউ।' রিক্শায় ব'সে বললো, 'বিয়ে করে চেপে যাওয়া হচ্ছিলো কেন? বউ কেমন হ'লো? নাম কি?'

'গীতা।' অমিয় সংক্ষেপে জবাব দিলো।

গীতাকে দেখে হেরম্বর পছন্দ হ'য়েছে বুঝি। অমিয়কে সে ব্যবসা করতেই বলছে। ব্যবসার বাজার মন্দা হ'লেও, এখনো আশা ভরসা নাকি একেবারে যায়নি।

গীতা সলজ্জভাবে বললো, 'দেখুন, এখন যদি আপনার চেষ্টায় কিছু হয়।'

হেরম্ব বললো, 'আপনি কিছু ভাববেন না, বৌদি। অমিয়র কাছে আমার কথা নিশ্চয় শুনেছেন। আমরা ছেলেবেলা থেকে একআত্মা একপ্রাণ। আমাদের অন্তরংগতা সে আমলে একটা উদাহরণের মত ছিলো। শুনেছেন নিশ্চয় সব। এক গ্লাস জল খাওয়াবেন?'

হেরম্ব ভাবছিলো, অমিয়টা তো সত্যিকার বেকুব নয়, বেড়ে বউ জোগাড় ক'রেছে। স্বাস্থ্য, শ্রী, কথা বলার ধরণ সবই বেশ মজবুত।

এক নিঃশ্বাসে সবটা জল খেয়ে নিয়ে, দম না ফেলেই হেরম্ব বললো, 'চাকরি ছাড়তে দিলেন কেন একে? বড় হতভাগা তুই অমিয়। অযথা একজনকে এমন কষ্টে ফেলেছিস্।'

অমিয় দায়িত্বহীনের মত বললো, 'কিসের কষ্ট!'

'কিসের কষ্ট? কিছু বোঝনা। নির্বোধ কোথাকার। কিছু মনে করবেন না বৌদি। আমি অমিয়কে ধমকাতে পারি। এটুকু দাবী, এখনো আছে আমার।' ব'লে হেরম্ব উঠে দাঁড়ালো। আবার বললো, 'আজ চলি বৌদি। আবার আসবো, সময় পেলেই আসবো। বোঝেন তো ব্যবসাদার মানুষ, বড় ব্যস্ত থাকি সব সময়। ঠিক কথা দিতে পারছিনে আবার কবে আসতে পারবো। আর অমিয়র জন্যে ভাববেন না। হঠাৎ হয়ত একদিন দেখবেন, ও মস্ত ব্যবসা ফেঁদে ব'সেছে। জানেন না তো, পাতার পর পাতা ইতিহাস ও রাতারাতি মুখস্ত ক'রে ফেলতো। ওর অসাধ্য কাজ নেই।'

পরদিন হেরম্ব এসে হাজির। এসেই বললো, 'চা দিন দেখি।'

মাথায় বজ্রাঘাত হ'লো গীতার। অমিয় বাসায় নেই, ঘরে নেই এক ফোটা চিনি। দুধ না হয় জোগাড় ক'রে নেবে ওপরের তলার আরতির কাছ থেকে, কিন্তু চিনি ওরা কিছুতেই দিতে চায়না।

আনাচ কানাচ খুঁজে খান কয়েক বাতাসা পেয়ে গেলো গীতা। বাতাসা দিয়ে চা করলে ধরতে পারবে না নিশ্চয় হেরম্ব।

অনেক্ষণ বাদে এক বাটি চা নিয়ে এলো গীতা। চায়ে মুখ দিয়েই হেরম্ব বললো, 'চমৎকার। খাসা চা হয়েছে কিন্তু। বসুন না, চ'লে যাচ্ছেন কেন? চা করতে গিয়ে তো লম্বা একটা ডুব দিয়েছিলেন। ভাবলাম, ভুলেই গেলেন বুঝি আমাকে।' হেরম্ব চুমুক দিলো।

গীতা উস্খুস করছিলো। অমিয়ও আসছে না। আরতিও যদি একবার নীচে নেমে আসে! কথা বলার কথা পাচ্ছেনা দু'জনের কেউই।

হেরম্ব চায়ে চুমুক দিতে দিতেই বললো, 'মনে হ'চ্ছে আপনি যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছেন। কিছু ভাববেন না, ওর কিছু একটা হবেই। আর আমি যখন বম্বে থেকে এসে পড়েছি—ব্যবস্থা একটা করবোই।,

গীতা ঢোক গিললো শুধু, কিছু বললো না।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে হেরম্ব কাপের মধ্যে তাকিয়ে হেসে উঠ্‌লো, 'ও, বাতাসা দিয়ে তৈরী চা বুঝি? চিনি নেই, তা বললেই পারতেন। চা যে খেতেই হবে আমাকে, এমন কোন কথা ছিলোনা তো। চা খেতে গিয়ে ঠক্‌লামই বলতে হবে, আপনি চা তৈরি করতে গিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে রইলেন কতক্ষণ, আমি একা একা ব'সে রইলাম।' একটু থেমে বললো, 'অমিয় আসবে না এখন?'

'আসার তো কথা। এমনি সময়ই তো আসেন।' গীতা বার বার দরজার দিকে তাকাতে লাগলো। তার মনে হচ্ছিল হেরম্বর দৃষ্টি তার শরীরের উপর দিয়ে আড়শোলার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারা গা তার শিরশির করছিলো।

হেরম্ব বললো, 'আপনার মত মেয়ে যদি সিনেমায় নামে, তবে সিনেমার সেটা একটা মস্ত লাভ।

হঠাৎ এই অসংলগ্ন কথা গীতার গায়ে চাবুকের মত ঘা দিলো, অস্ফুটস্বরে বললো, 'তার মানে?'

হেরম্ব বুঝলো তার কথাটা বড় বেয়াড়া ভাবে বলা হ'য়ে গেছে, তবু বললো, 'এমন ফ্রী, এমন স্মার্ট, এমন ফিগার—'

গীতা বললো, 'ওঁর আসতে অনেক দেরী হবে আজ'।

হেরম্ব ঠিক বুঝলো না কথাটা, বললো, 'অপেক্ষা করতে বলছেন নাকি?'

'তা বলি কি ক'রে। আপনার কাজের ক্ষতি হবে তো! আবার আসবেন একদিন।' গীতা এক নিশ্বাসে ব'লে ফেললো।

হেরম্ব তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'সত্যি, যা' বলেচেন। ব্যবসাদার লোক তো আমরা। প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমাদের মাপা।'

হেরম্ব চ'লে যাবার কিছু পরেই অমিয় এলো। গীতা জিজ্ঞাসা করলে, 'রাস্তায় দেখা হয়নি তোমার বন্ধুর সংগে?'

'কে, হেরম্ব? কই, না তো!' অমিয় থমকে দাঁড়ালো, 'বসতে বললে না কেন?'

ব'লেছিলাম। কিন্তু তাঁর কাজের ক্ষতি হবে ব'লে থাকতে পারলেন না।'

'ক্ষতি! কিন্তু আমার ক্ষতি হ'য়ে গেলো কতটা তা জানো?' অমিয় গায়ের পাঞ্জাবী মাথার উপর দিয়ে বের ক'রে দিতে দিতে বললো, 'একটা দাঁও জুট্‌লো, অমনি হেরম্বও গেল ভেগে। একেই বলে বরাৎ।'

মাঝে একদিন বাদ দিয়ে হেরম্ব এসে হাজির। রাস্তা থেকে চীৎকার ক'রে অমিয়কে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকে পড়লো। কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে কুণ্ডলী হ'য়ে শুয়ে অমিয় তার ব্যবসার প্ল্যান করছিলো। হেরম্ব বললো, 'হ্যালো হিস্‌টোরিয়ান্, হোয়াট নিউজ্। এনি গুড থিং ফর মি?

তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠ্‌লো অমিয়, বললো, 'গড ইজ্—'

'হোয়াট?'

'হোয়াট নয়। শুধু গড্ ইজ্—তিনি আছেন। তার প্রমান তুমি এসেছো। যখন তোমাকে চাই, তখনই তোমার আবির্ভাব। দশ হাজার টাকা ছাড়তে হবে। কয়েক বেল্ কাপড় পেয়েছি। কাপড়ের দু-দিন আসছে। হলফ ক'রে বলতে পারি দশ হাজার টাকা ষাট হাজার টাকা আনবে ছ'মাস বাদে।'

অমিয়র সব উৎসাহ নিভিয়ে দিলো হেরম্ব। বললো, 'কিছু হবে না। ব্যবসা ইতিহাস নয়। অত সস্তা নয়। তার-চেয়ে এসো, ফিস্‌ট করি। এই নাও টাকা, চট ক'রে একবার বেরিয়ে পড়। ব্যবসা যখন হবে বুঝবো, তখন ঠিক লাগিয়ে দেব তোমাকে। ওঁৎ পেতেই বসে আছি।

ওঁৎ পেতেই অবশ্য ব'সে গিয়েছে হেরম্ব। অমিয় গেছে বাজারে। হেরম্বর অন্তরংগতার অভাব নেই। গীতা এদিকে আসতে পারছে না দেখে হেরম্বই উঠে গেলো গীতার কাছে। হঠাৎ এভাবে হেরম্বর আবির্ভাব আশা করেনি গীতা। সংকোচে সে ম'রে যেতে লাগলো। পরণের কাপড় এমন বেকায়দায় ছিঁড়ে গিয়েছে। হেরম্ব কিন্তু একটুও সংকোচ বোধ করলো না। কাছে গিয়ে ব'সে বললো, 'একটু খাটাবো কিন্তু আজ। অমিয়কে বাজারে পাঠিয়েছি—একটু ফিস্‌টু হবে।' পাকা খেলোয়াড়ের মত চাল-চলন হেরম্বর। গীতা ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে ছিলো, একবারও সে মুখ তুলে চাইতে পারছিলো না। হেরম্ব একমনে বম্বের কথা, পুণার কথা, পার্শি মহিলাদের কথা, মহাত্মা গান্ধীর কথা, বস্ত্র সংকটের কথা এলোমেলো ভাবে বলে যাচ্ছিলো। ওপর থেকে আরতি বুঝি একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেলো।

হেরম্ব বললো, 'একবার বম্বেতে নিয়ে যাবো আপনাকে। সত্যি দেখার জায়গা বটে। কই, একটা কথারও জবাব দিচ্ছেন না যে।'

মাথা নীচু ক'রে ব'সে গীতা বললো, 'গল্প শুনছি তো!'

'কোন্‌টা গল্প? এই বম্বে নিয়ে যাওয়াটা?' হেরম্ব একটু ভাল হ'য়ে বস্‌লো।

'উঁহুঁ।'

'তবে? এই বস্ত্রসংকট' হেরম্ব একটু বুঝি হাসলো।

গীতা আরো একটু কুকড়ে বসলো।

ফিস্‌টের পর ফিস্‌ট লেগেই আছে। আরো লজ্জার কথা, হেরম্ব এক জোড়া ধুতি আর এক জোড়া শাড়ি উপহার দিয়ে গেছে এদের। হাত পেতে কি ক'রে নেয় —যে অমিয়। শুধু কি ধুতি, শাড়ি—টাকাও। লজ্জায় ম'রে যায় গীতা। একদিন গীতার হাতের মধ্যেও হেরম্ব চুপ ক'রে কটা টাকা গুঁজে দিতে গিয়েছিল। অপমানের আর শেষ নাই গীতার।

রাত্রে শুয়ে গীতা বললো, 'আর কাজ নেই ব্যবসা দিয়ে। অনেক ব্যবসা হ'য়েছে। এবার একটা চাকরির চেষ্টা দেখ।'

অমিয় বললো, 'অত সহজেই হাল ছাড়তে নেই। দেখা যাক্-না শেষ কোথায়।'

গীতা বললো, 'শেষ দেখে লাভ নেই। হেরম্ববাবু তোমাকে নিয়ে করবেন না কিছু।'

'বলো কি? পাশ ফিরে শুলো অমিয়, কত চেষ্টা করছে ও, জানো?'

'জানি। চেষ্টা উনি খুবই করছেন। কিন্তু কিছু হবে না।' একটু থেমে বললো, 'আর একটুও মন টিকছেনা আমার! চাকরি যদি না পাও, চলো দেশে চলো।'

দেশে আছে কি? না আছে ধান, না আছে চাল। মাথা গোঁজার মত হয়ত আছে একটা আটচালা। তবু, তবু যেতে হবে। গীতার এটা জেদ্।

'কেন বলো তো?' অমিয় বললো, 'এত জেদ কেন কর্‌ছো?'

'সব শুন্‌তে নেই। চুপ ক'রে চলো। কাউকে কিছু জানাতে হবে না।'

অগত্যা একদিন সন্ধ্যার ট্রেণে তারা মহানগরী ছেড়ে রওনা হ'য়ে গেলো। দেশের মাটিতে পা দিয়ে শিউরে উঠ্‌তে লাগলো গা। আনন্দে শিউরো উঠ্‌লো না অবশ্য, হতাশায়। আটচালা আছে, আশ্রয় নেই। আত্মীয় আছে, স্বজন নেই। সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। এরা যেন উত্তপ্ত কড়াই থেকে প্রাণরক্ষার জন্যে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়েছে জলন্ত আগুনের মধ্যে। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে অনাহারে আর অনিদ্রায়।

ক্ষিদের জ্বালা যখন অসহ্য হ'য়ে ওঠে তখন অমিয় ক্ষেপে উঠে গীতার ওপর। তার জন্যেই তাকে এই নরকের মধ্যে এসে পড়্‌তে হ'য়েছে। অমিয়র অত্যাচার যখন চরমে ওঠে তখন গীতার মনে হয় নানা কথা। হেরম্বর কথায় রাজি হ'য়ে গেলে হয়ত ভালই হ'তো। বম্বে না গেলেও, অন্ততঃ পক্ষে সিনেমায়!

ঝগড়ার মীমাংসা

(ছোট্ট গল্প)

অধ্যাপক প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

★

এই সরস ছোট গল্পটীর লেখক বঙ্গবাসী কলেজের বঙ্গভাষার অন্যতম অধ্যাপক এবং কবি হিসাবে সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁর সুনাম যথেষ্ট আছে।

★

কয়দিন ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া চলিয়াছে—যেন থামিবার নয়। দুইজনের যে কেহ সামান্য ছুতা পাইলেই অপরের উপর ঝাল মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

কাল সকালে সেই ব্যাপারেরই পুনরভিনয় হইয়া গিয়াছে। বিষম ঝগড়া। দুইজনে কথা বন্ধ। কথা যাহা হইতেছে তাহা ব-কলমে—ছেলেমেয়ের মারফতে বা ঠারে—ঠোরে।

স্বামী মেয়েকে হুঙ্কার দিয়ে বলেন—এই পটলী, আমার ছোট রুমালখানা যে আজ তিনদিন দেখ্‌তে পাচ্ছি না,—গেল কোথায়? বাড়ীর সব তো একেবারে নবাব; কে কোথায় থাকেন তার ঠিক নেই। আমার জিনিষপত্তর সবই উচ্ছন্ন যাক, আর কি? দেখ্‌বে কে? আপিসে খেটে মরো, আবার বাড়ীতে এসে ঘটি খোঁজ, গেলাস খোঁজো, রুমাল খোঁজ! ভারী মজায় সব আছেন। পটলী, নিয়ে আয় রুমাল এখ্‌খুনি।

স্ত্রীর কানে কথাটা গেল। রুমাল কোনো রকমে আসিল।

খানিক পরেই স্ত্রীর গর্জন শোনা গেল—ছেলেকে বলিতেছেন—নবা, এই নবে, ঘি কোথায় যে হালুয়া খাবি? তিন দিন হ'ল ঘি ফুরিয়েছে। আমি কি দোকানে যাব না কি? সব আছেন খালি খা'বার মালিক,—আ'নবার বেলায় কেউ নেই। সাত দিন ধ'রে সাতজনকে খোসামোদ কর্‌তে হবে, তবে জিনিস আস্‌বে। খালি আমি দাসীবৃত্তি কর্‌লেই কি সংসার চল্‌বে? বাকী সব ব'সে ব'সে খাবেন বুঝি?

কথাটা স্বামীর কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। দুইজনেই বেশ গরম। আবার আগুন জ্বলিবে না কি?

দেড় ঘণ্টা পরে। প্রায় পৌণে দশটা। স্বামী আপিসের তাড়ায় তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। পা কেমন পিছ্‌লাইয়া গেল। একেবারে চারটে সিঁড়ি টপ্‌কাইয়া তিনি আছাড় খাইয়া পড়িলেন। সংগে সংগে আর্তনাদ করিলেন। পায়ে বিষম চোট লাগিল। ছেলে মেয়েরা ছুটিয়া আসিল। স্ত্রীও খুন্তি হাতে ছুটিয়া আসিলেন আহত স্বামীকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া তুলিলেন। স্বামী কাতর চোখে স্ত্রীর চোখের দিকে চাহিলেন। স্ত্রী বলিলেন—বেশ হয়েছে, চলো, বরফ দেওয়া হবে আর সেবা করা হবে। খালি ঝগড়া কর্‌লে কি আর মাথার ঠিক থাকে? যাতনার মধ্যেও স্বামীর গোঁফের পাশে একটু যেন হাসি খেলিয়া গেল।

আসুন, কয়েকজন বৈদেশিক চিত্রকরের কয়েকখানি চিত্রের সংগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি :

এইতো-জীবন ফ্রাঙ্ক ট্যানার

মারগারেট লিভিংষ্টোন ঃ চরিত্রানুশীলন ঃ রাসেস বল

নোয়েল ফ্রান্সিস : চরিত্রানুশীলন : রাসেল বল

হতাশায় শিল্পী ভেঙে পড়েছে : চরিত্রানুশীলন : রাসেল বল

বিশ্রামের কোলে :

: পল এলেন, এ, এস, সি

চরিত্রানুশীলন

ঃ কার্ল ষ্ট্রাস এ, এস, সি

রূপ-মঞ্চ

চরিত্রানুশীলন

ঃ কার্ল ষ্ট্রাস, এ, এস, সি

গভীর চিন্তায় মগ্ন ঃ চরিত্রানুশীলন ঃ লরেন্স গ্রাণ্ট

নেশা

(গল্প)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

★

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। রূপ-মঞ্চের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সংবাদও পাঠক-পাঠিকাদের জানা আছে। বৈচিত্রময় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যেমনি মাণিকবাবুর বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে —তেমনি তাঁর রচনায় সে বৈচিত্র স্পষ্ট ভাবেই ফুটে উঠে। বর্তমানের গল্পটীও বাস্তবের একটী মর্মন্তুদ ছবি।

★

একদিন ম্যাটিনীতে নাচেগানে প্রেমে বিচ্ছেদে আর শেষ মিনিটের মিলনে জমকালো এক ছবি দেখে পুলকেশ বাইরে এসেছে, দেখা হল যতীনের সংগে।

আগের কথা।

●

পুলকেশের সিনেমা দেখার ঝোঁক একেবারে নেই। যতীনেরও তাই। সত্যিকারের কোন ভাল ছবির খবর পেলে, রুচি, রসবোধ আর বিচারশক্তি আছে এমন কোন বিশ্বাসী লোকের কাছে খবর পেলে, হয়তো কখনো নিজেরাই সখ করে গিয়ে দেখে আসে ছবিটা। তাছাড়া ইচ্ছে করে কখনোই তারা সিনেমায় যায় না। মাঝে মাঝে যেতে যে হয় তার কারণ থাকে ভিন্ন। সিনেমা যাবার ভীষণ সখ আছে অথচ কেউ না নিয়ে গেলে যেতে পারে না এমন যার বা যাদের আব্দার এড়ানো চলে না, তাকে বা তাদের সংগে নিয়ে যেতে হয়।

ছবি যে একেবারে তারা উপভোগ করে না তা নয়। একটু উল্টোভাবে কিছু কিছু করে, দর্শকদের যেরকম উপভোগের জন্ম ছবিটা মোটেই তৈরী হয়নি। বাংলা আর হিন্দী ছবি হলেই পুলকেশ আর যতীনের অভিনব উপভোগটা জমে বেশী। উদ্ভট অবাস্তব সৃষ্টিছাড়া একঘেয়ে কাহিনী, চরিত্রগুলির অমানুষিক খাপছাড়া আর সংগতিহীন কথাবার্তা, চালচলন, ভাবভংগি, যেখানে সেখানে গান, উৎকট হাসি কান্না আর ভাঁড়ামি ইত্যাদি তাদের নিঃশব্দ হাসির অনেক খোরাক জোটায়। অন্য সকলের তন্ময়তার মর্যাদা রাখার জন্মই যেখানে নিঃশব্দে হাসা সম্ভব হয় না সেখানেও মুখে রুমাল গুঁজে হাসিটা চাপা দেয়। সময়টা তাই একরকম তাদের কেটে যায় হাই না তুলে, ঘুম না পেয়ে।

মৃন্ময়ী একদিন আশ্চর্য হয়ে পুলকেশকে বলেছিল, 'তুমি কেঁদে ফেল্লে! দৃশ্যটা খুব করুণ সত্যি, কিন্তু—'

'কোন দৃশ্যটা?'

'মেয়েটা যেখানে রাতদুপুরে বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে—'

'ও দৃশ্যটা করুণ নাকি? আমার তো ভারি কমিক লাগছিল। এত কাণ্ডের পর অচেনা বাপের সংগে রাতদুপুরে বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার কোন মানে হয়? আমি তো ভাবছিলাম মেয়েটা যাতে বাড়ীতেই থাকে তার জন্ম প্লট এত ঘোরালো করা হচ্ছে!'

দেহমনে স্বাস্থ্য, জীবনে আনন্দ, অসংগতির হাস্যকর দিকটাই চোখে পড়ে আগে। তাই জীবনের সংগে ছবিগুলির সংযোগের অভাব দেখে, কষ্ট কল্পনা দেখে, সস্তা ও হাল্কা রোমান্সের গেঁজলা রস থই থই করতে দেখে, এমন কি মানুষের মনে ছবিগুলির প্রভাব কি ক্ষতিকর কিছু কিছু তা ভেবেও, পুলকেশরা বিদ্বেষমূলক সমালোচনার ঝাঁঝ অনুভব করে না। এই সব ছবি দেখার জন্ম যারা পাগল তাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাবও পোষণ করে না। কেবল এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যায় যে ছেলেভুলানো এ জিনিষ দিয়ে বয়স্ক মানুষ নিজেকে ভোলায় কি করে!

●

তারপর জীবন আসে পরবর্তী বাস্তব অধ্যায়ের নিয়ম, অনিয়ম, প্রয়োজন আর ঘাতপ্রতিঘাতের সূচনা নিয়ে। যেভাবে আরম্ভ করবে ভেবেছিল, পুলকেশ বা যতীন কারো আরম্ভটাই সেরকম হয় না। হাসিমুখেই তারা সেই

কমলার অর্ঘ্য নিবেদন
মহিষমর্দিনী মায়ের রথচক্রের নিষ্পেষণে দেশের বুকের দুষ্ট দানবের নিপাত হউক।
কল্যাণময়ী মায়ের পাদস্পর্শে 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'র বুকের হাহাকার মিলিয়ে যাক।

আরম্ভকে গ্রহণ করে এবং প্রয়োজন হওয়ায় হাসিমুখেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যায়। স্বপ্ন দেখার অভ্যাস তাদের ছিল কম। জীবনের সূচনা যা কল্পনা করেছিল তা অবাস্তব বা অসম্ভব ছিল না, সাধারণ নিয়মেই ওটুকু প্রাথমিক সাফল্য তারা পেত, অসাধারণ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াতেই সেটা ফস্কে গেল। তাই তারা ভাবল, এ বাধার দাম কতটুকু? কি আসে যায় গোড়াতে একটু পিছিয়ে পড়লে? এগিয়ে চললেই হবে আবার।

যতীন একটা চাকরী নিয়ে চলে গেল পাটনা। পুলকেশ একটা চাকরী নিয়ে রইল কলকাতায় এবং বিয়ে করল। যতীন আগেই বিয়ে করেছিল।

কয়েকবছর একটু লড়তে হবে পুলকেশ জানতো। কিন্তু বিয়ে করলে মানুষ লড়তে পারবে না কেন, সে ভেবে পেল না। বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে, মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে, চার পাঁচ বছর অপেক্ষা করলে মেয়েটিও ফসকে যাবে বিয়ে করে সংসারী হবার পক্ষে বয়সটাও হয়ে যাবে বেশী, এ অবস্থায় যে বিয়ে না করে সে তো ভীরু, কাপুরুষ! আর একটা বিয়ে করার জন্য যে জীবন-যুদ্ধে হার মানবে, জয় তার বিয়ে না করলেও কোনদিন হবার সম্ভাবনা নেই।

আসল হিসাবে তার ভুল ছিল না, ভুল হল মৃণ্ময়ীর মত সিনেমা-বিদগ্ধা, স্বপনবিলাসিনী, রোমাঞ্চ লোভাতুরা, নিয়ন্ত্রণ অসহিষ্ণু, ধৈর্য আর সংযম বঞ্চিতা, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর মেয়েকে বিয়ে করায়। এর চেয়ে গেঁয়ো ভীরু ভোঁতা একটা মেয়েকে বিয়ে করলে তার ভাল হ'ত। জীবনটা অপূর্ণ থাকত বটে অনেক দিক দিয়ে, কিন্তু এভাবে অশান্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠত না, ভাঙনও ধরত না সব দিক দিয়ে।

প্রথমে সে গেল ভড়কে। তারপর তার মনটা হ'য়ে গেল বিষন্ন। তারপর এল রাগ আর জ্বালা। তারপর রাগ, জ্বালা বিষাদ ইত্যাদির সংগে গভীর হতাশা। দু'বছরের মধ্যে যে হাসতে ভুলে গেল, শরীর রোগা হয়ে পড়ল। সারাদিন অফিসের খাটুনির ওপর তিনটি টিউসনী করেও সে কখনো টের পায়নি কাজের চাপে কষ্ট হওয়া কাকে বলে, এখন অফিসের কাজ করতেই তার দেহমন যেন নুয়ে পড়তে লাগল শ্রান্তিতে। কারো সংগে মিশতে ইচ্ছা করে না, কথা বলতে ভাল লাগে না, কোন বিষয়ে কিছু ভাবতে গেলে মাথাটা যেন টন টন করে। শুধু ইচ্ছা করে পালিয়ে যেতে! সব ফেলে রেখে এক অনির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যেতে! সামঞ্জস্য ঘটতে সময় লাগল আরও প্রায় দু'বছর। দিশে-হারার মত উর্ধ্বশ্বাসে কোথাও ছুটে পালাবার দুরন্ত সাধ তখন ঝিমিয়ে এসেছে। স্তিমিত হয়ে এসেছে বিরক্তি, বিদ্বেষ আর জ্বালা বোধ। কাজ করার সেই অসহ্য কষ্ট কমে গেছে। নিস্তেজ ঝিমানো দেহমন নিয়ে সবই সে করে যায়,—সংসারের কাজ, অফিসের কাজ, মেলামেশা, মৃণ্ময়ীর সংগে কলহ করা ও তাকে আদর করা। মাঝে মাঝে একটু হাসিও সে এখন হাসতে পারে। তবে আগের মত হাসি নয়।

আর সময় পেলেই সে স্বপ্ন দ্যাখে। আগে যা কিছু কল্পনা করত তার সীমানা ছিল বাস্তব হিসাব আর পরি-কল্পনা, খুব বেশী ফুলে ফেঁপে উঠতে পারত না। এখন আর ওসব বাধা নেই। ট্রামের কুড়ি পঁচিশ মিনিট সময়ের মধ্যে আশ্চর্য আশ্চর্য উপায়ে কোটিপতি হতে তার সময় লাগে বড় জোর দু'তিন মিনিট, বাকী সময়টা যায় সেই টাকার বিচিত্র ও ব্যাপক উপভোগে। নানা টাইপের আদর্শ নারীর সংগে নানা বৈচিত্র্যময় প্রেমের লীলাখেলায় কত সময় যে তার কোথা দিয়ে কেটে যায়।

শেষের তিন বছর একবারও পুলকেশ কোন সিনেমায় যায় নি। এই নিয়েই একদিন মৃণ্ময়ীর সংগে তার দারুণ কলহ হয়ে গেল। সিনেমায় মৃণ্ময়ী হরদম যায়, অন্যের সংগে। কিন্তু কেন তা হবে? কেন তাকে পুলকেশ একদিন সিনেমায় নিয়ে যেতে পারবে না? কোন স্বামী এ রকম ব্যবহার করে স্ত্রীর সংগে? তার নিজের যেতে ভাল না লাগুক, মৃণ্ময়ীর কি সখ থাকতে নেই?

'আরেকদিন নিয়ে যাব।'

'আরেকদিন কেন? আজ নিয়ে চল।'

তাই করতে হল শেষ পর্যন্ত। বহুদিন পরে পুলকেশ

সেদিন একটি বাংলা ছবি দেখল। খাপছাড়া অদ্ভুত মনে হল বটে ছবিটা, কিন্তু আজ আর হাস্যকর মনে হল না। এমন কি অজানা নতুন তরুণ ডাক্তার পাড়াগাঁয়ে পা দেওয়া মাত্র কম্পাউণ্ডারের বয়স্থা কুমারী মেয়েকে তার সংগে মাঠে গিয়ে নৃত্যচ্ছন্দে লাফাতে লাফাতে ডুয়েট গান করতে দেখেও তার হাসি পেল না, বরং বেশ মিষ্টি আর রসালোই লাগলো ব্যাপারটা।

মসগুল হয়েই পুলকেশ শেষ পর্যন্ত ছবিটা দেখে ও শুনে গেল।

পরের শনিবার অফিসের এক সহকর্মীর সংগে সে আবার সিনেমায় গেল। পরের সপ্তাহে গেল তিনবার। কয়েকমাসের মধ্যে সে নিয়মিত ভাবে সিনেমায় যেতে এবং ভালমন্দ নির্বিচারে ছবিগুলি তন্ময় হয়ে দেখতে আরম্ভ করল। বন্ধুদের সংগে ছবি আর তারকাদের বিষয় আলোচনা ও তর্ক করে কেটে যেতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়।

●

একদিন ম্যাটিনীতে নাচে গানে প্রেমে বিচ্ছেদে আর শেষ মিনিটের মিলনে জমকালো এক ছবি দেখে পুলকেশ বাইরে এসেছে, দেখা হল যতীনের সংগে। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল, যতীন ছাতি মাথায় দিয়ে হাঁটছিল ফুটপাতে। যতীনকে হঠাৎ দেখে পুলকেশ চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরণে আধময়লা জামা কাপড়। যতীন নিজেই তাকে দেখে কাছে এগিয়ে এল।

এতদিন পরে দেখা, কিন্তু এমনি নির্জীব হয়ে পড়েছে দু'জন যে উল্লাসটা তেমন জোরালো হল না। কিছুটা আশ্চর্য আর কিছুটা খুশী হয়ে পুলকেশ বলল, 'যতীন! কলকাতা এলি কবে? যতীন বলল, 'মাসখানেক। তোর বাড়ী যাব যাব ভাবছিলাম, হয়ে ওঠেনি।'

যতীনের মুখে পুলকেশ মদের গন্ধ পায়। চোখে দেখতে পায় নেশার আবেশ। কথায় একটা অস্বাভাবিক টলোমলো প্রফুল্লতা। দুই বন্ধু কথা বলে ধীরে সুস্থে, খবর নেয় আর দেয় ছাড়া ছাড়া ভাবে, এতগুলি বছর ধরে অজস্র কথা জমেছে কিন্তু বলার বা শোনার তাড়া যেন নেই।

যতীন বলে, 'আয়, বসে কথাবার্তা কই।'

'কোথায় বসবি?'

'আয় না। কাছেই।'

খানিক এগিয়ে বাঁয়ে গলির মধ্যে একটা দেশী মদের দোকানে যতীন তাকে নিয়ে যায়। শনিবারের বিকাল, ইতি মধ্যেই লোক জমে যায়গাটা গম গম করছে—ছেঁড়া কাপড় পরা খালিগায়ের লোক থেকে ফর্সা জামাকাপড় পরা ভদ্রলোক পর্যন্ত। দোকান ঘরের বেঞ্চিগুলি সব ভর্তি, দাঁড়িয়ে এবং উবু হয়ে বসেও অনেকে মদ খাচ্ছে। পাশের ঘরে একটা বেঞ্চে যায়গা ছিল, পুলকেশকে বসিয়ে যতীন, বলে, বোস 'একটা পাঁট আনি। একটু সেলিব্রেট করা যাক।'

'আমি তো ওসব খাই না।'

'একদিন একটু খাবি, তাতে কি হয়েছে? এ্যাদ্দিন পরে দেখা, একটু ফুর্তি না করলে হয়?'

এখানে ঢুকেই যতীনকে আগের চেয়ে একটু তাজা, একটু উৎসাহী মনে হচ্ছে। সেলিব্রেট করার একটা ভাল উপলক্ষ পেয়ে সে যে ভারি খুশী হয়েছে বেশ বোঝা যায়, বেশী মদ খাওয়ার জন্য নিজের মনটা আর তাকে কামড়াবে না। যতীন মদ আনতে যায়, পুলকেশ বসে বসে ভাবে। যতীনের অধঃপতনে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়।

যতীন এসে বসলে সে জিজ্ঞেস করে, 'কদিন খাচ্ছিস?'

'বছর দু'তিন।'

'এটা ধরলি কেন?'

প্রশ্ন শুনে যতীন হাসে।—'খেলে একটু ভাল লাগে আবার কেন!'

গেলাসে মদ ঢেলে ঢেলে খেতে খেতে যতীনের অন্তরংতা বাড়তে থাকে, কথা সে বলতে থাকে তাড়াতাড়ি, বেশী বেশী। একবার চুমুক দিয়েই পুলকেশের সর্বাংগ শিউরে উঠেছিল, বমি ঠেলে উঠেছিল। আর খাবার চেষ্টা না করে সে যতীনের কথা শুনে যায়। অদৃষ্ট বড় খারাপ ব্যবহার করেছে যতীনের সংগে, ঘা মেরে মেরে

থেঁতলে দিয়েছে জীবনটা, কোনদিকে বিশেষ সুবিধা করতে দেয় নি। চাকরীর গোড়ায় বাপ মারা গেল। কিছু টাকা হাতে পেয়ে চাকরী ছেড়ে একটা ব্যবসা আরম্ভ করেছিল, তেমন সুবিধা হল না। বীমার দালালী করেছিল কিছুদিন, সুবিধা হল না। একটা এজেন্সী কারবার ধরেছিল, সেটাতেও হল না। দুটো ছেলে হবার পর বৌটাও পড়ল অসুখে, সেই থেকে একটানা ভুগছে। বোনের বিয়ে দিয়েছিল, বোনটাকে তার স্বামী নেয় না। বিরক্ত হয়ে সকলকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সে কলকাতায় নতুন একটা ব্যবসা ফেঁদেছে।

সংসারের হাংগামা নেই, খরচের টাকা পাঠাই, বাস্। এবার ঠিক গুছিয়ে নেব। দু'বছরের মধ্যে যদি না মোটর কিনি তো—'

জমজমাট নেশা হয়েছে যতীনের। সগর্বে বুক ঠুকে সে পুলকেশকে শোনায় ব্যবসাতে তার কেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অল্পদিনে কি ভাবে সে ফেঁপে উঠবে, অন্য লোকেরা কি ভুল করে আর সে কি ভুল করবে না, এমনি সব বড় বড় কথা। জীবনে অসামান্য সাফল্য লাভের অহংকারেই সে যেন সিধে হয়ে বসে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

পুলকেশ তার দিকে চেয়ে থাকে।

আধুনিক ডিজাইনের জড়োয়া গহনায়
"নভেলটীই" অগ্রগণ্য
ইহাই একমাত্র
নির্ভরযোগ্য বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান
নভেলটী জুয়েলারী
১৬০/১, বহু বাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—ফোন—বি-বি-১২৫৩

র‍্যাবিশ

—"মিয়াভাই"—

★

দর্শক এবং লেখক হিসাবে 'মিয়াভাই'র স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার আছে। রূপ-মঞ্চ কোন দর্শকেরই ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু কোন বিশেষ বিশেষ পত্রিকা নিজেদের মতবাদকে অর্থের লোভে বিকিয়ে দিলেও—এমন অনেকে আছেন যাঁদের আদর্শ কোন প্রলোভনই ম্লান করতে পারেনি, অদূর ভবিষ্যতেও পারবে না—অন্তত রূপ-মঞ্চের এই স্পর্ধা নেহাৎ অহেতুক নয়

★

রূপমঞ্চের সম্পাদক মহাশয় আমাকে ছায়াছিত্র সম্বন্ধে কিছু লিখবার জন্য হুকুম দিয়েছেন। একজন সাধারণ দর্শক হিসাবে ভারতীয় ছায়াচিত্র সম্বন্ধে আমার মতামত জানাতে হবে। কিন্তু ছায়াচিত্র দর্শক হিসাবে আমার স্থান কোথায় প্রথমে সেটা জানান দরকার কেননা তারই ওপর আমার মতামতের দাম নির্ভর করছে। কণ্ট্রোলের অপিসে চাকুরি করি, ফলে আইন বিরুদ্ধ যা কিছু পাই সব ধরে সিনেমা কর্তৃপক্ষদের একটু হায়রান করি তাতেই তাঁরা খুশি (?) হয়ে মাঝে মাঝে বায়স্কোপের পাশ দিয়ে থাকেন। ইদানিং কোলকাতায় যতগুলি দেশী ছবি এসেছে প্রায় সবগুলি বিনাপয়সায় দেখেছি, ফলে আমার চশমার লেন্স ইতিমধ্যে দুবার বদলাতে হয়েছে এবং আজকাল সিনেমা হলের মধ্যে ঢুকলেই মাথা ধরে। নেহাৎ কর্তৃপক্ষরা অসন্তুষ্ট হবেন তাই নতুন ছবি এলেই একবার কষ্ট স্বীকার করে দেখে আসতে হয় (!)। নচেৎ দেশী ছবি দেখতে আমার আদৌ ইচ্ছা হয় না। অথচ তাজ্জব বনে যাই, যখন দেখি প্রত্যেকটি প্রেক্ষাগৃহেই প্রতিদিনই সমানে ভীড় লেগে আছে। লোকে গাঁটের পয়সা খরচ করে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করে কেন যে এই সব র‍্যাবিশ দেখে অর্থ, সময় ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে তা ভেবে পাই না যাঁরা কষ্ট করে এই লেখা পড়ছেন তাঁরা হয়ত আমার মতামতের বহর দেখে আর এগুতে সাহস করবেন না, হয়ত বা এ অধমের ধৃষ্টতা দেখে একটু তটস্থ হচ্ছেন। কিন্তু যা র‍্যাবিশ তাকে আলবৎ র‍্যাবিশ বলব। আমার আবার ভয়টা কি মশাই? তবে হ্যাঁ ভাবনার কথা সম্পাদক মশায়ের; তিনি হয়ত বড় জোর ব'লবেন "দরকার নেই বাপু তোমার আর এই সব প্রবন্ধ লিখে, ভ্যালা লোককে লেখা দিতে বলেচি।"

এই প্রসংগে আমার নিজের একটা মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ না করে পারলুম না। কিছুকাল আগে ছায়াচিত্র সম্বন্ধীয় একটা অখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনার ভার আমি পাই। কয়েক সংখ্যায় আমার সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হবার পর পত্রিকার মালিক একদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে বল্লেন "কোরছেন কি মশাই, এমনি ধারা লিখলে দুদিনেই লালবাতি জ্বালতে হবে যে। একটা বিজ্ঞাপনও আসে না, যাও বা এসেছিল আপনার ঐ লেখার চটকে বাতিল হয়ে গেছে। এমন কি একটা কমপ্লিমেণ্টারী পাশ পর্যন্ত কেউ দিতে চায় না, হায় হায়।" আমি রীতিমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। সম্পাদকের মতের সংগে বিজ্ঞাপন আর কমপ্লিমেণ্টারী পাশের সম্বন্ধটা যে কোনখানে সেটা ঠাহর করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। পত্রিকার মালিক সোজা কথায় বুঝিয়ে দিলেন "সমালোচনা করতে বসে সব ফিল্মের গলদ দেখিয়ে দিলে চলবে কেন? যারা বিজ্ঞাপন টিজ্ঞাপন দিচ্ছে তাদের বই নিয়ে একটু ভাল করে লেখ আর যারা দেয় না তাদের ঠেসে গালাগালি দাও কেউ কিছু বলতে আসবে না।'' চমৎকার যুক্তি! সম্পাদকের মত যে, এই উপায়ে কিনতে পাওয়া যায় সেটা সেদিনই বুঝতে পারলুম। (হয়ত আমার বুঝতে একটু সময় লেগেছে।) তারপর লক্ষ্য করে দেখেছি বাংলার একাধারে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমালোচক ও সাংবাদিকের মুখ সামান্য বিজ্ঞাপন দিয়েই বন্ধ করে দেওয়া গেছে, ফিল্মজার্ণাল ত অতি তুচ্ছ। আর্টের প্রতি সত্যিকারের দরদ কটা সমালোচকের আছে? বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলে যিনি বা যাঁরা পরিচিত তাঁরাও সুবিধা-

ধাঁদী, আজ এক কথা বলচে, কাল শুনবেন অন্য সুর। আর্টের কোথাও গলদ থেকে যাচ্ছে, কি করে ছোট-খাট দোষ ত্রুটির হাত থেকে আমাদের ছায়াচিত্র শিল্পকে মুক্ত করা যায় তা নিয়ে কটা সমালোচক মাথা ঘামায়? টাকা, বিজ্ঞাপন আর কমপ্লীমেণ্টারী পাশের ওপরই আমাদের দেশের ফিল্মজর্নালিষ্টদের নজর। ফিল্মকর্তৃপক্ষরাও এই তথাকথিত সমালোচকদের হাত করবার কায়দা ভাল ভাবেই জানেন। চলচ্চিত্র দর্শকদেরই বা কি দোষ, তারা আর্টের কতখানি বোঝে? তাদের রুচি পরিবর্তন করবার পথ ত ফিল্মব্যবসায়ী আর তাদের পেটোয়া মুখপত্রগুলা ঘেরে রেখেচে। ফিল্মকর্তৃপক্ষরা আমাদের দেশের সিনেমা পত্রিকাওয়ালাদের ও সমালোচকদের যে থোড়াই কদর করেন এটা অস্বীকার করবার মত সাহস আজ কারও আছে বলে মনে হয় না। কোথায় বিজ্ঞাপন, কি সমালোচনা ছাপাবার জন্য ফিল্মপ্রডিউসার এবং ডিষ্ট্রিবিউটাররা পত্রিকা কর্তৃপক্ষদের স্মরণাপন্ন হবেন তা না ক'রে পত্রিকা সম্পাদকরাই এই সব ফার্মের দ্বারস্থ হয়ে দিনের পর দিন ধন্না দিচ্ছেন, মুষ্টি ভিক্ষার স্বরে, যদি 'প্রভুরা' প্রসন্ন হয়ে 'ফুল পেজ' না হোক, 'হাফ পেজ' নিদেন 'কোয়র্টার পেজ' বিজ্ঞাপন দিয়ে দেন। চুলোয় যাক্‌গে ফিল্মজার্নালের কথা, ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে বসেছি।

আমাদের দেশী ফিল্ম সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে গেলেই আবার 'রাবিশ' শব্দটি উল্লেখ করতে হবে। নারকোলের যেমন শাঁস, মালা ছোবড়া সবই ভাল তেমনি আমাদের দেশের কথাচিত্রগুলির প্লট থেকে ডায়ালগ, ডিরেকসন, প্রোডাকসন সবই জঘন্য। প্রথমেই ধরা যাক্ বাংলা ছায়াচিত্রের কথা—এক ঘেয়ে প্লট, হুট বলতেই প্রেম, সামাজিক ছবিতে গেরস্ত মেয়েদের বেহায়াপনা যা বাঙ্গালী মেয়েদের ওপর একটা অযথা কলঙ্কের ছাপ বসিয়ে যাচ্ছে। চিত্র তারকাদের সেই এক মুখ এক বেশ, এক ঢং বৈচিত্র শুধু দেখি যারা কোথাও পিতা কন্যা রূপে দেখা দিচ্ছেন, তারাই আবার স্বামী স্ত্রী রূপে অথবা ভাইবোন রূপে অন্যত্র হাজির হোচ্ছেন। তারপর গান, যখন তখন যেখানে সেখানে গাইলেই হল তা সে বেমানান হোক আর খাপছাড়াই হোক। ছবির মধ্যে আরও মজার ব্যাপার চোখে পড়ে, যেমন কোথাও একটা হাসির ব্যাপার হচ্ছে, কি হাসির গান হচ্ছে, চারিদিকে দর্শকের ভীড় কিন্তু দর্শকের কারও মুখে একটুও হাসি নেই, হয়ত কোথাও দারুণ বেগে মটর ছুটছে কিন্তু চালক এবং পাশের লেকের গায়ের কাপড় একটুও নড়ছে না। ট্রেনের ভেতরের দৃশ্য দেখলেই বোঝা যায় ফিল্ম তোলার কেরামতি। পাড়াগাঁয়ে গরীবের মেয়ে রান্নাঘরে চা তৈরি করছেন—কায়দা দোরস্ত চায়ের সেট নিয়ে এবং পরণে জর্জেট সাড়ী, গায়ে এক গা গহনা। এমনি হাজার রকম টেকনিকেল গলদ সাদা চোখেই ধরা পড়ে। হিন্দি ছবিগুলি যদি বা বাংলা ছবির চাইতে একটু পদে আছে তবু সেও আজকাল এক ঘেয়ে হয়ে পড়েছে বিশেষ করে তার প্লট এবং গানগুলি। অথচ একটা বিলাতি ছবি দেখে আসুন; কোনখানে খুঁতটি পাবেন না। একঘেয়েমি, ন্যাকামি অথবা ছ্যাবলামির বালাই নেই। একখানা ছবি দেখে ষোল আনা তৃপ্তি পাবেন। তারপর বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন দর্শকের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ছবি আছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি সাগর পারের ছবিগুলির দান। আর সে যায়গায় আমাদের দেশের ছবি উন্নতির অপরিসীম কথা চুলোয় যাক্, করে আসছে দেশের ও সমাজের অশেষ ক্ষতি। আমি যতই দেশী ছবি নিয়ে সমালোচনা করি না কেন তার মধ্যে নতুনত্ব কোথাও নেই। সবই পুরাণ কথা। আমাদের গলদ কোনখানটায় তা আমরা ভাল রকমই জানি কিন্তু শোনে কে? প্রডিউসাররা কেবল ব্যবসার দিকটা নিয়েই মাথা ঘামান; শিল্প জাহান্নামে যাক্। বিদ্যার্থী এবং কিশোরদের উপযোগী ছবি তুললে তেমন টাকা আসবে না অথচ ঠুনকো প্রেমের ন্যাকামি আর ইতরুমি দেখতে ছেলে বুড়ো সবই ভালোবাসে। তাই আবার বলছি আমাদের দেশের ছবি স্রেফ রাবিশ আর আমরা হতভাগ্য দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাঙ্গালী সেই রাবিশের ডাষ্টবিন থেকেই একটু আনন্দের খোরাক খুঁজে বেড়াই।

'জাতির কৃষ্টি ও শিক্ষার প্রধান বাহন রূপে আজ চলচ্চিত্রশিল্পকে নিয়োজিত করতে হবে। তা যদি না পারি, চিত্র ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমাদের এতদিনের সাধনা হবে ব্যর্থ—আমাদের ভিত্তি পড়বে খসে—আসন উঠবে নড়ে।'

শ্রীপার্থিবের সংগে আলোচনায় শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত

সেদিন ছিল শুক্রবার। বেলা ১১টা তখন অবধিও বাজেনি। ট্রামকর্মীদের ধর্মঘট—অনেকটা পথ হেটে হন্তদন্ত অবস্থায় ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীটে যেয়ে হাজির হলাম। চিত্র পরিবেশনা থেকে আরম্ভ করে প্রযোজনা, প্রদর্শনা চিত্র শিল্পের সর্বপ্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় এই সাতাশী নম্বরের বাড়ী। অভিজ্ঞ, প্রবীণ, এবং খ্যাতনামা—এই তিনটী বিশেষণ এক সংগে যাঁর নামের পেছনে জুড়ে দিলে মোটেই অতিশয়োক্তি করা হবে না—বাংলা চিত্র-জগতের শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়—সেই লোকটীর সংগে চিত্র ব্যবসায় সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা করবার দিন ছিল ঐ শুক্রবার। এম, পি প্রডাকসন্সের প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দবাবু) বার বার হাতুড়ীর আঘাত মেরে আমায় শুনিয়ে দিয়েছিলেন, '১১টার আগে আসবেন নইলে ভীড়ের জ্বালায় কথা বলতে পারবেন না।' ১১টার বহু পূর্বেই আমি যেয়ে হাজির—কিন্তু "কা কস্য পরিবেদনা?" তখন অবধি অফিসের অর্গলই খোলেনি। যাই হউক, একটু যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। এতবড় একজন চিত্র ব্যবসায়ীর সংগে আলাপ আলোচনা করতে হবে—কী নিয়ে করবো—শারদীয়া সংখ্যার চাপে যে কিছুই স্থির করে আসতে পারিনি। তাই কিছুটা সময় পেয়ে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লুম। আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলি মনে মনে তরজমা করে নিলাম। লোকজন এলো, কিন্তু তাদের কথা শুনে যে এবার মুসড়ে পড়লাম। জানি মেঁকী জিনিষকে সাচ্চা বলে চালানোই প্রচার সচিবের কাজ—কিন্তু তাই বলে ঐ আসনে বসলে সাচ্চা কথা বলবার অভ্যাসও কী মানুষের বদলে যায় নাকী? আমাদের নন্দবাবুও তারই পরিচয় দিলেন। শুনলুম ১১টায় মুরলীবাবু আসবেন। বয়স্ক লোক—পথের ক্লান্তি দূর করতে বিশ্রামের জন্য যাবে অন্ততঃ এক ঘণ্টা। অথচ নন্দবাবু আমাকে সময় দিয়েছেন ১১টার পূর্বে। ভাগ্য সেদিন নেহাৎ ভালই ছিল—তারপর নন্দবাবুও বোধহয় ভুল করে সেদিন সত্যকথা বলে ফেলেছিলেন। গাড়ীর আওয়াজের সংগে সংগে সচকিত হ'য়ে উঠলাম। কাটায় কাটায় এগরটায়ই আমার ডাক পড়লো। শংকিত পদক্ষেপে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসলাম। বিপরীত দিকে মুরলী বাবু। এসেই কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। ধুক ধুক করে বুকটা আমার কাঁপছিল—এতবড় একজন চিত্র ব্যবসায়ী আর তাঁর কাছে আমি একজন নগণ্য সাংবাদিক। স্তুপীকৃত কাজগুলি সরিয়ে রেখে আমার প্রশ্নের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। জড়তা কাটিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "চিত্রজগতের প্রতি আকৃষ্ট হলেন কী করে? চিত্রজগতে আপনার আগমন কী আকস্মিক?" আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বলে যেতে লাগলেন, "পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ। নিছক চাকরী করতেই ঢুকলাম ম্যাডান কোম্পানীতে। কলম পিশে কর্তব্য শেষ করলাম, মনে করেই আমি ক্ষান্ত হতাম না। এই শিল্পের রঙ্গীন ভবিষ্যৎ আমায় হাতছানি দিত। ম্যাডানের মত নিজস্ব একটী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আমি স্বপ্ন দেখতাম। তাই চিত্র ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রতিটি কাজ আমি লক্ষ্য করতাম। কোনভাবে কোনকাজটী করা হচ্ছে—কার কোনখানে কোন গলদ থেকে যাচ্ছে, আমি তা নিজের মনে বিনিয়ে বিনিয়ে দেখতাম। চিত্র ব্যবসায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতার যখন একটা ক্ষীণরেখা আমার মনে রেখাপাত করলো—১৯৩২ খৃঃ আমি রীতেন এণ্ড কোং এই চিত্র-পরিবেশক প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা করলাম। পরিবেশনা

ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে নানা বাধাবিপত্তি এসে দাঁড়ালো—১৯৩৬ খৃঃ Exhibitors' Syndicate Ltd. নামে যৌথ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে প্রদর্শনা ক্ষেত্রে পা বাড়ালুম। চিত্রশিল্প তার নানান রূপ নিয়ে আমায় আকৃষ্ট করলো—প্রযোজনা ক্ষেত্রটা আর তাই অকর্ষিত রাখলাম না। ১৯৩৭ খৃঃ 'তরুবালা' চিত্রখানি প্রথম চিত্র প্রযোজনা ক্ষেত্রে আমায় টেনে নেয়। এই চিত্রখানি যদিও পপুলার পিকচার্সের প্রযোজনায় গৃহীত হয়—তবু বলতে গেলে—তরুবালা চিত্রের প্রযোজক আমিই, কারণ চিত্রখানির সর্বসত্ত আমি ক্রয় করি। এর পর কমলা টকীজের প্রতিষ্ঠা করে রাজগী, স্বামী-স্ত্রী, রাজকুমারের নির্বাসন চিত্র প্রস্তুত করি। যুদ্ধের দামামা তখন বেজে উঠেছে। নানা কার্যগতিকে কমলা টকীজের কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হই। ১৯৪০ খৃঃ এম, পি প্রডাকসন্স এর প্রতিষ্ঠা করি। ঠিক ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভংগীতে এতদিন আত্ম-নিয়োগ করলেও—আমার ব্যবসায় জীবনের কৃতকার্যতা আজ চিত্র-শিল্পের শিল্পগত উৎকর্ষের দিকে নিবদ্ধ। এই দীর্ঘ দিন ব্যবসায়ীরূপে চিত্র জগতে আত্মনিয়োগকরে আমি বুঝতে পেরেছি—এর শিল্পের দিককে অবমাননা করলে চলবে না। জাতির কৃষ্টি ও শিক্ষার প্রধান বাহন রূপে আজ চলচ্চিত্রশিল্পকে নিয়েজিত করতে হবে। তা যদি আমরা না করতে পারি—আমাদের এত দিনের সাধনা দিয়ে দেশ এবং জাতির কোন উপকারই করতে পারবো না। আমাদের ভিত্তি পড়বে খসে, আসন উঠবে নড়ে।” এই কথা গুলি বলতে বলতে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় উত্তেজিত হয়ে পড়েন—আমিও অভিভূত হয়ে পড়ি অনেকটা। চিত্রশিল্পের একজন প্রবীণ—এবং অভিজ্ঞ কর্ণধারের কাছ থেকে এই আশার বাণী চিত্রশিল্পের উন্নতকামী একজন সাংবাদিকের মনে যে আনন্দের সৃষ্টি করবে—সে আর বেশী কথা কী! তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম—“শিক্ষামূলক চিত্র গ্রহণের

প্রয়োজনীয়তা আপনি কি উপলব্ধি করেন?—এই বিরাট জনশক্তিকে অজ্ঞানতার মাঝ থেকে তুলে নেবার শক্তি কী ছায়াছবির আছে?" শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় জোড়ের সংগে বল্লেন, "নিশ্চয়ই। শিক্ষামূলক চিত্রের প্রয়োজনীয়তাও যেমনি আমি উপলব্ধি করি, তেমনি দেশের এই বিরাট জনশক্তিকে অজ্ঞতার হাত থেকে রক্ষা করবার শক্তি চলচ্চিত্রের আছে। ইতিহাস, ভূগোল, এবং বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রভূত সাহায্য করতে পারে চলচ্চিত্র। দশখানা বই পড়ে যে জ্ঞান অর্জন করতে ছাত্রদের যে সময় লাগবে, তার খুব অল্প সময়ের ভিতরই একখানা চলচ্চিত্র দেখে তারা সে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। এমন কি যারা নিরক্ষর—তাদের দর্শনীয় বস্তুর সাহায্যে অতি সহজেই শিক্ষনীয় জটিল বিষয়ের সংগে পরিচিত করিয়ে দেওয়া যায় চলচ্চিত্রের সাহায্যে। আমাদের গরীব দেশ, তাই অনেক কিছুই সম্ভব হ'লেও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে যেখানে বৈদেশিক সরকার এবং যে সরকারের কোন প্রকার সহানুভূতির আশা করা দুরাশা মাত্র। যেমন মনে করুন, প্রত্যেকটী স্কুলে যদি একটী করে প্রজেকসন মেসিন থাকে—এবং এমন একটী প্রতিষ্ঠান থাকে—state control ছাড়া যা এক রকম অসম্ভব—যারা শুধু শিক্ষামূলক চিত্র নির্মাণ করবেন—এবং বিনি পয়সায় ঐ স্কুল কলেজে প্রদর্শন করবার জন্য বিলি করা হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে 'who is to bell the cat' ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন কোন প্রতিষ্ঠানই এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না। এক যদি এমন কোন উদার মনোভাব সম্পন্ন প্রযোজক থাকেন—যিনি অন্ততঃ ৩ খানা চিত্র গ্রহণ করবেন লাভের দিকে বিচার করে. একখানা গ্রহণ করবেন—শিক্ষার দিক দৃষ্টি রেখে। কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠবে ঐ ছবির প্রদর্শন নিয়ে। শুধু সহরে দেখালেইত চলবে না। যাদের জন্য ছবি গ্রহণ করা—তাদেরই যদি না দেখানো হলো তবে সে ছবির সার্থকতা কোথায়? তাই যদি প্রত্যেক স্কুলে স্কুলে একটী করে প্রদর্শন্ যন্ত্র থাকে তবে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু যে দেশের স্কুল শিক্ষকদের সামান্য বেতনই দিয়ে উঠতে পারে না, সেখানে একটী

শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

করে প্রদর্শন যন্ত্র ক্রয় করা তাদের পক্ষে কল্পনার বাইরে। একমাত্র State control দ্বারাই এই কার্য সাধিত হতে পারে। আমাদের দেশের মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী চিত্রে রূপ দিয়ে—তাঁদের আদর্শ প্রচার করা—এবং সেই আদর্শে ছোটদের উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্বও শিক্ষামূলক চিত্র গ্রহণ করতে পারে। সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন এ বিষয়ে প্রভূত উন্নতির পরিচয় দিয়েছে এবং ছোটদের শিক্ষামূলক চিত্র গ্রহণে সোভিয়েট রাশিয়া সম্ভবতঃ এদের সকলের চেয়ে বেশী প্রশংসা পাবার যোগ্য।"

যুদ্ধোত্তর কালে বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চিত্রের কথা উল্লেখ করলে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সমগ্র ভারতের চিত্রব্যবসায়ীরা যদি একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে সচেতন না হন—তবে ভারতীয় চিত্রের যে দুর্দিন দেখা দেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।" Twentieth Century Fox এবং আরো অপরাপর চিত্র প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক ধনীদের নাম উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এরা শুধু চিত্র প্রদর্শন করেই খান্ত হবে না—যুদ্ধোত্তর কালে—ভারতে ষ্টুডিও নির্মাণ

করে—ভারতীয় ভাষায় চিত্র গ্রহণ করে ভারতীয় ব্যবসার ক্ষেত্র করতলগত করবার ইচ্ছাও এদের আছে। যে পরিমাণ অর্থ নিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে এরা অগ্রসর হবে—তাকে বাধা দিতে হলে—কোন ব্যক্তি-গত প্রযোজকের অর্থ ফুৎকারে উড়ে যাবে। এজন্য সুপরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ ভাবে প্রচুর অর্থ নিয়ে ভারতীয় প্রযোজকদের তৈরী হয়ে থাকতে হবে। এ বিষয়ে ভারত সরকারকেও অবশ্য B. M. P. P A থেকে লেখা হয়েছে—যাতে ভারতীয় বাজারে কোন বৈদেশিক প্রতি-ষ্ঠানকে চিত্র ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার সুযোগ দেওয়া না হয়। অবশ্য সরকারের উপর নির্ভর করা চলে না।" এ বিষয়ে বাংলার প্রযোজকেরা কোন পন্থা অবলম্বন করছেন কিনা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "প্রত্যেক বাঙ্গালী প্রযোজকের দ্বারস্থ আমরা হয়েছি—আমাদের প্রস্তাব অনেকের কাছ থেকে প্রত্যা-খ্যাত হয়ে এসেছে। তবে কয়েকজন বাঙ্গালী এবং কয়েক-জন অবাঙ্গালী (অবশ্য ভারতীয়) ধনীদের সম্মতি পেয়ে আমরা এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান গড়ে সে পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করছি। অবশ্য প্রথম প্রথম

বিদেশ থেকে 'আমাদের সাজ-সরঞ্জামও আনতে হবে এবং বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ ও রাখতে হবে। তবে যতদিন দেশীয় বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে না পারা যায় ততদিন পর্যন্তই বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ বাধ্য হয়ে রাখতে হবে।"

বাংলা ও হিন্দি ছবির তুলনায় বাংলা ছবির উৎকর্ষতার পক্ষেই শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় রায় দেন। কাহিনী, অভিনয়, পরিচালনা—চিত্রের বিভিন্ন—অংগের ভিতর গল্পকেই শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় ছবির প্রাণ বলে উল্লেখ করেন। "তিনি বলেন,ঝরঝরে কাহিনীই একখানি ছবিকে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করে অনেকাংশে।" দেশীয় পরিচালকদের কথা উল্লেখ করলে শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচয় পাই। এবং শৈলজানন্দ সম্পর্কেও তাঁর উচ্চ ধারণা—আমার কাছে অপ্রকাশ রয়নি। শৈলজানন্দের কথা উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অবশ্য অভিনয় নয় এর কথা বাদ দিয়ে বলছি। পর পর এতগুলি ছবিতে কৃতকার্যতা অর্জন করা অন্য কোন পরিচালকের ভাগ্যেই সম্ভব হয়নি। সাধারণ ভাবে গল্পটাকে বলে যাবার চতুরতা শৈলজানন্দের ভিতর অভাব হয়নি।" অভিনেত্রীদের কথা উল্লেখ করলে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় "চন্দ্রাবতী এবং মলিনার কথা বলতে যেয়ে বলেন, চন্দ্রাবতীর অভিনয় প্রতিভার প্রশংসা করতেই হবে। সাত নম্বর বাড়ীতে একটি বুড়ির ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখে মলিনার উপর আমি খুশী হয়েছি অনেকটা।" আমাদের আলোচনা প্রায় বারোটা অবধি চলে। বাইরে আগন্তুকদের ভিড় বাড়ে। যতক্ষণ আলোচনা চলে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় আমার প্রত্যেকটী প্রশ্নের উত্তর ধীর ভাবে, আগ্রহ ভরে দেন। বাইরে থেকে এই প্রবীণ চিত্র ব্যবসায়ী সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করছিলাম—তাঁর সান্নিধ্যে এসে চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর দরদী মনের পরিচয় পেয়ে, দেশীয় চিত্রশিল্পের ব্যবসায় এবং শিল্পগত উন্নতির জন্য তাঁর কল্পনা বিলাসী মনের প্রশংসা না করে পারবো না। উঠে আসবার সময় রূপ-মঞ্চের কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি হেসে জবাব দিলেন,—"রূপ-মঞ্চ সময় মত না পেলে আমার অফিসে খোঁজ করে সংগ্রহ করে পড়ি—রূপ-মঞ্চের প্রতি আমার অনুরাগের কথা এর চেয়ে আর বেশী কিছু বলতে পারি না।" এর চেয়ে বেশী কিছু আমাদের আশা করবার নেই—হাসি মুখে একথা শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়কে বলে আমি বিদায় নিলাম।

শ্রীপার্থিব।

চিত্র-সংবাদ ও নানাকথা

——দীনেশ রায় চৌধুরী——

এম, পি প্রডাকসন্স

সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় এম, পি প্রডাকসন্সের বর্তমান চিত্র 'সাতনম্বরবাড়ী' দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। কালীঘাট অঞ্চলে এদের কর্তৃত্বাধীনে যে প্রেক্ষাগৃহটী গড়ে উঠছে—তার উদ্বোধন করা হবে 'সাত নম্বর বাড়ী' দিয়ে এরূপ গুজব শুনতে পাচ্ছি। অবশ্য উত্তর কলিকাতার অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহেও একযোগে এর মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

'সাতনম্বর বাড়ী'কে একখানি সাফল্য মণ্ডিত চিত্র করে তুলতে প্রযোজক যেমনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন—তেমনি পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তও। দুইটী বিশেষ চরিত্রে বিশেষ রূপ-সজ্জায় বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায় এবং খ্যাতনামা অভিনেত্রী মলিনা দেবী দর্শক সাধারণকে অভিবাদন জানাবেন।

সাতনম্বর বাড়ীর প্রাণ হচ্ছে সংগীত। তাই এই চিত্রের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করছে সুরশিল্পী রবীন চট্টোপাধ্যায়ের ওপর। ছায়াচিত্রের সংগীতের চিরগতানুগতিক মোড় ফেরাতে নবীন সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় কতগুলি বিষয় পরীক্ষামূলকভাবে দর্শকসাধারণের কাছে উপস্থিত করবেন বলে শুনতে পাচ্ছি। আশা করি এই পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ ক'রে তিনি দর্শকসাধারণের ধন্যবাদলাভে সমর্থ হবেন।

তুমি আর আমি

এম, পি প্রডাকসন্সের পরবর্তী বাংলা চিত্রের পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন সন্ধি-খ্যাত পরিচালক শ্রীযুক্ত অপূর্ব মিত্র। 'তুমি আর আমি'র কাহিনী লিখেছেন খ্যাতনামা গীতিকার শ্রীযুক্ত শৈলেন রায়। এর প্রধানাংশে অভিনয় করবেন সম্ভবতঃ কানন দেবী। অবশ্য 'তুমি আর আমি'র পরিকল্পনা—এখন অবধি কাগজ কলমের ভিতরই সীমাবদ্ধ আছে। তাই—অনেক কিছু ওলোট পালোট হবার যখন সম্ভাবনা তখন সে সম্বন্ধে আমাদের এই সংবাদ ও ওলোট পালট হ'তে পারে।

এসোসিয়েটেড পিকচার্স লিঃ

নবনির্মিত প্রযোজক প্রতিষ্ঠান এসোসিয়েটেড পিকচার্স লিঃ এর প্রথম চিত্র আমিরী (হিন্দি) বস্তী জীবনের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে। কাহিনীটী লিখেছেন বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন প্রথিতযশা প্রয়োগ শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন, বড়ুয়া, অহীন্দ্র চৌধুরী, রঞ্জিৎ রায়, শ্যাম লাহা, যমুনা, মায়া ব্যানার্জি, মলিনা, রমলা, রাজলক্ষ্মী এবং আরো অনেকে। সুর সংযোজনার ভার নিয়েছেন শ্রীযুক্ত দক্ষিণা ঠাকুর। চিত্রখানিকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে প্রযোজক যেমনি অকৃপণ হস্তে অর্থ বয়ে করছেন তেমনি শ্রীযুক্ত বড়ুয়াও চেষ্টার কোন ত্রুটি করছেন না। পূজার পর কোন বিশিষ্ট চিত্রগৃহে 'আমিরী' মুক্তি লাভ করবে। 'আমিরী'র বাংলা রূপ দেবার অনুমতিও কর্তৃপক্ষ পেয়েছেন। পরিচালনা নৈপুণ্যে, অভিনয় মাধুর্যে, সংগীত মূর্ছনায় মর্মস্পর্শী কাহিনীটী শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক তাই আমরা কামনা করি।

শ্রীযুক্ত নেপাল দত্ত ও শ্রীযুক্ত সরোজ কুমার মজুমদার—এই দুইজন আদর্শবাদী শিক্ষিত তরুণ যুবক এসোসিয়েটেড পিকচার্স লিঃ এর পরিচালনার পুরোভাগে রয়েছেন। বাংলা ছায়া চিত্রের উন্নতির আশা নিয়েই এদের আত্মনিয়োগ—বাংলার অর্থ ও শ্রমে—চিত্রশিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে এদের পরিকল্পনা বাস্তবের রূপ লাভ করুক—যে কোন বাঙ্গালী চিত্রামোদীই তাই কামনা করবেন।

চিত্রভারতী

শ্রীযুক্তা প্রতিভা শাসমল প্রযোজিত চিত্রভারতীর আগামী বাংলা চিত্র 'সৌভাগ্যবতীর' পরিচালনা করবেন প্রযোজক নিজে। প্রযোজনাক্ষেত্রে শ্রীযুক্তা শাসমল যেমনি বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন— পরিচালনা ক্ষেত্রেও যে সে শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হবেন সে বিশ্বাস নিশ্চয়ই তাঁর আছে, নইলে এই গুরু দায়িত্ব—মাথাপেতে গ্রহণ করতেন না।

নিউথিয়েটার্স লিঃ

নিউথিয়েটার্সের বাংলা চিত্র 'দুই পুরুষ' স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। দুইপুরুষ সম্পর্কে ভাদ্র সংখ্যায় আমাদের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'মাই-সিসটার' হিন্দি চিত্রখানি নিউসিনেমায় মুক্তি প্রতীক্ষায়। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র। কাহিনী লিখেছেন শ্রীযুক্ত বিনয় চট্টোপাধ্যায়। এদের 'উদয়ের পথে'র হিন্দি চিত্ররূপ 'হামরাহী' বম্বে মুক্তি লাভ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এবং অভিনেতৃ গোষ্ঠীর ভিতর সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন নাকি শ্রীযুক্তা বিনতা বসু। আর অখ্যাতির ভাগ পড়েছে শ্রীযুক্ত রাধা মোহনের ঘাড়ে।

নার্সসিসি, ওয়াশীয়াৎনামা, বিরাজ বৌ এই তিনখানি চিত্রও মুক্তি প্রতীক্ষায়।

ইউনিটি ফিল্ম এক্সচেঞ্জ

এদের পরিবেশনায় 'কলঙ্কিনী' বাংলাচিত্র মিনার, ছবিঘর ও বিজলী প্রেক্ষাগৃহে 'বন্দিতা'র পর মুক্তি লাভ করবে। কলঙ্কিনীর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন জহর, রেণুকা, অহীন্দ্র, ধীরাজ, পূর্ণিমা, সাবিত্রী প্রভৃতি। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত জ্যোতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর সংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত শচীনদেব বর্মন।

এদের প্রযোজনা বিভাগের অধীনে শ্রীযুক্ত রামেশ্বর শর্মার পরিচালনায় রাজমাতা ও কুরুক্ষেত্রের কাজ এগিয়ে চলেছে।

সাধনা বোস প্রডাকসন্স

ভারত বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী সাধনা বসু তার 'অজন্তা' চিত্রের চিত্র নাট্য শেষ করবার পর—কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে চিত্র নির্মাণ কার্য সুরু করবেন। বৌদ্ধ যুগের গৌরবময় ইতিহাসের পটভূমিকায় সাধনার বর্তমান চিত্রের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই চিত্রের প্রধান স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করবেন—শ্রীমতী সাধনা নিজে এবং তাঁর বিপরীত ভূমিকায় দেখা যাবে জনপ্রিয় প্রিয়দর্শন তরুণ নট সাহু মোদক কে। পোষাক পরিচ্ছদ—দৃশ্য সজ্জার নিখুঁত রূপ ফুটিয়ে তুলতে অজস্র অর্থব্যয় করা হচ্ছে। চিত্রজগতের

নৃত্যশিল্পী কুমারী কৃষ্ণা

যাদুকর চিত্রশিল্পী প্রহ্লাদ দত্ত—চিত্রখানি পরিচালনার ভার গ্রহণ করে চিত্রজগতে যে ঐন্দ্রজালের সৃষ্টি করবেন, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ পূর্বে থেকেই দৃঢ় ধারণা পোষণ করেন। সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করবেন খ্যাতনামা সুর শিল্পী তিমির বরণ। প্রযোজকদের তরফ থেকে অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বি, এল, খেমকা চিত্রখানিকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। নিউথিয়েটার্সের ভূতপূর্ব প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যাল চিত্রের প্রযোজনার ভার গ্রহণ করেছেন।

ভ্যারাইটী পিকচার্স

শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন বসু প্রযোজিত ভ্যারাইটী পিকচার্স পি, ডব্লুডি,র হিন্দি রূপ গ্রহণের অনুমতি পেয়েছেন।

চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত জ্যোতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর সংযোজনার ভার পড়েছে শ্রীযুক্ত সুবল দাশগুপ্তের উপর। গুজব শ্রীমতী ভারতী এর বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

ইষ্টার্ণ টকীজ

শ্রীযুক্ত সুরেন সরকার প্রযোজিত ইষ্টার্ণ টকীজএর পরিবেশনায় শৈলজানন্দ পরিচালিত মতিমহল পিকচার্সের পৌরাণিক চিত্র 'শ্রীদুর্গা' রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। আগামী সংখ্যায় শ্রীদুর্গার মহিমা কীর্তন করবার ইচ্ছা আছে। এদের পরবর্তী বাংলা চিত্র নতুন বৌয়ের পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত: সরকার স্বয়ং। রূপমঞ্চ বলে চিত্র ও নাট্য সম্বলিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি পত্রিকা আছে—বাঙ্গালী প্রযোজক হ'য়ে ইষ্টার্ণ টকীজ অস্বীকার করলেও, চিত্র জগতের বাঙ্গালী প্রযোজককে অস্বীকার করবার হীন মনোবৃত্তি অন্ততঃ রূপমঞ্চের নেই এবং এই বালক সুলভ ন্যাকামী ভরা অজ্ঞতা থেকে রূপমঞ্চ মুক্ত। আমরা ইষ্টার্ণ টকীজের সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি—অবশ্য 'অভিনয় নয়' এর কথা বাদ দিয়ে।

এম্পায়ার টকী ডিসট্রিবিউটর্স লিঃ

নিউ সেঞ্চুরী প্রযোজিত শৈলজানন্দের মানে-না-মানা এদের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নিউ সেঞ্চুরীর পরবর্তী বাংলা চিত্র 'রায় চৌধুরী' শৈলজানন্দের পরিচালনায় গৃহীত হবে বলে প্রকাশ।

ম্যানসাটা ফিল্ম ডিসট্রিবিউটর্স

ম্যানসাটার পরিবেশনায় কয়েকখানি হিন্দি চিত্র মুক্তির প্রতীক্ষায় আছে। ভী শান্তারাম প্রযোজিত, পরিচালিত, অভিনীত ডাঃ কুটনীশ চিত্রখানির জন্য আমরা উৎসুক হয়ে আছি। আর্ট-ফিল্ম প্রযোজিত তকরার চিত্রখানিও সমাপ্ত হয়ে আছে। চিত্রখানির পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত হেমেন গুপ্ত এবং সুর সংযোজনা করেছেন খ্যাতনামা গায়ক ও সুর শিল্পী শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতি লাল)।

রূপশ্রী লিঃ

যশস্বী সাংবাদিক শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ (চন্দ্রশেখর)

> অভিনেত্রী মলিনা দেবী 'রূপ-মঞ্চ' রবীন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডারে ১০১ টাকা দান করিয়াছেন।

রূপশ্রীলিঃ এবং ব্যঙ্গ ভরা রঙ্গচিত্র 'মৌচাকে ঢিল' এর পরিচালনা সুষ্ঠুরূপে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সাংবাদিক রূপে শ্রীযুক্ত ভঞ্জ দর্শক সাধারনের যে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, পরিচালক জীবনে তা থেকে যে বঞ্চিত হবেন না সে বিশ্বাস আমাদের আছে। 'মৌচাকে ঢিল' এর কাহিনী লিখেছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী। রূপশ্রী লিঃ এর কর্ম সচিব শ্রীযুক্ত কেশব দত্ত বলেন, বাংলা ছায়া চিত্রের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 'মৌচাকে ঢিল' আত্মপ্রকাশ করবে। এই চিত্রে কয়েকটী নূতন মুখের সন্ধানও পাওয়া যাবে. শ্রীযুক্ত দত্তের সংগে ইতিপূর্বে আমাদের বাংলার ছায়াচিত্রের বিভিন্ন দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা হয়। ছোটদের উপযোগী চিত্র গ্রহণের পরিকল্পনা রূপশ্রীর রয়েছে বলে ওদিনকার আলোচনায় জানতে পারি।

চিত্রবাণী লিঃ

শৈলজানন্দের কাহিনী অবলম্বনে এদের বর্তমান বাংলা চিত্র 'এইতো জীবনের' পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত মানুসেন ও ধীরেশ ঘোষ। খ্যাত নামা চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত নীরেন লাহিড়ী 'এইতো জীবন' এর তত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেছেন।

এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্স লিঃ

নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত এদের বাংলা চিত্র 'ভাবী কাল' মুক্তি প্রতীক্ষায়। চিত্রখানির কাহিনী রচনা করেছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন চন্দ্রাবতী, রবি রায়, রবীন মজুমদার প্রভৃতি। এবং একটি নূতন মুখের সংগেও দর্শক সাধারনের পরিচয় হবে বলে প্রকাশ। এই নূতন মুখটী সম্ভবতঃ কুমারী কাননিকা চট্টোপাধ্যায়

শিপ্রা দেবী নামে ইনি দর্শক সাধারণকে অভিবাদন জানাবেন।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন

শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্রের পরিচালনায় অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের বাংলা চিত্র 'পথের সাথী'র কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।

গুহস ষ্টুডিও

শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস স্বরং সিদ্ধার চিত্ররূপের জন্য এরা তৈরী হচ্ছেন। গুহস ষ্টুডিওর স্বত্তাধিকারী প্রবীণ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত রবি গুহ ফিল্ম সিজন আইন উঠে যাবার পরই কাজে হস্তক্ষেপ করবেন। এই চিত্রে নূতনের আয়োজনই সর্বাগ্রে গৃহীত হবে বলে শ্রীযুক্ত গুহ আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তাই অভিনয়োপযোগী পুরুষ এবং মেয়েদের শ্রীযুক্ত সুরেশ সরকার ১৫৭ এ ধর্মতলা ষ্ট্রীটে আবেদন করবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ভবানীপুর রিক্রীয়েশন ক্লাব

মহাসপ্তমীর পুণ্য প্রভাতে ২৩ নং গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জির রোডে ক্লাবের পূজা প্রাঙ্গণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে বেতার শিল্পী বিমল ভূষণ, ইন্দুসাহা, কুমারী বাণী ঘোষ প্রভৃতি যোগদান করবেন। স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বাসন্তী ফিল্ম ডিসট্রিবিউটার্স

বাসন্তী ফিল্ম ডিসট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় 'ঘর' হিন্দি চিত্রখানি নব নির্মিত প্রেক্ষাগৃহ 'বাণী টকীজ' এ মুক্তি লাভ করবে। মেঘদূত, পয়ছান, স্বামীনাথ, সুবর্ণভূমি, সাথায়াৎ পানিহারী প্রভৃতি বহু হিন্দি চিত্র এদের পরিবেশনায় মুক্তি প্রতীক্ষা করছে। বাসন্তীর স্বত্তাধিকারী শ্রীযুক্ত কাপুর চাঁদ সি, সেট—বাসন্তীকে একটা প্রথম শ্রেণীর পরিবেশক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। চিত্রশিল্পে আমরা বাসন্তীর সাফল্য কামনা করি।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও

ইন্দ্রপুরী স্টুডিও প্রযোজিত জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত বঞ্চিতা বাংলা চিত্রখানি পূজাবকাশের পর স্থানীয় বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। জহর, রেণুকা, ধীরাজ, অহীন্দ্র, কেতকী প্রভৃতি এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছে।

ক্যালকাটা অলিম্পিক প্লেয়ার্স

এদের প্রযোজনায় সম্প্রতি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে 'সাজাহান' নাটক অভিনীত হয়ে প্রশংসা অর্জন করেছে। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' অভিনয়ের জন্য এরা তৈরী হচ্ছেন।

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্য-কলার সচিত্র মাসিক।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মুখপত্র।

কার্যালয়ঃ
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা।
ফোন: বি, বি,: ৪২৯২

প্রতি বাংলা মাসের ৩০শে রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রতি সংখ্যার: মূল্য আট আনা।

সডাক এক বছরের গ্রাহক মূল্য আট টাকা।

এক বছরের কম কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না।

নূতন লেখকদের উপযুক্ত রচনা রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হয়।

অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠাবার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি না।

—পৃষ্ঠপোষকতায়—

নিতাইচরণ সেন
এন. সি. ঘোষ
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
বিভূতি ভূষণ দত্ত
দীনেশ দত্ত
এস. কে. রায়
এইচ্ বোর্ড

রূপ-মঞ্চ

৫ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা : কার্তিক : ১৩৫২

আমাদের আজকের কথা—

গত বুধবার ৫ই অগ্রহায়ণ হ'তে শুক্রবার ৭ই অবধি কলকাতায় যে অশান্তির শিখা প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছিল—তাতে বহু মূল্যবান প্রাণ বিনষ্ট হ'য়েছে। শাসক সম্প্রদায়ের অবিমৃষ্যকারীতার ফলে যে সব নিরীহ শহীদবৃন্দ অকালে মৃত্যু বরণ করে নিলেন—কোন মূল্য দিয়েই তাঁদের সেই মহা-জীবন আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো না—তা জানি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসকের আমলাতান্ত্রিক হীন মনোবৃত্তির ফলে নিপীড়িত জনসাধারণের অন্তরে অন্তরে যে অসন্তোষের বহ্নি দিন দিন ধূমায়িত হ'য়ে উঠেছে—আর কতদিন এরূপ বুলেট চালিয়ে তারা সেই ধূমায়িত কুণ্ডলীকে প্রশোমিত করে রাখতে পারবেন? প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে যতটুকু আমরা জানি—কোন সময়েই শোভাযাত্রাকারী ছাত্র বন্ধুরা কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তির পরিচয় দেননি। আইন এবং নিয়মানুবর্তিতার দোহাই দিয়ে শাসক সম্প্রদায়ের এই নৃশংস অন্যায়ের তাই আমরা তীব্র প্রতিবাদ করে—বে-সরকারী কমিটির দ্বারা তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি বিধানের দাবী করছি।

আমরা শুনে খুশী হলুম, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষে যে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে—আমাদের চিত্র ও নাট্য-জগতের বন্ধুরাও সেই প্রতিবাদ ধ্বনির সংগে সুর না মিলিয়ে পারেননি। তাই স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গালয়গুলি প্রতিবাদ স্বরূপ অভিনয় বন্ধ রেখে আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হ'য়েছেন।

বাংলা তথা ভারতের যুব শক্তির প্রতীক ছাত্রবন্ধুদের অদমনীয় শক্তির জয় ঘোষণা করে আজ যাঁরা মৃত্যুকে বরণ করলেন—তাঁদের মৃত্যু শুধু [illegible] নয়, এই যুবশক্তির অম্লান ভবিষ্যতের নির্দেশ দিয়ে গেল—তাই সেই মহাপ্রাণ যুব বন্ধুদের আত্মার প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি—আর অভিনন্দন জানাচ্ছি—এই অদমনীয় যুব শক্তিকে। "যৌবন রে তোরে রুধিবে কে?" জয় হিন্দ।

বম্বে টকীজের প্রতিমা চিত্রে :—শ্রীমতী স্বর্ণলতা

স্বর্গত অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
ফটো : মোহন আর্ট ষ্টুডিওর
সৌজন্যে

পরলোকে অমল বন্দ্যোপাধ্যায়

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অমল বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রিয়দর্শন অভিনেতা—রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াপটের জনপ্রিয় অভিনেতা—অকালে ইহজগৎ ত্যাগ করে গেছেন - তাঁর মৃত্যুতে রঙ্গজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। যদিও তিনি অনেকদিন থেকেই অসুস্থ ছিলেন, তবুও তাঁর মৃত্যু খুবই আকস্মিক এবং আকস্মিক বলেই তার বেদনাও অত্যন্ত গভীর ও মর্মস্পর্শী।

আমার প্রতি অমলের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা-ভালবাসা আমাকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিল অনেকখানি। আমি তাঁকে ভালবাসতাম ছোট ভাইএর মত—তাঁর গুণ দেখলে প্রশংসা করেছি—অন্যায় দেখলে তাঁকে অভিভাবকের মত তীব্র ভৎর্সনা করেছি। তাঁর মৃত্যুতে আমি আমার আত্মীয়ের বিয়োগ দুঃখই অনুভব করছি।

আজ অমলের কথা বলতে গিয়ে আমার মনে পড়ে এক শীতের প্রায়-উত্তীর্ণ প্রভাতের কথা—আমার কলিকাতার বাসায় বন্ধুদের মজলিস্ তখন ভেঙ্গেছে, আমি উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় অমল প্রবেশ করলো আমার ঘরে! দু'একটি কথার পরেই তিনি বললেন—'আমায় থিয়েটারে ঢুকিয়ে দিতে হবে।' অমল বহরমপুরে (সেখানেই তাঁর বাড়ী) কোন অফিসে কিম্বা আদালতে কি একটা চাকুরী করতেন জানতাম। কিন্তু তাঁর কথায় আমি বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হ'লাম না, কারণ অভিনয়ের প্রতি তাঁর যে শুধু আকর্ষণ ছিল তাই নয়—সে বিষয়ে তাঁর কিছুটা দক্ষতাও তখনই হয়েছিল। অমলের প্রথম আবৃত্তি শুনি আমি বহরমপুরের গ্র্যান্ট হ'লে—সে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অন্যতম বিচারক ছিলাম আমি। —অমল সেদিন সর্বাধিক ভোট পেয়ে প্রথম পুরস্কার পায়। তারপর বহরমপুরে সে যে ক'বারই থিয়েটারে নেমেছে, সে কবারই প্রশংসা অর্জন করেছে এবং থিয়েটার ক'র বহরমপুরের মত জায়গায় প্রশংসা পাওয়া সহজ কথা নয় তা আমরা জানি। এ গুণটা অমল তাঁর বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর পিতা স্বর্গগত দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন এবং আমাদের কলেজের থিয়েটারের উৎসাহদাতা ও শিক্ষক হিসাবে অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন— তাঁর সংগে একই নাটকে অভিনয় করার সৌভাগ্য আমার অনেকবার হয়েছে। কাজেই ভাবলাম দীনুদার ছেলে যদি কলকাতার থিয়েটারে নাম করতে পারে—তাহলে আমাদের সকলেরই ত শ্লাঘার কথা হ'বে। কাশিম-বাজারের রাজ এষ্টেটের তৎকালীন চিফ্ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ কর—তখন বৈষয়িক সূত্রে নাট্যমন্দিরের সংগে কিছুটা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আমার সংগে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর তখন কিছুটা পরিচয় ছিল। যা হোক দুচার দিনের মধ্যেই প্রধানতঃ হরেন-বাবুর চেষ্টাতে অমল নাট্যমন্দিরে অভিনেতা হিসাবে প্রবেশাধিকার পেলেন। শিশির বাবুই তাঁর নাট্যজগতের গুরু। তিনি তাঁর যোগ্যতা আছে দেখেই—তাঁকে সুযোগ দিলেন এবং তাঁর প্রথম অভিনয় চন্দ্রগুপ্তের— চন্দ্রকেতু। অভিনয়ের পর দিন এসে অমল আমায় প্রণাম করে' গেল—সে কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে, তার কিছুদিন পরেই চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকাতেই অমল নামতেন। তারপর "রীতিমত নাটকে" "বসন্ত" এর ভূমিকায় অভিনয় করে খুব নাম কিনলেন। পরে নাট্য-মন্দির ছেড়ে অমল নাট্যনিকেতন, ষ্টার, মিনার্ভা ও রঙমহল, প্রভৃতি থিয়েটারে যোগদান ক'রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে মোটামুটি আমার যা' মনে আছে তা এই—

চন্দ্রকেতু	চন্দ্রগুপ্ত	নবনাট্যমন্দির
চন্দ্রগুপ্ত	„	„
বসন্ত	রীতিমত নাটক	„
শশী	পথের দাবী	নাট্যনিকেতন
সিরাজ	সিরাজোদ্দৌলা	নাট্যনিকেতন
খড়্গা সিং	রঞ্জিৎ সিং	ষ্টার
অনিরুদ্ধ	উষাহরণ	„
সুরথ	দেবীদুর্গা	মিনার্ভা

সতীশ	চরিত্রহীন	রঙমহল
অলক	মাটির ঘর	,,
বিনোদ	পোষ্যপুত্র	,,
জীবানন্দ	সন্তান	,,

(এই তাঁর শেষ অভিনয়)

অমল যে সুগায়ক ছিলেন একথা হয়ত অনেকে জানেন না। তিনি আমার দু'তিন খানি গান গ্রামোফোন কোংর "টুইন" রেকর্ডে দিয়েছিলেন—তখন অমল সবে মাত্র থিয়েটারে ঢুকেছেন। অমল আবৃত্তিও করতে পারতেন সুন্দর।

অমল সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন—তাঁকে প্রথম দেখি বোধ হয় "রাঙাবউ" এ—তা ছাড়া শ্রীদুর্গা, শকুন্তলা অভিনয় নয় প্রভৃতি ছায়াচিত্রে অভিনয় করে তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন।

অমল যে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তার প্রমান তিনি দিয়ে গেছেন —"পথের দাবী"র 'শশী'র ভূমিকা অভিনয় করে—। আমার মনে আছে, সে অভিনয়ের মধ্যে আমি তাঁর প্রতিভার বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখেছিলাম। আমার মনে হয় অমলের "শশীর" ভূমিকাভিনয়ই তাঁর শ্রেষ্ঠতম অভিনয়।

সেদিন আমি শ্লাঘাবোধ করেছিলাম এই ভেবে যে, অমলকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়ে আমি তাঁর আত্মবিকাশের পথকেই সুগমই করেছি—তিনি নিজেকে ফাঁকি দেন নি এবং বাঙলার রসিকসমাজকেও ফাঁকি দেন নি—। অমল যে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছেন একথা তখন বিশ্বাস করতে আমার বাধে নি। অমল অভিনয় করে তৃপ্তি পেতেন, ভাল অভিনয়

করেছেন শুনলে তাঁর মুখ উজ্জল হয়ে উঠ্‌ত। অনেক সময় তাঁর ভূমিকা নিয়ে তাঁর সংগে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, তিনি না বুঝে অন্তরের মধ্যে না নিয়ে কোনো ভূমিকায় অভিনয় করেন না। তাঁর সুস্পষ্ট বাচনভংগী, মধুর কণ্ঠস্বর ও সুষ্ঠু অভিনয়ের মধ্যে যেন একটা স্বকীয়তা ছিল যার জন্য সকলকেই মুগ্ধ হ'তে হোত।—তাঁর জন্য তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসাও পেয়ে গেছেন সকলের কাছ থেকে।

কয়েক বছর আগে অমল সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শান্তি গুপ্তাকে বিবাহ করেন। তাঁদের বিবাহিত জীবন বিশেষ সুখেরই হয়েছিল। অভিনেতা অমলের জীবনই বা ক'দিনের এবং বিবাহিত জীবনের দিনগুলির সংখ্যাই বা কি এবং তাঁর বয়সই বা কি যে তাঁকে বিদায় দেবার জন্য আমরা প্রস্তুত হ'ব? দীর্ঘ পথ ছিল তাঁর সম্মুখে—বিস্তৃত সে পথে—তাঁর জন্য অনেক প্রশংসা, অনেক খ্যাতি, অনেক সম্মানই ত অপেক্ষা ক'রে ছিল কিন্তু এমনি অসময়ে অমল পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন যে—জীবন নাটকের অনেকখানি অভিনয়ই—তাঁর বাদ পড়ে গেল। আমাদের এত আশা, এত শুভ ইচ্ছা—এতখানি আন্তরিক প্রার্থনার কোনো মূল্যই রইল না তাঁর কাছে, যিনি নেপথ্য বিধানে চিরকাল এমনি বিস্ময়ের সৃষ্টি ক'রে চলেন। একেই বলে অদৃষ্ট - না—নিয়তি?

সেই অদৃশ্য দেবতাকে নিষ্ঠুর বললে হয়ত সবখানি বলা হয় না—আবার তাঁর বিধানকে অনিবার্য বলে সান্ত্বনা পাবারও কোনো যুক্তি দেখি না কিন্তু অমলের মৃত্যু যে অবাঞ্ছিত, আকস্মিক ও নিষ্ঠুর একথা বলতে আমি কুণ্ঠিত নই। অমল তাঁর মৃত্যু চান নি —আমরাও কামনা করেছি তার দীর্ঘায়ু। পৃথিবীকে অমল প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছিলেন—তার সৌন্দর্য, তার প্রেম ও মাধুর্য তিনি অন্তরের সংগে গ্রহণ করেছিলেন। তাই আজ বার বার এই কথাই আমার মনে হচ্ছে যে, সেই পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে অমল কি গভীর ব্যথাই না পেয়ে গেছেন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের নিপীড়িত আকুলতায় সে ব্যথার কতটুকুই বা প্রকাশ পেয়েছে!

নির্বাক যুগের ছবির স্মৃতি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়ে হলিউডের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রাভিনেতা ক্লার্ক গেবেল একবার লিখেছিলেন যে, তাঁর জীবন ছেলেবেলায় দেখা তুষার-গলা প্রান্তরের মোরগের মত। একদিন ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছিল, বাইরে পথেও উন্মুক্ত প্রান্তরে তুষার গলে পড়েছে হঠাৎ গেবেল দেখতে পেলেন একটা মোরগ তার আশ্রয় হারিয়ে সেই তুষার-গলা ঠাণ্ডা উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে কী ক'রে যেন এসে উপস্থিত হ'য়েছে এবং সকরুণ, অসহায় ভাবে আশ্রয়ের জন্ম একবার এদিকে আরেকবার সে-দিকে ছুটোছুটি ক'রছে। দৃশ্যটা সাদা চোখে হয়তো তেমন বিশেষ কিছু নয় কিন্তু নিজের জীবনের সংগে এই অসহায় মোরগের সংগ্রামের কোনো সাদৃশ্য ছিল বলেই হয়তো পরবর্তী জীবনেও গেবেল সে-দৃশ্যের কথা বিস্মৃত হ'তে পারেন নি। গেবেল লিখেছেন, সেই ঘটনার পর থেকেই মোরগ জাতির ওপর তার কেমন যেন মায়া পড়ে'গিয়েছিল। হয়তো ছেলেবেলায় দেখেছিলেন বলেই এ ঘটনার কথা তিনি ভুলতে পারেন নি, ছেলেবেলায় দেখা অনেক জিনিষ যেমন আমরা সহজেই ভুলে যাই তেমনি আবার এমন অনেক জিনিষও থাকতে পারে মনের উপর যার রেখাপাত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কুড়ি বছর আগে যখন ছবি দেখতে শুরু করি তখন সাত বছরের বালক মাত্র। তখন ছবি ছিল নির্বাক, এখনকার দিনের মতো চপল ও মুখর নয়। আজীবন সহরে থেকেছি বলে' এবং নিতান্ত বালক বয়সেও ছবি দেখবার টিকেটের পয়সা জোগাড় করতে পারতুম ব'লে তখন থেকেই প্রায় প্রত্যেকটি ভালো ও উল্লেখযোগ্য ছবি দেখবার সুযোগ আমার হ'য়েছিল। কিন্তু পনের-কুড়ি বছর আগে এখনকার দিনের মতো এতো ছবিঘর ছিল না। আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের তখন শিশু অবস্থা, প্রচুর অর্থব্যয় ক'রে যে-সব ছবি তোলা হ'তো সেগুলো তেমন উল্লেখযোগ্যও হ'তো না, কাজেই বিদেশ থেকে আসা ইংরেজি ছবির ওপরই তখনকার দিনের ছবিঘর-গুলোকে নির্ভর ক'রতে হ'তো। দর্শকের সংখ্যাও ছিল মুষ্টিমেয়, কিন্তু যাঁরা দেখতেন তাঁরা অনবরত দেখতেন। প্রত্যেক নতুন ছবি দেখতে গিয়ে দর্শকদের মধ্যে অনেক পরিচিত মুখ দেখতে পেতাম। এমন হ'য়েছে যে সিনেমা-হলের মধ্যেই অনেক নতুন-নতুন লোকের সংগে পরিচয় ঘটেছে এবং সিনেমাহলেই সে পরিচয়ের যবনিকাপাত হ'য়েছে। আমি নিজে অবশ্য ছেলেবেলায় দল-বেঁধে সিনেমা দেখতে যেতাম, কারণ, আমার মতো সিনেমাখোর পাড়ায় আরো ছিল, এবং ছবি দেখার পর সবাই মিলে তার ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনাও করতুম। ফলে, বালক বয়স থেকেই ছবির মূল্য বিচার সম্পর্কে আমাদের মনে ক্রমশঃ সঠিক ধারণা গ'ড়ে উঠতে পেরেছিল। এখনকার দিনে সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকেও অনেক লোক প্রত্যহ সহরে ছবি দেখবার জন্ম আসেন, আগেকার দিনে এসব সুযোগ ছিল না। দর্শকের সংখ্যা অল্পতার এও একটা কারণ।

আগেকার দিনে সিনেমার হ্যাণ্ডবিল সংগ্রহ ক'রবার একটা বাতিক আমাদের ছিল। কোনো নতুন ছবি এলে স্থানীয় ছবিঘরের কর্তৃপক্ষরা রঙ বে-রঙগের বড়ো বড়ো কাগজে তিন-চারটে ছবি সমেত ছটকদার হ্যাণ্ডবিল ছাপতেন। অনেক সময় দেখা যেত ছবিঘরের ভাড়াটে বাগুকররা বাগু বাজিয়ে সেগুলো বিলি ক'রতে-ক'রতে যাচ্ছে। অসীম উৎসাহ নিয়ে সেই হ্যাণ্ডবিলগুলো সংগ্রহ করতে ভালো-বাসতাম এবং বার বার ক'রে পড়তাম। তারপর সেগুলো সযত্নে রেখে দিতাম। সিনেমাহলের একদিকে বাগুযন্ত্র শিল্পীদের (নির্বাক ছবির সংগে সংগে যাঁরা বাজনা বাজাতেন) বসবার জন্ম স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। এই বাগুযন্ত্র-শিল্পীরাও ছিলেন আমাদের কাছে বিস্ময়। অনেক সময় আমরা তাঁদের বসবার জায়গার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম এবং যে সব ইংরেজী ও বাংলা গৎ তাঁরা বাজাতেন সেগুলোর সুর মুখস্থ করতাম। শেষ পর্যন্ত এমনও হ'য়েছিল যে হাসি-কান্না আনন্দ-কারুণ্য মিশ্রিত ছবিতে কোন্ দৃশ্যে কোন্ ধরণের গৎ বাজাতে হবে তাও যেন আমরা অনিবার্যরূপে ব'লে দিতে পারতুম।

সিনেমা কেন দেখেন না এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' নামের বইটির একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে নির্বাক যুগের মতো উল্লেখযোগ্য অভিনেতা-অভিনেত্রী নেই বলেই এখনকার দিনের মুখর ছবি তাঁর মনে সাড়া জাগায় না। আক্ষেপ ক'রে তিনি বলছেন, কোথায় সেই বীর এডিপলো, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা লিলিয়ান গিস? বুদ্ধদেববাবুর এ ধরণের উক্তিতে নিতান্ত ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ পেলেও তা যে অতিশয়োক্তি নয় এ-সত্য। যাঁরা লিলিয়ান গিস বা এডিপলোর ছবি দেখেছেন তাঁরা অস্বীকার ক'রতে পারবেন না। অবশ্য ছেলেবেলাকার অনেক জিনিষই পরবর্তীকালে পরিণত বয়সে মধুর ব'লে মনে হয়। যে-সব জিনিষ একদা ছিল অথচ আর কখনোই ফিরে পাওয়া যাবে না সে-সবের জন্য মন উন্মনা না হ'য়ে পারে না। সে-ক্ষেত্রে মন যুক্তি মানে না, অবোধ আবেগেই পথ চলে। কিন্তু লিলিয়ান গিস বা এডিপলোর নামের সংগে ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত আছে বলেই যে ঐসব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে হয় তা হয়তো নয়। আগেকার দিনে ছবিতে কথা বলবার সুযোগ ছিল না বলেই অভিনয়কলা জিনিষ অধিকতর জটিল ও কঠিন ছিল। প্রধানতঃ মুখমণ্ডলের ভাবান্তরের (Expression) ওপরই অভিনয়ের সাফল্য নির্ভর ক'রতো। এখনকার দিনের শিল্পী কথনভংগীর মধ্য দিয়ে অভিনয়কলার খুঁৎ ঢাকতে পারেন কিন্তু নির্বাক যুগের শিল্পীদের এ-সুযোগ ছিল না। ভাবাভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশের মধ্য দিয়েই তাঁরা দর্শক সাধারণের চিত্ত জয় ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন।

এখনকার দিনের শিক্ষিত মহল ফুল সিরিয়েল ছবি দেখতে চান না। ফুল সিরিয়েল দেখবার কল্পনাও যথেষ্ট হাস্যকর এবং বিকৃত রুচির পরিচয় ব'লে মনে হয়। কিন্তু সেকালের শিক্ষিত মহলের রুচিজ্ঞান এতো সাংঘাতিক ছিল না। বুদ্ধদেব বাবু যে বীর এডিপলোর জন্য আক্ষেপ করেছেন তাঁর সংগে সাধারণ দর্শকের পরিচয় ঘটেছিল ফুল সিরিয়েলের মধ্য দিয়েই। এডিপলোর দুটো বিখ্যাত ছবি হ'লো 'সার্কাস কিং' এবং 'কিং অব দি সার্কাস' কিন্তু এ-দুটো ছবিই ফুল সিরিয়েল। এখনকার দিনে মাঝে-মাঝে তৃতীয় শ্রেণীর ছবিঘরগুলোতে যেসব ফুল সিরিয়েল প্রদর্শিত হয় সেগুলো সাধারণত চব্বিশ রীলের ওপর হয় না, এবং গোটা ছবিটাই একবারে দেখানো হ'য়ে থাকে। মৌন যুগের ফুল সিরিয়েল কিন্তু আরোও দীর্ঘ হ'তো, সাধারণত ছত্রিশ রীলের কম হ'তো না। এই দীর্ঘ ছবি এক সংগে এক শোতে দেখবার উপায় ছিল না; প্রথম চার দিন নয় খণ্ড, তার পরের চার দিন পরবর্তী নয় খণ্ড এই ভাবে ষোল দিনে ছত্রিশ খণ্ড দেখানো হ'তো। অবশ্য বছরে দু'তিনবার বিশেষ উৎসব উপলক্ষে, যথা, বিজয়া-দশমী, শ্যামাপূজা কি শিবরাত্রি উপলক্ষে, গোটা ফুল সিরিয়েলই একবারে দেখানো হ'তো। রাত্রি নটায় আরম্ভ হ'লে ছবি শেষ হ'তে হ'তে পরের দিন সকাল এগারোটা বেজে যেতো। ছবিঘরের অন্ধকার দেখে রাত্রি-জাগা চোখে বাইরে এসে দেখতে পাওয়া যেতো চারিদিকে প্রচুর রৌদ্র উঠেছে, ছেলে মেয়ের দল স্কুল কলেজে এবং উকিলরা সব কাছারীতে যাচ্ছেন।

কুড়ি বছর আগে এডিপোলের সমসাময়িক আরেকজন অভিনেতা ফুল সিরিয়েল ছবির মারফৎ জনপ্রিয় হ য়ে ছিলেন, তিনি 'এলমো'। এলমোর প্রকৃত নাম কী ছিল স্মরণ নেই কিন্তু তিনি ঐ নামেই দর্শকমহলে পরিচিত ছিলেন। 'এলমো দি মাইটি' তাঁর উল্লেখযোগ্য বই এবং আধুনিক কালের টার্জানের জনপ্রিয়তা তাঁর জনপ্রিয়তার কছে কিছুই নয়। তারপর অবশ্য দিনে-দিনে ফুল সিরিয়েলের প্রভাব কমতে লাগলো এবং তার বদলে দর্শকের চিত্ত জয় ক'রতে লাগলো এমন অনেক ছবি যা কি বিষয়-বস্তু কি অভিনয়কলা উভয় দিক থেকেই এখন পর্যন্ত স্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে।

নির্বাক যুগের প্রথম শ্রেণীর চিত্রাভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এমিল জেনিংস, লন চ্যানী, নরমান ক্যারী, রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনো, এডলফ্ মেঞ্জু, জন ব্যারীমোর, রোনাল্ড কোলমান, গ্যারী কুপার, রোমান নোভারো। অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রসিদ্ধা ছিলেন লিলিয়ান গিস, ভিলমা ব্যাঙ্কি, পোলা নেগ্রী, রিনি এডোম্নি, ডরাথী গিস, গ্লোরিয়া

সোয়ানসন, এনিটাপেইজ, লরলা প্ল্যাণ্ট বিলি, ডাভ, লিলি ড্যামিটা, গ্রেটা গার্বো, নরমা ট্যালমেজ ইত্যাদি। অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই সবাক যুগেও অভিনয় ক'রেছেন এবং এখনো ক'রছেন। জনপ্রিয়তার চরম শিখরে এঁদের অনেকে সবাক যুগে পৌঁছাতে পেরেছেন। কিন্তু অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই সবাক ছবির যুগে চিত্রজগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে এক ডলরেস কষ্টেলো ছাড়া আর কেউ ফিরে এসেছিলেন বলে জানা নেই।

অভিনেতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম মনে পড়ে সুদর্শন রুডলফ ভ্যালেন্টিনোকে। 'শেখ' ও 'দি সন অব দি শেখ' এ ছুটো ছবিতে অবতরণ ক'রে সর্বপ্রথম তিনি জনপ্রিয় হন। পরে 'দি ইগল' ও 'কোবরা' ছবিতে খ্যাতির চরম শিখরে আরোহণ করেন। দুঃখের বিষয় অল্প বয়সে তিনি মারা যান, হলিউড অকালে তার সবচেয়ে প্রিয়দর্শন অভিনেতাকে হারায়। কিন্তু শূন্য স্থান খুব বেশী দিন অপূর্ণ রইলো না, রূপালী পর্দায় আবির্ভাব ঘটলো একাধিক শক্তিমান তরুণ অভিনেতার। রোনাল্ড কোলমানের বয়স তখন অল্প কিন্তু 'ডার্ক এঞ্জল' ছবি তাঁকে সুপরিচিত ক'রলো। এই ছবিতে তাঁর নায়িকার ভূমিকায় নেমেছিলেন তখনকার দিনের নামজাদা তরুণী অভিনেত্রী ভিল্মা ব্যাঙ্কি। পরে 'বো জেষ্ট' ছবিখানিতেও রোনাল্ড কোলমান নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। এখনকার দিনেও গ্যারী কুপার জনপ্রিয়। অনেক ছবি তিনিও ক'রেছেন সেযুগে। একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হ'লো 'উইনিং অব বারবারা ওয়ার্থ'। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে ভালো ছবি বোধহয় 'বিট্রায়েল'। এই ছবিটাতে আরেকজন খুব নামকরা চিত্রাভিনেতাও ছিলেন, তিনি এমিল্ জেনিংস। এমিল জেনিংসের অভিনয় আধুনিক কালের পল মুনি ও চার্লস লাফটনের অভিনয়ের সংগে তুলনীয়। তাঁর আরো ছুটো বিখ্যাত ছবির নাম— 'ওথেলো' এবং 'দি লাষ্ট লাফ'।'

জন ব্যারীমোরকেও এই সময় পর্দায় দেখা যেতে লাগলো। তাঁর অভিনীত ছবি 'দি সি বিষ্ট' এবং 'বিলাভেড্ রোগ'। আর রামোন নোভারো তাঁর দীপ্তি নিয়ে দেখা দিলেন 'অ্যাক্রস টু সিঙ্গাপুর' ছবিতে। 'প্যাগান' এবং 'ষ্টুডেণ্ট প্রিন্স' এ ছবি ছুটো তাঁকে আরো সুপরিচিত ক'রে তুলেছিল। তারপর এলো 'দি বিগ প্যারে'। আমরা পরিচিত হ'লুম জন গিলবার্টের সংগে। সে পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হ'লো 'কশাকস্' 'ফোর ওয়ালস' 'ওমান অব অ্যাফেয়ার্স' ছবির মধ্য দিয়ে। 'কশাকস্'এ গিলবার্টের নায়িকার ভূমিকায় নেমেছিলেন রিলি এডোরি, আর 'ওমান অব অ্যাফেয়ার্স'এ গ্রেটা গার্বো। প্রণয় মধুর চিত্রের নায়ক হিসেবে এখনকার দিনের ক্লার্ক গেবেলের সংগে জন গিলবার্ট তুলনীয়! বিশেষ ক'রে সিনেমার বাইরে ব্যক্তিগত জীবনে গ্রেটা গার্বোর প্রেমিক হিসেবে তিনি অনেকের কৌতূহলের বস্তু হ'য়ে উঠেছিলেন।

নির্বাক যুগের কয়েকটি বিশেষ স্মরণীয় ছবি হ'লো 'রমলা' গার্ডেন অব আল্লা, 'ব্রোকেন ব্লসমস্' ক্যামেলি' এবং 'হাঞ্চব্যাক অব নটার ডেইম'। 'রমলা' চিত্রে অভিনয় ক'রেছিলেন লিলিয়ান গিস, ডরোথি গিস, নরমান ক্যারী। 'গার্ডেন অব আল্লায়' নায়ক নায়িকার ভূমিকায় নেমেছিলেন আইভান পেট্রোভিচ এবং এলিস টেরি। 'হাঞ্চব্যাক অব্ নটারডেম'এ নায়কের ভূমিকায় ছিলেন নরমানকেরী, নায়িকা ছিলেন লিলিয়ান গিস এবং কুজের ভূমিকায় লন চ্যানী বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ডি, ডাব্লু গ্রিফিথ পরিচালিত 'ব্রোকেন ব্লসমস্'এ রিচার্ড বার্থেলমেস্ ও লিলিয়ান গিস নায়ক-নায়িকার অংশে অবতরণ ক'রে ছিলেন। 'ক্যামেলি' ছবিতে নায়িকা ছিলেন নরমা ট্যালমেজ, নায়ক কে ছিলেন মনে পড়ছে না। এই কয়েকটি ছবি তখনকার দিনে চিত্রজগতে এতো আলোড়ন উপস্থিত ক'রেছিল যে পরবর্তী সবাক ছবির যুগে একমাত্র 'রমলা' ছাড়া আর সব কটি ছবিই আবার নতুন করে তোলা হ'য়েছিল এবং 'রূপ-মঞ্চে'র পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে আশা করি ঐ ছবিগুলো দেখেছেনও।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি ভালো ছবির নামও আমার মনে পড়ছে। যথা—'গচো' (ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস, মেরী পিকফোর্ড ও লুপে ভ্যালে অভিনীত) 'টসিং অব্ দি শ্রু' (ডগলাস্ ও মেরী অভিনীত), 'ডরোথি ভার্ণন অব

হ্যাডন হল' (মেরী পিকফোর্ড অভিনীত), রোসিটা' (মেরী অভিনীত) সয়োজ অব স্যাটান, (এডলফ্ মেঞ্জু অভিনীত), 'ফাইটিং ক্যারাভানস' (গ্যারীকুপার ও লিলি ড্যামিটা অভিনীত), 'টেল ইট টু ম্যারিস (উইলিয়ম হেইন্স, এলিটা পেজ অভিনীত)। বলা বাহুল্য, আমার এ পদও তালিকা কোনো ক্রমেই সম্পূর্ণ নয়। আমি নিজে তখনকার দিনে যে-সব ছবি দেখেছিলাম তার মধ্য থেকেই উল্লেখ ক'রলাম এবং এমন ছবিও থাকতে পারে যা' নিজে দেখে থাকলেও এখন আর আমার মনে নেই। বিলি ডাভও পোলানেগ্রী অভিনেত্রী হিসেবে তখনকার দিনে যথেষ্ট নাম ক'রেছিলেন অথচ এঁদের কোনো ছবির কথাই আমার মনে পড়চে না।

হাসির ছবিতে যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁদের মধ্যে চার্লি চ্যাপলিন; হ্যারোল্ড লয়েড এবং বাষ্টান কিটনের নাম মনে পড়ছে। 'গোল্ডরাস' 'দি কিড্' (জ্যাকি কুগানের সংগে) 'সার্কাস" 'সিটি লাইটস্' ছবিতে চার্লি চ্যাপলিন যে অভিনয় ক'রেছেন তা ভুলবার নয়। কিন্তু হ্যারোল্ড লয়েড কি বাষ্টার কিটনের কোন ছবির নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। সিড চ্যাপলিন নামের আরেকজন অভিনেতা হাসির ছবিতে নামতেন। তাঁর 'দি ম্যান অন দি বক্স' এবং 'ও' হোয়াট এ নার্স।' ছবি দুটো মনে পড়ে। বালক বয়সে অভিনেতা হিসেবে তখনকার দিনে সুপরিচিত ছিলেন জ্যাকি কুগান। প্রথমে তাঁকে দেখি চার্লি চ্যাপলিনের সংগে 'দি কিড'-এ। শেষ ছবি দেখি 'বাটনস্'। তাঁর অভিনয় প্রতিভা এখনকার দিনের ফ্রেডি বার্থেলমিউর চেয়ে কম ছিল না।

দুঃসাহসিক কর্ম-কলাপপূর্ণ ছবির নায়ক হিসেবে ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস অদ্বিতীয় ছিলেন। মনে পড়ে তাঁর 'ব্ল্যাক পাইরেট' 'থ্রি মাসকেটিয়াস' 'রবিন হুড' 'দি থিপ অব বোগদাদ' 'ডন কিউ সন অব জিরো' 'মার্ক অব জিরো' 'চিজ ম্যাজেষ্টি দি আমেরিকান' 'গচো' ইত্যাদি ছবি আমরা কী উত্তেজনা নিয়েই না দেখতাম। পরে আরো দু'জন অভিনেতাও দুঃসাহসিক কার্যকলাপপূর্ণ ছবিতে অভিনয় শুরু করেন—রিচার্ড ট্যালমেজ ও সানসেনিয়া। কিন্তু কোন দিক দিয়েই তাঁরা ডগলাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারেন নি।

নির্বাক যুগের আরো কয়েকটি ভালো ছবির কথা মনে পড়ছে—'গো বোট' 'মেট্রোপলিস' 'ইষ্ট ইজ ওয়েষ্ট' 'দি ব্যাট' 'বারবারা ফ্রেচি' এবং 'ব্যো স্যাব্রিউর'। কিন্তু প্রধান প্রধান অংশে কারা নেমেছিলেন মনে নেই। আরেকজন অভিনেত্রীর নাম এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, তিনি গ্লোরিয়া সোয়ানসন। তাঁর অভিনীত দুটি ছবি—'লাভ অব সানিয়া' ও 'ট্রেসপাসার'। এছাড়া, 'লা নিজারেবেল' 'ডন য়ুয়ান' 'টেন কম্যান্ড মেণ্টস্' নামের কয়েকটি ছবির কথা মনে পড়ে। একটি খুব পুরোণো ছবি—'দি ফ্যাণ্টম অব দি অপেরা' আমার মনে হয় তখনকার দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। লন চ্যানীর নাম উপরে উল্লেখ ক'রছি। লোকে তাঁকে জানতো 'হাজার মুখো মানুষ (**Man with thousand faces**) বলে। বাস্তবিক বড়ো অদ্ভুত ছিল তাঁর মেকআপ। এক একটি ছবিতে এক এক বেশে তাঁকে দেখা যেত! তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে 'মকারী' 'লণ্ডন আফটার মিডনাইট' 'হোয়াইল সিটি স্লিপস' 'হাঞ্চ-ব্যাক অব নটার ডেম' উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সবাক চিত্রের যুগে বোরিস কার্লফ, লন চ্যানীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়েই তাঁর বিখ্যাত ছবি 'ফ্যাঙ্কেষ্টাইন'-এ অভিনয় করেছিলেন।

এই সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে আজকের দিনে কেউ বা মৃত কেউ বা বিস্মৃত। কিন্তু নিজেদের অভিনয় প্রতিভার দ্বারা তাঁরা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন তাঁর জন্যে এখনকার দিনের চিত্রামোদীরাও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। কারণ, অতীত যুগের যা কিছু ভালো ও মহৎ তাকে অস্বীকার করা মূঢ়তা, পরবর্তী যুগের শিল্পীরা উন্নততর অগ্রগতির পথের যাত্রা সেইস্থান থেকেই শুরু করেন।

বেতার-বিভ্রাট

মিষ্টভাষী

বড়ই মুস্কিলে প'ড়েছি। বেতার-বিভ্রাটের তো শেষ নেই। মাসে একবার ক'রে আমরা বিভ্রাটের ফিরিস্তি দাখিল করছি, ইতিমধ্যে বেতারের বিভ্রাট জমা হ'চ্ছে মাসে তিরিশ দিন। ঠিক থই পাচ্ছিনে। মনে হ'চ্ছে বেতার প্রতিষ্ঠান হয়ত আমাদের সংগে পাল্লা দিচ্ছেন। তাঁদের বিভ্রাটের শেষ সীমার নাগাল বুঝি আর পাবোনা।

সম্প্রতি লক্ষ্য করছি,—বেতারের অভ্যন্তরে রীতিমতো বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হ'য়েছে। সেট্ খোলামাত্র গানের সংগে বা কোনো বক্তৃতার সংগে কোলাহল শুনতে পাওয়া যায়। ষ্টুডিয়ো ডিসিপ্লিন কেউ মেনে না চলার দরুণই এটা-যে হ'চ্ছে—তা বলাই বাহুল্য। এর জন্যে দায়ী কে? এর জন্যে দায়ী বেতার কর্ণধার—ষ্টেশন ডিরেক্টর। ষ্টেশন ডিরেক্টর কি এদিকে মনোযোগ দেবেন? কলকাতা বেতার কেন্দ্রে কতকগুলো নতুন কর্মচারী আমদানী হ'য়েছে—আমরা দেখেছি। ফুটপাথ থেকে নিশ্চয় তাঁদের কুড়িয়ে আনা হয় নি। তা যদি না হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তাঁদের রীতিনীতি অমন ফুটপাথী কেন—এ-কথা নিশ্চয় আমরা প্রশ্ন করতে পারি। আমরা নিজে দেখে এসেছি। এই সব নতুন কর্মচারীরা কোনো রকম ডিসিপ্লিন মেনে চলেন না। ষ্টুডিয়োর দরজার কাছে ব'সে গুলতানী করেন, অযথা চেঁচামেচি করেন। এতটুকু শিক্ষা বা ভদ্রতা বোধ না রেখে তাঁদের চাল চলন বিশেষ রকমের দৃষ্টি কটু। সেট্ খুলতেই যে কোলাহলের সংগে আমাদের পরিচয় হয়—তা নিশ্চয় এই সব নতুন আমদানীদের নবতম অবদান। বলা বাহুল্য, যা ব্রডকাষ্ট করার ব্যবস্থা হয় সেইটেই শ্রোতারা শুনতে চান্। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কোলাহলের পরিবেশন থেকে বেতারের কর্তৃপক্ষকে বিরত থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় কোলাহল শুনতে অবশ্য

আমরা রাজি আছি।—অনেক অভিনয়—বিশেষ ক'রে নারদমুনীর বঙ্গদর্শন সিরিজ—কোলাহল ছাড়া কিছু না। কিন্তু যে—কোলাহল পরিবেশন করার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেন নি, তা-ও যেন পরিবেশিত না হয়—তার দিকে নজর দেওয়ার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলেও, এখনো নজর দেওয়া চলতে পারে। আমরা আবার বলছি, কলকাতা বেতারকেন্দ্রের ডিরেক্টর (শ্রীযুত সোমনাথ চিব) স্বয়ং এদিকে নজর দেবেন। তাঁর ষ্টেশনে যে বিশৃঙ্খলা ও বে-আইনী আচার আচরণ সুরু হ'য়েছে, তা বন্ধ করার দায়িত্ব তাঁর নিজের।

কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে আমাদের কার্যব্যাপদেশে গতায়াত বহুদিন থেকে। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে যে নিয়মশৃঙ্খলা ভংগের হিড়িক দেখছি—ইতিপূর্বে তা কখনো দেখিনি। এখন বেতার-কেন্দ্রে ঢুকলে চাপরাশী থেকে আরম্ভ ক'রে অফিসার ইন্-চার্জ—সকলকেই মনে হয় সে-ই এ-কেন্দ্রের কর্ণধার। তার আদেশ ও নির্দেশ মতই বেতার কেন্দ্রের প্রত্যেকটি কল্ চলছে। এত অধিক সংখক সন্ন্যাসীর সমাগমেই বুঝি কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের গাজনের এই সাম্প্রতিক দুর্দশা। এর কারণ আর কিছু না—অপটু, আনাড়ি ও অশিক্ষিত কতকগুলি কর্মী এই প্রতিষ্ঠানে সম্প্রতি ঢুকেছে:—এটুকু জ্ঞানও তাঁদের নেই যে এই প্রতিষ্ঠানে মাইক্ নামক একটি সেন্‌সিটিভ যন্ত্র আছে—চুঁ শব্দটি করলেই তা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। তাঁরা যদি অজ্ঞান হ'ন্, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু ষ্টেশনের কর্ণধার যেন সেই সংগে জ্ঞানহীন না হ'ন্। তিনি যেন সজ্ঞানে এসব দিকে নজর দিয়ে তাঁর অজ্ঞান কর্মচারীদের পাকড়াও করেন, এবং সেই অজ্ঞান ও অনভিজ্ঞ কর্মীদের মগজে একটু মস্তিস্ক চালনা ক'রে দেন। এ না করলে তো শ্রোতারা আর সহ্য করতে পারছে না। তাঁদের সহনশীলতার সীমা নিশ্চয় একটা আছে।

আমরা কি আশা করতে পারি—বেতার কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দেবেন,—এবং এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন অবিলম্বেই? তাঁরা যদি এদিকে মনোযোগ না দেন, তাহ'লে আমাদের স্মরণাপন্ন হ'তে হবে দিল্লীর। দিল্লীর কর্তার কাছে আমরা সহস্র শ্রোতার স্বাক্ষর নিয়ে হাজির হবার জন্য প্রস্তুত হবো। 'রূপমঞ্চ' কয়েক সহস্র বেতার-শ্রোতার দ্বারা পঠিত পত্রিকা। অতএব আমাদের পক্ষে দিল্লী যাত্রা বিশেষ কষ্টকর নয়। তাছাড়াও আমাদের দৈনিক ও সাপ্তাহিক সহযোগীদের সহযোগিতাও গ্রহণ করতে হবে দরকার হ'লে। মোদ্দা কথা, প্রতিকার আমরা চাই। আমরা চাই কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান একটা ডিসিপ্লিন্‌ড্ প্রতিষ্ঠান হোক্। তার কর্মচারীরা দায়িত্ব-বোধ সম্পন্ন হোক্, চটুল ফাজলামো, অকারণ চাঞ্চল্য ইত্যাদি বর্জন করুক্। ষ্টুডিয়োর দরজার কাছে ব'সে বৈঠকী আড্ডা দেওয়া থেকে বিরত হোক্। হাজার হোক, বেতার প্রতিষ্ঠান কখনই একটা গার্ব্বে হাউস্ নয়।

অসুবিধে এইখানে যে কারু নাম জানিনে। এই সব নাম-না জানা নতুন আমদানীরাই প্রতিষ্ঠানের একটা মস্ত গলদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য নতুন আমদানীদের সবাইকে একদলে ফেলছিনে। তাঁদের মধ্যেও শিষ্ট সভ্য অনেকে আছেন।

নিউ সেঞ্চুরীর
মানে না মানা চিত্রে
মলিনা দেবী

কলঙ্কিনী চিত্রে :—শ্রীমতী রেণুকা

বাংলা গীতি শিল্পে বেয়াদপি

—গোবিন্দ চক্রবর্তী

একটি বাংলা গান।

ভাবা চয়নের পেলব লালিত্যে, চিত্তবৃত্তির লীলাগ্রহনে আর সুরের ঝিকিমিকি ফুলঝুরিতে একটি সঞ্চারিণী বিদ্যুল্লতা।

অথচ তাকে আজ কী অভিনব উপায়ে রীতিমত চাবুক ক'রে ভাঙা হচ্ছে আমাদের পিঠে আর আরো আশ্চর্য: সাধারণতঃ করকরে রজতমুদ্রা হাতে হাতে গুণে দিয়ে এই বহু বিজ্ঞাপিত রজনীগন্ধার পুষ্পিত ডাঁটাটাকে কিনে এনে, সপাসপ সংকর মাছের ল্যাজের ঝাপটা খেতে হচ্ছে, দু'চোখ বন্ধ করে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ ক'রে।

রেকর্ডের গানের কথাই বলছি।

আমার কাছে অগুণতি প্রচার-পুস্তিকা আছে প্রায় সমস্ত রেকর্ড কোম্পানীর।

দেশবিদেশের ডাকটিকিট জমানো, অথবা নানা পাহাড়ের নুড়ি সংগ্রহ করা কিংবা অনেক সমুদ্রতীরের রঙীন রঙীন ঝিনুক সঞ্চয় করার মত এও আমার একটি খেয়াল। আমি রেকর্ডের গানের বই সংগ্রহ করি যত পারি। নিছক বিলাসের বশতঃই করি নে: একটা কারণ অবিশ্যিই আছে। যদি কোনো ধারা খুঁজে পাওয়া যায় বাংলা গীতি-শিল্পের।

সম্প্রতি আমার হাতে এসেছে একটি আনকরা নোতুন গান।

রেকর্ডটা সমেত।

ঝকঝ'কে একটি রেকর্ড: বুকেপিঠে শীলমোহর আঁকা একটি শ্রুতিব্যাকুল কুকুরের: অভিজাত একটী প্রতিষ্ঠানের আভিরূ চিহ্ন সম্বলিত। বিখ্যাত লেখকের বাজারে বেরুনো নোতুনতম বইটার প্রতি যে স্বাভাবিক তৃষ্ণা সু-নিষ্ঠ পাঠকের মনে: অনুসন্ধিৎসু শ্রোতার লোভও তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয় নামকরা গায়কের আনকরা রেকর্ডের যে-কোনো একটা খণ্ড শুনতে পাওয়ার জন্যে। আর যদি সংগ্রহ ক'রতে পারার আগেই সে রেকর্ড অতর্কিতে হাতে এসে পৌঁছে যায় অযাচিত দয়ার মত?

যাঁর কণ্ঠ এই রেকর্ডটীতে: এখন বাংলাদেশের অনেকের কণ্ঠে তাঁর নাম।

রেকর্ডটীকে মেসিনে চড়িয়ে দিলাম সুতরাং যথাক্রম।

কিন্তু ঘাড়ে, মাথায়, কাণে ঠকাঠক কে যেন কতকগুলো পেরেক ঠুকে দিলো অকস্মাৎ।

মেসিন থেকে নামাতে হলো রেকর্ডটীকে আধখানা শুনেই।

বস্তুতঃ ভেলভেটের কাস্কেটে মোড়া একটী গোরুর মাথার খুলি।

কিছু কিছু লেখাপড়া যখন জানি, তখন এতটা অর্বাচীন নিশ্চয়ই হবো না যে, একটী বাংলা গানের ভাবোদ্ধারও ক'রতে পারবো না। অতি বাজে কবির কেতাদুরস্ত আধুনিক কবিতাও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে এ গানের কথার আবেদনের কাছে:

"কোন দূর প্রণয়ীর পথে প্রাণ ভ্রান্ত:
অবেলায় বেলা তার হলো বুঝি ক্লান্ত!
তাই কি সে ডেকে কয়:
মনের বলাকা তোর ফুরালো সময়—"

স্তম্ভিত হলাম।

এই অতি নিকৃষ্ট পাগলের প্রলাপ বাজারে বেমালুম চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে দ্বিধাহীন দু'হাতে। কোনো সংকোচ নেই, কোনো লজ্জা নেই। এই একটী মাত্রায়: এ রকম অসংখ্যতর প্রলাপ শুনতে কেউ যদি সত্যি রাজী থাকেন, চেতনাশীল মন নিয়ে প্রতি মাসের রেকর্ডের গানগুলো কিছু কিছু ওলোটপালোট করলেই বুঝতে পারবেন। এই গানটিতে দেখলাম: কবিরাজ বত্তিগিরি ব্যবসার ফাঁকে কবি সাজবার প্রয়াসও পেয়েছেন নির্লজ্জভাবে। কথা, সুর আর গান: সবই এই বিখ্যাত সুকণ্ঠ ভদ্রলোকটীর।

বোলতার ঘুর-পাক খেয়ে খেয়ে গুঞ্জিত চক্রমনধ্বনি তোলার মত কথাটা মাথার মধ্যে অনেকক্ষণ পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো: 'ফুরালো সময়।'

না ফুরালেও এরকমতর শুভ প্রচেষ্টার পুনর্পৌনিক

আবৃত্তি দ্বারা অন্ততঃ গীতি-কথাকে ফুরিয়ে দেবার জন্যে প্রাণপণে উঠে-পড়ে লাগা হয়েছে নিঃসন্দেহে। কোনো দিশাই ত' আর দেখতে পাচ্ছি না। যেসব বিদেশীরা ভালো বাংলা জানেন, যদি জানেন এবং বাংলার বিখ্যাততম রেকর্ড প্রতিষ্ঠানগুলির এই রকম কর্ষনা বাছা বাছা গান যদি একটি বিশেষ আসরে আমন্ত্রণ ক'রে এনে তাঁদের শুনিয়ে দেওয়া হয় আচ্ছা ক'রে—এটা রবীন্দ্রনাথের দেশ কিনা অথবা সত্যিই রবীন্দ্রনাথ এই ভাষাকেই প্রাণপণে উন্নীত ক'রে গিয়েছিলেন কিনা কঠিন সাধনায় : এই বিষয়টাকে নিয়ে যদি তাঁরা রীতিমত 'থিসিস' রচনার পরিকল্পনা করে বসেন—খুব বেশী আশ্চর্য হবার কারণ থাকবে কি তাহলে?

সাধারণতঃ আধুনিক বাংলাগানের লালক ও পালক-পিতা রেকর্ড আর চিত্রপ্রতিষ্ঠানের স্ফীতোদর বড় কর্তারাই। উদরের পরিধি স্ফীত হ'লেই তাঁর রুচির পরিধিও যে আদিগন্ত বিস্তীর্ণ হবেই : এ জবরদস্তিপনাকে সায়েস্তা ক'রতে না পারলে বাংলাগানের কথাশিল্পের সৌকুর্য-সম্ভাবনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আলু বিক্রী ক'রে যিনি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ ক'রলেন : ঈশ্বর তাঁর সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি করুন আমরা বড়জোর এ পর্যন্ত তার জন্যে প্রার্থনা ক'রতে রাজী হ'তে পারি। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এসে সের দরে এমনি ক'রে পচা আলু বিক্রী করার বেহায়াপনাকে শক্ত হাতে কাঁটান'টের মত উপড়ে ফেলাই নিশ্চয় উচিৎ।

উদ্দেশ্য যদি সুস্থ না হয়, সে কার্যের সম্পাদনায় সম্প্রসারিত সৎ হস্তের দাক্ষিণ্য মেলাও তাই সহজভাবেই কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগের উন্নয়ণ-শিল্প আগিয়ে চ'লেছে ঝড়ের গতিতে : নোতুন নোতুন প্রতিভাধর শিল্পী সেখেনে বিনিআমন্ত্রণে নোতুন

নোতুন কলম নিয়ে প্রতিমুহূর্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রছেন সূক্ষ্ম-বৈজ্ঞানিক চোখে আর এই একটা দিক - সংস্কৃতির এমনতর একটী চারুশিল্প, সাহিত্যেরো একটী ললিততম অংগবিশেষ— এটাই বা এমন রঙ-জ্বলা, চটা-ওটা, হা ড়-বে র-ক রা হ'য়ে কলংকিত মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে কেন?— ভাড়াটে কলম দিয়ে টায়টোয় প্রয়োজনসম্পন্ন হতে পারে, শিল্প-সৃষ্টি হয়না। বাংলা সাহিত্যে কারুর একচেটে আমলায়ানার ভোগ-দখলী সত্ব নেই—তাই সেখানে একটী দ্যুতিময়ী কবিতা কাঞ্চনমূল্যের অপেক্ষা না রেখেই রচিত হ'তে পারে এবং হচ্ছেও অথচ প্রাপ্তিযোগের যথেষ্ট প্রলোভন থাকা সত্বেও এ অঞ্চলে গীতি-শিল্পীর কোনো ভিড়ই নেই। এ কি ক্ষমতার অভাব? অবিশ্বাস করি। যাঁরা এর অভিভাবকত্ব করছেন, নিছক ব্যা ং ক্-ব্যা লা ন্সে র জোরে: তাদের স ব জা ন্তা গি রি র খবরদারিই এর জন্যে প্রধানতঃ এবং একমাত্র দায়ী। তাই

নিউ থিয়েটাসে'র নার্স সি, সি চিত্রে তরুণ নট অসিতবরণ

তিনটী কি চারটী তাঁবেদার কলমের ভোঁতা নিবই এখেনে ঘোরাফেরা ক'রছে অমন কতকাল থেকে।

এর মধ্যে দু'টো আশ্চর্য কেবল অজয় ভট্টাচার্য আর নজরুল ইসলাম।

নজরুল জলন্ত সূর্য। বৈশাখের কড়া রোদ্দুরকে ফিনফিনে মেঘের আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখা বড় দায়। খাপখোলা তলোয়ার একহাতে যেমন ঝ'ল্‌কেছে তাঁর কবিতায়—ওদিকে রাগ-রাগিণীর জগতেও তাঁর গতিবিধি ছিলো তেমনি আশ্চর্যভাবে নির্ভীক। পাকা সাপুড়ের মত নানা রাগিনীর চটকদার বাঁশীও তাঁর হাতে বেজে উঠ্‌তো মোলায়েম হ'য়ে। সেখানে তাঁকে রোধ করতে যাওয়াই বিড়ম্বনামাত্র। তা' ছাড়াও—এখেনেও প্রচ্ছন্ন-

ভাবে কাজ ক'রেছে সেই আলুবিক্রীর বুদ্ধিই। এক পাথরে ছুটী পাখীকে ঘায়েল করা। এক হাতে কলম, এক হাতে বাঁশী—অল্প দু' এক পয়সা বাড়তি ধ'রে দিয়ে এ চিজকে বেঁধে রাখাই পাকা বুদ্ধিমানের কাজ। তবু নিজেদের চাহিদা মাফিক নজরুলের হাত দিয়েও জোর ক'রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাবিশও টেনে বের ক'রিয়ে নেওয়া হচ্ছে—এমন নজিরও মেলে। দেব-বর্মনের মত যাদুকর যদি অজয়ের গানের চারণ না হ'তেন আর হিমাংশু দত্তের মত ক্ষমতার সমর্থনের প্রশ্রয় যদি এতে না থাকতো—অজয় এ দিগন্তে আসতেন কিনা অথবা এরা তাঁকে আসতে দিতো কিনা, সে বিষয়ে নোতুন ক'রে বলবার কিছু নেই।

এই একই কথা বলা যায় ঠিক ছায়াচিত্রের প্রসংগেও। গানকে ত' সেখেনে 'জলখাবারের' মত খরচ করবার মহরম। কুৎসিৎ কাকের শরীরের যেখেনে-সেখেনে ময়ূরপালক গুঁজে দেবার মত চেষ্টা। কাকেরো বোধহয় একটা প্রাকৃত-সৌন্দর্যের দ্যুতি আছে কিন্তু বাংলা ছবির পোষাক তার চেয়েও নোংরা। আর সেই শরীরের জায়গায় জায়গায় স্থানকালের কোনো সমতারক্ষা না ক'রেই গানের জরিদার ঝিকিমিকি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মুঠোয় মুঠোয়। আর সেগুলো বিষাক্ত ক্ষতের মত আরো কুশ্রী ও উলংগভাবে ফুটে বেরুচ্ছে দগ্‌দগ্‌ ক'রে। গানের এমনতর অপমান কোনো রুচিবান দেশই বোধহয় করবার সাহস পায়না। তেরশ পঞ্চাশের ভূত বাজারের খই-মুড়কির দরও বাড়িয়ে ছেড়েছে একমুঠো ধুলোর চেয়েও বোধহয় আরো যোগ্যতাহীন করে তুলে ধরবার চক্রান্ত করা হ'য়েছে আধুনিক বাংলাগানকে। এখোনও সেই ভুঁড়িয়ালার চর্বিচর্চিত ভুঁড়িয়ালি। পরিচালকের ঘাড়ে সবটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে ঠিক পারিনে : অন্ততঃ যেটুকু খবর রাখি এ দিগন্তের। ভুঁড়িদের ভাঁড়ামীর উদাহরণই এসবক্ষেত্রে ভুরি ভুরি। পরিচালকের কিছু চালবাজীও অবশ্যই আছে। অজয়কে বাদ দিলে এবং দিতেই হবে, প্রেমেন্দ্র মিত্র ভিন্ন আর কোনো পরিচালকেরই অন্ততঃ গীতি-রচনার দুঃসাহস প্রকাশ করা উচিৎ নয়। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বাগতম। গীতি-রচনার একটা নোতুন দিগন্ত একমাত্র তাঁর হাতেই এখন খোলা সম্ভব। অবিশ্যি গানের কলমে তাঁর কিছু কিছু আপত্তিরও আছে। সেটা এখন আলোচ্য নয়। কিন্তু কোনো কোন রাঘব-বোয়াল এ পয়শাটাও হাত-ছাড়া ক'রতে নারাজ। কয়েকটা কুৎসিৎ বেঁকা আঙুলকে মাঝে মাঝে ঘোরাফেরা ক'রতে দেখি সরীসৃপের মত। নিজের নামে না হোক, ছদ্মনামে, ছদ্মনামে না হোক মিষ্টি কোনো মেয়ের নামে।

রাজনীতির বড় বড় বুলি না তুলি, এটুকু অন্ততঃ নির্দ্বন্দ্বেই তুলে ধ'রতে পারি আপনাদের কাছে : আপনাদের দাবী জানান, এর প্রতিবাদ করুন। পয়সা দিয়ে আর কতকাল এমন মার খাবেন? সরকারী বিজ্ঞাপনের মত আমিও বোধহয় এটুকু নিশ্চয়ই পেশ ক'রতে পারি আপনার কাছে : এ কালোবাজার আপনিই বন্ধ ক'রতে পারেন ন্যায্য জিনিষের ন্যায্য দাম দিয়ে। ছায়াচিত্রে 'নোতুন মুখের' আন্দোলন আজ যথেষ্ট কার্যকরী হ'য়েছে। এ-ই বা হবে না কেন? দাবী করুণ গীতি-রচনার ক্ষেত্রে নোতুন নোতুন শক্তিমান কবি অথবা গীতিকারদের মৌলিক রচনার স্বতঃস্ফূরণ, প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক মানসম্পন্ন নোতুন নোতুন সুরকারদের চিন্তামৃত সুর-সংযোজনা। একটী লাঞ্ছিত ললিতকলাকে বৃষভ-বেয়াদপির হাত থেকে মুক্ত কোরুণ। কবিদের কিছু পয়সার সংস্থান ক'রে দেবার জন্যে এ আন্দোলন আহ্বান নয়। আপনারা রবীন্দ্রনাথেরই দেশের লোক। এটীও একটী জাতীয় কর্তব্য।

আধুনিক মঞ্চ ও চিত্রে নৃত্যের স্থান

—ভাস্কর দেব

চৌষট্টি চারুকলার গোষ্ঠীতে নৃত্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ ললিত-কলা। নৃত্য ললিতকলার অনুপম লালিত্যের কাছে তার স্বগোষ্ঠীর এমন কি স্বগোত্রীয় সকল চারু-শিল্পের সুচারু-তাই সঙ্কুচিত চিত্ত। যে হিসাবে নৃত্যকে দেহের কাব্য বলা হয় সে সম্বন্ধে দুচার কথার আলোচনা করলেও ঠিক সে হিসাবে তা'র আলোচনা করা আলোচ্য আলোচনার উদ্দেশ্যে নয়। যে জন্যে নৃত্য আর্ট বিশেষ তার সমালোচনা হবে অপ্রাসংগিক এ আলোচনায়। মঞ্চে ও চিত্রের আসরে নৃত্যের আসন নির্দেশ আর তা'র অতীত বর্তমান বা ভবিষ্যতের গৌরব অগৌরবের সমালোচনাই এ আলোচনার উদ্দেশ্য। মঞ্চে আর চিত্রে নৃত্য কেমন অবস্থায় ছিল, কেমন অবস্থায় এসেছে বা কেমন অবস্থায় আসতে পারে অথবা আসবে নৃত্য সম্বন্ধীয় আলোচনার সেই উপেক্ষিত স্থানটিতে আলোক দেবার আশায় সে সম্বন্ধে দুচার কথা বলব।

আলোচনার প্রারম্ভেই প্রথম প্রশ্ন নৃত্য কি? এ প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে হবে গোড়ায় গলদ, তাই বলি যে, সুললিত অংগভংগিমার স্বচ্ছন্দ ছন্দ বন্ধনে মনের যে কোনো আবেগ-আবেদন বা অন্তর আলোড়নের যে কোন রসানুভূতির ইচ্ছা প্রকাশই নৃত্য। অতএব হৃদয়ের ভাব সংঘাতে যার জন্ম আর সে ভাবের আবেগে যার কল্পনাময় প্রমূর্ত প্রকাশ মঞ্চ বা চিত্রের সংগে তার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের সত্যটুকু উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মঞ্চ বা চিত্রের প্রাণবন্ত নাটক আর সে নাটকের জন্মও হৃদয়ের ভাবাবেগে, তা'রা নৃত্যেরই সহোদর। মঞ্চে বা চিত্রে নৃত্য তাই অপরিহার্য। হৃদয়ের ভাব যখন হয় সূক্ষ্ম নাটকে নেওয়া হয় তখন গানের আশ্রয়। কিন্তু সে ভাব যখন হয় সূক্ষ্মতম,—যে ভাবের সংজ্ঞা নেই, সে আকুলতার ভাষা নেই, ছন্দ যার আভাষ-মাত্র দিতে পারে, সুর যার ইংগিত ছাড়া আর কিছুই জানেনা, নাটকে সে ছায়ারূপী অশরীরি ভাব প্রকাশ করতে হ'লে হয় নৃত্যের সারথ্যের প্রয়োজন;—শিক্ষিত অংগের ছন্দোময় ব্যঞ্জনাই সূক্ষ্মতম ভাবের সেই অনঙ্গ আকুতিকে আভাসিত ক'রে তুলতে করে প্রাণপণ।

বাংলার রংগমঞ্চের আদি স্রষ্টারা পেয়েছিলেন এই পরম সত্যের সন্ধান, বাংলা রংগমঞ্চের জন্মও তাই সঙ্গীত বহুল নৃত্যনাট্যে। বাংলার আদি নাট্যাভিনয় যাত্রা বা অপেরার গীতি-নৃত্য বাহুল্যই নাটকে নৃত্যের সর্ব প্রাধান্যের জীবন্ত প্রমাণ। বহুদর্শী মনীষি রবীন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন এই একান্ত সত্যের ইংগিত, তাই, শেষজীবনে নাটকে তাঁর নৃত্যই হয়েছিল ভাবের প্রধান বাহন। আদি যুগের নাটকে নৃত্যই ছিল অভিনয়ের প্রধান অংগ, সেই জন্যেই নাট্যাভিনয়কে সে যুগে বলা হ'ত নৃত্যাভিনয়। বাংলা নাটক ছিল তাই সে সময়ে প্রাণবন্ত নৃত্য। বাঁচিয়ে রেখে-ছিল তা'র বৈশিষ্ট্যটুকু তা'র অবিমিশ্র স্বাতন্ত্রের সত্বাটুকু সে কালের ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাট্যাভিনয়ের মধ্যে। পেশাদার রংগমঞ্চের পিতা গিরিশচন্দ্রের যুগের পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের সময়েও ভারতীয় নৃত্য ছিল শ্রেণী স্বতন্ত্র,—একটি অপরটির রীতি বা প্রভাব মুক্ত। নটরাজ মহাদেব যে নৃত্যকলার আদিগুরু, নবারুণ রাগ রঞ্জিত সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে পিনাকপাণি নটরাজের আপন অন্তরের উদ্দাম আবেগে ডমরু তালের তাণ্ডব নৃত্যে হয়েছিল যে প্রথম নৃত্যের সৃষ্টি, সেই দেবাদিদেব মহাদেব আশ্রিত পৌরাণিক নাটকের যুগে ভারতীয় নাটক অক্ষুন্ন রেখেছিল তাদের শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র। সে কালের পৌরাণিক নাটক রুদ্ররসাত্মক 'উমা-তাণ্ডব' 'আনন্দ-তাণ্ডব' নৃত্য বা ইন্দ্রের সভায় উর্বশীর আদি-রসাত্মক নৃত্য ছাড়া অন্য কোন প্রকার নৃত্য বিশেষ হ'ত না, সেই জন্যেই নৃত্যের শ্রেণীগত বা রীতিনীতি গত বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল।

কিন্তু তারপর ঐতিহাসিক নাটকের যুগে মোগল কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় নৃত্যের এই আদি শ্রেণী-স্বাতন্ত্রে ধরল ভাংগন। বাইজী নৃত্যের মাধুকরী আকর্ষণী শক্তির আকর্ষণে ক্রমশঃ তা'র সমস্ত শ্রেণী গেল এক সংগে মিশে

এই ঐতিহাসিক নাটকের যুগেই হ'ল ভারতীয় নৃত্যের ধ্বংসের বীজ বপন।

এই ভাবে মিশতে মিশতে আধুনিক সামাজিক নাটকের যুগে রংগমঞ্চ থেকে নৃত্য হ'ল অদৃশ্য। সামাজিক নাটকে ভারতীয় নৃত্যের সেই মিশ্র-রূপেরও প্রবেশ নিষেধ। এ বিষয়ে আধুনিক মঞ্চাধ্যক্ষদের একান্ত সংরক্ষণশীলতায় হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে আসা ভারতীয় নৃত্যের নিরবিচ্ছিন্ন ধারার বেগ গেল শুকিয়ে। তারই ফলে বাংলা নাটক আর মঞ্চ আজ অধঃপতনের বর্তমান স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে। আঘাতের মধ্যে দিয়ে বাংলা মঞ্চাধ্যক্ষদের আজ এ কথা বোঝা উচিৎ যে নৃত্যছাড়া নাটক বাঁচতে পারে না। মীড় মূর্চ্ছনার মত যে ভাবের কোনো ভাষা নেই, বাস্তব জগতের ভাব প্রকাশোপোযোগী কোন অভিব্যঞ্জনাই যে অনঙ্গ বৈদেহীর যথার্থ রূপের কোন হদিসই পায় না,—সে অসাধ্য-সাধন করে একমাত্র নৃত্য। স্বপক্ষের যুক্তির শক্তি বৃদ্ধির আকাঙ্খায় অনেক আধুনিকই হয় তো বল্‌বেন যে হৃদয়ের সকল ভাব প্রকাশেই নৃত্য কি সমর্থ? তাঁদের এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বল্‌ব হ্যাঁ তা সম্ভব। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে, "আদি সোহাস্য করুণ-রৌদ্র-বীর ভয়ানকাঃ।

বীভৎসাদ্ভুত-সংজ্ঞৌ চেতাষ্টৌ কাব্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥

শান্তশ্চ বৎসলশ্চেতি স্মৃতো নব দশ কচিৎ।"—অর্থাৎ,

আদি, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এই আটটি বা শান্ত, বাৎসল্য নিয়ে যে দশটি রসের উল্লেখ আছে তা'দের প্রত্যেকটিকে আশ্রয় করে এক এক জাতের নৃত্য গড়ে উঠেছে। অন্তরের ভাবসংঘাতে যে রসের জন্ম ভাবসংঘাত জাত নাটকের যে কোন ভাবেরই সুষ্ঠু রস-পরিবেশনে যে তারা সমর্থ এ কথা প্রমাণ নিরপেক্ষ সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নৃত্যের ভাব প্রকাশের অভাবে নয় বরং আধুনিক রংগমঞ্চের কর্ণধারগণের প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার অভাবেই নাটকের আসর থেকে তার প্রধান বাহন নৃত্য হয়েছে নির্বাসিত আর তার ফলেই বাংলা নাটকের আজ এ অধঃপতিত গ্লানিকর দুরবস্থা।

আধুনিক যুগে নৃত্যের যেটুকু স্থান আছে, তা চিত্রে। শুধু স্থান আছে কেন, বরং বলি যে নৃত্য বাংলাচিত্রের সংগে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রায় প্রত্যেক চিত্রেই এক বা একাধিক নৃত্যের সমাবেশ হয়ে থাকে। হিন্দী চিত্র এ বিষয়ে আরও এগিয়ে গেছে। নৃত্যহীন হিন্দীচিত্র একালের লোকেদের কল্পনারও অগোচর। কিন্তু পরম পরি-তাপের বিষয় এই যে, তার মধ্যে 'লেও সখি লেও ভর, পিয়ালা' বা 'দেহ-বল্লরীফুল্ল আনন্দে, মম যৌবন উন্মনা গন্ধে' এ রকম অতি নিকৃষ্ট স্তরের আদিরসাত্মক 'বাইনাচ' ঢংগের ভাবাবেদন ছাড়া আর কিছুই নেই। কোন প্রাচ্য নৃত্য বিশেষের অবিমিশ্র স্বাতন্ত্রিক রূপের রূপায়ন কোন চিত্রের নৃত্যেই নেই। যা আছে প্রাচ্য নৃত্যের পাঁচমেশালি অঙ্গ সঞ্চালন হ'লেও তা নৃত্য নয়। আজ পর্যন্ত স্বনামখ্যাত নৃত্যরসিক শ্রীমধু বোস প্রযোজিত একটি মাত্র ঐতিহাসিক চিত্রে উচ্চাঙ্গের যথার্থ

প্রাচ্য নৃত্য সমাবেশের প্রচেষ্টা হয়েছে; তা ছাড়া বাকি সব অকথ্য।

কিন্তু এর কারণ কি? কারণ কৃষ্টি আর সংস্কৃতির অভাব। নৃত্যের আদি গুরু ভরত মুনির প্রাচীনতম প্রামাণিক গ্রন্থ, নৃত্যকলা বিষয়ে যা দেবস্বরূপ, তার মতে নৃত্য শাস্ত্র অনুযায়ী নৃত্যের প্রধান অঙ্গ চারটি। রেচক বা দেহ-সঞ্চালন, করণ বা ভঙ্গি-বিশেষ, অঙ্গহার বা ভাব-অভিব্যঞ্জক ভঙ্গী আর মুদ্রা বা হাত-অঙ্গুলির ব্যঞ্জনা। একে নৃত্যশাস্ত্রের চতুরঙ্গ রীতি বলা যেতে পারে। রেচক—হস্ত-রেচক, পদ-রেচক, কটি-রেচক, গ্রীবা-রেচক এই চার প্রকার। তা ছাড়া করণ ও মুদ্রা অসংখ্য। এই চতুরঙ্গ রীতির কোন একটির প্রাধান্য অনুসারে প্রাচ্য নৃত্যের শ্রেণী বিভাগ হ'য়েছে। যে নৃত্যে এই চতুরঙ্গ রীতির একাঙ্গের বিশেষ ব্যবহার আছে সেটা সেই নৃত্যের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য, যাকে ঘুরিয়ে বলা হয় বিলাতী প্রথায় টেক্‌নিক্ (Technique)। মণিপুরী নৃত্যে এই চতুরঙ্গের রেচক বা দেহ-সঞ্চালনের আধিক্য আছে। তাতে মুদ্রার ব্যবহার বিশেষ নেই। অঙ্গ-ভঙ্গিমার সূক্ষ্ম অভিব্যঞ্জনাই মণিপুরী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য। পশ্চিম ভারতের 'কথক' নৃত্যে তবলার দ্রুত বোলের সাথে দ্রুত পরিবর্তনশীল পায়ের কাজ দেখান হয় বেশী। আধুনিক চিত্র-শিল্পে, বিশেষতঃ হিন্দী চিত্রে পশ্চিম ভারতের এই 'কথক' নৃত্য আর দাক্ষিণাত্যের 'তাঞ্জোর' নৃত্যের সংমিশ্রণে এক মিশ্র শ্রেণীর নৃত্যই সংযোজিত হয়ে থাকে। সেটা ভারতীয়-নৃত্যের কোন অবিমিশ্র বিশিষ্ট শ্রেণীর নৃত্য নয়। হাতের মুদ্রার বহুল ব্যবহার হয় 'কথাকলি' নৃত্যে। আধুনিক বাংলার নৃত্য দক্ষিণ ভারতের এই 'কথাকলি'। এই শ্রেণীর নৃত্যে একটা সম্ভ্রান্ত মার্জিত রুচির শালীনতা আছে। কিন্তু বাংলা চিত্রের নৃত্য অবিমিশ্র এই 'কথাকলি' নৃত্য নয়। তা 'কথাকলি', মণিপুরী আর 'কথক' নৃত্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

অধুনা প্রচলিত এই কয়টি ক্লাসিক নৃত্য ছাড়া চিত্রে আর এক জাতের নাচের প্রাধান্য দেখা যায়। সেটা হচ্ছে "লোকনৃত্য" যাকে বলে Folk Dance অশিক্ষিত জনসাধারণ বিশেষতঃ গ্রামবাসীরা নৃত্য শাস্ত্রের বিধান না জেনে বা না মেনে মনের দুর্বার বাসনাবেগের যে দৈহিক প্রকাশ করে সেটাই হ'ল 'লোকনৃত্য'। "রায় বেঁশে" বা "রাইবেশী" যা বাংলার বহুল প্রচারিত নিজস্ব সম্পদ আর ব্রতচারী নৃত্যের অন্য সব নৃত্যই এই "লোক-নৃত্যে"র সমগোষ্ঠীর। হিন্দী চিত্রে বা অল্প কয়েকটা বাংলা চিত্রেও এ নৃত্য দেখা গেছে। কিন্তু কি হিন্দী কি বাংলা কোন দেশের কোন চিত্রের নৃত্যেই কোন অবিমিশ্র ভারতীয় নৃত্যের সমাবেশ আজকাল আর হয় না। যা হয়, তা হয় আধুনিক প্রতীচ্যের অসভ্য অংগ-দোলন বিলাস, আর না হয় বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় নৃত্যের অদ্ভুত অবোধ্য সমন্বয়। এই দুইটিই পতনাত্মিক যার প্রত্যক্ষ ফল আমরা দেখছি আজ বিক্ষুব্ধ চিত্তে।

দূর-দর্শী ঋষি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অলৌকিক প্রাতিভার প্রভাবে হয় তো পূর্বাহ্নেই দেখেছিলেন ভারতীয় নৃত্যের এই শোচনীয় পরিণাম, তাই, তাঁর নিজের নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে চেয়ে ছিলেন বেঁধে রাখ্‌তে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের সেই অনুন্নত গৌরবটুকু। কিন্তু সস্তারস-পিপাসু অধঃপতিত আধুনিক বাংলার ভাগ্যবিড়ম্বনায় হয়েছে তা অসহ্য; সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে ভারতীয় নৃত্য এসে দাঁড়িয়েছে তাই আজ এই অগৌরবের আসনে। বিশ্বকবি বল্‌তেন, "নারকেল গাছ যেমন সমুদ্রের হাওয়ায় দুলছে তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।" দেশের সমস্ত অধিবাসীই যখন নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত তখন তাদেরই জীবনের ভাবসংঘাতে জন্ম যে নাটকের, নৃত্য ছাড়া যে তা বাঁচতে পারে না একথা ভেবে সাবধান হবার—নিজেদের ভুল সংশোধন করবার দিন আজ এসেছে বাংলার নট, নাট্যকার আর নাট্য শিল্পপতিদের। অন্যথায় বাংলার সংস্কৃতির যে সর্বনাশ তাঁরা করবেন দেশের ইতিহাসে সে কথা থাক্‌বে লেখা।

মুক্তিস্নান
মুক্তিস্নান করে মোক্ষ
লাভের লোভ মনে জাগে
না কার? কিন্তু মুক্তিস্নানের
যোগ ও তীর্থস্থানে পৌঁছবার
সুযোগ বছরে কবার আসে? তবে
স্নানের পবিত্রতাবোধ বলতে যা বোঝায়
তার যোগাযোগ ঘটানো কিন্তু প্রতিদিনই
সম্ভব। চাই—একখানা ভালো সাবান আর
পরিষ্কার জল—তা কলেরই হোক বা কুয়োর,
নদীরই হোক বা পুকুরের। আর ভালো সাবান বলতেই মনে পড়া উচিত
'রেণু'—কারণ এমন সুলভে এত ভালো
সাবান বাজারে বড় বেশি নেই। অল্প মাখলেই
'রেণু'-র প্রচুর সুগন্ধি ফেনরাশি দেহ সম্পূর্ণ
পরিষ্কার করে মনে রেখে যায় একটি
স্নিগ্ধ পবিত্রতার অনুভূতি। তাতে
মোক্ষলাভ না হোক তৃপ্তিলাভ
যে অনিবার্য সন্দেহ নেই।
রেণু
শিশির সোপ ওয়ার্কস দমদম
সোল সেলিং এজেণ্টস: হিন্দুস্থান মার্কেণ্টাইল
কর্পোরেশন লিঃ, ৭৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পদ্মপিসি আর পলমুনি

—মনোজিৎ বসু

হলিউডের বিখ্যাত চিত্র-তারকা পল-মুনির সংগে বাজে শিবপুরের পদ্ম-পিসির কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে ইহা যেন নিতান্ত-ই অসম্ভাব্য! কিন্তু এই বিরাট বিশ্বচক্রের ঘুর্ণিপাকে প্রতিদিন কত যে অসম্ভব ঘটনাই যে ঘটিয়া যাইতেছে তাহার তো ইয়ত্তা নাই। অসম্ভাব্য বস্তুই একদিন অতর্কিতে বিনা নোটিশে সম্ভাব্যের ছাড়-পত্র লইয়া হাজির হয়। তখন আর কিছু না হোক, বিস্ময়ের মাত্রাটা বাড়িয়া যায় এ-কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

হ্যাঁ যে-কথা বলিতেছিলাম। পদ্ম-পিসি আর পলমুনি।

বাজে-শিবপুরের পঞ্চুকে বোধহয় আপনারা দেখিয়া থাকিবেন। ঐ যে ঘাড় কামানো কোঁকড়ানো চুল, গায়ে গিলে করা চুড়িদার পাঞ্জাবি, ঘাড়ের কাছের দুটি ঘর বোতাম খোলা, পায়ে বিদ্যেসাগরী চটি, (আধুনিক তরুণদের ফ্যাশন) কালো কুচ্‌কুচে চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ, ছেলেটি প্রায়ই কলেজস্ট্রীটের মোড়ের বুকস্টলে দাঁড়াইয়া বিশেষ ধরণের বই লইয়া নাড়াচাড়া করে, কিংবা মেট্রো বা লাইটহাউসের ফোর্থক্লাসের বুকিং-উইনডোর সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ছোলাভাজা চর্বণ করে, সেই আমাদের পঞ্চানন, ওরফে পঞ্চু। পাঁচজনে সেই নামেই তাহাকে ডাকিয়া থাকে। সেই নামই তাহার নামডাক। সেই পঞ্চুর একমাত্র অভিভাবিকা পদ্মপিসি।

পদ্মপিসি পঞ্চু বলিতে অজ্ঞান। বাপ-মা মরা বংশের একমাত্র জয়ধ্বজা! তাহাকে তিনি শৈশব হইতে মাতৃস্নেহে লালন পালন করিয়া আসিয়াছেন। পঞ্চুর বাবা দিগম্বর পাকড়াশী ছিলেন বাজে শিবপুরের স্বনামধন্য ব্যক্তি। মরিবার সময় বিধবা ভগ্নীর হাতে নাবালক পুত্রকে সমর্পণ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন—"পদ্ম, পঞ্চু-কে আমার দেখিস। ও যেন কোনদিন কষ্টভোগ না করে।"

মৃত্যু-শয্যায় অগ্রজের সেই অন্তিম-বাক্য পদ্মপিসি ভোলেন নাই। তাই কুড়িবৎসরের পঞ্চাননকে তিনি এখনো আঁচল চাপা দিয়া রাখিতে চান। কিন্তু ছেলে সেয়ানা হইয়াছে। ঘরে তাহার মন বসেনা। সারাদিন ক্লাবে, আড্ডায়, মজলিসে আসর সরগরম করিয়া ফেরেন।

পদ্মপিসি যদি বলেন—ওরে হতভাগা, দিনরাত্রি কোথায় থাকিস, কি করিস ভেবে পাইনা। তোর জন্যে কি আমার দু'দণ্ড শান্তি নেই।'

ঠোঁটের সিগারেটটা চাপিয়া পঞ্চু জবাব দেয়—আমার জন্যে ভেবো না পিসি। আমি তো আর ছেলে-মানুষটি নই, যে ছেলেধরা নিয়ে যাবে। I am O. K.'

পঞ্চুর ইংরেজি ও, কে, (O. K.) শুনিয়া পদ্মপিসি ঠিক বুঝিতে পারেন না। বলেন—কই, কে আবার, কেউ তো নেই। তুই ওকে বলে উঠ্‌লি কেন?'

পঞ্চু হাসিয়া বলে—সাধে কি বলি পিসি, ইংরেজি শেখ, ইংরেজি শেখ। নইলে এ-যুগে অচল। ও, কে, মানে ওকে নয়—মানে অলরাইট, অর্থাৎ আমি ঠিক আছি। বুঝলে?'

—হ্যাঁ, কি তোদের ইংরাজি কথা বাপু, বুঝিসুজি না অতশত। যাক্‌গে সে-কথা। এখন বল দেখি সারা সন্ধ্যে কোথায় ছিলি?'

পঞ্চু জামা খুলিতে খুলিতে জবাব দেয়—হুঃ পিসি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে হয়রাণ। আর পারি না বাপু। গিয়েছিলাম বায়স্কোপ দেখতে 'বঙ্গবাসীতে' বুঝলে?'

পদ্মপিসির সুর নরম হইয়া আসে। ছেলে চটিয়া গিয়াছে। হয়তো অভিমান করিয়া না খাইয়াই শয্যা গ্রহণ করিবে, কিংবা সারা বাড়ি চেঁচাইয়া কাঁপাইয়া তুলিবে কি, কী করিবে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই।

তিনি কাছে আসিয়া পঞ্চাননের হাত ধরিয়া বলেন, 'এই দেখ ছেলের কাণ্ড। আমি কি রাগ করতে বলেছি। তা গিয়েছিস বায়স্কোপ দেখতে সে তো ভালই, যত খুসি দেখ না, কে তোকে বারণ করছে রে বাপু—তাই ব'লে পিসির ওপর রাগ করতে আছে মাণিক!'

মাণিক জানেন পিসির দুর্বলতা কোথায়। ঠিক জায়গায় গিয়া ঠিক ওষুধ পড়িয়াছে। আর ভাবনা নাই।

কাজেই আবদারের সুরে বলে—ও পিসি! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে শিগ্‌গির খেতে দাও—পেটে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জ্বলছে।'

পিসিমাও তাড়াতাড়ি খাবার আনিতে ছোটেন। খাইতে খাইতে পঞ্চু বলে—জানো পিসি আজ যে ছবি দেখলাম সে আর কি বলব। গুড্ আর্থ। পলমুনির বেষ্ট (best) ছবি। উঃ কি মার্ভেলাস এক্টো করেছে পলমুনি, তুমি যদি দেখতে!'

পদ্মপিসি বলেন—ঠাকুর দেবতার ছবি বুঝি? 'পঞ্চুর মাথায় হঠাৎ দুষ্টু-ফন্দী জাগিয়া উঠে। সে বলে—হ্যাঁ, ঠাকুর দেবতার ছবি-ই তো। নইলে অমন ভালো ছবি হয়।' উদ্দেশ্য, এই ফাঁকে পিসিকে রাজি করাইতে পারিলে তাহার আর একবার পলমুনির অভিনয় দেখা হইয়া যায়। সে ঠিক করিয়াছে আগামী শারদীয়া পূজার সময় পাড়ার 'টিপু-সুলতান' অভিনয়ে মীরকাশিমের পাটে' সে পলমুনির মার-প্যাঁচ দেখাইয়া ছাড়িবে। তাহা হইলে তাহাকে আর পায় কে। মীরকাশিমের এ্যাক্টিং-এ সে সবাইকে ফ্ল্যাট করিয়া ছাড়িবে।

পিসিমা যাইবেন, কাজেই টিকিটের জন্যে কোনো ভাবনা নাই। পিসিমা তো আর ফোর্থ ক্লাসে যাইতে পারেন না—কাজেই, থার্ড-ক্লাসের টিকিট করা যাইবে। একটু ধরিয়া বসিলে পিসিমা ফাষ্টক্লাসের পয়সাও অনায়াসে বাহির করিয়া দিবেন। পঞ্চু পদ্ম-পিসির দুর্বলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

পদ্ম পিসি রাত্রে একবার জিজ্ঞাসা করেন—কার ছবি বল্লি, কি মুনি যেন?'

—পল্‌মুনি, পলমুনি!'

পদ্মপিসি সমস্ত স্মৃতির ভাণ্ডার খুঁজিয়া ফেরেন—কিন্তু বহু মুনি-ঋষির মধ্যেও পলমুনির কথা তাঁহার স্মরণ পথে উঁকি দেয় না। হয় তো কোন স্কন্দপুরাণ, কি মার্কণ্ডেয়-পুরাণে তাহার কথা পড়িয়াছিলেন, এখন আর মনে নাই। কি করিয়াই বা অত নাম মনে রাখা যায়। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে তো আর মুনি-ঋষির অন্ত নাই। কলিযুগেও যে আবার মুনিঋষির আবির্ভাব হইতেছে ইহা আশার কথা।

পলমুনি কোনদেশের মুনি। যে-দেশেরই হউন তিনি মুনি। স্বয়ং তাহার ছবি। ধর্মপ্রাণ পদ্মপিসির অন্তরে সাড়া জাগে। তিনি জপের মালা বন্ধ করিয়া মুনির উদ্দেশ্যে নমস্কার জনাইয়া নিদ্রা যান।

পরদিন বৈকালে ভাইপো ও পিসিতে মিলিয়া 'বঙ্গবাসী'তে পলমুনির ছবি দেখিতে চলিয়াছেন। ভাইপো মনে মনে মীরকাশিমের পাটে পলমুনির ম্যারপ্যাঁচ ঢোকাইবার চিন্তায় মগ্ন, আর পিসিমা ভাবিতেছেন, স্বয়ং মুনিঋষির ছবি দেখিয়া তাঁহার জীবন আজ সার্থক হইতে চলিয়াছে। পঞ্চুর প্রতি স্নেহ প্রগাঢ় হইয়া আসে। পঞ্চুর ধর্মে, দেবদ্বিজে মতি দেখিয়া পদ্মপিসি মনে মনে আশ্বস্ত হন।

বায়স্কোপ কে না দেখে। তাই বলিয়া ঐ সব ছাতা-মাতা ছবি না দেখিয়া পঞ্চু যে ঠাকুর দেবতা, মুনি ঋষির ছবি দেখে—ইহাতে আশঙ্কার কথা নাই, বরং আশার কথাই!

হলে ঢুকিতে গিয়া পঞ্চু লক্ষ্য করে পদ্মপিসি হঠাৎ যেন হলঘরের চৌকাঠ হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া মাথায় ঠেকান, পরে সন্তর্পণে চৌকাঠ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করেন। পঞ্চু অবাক হইলেও, আমরা অবাক হই নাই। কারণ বহু ছবিঘরে দেখিয়াছি যে, তাহাতে কোন পৌরাণিক দেব-দেবীর ছবি দেখিতে আসিয়া বহু নরনারী হলে ঢুকিবার পূর্বে পায়ের পাদুকা ইত্যাদি খুলিয়া হাতে করিয়া তবে প্রবেশ করিয়াছেন। ধর্মপ্রাণদের ধর্মতত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য না হওয়াই স্বাভাবিক!

ছবি দেখিতে দেখিতে পঞ্চু মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কখনও বা অসতর্কতা বশে বলিয়া ফেলিতেছে—বাঃ, খাসা! মারভেলাস!' এন্‌কোর পর্যন্ত!

পদ্মপিসি কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে ছবি দেখিতেছেন। আর মাঝে মাঝে হাত তুলিয়া পর্দার দিকে নমস্কার করিতেছেন।

পঙ্কু এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে পদ্মপিসি কি ভুল করিয়া ছবি দেখিতে আসিয়াছেন। পলমুনিকে সত্যি মুনি ভাবিয়া লইয়া বার বার নমস্কার করিয়া অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন পর্যন্ত। আহা পিসির কি ভক্তি! পঙ্কু একটু আপন মনে হাসিয়া ফেলে।

একটা কথা পঙ্কুর মাথায় আসে না, পদ্মপিসি তো ইংরেজি জানে না, তবে কি করিয়া অমন তদ্গত চিত্তে ছবি দেখিয়া যাইতেছে। তাহার কাছে ইহা 'এ্যাটম্ বোমা'র মতই দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়।

বাড়ী ফিরিবার পথে পঙ্কু জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ পিসি কেমন লাগলো?'

পদ্মপিসি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলেন, 'আহা এমন ছবি আর দেখিনি! আরও তো কত ঠাকুর দেবতার ছবি দেকিচি, কিন্তু এ তাদের চাইতে আলাদা। মুনিঋষিদের কথাই আলাদা।'

শৈলজানন্দ পরিচালিত 'মানে-না-মানা' চিত্রে সন্ধ্যারাণী

—কিন্তু পিসি, সব কথা তুমি বুঝলে?'

পদ্মপিসি হাসিয়া বলেন—আমরা হচ্ছি সাধারণ মানুষ, আমরা কি আর মুনিঋষিদের সব কথা বুঝতে পারি বাবা! তাঁরা হচ্ছেন দেবতুল্য লোক—তাঁদের সব কথা বোঝবার ক্ষ্যামতা কি আর আমরা রাখি?'

পদ্মপিসি পলমুনির উদ্দেশ্যে আবার হাত তুলিয়া নমস্কার করেন। পঙ্কু তাঁহার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে।

সুগন্ধে
রূপ হবে রমনীয়
হোয়াইট রোজ
মনের মতন
বকুল
যুথী
লিলাক
P.A.S
পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

ভুলি নাই প্রিয়া

(গল্প)

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

রাত অনেক হয়ে গেছে, ঘুম আসেনা নীলার। আলোটা জ্বলছে, ওপাশের টেবিলে লিখে চলেছে বিনয় মাথাটা নুইয়ে, খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর নীলা উঠে আসে বিছানা থেকে।

আলোটা সহসা নিভে যেতেই অন্ধকারে বিনয়ের লেখা বন্ধ হয়ে যায়, চীৎকার করে ওঠে সে' আলোটা আবার জ্বলে উঠতে দেখা যায়, দাঁড়িয়ে রয়েছে নীলা, চোখে মুখে তার লজ্জার ছায়া।

—"কেন আলো নিভিয়েছিলে? দিলেত লেখাটা মাটি করে?"

বকুনি খেয়ে নীলা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় বিছানার দিকে। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়েই বাইরের বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়। অন্ধকারে তার পদবিক্ষেপ শোনা যায়। বিছানায় অসহায়ের মত পড়ে থাকে নীলা। লজ্জায় অপমানে তার চোখে আসে জল! বাইরে ঘনিয়ে আসে রাত্রি। চোরের মত ঘরে ঢোকে বিনয়। আলোটা জ্বালতে গিয়ে থেমে যায় ধীরে ধীরে। বিছানার দিকে এগিয়ে যায়! চুপি চুপি নীলাকে ডাকবার চেষ্টা করে, নীলার সাড়া নাই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে হয়ত, ধীরে ধীরে সরে আসে।

একটা মোমবাতি জ্বেলে বাকীটুকু লিখতে বসে বিনয়।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে মাথা দিয়ে জানে না, মোমবাতিটা নিঃশেষ হয়ে পুড়ে গেছে, সকালের রোদ জানলা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে। নীলা তাড়াতাড়ি করে উঠে, ঘুমন্ত বিনয়ের দিকে এগিয়ে যায়, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে লেখা কাগজগুলো। সবগুলি গুছিয়ে রেখে সন্তর্পণে বার হয়ে যায় সে!

* * *

বেলা হ'য়ে গেছে। দুপুরের সূর্য মাথার উপরে উঠে আবার পশ্চিম দিকে যাত্রা সুরু করেছে, বিনয়ের দেখা নাই, নীলা করুণ নয়নে জানালার দিকে চেয়ে থাকে হঠাৎ ঘরে পিসীমার গলার শব্দ শুনেই ফিরে চায়।

"এখনও খেলেনা বৌমা, তার কি কোন হুস আক্কেল আছে! ফিরবে যখন তার মন হবে। যাও বাছা খেয়ে নাওগে।" নীলা আমতা আমতা করে—"আর একটু দেখি পিসীমা।"

পিসীমার বয়স হয়েছে: শীঘ্রই চটে উঠেন, "ওইত তোমার আদিখ্যেতা বাছা, যা ভাল বোঝ করগে।"

বেলা বেড়ে চলে, রুদ্ধ দ্বার কক্ষে নীলা একা বসে ভাবে যত সব আকাশ পাতাল···প্রথম যখন তাদের বিয়ে হয়, সে বিনয় যেন বদলে গেছে। ফুলশয্যার রাতে নিবিড়-ভাবে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। লজ্জায় জড় সড় হয়ে ওঠে নীলা—কানের ডগা গরম হয়ে আসে। চুপিচুপি বলেছিল সেদিন—

"কোনদিন আর ছেড়ে থাকলে চলবে না কিন্তু! আমার গানে, লেখার সবকিছু মাঝে তুমি থাকবে প্রাণ হয়ে।"

নীলা অবাক হয়ে যায়, সেকি গান?

হেসে ফেলে, সে কি জান না—

রেকর্ডখানা গ্রামোফোনের উপর বসাতেই সারা ঘরখানা ভরে ওঠে গানের সুরে—ঝরা ফুলে চরণ থেকে, কে তুমি এলে,

"বুঝলে নীলা সে তোমার আগমনীতে—আমার নূতন গান উজ্জল হয়ে উঠলো।"

তারপর দিন যায়—একটার পর একটা লিখতে বসবার আগে ঘরটা বিনয়ের গানের হালকাসুরে ভরে ওঠে। তার কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে—নীলা—নীলা—

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হাতের কাজ ফেলে রেখে নীলা আসতেই অবাক হয়ে যায়। নিজেকে তার বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে।

"ওমা গো! কি বেহায়া—ছাড়—ছাড়"

হাসতে থাকে বিনয়। ঝঙ্কার তোলে নীলা

"আবার একটা! কখখনো না।" কসে বসিয়ে দেয় বিনয়ের গায়ে একটা চিমটি, চীৎকার করে ওঠে বিনয় "উঃহু লাগছে।

বলে নীলা—"তবে খারাপ নয়। লাগছে ভালই।"

আজ সে সব কথা স্বপ্নের মত মনে হয় নীলার—কাজ করবার সময় শব্দ করলেই নাকি লেখার ব্যাঘাত হয়। কেউ ঘরে থাকলেও নাকি লিখতে পারে না। নীলা যেন আজ তার চক্ষুশূল।

সিঁড়িতে সারা সিঁড়িটা কাঁপিয়ে যেন আসছে কে। দরজা খুলতেই নীলা এগিয়ে যায়। বিনয় কোনদিকে না চেয়েই তাকে টেনে নিতে যায় বাহু বন্ধনে—সরে আসে নীলা।

বিনয় ভ্রূক্ষেপ করে না। বলে, নীলা আজ আমার মেসে নেমতন্ন।"

পিসীমা বার হয়ে আসতেই মুহূর্ত মধ্যে বিনয়ের এত হাসি উচ্ছ্বাস যেন কোন দিকে মিলিয়ে যায়। মুখটা যন্ত্রনায় বিকৃতকরে সেইখানেই সিঁড়ির রেলিং ধরে হেলান দিয়ে বসে পড়ে কাতরাতে থাকে—উঃ পেটে দারুণ যন্ত্রণা, ডাক্তারখানায় বসেছিলাম!"

পিসীমা ছুটে আসেন—হ'ল ত। তোর মনের সাধ মিটলত। এবার বলি ওরে, চানটান করে যা—বাড়ী থেকে খেয়েদেয়ে—কথা যদি কানে তুলবে! ওরে ও রামকিষণ একবার ডাক্তার বাবুর ওখানে যা—!"

বিনয় কোনরকমে নীলার হাত ধরে উঠে যায় ভিতরে, হাসতে থাকে ঘরের মধ্যে! হাসিতে যোগ দেয় না নীলা! চুপ করে যায় বিনয়—"তোমার খাওয়া হয়নি?"

গম্ভীরভাবে জবাব দেয় নীলা—আমাদের ওটা মানতে হয়! খাই কি করে!"

* * *

রাত্রি হয়ে গেছে অনেক! জলসা জমে উঠেছে। গানের সুরে সারা দালানটা ভরপুর। সিতারা বাইজীর পায়ের ঘুঙুর আজ বাধা মানে না। মুলতানী সুরের মায়াজাল যেন অশরীরী রূপে সারা হলটা ভরিয়ে রেখেছে! সারেংগীওয়ালার হাতে এসেছে বিজলীর বেগ। নূপুরের শব্দ বীণার সুর ঝংকারে বিনয়ের অবচেতন মনের মধ্যে আনে তৃপ্তির খোরাক! হঠাৎ কুমার বাহাদুরের ধাক্কায় চমকে উঠে বিনয়—"কেমন লাগছে কবি!"

"বেশ, এদের গানের বৈশিষ্ট আছে!"

মদের ঘোরে বলেন কুমার বাহাদুর—"থাকবে না! একি তোমাদের সিনেমা—রেকর্ড কোম্পানীর সস্তা জিনিষ! চলবে?" গেলাসটা এগিয়ে দেয় বিনয়ের দিকে ঘাড় নাড়ে বিনয়!

উঠতে যাবে বিনয় হঠাৎ কি একটা আবিষ্কার করেই অপ্রস্তুত হয়ে যায় তারা, সিতারার সংগী মণিকার শাড়ীর সংগে কখন যে বন্ধুরা তার চাদর গেট দিয়ে বসেছিল জানে না, উঠতে গিয়ে টান পড়ে, সকলে হেসে ওঠে। বিনয়ের চোখ মুখ লাল হয়ে যায়! বন্ধু টিপ্পনী কাটে—"সেকিহে; এরি মধ্যে।"

মেয়েটিই বাঁধনটা খুলে দেয়! তার চোখের পাতায় ফুটে ওঠে অস্পষ্ট হাসির আভা! তাড়াতাড়ি বাইরে এসে হাফ ছেড়ে বাঁচে বিনয়! গুণ গুণ গাইতে গাইতে চলে সন্ত শোনা গানটা!—চলেছে জনহীন রাস্তা দিয়ে বিনয়।

সকালবেলায় উঠেই সেই সুরটা মনে পড়ে, রাত্রির শোনা! সেই মেয়েটির কথা—ভোলেনি! ঘরের দরজা বন্ধ করে কলম নিয়ে বসে যায়!—সুরের উপর অনেক গানই আসে, সুন্দর হয়ে! সকালের রোদ বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে, তারই ছোঁয়া লাগে বিনয়ের সারা মনে।

এম, পি, প্রডাকসন্সের সাত নম্বর বাড়ীতে মিহির ও মলিনা দেবী

কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে আসর জমে উঠেছে, গত রাতের জলসার বিষয়ই আলোচনা চলেছে বেশ রসাল কলেবর রূপ ধারণ করে। হঠাৎ বিনয়কে প্রবেশ করতে দেখেই সকলে সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে। কে যেন এসে তার গালে হাত দিয়েই সম্ভাষণ ক'রে, এড়িয়ে যায় বিনয়।

কুমার বাহাদুর বিনয়ের প্রশ্ন শুনেই অবাক হয়ে যান। "তোমার আবার এসব রোগ ভাল নয় কবি! বাইজীর গান শুনলে—সেই ভাল, বেশী মাখামাখি—ভাল নয়!"

নৃপেন বলে ওঠে—"আরে সিতারা বাইজী ত! তার আবার ঠিকানা; ঠাকুর পুকুরের কাক পক্ষী জানে—তাকে!"

বার হয়ে যায় বিনয়! তার গতিপথের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে বন্ধুর দল! কুমার বাহাদুর বিনয়কে ভাল ছেলের খাতা থেকে বাতিলই করে বসেন।

চলেছে বিনয়, ঠাকুর পুকুরের খোঁজে। পাড়াটার রূপ দেখেই বোঝা যায় বিশেষ ভদ্রপল্লী নয়। পানের দোকানের আশেপাশে জমেছে কুৎসিত চেহারার মেয়েদের জটলা। একটা স্যাকড়া গাড়িতে করে জন কয়েক মাতাল। হৈ হৈ করতে করতে চলেছে। বিনয়কে দেখে হাসাহাসি করে মেয়েরা নির্লজ্জভাবে!

পানওয়ালা ঠিক চিনতে পারে না নামটা! বিনয়ের কথায় এগিয়ে আসে একজন বিশালাকায় নারী; পুরুষের মত কণ্ঠে বলে ওঠে,

"কেন? আমরা কি গাইতে জানি না, নাচিনি কোন কালে! কেন আমাদিকে কি—পছন্দ হয় না!"

আর একজন এগিয়ে আসে, প্যাকাটির মত চেহারা, ক্ষীণকণ্ঠে বলে

"চপের কেত্তন! ভগবানের নাম গান!" হাত দুটো কপালে ঠেকায়। বিনয় বেগতিক দেখে সরে পড়ে। হাসতে থাকে সকলেই, বিনয় আর পিছু ফিরে চায় না! কোন রকমে জায়গাটা পার হতে পারলে বাঁচে।

চলেছে দ্রুতবেগে···সরু গলিটা থেকে বার হচ্ছে একটা গাড়ী। সামনেই পড়ে যায় বিনয়, গাড়ীখানা আর্তনাদ করে থেমে যায়, বিনয়ও চোখ বুজে লাফ দিয়েছে। ইতিমধ্যে গাড়ীর নিক্ষিপ্ত জলকাদায় বিনয় একেবারে রঞ্জিত হয়ে যায়! তাড়াতাড়ি করে গাড়ী থেকে বার হয়ে আসে কালকের রাত্রের সিতারাসঙ্গিনী সেই মাণিকা বাইজী! বিনয় মুখ চোখের জল ঝাড়বার চেষ্টা করে। কোন ওজর আপত্তি শোনেনা, বিনয়কে শেষকালে উঠতেই হয় তার গাড়ীতে!

রাত্রি হয়ে গেছে। সিতারা বাইজীর ঘরখানা ভরে ওঠে কয়েকজন লোকের উপস্থিতিতে! এপাশে ওপাশে ছড়ান বোতল গুলো! সারেঙ্গীওয়ালা তবলচী···সকলেই মশগুল! মণিকা চুপ করে বসে থাকে দূরে! নেশা ক্রমশঃ ঘোরাল হয়ে আসতেই মণিকা বার হয়ে যায় ঘর থেকে। কেযেন রংগিন নেশায় চীৎকার করে ওঠে তার উদ্দেশ্যে। সিতারা ফিরে চায়, মণিকা তখন বাইরে চলে গেছে।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিজের ঘরে সে কী যেন ভাবে, ও সব ভাল লাগে না তার।

বিনয় লিখে চলেছে। কলমটা চলে অবিশ্রান্ত গতিতে। লিখতে লিখতে আপন মনে বলে বসে, বুঝালে নীলা। এ হবে আমার সব চেয়ে ভাল একখানা বই। রাজনটী মণিদীপা।"

জীবনের ব্যর্থ কামনার মহাযজ্ঞে আপনার সব কিছু বিসর্জন দিলে, তবু রয়ে গেল তার নারীজন্ম ব্যর্থ হয়ে। দেশের জন্য হারাতে হ'ল তার স্বামী কামন্দককে। নিষ্ঠুর পরস্বাপহারী রাজশাসনের কঠিন শিলাবেদীতলে হ'তে হ'ল বন্দী, সারাদেশে হাহাকার, নিঃস্বের আর্ত ক্রন্দনধ্বনি, সেই সময়েই স্বামীর অর্ধসমাপ্ত কাজ তুলে নিল কল্যাণী। ছোট শান্তিময় গৃহকোণ ছেড়ে তাকে বার হ'তে হ'ল··· কোশল রাজসভায় নটীর বেশে, নারীত্বের সম্মান, আজ তার কাছে তুচ্ছ। সে চায় দেশের মুক্তি, জনগণের মুক্তি। কল্যাণী আজ নটী, কোশল রাজসভায় যোগ্যময়ী রাজনটী মণিদীপা।

বাইরে রাত্রির অন্ধকার। থমথমে নীরব। লিখে চলছে বিনয়, চোখের সামনে ভেসে ওঠে কোশল রাজসভায় মণিদীপার চঞ্চলপাদবিক্ষেপ, ওদিকের শূন্য বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীলা, মুখে চোখে তার বিরক্তির ছায়া, বিনয়ের ঘরের দরজা থেকে সন্তর্পণে সরে যায়।

* * *

মণিকা বিনয়কে এ সময় আসতে দেখে আশ্চর্য হ'য়ে যায়। সবে সকাল বেলায় স্নান সেরে উঠছে উপরে, এ হেন সময়ে উস্কো খুস্কো বেশে প্রবেশ করে বিনয়। সিতারা বাইজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে,...মণিকা নিয়ে গিয়ে বসায় তাকে।

"এ অবস্থায় শরীর ভাল ত। কাল রাত্রে ঘুম হয় নি নাকি?" আরাম করে বসতে বসতে বলে বিনয় "ঘুম! কাল রাত্রে সময়ই পাই নি। নোতুন নাটক স্বপ্নভঙ্গ শেষ করলাম।"

"শেষ হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, খবরটা তোমায় না দিয়ে পারলাম না। রাজনটী মণিদীপার চরিত্র চিত্রণে যদি কারও অনুপ্রেরণা থাকে, সে তুমিই। যদি কোনদিন সফল হয় আমার, ওরই কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমি খুঁজে পাব না।"

হেসে ফেলে মণিকা তার কথা বলার ভংগীতে—"আচ্ছা সে না হয় জানাবেন।"

সকাল বেলায় নীলা চায়ের ট্রেখানা নিয়ে বিনয়ের ঘরে ঢোকে, সন্তর্পণে এগিয়ে এসে মশারিটা তুলে দেখে কেউ কোথায় নাই। বিনয় বার হয়ে গেছে।

মণিকা চায়ের পেয়ালায় লিকার ঢেলে বসেছে। বিনয়ের সামনে রাজনটী মণিদীপার পাণ্ডুলিপিটা। প্রশ্ন করে মণিকা—'কল্যাণীই ত রাজনটি মণিদীপা।"

হ্যাঁ! আজ রাজদ্রোহিতার অপরাধে তার স্বামী

কারারুদ্ধ।...তাই স্ত্রী এগিয়ে এসেছে সব কিছু ছেড়ে স্বামীর কাজ নিয়ে কোশল রাজসভায় নটীর বেশে, হোক সে নর্তকী, পরিচয়হীনা ঘৃণিত শ্রেণীর জীব, সমাজে তার ঠাঁই না থাক, তবুও সে দেশপূজ্যা—নমস্যা।

চা ঢালতে ভুলে যায় মণিকা, বিস্ময়ে বাক্যহারা হ'য়ে চেয়ে থাকে বিনয়ের দ্যুতি মাখান মুখের দিকে,..."তাদিকে ক্ষমা করবেন আপনি?'

"এতটুকু সামান্য ত্যাগ না করতে পারলে, বড় হতে চাওয়া যে মস্ত বড় ভুল।"

বেলা বেড়ে গেছে, কখন বিনয় চলে গেছে জানেনা মণিকা। নীরবে সে চেয়ে রয়েছে জানালার বাইরে, সারা মনে আজ কোন অজানা দেশের আলোর সন্ধান। নোতুন জীবনের হাতছানি। বিনয়ের কথা গুলো ভুলতে পারে না?

"হোক সে পরিচয়হীনা সমাজ পরিত্যক্তা। আমার শ্রদ্ধার দাবী সে করতে পারে, সেও মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারে।"

শরারাত চিত্রে রাণীবালা ও প্রতিমা দাশগুপ্তা

বিনয়ের মনে আজ গানের সুর। গুন্ গুন্ করে কি একটা কলি গাইতে গাইতে ঘরে ঢোকে? নীলা ঝিকে দিয়ে ছবিগুলো পরিষ্কার করাচ্ছিল; পিছন থেকে কার হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে ওঠে। পিছন ফিরেই দেখে বিনয়।..."কি বল দেখি তুমি।"

হাসে বিনয়' "আজ আর মুখ ভার করে থেকোনা, প্রথম বইয়ের আমার আজ অভিনয় হচ্ছে"...

ঝিটা বার হয়ে যায় ঘর থেকে। বিনয়ের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় নীলা। "আঃ কি ভাববে বল দেখি। আর আমার কাজ রয়েছে। পিসী মা—"

"পিসীমা আর কাজ! দুটো জিনিষ ছাড়া আর কিছু জানোনা দেখছি!"

বলে নীলা—"না তোমার মত বিদ্বান নই—বাবা দুটো পাশও করায় নি! আর কবিও নই! ও ছাড়া জানব কি বল!"

বার হয়ে যায় নীলা! বিনয় হতাশ ভাবে মুখটা বিকৃত করে!

বিনয়কে রান্না ঘরের বারান্দায় আসতে দেখে ফিরে যায় নীলা! "আজকের থিয়েটারে যাবে ত।"

আজ যে বাবার ওখানে যাবার কথা আছে। বীণা আসবে!"

"আসুক না হয় ফিরে যাবে! আজ প্রথম বই!—"

বলে নীলা—"পিসীমার সংগে যাব একদিন, আজ বাবার ওখানে যেতেই হবে। বাড়ীতেও অনেক কাজ!"

ঝিটা অবাক হয়ে যায়। আলমারি খুলে বিনয় এক-রাশ কাপড় জামা বের করে এটা সেটা পরবার চেষ্টা করে আবার ধর অন্যটা! নফরার মা বলে. "দিদিমণিকে ডেকে দিই—!"

চটে ওঠে বিনয়, "কেন, সে এসে কি পরিয়ে দেবে আমাকে!" নীলাকে প্রবেশ করতে দেখে চেয়ে থাকে তার দিকে বিনয়! বলে ওঠে নীলা—"কি হচ্ছে এ সব, পরবে ত একখানা পাঞ্জাবী আর ধুতি! নামাতে আর কিছু বাকী আছে।"

কথা না বলে বিনয় আলমারী থেকে গাদা করা সব কাপড় জামা গুলো বের করে সব নীচে ফেলে দেয়। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নীলা! বার হয়ে যাবার সময় বলে যায় বিনয় "এমন ঘরনী, ঘর তাকে ছেড়ে দেবে এ একটা কথাই নয়। কাজের অভাব ছিল, আপাততঃ সেটা মিটল ত!"

নাট্যালোকে—আজ নোতুন নাটকের অভিনয় সন্ধ্যার আগে হতেই সুরু হয়েছে লোকের ভিড়! গাড়ীগুলো রাস্তা ছেয়ে রেখেছে।

মঞ্চের পর্দা উঠাতেই দেখা যায় কোশল রাজ্যের প্রান্তসীমা! বাণীপীঠ গ্রামের দৃশ্য! তাদের যত্নে রংগিল দিনগুলো কেটে চলে, হালকা গতিতে! রাজ্যে এল হাহাকার, দুর্ভিক্ষ! সারা প্রজাবৃন্দ উত্তেজিত হয়ে ওঠে!

নীচের দিকে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে বিনয়! মণিকাও এসেছে থিয়েটারে! কল্যাণীর ভূমিকায় নেমেছে বিশালাকায়া অভিনেত্রী। তার কুৎসিত চেহারা, কণ্ঠস্বর আর নাচবার প্রচেষ্টা সারাহলের মধ্যে বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে।

একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, দর্শকরা গোলমাল সুরু করে, পাগলের মত ম্যানেজার

সাহেব ছুটে আসেন। বিনয় দাঁড়িয়ে ওঠে! বলে বসেন ম্যানেজার—"সর্ব্বনাশ! বলে কি না মাথায় চেয়ার ভাংগবো! বললাম ওরে বাবা ওকে নামাস না! নোতুন হিরোইন দেখ! বোঝ ঠ্যালা এইবার।"

সামনের লবিতে বুকিং অফিসের সামনে একজনতা চীৎকার করে চলেছে!—বই না আথার ছাই, পয়সা ফেরৎ দাও!

হলটা জনশূন্য! বিনয়—ম্যানেজার দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মণিকার কথা বিশ্বাসই করতে পারে না! ম্যানেজার সাহেব বলে ওঠেন—পারবেন আপনি?

ঘাড় নাড়ে মণিকা! ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে যায় ষ্টেজের দিকে!

সহরে কোলাহল চলেছে। উত্তেজিত জনতার হঠাৎ জনতার মাঝে একটা পরিবর্তন দেখা যায়! চুপ করে আসে সকলেই! কোশল রাজসভার দৃশ্যাভিনয় চলেছে! রাজনটী মণিদীপা নেচে চলেছে, তবলচীর হাতটা অদৃশ্য ভাবে চলতে সুরু করে! উত্তেজিত জনতা ভাষা হারিয়ে এগিয়ে আসে। শূন্য হলটাতে দেখতে দেখতে পূর্ণ হয়ে যায়। হলটার নির্বাক বিস্মিত জনতায়, মঞ্চের মধ্যে ম্যানেজার লাফাতে থাকে! বিনয় যেন স্বপ্ন দেখে! তার কল্পনার মণিদীপা আজ জীবন্ত পাদপ্রদীপের সামনে!

দেশের সারা কাগজে কাগজে ছাপা সুরু হয়েছে বিনয়ের নাটকের প্রশংসা! প্রতিভাবান তরুন নাট্যকারের অমর অবদান, সেই সংগে আর একজনের নাম? সে মণিকা, নাট্যলোকের খ্যাতির সংবাদ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে?

বীণাকে আসতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় নীলা, সংগে তার স্বামী অনুপম বাবুও, অনুপম বাবুর প্রশংসা ধরেনা, কাল নাকি তারা গিয়েছিল স্বপ্ন-ভংগ দেখতে, আজ বিনয় বাবুর সংগে আলাপ করিয়ে দিতে হবে তাকে, এত বড় একজন গুণীলোক। বীণা বলে, কাল সারারাত তাদের আলোচনা হয়েছে ঐ নিয়ে!

"ওমা! তুই এখনও দেখিসনি তোর বরের লেখা নাটক! আচ্ছা যা হোক বাবা—!"

'ঘর' চিত্রে ইয়াকুব, যমুনা ও নবাব

নীলা কথা বলে না, তাদিকে নিয়ে বিনয়ের ঘরের দিকে চলে!

একমনে লিখে চলেছে বিনয়!...বীণা অনুপমবাবুকে বাইরে রেখে এগিয়ে যায় নীলা—ভিতরে টেবিলের সামনে দাঁড়াতে একবার মুখ তুলে চায় মাত্র বিনয়, আবার লিখতে থাকে! কথাটা তার কানেই যায় না, বলে চলে নীলা—"শুনছ—!"

"আহা! একটু পরে! এখন বড্ড ব্যস্ত!"

অর্গানটার পাশে দাঁড়িয়ে রিডগুলো নাড়াচাড়া করতেই সেগুলো একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি করে, বিনয়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে যায়, চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে বলে—

—"কতবার বলেছি তোমায় বিরক্ত করোনা, কে তোমাকে আসতে বলেছে এখানে! যাও—!"

থমকে দাঁড়ায় নীলা। চোখে মুখে তার অপমানের কালো ছায়া! জবাব দেয় নীলা—"তোমার এখানে আসাটাও আমার অপরাধ! সে অধিকারও কি নাই?"

"নিজের হাতেই নষ্ট করছো সে অধিকার!"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে চলে নীলা—"আমি নই! তুমিই দাওনি আমায় সে অধিকার, দিনের পর দিন দূরে সরিয়ে রেখেছ তোমার কাজের গণ্ডীটেনে!—কি তুমি দিয়েছ আমায়!"

দূরে সরে যায় বিনয় জানলার দিকে—! "এগিয়ে যদি না আসতে পার, সে অক্ষমতা আমার নয়। তোমার। আর সে অক্ষমতার জন্য সামান্য স্ত্রীর পরিচয় টুকু নিয়েই তৃপ্ত থেক, অধিকারের দাবী জানিয়ো না।"

সরে যায় বিনয়। অপমানে অসহায় লজ্জায় ভেংগে পড়ে নীলা। কোন রকমে বার হয়ে আসে। গোলমাল শুনে পিসীমাও এসে উপস্থিত হন, চেয়ে থাকেন নীলার দিকে।

বীণা কথাটা সমর্থন করে! পুরুষদের প্রবৃত্তি খানিকটা নারীকে মেনে নিতেই হবে! তাদের দেহারতির অভিনয়! তারা চায় স্ত্রীকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে কাছে পেতে, সে সীমারেখায় সংসার—সংসারের কোন কাজ বাধার সৃষ্টি করতে পারে না!...নীলার দুর্বলতা এইখানেই। পুরুষের মন যে নারী জয় করতে পারেনি, (সে যেমন করেই হোক) নারীত্বের সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় সে পরাজিত! কথাটা নীলাকে বোঝাবার ভাষা খুঁজে পায় না বীণা! নিজেদের নতি স্বীকার করার উপায়টা নারী হয়ে নারীর কাছে প্রকাশ করা লজ্জাকর, তবুও করতে হয়। মলিন ভাবে হাসে নীলা। পিসীমা এমনি কথাটা পাকে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিতে ছাড়েন না! "এমন স্বামীর ঘরে আসা নাকি ভাগ্যের কথা!" ভাবে নীলা কথাগুলো!

সিতারা বাইজীর ঘরে আজ আসর জমে উঠেছে! সিতারা একটু গোপনে কুমার বাহাদুরের সংগে কি কথা কইচে। সিতারার হাতে নোটগুলো গুজে দিয়ে বলেন তার সরকার—যে মণিকাকে কিন্তু নিয়ে যেতেই হবে!

হাসে সিতারা—"এত কমে কি করে হয় বাবুজী! ওর ও—"

সরকার অসন্তুষ্ট মনে বাকী টাকাগুলো বার করে দিয়ে বলে, "মবলক সবই ত নিলে, শেষে যেন ফাসিয়োনা! মণিকাকে না পেলে নোকরী নেহিরহেগী বুঝতে পারতে হায়—!"

ওপাশের সার্সির আড়াল থেকে একজন ছায়ামূর্তি যেন সরে যায়। সিতারা তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে আসে কোন কিছুই দেখতে পায় না। সে তখন সরে গেছে সেখান থেকে।

মণিকা রুদ্ধ দ্বার কক্ষে কি যেন ভাবে, দরজাটা খুলে ঢোকে সিতারা, মুখে তার বীভৎসতার ছাপ! "তৈরী হয়ে থাকবি, আজ যেতে হবে।"

দৃঢ় ভাবে মণিকা বলে, "শরীর খারাপ! পারবোনা!"

সিতারা শোনে না—"বিশেষ দরকার, যেতেই হবে!" গম্ভীর ভাবে কথাটা বলে বার হয়ে যায়! বাইরে দরজায় বিশালাকায় একটা দারোয়ানকে ইসারা করে যায় 'হুসিয়ার বাহাদুর।"

মণিকার দেহে মনে আসে বিদ্রোহ! তাকে এমনি করে অত্যাচার সহ্য করতে হবে! কিছুতেই না! সে করবে বিদ্রোহ!...বাইরে থেকে ভেসে আসে কাদের হল্লার শব্দ! রাত্রি বেড়ে চলে! তাড়াতাড়ি করে সুটকেশ খুলে ...কিছু টাকা গয়নাপত্র নিয়ে পিছনের ছোট সিড়িটা বয়ে নামতে থাকে সে! অন্ধকারে পা চলে না। সন্তর্পণে বার হয়ে রাস্তায় নামে!...অন্ধকার রাত্রি, সরু গলিটার দুদিকের থেকে ভেসে আসে টুকরো চীৎকারের শব্দ! রাস্তাটা দিয়ে কারা যেন গাড়ী করে আসছে! চেনা কণ্ঠস্বর, সেই কুমার বাহাদুরের দল!...চকিতের মাঝে অন্ধকার দেওয়ালের কোলে সরে দাঁড়ায় মণিকা, গাড়ী খানা বার হয়ে যেতেই আবার পথ ধরে!

বিনয় ছড়ান বই খাতার মধ্যে ডুবে থেকে কি যে, লিখবার চেষ্টা করে! দরজা খুলে দাঁড়ায় নীলা,...আজ তার নববিবাহিত বধূ বেশ। বিনয় বই থেকে মুখ তুলে চায়!...বলে নীলা—"কি দেখছ!"

—দেখছি কতখানি—নির্লজ্জ হতে পার তোমরা!"

বলে নীলা—"কোথায় তার পরিচয় পেলে!'

বই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দেয় বিনয়।

—"সামনেই, সেজে গুজে যারা শুধু নিজের দেহকে

আর একজনের কাছে তুলে ধরে আত্মনিবেদনের ভাষায়, আর যাই হোক—লজ্জাশালীনতা তাদের নেই!"

এগিয়ে আসে নীলা! তার গয়নাপত্র খুলে! কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে—"দাড়াও! শুনতে হবে আমার সব কথা! কেন—কেন তুমি আমাকে এ শাস্তি দাও! বলতে পার কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে!"

"দেহের ক্ষুধা আর মনের ক্ষুধা দুইটার মাঝে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, এটা বোঝাতে পারব না। তাই হয়ত এ অশান্তি আমাদের মাঝে!"

বার হয়ে যায় বিনয়!—"শোন, আমার কথার উত্তর দাও!"

--"উত্তর আজ সকালেই পেয়েছ তুমি!"

দরজার সামনে দাঁড়ায় গিয়ে নীলা—"আজ তুমি ভুলে যাচ্ছ! আমি তোমাদের বাড়ীতে না এলে, আমার বাবার সাহায্য না পেলে আজ দাঁড়াতে কোথায়! কোথায় থাকত তোমার সম্মান, পরিচয়! আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকেই অপমান করতে সাহস হয় তোমার!"

ফিরে চায় বিনয়! "পথে দাঁড়াতাম, হয়ত তাও সহ্য হত। কিন্তু নিজেকে বিক্রী করিনি আজও!"

বার হয়ে যায় বিনয়, নীলা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে! সিড়ি দিয়ে নেমে বার হয়ে যায় বিনয়! পিসীমার কণ্ঠস্বর শোনা যায় "বিনয়! বিনয়! ওরে শোন!"

নীলার ঘরে এসে থমকে দাঁড়ান পিসীমা!...নীলা পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে!

চলেছে বিনয় রাস্তা দিয়ে রাত্রের অন্ধকারে।

মণিকা মাঝে মাঝে পিছন পানে চেয়ে ত্রস্ত পদে এগিয়ে যায়। সুপ্ত নদীর তীরে জলের ঢেউ বার বার আঘাত করে ফিরে যায়। গাছের ছায়ার পাশ দিয়ে নৌকা যায় মণিকা জলের ধারে ডিংগিগুলোর পাশে!

বুড়ো মাঝিটা ঘুম থেকে উঠে মণিকার দিকে কেরাসিনের কুপিটা এগিয়ে নিয়ে আসে! বুড়োর মনে খট্‌কা লাগে। একে নিয়ে ভাড়া যাওয়া ঠিক হবে না, একে সে স্ত্রীলোক, তার বয়েস অল্প!

তাগাদা দেয় মণিকা—"চল যাবে না—!"

'ঘর' চিত্রে মলিনা দেবী

বলে বুড়ো—"ঘরে ফিইরা যাও মা! দুরোজের জন্যি ঝগড়া—! স্বামীর ঘর ছাইড়া বাপের বাড়ী যাবা ক্যান।"

নিশ্চয়ই ঝগড়া করে বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছে। পিছনে কার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসে, মণিকার আর হয়ত যাওয়া হবে না, ওরা পিছু ধাওয়া করে চলে এসেছে! হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে থেকে বিনয়কে আসতে দেখে অবাক হয়ে যায় মণিকা—"তুমি! এখানে—!"

বুড়ো মাঝির মুখটা আনন্দে ঝলমল করে ওঠে—"একাই যাতি চাইলেন কর্ত্তা! আমি কইনু বড় মানুষ ঝগড়া কইরা যাবা ক্যান, তোমাগোর ও বলবার কথা নাই বাবু! চাঁদ পানা বউএর গায়ে কাইজার (ঝগড়া) কায কি!

লজ্জায় রাংগা হয়ে ওঠে মণিকা! বিনয়ের ডাকে নৌকায় উঠে আসে! মাঝি এতক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে নৌকা খুলে হালধরে বসে। ভাটার টানে স্তিমিত চক্রালোকে ভেসে চলে নৌকা নিরুদ্দেশের পথে!...নিজে কোথায়

এক্সটিক
ও মীনা
প্রসাধন
সামগ্রী

EXOTI
TALCUM POWDE

Parijat
Taila
Excellent for
Hair & Brain

Odorex
DEODORANT CREAM

FACE POWDER

যাবে জানে না দুজনই! পথের যাত্রী আজ যেন দুজনকেই আপন করে পায়!

ছোট্ট নৌকা! চালের মধ্যে কোন রকমে দুজনের বসবার জায়গা হয় নৌকার দোলানিতে দুজনে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না তারা!

সকালের রোদ ছড়িয়ে পড়ে নদীর বুকে! মণিকার ঘুম ভেংগে যায়, চোখ মেলেই আবার চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে! সারামন দিয়ে বিনয়ের স্পর্শ টুকু অনুভব করে। বিনয়ও জেগে রয়েছে কেউ যেন ব্রত ভাংগতে রাজী নয়। হঠাৎ বুড়ো মাঝি সামনের ঝাপটা খুলে দিতেই এক ঝলক আলো আসে ভিতরে, দুজনেই অপ্রস্তুত হয়ে যায়! বুড়োর মুখে ফুটে ওঠে সরল হাসি।

নৌকার বাইরে দুজনে এসে দাঁড়ায়। রক্তিম সূর্য নদীর বুক ভরিয়ে তোলে, গাংচিলের দল ছোঁমেরে যায়, দুর ছায়াময় দিগন্তের কোলে নেমে আসে দিকচক্রবাল! বাতাসে ভেসে যায় কার কণ্ঠের ভাটিয়ালী সুরের রেশ; সারা আকাশ বাতাস ভরে তোলে, নৌকার নীচে করে ছন্দ বন্ধ ভাবে ছোট্ট ঢেউএর দল! চারিদিকে সুরের ঐক্যতান বাইরের পৃথিবীর সুর শিল্পীর মনে জাগিয়ে তোলে কোন অজানা আনন্দের শিহরণ। বিনয় যেন হারিয়ে ফেলে নিজেকে অসীম পৃথিবীর মাঝে! অপূর্ব-আনন্দ অনুভূতি তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জাগায় স্বর! ভাষাপায়! রূপায়িত করে তোলে দুজনে! মণিকার কণ্ঠে জাগে সুর! দুজনে আজ আত্মহারা! নৌকার গতিবেগ, নদীর জলের তালে তালে সারা আকাশ বাতাসে ধ্বনি তোলে, গানের সুরে বয়ে চলে নৌকাটা, বুড়ো মাঝি অবাক হয়ে শোনে তাদের গান? কোন অজানা পথিকের অভিযান—দূরদিগন্ত পানে নোতুনের সন্ধানে! নৌকাটা চলে!

কে, বি, পিকচার্সে'র 'ভাবীকাল' চিত্রে দেবী মুখার্জি

বিনয় আজ ব্যস্ত! কালকের চলতিপথের অনুভূতি তার অতিন্দ্রিয় মনের পরতে পরতে যে সুর জাগিয়ে ছিল; তারই অভিব্যক্তি দেবে সে!...

নোতুন বই নিয়ে ব্যস্ত!

বিনয়ের বাড়ীতে এসেছে একটা পরিবর্তন সে আর বাড়ীতে ফেরেনি! তার শূন্য ঘরখানাতে নীলা কি যেন খুঁজতে থাকে। তার চেহারায় এসেছে একটা রুক্ষতা। পিসীমার ডাকে ফিরে চাইল, সংগে তার বীণা! এগিয়ে আসে সে! হাতের খবরের কাগজখানা দেখায়! বিনয়ের নোতুন বই অভিযানের বিজ্ঞাপন বার হয়েছে! প্রধান ভূমিকায় আছে মণিকা—!

স্কুলে, কলেজে, পার্কে সব জায়গাতেই এক কথা, অভিযান! একেবারে নোতুন বই! প্রোগ্রেসিভ আইডিয়া—নোতুন প্রভাতের গান, তাই তার নাম অভিযান!…

বিনয় মণিকাকে বইখানা শোনাতে ব্যস্ত! থিয়েটারের ম্যানেজারও এসেছেন! মণিকা পিয়ানোটায় সুরটা তোলবার চেষ্টা করে, কলমটা কানে গুজে বিনয়…মন দিয়ে শোনে! চা খাওয়া ভুলেই যায়!

বীণা বোঝাবার চেষ্টা করে নীলাকে! নীলা কথা কয় না! শূন্য ঘরখানা…তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে! —বলে বীণা "তুই গিয়ে বল্লে সে না এসে থাকতে পারবেই না!"

নীলার মনে জাগে সন্দেহের ছোঁয়া, "সত্যি সে আসবে?"

"কেন আসবে না!…তুই হবি তার সন্তানের মা! এ যে তারও কত আনন্দের কথা—"

…নীলার লজ্জায় কপাল রাংগা হয়ে আসে!!

থিয়েটারের সামনে আজ জনতার ভিড়!…হ'লটা থমথম করছে লোকের ভারে!…দর্শকদের মধ্যে এসেছে নিথর নীরবতা! মণিকা গিয়ে বসেছে! নোতুনের অভিযান আজ সারা দেশে! সব কিছু বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে চলেছে তাদের বিজয় রথ, মণিকার কণ্ঠে গানের গাছ!

বাইরে চলেছে বর্ষণমেঘের ধারাপাত! ঝড়ের মধ্য দিয়ে নীলাদের গাড়ীখানা আসছে! সারা পৃথিবী যেন কেঁপে গেছে!!…বিদ্যুৎতেরও আঁকাবাঁকা রেখায় তার ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি!…স্তম্ভিত হলের প্রান্তে দেখা যায় নীলাকে! কেউ তার দিকে ফিরেও চায় না! মঞ্চের যবনিকার সংগে সংগে হাততালি—আনন্দ ধ্বনির মধ্যে সব কিছু ডুবে যায়। রাশি রাশি ফুল পড়তে থাকে মঞ্চে! মণিকার সংগে বিনয়কেও এসে দাঁড়াতে হয় মঞ্চে জনতার অনুরোধে!! বিনয় মাথা নুইয়ে নমস্কার জানায় জনসাধারণকে!

নিজের ঘরের দিকে চলেছে বিনয় সংগে মণিকা! দরজাটা খুলেই থমকে দাঁড়ায় বজ্রাহতের মত সে। ওদিকের চেয়ারে বসে নীলা! রুদ্ধ কণ্ঠে বিনয় বলে,

"তুমি এখানে?"

এগিয়ে আসে বীণা—"কেন নিজের স্ত্রীও আসতে পারে না!"

বিস্মিত হয়ে যায় মণিকা, "আপনার স্ত্রী!" কণ্ঠে তার হতাশার সুর! পরক্ষণেই সেটাকে সামলে নিয়ে হালকা হাসির ছোয়ায় লঘু করে নেয় মনকে! এগিয়ে আসে।

"আপনার স্বামী সারাদেশের গৌরব, আপনি তাঁর স্ত্রী, নমস্কার করবার সৌভাগ্য আজ হল আমার!"

বাইরে কয়েকজন গুণমুগ্ধ দর্শক, দেশের নাম করা সকলেই এগিয়ে এসে বিনয়কে অভিনন্দন জানায় "আপনার সৃষ্টি অমর হয়ে থাকবে!

নীলাকেও নমস্কার করে তাঁরা—"আপনার গর্ব! এ যে আপনার কত বড় সৌভাগ্য—আপনার স্বামী আজ দেশ বরেণ্য!"

দু,একজন মহিলাও কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পায় না নীলাকে!—বিনয় সম্বন্ধে কত খুঁটি নাটি প্রশ্ন করে, কবার চা খান উনি! কি কলমে লেখেন!! কে যেন আবার নিমন্ত্রণই করে বসে—"একদিন যদি আপনারা স্বামীস্ত্রীতে পায়ের ধুলো দেন আমাদের বাড়ীতে—

আমতা আমতা করে নীলা—"কিন্তু আমার কথা—তা ছাড়া ওর সময় কম কি যে বলেন, আপনি বললে কখনও অমত করতে পারেন উনি!"

করুণ হাসিতে মুখখানা ভরে ওঠে নীলার, প্রশংসা, জনসাধারণের ভিড় ছেড়ে কখন যে সন্তর্পণে বার হয়ে আসে নীলা কেউ জানে না। অন্ধকার সিঁড়ির কাছে এসে ক্রমে দু'চোখ তার জলে ছেয়ে আসে! আজ অনুভব করে কোথায় তার স্বামী কোথায় বা সে! কোন অধিকার

নাই তার! থাকবার যোগ্যতা তার নাই! প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে, পারে না! দুচোখ জলে ভরে আসে! হাত পা গুলো অবশ হয়ে যায়! চোখের সামনে নেমে আসে নিবিড় অন্ধকার!—মাথাটা যেন পাক দিচ্ছে! সকলের অজ্ঞাতে মণিকা কখন যে তার পিছু নিয়েছিল জানে না. সিঁড়িতে নীলাকে পড়ে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি এসে তোলবার চেষ্টা করে তার জ্ঞানহীন দেহটাকে!

ডাক্তার বাবু পরীক্ষা করে বলেন,—একপাশে মণিকা কি একটা ওষুধ ঢালছিল গ্লাসে! ডাক্তার বাবুর কথাগুলো তার কাণে যায়!

"মানসিক দুশ্চিন্তা, দুর্বল শরীর তার উপর গর্ভাবস্থা খুব সাবধানে রাখা দরকার!"

—ওষুধটা গ্লাস ভর্তি হয়ে ছাপিয়ে পড়তে থাকে, মণিকার খেয়াল নাই!

...বাইরে পায়চারী করছে বিনয় চঞ্চল ভাবে!

কদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আজ চোখ মেলে চায় নীলা! মণিকা ধীরে ধীরে সরে যায়! বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে! বীণা বলে ওঠে, "যাবেন না ভিতরে!"

মণিকা হাসবার চেষ্টা করে, "একটু কাজ সেরে আসছি ভাই!"

"ওষুধটা খাইয়ে দেবেন ওর জ্ঞান হয়েছে!"

বীণা তাড়িতাড়ি ঘরের দিকে চলে যায়!

নিস্তব্ধ রাত! ঘরে থেকে বার হয় মণিকা! চারিদিকে চেয়ে নিয়ে পা চালায়...চুপিচুপি! বিনয়ের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়! দুর্বার আকর্ষণে ঢোকে ঘরের মধ্যে। নিদ্রাচ্ছন্ন বিনয়! একগাদা বইএর মধ্যে মাথাগুজে ঘুমিয়ে চলেছে! আবার পা চালায় চিন্তিত মনে মণিকা!

কার পায়ের শব্দে ঘুম ভেংগে যায় বিনয়ের, মণিকা বার হয়ে যায় ত্রস্ত পদে! বাড়ীর বাইরে বার হয়ে পড়ে মণিকা রাতের অন্ধকারে!

বিনয় ঢোকে নীলার ঘরে, সেখানেও নাই মণিকা, আবিষ্কার করে বাইরের ফটকটা খোলা! বিনয়ও বার হয়ে যায় তাড়াতাড়ি!...

সেই বুড়ো মাঝি ওপারের যাত্রীর আশায় বসে আছে। ট্রেণের দেরী নাই, আজ মণিকাকে দেখে নির্বিবাদেই রওনা হয় ওপারে,...ঘাটে এসে পড়েছে বিনয়! খবরটা কে একজন তাকে দেয়—বুড়োই নাকি তাকে পারে নিয়ে গেছে! পাশের নৌকাটাতে লাফিয়ে উঠে পড়ে বিনয়!! চলেছে নৌকাটা জোরে!! ট্রেণের সার্চ লাইট দেখা দেয় ওপারে, মধ্য নদীতে যেতে না যেতেই ষ্টেশন থেকে ট্রেণখানা বার হয়ে যায় সিটি দিয়ে!...বিনয় পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে!! চলে গেল মণিকা!

স্বপ্নাবিষ্টের মত নদীর ধারে বসেই কাটিয়ে দেয় বাকী রাত! বিদায়ের দুঃখ আজ মনে তার গুমরে ওঠে! সকালের আলো, লোকের কোলাহলে তার জ্ঞান ফেরে। ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।

* * *

প্রায় পনের বছর কেটে গেছে!...সারাদেশে আজ বিনয়ের নাম, দোকানে দোকানে তার বই—নাটক! রাস্তার পথিকও আজ তার গানের সুরে পথ চলে! দূর দূরান্তরের গ্রামে সহরে চলে তার নাটকের অভিনয়!

...বিনয়ের সারা দেহে মনে এসেছে পরিবর্ত্তন! বৃদ্ধ—আজ সে জীর্ণ। তার এ সফলতার দিনে তার মনের কোনে ভেসে ওঠে সেই একজনের কথা—প্রথম যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, তার সৃষ্টির কল্পলোক রচনায় প্রতিটি গানের ভাব যার কণ্ঠের মধু দিয়ে মায়াময় করে গিয়েছে। সেই মণিকার কথা। জানে না কোথায় আজ সে! তবু মণিকা অমর আজ তার কল্পনায়, তার সৃষ্টিতে। বিনয়ের চোখের কোলে অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। সর্বত্যাগিনী নারীর প্রতি কৃতজ্ঞতায়—হোক সে ঘৃণিত শ্রেণীর নারী, তবুও সে নমস্যা!!

শুধু কল্পনায় নয়, বাস্তব জগতেও এদের অস্তিত্ব কিছু আছে!

সৌন্দর্য্য ও
অলঙ্কার শিল্পে
হরিচরণ দত্ত
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস
১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

NIP—HD (1) B

মামাকে ব'লে দেবো

(কৌতুক নাটিকা)

শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়

পুরুষ

শঙ্করনাথ—শঙ্কিতা ও চকিতার মামা।

অনুপম—শঙ্কিতার গৃহশিক্ষক।

স্ত্রী

শঙ্কিতা—

চকিতা—মাসতুতো বোন।

অন্নপূর্ণা—শঙ্কিতার মা।

(সাঁওতাল পরগণার কোনো সহর প্রান্ত। সন্ধ্যা আসন্ন। লাল মাটীর রাস্তা তিনদিকে ত্রিধা হ'য়ে চলে' গেছে। সন্ধিস্থলে অনেকগুলি প্রস্তর পুঞ্জীভূত হ'য়ে পাহাড়ের মতো সৃষ্ট হ'য়েছে। দূরে দূরে শালবন। বহুদূরে আকাশ ক্রোড়ে পাহাড়ের শ্রেণী ছায়ার মতো অস্পষ্ট। দূরস্থিত মন্দির থেকে সানাই-এর আওয়াজ আসছে।

প্রস্তর স্তূপমূলে দুটি কিশোরী বালিকা উপবিষ্টা। দু'জনেই প্রায় একবয়নী; উনিশের বেশি নয়। শঙ্কিতা ও চকিতা। শঙ্কিতার আচ্ছাদন-নিষ্ঠা সাবধানী মেয়ের মতো।

দুমিনিট পথ অতিক্রম করলেই শঙ্কিতাদের দ্বিতল বাড়ি। বাড়ি ও তার সামনের বাগান এই প্রস্তর স্তূপ হ'তে দেখা যায়।

শঙ্খধ্বনি শোনা গেলো।)

★

শঙ্কিতা—ও ভাই, শাঁখ যে বাজলো!

চকিতা—তাই নাকি? তোর না আমার?

শঙ্কিতা—ছি ভাই, তুমি ভারি ফাজিল। মা সন্ধ্যের শাঁক বাজালো যে।

চকিতা—তাই নাকি? মাসিমা বাজালো? কিন্তু সন্ধ্যের শাঁখ তো বাজলো, সুরুর শাঁখ কবে বাজবে ভাই?

শঙ্কিতা—হেঁয়ালি আমি বুঝিনা ভাই, আমি তো আর তোমার মতো বি, এ ক্লাশের ছাত্রী নই।

চকিতা—হ'লেই বা হে ম্যাট্রিকের ছাত্রী হ'লেই বা। আসলে তো আমরা একই ক্লাশের ছাত্রী।

শঙ্কিতা—বলছি-না আমি হেঁয়ালি বুঝি না?

চকিতা—(উঠে দাঁড়িয়ে শঙ্কিতার দুটী হাত ধ'রে চোখে দৃষ্টি রেখে) ওগো শঙ্কিতা, উনিশের পৈঠেয় তুমিও আমিও। শঙ্কা কি বোন! কোনো যুবোজন আসছে শুনলে চকিতা হই কি আমিই শুধু? লম্বায় বা ওসারে দুজনের চেহারার কম বেশী যাই থাক, আসলে তোমাকে তেরো বা এমনকি পনেরো ব'লেও ভুল করবে এমন খোকা ছেলে কোন কলেজেই নেই। কাজেই আমরা একই ক্লাশের ছাত্রী।

শঙ্কিতা—তুমি ভাই ভারি অসভ্য। এমন কম্ কম্ ছাঁটা ছাঁটা জামাটামা পরো কেন?......ওমা, কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখো ভাই। চল্ বাড়ী যাই।

চকিতা—ব'স্ না আরো একটু। আমি মাসিমাকে ব'লেই এসেছি আজ আমাদের দেরী হবে। তিন মিনিটের তো পথ। আমরা তো আর আমেরিকার মেয়েদের মতো শনিবাসর করতে আসিনি। বোসো।

(হাত ধ'রে শঙ্কিতাকে বসালো। নিজেও বসলো।)

শঙ্কিতা—দেখো চকিতা, ঐ দূরে কে একজন ব'সে না?

চকিতা—একজন? কই? ওমা, হ্যাঁ তো। একজন মাত্র। তবেই তো মুস্কিল! দুজন হ'লে ডেকে আলাপ করতুম।

শঙ্কিতা—দূর, পাজি কোথাকার। আচ্ছা; পারিস আলাপ করতে?

চকিতা—কেন পারবো না? বাঘ নাকি?

শঙ্কিতা—তোমার দাদার অনেক বন্ধু আসে তোমাদের বাড়িতে। তোমার সংগে ভাব আছে তাদের?

চকিতা—ভাব? আছে বৈকি, কারো সংগে এত্তোটুকু। (হাতের ইংগিতে দৈর্ঘ জ্ঞাপন) কারো সংগে আরো বেশী, আবার কারো কারো সংগে এমন ভাব আছে যে ভাবনা হয়। ভীষণ ভাবনা। আমার নয়, পাড়ার অনেকের; বাড়ীর কারো কারো।

শঙ্কিতা—বাব্বাঃ, কথার ছিরি দেখো।...আচ্ছা বেশ। যাদের সংগে ভাব-সাব, তাদের দু-একজনের নাম বলো-না ভাই? নামগুলো কিন্তু সেকেলে হ'লে ভালো লাগে না; না? আর যারা অনেকখানি কান্‌কো৺য়ালা আর কব্জিটেপা সার্ট পরে না তাদের ভালো লাগে না। আর লম্বা জুল্‌পি তোমার কেমন লাগে ভাই?

চকিতা—লম্বা জুল্‌পি? চমৎকার। ওতে কানটা মানিয়ে যায়।

শঙ্কিতা—কই, বল্‌লে না?

চকিতা—কী?

শঙ্কিতা—তাদের নাম? আচ্ছা, ক'জনের সংগে তোমার ভাব?

চকিতা—আমার সংগে খুব ভাব তিন জনের।

শঙ্কিতা—তিন তিন জন? ওমা, সামলাও কি ক'রে?

চকিতা—ওরে খুকী, সামলাবো কেন রে? বারে খুকী, কথা তো ব'লো বেশ। তবে অতো শঙ্কিত কেন হে? বঞ্চিতা ব'লে বুঝি? আচ্ছা আমি তোমার বন্ধু জুটিয়ে দেবো।

শঙ্কিতা—আর অতো উপকারে কাজ নেই। তারপর খালি পায়ে-পায়ে সংগে সংগে ঘুরুক আর কি? কোন্ দিন কী ক'রে বসবে শেষ কালে?

চকিতা—বারে বেবি, সব জানা আছে দেখছি। কী ক'রে বসবে ভাই?

শঙ্কিতা—(চকিতার মুখে হাত চেপে) ছি! ওসব কথা আর নয়, আমার বন্ধুর দরকার নেই; বেশ আছি।

চকিতা—ছাই বেশ আছো। যখন রাত্রে ঘুম হয় না আর জানলা দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়ে তখন মনে হয় না পাশে কেউ থাকলে হোতো?

শঙ্কিতা—কেন? মা-তো আমার পাশে থাকে।

চকিতা—মা-তো আর 'সে' নয়।

শঙ্কিতা—'সে' মানে?

চকিতা—'সে' মানে তুমি আমি ছাড়া। অর্থাৎ মা-তুমি ছাড়া।

শঙ্কিতা—কি যে ভাই বল্লো, বুঝতে পারি না।

চকিতা—ওগো অবুঝ, (ইতিমধ্যে শঙ্কিতার চিবুক ধরেছে) 'সে' মানে যে-কোনো জন নয়। একজন। সে-জন। আমার দোসর যে জন ও গো সে।

শঙ্কিতা—এতো কথাও জানো ভাই। যাক্ ওসব কথা। তোমার তাদের নামগুলো বললে না?

চকিতা—আমার তাদের নামগুলো? একজনের নাম প্রেমোৎপল। বয়স কুড়ি, কান্‌কো৺য়ালা সার্ট গায়ে। আর একজনের নাম প্রেমোজ্জল। বয়স একুশ, লম্বা জুল্‌পি। তৃতীয়টার নাম প্রেমোচ্ছল। বয়স বাইশ, যখন তখন ঝপ্ ক'রে কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলে। এই প্রেমোচ্ছলকে নিয়েই তো ভাবনা। ভীষণ ভাবনা। আমার নয়। পাড়ার অনেকের, বাড়ির কারো কারো।

শঙ্কিতা—ওসব তোমার বানানো নাম নিশ্চয়।

চকিতা—কেন? বানানো কেন হবে? প্রেমলতিকা নাম শোনোনি মেয়েদের? আর পশ্চিমী মেয়ের নাম প্রেমকণ্টক?

শঙ্কিতা—আচ্ছা বেশ, না হয় সত্যি নামই হোলো শেষেরটার কী নাম যেনো বললে?

চকিতা—শেষেরটার? প্রেমোচ্ছল। একেবারে উচ্ছল উৎপল তো ফুটেই খুসী। আগে বসে মুচকে হাসে উজ্জল তো কাছে থেকেই খুসী। পাশে বসে, গান শোনায়, আবার শেখায়-ও। গান শেখাতে গিয়ে হারমোনিয়ামের চাবিতে আমার ভুল শোধরাবার সময় ইচ্ছে ক'রে আমার আঙুলে আঙুল ঠেকায়।

শঙ্কিতা—তুমি ভাই ভারি ফাজিল।

চকিতা—কই, সকলের কথা যে এখনো ফুরোয় নি।—

শঙ্কিতা—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। প্রেমোচ্ছলের খবর কি?

চকিতা—খবর খারাপ, উচ্ছলকে নিয়ে মুস্কিল। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে হট্টগোল ক'রে একেবারে 'ব্লিৎস্ ক্রীগ্'। হঠাৎ বলবে, "এখান থেকে আমি তোমার কাছ পর্যন্ত লাফাতে পারি।" ব'লেই আমার হাত ধরে আমাকে দু হাত তফাতে দাঁড় করাবে। তারপরে একলাফে একেবারে......

শঙ্কিতা—মাগো, গায়ে পড়বে নাকি?

চকিতা—যা বলেছিস ভাই। আমি কিন্তু সরি না।

শঙ্কিতা—কি অসভ্য তোরা রে।

চকিতা—ঝাঁ ক'রে পাশ কাটিয়ে হেলে পড়ি; পা সরাই না।

শঙ্কিতা—তোরা ভারি পুরুষ-ঘ্যাঁসা। ওতে লজ্জা পাস না?

চকিতা—পুরুষ মেয়ে আবার কি! We are all comrades. Comrades in the walk of life.

শঙ্কিতা—তা ব'লে walk of life-এ ঐরকম ঘাড়ে এসে পড়বে?

চকিতা—পড়েনি তো?

শঙ্কিতা—পড়তে পারে তো? তা ছাড়া ঝপ্ ক'রে কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলা?

চকিতা—একদিন পায়ে ধরেছিলো, প্রেমোচ্ছল।

শঙ্কিতা—তোর মরণ আর কি!

চকিতা—পায়ে কাঁটা ফুটেছিলো যে। বের করতে পারছিলুম না যে।

শঙ্কিতা—তা ব'লে তুই পায়ে হাত দিতে দিলি?

চকিতা—না হ'লে পা ধ'রে হিড়্ হিড়্ ক'রে টানবে যে।...ঐ দেখ, যে দূরে বসেছিলো সে উঠলো।

শঙ্কিতা—চলো ভাই, বাড়ি যাই।

চকিতা—পড়বি? মাষ্টার আসবে?

শঙ্কিতা—হ্যাঁ, চলো ভাই, বাড়ি যাই।

চকিতা—হ্যাঁরে মাষ্টার তো এম, এ পড়ে, না?

শঙ্কিতা—হ্যাঁ, খুব ভালো পড়াশুনা করে।

চকিতা—বয়স তো চব্বিশ পঁচিশ?

শঙ্কিতা—বেশ ছেলেমানুষ। এক এক সময় এমন চেয়ে থাকে—!

চকিতা—বেশ বড়ো জুলপি তো?

শঙ্কিতা—গায়ের রং টক্ টক্ করছে।

চকিতা—কান্‌কোওয়ালা আর কব্জি চাপা সার্ট তো?

শঙ্কিকা—সুন্দর পোষাক করে। এক এক সময় হাতা গুটিয়ে যখন থাকে—

চকিতা—মনে হয় এক ঘুসী খাই। এই তো?

শঙ্কিতা—খাই-ই তো।

চকিতা—তাই নাকি?

শঙ্কিতা—হ্যাঁ, অঙ্ক না পারলে।

চকিতা—অঙ্ক না পারবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিস্ তো?

শঙ্কিতা—কি জ্যাঠা মেয়েরে বাবা। একেবারে উচ্ছন্ন গেছো? ওই উৎপল, উজ্জ্বল আর উচ্ছলে মিলেই তোমাকে উচ্ছন্ন দিলে।

চকিতা—আর তোমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যা সব .... এই শঙ্কি, লোকটা যে এই দিকেই আসছে রে।

শঙ্কিতা—চলো ভাই, বাড়ি যাই। (এমন সময় ছেলেটি অনেক কাছে এসেছে)।

চকিতা—বাঃ, চমৎকার দেখতে তো? ভাব করলে হয়। তিনের পর আর এক। চার হ'লেই এক গণ্ডা। তা হ'লেই গান্ধীজীর 'জুলিয়েট' অপবাদের যোগ্য হ'য়ে উঠবো। কি বলিস্?

(ছেলেটি খুব কাছেই এসে পড়লো, লম্বা জুলপি। কান্‌কোওয়ালা সার্ট কব্জিটেপা। বয়স চব্বিশ পঁচিশ)।

শঙ্কিতা—ওঃ, আপনি?

অনুপম—হ্যাঁ। আপনি পড়বেন না নাকি? নতুন সঙ্গিনী পেয়ে পড়ায় ফাঁকি দেবার মতলব বোধ হয়?

চকিতা—আচ্ছা বেশ, আমি দুএকদিনের মধ্যেই চলে' যাবো। আপনার পড়ার ক্ষতি করবো না।

অনুপম—না না। সে কি কথা? কৌতুককে আপনি সত্যি মনে করেন নাকি? লেখাপড়া শিখলেও মেয়েরা humour বোঝেনা।

চকিতা—আপনি তো খুব বিজ্ঞ দেখছি।

অনুপম—ঠাট্টা করছেন? তবে বাড়ি চললুম। আপনারা আরো খানিকটা সখি-সংবাদ রচনা করুন।

চকিতা—সে কি? আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবেন না?

অনুপম—কেন?

চকিতা—সন্ধ্যা যে হ'য়ে গেছে। আমরা যে একলা।

অনুপম—পথ তো মাত্র দু মিনিটের। তা ছাড়া দুজনে একলা?

চকিতা—লেখাপড়া শিখলেও এটা বদ্‌লায় নি কেন—এই কথা বলতে চাইছেন তো?

অনুপম—আপনার সংগে আমি কথায় পারবো না।

চকিতা—আমরা একলা যেতে পারি জানলে আপনার খারাপ লাগবে না?

অনুপম—কেন?

চকিতা—ধিঙ্গি মনে হবে না আমাদের? আমাদের মানে আমাকে?

অনুপম—নাঃ, আপনার সংগে আমি কথায় পারবো না। চললুম, নমস্কার। শঙ্কিতা দেবি, পড়বেন না আজ তাহ'লে?

শঙ্কিতা—কেন পড়বো না? আপনিও বাড়ি ঘুরে আসুন, আমরাও এখনি যাবো।

অনুপম—আচ্ছা। (প্রস্থান)

চকিতা—চমৎকার দেখতে। যেনো রাজপুত্তুর। ওকে তোর ভা···লো···ইচ্ছে হয় না?

শঙ্কিতা—না ভাই, না ভাই। কী ভাই তুমি। ···না, না···মামাকে ব'লে দেবো কিন্তু। দেখো না মামা······।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(শঙ্কিতাদের পরিপাটী ক'রে সাজানো বৈঠকখানা। ঘরের দেয়ালে রবি বর্মার আঁকা ঠাকুর দেবতার পট। মধ্যে শঙ্কিতার স্বর্গগত পিতার প্রতিকৃতি ঘরের মধ্যে শঙ্করনাথ ও অন্নপূর্ণা। শঙ্করনাথের চুলে পাক ধরেছে। দেহ বলিষ্ঠ। মাথার চুল সমান ক'রে ছাঁটা। গায়ে বেনিয়ান, পায়ে তালতলার চটি।)

অন্নপূর্ণা—দাদা, তুমি বাড়ি নেই, ছেলেদের অসুবিধা হবে না তো?

শঙ্কর—তোর বৌদি মারা গেছে আজ পাঁচ বছর। চালাচ্ছি তো একাই, তা ছাড়া স্বর্ণটা রয়েছে।

অন্নপূর্ণা—ওকি আগের মতোই এখনো দিবা রাত্তির খালি কাজ আর কাজ?

শঙ্কর—নিশ্চয়। ছোটোগুলোর ও-ই তো মা হ'য়ে বসেছে। ভালোই হ'য়েছে। বিধবার মনটা ফাঁকা রাখতে নেই।

অন্নপূর্ণা—মেয়েটা যেনো পটের ছবি। অমন মেয়ের অমন সমস্ত বয়সে বিধবা হওয়া! যার যেমন বরাত।

শঙ্কর—না না; ও বেশ আছে। ব্রহ্মচারিণী থাকা একটা পুণ্যের কথা, ও খুব শক্ত। তা ছাড়া এই কঠোর বৈধব্য সাধনায় ও-তো আর একা নয়। মাছ-টাছ গুলো আমিও যে ছেড়েছি। আলোচাল ধরেছি আমিও।

অন্নপূর্ণা—আচ্ছা, স্বর্ণের বয়স শঙ্কিতার চেয়ে বছর খানেকের বেশি, নয়? তেমনি একমাথা চুল আছে তো?

শঙ্কর—নাঃ, চুল আমি কাটিয়ে দিয়েছি।

অন্নপূর্ণা—আহা, তা কেন করতে গেলে দাদা?

শঙ্কর—ভালোই করেছি। রূপের বাহারগুলো থাকলেই ভোগের আহারগুলোর জন্যে মন ছোঁক্ ছোঁক্ করে।··· যাক্ ওর কথা, কিন্তু তোর মেজদি, মেয়ে চকিতাকে নাকি বি, এ পড়াচ্ছে এবার? ভগ্নিপতির মতিগতি তো খুব হালফ্যাসানের দেখছি। আমি তো জানি গরীবের মেয়ে আর খারাপ মেয়েরাই বি, এ, এম, এ পড়ে।···চকিতা আর শঙ্কিতা গেলো কোথায়?

অন্নপূর্ণা—বেড়াতে গেছে।

শঙ্কর—বেড়াতে? সন্ধ্যের পর-ও ফিরলো না? কতো দূরে গেছে? কাদের বাড়ি?

অন্নপূর্ণা—কারো বাড়ি নয়। ঐ যে পাথরের রাস্তা-গুলো পাহাড়ের মতো হ'য়েছে রাস্তার তে মাথায়, ঐখানে। এই তো দু মিনিট মাত্র যেতে লাগে। (নেপথ্যে শঙ্কিতার "মা" ও চকিতার "মাসিমা" ডাক শোনা গেলো।) ওরে আয় তোরা এখানে বৈঠক খানায়। (দুজনে প্রবেশ করলো।)

শঙ্কর—কতোদূর বেড়ানো হ'লো দেবিদের? কোপেন হেগেন না ষ্ট্রাস্‌বুর্গ?

শঙ্কিতা—কাছেই গিয়েছিলুম। একা নয়। চকিতা সংগে ছিলো।

শঙ্কর—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কি গো চকিতে সুন্দরী, বাবা আর কতোদূর পড়াবে?

চকিতা—আমার যতোদূর ইচ্ছে।

শঙ্কর—বটে! তোমার কতোদূর ইচ্ছে? লীড্‌স্ য়ুনিভার্সিটি পর্যন্ত?

চকিতা—কলকাতায় এম, এ পর্যন্ত।

শঙ্কর—তারপর?

চকিতা—পরে ভাববো।

শঙ্কর—তুমিই ভাববে? ভালো।...তা' এই রকম পোষাক পরিচ্ছদ কি বাবার ফরমাসে না নিজের ইচ্ছেয়?

চকিতা—বক্‌ছেন কেন মামা?

শঙ্কর—রামো। বিদুষীদের আমি বকি না মা। Old widower কিনা, কথা একটু খোট্টাই হওয়া স্বাভাবিক। তোমার Combination কী? Arts না Science?

চকিতা—Arts. ফিলসফি...

শঙ্কর—তবে তো সাইকলজিও পড়ছো। জানোনা যাদের বউ মরে যায় এবং আর বিয়ে করে না, তারা কাট খোট্টা হ'য়ে যায়? আমি তাই।

অন্নপূর্ণা—দাদা যেনো কি! বি, এ পড়ছে ব'লে কি চকিতা ঐ সব পণ্ডিতি আর রঙ্গ বুঝবে? হ্যাঁরে চকিতা ওসব বুঝলি?

চকিতা—না। তবে এইটুকু বুঝলুম যে উনি আমাকে বকছেন;...মামা, সুবর্ণদি'কে নিয়ে এলেন না কেন? এমন সুন্দর জায়গা! কেমন ভালো লাগতো!

শঙ্কর—কেমন তোমার সংগে বেড়াতো।

চকিতা—এটাও বকুনি। এইবার আমি আপনাকে বুঝেছি।

শঙ্কর—তুই কি আমাকে নতুন দেখ্‌ছিস নাকি?

চকিতা—চার বছর আগের দেখা আর এখন—অনেক তফাৎ। তখন কিছু বুঝতুম না।

শঙ্কর—সপ্তাহে ক'টা সিনেমা দেখিস্?

চকিতা—মাসে একটা।

শঙ্কর—দাদার বন্ধুদের সংগে আলাপ আছে নিশ্চয়?

চকিতা—এটাও বকুনি। আর কিন্তু ভয় করছে না। এইবার বুঝেছি।

শঙ্কর—I herebly certify that Miss....so and so is অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।

অন্নপূর্ণা—ওরে ও চকিতা, দাদা রাগ করে নি রে রাগ করে নি। রঙ্গ করছে।...চলো দাদা ঘরে। একটা কথা আছে। এসেই যখন পড়েছো তোমার মতটা নিই। মেয়ে মানুষের বুদ্ধি; আবার ভুল ক'রে না বসি।

শঙ্কর—কি, মেয়ের পাত্র দেখেছিস্ নাকি?

অন্নপূর্ণা—চলোই-না ওপরে। বলবো।

(দু'জনের প্রস্থান।)

চকিতা—এই শঙ্কি, মামা ক'দিন থাকবে রে?

শঙ্কিতা—এই তো দুপুরে এলো। কি ক'রে জানাবো?

চকিতা—বেশি দিন থাক্‌লে আমি বেশি দিন নয়।

শঙ্কিতা—কেন, মামা ঐ সব বলছিলো ব'লে? কেন ভাই, মা-তো আর কিছু বলে নি।

চকিতা—মাসিমা তো মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছিলো ভাই মামার কথায়।

শঙ্কিতা—তবে মা কি করবে? প্রতিবাদ?

চকিতা—নিশ্চয়ই। কেন নয়? মামা বাঘ নাকি?

শঙ্কিতা—বাঘের মামা।

চকিতা—আর তোর মা বুঝি বাঘের মাসি?

শঙ্কিতা—(মুখ চেপে ধ'রে) কি ফাজিলই হ'য়েছিস্!

চকিতা—দাঁড়া তবে। আমার ছবির বইখানা আনি। মজাসে সময় কাটানো যাবে যতোক্ষণ না তোর মাষ্টার সাহেব আসে। (প্রস্থান। শঙ্কিতা একখানা বই এর পাতা ওল্টাতে লাগলো। চকিতার প্রবেশ।)

চকিতা—(ছবি দেখিয়ে) এই দেখ্ শুধু স্নানের পোষাকে নর্মা শিয়ারার।

শঙ্কিতা—না ভাই না। ওসব দেখিয়ো না। মামা বকবে। (চোখ মুদ্‌লো। আবার খুল্‌লো।)

চকিতা—এই দেখ্ মার্লিনের ভংগী। কতোখানি-কাটা জামারে বাবা।

শঙ্কিতা—না ভাই না। ওসব দেখিয়ো না। মামা রাগ করবে। (চোখ মুদ্‌লো। আবার খুললো।)

চকিতা—এই স্নানের পোষাক পরা পুরুষটীর কি চমৎকার স্বাস্থ্য দেখ।

শঙ্কিতা—দেখি। অনেকটা যেনো—

চকিতা—সে কি রে? কারো সংগে মেলে নাকি? বুঝেছি। তবে কেটে বাঁধিয়ে রেখেদে।

শঙ্কিতা—রাক্ষুসী তুই।

চকিতা—(চিবুক ধ'রে) সখিরে কী পুছসি অনুভব মোর।

শঙ্কিতা—তোর দুটি পায়ে পড়ি, থাম।

চকিতা—সখিরে, বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটলে।

শঙ্কিতা—মাইকেলের লাইন না ওটা?

চকিতা—মাষ্টার পড়ায় তা হ'লে? আয় (বক্ষে ধারণ।)

শঙ্কিতা—ছাড়ো ভাই ছাড়ো। লোকে দেখতে পেলে কী বলবে?

চকিতা—কেন? আমি পুরুষ মানুষ নাকি? ন্যাকা আর কি! (গাল টিপে চুম্বনোন্মুখ)

শঙ্কিতা—মামাকে বলে দেবো কিন্তু। দেখো না মামা···

তৃতীয়দৃশ্য।

(শঙ্কিতার পড়ার ঘর। টেবিলের চারধারে চারখানি চেয়ার। বই-এর একটি আলমারি! দেওয়ালে কতকগুলি দৃশ্যপট। টেবিলের উপর পেন্সিল, খাতা, বই প্রভৃতি। তা ছাড়া আলো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। ঘরে কেউ নেই, চকিতা এলো, সে শেলির কাব্যগ্রন্থখানি টেবিল হ'তে নিয়ে খুলে আবৃত্তি করতে থাকলো।

"Oh Mary dear that thou wert here
With your brown eyes bright and clear"

(পদশব্দে চমকে উঠে দেখলো শঙ্কিতা ও অনুপম)

অনুপম—চমৎকার পড়ছিলেন আপনি। থামলেন কেন? পড়ুন না; আমরা ব'সে শুনি।

চকিতা—বারে, তা কি হয়? বরং আপনারাই পড়াশুনা করতে থাকুন। আমি পালাই। (ইতিমধ্যে ওরা দুজনেই বসেছে।)

অনুপম—আপনার শেলির কবিতা ভালো লাগে বুঝি;

চকিতা—অত্যন্ত, সব বুঝতে পারলে আরো ভালো লাগতো। স্বপ্নজগতের মানুষ ঐ শেলি। ঐ রকম মানুষ যদি আমার সামনে চলাফেরা ক'রে বেড়াতো···

অনুপম তাহ'লে কী করতেন?

চকিতা—শঙ্কিতা না থাকলে হয়তো বলতে চেষ্টা করতুম।

শঙ্কিতা—বেশ তো আমি না হয় চলেই যাচ্ছি।

চকিতা—বাসরে সে তো আরো বিপদ।

শঙ্কিতা—তবে আমার সামনেই বলতে ক্ষতি কী? (চকিতা শঙ্কিতার কানে কানে কি বললো)

শঙ্কিতা—ফাজিল কোথাকার!

চকিতা—চললুম, অনুপম বাবু, ফাজিলের সংস্রব সর্বথা পরিত্যজ্য।

অনুপম—আমি তো আর বলিনি? আপনি বরং ব'সে বসে' কবিতা পড়তে থাকুন, এদিকে আমরাও পড়াশুনা করতে থাকি।

চকিতা—আবৃত্তি ক'রে না পড়লে কবিতা আমার ভালো লাগে না, আমি যাই; আপনারা পড়ুন। (চকিতার প্রস্থান)

অনুপম—আচ্ছা, ইংরাজী টা খুলুন।···কি হ'লো? পড়তে আজকে আর ততো ভালো লাগছেনা বুঝি?

শঙ্কিতা—পড়াতে আজ আর ততো ভালো লাগছেনা বোধ হয়।

অনুপম—মানে? ভালো যদি না লাগবে তবে এলুম কেন।

শঙ্কিতা—আসবার আগে যদি জানতেন তবে আসতেন না।

অনুপম—বুঝতে পারছি না।

শঙ্কিতা—আমার মতো বয়সে বি, এ পড়াই উচিত; নয়?

শঙ্কিতা—হঠাৎ এ-কথার মানে?

শঙ্কিতা—আচ্ছা শেলির কবিতা আপনার খুব ভালো লাগে, না?

অনুপম—চকিতা দেবীকে ঐকথা জিজ্ঞাসা করে ছিলুম হ্যাঁ··· তাতে কী?···

শঙ্কিতা—না, না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, হ্যাঁ তাতে কি?

অনুপম—কিসে আপনার পায়ে ফোস্কা পড়লো বুঝতে পারছি না,

শঙ্কিতা—যারা বি,এ, পড়ে না। শেলী পড়ে না তাদের একটুতেই গায়ে ফোস্কা পড়ে। (চকিতার প্রবেশ)

চকিতা—শঙ্কি, শেলীখানা নিয়ে যাই।

শঙ্কিতা—আমাকে কেন জিগ্যেস। বই ওঁর।

চকিতা—ওঃ আপনার? একবার নিয়ে যাবো বইখানা?

অনুপম—খুব সুখী হবো।

চকিতা—ধন্যবাদ, (বই নিয়ে চলে' গেলো।)

শঙ্কিতা—খুদী আর ধরছেনা দেখছি। (ইংরেজী বই খুলে) দিন, মানেটা ব'লে দিন্। নাকি ইচ্ছে যাচ্ছে না?

অনুপম—আপনার পাগলামি দেখে অবশ্যই মন যাচ্ছে না।

শঙ্কিতা—কেন? শেলীখানার সংগে সংগে মন খানাও ঘরখানা থেকে বেরিয়ে গেলো নাকি?

অনুপম—আমার মনখানা নিয়ে নাড়ানাড়ি করবার অধিকারখানা আপনাকে কে দিয়েছে? কই দেখি। পড়া দেখি।

শঙ্কিতা—আজ আমি পড়বো না।

অনুপম—কেন?

শঙ্কিতা—শরীর ভালো নেই।

অনুপম—মেয়েদের শরীর প্রায়ই ভালো থাকে না।

শঙ্কিতা—অর্থাৎ?

অনুপম—অভিধান দেখুন-না।...বেশ পড়বেন না যখন, আমি বাড়ি যাই। (উঠবার উপক্রম)

শঙ্কিতা—(হাত ধ'রে টেনে বসিয়ে) না। যেতে পাবেন না। পড়বো, বসুন। (অনুপম বসলো, শঙ্কিতা বইখুলে কিছুক্ষণ বসে রইলো)

শঙ্কিতা—মা আজ সকালে আপনাদের বাড়ি কেন গিয়েছিলেন?

অনুপম—কি ক'রে জানবো?

শঙ্কিতা—গিয়েছিলেন—তা জানেন তো?

অনুপম—কেন জানবো না?

শঙ্কিতা—কার কাছে গিয়েছিলেন? আপনার মাসির কাছে তো?

অনুপম—নিশ্চয়ই। আজকাল তো উনি প্রায়ই যান।

শঙ্কিতা—আগে তো এতো ঘন-ঘন যেতো না মা।

অনুপম—তার খবর আমি কি জানি?

শঙ্কিতা—আপনি সব কাজ মাসির মত নিয়ে করেন?

অনুপম—কেন করবো? বেড়াতে যাবো কিনা মাসির মত নিই না, শুয়ে পড়বো কিনা মাসির মত নিই না। হাঁচবো কিনা, কাশবো কিনা, হাই তুলবো কিনা—

শঙ্কিতা—জ্বালাবেন না বলছি। আমি কি সেই কথা বলছি?

অনুপম—আপনি এখন যা-সব বলছেন তা আমি বুঝছি না।

শঙ্কিতা—আমি বলছি গুরুতর বিষয়ে আপনি মাসির মত নিয়ে চলেন, না স্বাধীন মতে চলেন?

অনুপম—অনেক সময় নিই; অনেক সময় নিই না... কিন্তু এসব হেঁয়ালির মানে কি? এসব—কথা কেন উঠছে? এগুলো তো ইংরেজী পড়া নয়।

শঙ্কিতা—পড়তে আমার আজ ভালো লাগছে না।

অনুপম—(ক্রোধের ভানে) মেয়েদের আবার কোন্ কালে পড়তে ভালো লাগে?

শঙ্কিতা—বাব্বা, রাগছেন যে। মাসী তো মাটীর মানুষ। বোন্ পো-টি—

অনুপম—কাঠের মানুষ।

শঙ্কিতা—হ্যাঁ।...বলুন-না, মাসীর অমতে কিচ্ছুটি করেন না!

অনুপম—আচ্ছা, আপনার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সেদিন মাসীকে বললুম, "মাসি, তোমার অমতে যদি বিয়ে করি বউকে ঘরে নেবে?"

শঙ্কিতা—(এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি মেলে) মাসী কী বললেন?

অনুপম—বললেন—'তুই যাকে নিতে পারবি আমি তাকে পারবো না?"

শঙ্কিতা—সত্যি? (আহ্লাদের ভঙ্গী)

অনুপম—তা, আপনার এতো খুসী কেন?

শঙ্কিতা—আপনার মাসী খুব-পড়া মেয়ে ভালোবাসেন নাকি?

অনুপম—না! আমিও না।

শঙ্কিতা—মাসী আপনাকে খুব ভালোবাসেন, না?

অনুপম—অত্যন্ত।

শঙ্কিতা—পরের মেয়েকেও তেমনি ভালো বাসতে পারবেন?

অনুপম—কে পরের মেয়ে? ও, আমি যাকে বিয়ে করবো? খুব পারবেন।

শঙ্কিতা—মা কেন আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলেন সত্যিই জানেন না?

অনুপম—গিয়েছিলেন জানি, কেন গিয়েছিলেন—

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)।

অন্নপূর্ণা—(একখানি খাম অনুপমের হাতে দিয়ে) এখানি মাসিকে দিয়ো। মাসি তোমাকে কিছু বলে ছিলেন?

অনুপম—আজ? আপনি চলে' আসবার পর?

অন্নপূর্ণা—হ্যাঁ।

অনুপম—বলেছেন।

অন্নপূর্ণা—তা হ'লে তোমার অমত নেই তো?

শঙ্কিতা—ইংরেজীটা থাক্, এখন অঙ্ক কসি।

অনুপম—তাই করুন।

অন্নপূর্ণা—'করুন' আবার কেন? কতোদিন ভাবি তোমাকে বারণ ক'রে দেবো 'আপনি' বলতে। আর ওকে 'আপনি' ব'লো না।' ও-তো তোমার কত ছোটো।··· আচ্ছা, মাসীকে ওটা দিয়ো তাহলে। ভুলোনা যেনো।

(প্রস্থান)

শঙ্কিতা—আপনার মাসীর সংগে মায়ের ভাবটা যেন বেশি ঘনিয়ে এলো মনে হচ্ছে না? আগো তো এতোটা ছিলো না?

অনুপম—আপনাকে আপনার মা 'আপনি' বলতে বারণ করলেন কেন বলুন তো?

শঙ্কিতা—ভুল হ'লো। তোমাকে তোমার মা 'তুমি' বলতে বললে কেন বলো তো?

অনুপম—তাই, তাই।

শঙ্কিতা—তাই তাই দিচ্ছেন? (চকিতার প্রবেশ)

চকিতা—তাই-তাই কে দিচ্ছেন ভাই? উনি? না, না। তা কি হয়? যে দেবে সে আসতে দেরি। হয়তো খুব দেরি নয়।

অনুপম—(হেসে) } বসুন-না।

শঙ্কিতা—(রেগে) } ফাজিল।

চকিতা—না। অর্থাৎ দুজনেই একই সংগে কথা বলেছেন, দু জনকে এক সঙ্গেই জবাব দিলুম। শঙ্কিতা, আমি ফাজিল নই। অনুপম বাবু, আমি বসবো না। কারণ, শঙ্কিতা রাগ করবে। (প্রস্থান)

শঙ্কিতা—আচ্ছা, আপনি কতো বয়সে বিয়ে পছন্দ করেন?

অনুপম—এর নাম কি পড়া শুনা?

শঙ্কিতা—বারে বকছেন কেন? আপনার মাসী মাটীর মানুষ। আপনি বুঝি—

অনুপম—বলেছি তো। কাঠের মানুষ। (চকিতার প্রবেশ)

চকিতা—'চকিতা' নামের সার্থকতা দেখাচ্ছি। ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়ে চমক দিয়ে যাচ্ছি। বইটা রইলো। অন্য মনস্ক হ'য়ে গেছি। একটা সুখবর শুনেছি কিনা, আর মন দিতে পারছি না। তার চেয়ে মাসীর চপ ভাজায় সাহায্য করিগে। (প্রস্থান)

শঙ্কিতা—কই? বললেন না?

অনুপম—বলবার ফুরসৎ হ'লো কই?

শঙ্কিতা—এইবার?

অনুপম—বলছি। আমি পছন্দ করি ছাব্বিশের মধ্যেই পুরুষের বিয়ে।

শঙ্কিতা—আর মেয়ের?

অনুপম—(মৃদু হাস্যে) কুড়ির পরে নয়।

শঙ্কিতা—আপনি ভারি দুষ্টু।

অনুপম—শিষ্টতার অভাব ঘটলো কোথায়?

শঙ্কিতা—হাসলেন কেন?

অনুপম—হাসলুম এই ভেবে যে আপনার মা কেন মাসীর কাছে গিয়েছিলেন তা আমি জানি, আপনি জানেন তো?

শঙ্কিতা—মানে? বেশ উল্টো চাপ দিতে পারেন তো? আমি জানলে আবার আপনার কাছে জানতে চাইবো কেন? আমি কি মিথ্যে বাদী?

অনুপম—খুব। আপনি একা কেন; মেয়েরা সবাই। বিশেষতঃ এই রকম ব্যাপারে।

শঙ্কিতা—ব্যাপার আবার কি?

অনুপম—সে এক 'অনুপম' কাণ্ড।

শঙ্কিতা—খুব হেঁয়ালি জানেন তো?

অনুপম—আর সেই 'অনুপম' কাণ্ডে 'শঙ্কিতা' শাখা বাতাসে কাঁপছে শঙ্কায়।

শঙ্কিতা—শঙ্কায় না ছাই।

অনুপম—তবে?

শঙ্কিতা—আনন্দে।

অনুপম—তবে যে জানোনা তুমি?

শঙ্কিতা—(উঠে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এসে) হ্যাঁ 'তুমি'। আপনি অনুপম। অর্থাৎ আপনার এই 'তুমি' বলা।

অনুপম—জানো তা হ'লে তোমার মা কেন গিয়েছিলেন?

শঙ্কিতা—না।

অনুপম—আমার মত আছে।

শঙ্কিতা—নিশ্চয়ই। আপনার একটা মত নিশ্চয়ই আছে।

অনুপম—আমার বয়স পঁচিশ।

শঙ্কিতা—আহা, আর আমিই যেনো বিশ পেরিয়েছি।

অনুপম—বেশি পড়া মেয়ে আমার পছন্দ নয়।

শঙ্কিতা—কতো দূর?

অনুপম—(ঝাঁ ক'রে ইংরেজী বই-এর খোলা পাতায় আঙুল দেখিয়ে) এতো দূর।

শঙ্কিতা—এতো দূর? তবে যে কিচ্ছুটি জানেন না?

সৌভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নির্বিকার চিত্তের আয়নায় জাতির ভণ্ডামি, কৃত্তিমতা, নির্লজ্জতা ও আত্মসর্বস্ব মনের যে কলুষিত চেহারা ফুটে ওঠে তারই বিরুদ্ধে আত্মচেতনা ও অধিকার-বোধের যে প্রশ্ন অসহায়কেও দুঃসাহসিক ক'রে তুলেছে—তারই চরম পরিণতির ইঙ্গিত দেবে।

অনুপম—এর মধ্যে কী জানবো? এখন মাত্র জানি যে—না, যাক্।

শঙ্কিতা—না, শুনবো।

অনুপম—দরজাটা খুলে আসা হোক্। (শঙ্কিতা দরজা খুললো)

অনুপম—মাত্র জানি যে নাম এই (শঙ্কিতাকে দেখালো), ধাম এই (বাড়িখানি অর্থাৎ ঘরখানি দেখালো), বিদ্যে এই (টেবিলের বইগুলি দেখালো), সংগ এই। (নিজেকে দেখালো)

শঙ্কিতা—চকিতাকে কেমন লাগে?

অনুপম—মন্দ নয়। তবে বড়ো বেশি চালাক। অতো চালাক আমার ততোটা ভালো লাগে না।

শঙ্কিতা—তবে যে অতো খাতির ক'রে কথা বলা হয়?

অনুপম- আমি তো অভদ্র নই।

শঙ্কিতা—ওঃ। তবে পাঞ্জাবীর চেয়ে সার্ট ভালো লাগে আমার। ছোটো জুল্‌পির চেয়ে বড়ো জুল্‌পি, আচ্ছা, চকিতার মতো ছাঁটা ছোঁটা জামা ভালো?

অনুপম— মন্দ কি।

শঙ্কিতা—পছন্দ ঐ রকম?

অনুপম—আমার পছন্দে ওটা ভালো নয়।

শঙ্কিতা-- বাঁচা গেলো।

অনুপম—কেন?

শঙ্কিতা—বলবো না।

অনুপম—দেখি তোমার মাথার চুলের কেমন গন্ধ? কী তেল মাখো?

শঙ্কিতা - মামাকে বলে দেবো কিন্তু।

অনুপম—কেন, মামা কি মাষ্টার মশাই?

শঙ্কিতা—আজ্ঞে হ্যাঁ, তোমার মত নয়। (অনুপম শঙ্কিতার চিবুক ধরলো।) কি হচ্ছে? মামা রাগ করবে না?

অনুপম—না, না।

শঙ্কিতা—হ্যাঁ, মামা বকবে। (চোখ মুদলো।) মামা বকবে। ওরে বাপরে, মামা রাগ করবে। (চোখ খুললো) ওরে বাপরে। (বলতে বলতে যাবার উপক্রম)

অনুপম—থামো থামো।—কবে বিয়ে হবে জানো?

শঙ্কিতা -শুনবো না, শুনবো না। মামা বকবে।

অনুপম—বিয়ে হবে আসছে মাসে।

শঙ্কিতা—সত্যি ?

অনুপম—হ্যাঁ।…শোনো।

শঙ্কিতা—কি গো ?

অনুপম—তোমার অমত নেই তো ?

শঙ্কিতা—দূর।

অনুপম—দূর নয়। কাছে। এসো এসো (শঙ্কিতা কাছে এলো, অনুপম তার হাত ছুখানি ধরলো।)

শঙ্কিতা—না গো। ছাড়ো। মামা যদি—(অন্নপূর্ণা ও শঙ্করের প্রবেশ। পিছনে চকিতা।)

অন্নপূর্ণা—শঙ্কি, তোর মামা মত দিয়েছে। তোরা দুটিতে ওঁকে প্রনাম কর। (অনুপমা ও শঙ্কিতা অগ্রসর হ'লো।)

চকিতা—(গানের সুরে) "আমার দোসর যেজন ওগো তারে—" (চকিতার গমনোদ্যোগ)

শঙ্কিতা—মামাকে ব'লে দেবো কিন্তু। দেখো না (মামার দিকে চেয়েই দ্রুত প্রস্থান।)— যবনিকা

— —

সাহিত্যিক-চরিচালক শৈলজানন্দ

[রচনাটির দায়িত্ব লেখকের ব্যক্তিগত পত্রিকার নয়।]

—সতীশ নন্দী

বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলার রংগমঞ্চে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা অস্বীকার্য নয় কোনদিনও। সূর্যের উদয়াস্তের মতো সত্য। আমাদের জীবনের হাসি কান্না, দুঃখ ব্যথার অতি তুচ্ছতম ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র তাঁর অপূর্ব হাতের পরশে বাঙালীর বড় ও ছোট খ্যাত ও অখ্যাতের জীবনের যে ঘাত সংঘাত সৃষ্টি করেছেন, তা অনবদ্য। অনুপম সুন্দর। সেই সৃষ্টির কাছে আর কোন সৃষ্টির তুলনা মেলেনা।

কিন্তু শরৎচন্দ্র আজ আর নেই। যা দিয়ে গেছেন তা আছে, এবং থাকবেও যতদিন ভাষার আঁচড় থাকবে পুঁথির পৃষ্ঠার বুকে। প্রশ্ন এই, শরৎ প্রতিভার পর আর কোন শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকের তুলির পরশে বাঙালীর, হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, ও নিপীড়িতের ব্যথা বেদনার ইতিহাস কেন্দ্র করে, কার প্রতিভার বিকাশ হয়েছে? তার উত্তরে, আজ বাঙলার প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দের নাম বললে অত্যুক্তি হবেনা আশা করি।

সাহিত্যিক শৈলজানন্দ বাঙলা সাহিত্যে যে দান করেছেন তা বাঙালীর নিজস্ব বৈশিষ্টেরই অতুলনীয় পরিবেশন। এইখানেই তাঁর সাহিত্যে কৃতিত্ব। কিন্তু যেদিন হ'তে তিনি চিত্রজগতে সেই সাহিত্যের ভাবধারা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন, তখন হতে অনেকেই তাঁকে অপাংক্তেয় করেছেন সাহিত্যরথীদের আসন থেকে। তিনি ভ্রুক্ষেপ কর্লেন না, বাসী-বনের কুসুম তুলে, মালা গেথে দিতে আরম্ভ করলেন চিত্র জগতকে, এবং তিনিই এই জগতে সৃষ্টি করলেন এক চিত্ত চাঞ্চল্য ইতিহাস। বাঙ্গালীর মন হতে শৈলজানন্দ অপসৃত হয়ে যেতে পারে কিন্তু "বন্দী" 'সহর থেকে দূরে' আর অধুনা 'মানে না মানা' কোনদিনও বাঙ্গালী ভুলবে না।

প্রতিটী ঘরের নর-নারীর অন্তরের সুখ দুঃখ অনুভূতি মানাপমান প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে, চোখের সম্মুখে আলেখ্য করে ধরতে, একমাত্র শৈলজানন্দর মতো শিল্পীই পারেন।

'বন্দীর' আদর্শ ভাইয়ের ভূমিকায় 'জহর'কে কেউ কোনদিন ভুলতে পারবেনা, শুধু সেই কারনেই কি 'বন্দী' কথা চিত্র মনে রাখবার মতো, তাছাড়া আরও ছোটখাটো কতগুলি ঘটনা সমাবেশ যা সত্যিকারের গ্রামের রূপ, সে কথা বাঙালী কি অস্বীকার কর্তে পারবে? যদি কেউ পারে, আমি বলবো, তাঁরা বিলাসী শহরের বাসিন্দা, গ্রামের সংগে নিবিড় যোগ নেই।

তারপর আস্‌ছে 'সহর থেকে দূরের কথা। যেখানে শাশুড়ীর ভূমিকায় 'প্রভাকে' কোন বাঙালী বধূ ভুলতে পারেনা। তাদেরই অন্তরের খাঁটি সত্য কথা ফুটে উঠেছে আলেখ্য চিত্রে।

'মানে না মানা'তেও তেমনি বাংলা পল্লীগ্রামের একটি দরিদ্র গৃহস্থের ঘরোয়া ব্যাপারকে কি সুন্দর নিখুঁত ভাবে পরিবেশন করেছেন চিত্রে। ধনী, দরিদ্রের শ্রেণী বৈষম্য দেখলে, শৈলজানন্দের প্রতিভাকে স্বীকার করতে দ্বিধাগ্রস্থ হ'তে হয় না।

বাঙলা দেশে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার কাছে শৈলজানন্দের প্রতিভার পরিমাপ করা ভুল, কিন্তু শরৎচন্দ্রের পর বর্তমান যুগে কথাশিল্পী শৈলজানন্দ শরৎচন্দ্রের স্থান কিছুটা দখল করেছেন, সেকথা স্বীকার্য।

বাঙলা দেশে একটা জিনিষ খুব বেশী প্রবল, তা হচ্ছে, দলাদলি। মতভেদ থাকা ভালো, তা বলে দলাদলি থাকতে হ'বে একথা ত ঠিক নয়। সাহিত্যক্ষেত্রেও যেমন মতভেদ রয়েছে, দলাদলিও রয়েছে বিস্তর। যারা সমালোচক, তারা নিরপেক্ষ সমালোচক নহে, তারা যে ব্যক্তি বা যে দলের, তাকেই বড় করবে তুলবে সমালোচনার মানদণ্ড দিয়ে, তা একদিকে বেশী ভার হউক একদিক কমে যাক, তাতে কিছু যায় আসে না।

'সারারাত' চিত্রে রাণীবালা ও প্রতিমা দাশগুপ্তা

প্রতিভাকে আমরা স্বীকার করি তখন, যখন দেখি কোন একজন বড় সমালোচক বা বড় কাগজের সম্পাদক তাঁর প্রতিভাকে বিশ্লেষণ করেছেন। যদি সেই প্রতিভাবান ভাগ্যক্রমে তাদেরই দলভুক্ত হন্। কিন্তু যদি বিপক্ষ দলের হন্ তাহ'লে No Chance.

আমাদের দেশেরই একজন স্বনামধন্য সমালোচক, নাট্যসাহিত্যিক হিসেবে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্রকে। তার সৃষ্টি "মানময়ী গার্লস স্কুলের" জন্য। জানিনা, রবীন্দ্র মৈত্র এই কথা শুনে গিয়েছেন কিনা, তাহ'লে আশা করি স্বর্গে গিয়েও তিনি সেই সমালোচকের প্রতি কৃতজ্ঞ হ'য়ে আছেন।

নিরপেক্ষভাবে শৈলজানন্দের সাহিত্য সৃষ্টির পর্যালোচনা করে দেখলে, তাঁকে অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখক বা শিল্পী না বললেও প্রতিভাশালী শিল্পী একথা সকলেই স্বীকার করবেন। 'কয়লা কুঠির' লেখক শৈলজানন্দ আজ বাঙলা সাহিত্যাকাশে জ্যোতিষ্ক না হ'তে পারেন তার জন্য ক্ষতি নাই, বিশেষণ লাগানো আখ্যার জন্য শৈলজানন্দ আকাঙ্খিত নয় তা তার নিজের কথা হতেই বেশ প্রমাণিত হয়। তিনি যে শরৎচন্দ্রের মতোই বাঙলার একজন দরদী সাহিত্যিক সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

তিনি 'শহর থেকে দূরে' সম্বন্ধে বলেছেন,—

"শত সহস্র দর্শকের আনন্দ-কলরব মুখরিত অন্ধকার গৃহের এক প্রান্তে নিতান্ত সংগোপনে যখন আমি দাঁড়াই, যখন দেখি বহু বিচিত্র চরিত্রের নরনারী তাদের সংগ্রাম বহুল জীবনের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার কথা বিস্মৃত হ'য়ে আমার সৃষ্ট কয়েকটি মানুষের সংগে এক হ'য়ে গিয়ে হৃদয় রাজ্যের পরিধিকে বিস্তার করে দিয়েছে। তখন আমার চোখের জলে যে আনন্দের সন্ধান পাই—পৃথিবীর ভাণ্ডারে এমন কোনও অর্থ সম্পদ নাই, যাহার পরিবর্তে আমি আমার ওই এক ফোঁটা অশ্রুকে বিনিময় কর্তে পারি।"

সম্পাদকের দপ্তর

মঈদ্-উর-রহমান (আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা)

শারদীয়া রূপ-মঞ্চে সকলের আগে আপনার লেখা "আমাদের আজকের কথা" মনযোগ দিয়ে পড়েছি। প্রথম দিক দিয়ে আপত্তি আমাদের কিছুই নেই—বরং ভালই লেগেছে বলতে হবে; কিন্তু শেষ দিকে দিয়ে মানে শেষ লাইনটী সম্বন্ধে কিছু আপত্তি রয়েছে। আপনি শেষ দিক দিয়ে হিন্দু-মুসলমানকে মিলিত হতে বলেছেন। তারপর লিখেছেন "হিন্দু মুসলমানের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হউক 'বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম!" হিন্দু মুসলমানের মিলনে ভারতের স্বাধীনতা আসতে পারে—সে ভাল কথা। কিন্তু মুসলমানের কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিত হউক—এখানেই আমাদের আপত্তি। 'বন্দেমাতরম, হিন্দুদের জাতীয় সংগীত হ'তে পারে, কিন্তু মুসলমানেরা সেটাকে নিজেদের সংগীত বলে মেনে নিতে কিছুতেই পারেন না। কারণ, মুসলমানেরা মাতাকে বন্দনা কখনও করেন না—তারা বন্দনা করেন এক 'খোদাকে।' খোদা ছাড়া আর কিছুকে বন্দনা করাই তাদের মহাপাপ। There is no god but God. সুতরাং গানের প্রথম শব্দটী গ্রহণেই আমাদের আপত্তি। তারপর মধ্যে আছে—

> "তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম
> তুমি হৃদি, তুমি ধর্ম্ম
> তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

আপনি কি এই শ্লোক গুলোকে মুসলমানের গ্রহণীয় বলতে চান? মুসলমান কি কোন দিন কারো প্রতিমা গ'ড়ে মন্দিরে রেখে পূজা করেছে বা করতে পারে? এ ভাবতেও পারা যায় না। তবে আপনি কেন এটাকে মুসলমানদের কণ্ঠে ধ্বনিত হউক এই আশা করেছেন?

: আপনার প্রশ্ন অথবা অভিযোগ আমি বার বার পড়েছি এবং আমায় খুব আনন্দ দিয়েছে এইজন্য—যে, রূপ-মঞ্চের একজন সত্যিকারের দরদী পাঠক হ'য়ে আপনি তার সম্পাদকের মতবাদ বিনা প্রতিবাদে অন্ধের মত মেনে নেননি। জাতি হিসাবে আমরা এক—ভারতবাসী, কিন্তু দুই প্রধান ধর্ম আমাদের দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছে। পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝির জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক আমাদের যে কোন জাতীয় আন্দোলন পরস্পরের বিরোধী মনোভাবের জন্য ব্যর্থতার আঘাতে বার বার চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে। তাই প্রতি পদক্ষেপে প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর—তিনি হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন উচিত নয় কী এই সর্বনাশা ভুলের মূল উৎপাটন করে জাতির মহত্তর কল্যাণ সাধন করা? পূজা সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শেষাংশে হিন্দু মুসলমানের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হউক "বন্দেমাতরম—বন্দেমাতরম" এই অংশটুকু সম্পর্কে আপনি আপত্তি তুলেছেন, কারণ মুসলমানেরা মাতাকে বন্দনা কখনও করেন না—তাঁরা বন্দনা করেন এক খোদাকে। খোদা ছাড়া আর কিছুরই বন্দনা করা তাঁদের মহাপাপ। "There is no god but God"। একটা কথা এখানে বলে রাখি, শুধু মুসলমান ধর্ম কেন, প্রত্যেক ধর্মের মূলই হচ্ছে, There is no god but God. হিন্দু ধর্মের মূল সূত্রও তাই "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।"। বিভিন্নরূপে বিভিন্ন দেব-দেবীকে আরাধনা করলেও হিন্দুরা যে সেই সর্বশক্তিমান ভগবানেরই আরাধনা করে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। একই ভগবান বিভিন্ন রূপে

রূপায়িত—"একোঽহং বহু স্যাম।" এ যেন ঠিক বিভিন্ন পর্বতের গা বেয়ে কতগুলি ধারা এসে একই সংগম স্থলে বা গন্তব্যে পৌছেছে। ধর্মের এই গূঢ় তত্ত্ব কথা থেকে—আমাদের মূল বক্তব্যে আসা যাক। এবং আমাদের বক্তব্যের পূর্বে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র গঠিত 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র সামরিক সংগীতের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

"কদম কদম বাড়ায়ে যায়
খুশীতে গীত গায়ে যায়
এ জিন্দগী হ্যায় কওম কী
(তো) কওম পে লুটায়ে যায়।
তু শেরে হিন্দ আগে বাড়
মরনেসে ফিরভি তু ণ ডর
আসমান তক উঠাকে শর্
জোসে বতন্ বাড়ায়ে যায়॥
তেরে হিম্মদ বাড়তি রহে
খুদা তেরী শুনতা রহে
যে সামনে তোরে চড়ে।
তো খাকসে মিলায়ে যায়।
চলো দিল্লী পুকার কে
কওমী নিশান্ সামালকে
লাল কিল্লে গাড় কে
লহরায়ে যা লহরায়ে যা॥

এখানে ত খোদার কথা রয়েছে তাই বলে এই সংগীত কী হিন্দুদের জাতীয় সংগীত নয়? মহাপাপ বলে হিন্দুরা কী একে বর্জন করবে—যেহেতু এখানে তাদের ভগবানের কথা নেই—তাই যদি কোন হিন্দু করে, তাকে বলবো সাম্প্রদায়িক হীন মনোবৃত্তিতে দুষ্ট—কারণ জাতি বিরাট— সমগ্র দেশের অধিবাসী নিয়ে জাতি—ধর্ম তার অধীনে। কোন ধর্মকেই জাতি বাদ দিতে পারে না। আবার একই জাতির অধীনে কোন ধর্ম জাতিকে অবমাননা করতে পারে না। জাতি হিসাবে হিন্দু মুসলমান—এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত যে কোন ভারতবাসী এক—ধর্ম হিসাবে তারা পৃথক। যখনই আমি নিজেকে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী বলে জাহির করবো—মুসলমান সংস্কৃতি—হিন্দু সংস্কৃতি কাউকেই ছোট করে দেখবো না। আমি যে ধর্মাবলম্বীই হই না কেন। জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমান ধর্মের কোন বাণী এমন কী পবিত্র কোরাণ শরিফের কোন বাণী যদি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে—হিন্দু হ'য়েও আমি তা অতি আগ্রহের সংগে উচ্চারণ করবো—কারণ জাতীয় আন্দোলনে তা প্রেরণা দিয়েছে বলে—। বন্দেমাতরম সংগীতকেও আমরা ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ করবো। হিন্দু ধর্মের ভাবধারাকে অনুসরণ করে একজন হিন্দু সাহিত্যিকের কলম থেকে যদিও তা নিসৃত হ'য়েছিল—কিন্তু তবু জাতীয় জাগরণে এই সংগীত প্রভূত অংশে প্রেরণা দিয়েছে। তাই জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী হ'য়ে আমি একে অবমাননা করতে পারি না। যদি মুসলমান ধর্মের কোন ভাবধারাকে কেন্দ্র করে এরূপ কোন সংগীত জাতীয় আন্দোলনে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে—তাকেও আনন্দের সংগে আমরা গ্রহণ করবো—তাতে আমাদের হিন্দু ধর্ম রসাতলে যাবে না। মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে আমার চেয়ে আপনার প্রভূত জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক—বন্দেমাতরম যদি মুসলমানদের গ্রহণ করলে মহাপাপ হয় তাহ'লে কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ একজন মহাপাপী নিশ্চয়ই আপনার মতে। এবং আরো পণ্ডিতজন মুসলমাদেরও আপনি এই দলে টেনে আনবেন। তাই যদি হয়—তাহ'লে আমার কিছু বলবার নেই। আপনার অভিযোগ মাথা পেতে নেবো।

তারপর এখানে শুধু 'বন্দেমাতরম'ই ধ্বনিত হউক এই কথা বলা হ'য়েছে—এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ হিন্দু এবং মুসলমান মিলিত ভাবে এই দেশমাতৃকার মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিক। তারা যে মিলিতভাবে মন্দিরে মন্দিরে মায়ের প্রতিমা গড়ে পূজা করবে—একথা যেমনি আমার নিজেরও অভিপ্রায় নয়—তেমনি ওখানে তা প্রকাশও পায়নি।

এস, আলী মোহাম্মদ (গ্রাহক নং ১০১৪ চকবাজার বরিশাল)

(ক) অনেক অভিনেত্রীই আছেন আমাদের বাংলা ছায়াকাশে কিন্তু চন্দ্রাবতী দেবীকে যেন অতি উচু স্থানীয় হিসেবে দেখতে পাই। (খ) শিশুদের বা কিশোরদের উপযোগী কোন বই পর্দা বা মঞ্চে অভিনীত হয় না কেন? (গ) অপরাজেয় অভিনেতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে যাতে কোন একটা রাস্তার নামকরণ হয়—তার স্মৃতি রক্ষার্থে রূপ-মঞ্চ কতদূর কী করেছে? (ঘ) দেখছি আপনার চোখে হিন্দু মুসলমান এক, কিন্তু সবাই সবাইকে সমান চোখে দেখতে পারেন না কেন? (ঙ) শুনলাম বিশ হাজার টাকা খেয়ে শ্রীমতী পূর্ণিমা 'অভিনয় নয়'তে ঐ কুৎসিৎ অভিনয়টুকু করেছেন, তার মত অভিনেত্রীর কাছ থেকে এ আমরা কখনও আশা করিনি। পরিচালক যা অর্ডার দেবেন তাই করতে হবে নাকি? টাকা খেয়ে এরূপ অর্থহীন অভিনয়ের কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

: (ক) চন্দ্রার ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় শুধু আপনার নয় সমস্ত বাঙ্গালী দর্শক সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছে। নক্ষত্র খোচিত আকাশের গায়ে ধ্রুবতারা যেমনি নিজের বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্যরূপে প্রতিভাত হ'তে থাকে, আমাদের চিত্রালোকে চন্দ্রাবতীও তাঁর অভিনয় দীপ্তিতে তেমনি দীপ্তিময়ী। (খ) প্রযোজকদের ধারণা কিশোরোপযোগী নাটক বা চিত্র পয়সা দেয় না। এই ধারণা যতদিন না তাদের মন থেকে মুছে যাবে তার পূর্বে—বর্তমান প্রযোজক গোষ্ঠীর দ্বারা কিশোরোপযোগী কোন চিত্র বা নাটকের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। (গ) রূপ-মঞ্চের প্রতি যদি এ দায়িত্ব চাপাতে চান—তাহলে পৌর-নির্বাচনে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে হয়। তাই আপনাদের মত রূপ-মঞ্চও এবিষয়ে পৌরকর্তাদের মর্জির প্রতি চেয়ে আছে। (ঘ) হিন্দুমহাসভা এবং মুসলিম লীগ-এর পরস্পরের এ বিরোধ যেদিন দূর হবে সেদিন এর উত্তর পাবেন। আমি এ দুইয়েরই বাইরে—আমার মত ধর্মের চেয়ে জাতির স্বার্থই যাদের কাছে বড় সেরূপ হিন্দু বা মুসলমানের কাছে—হিন্দু মুসলমানের কোন পার্থক্য নেই। একই মায়ের আমরা দুটী সন্তান। (ঙ) অভিনয় করে শ্রীমতী পূর্ণিমা কত টাকা পেয়েছেন সে সংবাদও যখন আপনি রাখেন—তখন আমার কাছে এ প্রশ্নের অবতারণা কেন—? তবে এটুকু জেনে রাখতে পারেন—চুক্তি করবার সময় কোন দৃশ্যে কী করতে হবে—সেসবের কোন উল্লেখ থাকে না। যতদূর জানি, সময়ের পরিমাপেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চুক্তি করা হয়। অনেক সময় চরিত্রটীর আভাসও দেওয়া হয়। ঐ দৃশ্যে ওরূপ করতে হবে—এই জন্য শ্রীমতী চুক্তিবদ্ধা হ'য়েছিলেন—এরূপ বালকসুলভ মনোভাব মনে স্থান দেবেন না। চরিত্র বিকাশের জন্য দায়ী পরিচালক এবং কাহিনীকার। পরিচালক যে ভাবে নির্দেশ দেবেন পরিচালকের নির্দেশানুযায়ীই শিল্পীর ভিতর চরিত্রটী বিকশিত হতে থাকে। তাই অযথা শ্রীমতী পূর্ণিমা'কে দায়ী করলে চলবে কেন?

কুমারী উমা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)

(১) পদ্মা দেবীর খবর কী? তিনি কী চিত্রজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। (২) শ্রীমতী বিজয়া দাসের পরবর্তী চিত্র কী? (৩) শ্রীমতী পান্নার খবর কী? (৪) রাধামোহন ভট্টাচার্য ও বিনতা বসুর (হিন্দি হামারাহী ছাড়া) পরবর্তী বাংলা চিত্র কি? (৫) শ্রীমতী কানন দেবী অভিনীত বনফুলের খবর কী? (৬) দেবী মুখার্জি কি নিজে গেয়ে থাকেন।

: (১) পদ্মা দেবীকে ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওর বাংলা চিত্র গৃহলক্ষ্মীতে দেখতে পাবেন। চিত্রখানি রূপবাণীতে মুক্তি অপেক্ষায়। তাই চিত্রজগত থেকে তাঁর বিদায় নেবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

(২) শ্রীমতী বিজয়া দাস সাময়িক ভাবে বিদায় গ্রহণ করেছেন। অভিনেত্রী জীবনের প্রথম ব্যর্থতায় তাঁর এই বিদায় গ্রহণ আমি খুব প্রশংসার বলে মনে করি না। কারণ শেষরক্ষা চিত্রে তাঁর যে অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি—তাতে তাঁর বিদায় গ্রহণে বাংলা চিত্র জগতের কিছুটা ক্ষতি হ'য়েছে বৈকী? বাংলা চিত্রজগতে যে সব চিত্র-তারকা গিজ গিজ করছেন—তাদের চেয়ে শ্রীমতী বিজয়া দাসের কিছুটা বেশী প্রয়োজন আছে—

একথা স্বীকার করতে আমি কুন্ঠিত নই। (৩) শ্রীমতী পান্না সম্ভবতঃ স্থায়ী ভাবেই অবসর গ্রহণ করেছেন। (৪) আগামী সংখ্যায় আপনাকে এদের সম্পর্কিত সংবাদ দিতে পারবো আশা করি। (৫) বনফুল মুক্তি প্রতীক্ষায় (৬) না। দেবী বাবুর জন্য পর্দায় অন্য গলার প্রয়োজন হয় সংগীতের সময়।

শ্রীপরিমলকৃষ্ণ বিশ্বাস (রামধাম পোঃ বসিরহাট)

আমি সিনেমাটোগ্রামী বা সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারের কাজ শিখিতে চাই—এজন্য কতদূর শিক্ষা দরকার।

: অন্ততঃ পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস্-সি হওয়া উচিত। এবং শিল্প দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

শ্রীকাননকুমার চট্টোপাধ্যায় (রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা)

রূপ-মঞ্চের শিল্পী শ্রীযুক্ত সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় (৭৪।৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,—) এর সংগে আপনি দেখা করুন। তিনি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন।

করালীমোহন চট্টোপাধ্যায়

পি, আর, প্রোডাকসন্সের 'বনফুল' ছবির সংগীত পরিচালক কে?

: শ্রীযুক্ত কমল দাশগুপ্ত

নিতাইকুমার রায় (সৈদাবাদ, খাগড়া)

শুনলাম পরিচালক শৈলজানন্দের সংগে ইষ্টার্ণ টকীজের ম্যানেজারের নতুন বৌ নিয়ে ঝগড়া লেগেছে কথাটা কী সত্য?

: কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা না হ'লেও ঝগড়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোন আদর্শগত মতানৈক্যের জন্যই শৈলজানন্দ নতুন বৌএর পরিচালনা করবেন না—তাই বলে ইষ্টার্ণ টকীজ আর তাঁর মাঝে কোন বিদ্বেষ ভাব এখন পর্যন্তও দানা বেঁধে উঠেনি বলেই জানি।

হীরেন বসু (কলিকাতা)

নামগুলি শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে সাজিয়ে দিন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, বেচু দত্ত, জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখো, সত্য চৌধুরী, সুধীন চট্টোঃ।

: নিজে আমি সংগীত বিশারদ নই তাই আমার কাছ থেকে বিজ্ঞান-সম্মত বিচার আশা করতে পারেন না। শ্রোতা হিসাবেই আমার নিজের কাছে যাকে যেমন লাগে তাকে তেমনি ভাবে সাজিয়ে দিচ্ছি। জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, বেচু দত্ত, সত্য চৌধুরী, সুধীন চট্টো—(এর গান আমি শুনিনি, শুনলেও রেশটা মনে নেই—তাই একে বাদ দিয়েই বললাম।)

দেবকুমার চক্রবর্তী (ক্ষেত্রেশকুমার রোড, মজঃফরপুর)

কানন দেবী সর্বপ্রথম কোন ফিল্মে অংশ গ্রহণ করেন।

জ্যোতিপ্রকাশ কি একজন বৈমানিক ছিলেন ?

: ঋষির প্রেম! না।

শ্রীবাসুদেব ভাদুড়ী (সিকদার বাগান ষ্ট্রীট কলিঃ)

নিউ থিয়েটার্সের মাই সিসটার চিত্রটী কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিতেছে না কেন? কোন্ চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করিবে ?

: অন্য কয়েকখানি চিত্র তার মুক্তির পথ অবরোধ করে রেখেছে বলে। সম্ভবতঃ চিত্রলেখা ও নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ করবে।

মনোরঞ্জন দাস (ক্যানিং হোষ্টেল)

নিউ থিয়েটার্সের যাবতীয় চিত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রখানার নাম কি এবং তার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অভিনেত্রী ও পরিচালকের নাম জানাবেন।

(২) দুই পুরুষ, মানে-না-মানা, অভিনয়-নয়, বন্দিতা প্রভৃতি চিত্রগুলির নাম পর পর সাজিয়ে দিন। (৩) লীলা দেশাই এখন চিত্রে অভিনয় করেন না কেন ?

(১) উদয়ের পথে।

ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, বিমল রায়।

(২) দুই পুরুষকে যদি দুই পুরুষ মূল নাটকের চিত্ররূপ মনে না করে—পর্দায় যে কাহিনী পেয়েছি সেদিক থেকে বিচার করি, তাহলে দুই পুরুষের নাম পূর্বে সাজাতে হবে—নইলে মানে না মানা। তারপর এলো অভিনয় নয় ও বন্দিতা—এ দুখানিকে ঠিক একই আসন দেওয়া যেতে পারে। অভিনয়-নয় চিত্রখানিতে যে কুরুচীর পরিচয় পাই বন্দিতাও সে অভিযোগ থেকে বাদ যাবে না। বন্দিতায় কাশীর গুণ্ডাদের দৃশ্যটীর কথা মনে করে দেখুন, ছায়া ও লোমশ ব্যাক্তির (জি, ডি, ইরাণীর) তথাকথিত নৃত্য দৃশ্যটী। (৩) লীলা দেশাই বম্বে আছেন। এবং বম্বের পর পর হিন্দি চিত্রে অভিনয় করছেন। এই সেদিনই ত তার 'মেঘদূত' চিত্রখানি কলিকাতায় প্রদর্শিত হ'য়েছিল।

শ্রীচণ্ডীচরণ সিংহ (ভাতুল, বাঁকুড়া)

বাংলা চিত্র জগতে অভিনেত্রী হিসাবে সুমিত্রা দেবী ও প্রতিমা দাশগুপ্তার মধ্যে কাহার স্থান উচ্চে। এবং তাহারা কে কোন চিত্রে ভাল অভিনয় করিয়াছেন। ছবি বিশ্বাস কী কোন নূতন ছবির পরিচালনা করিতেছেন ? পাহাড়ী সান্যাল কোন্ ছবিতে শ্রেষ্ঠ অভিনয় করিয়াছেন।

: দু'জনকে ঠিক তুলনা করা চলে না। চিত্রাভিনেত্রীর যে যে সম্পদ থাকা প্রয়োজন কোন জনেই তা থেকে বঞ্চিত নন। তবে সৌন্দর্যের দিক থেকে সুমিত্রাকে উচ্চ আসন দেওয়া যেতে পারে, প্রতিমা আবার সুমিত্রার চেয়ে বেশী 'ইন্‌টিলেকচুয়াল'। প্রতিমা সব ছবিতেই প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। তবে তার ভিতর গোরা, পথ ভুলে (বাংলা) এবং কুঁয়ারা বাপ (হিন্দি) তার শ্রেষ্ঠ অভিনীত চিত্র। সুমিত্রা এ পর্যন্ত একখানি বাংলা চিত্রেই অভিনয় করেছেন এবং তাতেই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছেন। চিত্রখানি চিত্ররূপার সন্ধি। শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস আপাততঃ কোন ছবির পরিচালনা করছেন না। পাহাড়ী সান্যাল কোন বাংলা ছবিতেই নিন্দনীয় অভিনয় করেননি। তবে বড় দিদি চিত্রের মাষ্টারমশায় তার শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের দাবী রাখে।

মঞ্চে ও নেপথ্যে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরত্নেশ্বর মজুমদার, শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

গোড়ার কথা বাদ দিলে আলোচ্য পুস্তকখানিকে মঞ্চ-নাট্য, মঞ্চের শিল্পী, আমাদের মঞ্চ ও গ্রন্থ নির্দেশ এই কয়েকটী পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় ছায়াচিত্র ও মঞ্চ-সম্বলিত কোন পুস্তক নেই বললেই চলে। শ্রীযুক্ত নরেন দেবের সিনেমা চিত্রামোদীদের কিছুটা কৌতূহল নিবৃত্তি করেছিল কিন্তু মঞ্চ সম্বলিত অর্থাৎ মঞ্চের আলোকসজ্জা, রূপ-সজ্জা, মঞ্চ-শিল্পীর আদর্শ—নাটকের স্বরূপ এরূপ খুঁটিনাটী নিয়ে সেরকম পূর্ণাংগ কোন পুস্তক ইতিপূর্বে দেখেছি বলে মনে হয় না। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক নিজে খ্যাতনামা নাট্যকার—কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলির অন্যতম জনপ্রিয় নাট্যমঞ্চ ষ্টার থিয়েটারের নাট্যাধ্যক্ষ। বহুদিন নাট্য-মঞ্চের সংগে জড়িত থেকে এর প্রত্যেক বিভাগ সম্পর্কে তাঁর যে বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মেছে আলোচ্য গ্রন্থ খানির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখিত বিভিন্ন বিষয়গুলি তারই সাক্ষ্য দেবে। বইখানি একদিক দিয়ে যেমনি বাংলা ভাষায় এরূপ একখানি গ্রন্থের অভাব পূর্ণ করলো, অন্য দিক দিয়ে যে কোন নাট্যামোদীকে নাট্য-মঞ্চ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে যে সাহায্য করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। পুস্তকের দর্শন এবং মুদ্রণও প্রশংসনীয়। তবে প্রচ্ছদপটটী আমাদের ভাল লাগেনি।

—প্রীতি দেবী

মরু-প্রদীপ

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল প্রণীত। প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

লেখক বাংলা সাহিত্যে নবাগত নন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনার সংগে আমরা পরিচিত আছি। গ্রন্থখানি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ১৪টী ছোট গল্পের সংগ্রহ। ইভাকুইজ ক্রম রেংগুণ—এ বার্মায় বোমা বর্ষণের নিখুঁত ছবি নাই। একটী মেয়ে, ক্ষুধার্ত, প্রেমের অভিশাপ, প্রভৃতিতে বাঙ্গালী সমাজের মর্মন্তুদ জীবনের বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। এ্যান্টিক কাগজে মুদ্রিত ঝরঝরে ছাপা প্রশংসনীয়। —প্রীতি দেবী

তাসের ঘর (উপন্যাস)—

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী ২১৬, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা। দাম ২॥০ টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় নাট্যসাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁর অনেক নাটক সাফল্যের সহিত পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে।

আলোচ্য পুস্তক "তাসের ঘর" জলধরবাবুর কাঁচা বয়সের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাস হিসাবে বইখানি সাধারণ মামুলী গার্হস্থ্য জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখিত। উপন্যাসের পরিণতি মন্দ লাগল না এবং মৃণ্ময়ী চরিত্রটিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে কতক যায়গায় দেবর মোহনের সংগে অসংগত ও অসহ্য আচরণ বড়ই পীড়াদায়ক। মৃত্যুমুখে মৃণ্ময়ীর মুখ দিয়ে কতকগুলি কথা বলিয়ে লেখক মৃণ্ময়ী চরিত্রটিকে খাটো করেছেন। রবীন্দ্রনাথের "গৃহ প্রবেশের" প্রভাব যেন শেষের দিকে বড় বেশী বলে মনে হয়।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই রুচিসঙ্গত ঝরঝরে।

—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবাদ

রূপমঞ্চ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ভাদ্রের রূপ-মঞ্চে 'অন্তরাল' নাটকের সমালোচনায় সমালোচকের একটি মন্তব্য পড়ে বড়ই বিস্মিত হলাম। সমালোচনার শেষের দিকে তিনি লিখেছেন, "চিত্রনাট্য 'উদয়ের পথে'র দুইটি দৃশ্যের ছাপ বইটিতে আছে, তবে খুব প্রচ্ছন্নভাবে।" 'মিল' না বলে, তিনি 'ছাপ' বলেছেন —অর্থাৎ আমি অনুকরণ করেছি। কিন্তু সমালোচক

বইএর ভূমিকায় চোখ বুলালেই দেখতে পেতেন যে তাতেই লেখা রয়েছে, নাটকখানি ১৯৪২ সালে রচিত। 'উদয়ের পথে' পর্দায় প্রকাশ পায় ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯৪২ সালেই অন্তরালের পাণ্ডুলিপি নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন সেন, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ এবং শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী পড়েছিলেন এবং ভাদুড়ী মশায় 'অন্তরাল' মঞ্চস্থ করবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। দু'বছর অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম নাটক মঞ্চস্থ হবার কোন সম্ভাবনা নেই, তখন আমি নাটকটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত করি এবং পুস্তকাকারে 'অন্তরাল' বেরুতেও সেই কারণেই দেরি হয়ে যায়। খোঁজ করলে অন্তরালের একখানি পাণ্ডুলিপি ভাদুড়ী মশায়ের কাছে এখনো পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া 'উদয়ের পথে' পর্দায় মুক্তি পাবার আগেই 'অন্তরাল' সাপ্তাহিক স্বদেশে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। এছাড়া আপনি নিজেও এর প্রমাণ রয়েছেন, কেন না উদয়ের পথের মুক্তির আগেই অন্তরালের পাণ্ডুলিপি রূপমঞ্চের জন্য আপনার হাতে পড়েছিল এবং সমালোচক স্বয়ং তা সুপারিশ করেছিলেন। উপরোক্ত মন্তব্য লেখার সময় অন্ততঃ তাঁর এটা স্মরণে আসা উচিত ছিল।

আমার এই চিঠিখানি 'রূপ-মঞ্চে' স্থান দিলে বাধিত হব। ইতি—নিবেদক—

শ্রীদিগীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা

['অন্তরাল' এর সমালোচনা প্রসংগে আপনার প্রতিবাদ আমি সর্বান্তোভাবে সমর্থন করি। পূজা-সংখ্যার কাজে ব্যস্ত থাকাতে আমার অলক্ষ্যে অন্তরালের প্রতি যে অবিচার করা হ'য়েছে সেজন্য আপনার কাছে আন্তরিক দুঃখিত। 'উদয়ের পথে'র বহু পূর্বে অন্তরাল লিখিত হয়— এবং আমার তা পরিষ্কার স্মরণ আছে—তাই 'উদয়ের পথে'র ছাপ আছে বলে 'রূপ-মঞ্চে'র পুস্তক সমালোচক যে ইংগিত করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সম্পাদক : 'রূপ-মঞ্চ'।]

অনুপমার প্রেম ✶✶ দিয়ে গেল দোল

অনুপমার প্রেম :···

অনুপমার প্রেম শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' এর অন্যতম গল্প। ৩৩ পাতার গল্পের ভিতর কিশোরী অনুপমার অন্তরে প্রেম-সঞ্চার থেকে তার বিরহ—ভালবাসার ফল—বৈধব্য—সৎ-ভাই চন্দ্রনাথ বাবুর সংসারে নির্যাতন এবং তার পরিণতির কিছুটা আভাষ বিভিন্ন পরিচ্ছদে ফুটে উঠেছে। একটি বাঙ্গালী মেয়ের কৈশোর থেকে বৈধব্যের শোচনীয় করুণ ছবি অনুপমার প্রেমে দেখতে পাই। আজকে শরৎচন্দ্রকে আমাদের রক্ষণশীল বলেই মনে হয়—কিন্তু শরৎচন্দ্রের যখন আবির্ভাব এবং পূর্ণ বিকাশ—তখন সমস্ত সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর প্রগতিবাদী মন নিয়ে কঠোর ভাবেই প্রতিবাদ করেছিলেন—সমাজের দুর্নীতি ও অন্যায়ের মুখোস খুলে দিতে তিনি মোটেই পিছপাও হননি—তবু সামাজিক অনুশাসনের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে হার মানতে হ'য়েছে—। সে অনুশাসনকে লংঘন করবার সাহস অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ভিতর ছিল না। কিন্তু তাই বলে তিনি যে একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন সেবিষয়ে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। আলোচ্য গল্পটীতেও সমাজের অনুশাসনের বিরুদ্ধে একটা বাঙ্গালী বিধবার নিপীড়িত জীবনের প্রতি তাঁর দরদশীল মনের পরিচয় পাই এবং এখানে অনুপমার পিতা জগবন্ধু বাবুর ভিতর দিয়ে তিনি পুরোপুরি বিধবা বিবাহের অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই কাহিনীটীর নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের আর দু'টি কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়ে দেবনারায়ণ বাবু নাট্যরূপকার রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আলোচ্য নাটকে তাঁর সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণই আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে—'অনুপমার প্রেমে'র সার্থকতা নিয়ে। সমাজের শোচনীয়তার ছবি সমাজের কাছে তুলে ধরবার দিন আমরা বহুদিন অতিক্রম করে এসেছি—আজকে যে যুগসন্ধিক্ষণে আমরা উপস্থিত, আমাদের দুর্বলতাই শুধু ফুটিয়ে তুললে চলবে না—আজ সেই দুর্বলতাকে দূর করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন। সমাজকে কীভাবে চলতে হবে তারই সুস্পষ্ট অভিমত আমরা চাই আমাদের নাট্যকারদের কাছ থেকে। শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত—সেদিক থেকে আমাদের নিরাশ করেছেন—এবং 'অনুপমার প্রেম' তাই কোন সার্থকতা নিয়েই আমাদের কাছে দেখা দেয়নি। ৩৩ পাতার একটি কাহিনীকে পূর্ণাংগ নাটকে রূপায়িত করায় বাহাদুরী আছে—সেদিক থেকে দেবনারায়ণ বাবুকে বাহাদুরই বলবো—কিন্তু নাটকের মূল আদর্শই যে তিনি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন—তাতে তাঁকে প্রশংসা করি কী করে—তাঁর যে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি—তাতে ভবিষ্যতে তাঁর কিছু দেবার আছে কিনা—সে বিষয়ে আজ আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ জেগেছে। অনুপমার মৃত্যু দিয়ে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎকে এমনি ধূমায়িত করে তুলবেন—একজন উদীয়মান নাট্যকার সম্পর্কে এ ধারণা আমরা ইতিপূর্বে পোষণ করতে পারিনি।

"কথা শেষ হইতে না হইতে অনুপমা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

* * *

অনুপমার জ্ঞান হইলে দেখিল, সুসজ্জিত হর্ম্যে পালঙ্কের উপর সে শয়ন করিয়া আছে পার্শ্বে ললিতমোহন। অনুপমা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কাতর স্বরে বলিল, কেন আমাকে বাঁচালে?"

অনুপমার ভবিষ্যত কী শরৎচন্দ্র এই শেষের কয়টা কথার ভিতর প্রচ্ছন্ন রেখে যান নি? অভিনয় শেষে কয়েকজন নাট্যামোদী শরৎচন্দ্রের রক্ষণশীল মনোভাবের সমালোচনা করতে করতে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিলেন—কথাগুলো কানে এলো—আজ নাট্যামোদীদের কাছে শরৎচন্দ্রকে এরূপ হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য কী নাট্যরূপকার দায়ী নন?

অভিনয়ে জগবন্ধুর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর কথাই সর্বাগ্রে বলতে হয়, কিন্তু কয়েকটা দৃশ্যে তাঁর চিরা-চরিত প্যাঁচ কশবার মনোবৃত্তি আমাদের ব্যথিত করেছে—বিশেষ করে একটা দৃশ্যে—নাট্যরূপকার আরও তার সুযোগ করে দিয়েছেন—অনুপমা বৃদ্ধ রামদুলালের সংগে বিয়ের অমত জানিয়ে যখন বললো, "বাবা, আমাকে মেরে ফেল, আমি বিষ খাব।" তার উত্তরে জগবন্ধুবাবু বলেছিলেন, "যা ইচ্ছে হয় কাল খেয়ো মা, আজ বিয়ে দিয়ে আমার জাত বাচাই।" এই ছিল মূল কাহিনীতে। কিন্তু সস্তা নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার জন্য এবং দর্শকমন সস্তা নাটকীয় বদরসে ভিজিয়ে দেবার জন্য—মূর্চ্ছিত অনুপমাকে লক্ষ করে অহীন্দ্র বাবুকে বলতে দেখি, "ওরে মরা মেয়ের বিয়ে দেওয়া কী শাস্ত্রে আছে—নইলে যে আমার জাত যায়।" জাতির কুসংস্কারের এই মর্মান্তিক ছবি নাট্যরূপকার ফুটিয়ে তুলতে পারলেন আর অনুপমাকে বাঁচিয়ে তুলে এর প্রত্যোত্তর দেবার সৎ-সাহস তাঁর হ'লো না—যা শরৎচন্দ্রের ভিতর অভাব হয় নি!

অনুপমার ভূমিকায় শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী প্রথম দিকে বেশী রকম নাটকীয় হ'য়েছেন অবশ্য এজন্য শরৎচন্দ্র কম দায়ী নন!—দু'একটা দৃশ্যের পর থেকে তার স্বাভাবিক অভিনয়ের প্রশংসা করবো। অনুপমার মায়ের ভূমিকায় সুহাসিনী, বৌদির ভূমিকায় পদ্মাবতী, চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় শরৎ চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহনের ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্য—ললিতের চাকরের ভূমিকায় বিজয়কার্তিক দাস—ললিতের মা এবং রাখাল বাবুর ভূমিকা দুটীও সু-অভিনীত হ'য়েছে। সংগীতাংশের প্রশংসা করতে পারবো না। অনুপমাদের চাকর ভোলাকে নিয়ে যে মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়েছিল অনুপমার বৌদি—জলে ডুবে আত্মহত্যা করবার সময়—ভোলাকে নিয়ে সেখানে হাজির করে তার অসত্যতা প্রমাণ করবার দৃশ্যটি দেখে কেবল হাসি পেয়েছে এই মনে করে যে, আমাদের নাট্যকারেরা নাট্যামোদীদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করেন কেন যে, ওখানে ভোলাকে হাজির না করলে তারা বুঝবে না যে অনুপমা নিষ্কলঙ্ক। এটুকু বোধশক্তি বর্তমানের নাট্যামোদীর আছে—একথা নাট্যকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

—শ্রীপার্থিব

দিয়ে গেল দোল—

দক্ষিণ কলিকাতার একমাত্র নাট্যমঞ্চ 'কালিকার' 'দিয়ে গেল দোল' মধ্য সাপ্তাহিক নাটকখানি আমরা দেখে এসেছি—নাটকখানি রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বহুদিন পূর্বে রঙমহল রংগমঞ্চে তাঁর একখানি কুখ্যাত নাটকের অভিনয় দেখবার দুর্ভাগ্য আমাদের হয়েছিল। 'দিয়ে গেল দোল' কোন সার্থকতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে আমরা ঠিক তা পরিষ্কার করে বুঝতে পারলাম না। নাট্যামোদীদের আনন্দ দোলায় দোল খাইয়ে দেবারই ইচ্ছা হয়ত কর্তৃপক্ষের ছিল—কিন্তু নাটকখানি দেখে মনে হয় গ্যাঁজায় দম দিয়েই নাটকখানি লিখিত হয়েছিল—তাই গ্যাঁজায় দম দিয়ে কোন নাট্যামোদী যদি পাদপ্রদীপের সামনে যেয়ে বসেন—'দিয়ে গেল দোল' তার মনে দোল খাইয়ে দিতে পারে। সুস্থ মন নিয়ে উপভোগ করবার নাটক যে 'দিয়ে গেল দোল' নয়—স্পষ্ট কথায়—তাই আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে চাই।

মহিম সেন (ধীরাজ ভট্টাচার্য) ধনবান যুবক। সংসারে সে আর তার স্ত্রী। স্ত্রী গেছেন কাশীতে, মহিমের তদারক করবার ভার দিয়ে গেছেন—তার মাসীমার (বেলারাণী) ওপর। সেই সংগে মাসীমার দুই ছেলে নন্দদুলাল (রণজিৎ রায়) ও তার ছোট ভাই (মাষ্টার মিন্টু) জুড়ে আছেন সংসারে। নন্দদুলাল ক্লাবে মেয়েদের নিয়ে নাচ গানের মহলা দেয়—ভগ্নীপতির পয়সায় স্ফূর্তি করে। নিরালা বাড়ীতে আরব্য-উপন্যাস পড়তে পড়তে মহিমের ইচ্ছে হ'লো সেও হারুণ-অল-রসিদের মত ছদ্মবেশে বেরিয়ে মুক্ত হস্তে দান করে আসে। একদিন এমনিভাবে বেরিয়ে পড়লো—এবং মীনা বা মীনাক্ষী নাম্নী একজন নাচওয়ালীর উপকার করতে যেয়ে তার রুমালখানা ভুলে এলো ফেলে। অতি সাবধানী মাসীমা—রুমাল, কাপড়-জামায় মহিমের নাম লিখে রাখে—যাতে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটলে খবরটা তাড়াতাড়ি বাড়ীতে আসে—

রুমালে নাম দেখে রুমালখানা ফেরৎ দেবার অছিলায় মীনা মহিমের বাড়ীতে আসে এবং রগড় দেখবার ইচ্ছায় আসল হারুণ-অল-রসিদকে পেয়ে বাড়ী থেকে আর যেতে চায় না। মহিমের এক ভাগ্নী থাকতো বম্বেতে—তারও আসবার কথা—সন্দেহশীল মাসীমার কাছে—মীনাকে ভাগ্নী বলে দিল পরিচয়। এমনিভাবে—মাসীর কবল থেকে মুক্তি পেতে এক এক করে জটিলতার ভিতর জড়িয়ে পড়তে লাগলো—তার আসল ভাগ্নীও সময়মত এলো—তাকে থাকতে দিল সামনে এক নার্সিং হোমে—নকল ভাগ্নী সেজে মীনা রইল তাদের বাড়ীতে। মহিমের স্ত্রীও এসে পড়লো—সমস্যা আরও জটিলতর—মহিম মনে করলো স্ত্রীকে সত্য সত্যই সব বলবে—কিন্তু মিথ্যা দিয়ে যার আরম্ভ হ'য়েছে—তাকে কিছুতেই খোলসা করতে পারছে না মহিম। নানান শাখা প্রশাখা গজিয়ে অক্টো-পাসের মত তাকে ঘিরে ধরলো। মাসীমার ইচ্ছা ছিল মহিমের ভাগ্নীর সংগে তার নন্দদুলালের বিয়ে দেয়—কারণ তার প্রচুর অর্থ আছে। শেষকালে প্রকৃত সত্যকে আশ্রয় করে মহিম এই জটিলতার ভিতর থেকে মুক্তি পায়—মহিমের নিজের ভাগ্নীর সংগে হয় তার এক শিল্পী বন্ধুর বিয়ে—নকল ভাগ্নী অর্থাৎ মীনাকে নিয়ে—নন্দ-দুলাল—রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করতে বেরিয়ে পড়ে। আশাভংগ মহিমের মাসীশাশুড়ী—মহিমের আদেশে মহিমের বাড়ী পরিত্যাগ করে। মোটামুটি এই গেল কাহিনী। নানান শাখা প্রশাখা এর আছে।

এখানে নাট্যকার কাণে ধরে নাট্যামোদীদের একটু বলতে চেয়েছেন—"সদা সত্য কথা বলিবে সত্যছাড়া মিথ্যা বলিবে না।" নাট্যকারদের কাছ থেকে আমরা সত্যিকারের নির্দেশই আশা করি—তবে নির্দেশ দেবার মত উপযুক্ততা অর্জন করে নিতে হবে তার পূর্বে—সত্যিকারের পণ্ডিতদের কাণমলা খেতে খেদ নেই—তবে অপণ্ডিতের দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দেবো না। অবশ্য বিলেতী কৌতুক নাট্যের সাজে স্বদেশীকতাকে ঢালাই করতে গেলে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করা যায় না। প্রথম কয়েকটা দৃশ্যের পর কাহিনীর গতি চেষ্টা করে ঢেকে রাখতে গেলেও নাট্যা-মোদীদের কাছে পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে। তাই কাহিনীকে রহস্যাবৃত করে রাখবার চেষ্টা নাট্যকারের ব্যর্থতায়ই পর্যবশিত হয়েছে। রণজিৎ রায় অভিনীত নন্দদুলাল চরিত্রটী, যারা '২৬শে জানুয়ারী' দেখেছেন সহজেই মেনে নেবেন তার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়। নাট্যকারের ভাষা—কয়েকটী দৃশ্যে এতই রুচীতে বাধে—কালিকার পূর্বতন বাসীন্দাদের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

নাটকের অভিনয়ের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই। অভিনেতৃদের ভিতর যে 'Team Work'টী গড়ে উঠেছে সেজন্য কর্তৃপক্ষ প্রশংসার দাবী করতে পারেন। তবু তার মধ্যে মলিনা দেবী, ধীরাজ, বেলা রাণী, মাষ্টার মিন্টু, বন্দনা দেবী শ্রীমতী উমা ও রণজিৎ রায়ের প্রশংসাই করবো। শ্রীমতী উমাকে এতদিন বাদে বর্তমান নাটকের চরিত্রে মানিয়েছেও যেমনি ভাল, তার অভিনয়েও আমরা খুশী হ'য়েছি। শ্রীযুক্ত রণজিৎ রায়ের কথা একটু বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় একটী বিশেষ দৃশ্যে—মীনার কাছে নিজের সত্যিকারের পরিচয় দেবার পরও মীনা যখন বললো, তাঁকে সে বিয়ে করবে—তাকে সে ভালবাসে - তখন তার যা আনন্দ—মনের সেই আনন্দ তার সর্বাংগ বেগে উপচে পড়ছে—শ্রীযুক্ত রণজিৎ রায় এই আনন্দানুভূতিকে এমনি ভাবে প্রকাশ করেছেন—যে তাকে অপূর্বই বলতে হয়—অথচ এই অভিনেতাই যখন 'মা-বাবা গো' বলে বিকট চীৎকার করে ওঠেন, তখন দোষ দেবো তাকে না নাট্যকারকে ?

নাটকের সুর সংযোজনার প্রশংসা করবো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত গানের প্রথম কলি এবং ভাবের যে চৌর্যবৃত্তি দেখতে পাই দু'খানি গানে—তাতে গীতিকারকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করতে হয়—তার বিচার করবেন নাট্যামোদীরা। গীতিকারের এই হীন মনোবৃত্তির যেন ভবিষ্যতে আর না পরিচয় নাই। দৃশ্যপটে কালিকা নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে—কিন্তু একই দৃশ্যে অর্থাৎ মহিমের বাড়ীতে নৃত্য দৃশ্যটীর অবতারনা

করে পরে বলা হয়েছে club ঘর অন্তত্র—এর তাৎপর্য বুঝতে পারলুম না। নৃত্য পরিকল্পনা যিনি করেছেন—বা যাদের দিয়ে নাচিয়েছেন—এদের সবাইকে একই দলভুক্ত করা যেতে পারে।

'দিয়ে গেল দোলে'র পূর্বে 'বৈকুণ্ঠের উইল' বা '২৬শে জানুয়ারীর' অভিনয় করে কালিকা একটা আভিজাত্যের ছাপ মাখতে গিয়েছিল—আমরা তাতে আপত্তিও করতাম না—কিন্তু 'দিয়ে গেল দোল'—দেখে নীলবর্ণ শৃগালের পুরাতন কাহিনীটাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

নাটকখানি দেখতে দেখতে কালিকার উদ্বোধন দিনের ছবি স্বতই মনে ভেসে উঠছিল। দেশ এবং জাতির সেবার বড় বড় বুলি আওড়িয়ে সেদিন শ্রীযুক্ত রাম চৌধুরী মশায় আমাদের তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দেশের সেবায় (!) শ্রীযুক্ত চৌধুরীর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের কাহিনী আমরা সেদিন ভুলবার চেষ্টা করে, এরূপ একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে নাট্য জগতে পেয়ে একটু যে আশান্বিত হ'য়ে না উঠছিলাম তা নয়—কিন্তু আমাদের সে আশা যে দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'তে চলেছে। নাট্য-মঞ্চের মারফৎ দেশ এবং জাতিকে সেবা করবার যে সম্ভাব্য রয়েছে শ্রীযুক্ত চৌধুরী যদি সত্যই সে সম্ভাব্যের প্রতি আস্থাবান হ'য়ে উঠে থাকেন – বাংলার নাট্যামোদীরা চিরদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবে—রাশিয়ার মায়ার-হোল্ড, স্টেনিশ্লাভস্কি, যে শ্রদ্ধা পেয়েছেন জনসাধারণের কাছ থেকে—লেনিন-স্ট্যালিনের শ্রদ্ধার কাছে তা মোটেই ম্রিয়মান হয়নি—আর সতিই যদি থিয়েটার চালাতে হয়—দেশ এবং জাতির সত্যিকারের দরদী হয়ে তাঁকে নামতে হবে—মুখে এক ভিতরে অন্য—এই দ্বিরূপী হলে চলবে না। আমরা চাই শ্রীযুক্ত চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চ আমাদের নূতন বাণীতে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক– যে পাদপীঠের আলোকমালার সামনে দাঁড়িয়ে তার উদ্বোধন উৎসবে যে উদ্বোধনী শুনিয়েছিলেন, তার সার্থকতার পরিচয় দিতে যেন তিনি পিছু না হটেন।

—শ্রীপার্থিব

চিত্র-সমালোচনা ও নানাকথা

শ্রীদুর্গা

শৈলজানন্দ পরিচালিত মতিমহল থিয়েটার্সের শ্রীদুর্গা ইষ্টার্ণ টকীজের পরিবেশনায় রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। চিত্রখানি আমরা দেখে এসেছি। রামায়ণের চিরপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে শৈলজানন্দের বর্তমান চিত্রখানি গড়ে উঠেছে। অম্বিকার স্নেহে পুষ্ট শক্তিশালী লঙ্কাধিপতি রাবণকে যখন কিছুতেই শ্রীরামচন্দ্র বধ করতে পাচ্ছিলেন না—নিজের এই অকৃতকার্যতায় সীতা উদ্ধারের আশা তাঁর মনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে উঠছিল। অবসাদাচ্ছন্ন শ্রীরামচন্দ্রকে তখন দেবতারা দশপ্রহারিণী দশভুজার আরাধনা করে রাবণ বধের প্রকৃষ্ট উপায় দেবীর কাছ থেকে জেনে নেবার পরামর্শ দেন। দেবীপূজার উপযুক্ত সময় না হলেও অকালে বোধন করে শ্রীরামচন্দ্র দেবীপূজা আরম্ভ করেন—নানান বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়ে পূজায় দেবীকে সন্তুষ্ট করে রাবণকে বধ করবার উপায় দেবীর কাছ থেকে জেনে নেন। এবং সীতাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন। বাংলাদেশে শ্রীরামচন্দ্র অনুষ্ঠিত অকালে বোধন করে শরৎকালীন দেবীর এই পূজাই বেশী প্রচলিত। আলোচ্য চিত্রে এই দেবী মাহাত্ম্যই প্রচার করা হ'য়েছে।

'শ্রীদুর্গার' প্রারম্ভ পরিকল্পনাটীর জন্ম আমরা প্রশংসা করবো শৈলজানন্দকে। কোন বাঙ্গালীর ঘরে দেবী পূজার আয়োজন হ'য়েছে—পুরোহিত চণ্ডীপাঠে রত—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীর স্তবগান শোনাতে শোনাতে পরিচালক আমাদের লঙ্কায় নিয়ে হাজির করেন। বিভীষণ রাবণকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবার জন্ম পরামর্শ দিচ্ছে—সীতাকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করছে—রাবণ তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করলো এই দৃশ্য থেকে—রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার অবধি কাহিনী বর্তমান চিত্রে স্থান পেয়েছে। শ্রীদুর্গা পৌরাণিক চিত্র—পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে পর্দায় রূপায়িত করবার সময় যে সব জাঁমজমকময় দৃশ্যাবলীর প্রয়োজন—আলোচ্য চিত্রে তার কিছুই ফুটে ওঠেনি। যদি পরিচালক রামায়ণের ঐতিহাসিক ভিত্তিকে অস্বীকার করতে চান—(এবং চেয়েছেন বলেই আমাদের মনে হয়—নইলে তার চরিত্র গুলিকে বিংশ শতাব্দীর হুবহু ছাপ নিয়ে দেখা দেবে কেন?) তাহ'লেও যে যুগে রামায়ণ রচিত হ'য়েছে তখনকার সমাজের রূপই ত ফুটিয়ে তুলতে হবে? তাই যদি পরিচালক না পারেন তবে তাঁর এ চিত্রখানিকে ব্যর্থ ছাড়া কী বলবো? হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করে রামায়ণ রচিত হ'য়েছে, এর এক একটী চরিত্র আমাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—এরা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ যে দৃষ্টি ভংগী নিয়ে এদের বিচার করতে গেছেন তাতে আমাদেরই মত সাধারণ মানুষের পর্যায় তাঁদের টেনে আনা হ'য়েছে, শৈলজানন্দের এই দৃষ্টিভংগীকে হয়ত প্রশংসাই করতাম—যদি কোথাও তার বৈপরীত্য ভাব পরিলক্ষিত না হ'তো। পুরাণের প্রভাব হ'তেও যেমনি তিনি মুক্ত হতে পারেন নি—আবার নূতনকেও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। দুটো বিপরীত দৃষ্টির চাপে একটা জগাখিচুড়ী তৈরী করেছেন। তবু সীতা উদ্ধারে রামের মুখ দিয়ে তিনি যে উক্তি করিয়েছেন—'রাবণের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করছি এইজন্য—যাতে কোন দিন, কোন লোভী রাজা ধরিত্রীর সম্পদ সীতাকে নিজের ব্যক্তিগত সুখ ভোগের জন্ম হরণ করতে না পারে।' তারপর রাক্ষস কুমার ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতিদের স্বদেশের জন্ম যুদ্ধের যুক্তিকেও আমরা প্রশংসা করবো। তবে, কালিদাসের মানস তনয়া শকুন্তলাকে পর্দায় রূপ দিতে যেয়ে ভী, শান্তারাম যে দৃষ্টি ভংগীর পরিচয় দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ তা দিতে যেয়ে—ব্যর্থই হয়েছেন। আলোচ্য চিত্রখানি সম্পর্কে এই কথাই শুধু বলা চলে—চিত্রখানি দেখতে যেয়ে যদি আমরা মনে করি, স্থানীয় কোন রঙ্গমঞ্চে আমরা একটী নাটকের অভিনয় দেখছি—তখন হয়ত আমাদের মঞ্চগুলির দৃশ্য রচনা ও রূপসজ্জার কথা চিন্তা করে—এর সাফল্যকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবো না। অভিনয়ের দিক দিয়েও তাই। এর চেয়ে শ্রীদুর্গার সার্থকতা সম্পর্কে আর কিছু বলার নেই।

রামায়ণের যে বিকৃতরূপ দেখতে পেয়েছি শ্রীদুর্গায় তা উল্লেখ না করলে আমাদের সমালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জানিনা শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মূল বাল্মীকি লিখিত রামায়ণকে অনুসরণ করেছেন না কৃত্তিবাসকে। তবে দুটো থেকেই তিনি তাঁর খুশীমত ঘটনা স্থাপন করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রামায়ণে বর্ণিত আছে বিভীষণ যখন ইন্দ্রজিতের মরণোপায় বল্লেন :

"নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে দুষ্ট নিশাচর।
করিয়াছে যজ্ঞ-কুণ্ড লঙ্কার ভিতর॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যদি যায় রণে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালেতে কার সাধ্য জিনে॥"

তখন :—

"অষ্ট বানর সঙ্গে দেহ বলে বিভীষণ।
গয় আর গবাক্ষ আদি গন্ধমাদন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর সম্পাতি।
নল নীল চলিল প্রধান সেনাপতি॥
গড়-মধ্যে পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনে।
বিভীষণ-হাতে সমর্পিলেন লক্ষ্মণে॥"

আলোচ্য চিত্রে শুধু বিভীষণ আর হনুমানকে লক্ষ্মণের সংগে দেখতে পাই। লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ দৃশ্যে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতের অংগে অস্ত্র নিক্ষেপ করা দেখিয়ে লক্ষ্মণের চরিত্রকে শৈলজানন্দ কলুষিতই করেছেন। কারণ নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতের অংগে লক্ষ্মণ অস্ত্রাঘাত করেননি—তবে যজ্ঞশালার বাইরের পথ রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এবং আলোচ্য চিত্রে দেখানো হয়েছে ইন্দ্রজিৎকে হনুমান ধরলো আর লক্ষ্মণ তীর ছুড়লেন—কিন্তু রামায়ণে আছে—দুজনের অস্ত্র নিয়েই যুদ্ধ হয়েছিল এবং ভীষণ যুদ্ধ।

"দু-জনে দেখিয়া বাণ যোড়ে দুইজনে।
দু-জন পড়িল ঢাকা দু-জনার বাণে॥"

রাবণের মৃত্যু রামায়ণে যা বর্ণিত আছে—আলোচ্য চিত্রে তারও বিকৃত রূপ দেখতে পাই। রামায়ণে আছে যে দেবী দশভুজা শ্রীরামচন্দ্রের অকাল-বোধন পূজায় সন্তুষ্ট হ'য়ে বললেন,

"রাবণে ছাড়িনু আমি বিনাশ করহ তুমি
এত বলি কৈলা অন্তর্দ্ধান।"

তারপর রাবণের মৃত্যুবাণ—বিভীষণের পরামর্শানুযায়ী সংগ্রহ করতে হ'য়েছিল শ্রীরামচন্দ্রকে।

"সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোধরী রাণী।
কোথায় রেখেছে অস্ত্র কিছুই না জানি॥"

তখন হনুমান ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মন্দোধরীর কাছ থেকে সেই বাণ হরণ করে শ্রীরামচন্দ্রকে দেয়।

"বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়া মারুতি।
ভাঙ্গিল স্ফটিক-স্তম্ভ মারি এক লাথি॥
ভাঙ্গিতে স্ফটিক-স্তম্ভ দৃষ্ট হল বাণ।
বাণ লয়ে লাফ দিল বীর হনুমান॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি গিয়া বসিল প্রাচীরে।
আর এক লাফে গেল রামের গোচরে॥"

চিত্রে দেখানো হ'য়েছে—রাবণের মৃত্যুবাণ দেবী নিজে হাতে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করলেন।

এরূপ নানান বিকৃতরূপ ফুটে উঠেছে আলোচ্য চিত্রে।

রাণী মন্দোধরী ও লঙ্কার পুরনারীরা সীতাকেই অভিসম্পাত করেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রকে এরূপ অভিসম্পাৎ করতে মন্দোধরীকে দেখতে পাইনা রামায়ণে—যেমন আলোচ্য চিত্রে ফুটে উঠেছে। এই দৃশ্যটি স্বর্গত যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের সীতা নাটকের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বালির মৃত্যুতে তুঙ্গাভদ্রার অভিশাপ দৃশ্যটীর কথাই মনে করিয়ে দেয়।

হনুমানের রূপ-সজ্জা—যদি বানরাকারে করতে আপত্তি থাকে—তবু তাকে বন্য-নর হিসাবে গ্রহণ করবার বিরুদ্ধে ত কোন যুক্তি দেখতে পাই না। হনুমানের ভূমিকায় স্বর্গত রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপ-সজ্জায় অন্ততঃ বন্য ভাব আনা উচিত ছিল।

রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের চরিত্রচিত্রণে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় প্রশংসার দাবী করতে পারেন—। অভিনয়ে শ্রীরামচন্দ্রের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের প্রশংসা করবো সর্বাগ্রে। তারপর প্রশংসনীয় অভিনয়—সরমার ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়া দেবীর। অহীন্দ্র চৌধুরীর বিভীষণও আমা-

দের ভাল লেগেছে। সবচেয়ে নিন্দনীয় অভিনয় যদি কেউ করে থাকেন সীতার ভূমিকায় শ্রীমতী রেণুকা। শ্রীমতী রেণুকার অভিনয় শুধু নিন্দনীয়ই হয়নি, সীতার চরিত্রের অমর্যাদা করেছেন তিনি। সামাজিক চিত্রে চোখ মারা অভিনয় করতে করতে শ্রীমতী রেণুকা সীতার ভূমিকায় অভিনয়ের সময়ও সে বদভ্যাস ছাড়তে পারেন নি —প্রবাদ আছে "কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।" শ্রীমতী রেণুকার অভিনয় দেখে এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করেছি। সীতার ভূমিকায় তার নির্বাচনে শৈলজানন্দ যে নেহাৎ ছেলেমানুষীর পরিচয় দিয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীদুর্গার সংলাপের প্রশংসা করবো। সংগীতাংশও মন্দ নয়—তবে সংগীত এবং নৃত্যের যে সুর এবং যে পরিকল্পনার পরিচয় পেয়েছি—তার বিরুদ্ধে আমাদের একটু বলবার আছে—লঙ্কার রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত নৃত্যের পরিকল্পনা সিংহলী বা যবদ্বীপের ছাঁচে হওয়াই উচিত ছিল। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ একরূপ। — শ্রীপার্থিব

কলঙ্কিনী—

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও প্রযোজিত কলঙ্কিনী চিত্রখানি ইউনিটি ফিল্ম এক্সচেঞ্জ-এর পরিবেশনায় মিনার, ছবিঘর ও বিজলী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন প্রবীণ পরিচালক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পর্ধাকে ধন্যবাদ—যিনি আজ পর্যন্ত বহুচিত্রের পরিচালনা করে দর্শকদের খুশী করবার মত একখানা উল্লেখযোগ্য চিত্রও তৈরী করতে পারলেন না—(সে যুগের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' প্রশংসা পেয়েছিল কাহিনীর জন্য, পরিচালনার জন্য নয়) তিনি পরিচালনা ক্ষেত্রটা এত দিন কর্ষণ করে খুশী থাকতে পারলেন না—সাহিত্য ক্ষেত্রটাও কর্ষণ করে দেখবার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন। এটা থেকে সেটা—সেটা থেকে ওটা জোড়া দিয়ে তিনি যে কাহিনী দাঁড় করালেন—তার পরিচালনা-নৈপুণ্যের (!) মতই তা আমাদের কাছে কলঙ্ক হ'য়ে রইল। তাই কলঙ্কিনীকে 'কলঙ্ক' নাম দিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করি, কলঙ্ক কার? তার উত্তর যদি পাই, পরিচালক ও কাহিনীকারের—তাহলে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মনে মনে বেয়াদপ বলে আমাকে গালিগালাজ করলেও—আমার অপ্রিয় সত্যকে উড়িয়ে দেবার মত কোন যুক্তি দাঁড় করাতে পারবেন না।

কলঙ্কিনীর কাহিনীতে পাই নায়ক বিনয় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এম, এ হলেও বেকার। ঘরে বসে সে রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্বন্ধে গবেষণা করে—স্ত্রী বীণা মেয়ে স্কুলের হেড-মিস্‌ট্রেস্ তাছাড়া টিউশনীও করে। বিনয়ের এই স্ত্রী লাভকে flash-back করে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাহিনী দাঁড় করিয়েছেন—তাতেও তার উর্বর মস্তিষ্কের প্রশংসা (!) না করে পারবো না। পোড়া বাংলা দেশ—আমরা খাঁটী দুধও খাই —আবার দুধের নাম দিয়ে অ-খাঁটী জল মিশ্রিত দুধ খেয়েও প্রতিবাদ করি না—জাতির মনের এই উদারতাটুকু শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় জানতে পেরেছেন, আর কিছু অর্জন করতে যত অক্ষমতাই থাকুক না কেন।

নায়িকা বীণার স্কুলের সেক্রেটারী মিঃ সেন "প্রিয়দর্শনা সুগঠিত-দেহা ও আলোক প্রাপ্তা বীণাকে দেখে অবধি নিজের সরল প্রকৃতি পল্লীবাসিনী স্ত্রীতে আর মন ওঠে না।" কিন্তু আশ্চর্য এই যে, একথা আর কেউ জানতে না পারলেও বিনয়ের কুকুর এটা টের পেয়েছিল।

মানুষের মনস্তত্ব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলেও কুকুর চরিত্র সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে খুশী হ'য়েছি।

"যাই হোক বিনয়ের মনে সন্দেহ হ'তে থাকে, মিষ্টার সেনের-সংগে বীণার মেলা মেশাটা হয়তো সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়।" ..."বিনয় নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে নীরবেই থাকে, আর তার রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ব আলোচনা করে।" "...কিন্তু নীরব থাকা বিনয়ের পক্ষে সত্যই অসম্ভব হলো তখন যখন সে শুনলো স্কুলে মেয়েদের থিয়েটারে বীণা প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবে।......বিনয় তার স্ত্রীর প্রকৃতি ও সত্যকার পরিচয় না পেয়েই কুল-বণিতাকে বারবণিতার মত কলঙ্কিনী ভেবে স্ত্রীর প্রতি করল অবিচার—বাড়ী ছেড়ে হলো নিরুদ্দেশ"। একদম বয়ে যেয়ে

হাজির। "চাকরীর চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে পড়ল গাড়ী চাপা—গাড়ীতে ছিল বম্বের বিখ্যাত ধনী মিঃ সরকারের মেয়ে ও ভাবী জামাই।" থাকতেই হবে! বিনয় এলো মিঃ সরকারের বাড়ী। সুস্থ হ'য়ে উঠলে মিঃ সরকারের বাড়ীর চাকর হ'য়ে রয়ে গেল বিনয়! সরকারের কন্যা মণিকা আকৃষ্ট হ'লো তার প্রতি। আত্মগোপন করে বিনয় সেখানে কোন একটা পত্রিকায় কলঙ্কিনী নামে একটা গল্প লেখে—বম্বের কোন সিনেমা প্রতিষ্ঠান তা ক্রয় করে—বীণার পরিচিত মিঃ চৌধুরীর প্রাইভেট ডিটেকটিভ হুতাশ হালদার বম্বে যেয়ে হাজির হয়। বিনয়ের ছদ্মবেশ খশে পড়ে—বীণাও যেয়ে সেখানে হাজির হয়—মণিকার সংগে তার প্রণয়ী ডাঃ দত্তের সংগে এবং বীণা বিনয় ও আরো সকলের মিলনের মধ্য দিয়ে হ'লো চিত্রের পরিণতি।

কয়েকদিন পূর্বে বেতার মারফত শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—'কলঙ্কিনী'র সমালোচনা করতে যেয়ে আর কিছু না পেয়ে কেবল বল্লেন, "এই গল্পের নায়ক জনপ্রিয় অভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায়—বন্ধুভাবে তাঁকে শুধু বলছি—এরূপভাবে যেন পরিচালকদের হাতে তিনি নিজেকে বিকিয়ে না দেন।" সমালোচনাটা শুনে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি তখন খুশী হ'তে পারিনি এই মনে করে—যে, এই নাকি চিত্র সমালোচনা? চিত্রখানি দেখে আসবার পর সে ভুল ভেঙেছে এবং শ্রীযুক্ত জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর আবেদনের মাঝে যে চিত্র সমালোচনার সবচেয়ে বড় কথা প্রচ্ছন্ন ছিল তাও বুঝতে পেরেছি।

বর্তমান সংখ্যা রূপ-মঞ্চে অন্যত্র প্রকাশিত কলঙ্কিনীর বিজ্ঞাপনে প্রচারসচিব লিখেছেন, "সাধারণ বাংলা ছবির বিরুদ্ধে আপনার অনেক অভিযোগ, তার মধ্যে প্রধান হ'লো কাহিনীর গতানুগতিকতা। আপনার সেই অনেক দিনের অনেক অভিযোগ দূর করবে আমাদের এই ছবি।" কথাগুলি—রূপ-মঞ্চ পাঠক পাঠিকা তথা বাঙালী দর্শক সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলা—কথাগুলি যদি কলঙ্কিনী সম্পর্কে সত্য হয়—অন্ততঃ প্রচার সচিব মনে করেন—বাঙালী চিত্রামোদীরা বাংলা ছবির বিরুদ্ধে আর দ্বিতীয় বার অভিযোগ করবেন না—অভিযোগ করবার মত দুর্বলতা নেই বলে নয়—বাংলা ছবির বর্তমান ভাগ্য নিয়ন্তাদের সে দুর্বলতা বিচার করবার বোধশক্তি নেই বলে—সে দুর্বলতা দূর করবার মত সবলতা তাদের মাঝে নেই বলে।

কলঙ্কিনীর সুর-সংযোজনার প্রশংসা করবো। অভিনয়াংশের প্রশংসা করবারও নেই, নিন্দা করবারও নেই। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতে কেবল আবেদন জানাবার আছে অভিনেতৃদের কাছে—অর্থের লোভে এসব শ্রেণীর চিত্রে অভিনয় করে তাঁরা যেন বাংলা ছায়াজগতের বর্তমানের অন্ধকারকে ভবিষ্যতে আরও জমাট বাধিয়ে না তোলেন। আর অনুরোধ জানাবো পরিচালক শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে, প্রবীণ বলে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রয়েছে—সে শ্রদ্ধা একদম নষ্ট হবার পূর্বে তিনি যেন স-সম্মানে অবসর গ্রহণ করেন—এবং তাঁর বিদায়-স্তুতি গাইবার সুযোগ দেন আমাদের।

—শ্রীপার্থিব

এম, পি, প্রডাকসন্স

সন্ধ্যি-খ্যাত পরিচালক শ্রীযুক্ত অপূর্ব মিত্রের পরিচালনায় এদের আগামী দোভাষী চিত্রের কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আরম্ভ হবে। এম, পি, প্রডাকসন্সের এই চিত্রখানি খ্যাতনামা গীতিকার শ্রীযুক্ত শৈলেন রায়ের একটী কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। চিত্রখানির নাম হ'য়েছে "তুমি আর আমি"। বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী 'তুমি আর আমি'র নায়িকারূপে দর্শক সাধারণকে অভিবাদন জানাবেন।

শ্রীযুক্ত সুকুমার দাসগুপ্তের পরিচালনায় এম, পি, প্রডাকসন্সের বাংলা চিত্র "সাত নম্বর বাড়ী" প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। চিত্রখানিকে নানাদিক দিয়ে সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্য যেমনি পরিচালক কোন প্রকার ত্রুটি করেন নি—তেমনি প্রযোজকদের তরফ থেকে কোন প্রকার গাফিলতির পরিচয় পাওয়া যায়নি। এই চিত্রের প্রধান আকর্ষণ সংগীত। নবীন সুরকার শ্রীযুত রবীন চট্টোপাধ্যায়

দর্শকসাধারনের অভিনন্দন লাভে বিভিন্ন রাগ রাগিনীর ভিতর নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করে তুলতে চেয়েছেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের ইতিপূর্বে জনপ্রিয় সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞ কুমার শচীন দেব বর্মণের শিষ্যত্ব লাভের সৌভাগ্য হয়েছে—তাছাড়া পৃথক ভাবে চিত্রের সুর সংযোজনা করেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছেন। সাতনম্বর বাড়ীর আর একটী বৈশিষ্ট্য—ছুটী চরিত্রে বাংলার জনপ্রিয় নট জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও খ্যাতনামা অভিনেত্রী মলিনা দেবী যে বিশিষ্ট রূপ সজ্জায় দেখা দেবেন ইতিপূর্বে দর্শক সাধারণের সে রূপের সংগে পরিচয় হয়নি। আগামী সংখ্যায় সাতনম্বর বাড়ীর উদ্বোধনী সংবাদ দিতে পারবো।

চিত্রভারতী

চিত্রভারতীর বর্তমান বাংলা চিত্রের কাজ কালী-ফিল্মস ষ্টুডিওতে এগিয়ে চলেছে। প্রকাশ, চিত্রখানি চিত্রভারতীর প্রযোজক শ্রীযুক্তা প্রতিভা শাসমল ও শ্রীযুক্ত সৌম্যেন সান্যালের যুগ্ম পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। শ্রীযুক্ত সান্যাল ইতিপূর্বে শ্রীযুত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী রূপে অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন।

রূপশ্রী লিঃ

রূপশ্রী লিঃ এর রঙ্গভরা ব্যঙ্গচিত্র মৌচাকে ঢিল এর কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, যিনি আমাদের কাছে চন্দ্রশেখর নামে সুপরিচিত। মৌচাকে ঢিলএর কাহিনী লিখেছেন অধ্যাপক প্রমথ নাথবিশী। সাধারণ বাংলা ছবির গতানুগতিক মোড় ফেরাতে মৌচাকে ঢিল অনেকাংশে সাহায্য করবে বলেই প্রকাশ। এইচিত্রে কয়েকটী নূতন মুখের সংগেও আমাদের পরিচয় হবে। চিত্রখানি মুক্তি প্রতীক্ষায়।

এসোসিয়েটেড পিকচার্স লিঃ

শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত এদের হিন্দি চিত্র আমিরীর চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। আমিরীর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন—প্রমথেশ বড়ুয়া, অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্যামলাহা, রঞ্জিত রায়, ফণীরায়, মাষ্টার কেশব, শৈলেন চৌধুরী, মায়া ব্যানার্জি, মলিনা দেবী, রমলা, যমুনা, রাজলক্ষী প্রভৃতি। সুর সংযোজনা করে-ছেন শ্রীযুক্ত দক্ষিনা মোহন ঠাকুর। কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল, চিত্রখানি মুক্তি প্রতীক্ষায়।

এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিটার্স লিঃ

পরিচালক নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত কে, বি, পিকচার্স-এর ভাবীকাল এদের পরিবেশনায় মুক্তি প্রতীক্ষায়।

প্রগতি সংঘ

১৬৪নং আপার চিৎপুর রোডস্থ স্বর্গতঃ ননীদাস মহাশয়ের বাড়ীতে প্রগতি সংঘের উদ্যোগে "বর্তমান চল-চ্চিত্র নাট্যের গতি ও তার ভবিষ্যত" নিয়ে এক আলোচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন, দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, কমলাদাশ, সুধী দেবী, ভাংটেশ্বর মুখার্জি, হীরেন বসু, বিমল ঘোষ, প্রাণতোষ

ঘটক, অধ্যাপক মণি বন্দ্যো, মণিকা সেন, বনমালা প্রভৃতি সভার উপস্থিত ছিলেন। নাট্য ও চলচ্চিত্র বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার সহকর্মীরা উক্ত অধিবেশনের সাফল্যর জন্য ধন্যবাদের যোগ্য।

মোহন আর্ট ষ্টুডিও

বর্তমান সংখ্যা রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত স্বর্গত অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন প্রতিকৃতি সরবরাহ করে মোহন আর্ট ষ্টুডিও আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত হীরালাল চক্রবর্তী (লালবাবু) খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুত কুঞ্জলাল চক্রবর্তীর পুত্র। চিত্রশিল্পীদের কোন প্রতিকৃতির প্রয়োজন হ'লে দর্শক সাধারণ ১নং সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটস্থিত উক্ত ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করতে পারেন।

ডি, রতন

গত পুজা সংখ্যায় রূপমঞ্চে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের যে কমপোজিট প্রতিকৃতি প্রকাশিত হয়েছে—পৃথক পৃথক ভাবে তার প্রত্যেকখানি ছবি পাঠক সাধারণ সুপ্রসিদ্ধ চিত্র প্রতিষ্ঠান ডি, রতন এণ্ড কোং থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। আমাদের কাছে ঐ ফটো কোথায় পাওয়া যেতে পারে জিজ্ঞাসা করে পাঠক সমাজের কাছ থেকে বহু চিঠি এসেছে—পৃথকভাবে—সকলের পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত ডি, রতনের ফটোর দোকানে রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করে চিঠি লিখলে সুবিধা দরে ঐ ফটো পাওয়া যেতে পারে। উক্ত ফটোর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সাহায্য ভাণ্ডারে প্রদান করবেন বলে ডি, রতন এণ্ড কোংর স্বত্বাধিকারীরা আমাদের কাছে এক সংবাদ পাঠিয়েছেন। তাঁদের এই বদান্যতার প্রশংসা করি।

পরলোকে কয়েকজন শিল্পী

বম্বের খ্যাতনামা চলচ্চিত্রাভিনেতা পিঠাওয়ালা—বাংলার তরুণ চিত্র ও নাট্যাভিনেতা অমল বন্দ্যোপাধ্যায়—ও খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি।

কিসমৎ এর বিশ্ববিজয় উৎসব

কাপুরচাঁদ লিমিটেড পরিবেশিত কিসমৎ হিন্দি চিত্রের বিশ্ববিজয় উৎসবের বিজ্ঞাপনী অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই ছবির কৃতকার্যতার মূলে প্রতিষ্ঠানের যে সব কর্মীদের তীক্ষ দৃষ্টি ও ব্যবসায়ী বুদ্ধি রয়েছে উক্ত বিজ্ঞাপনীতে তাদের প্রশস্তি প্রকাশিত হয়েছে। এদের কর্মদক্ষতার আমরাও প্রশংসা করি—কিন্তু এই প্রসংগে কাপুরচাঁদ লিমিটেডের আরও তিন জন অক্লান্ত নীরব কর্মীর নাম উল্লেখ করা উচিত ছিল – চিত্রের প্রচার এবং দীর্ঘদিন প্রদর্শনার মূলে যাঁদের প্রচেষ্টাকে কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করতে পারেন না। তাঁরা হচ্ছেন কাপুরচাঁদের কলিকাতাস্থিত দুটী প্রধান প্রেক্ষাগৃহ রক্সী এবং প্যারাডাইস সিনেমার ম্যানেজার শ্রীযুত এস্ এম বাগড়ে ও শ্রীযুত বিজয় প্রসাদ এবং প্রচার সচিব খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীযুত পঙ্কজ দত্ত।

ইউ, সি, এ, ফিল্মস

চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে প্রগতি পরায়ণ শিক্ষিত ও সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে একটা ইউনিট গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে প্রায় বছর দুয়েক আগে ইউ, সি, এ, ফিল্মস নামে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে, ফিল্ম নিয়ন্ত্রনাদেশ জারী হওয়ার ফলে তাদের সেই কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে হয়। আগামী ১৫ই ডিরেম্বর এই সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হবে বলে যে ঘোষনা করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী এঁরা আবার তাঁদের পূর্ব সাধনায় ব্রতী হওয়ার সংকল্প করেছেন। জানা গেল, এঁদের যে নতুন ছবি হবে তাতে কেবল শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও সুরুচিসম্পন্ন নতুন শিল্পীরাই স্থান পাবেন, পুরাণো অথবা বাজারের নাম-ডাকওয়ালা শিল্পীদের নিয়ে কাজ করবার ইচ্ছা এঁদের নেই। আমাদের দেশে এই রকম পরিকল্পনা অভিনব তাতে সন্দেহ নেই। তবে শেষ অবধি এঁদের এই উদার মনোভাব অনুদারে পর্যবশিত না হয়।

চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠান

নব নির্মিত চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্ম সচিব শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চৌধুরী আমাদের এক সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, তাঁদের আগামী বাংলা চিত্র 'বন্দেমাতরম' এর কাজে শীঘ্রই রাধাফিল্ম ষ্টুডিওতে আরম্ভ হবে। চিত্রখানি

পরিচালনা করবেন—শ্রীযুক্ত সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে জনপ্রিয় পরিচালক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সহকারীরূপে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন—এবং এঁর তিন রীলের গোঁজামিল কৌতুক চিত্রখানি দর্শকদের অভিনন্দন লাভে সমর্থ হ'য়েছিল। সাহিত্যিক হিসাবেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কাছে অপরিচিত নন—এঁর কয়েকখানি উপন্যাস বাঙ্গালী পাঠক সমাজের সমাদরও লাভ করেছে। 'বন্দেমাতরম'এর কাহিনী এঁরই লেখা। প্রধান পুরুষচরিত্রে বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস 'বন্দেমাতরম'এ বাঙ্গালী দর্শক সমাজকে অভিবাদন জানাবেন।

চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রযোজক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চৌধুরীর নাম এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। মৈমনসিংহ জেলার আমবেরিয়া গড়ের (অধুনা হেমনগর) সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গত দানবীর হেম চৌধুরী মহাশয়ের ইনি তৃতীয় পুত্র। শ্রীযুক্ত চৌধুরী নিজে শিক্ষিত এবং উদারনৈতিক। চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে এরূপ প্রযোজকদের আগমন যে শুভ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নয়। রূপ-মঞ্চের পাঠক পাঠিকারা শুনে হয়ত আরো খুশী হবেন যে, শ্রীযুক্ত চৌধুরী রূপ-মঞ্চের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত। চলচ্চিত্র ক্ষেত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণের মূলে রূপ-মঞ্চের সম্পর্ককে ভুলতে পারি না। আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় পাঠকের এই নব যাত্রায় আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সাধনা বোস প্রডাকসন্স

খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু প্রযোজিত অজন্তার মহরৎ উৎসব কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে চিত্র জগতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমাগম হ'য়েছিল। শ্রীযুক্তা বসু ও প্রিয় দর্শন নট সাহু মোদককে নিয়ে সেদিন একটা দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। চিত্রখানির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন 'শিরি ফরহাদ' খ্যাত পরিচালক ও চিত্রশিল্পী শ্রীযুত প্রহ্লাদ দত্ত। ওদিন উৎসবান্তে কর্তৃপক্ষ উপস্থিত অতিথিদের জলযোগে আপ্যায়িত করেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত সাহু মোদক, পরিচালক প্রহ্লাদ দত্ত ও প্রডাকসন্স ম্যানেজার খ্যাতনামা সাংবাদিক সুধীরেন্দ্র সান্যাল বক্তৃতা করেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রাধা ফিল্ম স্টুডিও

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওর সমস্ত স্বত্ব চিত্ররূপা লিমিটেডের শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ক্রয় করেছেন। প্রযোজনা ক্ষেত্রে ঘোষাল ভ্রাতৃত্রয় ইতিপূর্বে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর পরিচালনাধীনে আর একটী ষ্টুডিও দেখতে পেয়ে চিত্র ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সাফল্যে যে আমরা গৌরব অনুভব করছি সেকথা উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওর উদ্বোধন উৎসবে আমরা উপস্থিত ছিলাম। ঘোষাল ভ্রাতৃত্রয়ের সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। চলচ্চিত্রশিল্পে তাঁদের দিন দিন উন্নতিই আমাদের কাম্য।

রূপায়ণ

দক্ষিণ কলিকাতায় চেতলা সেন্ট্রাল রোডে নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহ রূপায়ণের উদ্বোধন উৎসব শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকারের পৌরহিত্যে সুসম্পন্ন হয়েছে। 'প্রভাস মিলন' পৌরাণিক চিত্রখানি দিয়ে রূপায়ণের পর্দা উত্তোলন করা হয়। ও অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রথম শ্রেণীর চিত্র প্রদর্শন করে রূপায়ণ শ্রীবৃদ্ধি ও দর্শক সাধারণের শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হউক তাই আমরা কামনা করি।

ইউনিটি প্রডাকসন্স

ইউনিটি প্রডাকসন্সের রাজমাতা চিত্রের নাম তপস্যায় পরিবর্তিত হয়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত রামেশ্বর শর্মা। এর প্রধানাংশে অভিনয় করছেন বম্বের খ্যাতনামা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী কৌশল্যা। চিত্রখানি ভারতলক্ষী ষ্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে—এর দৃশ্য রচনার ভার গ্রহণ করছেন খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত চারু রায়। চিত্র গ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীযুক্ত জি, কে, মেঠা সুরসংযোজনা করছেন নেপাল রাজের ভূতপূর্ব সংগীতজ্ঞ শ্রীযুক্তগণপৎরাও। পরিচালক রামেশ্বর শর্মা 'তপস্যা'কে নিখুঁত রূপদেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন—

শ্রীযুক্ত শর্মার প্রতিভা এবং উদ্দীপনা শেফুলয়েডের ফিল্মের যথার্থ রূপ লাভ করুক তাই আমাদের কামনা।

চিত্রবাণী লিঃ

চিত্রবাণী লিমিটেডের বর্তমান বাংলার চিত্র 'এই তো জীবনের' কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এগিয়ে চলেছে। 'এই তো জীবনের' কাহিনী রচনা করেছেন খ্যাতনামা চিত্র পরিচালকও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। জনপ্রিয় পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত মানুসেন ও ধীরেশ ঘোষ চিত্রখানি পরিচালনা করছেন। এইতো জীবনের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুনন্দা দেবী। সীতা দেবী নামে একজন নূতন মুখের সংগেও এই চিত্রে আমাদের পরিচয় হবে। এর কণ্ঠে সংগীতের অপূর্ব মূর্চ্ছনা দর্শক অন্তরে অপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করবে বলে প্রকাশ। প্রযোজক শ্রীযুত রাম কৃষ্ণ দাস এবং চিত্র বাণীর তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত শ্যামানন্দ বসু 'এই তো জীবনের' সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

ভ্যারাইটী পিকচার্স লিঃ

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু প্রযোজিত ভ্যারাইটী পিকচার্সের আগামী হিন্দী চিত্রের কাজ আরম্ভ হ'য়েছে। নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়ের একটা সামাজিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে বর্তমান চিত্রের কাঠামো গড়ে উঠেছে। নৃত্য-গীত এবং প্রণয় মাধুর্যে এই চিত্রখানি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দানের দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। এর প্রধান ভূমিকায় ভারতের খ্যাতনামা কোন নৃত্যশিল্পীকে দেখা যাবে। অপরাংশে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, বসির হোসেন, আমিনা খাতুন প্রভৃতিকে দেখা যাবে। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে প্রবীণ পরিচালক শ্রীযুত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই হিন্দি চিত্রখানি গৃহীত হচ্ছে। সংগীতাংশের ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীযুত সুবল দাসগুপ্ত—চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব পড়েছে শ্রীযুত সুহৃদ কুমার ঘোষের উপর।

গত পূজা সংখ্যা রূপ-মঞ্চে ভ্যারাইটি পিকচার্সের উক্ত চিত্র সম্পর্কে একটা সংবাদে প্রকাশিত হ'য়েছিল—"গুজব শ্রীমতী ভারতী এর বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করবেন।" এই গুজবটা গুজবেই পরিণত হ'য়েছে—।

নিরীহ ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলি বর্ষণে প্রেস কর্মচারীদের প্রতিবাদ

'আজাদ হিন্দ ফৌজ' কর্মীদের বিচারের প্রতিবাদ করে যে ছাত্র মিছিল বের হয়—সেই নিরীহ ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদ করে গত ২৩শে নভেম্বর শুক্রবার বেলা ১১টার সময় উত্তর কলিকাতার বিভিন্ন প্রেস কর্মীরা হরতাল পালন করে ও একটি শোভাযাত্রা বাহির করে। গ্রে ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বিডন ষ্ট্রীট দিয়ে এসে শোভাযাত্রাটী ব্লাকওয়ার স্কোয়ারে মিলিত হয়ে এক প্রতিবাদ সভা করে। 'রূপ-মঞ্চ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। পুলিশের গুলি বর্ষণের নিন্দা করে এবং মৃত ছাত্র-কর্মীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপস্থিত প্রেস-কর্মীদের ভিতর অনেকে সভায় বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত জনসাধারণের কাছে কয়েকটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন—

"আমাদের প্রেস-কর্মীদের এই সভা গত বুধ ও বৃহস্পতিবার নিরীহ ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলি চালাইবার জন্য তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। যে সমস্ত মহাপ্রাণ—জীবন এই অন্যায় গুলি চালাইবার ফলে বিনষ্ট হইয়াছে—সেই সব শহীদদের আত্মার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং জনসাধারণকে সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল কার্য হইতে বিরত থাকিয়া কংগ্রেসের আদর্শানুযায়ী আইন ও নিয়মানুবর্তিতা পালন করিবার অনুরোধ করিতেছি। সর্বশেষে এই সভা প্রেস কর্মীদের সর্বপ্রকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংঘবদ্ধ হইবার জন্য আবেদন করিতেছে।" শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার মিত্র প্রস্তাবগুলি সমর্থন করবার পর সর্বসম্মতি ক্রমে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

উক্ত সভায় এম, আই প্রেস; শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস; ইণ্ডিয়ান প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড ষ্টেশনার্স লিঃ; বাণী প্রেস: মিত্র প্রেস; নালান্দা প্রেস; শক্তি প্রেস; ইউনাইটেড প্রেস; ফাইন আর্ট প্রেস; এল, এম, প্রেস; নিউ মুখার্জি প্রেস প্রভৃতি বহু প্রেসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মীরা সভায় দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। খুব শৃঙ্খলার সহিত 'জয় হিন্দ' ধ্বনির মধ্য দিয়ে সভা ভংগ হয়।

—০—

"আজাদ হিন্দ ফৌজ" সাহায্য ভাণ্ডার

রূপ-মঞ্চ পত্রিকা থেকে উক্ত ভাণ্ডারে প্রথম দফায় ২৫৲ টাকা দেওয়া হ'য়েছে। 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র বন্দীদের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য উক্ত ভাণ্ডারে মুক্ত হস্তে অর্থ প্রদানের জন্য আমরা আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ করছি।

—০—

আমাদের ভ্রম-সংশোধন

বর্তমান সংখ্যা রূপ-মঞ্চে 'সারারাত' চিত্রের একটী ব্লক দু'বার ভুলবশতঃ মুদ্রিত হ'য়েছে, এজন্য আমরা খুবই দুঃখিত।

তাছাড়া ৫৪ পাতার শিরোনামার 'পরিচালকের' স্থলে 'চরিচালক' মুদ্রিত হ'য়েছে—এই মারাত্মক ভুলের জন্য আমরা পাঠক সাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

—০—

তুলসীদাস গীতাভিনয়

গত ১লা অগ্রহায়ণ সুখচর দুর্গোৎসব মণ্ডপে ভবানীপুর নাট্য-সম্মিলনী (পানিহাটি) কর্তৃক কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী বিরচিত "ভক্ত তুলসীদাস" গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্য-
কলার সচিত্র মাসিক।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির
মুখপত্র।

কার্যালয় ঃ
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ফোন ঃ বি, বি, ঃ { ৪২৯২ / ৫২০৪

প্রতি বাংলা মাসের ৩০শে
রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হয়।
বর্তমানে প্রতি সংখ্যার ঃ
মূল্য আট আনা।
সডাক এক বছরের গ্রাহক মূল্য
আট টাকা।
এক বছরের কম কাহাকেও
গ্রাহক করা হয় না।
নূতন লেখকদের উপযুক্ত রচনা
রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হয়।
অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠাবার
দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি না।

—পৃষ্টপোষকতায়—

নিতাইচরণ সেন
এন, সি, ঘোষ
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
বিভূতি ভূষণ দত্ত
দীনেশ দত্ত
এস, কে, রায়
এইচ বোর্ণ

রূপ-মঞ্চ

৫ম বর্ষ ঃ ১১শ সংখ্যা ঃ অগ্রহায়ণ ঃ ১৩৫২

আমাদের আজকের কথা—

দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ব সীমান্তে অস্থায়ী জাতীয় সরকার সম্পর্কিত যত গুলি সংবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে—তার ভিতর যে সংবাদ গুলির প্রতি আমরা আমাদের চিত্র ও নাট্য-জগতের দায়িত্বশীল বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই-তা হ'চ্ছে ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিকল্পনাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে তিনখানি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হ'য়েছিল, জনসাধারনকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে জাতীয় আদর্শে নাটক রচনা করে অভিনীত হ'তো—জাতীয় আদর্শের ধারা অনুসরণ করে সংগীত রচিত হ'তো, এমন কি এই সব রচয়িতাদের আজাদ হিন্দ সরকারের তদানীন্তন মহামন্ত্রী সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃতও করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ আজ সারা ভারত-বাসীর অন্তর জয় করতে সক্ষম হ'য়েছে, তাঁদের দেশ-প্রেম, তাঁদের নিয়মানুবর্তিতা—ধর্মনির্বিশেষে একই আদর্শের জন্য তাঁদের সংঘবদ্ধতা—আজ আমাদের সামনে এক মহা আদর্শ উপস্থাপনে সমর্থ হ'য়েছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আজ 'জয়হিন্দ' বলে আমাদের প্রত্যাভিনন্দিত করছেন—তাঁর শিশু দৌহিত্র ভারতের

গাড়ীর জানালা দিয়ে বাহিরের দৃশ্য ভালোই দেখায়

যাত্রীটীর মুখে কিন্তু হাসি নেই। তার চোখের সামনে দিয়ে শস্যভরা ক্ষেত আর ফলে ফুলে পূর্ণ সারি সারি গাছপালা চকিতে সরে যাচ্ছে। তথাপি সে শুধু ভাবছে সেই দূরের বিস্তীর্ণ অনুপ্ত জমিগুলির কথা যেখানে কোনরকম কিছুরই চাষ করা হয় না।

এর কারণও সে জানে—ভারতবর্ষের ৭০০,০০০ গ্রামের বেশীর ভাগই উপযুক্ত রাস্তা অভাবে পণ্যের বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন। কাজেই গ্রামবাসীরা যদি বা ঐসকল অনুপ্ত জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, তথাপি ঐসকল খাদ্যশস্য বাজারে আনিবার কোন সুবিধা নেই। সুতরাং যদি কখনও রাস্তা তৈরী হয় তখন যে কেবলমাত্র প্রচুর শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে এমন নয়, চাষীরাও শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভারগুলি কিনিতে সক্ষম হবে। কৃষি ও শিল্প পরস্পর নির্ভরশীল,—একের উন্নতি অপরের উন্নতির উপর একান্তভাবে নির্ভর করে।

যাত্রীটী ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বুঝতে পারছে যে ভবিষ্যৎ ভারতে অসংখ্য ভাল রাস্তা তৈরী হবে, আর রাস্তাগুলি মনুষ্যদেহের রক্তপ্রবাহি ধমনীর মত জাতির স্বাস্থ্য ও সম্পদের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে এবং নগরে নগরে পৌঁছে দেবে।

অধিকতর পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ এবং উন্নত ধরণের শস্য উৎপাদন প্রবর্ত্তনের জন্য বার্ম্মা-শেল কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

ভাল রাস্তা জাতির সমৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করে

মহামানব মহাত্মা গান্ধীকে 'জয় হিন্দ' বলে অভিনন্দন জানিয়েছে। মহাত্মা 'জয় হিন্দ' বলে ঐ বালকের শিশু পৌরুষকে প্রত্যাভিনন্দন জানিয়েছেন। যে আদর্শ মহিমায় 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' আজ ভারতের বর্তমানের মহামানব থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের অন্তর জয় করতে পেরেছে—সেই আদর্শকে জয়যুক্ত করে তুলতে তাঁরা চিত্রও নাটকের সাহায্য গ্রহণ না করে পারেন নি। অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি—আমাদের জাতীয় জীবনকে আজ পঙ্গু করে ফেলেছে—এই ক্লৈবত্বের হাত থেকে জাতিকে বাঁচাতে হলে জাতীয় আদর্শ চিত্র ও নাট্যের ভিতর বিকশিত করে তুলতে হবে। চিত্র ও নাটকের সত্যিকারের রূপ বলতে যা আমরা বুঝি, তা সর্বপ্রকার জাতীয় আদর্শের পরিপূর্ণ রূপ বিকশিত করে—সর্বপ্রকার নীচতা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে অগ্রসর হওয়া। আশা-করি আমাদের দায়িত্বশীল বন্ধুরা চিত্র ও নাট্যমঞ্চের মারফৎ জাতির সেবার এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণে তৎপর হ'য়ে উঠবেন।

কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গীতি নাট্য অভ্যুদয়ের একটি দৃশ্যে সূত্রধার রূপে শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল ও শিল্পীদের দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে সর্বপ্রথম রংমহল রঙ্গমঞ্চে অভ্যুদয়ের অভিনয় হয়। পরে রকসী, শ্রীরঙ্গম, বিজলী প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে এর অভিনয় অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। গীতিনাট্যের ভিতর দিয়ে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের এই উদ্যম সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রশংসনীয়। তাই আজ অভ্যুদয় সকলের শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হয়েছে, (অভ্যুদয় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হ'য়েছে।)

বড়দিনের—শহরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ !!

উত্তরা · পূরবী · পূর্ণ

বি.বি. ২২০২ • বি.বি ৬৬৯২ • সাউথ. ৩৪.

হাসি হাসি !!
আর হাসি !!!
ছোট হাসি, ঈষৎ হাসি, বাঁকা হাসি, চাপা হাসি, খুসীর হাসি, অট্ট হাসি—হরেক রকমের হাসি, যখন প্রেক্ষাগৃহের আঁধো আধারকে সচকিত ক'রে তোলে, তখন-ই বোঝা যায়: 'মানে-না-মানা' সকলের মন মাতিয়ে তুলেছে।

৪৬শ
সপ্তাহ
—চলিতেছে—

কাল যে ছিল ভিস্তী আজ সে হ'ল রাজা! এই না ভাগ্যের খেলা!!
এর ওপর আবার রাজকুমারীর প্রেম!! কল্পনাতীত অঘটন
সর্ব্বরসের বিচিত্র সমাবেশ !!!

চিত্র জগতের স্মরণীয় বিস্ময় !!

চলচ্চিত্র ঐতিহাসিকের বিরাট কীর্তি !!!

একযোগে চলিতেছে

সেণ্ট্রাল * ছায়া * শ্রী * আলেয়া ও পার্ক শো হাউস

শ্রীমতী সিপ্রা দেবী

'ভাবীকাল' চিত্রে এর অভিনয় অনুল্লেখযোগ্য হলেও, এর ভাবী-অভিনেত্রী জীবনের সম্ভাব্যের পরিচয় দিয়েছে।

সুনন্দা দেবী

চিত্রবাণী লিঃ এর—**"এইতো জীবন"**
চিত্রে—জীবনের সত্যতা বিশ্লেষনে
বিশেষ অংশ গ্রহন করছেন।

রূপ-মঞ্চ : ১৩৫২

সোভিয়েট রাশিয়ার শিশু নাট্য-মঞ্চ

কালীশ মুখোপাধ্যায়

সোভিয়েট ইউনিয়নে ছোটদের উপযোগী নাট্য-মঞ্চের তুলনা হয় না। ছোটদের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা সোভিয়েট রাশিয়াতে যেমন দেখতে পাই, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ দেখতে পাই না। এখানকার অভিনেতা অভিনেত্রীরা সবাই শিশু, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বয়সী তারা, বেশীর ভাগ সৌখীন, পেশাদার ও অপেশাদার যুব শিল্পীরা একসংগে কাজ করে। শিশু বলে এদের অভিনয়ের মান মোটেই নীচু নয়—অনেক সময় বয়স্কদের চেয়ে এদের অভিনয় বেশী প্রশংসনীয়। শিশুনাট্যশালা গুলি মূলতঃ People's Commissariat of Education-এর অধীনে এবং শিশু নাট্য-মঞ্চের সমস্ত কিছু Central House of Children's Art Education দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই প্রতিষ্ঠানটী নাট্যমঞ্চে শিশু-শিক্ষা, সংগীত, শিল্পকলা, বেতার, নৃত্য প্রভৃতি শিশুদের সর্বপ্রকার শিক্ষা ও কৃষ্টির জন্য সমস্ত ইউনিয়নে অসংখ্য শাখা স্থাপন করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে সমস্ত স্কুলে স্কুলে বেতার যন্ত্র, চলচ্চিত্র প্রদর্শন যন্ত্র প্রভৃতি বিলি করা হয়ে থাকে। স্কুলের আমোদ প্রমোদের তালিকায় কোন কোন বিষয় গ্রহণ করা হবে, তার বিষয় বস্তু কেন্দ্রীয় ভবন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ভাস্কর্য এবং অংকন শিক্ষার তালিকাও এরা করে দেন। বয়স্কদের ক্লাবে ছোটদের সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেবার জন্য এরাই ব্যবস্থা করে দেন। শিশু শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করা হ'য়ে থাকে। শিশুদের সর্ব প্রকার সাফল্যের কথা নিয়ে পত্রিকা অথবা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় কেন্দ্রীয় ভবন থেকে। কিছুদিন পূর্বে সংগীত প্রতিযোগীতায় পুরস্কার প্রাপ্ত সংগীত গুলি সংগ্রহ করে একখানি পুস্তক প্রকাশ করা হয়, পুস্তক খানির মুদ্রণ সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। পুস্তকখানি প্রকাশিত হবার পূর্বেই এর অর্ধেকের বেশী বিক্রীত হয়।

১৯৩১ খৃঃ শিশু শিল্প শিক্ষার কেন্দ্রীয় ভবন (Central House of Art Education for Children) দ্বারা কেন্দ্রীয় পুতুল নাট্য-মঞ্চ (Central Puppet Theatre) প্রতিষ্ঠিত হয়, রিপাবলিকের সম্মানিত শিল্পী এস, ভি, অব্রাজটসোভকে (S. V. Obraztsov) এই থিয়েটারে পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয়। এই থিয়েটারের চার পাঁচটী দল আছে। এক একটি দলে পাঁচ ছ'জন করে যুব অভিনেতা ও তিনজন করে সংগীতজ্ঞ থাকেন। যদিও এই দল গঠনে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তথাপি সব দলই যেমনি সহরের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করে, তেমনি মফস্বলে গ্রামে গ্রামে এবং কালেকটিভ ফার্ম গুলিতে অভিনয় করে। দলগঠনের বিভিন্নতায় তাদের অভিনয়াঞ্চল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় না। যেখানেই এদের যে কোন দলের অভিনয় অনুষ্ঠিত হউক না কেন—এরা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়। এবং যখন যে গ্রামে যেয়ে হাজির হয়, সেখানকার শিশুদের মাঝে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, এই দূর দেশ থেকে আমরা তার কতখানি উপলব্ধি করতে পারবো? পুতুল নাচের এই অভিনয় আরো বেশী জমে ওঠে, যখন পরিচালক ওব্রাজটসোভ নিজে অভিনয়াংশে আত্মপ্রকাশ করেন। পুতুল অভিনয়ের প্রারম্ভটী চমৎকার। পুতুল শিক্ষক প্রারম্ভে সমস্ত পুতুল গুলি এক এক করে দর্শকসাধারণের কাছে তুলে ধরেন—কিভাবে তাদের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়—কাঠের মাথা...সব কিছুই দর্শকদের বলে দেন। লুকোচুরির কিছু নেই। রাশিয়ার বংশধরেরা এমনি ভাবে প্রথম থেকেই এক একটী শিল্পের জন্ম এবং পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে।

প্রাক বিপ্লব যুগে রাশিয়াতে ছোটদের উপযোগী নাট্য-মঞ্চ ছিল না একটীও। বিপ্লবোত্তর যুগে—একমাত্র শিশুদের উপযোগী নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৬৫টী। এই ৬৫টীর সবগুলিই পেশাদার রঙ্গমঞ্চ এবং এক একটী

রঙ্গমঞ্চ বহু দলের সমষ্টি নিয়ে গড়ে উঠেছে। বয়স্কদের রঙ্গমঞ্চের মত এগুলিতে বিভিন্ন বিভাগও রয়েছে। সবচেয়ে পুরোণ যে থিয়েটারগুলি তাদের বয়স বিশ একুশের বেশীও হতে চলেছে। এদের ভিতর State Theatre for Children (Khar Korv), the State Central Theatre for Young Spectators (Moscow), the State Theatre for Young Spectators (Leningrad) এবং the Moscow Theatre for Children উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটী বড় বড় সহরেই এরূপ শিশু নাট্যশালা বিদ্যমান। ছোট ছোট সহরেও—(যেখানে এখন অবধিও স্থায়ী শিশু নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়নি) স্থায়ী এবং ভ্রাম্যমান নাট্যসম্প্রদায় গঠনে Commissariat of Education-এর রয়েছে তীব্র দৃষ্টি।

এই অল্প সময়ে কি করে এরা ছোটদের মন জয় করতে পেরেছে—সে সম্পর্কে নাট্য তালিকায় বিশদ বিবরণ লিখে রাখা হ'য়েছে। গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারাই এত অল্প সময়ে এরা শিশুমন জয় করতে পেরেছে এবং এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তী কালে কর্মীদের বহু অংশে সাহায্য করেছে। এটা স্বাভাবিক, প্রথম যুগে উদ্যোক্তারা শিশুমনের চাহিদা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। শিশু মন নিয়ে গবেষণা করতে করতেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত শিশুমন জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রথম যুগে শিশু নাট্যাভিনয়ের তালিকায় রূপ কথার কাহিনী বহু পাই। যেমন Hoffman এর 'The Nutcracker and the King of Mice', Hans Andersen এর 'Nightingale'। অভিযানের গল্পও যে না ছিল তা নয়। যেমন Kipling's Mowgli, Mark Twain's Tom Sawyer, Uncle Tom's Cabin, এবং Hiawathaর নাট্যরূপ। ওপরে যে ধরনের শিশুনাট্যাভিনয়ের তালিকা আমরা দেখতে পাই—কর্তৃপক্ষ ক্রমে ক্রমে ঐ গুলি ছাড়া আরও নূতন চাহিদার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করেন। সময়োপযোগী মালমশলা সংগ্রহ করে দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের পটভূমিকায় শিশু অভিনয়ের জন্ম নাটক লিখিত হতে লাগলো। ১৯২৪-২৫খৃঃ থেকে সোভিয়েট গণজীবনযাত্রা প্রণালী স্থান পেতে লাগলো শিশুনাটকে। গৃহযুদ্ধের পট ভূমিকায়, সোভিয়েট গণজীবনের বিভিন্ন সমস্যায়, দেশের পুনর্গঠন সমস্যায় প্রতিফলিত চরিত্রে শিশুরা অভিনয় করতে থাকে। তদানীন্তন বহু নাটক আজকালও অভিনীত হচ্ছে। যেমন Makariev এর 'Timoshka's Mine', Afinogenov এর 'Black Ravine' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সত্য কথা বলতে কি, ঐ সময়ই শিশু নাট্য তালিকা তৈরী করা হয় এবং কয়েকজন যুবক নাট্যকারের সংগে সোভিয়েট রাশিয়ার পরিচয় হয়—যাঁরা শুধু শিশুদের উপযোগী নাটকই রচনা করতেন। তাঁদের মধ্যে সেসটাকোভ (Shestakov) মাকারিয়েভ (Makariev) ও রোচীনের (Rochin) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

নাটকের বিষয় বস্তু তখন থেকে আরও ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এবং মনস্তত্ত্বমূলক বিষয় বস্তুও স্থান পেয়েছে। বর্তমানের শিশু নাট্যপদ্ধতি এমনি ভাবে গ্রথিত যে, আমোদ প্রমোদ এবং শিক্ষা দু'টোকে যেন একই সুতো দিয়ে গাঁথা হ'য়েছে। এতে ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, খুব স্বাভাবিক ভাবে শিশুমন দু'টোকেই গ্রহণ করছে। বর্তমানে নাট্যাভিনয়ের ভিতর দিয়ে শিশুরা বিদেশ এবং বৈদেশিকদের সম্পর্কে বহু তথ্য জানতে পারে। ইতিহাসের পাঠ্য বিষয়গুলি তারা ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয়ের ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভ করে। নাটকের ভিতর দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা, নিয়মানুবর্তিতা ও বিভিন্ন সমস্যা, গৃহের পারিবারিক সম্বন্ধ সমাজজীবনের কাঠামো, সবকিছুই শিশুরা জানতে পারে। শিল্প তখনই শিক্ষার বাহন হতে পারে, যখন তা নিখুঁত এবং অভ্রান্ত রূপ লাভ করে। সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্যশিল্প সম্পর্কে একথা সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য। সোভিয়েট নাট্যশিল্পের সর্বাংগীন উন্নতির সংগে সংগে তার শিশু নাট্যকলাও প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। অভিনয়—নাটক, সংগীত, নৃত্য এবং বিজ্ঞান উদ্ভূত-শিল্পকলা সব কিছুর মধ্যে রয়েছে একটা অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য, যেন সমসূত্রে গাঁথা।

মস্কোর শিশু নাট্যশালার (the Moscow Theatre for Children) অভিনয় পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয়। মলি অথবা ক্যামারনী থিয়েটারের শিশু নাট্যাভিনয় থেকে এখানকার অভিনয় বৈদেশিকদের বেশী আকৃষ্ট করে। এখানকার দর্শক সমাগম বড় অদ্ভুত। এখানকার দর্শক সবাই আগ্রহশীল শিশু। এই শিশু দর্শকেরাই যেন পৃথক এক অভিনয়ের সৃষ্টি করে। অভিনয় আরম্ভ হবার পুর্বে'ই শিশুরা এখানে আসে—অনেক সময় অভিনয়ারম্ভের এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পুর্বে' তাঁরা ভীড় জমায়। খেলাধুলার ভিতর দিয়ে এই সময়টা কাটায়, তাদের নাচ-গান সেখানো হয়। এরা যে গোলমালের সৃষ্টি করে, কানের পরদা তাতে ফেটে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু যে প্রাণচাঞ্চল্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা, যে কোন বয়স্ক দর্শককেও অভিভূত করে তোলে।

বিভিন্ন থিয়েটারের বিভিন্ন রূপ হলেও একই কর্ম-পদ্ধতি সর্বত্র প্রচলিত। সকল থিয়েটারেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিদর্শক থাকেন। শিশু দর্শকেরা কি ভাবে অভিনয় গ্রহণ করেছে তা পরিদর্শন করবার জন্য। এদের প্রধান কর্তব্য শিশু দর্শক মনে নাটকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা। অভিনয়ের কোন বিশেষস্থানে শিশুরা কেন হাসলো, কেন হাসলো না, কোন অংশটুকু তাদের বিরক্তিকর বোধ হয় প্রভৃতি প্রত্যেকটী বিষয় লক্ষ্য করে টুকে নেন। শিশুনাট্য-শালা গুলির সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, তাদের শিশু-দর্শকদের মনের প্রতিটি অলিগলির পরিচয় পাওয়া। এনিয়ে তাঁরা অনবরত গবেষণা করছেন। তাঁদের নিয়োজিত পরিদর্শকদের বিবরণী থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী প্রযোজনায় অনেকক্ষেত্রেই শিশুমনের চাহিদা মেটাতে অনেক ক্ষেত্রেই সফলকাম হয়ে থাকেন। কতক্ষণ অভিনয় স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন, বয়সের তারতম্যানুযায়ী তা স্থিরীকৃত হ'য়েছে। বাস্তবতা এবং প্রতিরূপক কতখানি নাট্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে তাও আবিষ্কার করা হ'য়েছে। শিশুমনের সংগে আলাপ-আলোচনা করে, থিয়েটারের কাছে শিশুদের লেখা চিঠি দেখে (অভিনয় দেখে তারা যে সমালোচনা পাঠায়), অভিনয় দেখে স্কুলে তাদের চিত্রণ এবং অংকনে যে প্রতিক্রিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা পরিলক্ষণ করেছেন, তাদের সংগে সংযোগ রেখে শিশু অভিনয়ের তালিকা তৈরী করা হয়। পরিচালক, শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, অভিনেতা, অভিনেত্রী অভিনয়ের সময় শিশুমনের এই জ্ঞাত তথ্যের নির্দেশ মেনে চলেন।

শিশু শিল্প-শিক্ষার কেন্দ্রীয় ভবন (Central House of Children's Art Education) কর্তৃক ১৯৩০ খৃঃ 'The Theatre of Children's Books' প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুরা যাতে বই ভালবাসে এবং পড়ে, কি করে বই লেখা হয়, ছাপা হয়, কি করে বই এর যত্ন করতে হয় প্রভৃতি শিশুদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে এই নাট্যমঞ্চটী প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুদের উপযোগী নূতন কি কি বই প্রকাশিত হলো সেসবের সংগে শিশু-দের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্বও আছে এই Book's Theatreএর। এই থিয়েটারটীও পুতুল নাচের থিয়েটার। এবং পাঁচটি সুদক্ষ দলে ভাগ করা। এক একটি দলে দু'জন করে পুতুল কর্তা এবং একজন মঞ্চাধ্যক্ষ আছেন। পুতুল কর্তারা অবশ্য গাইতে জানেন এবং বাদ্য যন্ত্রেও তাঁদের দক্ষতা আছে। সর্বোপরি আছেন একজন সুদক্ষ সংগীতজ্ঞ। বিভিন্ন নকসার জন্য প্রয়োজন ও উপযুক্ততানুযায়ী সুরকারদের সহযোগীতায় তিনি নাট্যের সুর সংযোজনা করেন। সমস্ত মস্কোতে এদের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এদের অভিনয়ের কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। চাহিদানুযায়ী মস্কোর বিভিন্ন স্থানে, ক্লাব ও স্কুলে এরা অভিনয় করেন। কারণ ট্রাম বাসের ভীড় ঠেলে অভিনয় দেখবার জন্য এতে শিশুদের একস্থান থেকে অপর স্থানে যেতে হয় না। যেখানে মঞ্চ অব-স্থিত সেখানে শুধু রিহার্সেলই দেওয়া হ'য়ে থাকে। অনেক সময় এইসব দলকে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাইবেরিয়ার সীমানাও এদের পরিক্রমার ভিতর থাকে। পরিক্রমার সময় এই সব নাট্য দলের কর্মীরা দ্বিগুন ভাতা ও

বাড়ী ভাড়া পান। যখন এরা কোন কিনডারগারটেনে (Kindrgarten) অভিনয় করেন তখন প্রদর্শনীর কোন প্রবেশ মূল্য থাকে না। অন্যান্য স্কুলে যখন অভিনয় হয় তখন স্কুলের কর্তৃপক্ষ হয় সে ব্যয় ভার গ্রহণ করেন, অথবা ছাত্রেরা নামমাত্র প্রবেশ মূল্যে অভিনয় দেখতে পায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এই অর্থের পরিমাণ এতই কম যে, তাতে অভিনয়ের ব্যয় ভার কুলিয়ে ওঠে না। এই যে ঘাটতি, এর ক্ষতিপূরণ করে থাকেন 'কমিসারিয়েট অব এডুকেশন'। এবং যদি কোন সময় থিয়েটার কিছু লাভ করে তখন তা থিয়েটার তহবিলেই জমা হয়। থিয়েটারের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির উন্নতির জন্য সে গচ্ছিত অর্থ ব্যয়িত হয়।

প্রত্যেক শিশুনাট্যশালাই যখন কোন নাটক অভিনয়ের জন্য স্থির করেন, নাটকের রিহার্সেল আরম্ভ হবার পূর্বে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের আমন্ত্রন করে নাটকখানি তাদের পড়িয়ে শোনান। নাটক পঠিত হবার পর, থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নাটক নিয়ে আমন্ত্রিত ছাত্রদের সংগে আলাপ আলোচনা করেন। এই আলোচনা থেকে কর্তৃপক্ষ শিশুদের সান্নিধ্যে এসে শিশুমনের অনেক খবর জানতে পারেন যেমনি, তেমনি নাট্যমঞ্চগুলির সংগে শিশুদেরও এক মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা পূর্বেই আলোচনা প্রসংগে বলেছি, নাটকের অভিনয়ারম্ভের দেড় ঘণ্টা পূর্বে থেকেই শিশুরা প্রেক্ষগৃহে আসতে থাকে, তখন তারা বিভিন্ন খেলাধুলায় যোগদান করে। তাদের এই অবসর সময়টুকুর ভিতর গান বাজনাও শিক্ষা দেওয়া হয়, আবার কোন সময় বই বা নাটক থেকে কতকাংশ উদ্ধৃত করে লেখকদের নাম জিজ্ঞাসা করা হ'য়ে থাকে।

কিনডারগারটেনের শিশুদের বয়সের গণ্ডি হচ্ছে চার থেকে আট। নাটকের চরিত্রগুলির পোষাক পরিচ্ছদের সহজ সাবলীল রং এর খেলা তারা পছন্দ করে। পুতুল গুলির অংকন হওয়া চাই সহজ—দৃশ্যাবলীতেও ফুটে উঠবে সারল্য। নাটকের কাহিনী শাখা প্রশাখা বর্জিত সাবলীল হওয়া চাই—তবেই তাদের মন গলবে; এরা রূপকথার পরিকে ভালবাসে—যদি তারা খুব বেশী রকম কল্পনা-প্রয়াসী না হয়—অনেক ক্ষেত্রে অভিযানের কাহিনীও এদের আনন্দ দেয়—অবশ্য তা বাস্তবের রঙ্গে রঞ্জিত হওয়া চাই। এই সব চরিত্রের সংগে এরা পরিচিত হতে চায়। অনেক সময় এই অভিযানের কাহিনীতে শিশুরা অংশ গ্রহণ করতে চায়—তারা চায় নাটকের চরিত্রের সংগে কথা বলতে। 'They prefer not to be passive Spectators।' আটথেকে দশবছরের শিশুরা কাহিনীর একটু জটিলতা পছন্দ করে এবং এই বয়সের বেশীর ভাগ পরির উপাখ্যান ভালবাসে। দশ থেকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশুমনের বিশেষ পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয় না। বরং এই সময়টাতে একটু বেশী আজগুবী কাহিনীর তারা ভক্ত হয়ে ওঠে। কাহিনীর ঘাত প্রতিঘাত একটু বাড়বে। এই সময় তারা অভিনয়ের বিষয় বস্তুর প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি দেবে। এবং কাহিনীর নায়ক থাকা চাই একজন।

এগারো থেকে তেরোর সময় কাহিনীটা একটু অনুরাগে রঞ্জিত হওয়া চাই, নানা বীরত্ব পূর্ণ কার্য কলাপও তাদের আকৃষ্ট করে। স্কুলের শিক্ষার ভিতর দিয়ে তাদের মনকে এখন থেকে যাঁচাই করে নেওয়া হয় এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত করা হয়। স্কুলে অনেক সময় সমাজতন্ত্রী নায়কের চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ব্যবস্থা করা হয়, তারা একবাক্যে বিপ্লবী নায়কের অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করে। এখান থেকেই সোভিয়েট রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রীদের গঠন আরম্ভ হয়। এখন পুতুল নাচের থিয়েটার গুলির কথা রেখে আমরা সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যান্য ধরনের শিশু নাট্যশালা নিয়ে আলেচেনা করবো।

বৌমনস্কি শিশু নাট্যশালা (Baumansky Children's Theatre) মস্কো জেলার যেখানে এর অবস্থিতি—সেখান কার নামানুসারে এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। বোমনস্কির কম্যুনিষ্ঠ পার্টি নিজস্ব একটা থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তা থেকেই এই থিয়েটারের জন্ম। যেসব ছেলেরা রাস্তায় রাস্তায় বন্যভাবে ঘুরে বেড়ায়, তাদের

মাঝে নিয়মানুবর্তিতা আসা দরকার মনে করেই এই থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হ'য়েছিল। একটি পরিত্যাক্ত গির্জাকে সংস্কার করে নাট্যশালার উপযোগী করে নেওয়া হয়। ১৯৩০ খৃঃ বৌমনস্কি থিয়েটার 'অক্টোবর' নাটক দিয়ে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে এই নাটকের কয়েকখানা ফটো ছাড়া কোন খসড়াই নেই—অবশ্য পরবর্তী কালে এ নাটক আর অভিনীত হতে দেখা যায় নি—যদিও তখন এই নাট্যাভিনয় খুব প্রশংসা অর্জন করেছিল। জারসেনাবাহিনীর কয়েকজন সৈন্য বেরিয়ে এসে কিভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার কয়েকটি কলকারখানার পরিচালক হয়, এই নাটকখানিতে তাই দেখানো হ'য়েছে। এদের পরবর্তী নাটক 'Tokmanov Street'-এ শিশু এবং পিতামাতার সম্পর্কে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই নাটকখানি প্রশংসার সংগে অভিনীত হ'য়ে জনসম্বর্ধনা লাভে সমর্থ হয়। ধীরে ধীরে এদের নাটকের তালিকা বাড়তে থাকে। অসট্রোভস্কি, টুর্গেনিভ, চেকভ, গ্রীম প্রভৃতির নাটকও নাট্য তালিকায় দেখতে পাই। ১৯৩৬-৩৭ খৃঃ ফরাসী সাহিত্য থেকে গৃহীত Labische এর 'Confused Thinking', রাশিয়ার 'বোর্ডিং স্কুল' এবং 'যুব প্যারাসুট বাহিনী'র পটভূমিকায় লিখিত তিনখানি নাটক খুব প্রশংসা লাভ করে। বুক থিয়েটারের মতই বৌমনস্কি থিয়েটার কোন নাটক অভিনীত হবার পূর্বে ছোটদের আমন্ত্রন করে নাটকের খসড়া পড়িয়ে শোনান। তাদের মতামত গ্রহণ করে অভিনয়ে অগ্রসর হন। এরা শিশু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে বিভিন্ন জেলায় জেলায়, স্কুলে স্কুলে পরিভ্রমণ করেন। এরা অনেক সময় থিয়েটার প্রাঙ্গণে ভাস্কর্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করে থাকেন। 'টোকম্যানোভ ষ্ট্রীট' নাটক অভিনয়ের সময় এরা থিয়েটারের তিনটী পৃথকগৃহে মডেল তৈরী করে রেখেছিলেন। কম্যুনিষ্ট, ক্ষুদে বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবি এই তিন শ্রেণীর চরিত্র নিয়ে এরা মডেল তৈরী করেছিলেন। এই মডেলগুলি সব একত্রে মিশিয়ে দিয়ে শিশুদের পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট ঘরে সাজিয়ে রাখতে বলা হয়েছিল। শুধু ঐ নাটকের সময়ই নয়, বহু অভিনয়ের সময়ে অভিনীত চরিত্রগুলির মডেল তৈরী করে মঞ্চে এনে হাজির করা হয় এবং কোন মডেলটী কোন চরিত্রানুযায়ী গড়ে উঠেছে শিশুদের তা জিজ্ঞাসা করা হয়। এইভাবে অভিনয়ের চরিত্রগুলির সংগে পূর্বে থেকেই শিশুরা পরিচিত হ'য়ে ওঠে। 'Joy Street' নাটকাভিনয়ের সময় ব্যবস্থা দেখা গিয়েছিল অন্যরকম। কতগুলি সংখ্যা এবং বর্ণের একটা Chart করে মঞ্চে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লণ্ডনবাসীদের জীবন যাত্রা, বেকারের সংখ্যা, শিক্ষা এবং অশিক্ষা প্রভৃতি খুঁটিনাটি জ্ঞাতব্য বিষয় থেকে শিশুদর্শকেরা বুঝতে পেরেছিলো যে তাদের নাটক কি কি বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে।

প্রত্যেক নাট্যাভিনয়ের সময় অভিনয় শেষে শিশু দর্শকদের বয়স, স্কুল, ঠিকানা, মেয়ে না পুরুষ প্রভৃতি জেনে কতগুলি প্রশ্ন পত্র উত্তর দেবার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্নপত্রগুলি নাটকের বিভিন্নতানুযায়ী তৈরী করা হয়ে থাকে। কোন বিশেষ নাটক সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী এখানে উধৃত করে দিলাম—এথেকে প্রশ্নের ধারা সম্পর্কে পাঠকরা কিছুটা ধারনা করে নিতে পারবেন।

(১) Give the order of the Scenes—দৃশ্যগুলি পর পর সাজিয়ে দাও। (২) Enumerate all the characters you remember—যে সব চরিত্রগুলি তোমার মনে আছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (৩) Say which are the main comic and which are the Dramatic Scenes—কোন চরিত্রগুলি প্রধান কৌতুক চরিত্র এবং কোন গুলির নাটকীয় গুরুত্ব বেশী। (৪) Give the reason for Varia's hooliganism ভেরিয়ার গোণ্ডামীর কারণ দেখাও। (৫) Give Varia's reason for entering the pioneers অগ্রবর্তীদের ভিতর ভেরিয়ার প্রবেশের কারণ কি? (৬) Say what is harmful in the petty bourgeois family—ক্ষুদে বুর্জোয়া পরিবারের কোন কোন বিষয় গুলি ক্ষতিকর? (৭) What is wrong in the Communist family—কম্যুনিষ্ট পরিবারের কোন কোন বিষয় গুলি অন্যায়। (৮) State why the school, the Pioneer work and home life must be in harmony—

বিদ্যালয়—বৃহত্তর কার্য—পারিবারিক জীবন কেন সামঞ্জস্য পূর্ণ হবে।

এরূপ প্রশ্ন পত্র অভিনয় শেষে শিশুদর্শকদের দিয়ে দেওয়া হয়। একমাস বাদে স্কুলে এর আলোচনা চলে। আবার পুনরাবৃত্তি হয় ছয় মাস বাদে। এইভাবে নাটক এবং তার অভিনয়ের সুস্পষ্ট ধারণা শিশুমনে এঁকে দেওয়া হয়। এবং এই সব আলাপ আলোচনা থেকে শিশু-মনের তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় থিয়েটারে।

কোন বিশেষ একজন শিশুর মনে যদি অভিনয়ের বিশেষ প্রতিক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয় তাহলে—পরিদর্শকেরা তার কথা বিশেষ ভাবে টুকে রাখেন, যেমন মনে করুন কোন বিশেষ দৃশ্যে সকলেই হাসলো অথচ একটি ছেলে কেন হাসলো না, এই বৈশিষ্ট পরিদর্শকদের আকৃষ্ট করে। ঐ শিশুটিকে নিয়ে চলে তখন তাঁদের বিশেষ আলোচনা শিশুর গৃহে এবং স্কুলে।

সোভিয়েট রাশিয়া তার শিশুদের আমোদ প্রমোদের কতখানি সুবিধা সুযোগ করে দিয়েছে, তার শিশুদের জন্য কি ব্যাপক পরিকল্পনা ও উদ্যম, আমাদের বর্তমান আলোচনা থেকে আশা করি পাঠক পাঠিকারা একটা সুস্পষ্ট ধারনা করতে পারবেন। পুঁথি-বিদ্যা থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার শিশুদের নাট্যশালা সম্পর্কিত যতটুকু তথ্য আমরা জানতে পারি—ততটুকুই যে আমাদের বিস্ময়াভি-ভূত করে তোলে!

আমাদের এখানে আজ শিশুনাট্যাভিনয়ের জন্য আন্দোলন কেবল শুরু হ'য়েছে—রূপ-মঞ্চ কর্তৃপক্ষ এবং বহু বিদ্বজ্জন, এমন কি বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র বন্ধুরাও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে আরম্ভ করে-ছেন। শিশুনাট্যাভিনয়ের জন্য বিভিন্ন সংবাদ পত্র মারফত দাবীও জানাচ্ছেন—কিন্তু সে দাবী যে কবে মিটবে তা সুদূরপরাহত। নিউথিয়েটার্স রামেরসুমতির চিত্ররূপ স্বত্ত ক্রয় করেছেন, রঙ্গমহলে, শ্রীরঙ্গমে—রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে অভিনীত হচ্ছে দেখে যদি কেউ মনে করে থাকেন, শিশুদের দাবী স্বীকৃত হ'য়েছে, তাহলে যে মস্তবড় ভুল করবেন সেবিষয়ে মোটেই সন্দেহ নেই। শিশুদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কর্তৃপক্ষ—উক্ত নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেননি—বা চিত্ররূপ দেবার মনস্থও করেন নি—শিশুদের আমোদ প্রমোদের চাহিদা মেটাবার মত উদারতা তাঁদের মাঝে মোটেই পরিলক্ষিত হয়নি—তাঁরা উক্ত নাটক অভিনয় করছেন বা চিত্ররূপ দিতে যাচ্ছেন শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নিশ্চিত মুনাফার কথা বিচার করে। তবে কি নৈরাশ্যের অন্ধকারেই আমাদের সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে? তা নয়। হয়ত এমন কোন প্রযোজকের আবির্ভাব হতে বাধ্য—হয়ত তাঁরই জন্য আমরা দিন গুনছি—আমাদের দাবীই যিনি মেনে নেবেন সর্বাগ্রে। যদি তাও না হয়—আমাদের প্রয়োজন, আমাদের চাহিদা নৈরাশ্যের হাহাকারে মিলিয়ে যেতে দেবো না। পশ্চিমের রাহুমুক্ত সূর্য যেদিন পূর্বা-কাশে তেজোদীপ্ত হয়ে উদিত হবে, আমাদের সকল চাহিদা, সকল প্রয়োজন রূপে রসে রঙ্গিন হয়ে ভরে উঠবে। সেদিনে আমরা প্রত্যাখ্যাত হবো না—সে দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে। তাই সেই শুভদিনের আগমন প্রতীক্ষায় থাকতে হবে আমাদের।

উত্তর ভারতীয় কথক নৃত্য

নৃত্য শিক্ষক প্রহ্লাদ দাস

মুসলমান রাজত্বকালে নবাব বাদশাহদের বিলাসিতার উপকরণ ছিল নৃত্য। যুদ্ধ জয় করে নূতন দেশ হতে মণি, মুক্তা জহরৎ ইত্যাদির সংগে সংগে নিয়ে আসত সুন্দরী নর্ত্তকীদের। সেই সব নর্ত্তকীরা তাদের নিজের নিজের দেশগত নৃত্য ভংগী প্রকাশ করত নবাবের দরবারে। তারপর যখন মুসলমান রাজত্বের অবসান হলো ভারতে এলো পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া, তখন নামেই রইল শুধু "নবাব" দেশ জয় করবার ক্ষমতা আর রইল না। আর্থিক অবস্থাও তাদের হয়ে আস্‌তে লাগল অসচ্ছল, সুতরাং নূতন নর্ত্তকীর সংখ্যা ও আস্‌তে লাগ্‌ল কমে...তখন ছেলেরাই মেয়ে সেজে আরম্ভ করল নাচ্‌তে। এই নাচের ছিল না কোন নিয়ম শৃঙ্খলা। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তবলা বা পাখোয়াজের বোলের

বৃন্দাদীন মহারাজ (কালকা বৃন্দা)

কালিকা প্রসাদ মিশ্র (কালিকা মহারাজ)

সংগে পা মিলিয়ে সাধারণ অংগ ভংগী প্রকাশ করে নবাবের মনস্তুষ্টি...এই ছিল এই নাচের উদ্দেশ্য। আনুমানিক দেড় শত বৎসর পূর্বে লক্ষ্ণৌ নবাবের সভা-নর্ত্তক ছিলেন ঠাকুর প্রসাদ মিশ্র এবং তাঁর পিতা। এঁরা মেয়েদের মত পোষাক পরে নাচতেন নবাবের দরবারে। এই ৺ঠাকুর প্রসাদ মিশ্রের দুই পুত্রই বিখ্যাত কথক নৃত্যের গুরু মহারাজ ৺বৃন্দাদীন ও ৺কালিকা প্রসাদ। কালিকা প্রসাদের তিনপুত্র—অচ্ছান, লচ্ছু এবং শম্ভু মহারাজ, ঐ সংগে দুইজন শিষ্যের ও নাম করা চলে ৺সীতারাম ও রাম দৎ। এই সকল শিল্পীরাই লক্ষ্ণৌর ঘরোয়ানা কথক নাচকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। জয়পুরেরও একরকম কথক নাচ আছে, তবে জয়পুর আর লক্ষ্ণৌর নাচে অনেক তফাৎ জয়পুরের কথক নাচে— যে যত বেশী ঘুরতে পারবে—সেই তত বড় নাচিয়ে। তাতে ভাব রস থাক আর না থাক, কিন্তু লক্ষ্ণৌর কথক নাচে লয়ের কাজ যেমন, তেমনি ভাব রস ও আছে। কিন্তু

দুঃখের বিষয় অনেকের ধারণা কথক নাচে ভাব রস নেই যেমন পূজা সংখ্যা কৃষকে একজন লেখক ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লিখেছেন, কথক নাচে কোন ভাব নেই—আছে শুধু সাতারুর মত হস্ত সঞ্চালন। এখানে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হলো—বই পড়ে নাচের বিচার করা যায় না, নাচ না শিখে, ও ভাল করে না দেখে। মহারাজ বৃন্দাদীন যখন ভাও বাৎলাতেন গানের সংগে তখন দর্শকের মনে ভ্রম হতো—তাকে বৃন্দাবনের সখি বলে। উনি নিজেকে সখী কল্পনা করে যখন গানের অভিব্যাক্তি প্রকাশ করতেন তখন রাজা মহারাজা—নিজের অঙ্গাভরণ খুলে তাকে দিতেন উপহার। যাক কথক নাচ কি এবং কি ভাবে আরম্ভ করতে হয় সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলছি। এই নাচে—শিল্পী প্রথমে সভায় এসে সেলামী বোল বলে নমস্কার করে—এই সেলামী শব্দ হতেই প্রমাণ পাওয়া যায় এই নাচ মুসলমান রাজত্বের সময় হতে। পরে বোল পরম—মুখে বলে পায়ে দেখান হয়, তারপর রাধা কৃষ্ণের গল্প নিয়ে গৎ ভাও এবং সব শেষে নানা রকম ছন্দ করে তবলা বা পাখোয়াজের সংগে পায়ের কাজ দেখান হয়। এই নাচ সধারণত ত্রিতালী তালের সংগেই বেশী হয়। অনেক সময় চৌতাল ঝাঁপ তাল ও নানা রকম কঠিন তালের সংগেও করা। এই নাচ যে শ্রেণীর মেয়েরা নাচে তাদের বাইজী বলেই সকলে জানে। বর্তমানে নৃত্য কলার উন্নতির সংগে সংগে বহু মিউজিক কনফারেন্সে শম্ভু মহারাজ, অচ্ছান মহারাজ ও অন্যান্য শিল্পীদের নাচ দেখে ভদ্র ঘরের ছেলে মেয়েরাও একটু একটু শিখতে আরম্ভ করেছে তবে খুবই কম তাদের সংখ্যা। কারণ এই নাচ খুব কষ্ট সাধ্য। এই নাচের আনুসংগিক তবলা ও সারেঙ্গী। সারঙ্গীতে শুধু একলাইন সোম হতে সোম পর্যন্ত বার বার বাজতে থাকে। শিল্পী সেই গণ্ডীর মধ্যে থেকে নানারকম ছন্দ করে। পোষাক পত্রের মধ্যে ঢিলা পাজামা আচকান উড়নী মাথার জরীর টুপী। প্রবন্ধ বড় হয়ে যাবার জন্য নাচের বোল দিলাম না। তবে যদি কোন পাঠক বা শিক্ষক জানতে চান, রূপমঞ্চের মারফতে। তবে পরে জানাব। এখানে মহারাজ বৃন্দাদীনের নিজের রচিত একটি গান দিয়ে শেষ করি যে গানের অভিব্যক্তি উনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখাতেন এবং দর্শকরাও ভুলে যেত নিজেদের অস্তিত্ব। গানটির সংক্ষিপ্ত অর্থ নিজেকে সখী কল্পনা করে শ্যামকে বলছে—হে শ্যাম আঁচল ছাড়। আমি বলছি আমার কথা মেনে নাও। আমি তোমার দাসী, তোমার সেবিকা আমার সংগে ছলনা করা তোমার উচিৎ নয়। কিন্তু কপট শ্যাম কিছুতেই কথা শুনছে না আমাকে ঘিরে দাঁড়াচ্ছে।

গান

মেরী শুন শ্যাম
ছাঁড় আচড়ওবা
কঁহু মানিলে পেয়ারে
হুঁ তেরী চেরী।
যানে নাহি দেতা হ্যায়
ঢিঠা লাঙ্গারোয়া
বৃন্দা কহত নাহি মানে
শ্যাম ঘেরী॥

রূপ-মঞ্চ পূজা-সংখ্যার প্রতিবাদ

গত পূজা সংখ্যায় কথাকলি নৃত্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ আছে তার শেষে লেখা আছে "দক্ষিণ ভারতের অপরূপ সুন্দরী-নর্তকী বালা স্বরস্বতীও কথাকলি নৃত্যের বিশেষ পারদর্শিনী।"

এখানে আমার বলবার বিষয়, বালা সরস্বতী পারদর্শিনী শুধু ভরতনাট্যম্ নৃত্যে। সে কথাকলি নৃত্যে নয়, আমি বালাসরস্বতীকে খুব ভাল করে জানি, আমি ওর বাড়ী মাদ্রাজে এগমোর নামক জায়গায় অনেকবার গিয়েছি, দেখতে অত্যন্ত মোটা এবং কুৎসিৎই বলা চলে। তবে যখন তিনি নাচেন তখন তার গুণের কাছে রূপের কথা মনে থাকে না। আশা করি লেখক এরকম ভুল হয়ত আর করবেন না।

বাংলা নাটক : দ্বিতীয় পর্ব

অজয় বসু এম, এ

বাংলা নাটকের জাতীয় রূপ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে* আমরা দেখেছি বাংলা নাটকের আদি রূপ ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রভাবে আবর্তিত হয়নি। কিন্তু সে নাটকের আদিরূপ যে বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল, সে পথ রুদ্ধ হ'লো ইংরেজী সভ্যতার আগমনে। আজ আর একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের বর্তমান রূপ ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত। ১৭৯৫ খৃঃ হেরাসিম লেবেডফ ২৫শে নম্বর ডুমাতলাতে 'The disguise' নামক যে বাংলা নাটকটি অভিনয় করেন, তার বিশেষ বিবরণ আর এখন পাওয়া সম্ভব নয়, তবে বিজ্ঞাপন দেখে এবং লেবেডফের হিন্দি ব্যাকরণের ভূমিকা দেখে একথা সঠিকভাবে বলা যায় যে, ঐ সনের ২৭শে নভেম্বর যখন ঐ নাটকখানির প্রকাশ্য অভিনয় হয়, তখন তাতে বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়োগ করা হ'য়েছিল। নাটকখানি খুব জনপ্রিয় হ'য়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কেননা ১৭৯৬ সনের ২৪এ মার্চের Calcutta Gazattee এ লেবেডফ সাহেব "distinguised pratronage, ladies and gentlemen"কে "Wormest thanks" জানিয়েছেন। লেবেডফ সাহেবের নিজের বিবরণ হতেই আমরা জানতে পারি যে, তখনকার দর্শকেরা গম্ভীর ও উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা (তা যতো বিশুদ্ধ ভাবেই প্রকাশিত হোক না কেন) অনুকরণ ও হাসি তামাসা বেশী পছন্দ ক'রতো বলে তিনি চৌকিদার, চোর, উকিল, গোমস্তা ইত্যাদি হাস্যরসাত্মক চরিত্র পূর্ণ নাটক বেছে নিয়েছিলেন। এ সমস্ত কাজের মধ্যে তাঁর ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের প্রভাব যথেষ্ট ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু লেবেডফ থিয়েটারের আলোচনা প্রসংগে দুটি বিষয় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথমত লেবেডফ বিজ্ঞাপনে তাঁর থিয়েটারকে বলেছেন, "Decorated in Bengallee Style." এই বেঙ্গলী ষ্টাইলটি কী? কোন নাট্যমঞ্চ বাঙ্গালী ষ্টাইলে সজ্জিত ছিল একথা বলতে গেলে তৎপূর্ববর্তী কোন বাঙ্গালী নাট্যশালার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয়। তবে কী লেবেডফের সময়ে বাঙ্গালী নাট্যশালার কোন পুরাতন রূপ তখনো বেঁচে ছিল?—না Bengali Style বলতে বাঙ্গালী-মনোরঞ্জক কোন বিশেষ সজ্জা পদ্ধতি মনে করেছেন? দ্বিতীয়তঃ আমরা বিজ্ঞাপনে দেখতে পাই, "The words of much admired Poet Sree Bharot Chondro Ray, are set to music"—অর্থাৎ ভারতচন্দ্র রায় গুনাকরের গান বাদ্য সহযোগে সেখানে গাওয়া হ'য়েছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, ইংরাজি নাটক অভিনয় করবার সময়ও সেই নাটককে জনপ্রিয় করতে ভারতচন্দ্রের গীতের প্রয়োজন ছিল। এইটি তৎকালীন বাংলার প্রমোদ ব্যবস্থার সংগে একটা আপোষ করবার চেষ্টা বলেই মনে হয়। এই দুইটি বিষয় থেকে আমরা একথা বুঝতে পারি যে, বিদেশী প্রভাবে উদ্ভূত প্রথম বাংলা নাটকও বাংলার সংস্কৃতি ও প্রমোদ ব্যবস্থার বহু উপকরণ আত্মসাৎ করে বাংলায় প্রবেশ করেছিল।

যেমন বাংলা নাটকের আদি রূপের সংগে লেবেডফ থিয়েটারের সংগেও যোগসূত্র খুব শিথিল, তেমনি লেবেডফ থিয়েটারের সংগেও পরবর্তী কালের বাংলা নাটক ও নাট্যশালার যোগ অত্যন্ত অল্প। লেবেডফ থিয়েটার বিদেশী বণিকের ব্যবসায় প্রচেষ্টা বলেই, ইতিহাসে এর স্থান পরগাছার মতো, ইতিহাসের জমির সাথে এর কোন যোগ নেই। বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায় বাংলা নাটক অভিনীত হয় এর প্রায় চল্লিশ বছর পর।

১৮১৫ সালের পর থেকে মহাত্মা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে বাংলা দেশে এক নবজাগরণের বন্যা আসে। তিনিই প্রথম সহজ বাংলা গদ্যে ভারতের শাশ্বত চিন্তাধারার সংগে বাঙ্গালীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর বেদান্তভাষ্য, শঙ্করভাষ্য সম্বলিত ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদি গ্রন্থ শুধু বাঙ্গালীর মনে নবজাগরণের সৃষ্টিই করলো না, বাংলা গদ্যকেও কঠিন শব্দ শৃঙ্খল ও সন্ধি-সমাস-প্রবণতা থেকে মুক্ত করে সর্বসাধারণের বোধগম্য সরলতার প্রান্তরে নিয়ে এলো। রামমোহনই প্রথম ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে আন্দোলন

সুরু করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীমকোর্ট [প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই অবশ্য বাঙ্গালীর ইংরাজী শিখবার] উৎসাহ জাগে, কিন্তু সেই উৎসাহে ইন্ধন জোগালেন রামমোহন ও প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড্ হেয়ার সাহেব। এই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ও ডিরোজিও সাহেবের অধিনায়কত্বে হিন্দু যুবকেরা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়ে। সমাজের ওপর অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের বিলাস হ'য়ে উঠ্‌লো। এই ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাবে বিদেশী সংস্কৃতির আমদানী হয় খুব দ্রুত। বাংলার জাতীয় সংস্কৃতি মানসের কোন অভিব্যক্তিই এই সমস্ত ইংরাজী শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের কাছে সমাদর পেল না। ব্রাহ্ম ধর্মের আবির্ভাবে রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের ভিত্তি উঠলো নড়ে।

বাংলার জাতীয় জীবনে যখন এই বিরাট পরিবর্তন আসছিল, তখন নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির আমদানীর সংগে সংগে বাংলার প্রমোদ ব্যবস্থারও রূপান্তর হচ্ছিল। এর আগেই পর্তুগীজদের কাছ থেকে বেহালার আমদানী হয়েছিল এদেশে। আণ্টুনি ফিরিঙ্গী কবিগান গাইছেন; হ্যালহেড সাহেব যাত্রাদলে মিশে অভিনয় করছেন। অন্যদিকে তেমনি রিচার্ডসনের আমলে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা সেক্সপিয়র পড়ে ইংরাজী নাটকের সমৃদ্ধরূপ দেখে চমকে উঠেছে। এর আগেই এদেশে ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও লায়ন্স রেঞ্জের মাঝখানে এবং তৎপরে মিসেস ব্রিষ্টোর থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৩ সনে চৌরঙ্গী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত দেখে হিন্দু কলেজের ছাত্ররাও ইংরাজি নাটকের অভিনয় আরম্ভ করেন। কিন্তু বাংলা নাটকের ও রংগমঞ্চের এসবের স্থান খুব কম। সাধারণ লোকে ছাত্রদের ইংরাজি থিয়েটার কি চক্ষে দেখতো তার নমুনা পাওয়া যাবে সমাচার দর্পণে জনৈক দর্শকের পত্রে—"অধিকন্তু সুখের বিষয় ইঁহারা ধনি লোকের সন্তান, ইঁহাদিগকে প্রতি পদে পেলা দিতে হইবেক না, কালি-দমুনের ছোঁড়াগুলা সর্ব্বদাই টাকা পয়সা চাহে, তাহারা পয়সা বা সিকি আধুলি না পাইলে দর্শকদের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গভঙ্গ করে, সম্মুখ হইতে যায় না, সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয়, এ রকম যাত্রায় সে আপদ্ নাই।" প্রসন্নকুমার ঠাকুরের "হিন্দু থিয়েটারে"ই প্রথম বাঙ্গালীদের দ্বারা ইংরাজি নাটক অভিনয় করানো হয়।

এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো অবস্থিত, সেইস্থল নবীনচন্দ্র বসুর বাসা ছিল। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় প্রথম বাংলা নাটক ঐ স্থানেই অভিনীত হয়। যতদূর জানা যায়, উক্ত নাট্যশালায় প্রতি বৎসর চার পাঁচটি করে বাংলা নাটকের অভিনয় হ'তো। সমস্ত নাটকের বিবরণ এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এখানে বিখ্যাত বাংলা উপাখ্যান "বিদ্যাসুন্দর" অভিনীত হয়েছিল, তার বিবরণ আমরা পাই। এই নাটকেই আমরা প্রথম অভিনেতার ও অভিনেত্রীর নাম পাই: সুন্দরের ভূমিকায় শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদ্যার ভূমিকায় রাধামণি বা মণি। এই অভিনয় দেখে হিন্দু পায়োনিয়ার পত্রিকার উক্তি উল্লেখযোগ্য, "দেশব্যাপী অজ্ঞানের মধ্যে এইরূপ অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার ঘটিতে পারিয়াছে, তাহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই সকল বালিকাদের দেখিয়া কি, দেশীয় দর্শকেরা তাঁহাদের স্ত্রী ও কন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন না?"

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায়। এতদিন পর্যন্ত ইতস্ততঃ বিভিন্ন নাট্যশালায় ইংরেজি নাটক এবং কদাচিৎ বাংলা নাটক অভিনয় হচ্ছিল, তার কোন রকম সুসংহত শক্তি ছিল না। এর কারণ বাঙ্গালীর রুচি তখনও নাট্যরসের

সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। এতদিন হাফ-আখড়াই, গোপাল উড়ের টপ্পা, এবং খেউড় গানের পর হঠাৎ এই উন্নত রুচি নাট্যরসবোধ অর্জন করতে কিছুটা সময় লাগা স্বাভাবিক। একথা সত্যি হলেও, অন্য কারণও রয়েছে। এই সব ইংরাজি নাটকে বাঙ্গালীর পিপাসা পূর্ণ হতো না। সমাজের সাথে গূঢ় ভাবে যোগাযোগের সম্ভাবনা না থাকলেও সমাজসত্তা নাটকের কাছ থেকে কিছুটা বাস্তবতা আশা করে; এই বাস্তবতার প্রধান বিঘ্ন ছিল ভাষা। সেইজন্য বাংলা ভাষায় যতোদিন নাটক লেখার উপযুক্ত গদ্য তৈরী হয়নি, ততদিন নাটকের উৎসাহ কৃত্রিম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ১৮৫০ এর পর থেকে বাংলা গদ্য তার পরিপূর্ণ স্বস্বরূপ গ্রহণ করতে পেরেছিল। আমাদের ভাষায় নাটক তৈরি হবার অনুকূল আবহাওয়া কায়েম হবার আগেই ইংরেজি নাটক এদেশে প্রবেশ করে বলেই প্রথম যুগের নাটক কৃত্রিম ও কাঠামো সর্বস্ব হয়ে পড়েছিল।

বাংলা নাটকের নব জাগরণের প্রথম প্রমাণ আমরা পাই ১৮৫৭ খৃঃ ৩০শে জানুয়ারী তারিখে সাতুবাবুর বাড়ীতে নন্দকুমার রায় লিখিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" নাটকে। চারিদিকের ইংরেজি নাটকের মধ্যে এই বাংলা নাটকের অভিনয় প্রচেষ্টা তৎকালীন সংবাদপত্রগুলির দ্বারা বিশেষ অভিনন্দিত হইয়েছিল।..."উৎসাহের বিষয়—যে নাটকটি অভিনয় হইবে, উহা একটি সত্যকার বাংলা নাটক"... (হিন্দু পেট্রিয়ট, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭...) "প্রতি বৎসর ইংরাজী কবি সেকসপিয়র নাট্যক্রীড়া ইস্কুলের ছাত্রেরা প্রায় করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ এরূপ বাংলায় নাট্যক্রীড়ার চেষ্টা করেন নাই"... (সমাচার চন্দ্রিকা, ৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৭)।

সাতুবাবুর বাড়ীর নাটক অভিনয়ের পর আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক কোলকাতায় অভিনীত হয়। সেটি হচ্ছে নূতন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নাটক"; রচনা—রামনারায়ণ তর্করত্ন। এই "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নাটকের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সামাজিক নাটক। কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে এই নাটক লিখিত। "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নাটক" রামনারায়ণ তর্করত্নকে তৎকালীন নাট্যকারদের মধ্যে প্রধান বলে প্রতিপন্ন করে। এই নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল, এবং বার বার এর অভিনয় হয়েছিল। এই নাটকই প্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিল।

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তার ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ উভয়েই নাট্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁদের উৎসাহে "বেলগাছিয়া নাট্যশালা" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরাজী শিক্ষিত অভিজাত মণ্ডলের বহু গণ্যমান্য লোক এই নাট্যশালার সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে রাজারা তাঁকে আহ্বান করেন তাঁদের রঙ্গমঞ্চে নাটক লিখবার জন্যে। রামনারায়ণ লিখলেন "রত্নাবলী" নাটক, প্রথম অভিনয় হয় ৩১শে জুলাই, ১৮৫৭। এই নাটক অভিনীত হবার পর একটা বড়ো রকমের সাড়া পড়ে যায় কোলকাতায়। সকলের মুখে এক কথা, এরকম নাটক নাকি আর দেখা যায়নি এর আগে। দৃশ্যসজ্জা, মেক-আপ, অভিনয়, সুর সংযোজনা সবই নাকি হয়েছিল অপূর্ব! এখানেই প্রথম দেশীয় ঐক্যতান বাজনা প্রবর্তিত হয়। এক রত্নাবলী অভিনয়ের জন্যই রাজারা দশ হাজার টাকা (তখনকার দিনের) খরচ করেন। বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরও পর্যন্ত অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালার কীর্তি "রত্নাবলী" নাটকের সাফল্যপূর্ণ উৎসবে নয়। রত্নাবলী নাটকের মহলায় একদিন বাংলার এক বিদ্রোহী সন্তান একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন—তাঁরই ভাষায়—

"অলীক কু-নাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

তাই অবিশ্বাসীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তিনি সত্যি-কারের নাটক লিখবার সংকল্প গ্রহণ করেন। সেই চ্যালেঞ্জের ফলেই বাংলায় নাটকের নব যুগের সৃষ্টি হ'লো, নাটক হ'লো পরিপূর্ণ, তাতে এলো প্রাণ প্রবাহ, এলো নাটকের শ্রেষ্ঠ রস—ট্রাজেডি।

যে বিদ্রোহী সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বার-এট্-ল।

* পূজা সংখ্যা "রূপ-মঞ্চ"

সোভিয়েট চলচ্চিত্র

সি, ডে, লা, রোচ

বর্তমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের সংগে সংগে সোভিয়েট চলচ্চিত্রের একটা যুগের অবসান ঘটলো। এই সময়টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এইজন্য, যখন চলচ্চিত্র শিল্প তার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছিল—জাতির যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করে তুলতে। যদিও যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে সব ফিল্ম তৈরী হ'য়েছে, উৎকর্ষের দিক থেকে চলচ্চিত্র শিল্পের যে তা উন্নতির সাক্ষ্য দেবে তা নয়—জার্মান অভিযানের পূর্বে সোভিয়েট রাশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্প যেভাবে উন্নতি লাভ কচ্ছিল—যুদ্ধ যে তার সেই গতিপথকে অনেকখানি রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, যুদ্ধের এই দ্রুত পরিণতির জন্য সোভিয়েট চলচ্চিত্র-শিল্প সাহায্য করেছে অনেকখানি। সোভিয়েট চলচ্চিত্র-শিল্পের গতি জাতীয়-জীবন এবং চিন্তাশক্তির সংগে নিগূঢ় সম্পর্কে বাঁধা। চলচ্চিত্র এবং জনসাধারণের সংগে যে সম্পর্ক তা যেন নাড়ীর সম্পর্ক। এরূপ অন্তরের যোগ আর কোন দেশে পরিলক্ষিত হয় না। অধ্যাপক ইসেনষ্টিন তাই জনসাধারণের সম্পর্ককে 'অর্গানিক ইউনিট' (Organic Unit) বলে অভিহিত করেছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রে চলচ্চিত্র শিল্প যে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানলাভে সমর্থ হয়েছে পৃথিবীর আর কোন দেশে তা পায়নি।

সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পের অতীতের কোন গৌরবময় ইতিহাস ছিল না—বলতে গেলে তার কোন উল্লেখযোগ্য অতীতই ছিল না। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের সংগে সংগে তার জন্ম। সোভিয়েট রাষ্ট্রের ইতিহাসের সংগে তার সম্পর্ক তাই অবিচ্ছিন্নও অচ্ছেদ্য। সোভিয়েট রাশিয়াতে প্রথম যখন চলচ্চিত্র শিল্পের জন্ম হয়—ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি অথবা সমসাময়িক ঘটনাগুলিকে রূপায়িত করাই ছিল তার প্রধান কাজ—এবং বহুদিন পর্যন্ত এই 'ডকুমেণ্টারী' চিত্রগুলি 'Fiction' চিত্রগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে এবং প্রথম থেকেই জনসাধারণ চিত্র প্রযোজনায় অংশ গ্রহণ করে আসছেন। বিশেষ করে ইসেনষ্টিনের চিত্রগুলিতে জনতার বিশেষ স্থান দেখতে পাই। আজকালও জনসাধারণ চিত্র নির্মাণের প্রথম ধাপ থেকে শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করে থাকেন। চিত্র নির্মাণ-শালাগুলি বিভিন্ন ইউনিয়ন দ্বারা পরিচালিত হয়। চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবসায়ক্ষেত্র—প্রযোজনা—পরিবেশনা প্রত্যেকটি বিভাগ মস্কোর 'দি অল ইউনিয়ন সিনেমা কমিটি' দ্বারা পরিকল্পিত ও পরিচালিত। মস্কো এবং লেনিনগ্রাদের বড় বড় প্রয়োগশালাগুলির কথা বাদ দিলেও নিউজরীল, ডকুমেণ্টারী প্রভৃতি চিত্র নির্মাণের জন্য পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কিয়েভ, মিনস্ক, টিবিলিসি, আলমা আটা মোটকথা অন্যান্য ন্যাশনাল রিপাবলিকেও বিভিন্ন প্রয়োগশালা নির্মিত হয়েছে। জনসাধারণ ও চলচ্চিত্রের নিবিড় যোগাযোগ প্রসারের এও আর একটা কারণ।

অতএব দেখা যাচ্ছে, জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের কয়েক বছর তার উন্নতিতে সোভিয়েট ফিল্মের অবদান প্রচুর—সে ফিল্ম পৌরাণিক কাহিনী, ঐতিহাসিক কাহিনী অথবা সমসাময়িক জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠুক না কেন, জাতীয় জীবনের সংস্কার সাধনের মূলে সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পের অবদান অস্বীকার করা চলে না কোন মতেই। যে কোন চিত্রের বিষয় বস্তু এবং তার রূপ সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার দিক বিচার করেই গৃহীত হ'তো। "The first major development of the feature film was in the direction of historical re-construction of recent events or the interpretation of their impact on human life in realistic fiction (Eisensten's Batteeship Potemkin, Poudovkin's Mother)." সবাক চিত্রের আবিষ্কারের সংগে সংগে সোভিয়েট চলচ্চিত্রে নায়ককে খুব সাহসী এবং উদার মনোভাব সম্পন্ন করে আঁকা হ'তো। এই চরিত্র চিত্রণে খানিকটা প্রাচীন কাল্পনিক কাহিনীর ছাপ থাকতো। এই সব চিত্রের দৃশ্য পট, রূপসজ্জা, যেমনি ছিল জাকজমকময় তেমনি কাহিনীকে

সুষ্ঠু ভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে এগিয়ে নেওয়া হ'তো—এবং এক একটী চরিত্র প্রতীক রূপে অংকিত হ'তো। সোভিয়েট চলচ্চিত্রের এই প্রতীক চরিত্রগুলি আকস্মিক নয়। সোভিয়েট শিল্প প্রয়োজনবোধেই এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের মধ্যদিয়ে মায়াবাদকে প্রচার করে। চরিত্র চিত্রণে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের কোন স্থান ছিলনা। কারণ চরিত্রগুলিকে সমাজ জীবনের সংগে যোগ রেখে মূর্ত করে তোলা হ'তো। এই চরিত্র সৃষ্টি থেকে অনেকে মনে করতে পারেন—সমস্ত জাতিটাই বুঝি এরূপ প্রতীকে প্রতিফলিত—চরিত্রগুলির বুঝি কোন ব্যক্তিত্বই নেই —তাই যদি কেউ করেন, তাহ'লে খুবই ভুল করবেন।

এরপর এলো চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির দ্বিতীয় সোপান। নূতন নায়কের সন্ধান আরম্ভ হ'লো। সমাজ জীবনে ব্যক্তিত্বশালী সবল নায়কের সন্ধান আরম্ভ হ'লো এই সময়। এবং এর পরিচয় আমরা পাই অনেক জীবনী-মূলক চিত্রে। যেমন Vassiliev Brother এর Chapaev চিত্র, Donskoir Gorki Trilogy চিত্র। প্রভৃতি চিত্রের চরিত্রাঙ্কণের প্রশংসা না করে পারব না।

১৯৩০-এর শেষের দিক থেকে সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি আশাতীতভাবে প্রসার লাভ করেছে। এই সময় থেকে নতুন নতুন শিল্পীদের আবির্ভাব এবং বিকাশ দেখতে পাই—। তবু এর সমালোচনার অন্ত নেই—Pudovkin এবং আরো অনেকে এর অতি বাস্তবতার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত না করে পারেননি। সোভিয়েট চলচ্চিত্রের ভিত্তি স্থাপিত হ'য়েছে সমাজতন্ত্রের বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে—এই উপযুক্ত সময় যখন সকলের দৃষ্টি পড়লো একে প্রকাশভংগী এবং অন্যান্য দিক থেকে নিখুঁত রূপ দিয়ে সমস্ত পরিকল্পনাকে মূর্ত করে তুলতে। কিন্তু এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের সোভিয়েট চলচ্চিত্রে শিল্পের ইতিহাসের পাতা নিয়ে যখন বসা যাবে, তখন যদি তার একটা ধারাবাহিক গতি পরিলক্ষিত না হয় তা হলে কেউ যেন মনে না করেন —এই পঁচিশ বৎসর সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পকে নিয়ে কোন সুচিন্তিত পরীক্ষাই চলেনি। বরং এই অভিযোগ খণ্ডন করবার সপক্ষে Dovzhenko'-র Earth বিরাট চিত্রখানির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যুদ্ধোত্তর কালেও আমরা ঠিক এরূপ সমতালে সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পকে অগ্রসর হ'তে দেখেছি। ডকুমেণ্টারী চিত্র থেকে ঘটনাবহুল চিত্রের পুনর্গঠনে চরিত্রানুশীলন আরও আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে তোলে। জার্মেনীর অভিযান যেন সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পকে অকস্মাৎ এক ধাক্কা মেরে দিল। ওয়েষ্টার্ণ রিপাবলিকের সমস্ত প্রয়োগশালাগুলি—এমন কী মস্কোর বৃহত্তম প্রয়োগশালাটীও—সেণ্ট্রাল এশিয়াতে যেয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো। এই সময় নিউজরীল ইউনিটের নাম সর্বাগ্রে বলতে হয়—যারা তথ্য সংগ্রহ করে অদ্ভুতভাবে সকলের আগে চিত্র প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়। (—and of such terrible significance, that for a while no treatment of them others than the documentary seemed appropriate.)

"One day of war" একখানি পূর্ণাংগ ডকুমেণ্টারী চিত্র —এই চিত্রখানি গ্রহণের জন্য ১৬০ জন চিত্র-শিল্পীর প্রয়োজন হ'য়েছিল। এবং যুদ্ধকালীন চিত্রগুলির ভিতর এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। সোভিয়েট রাশিয়ার খ্যাতনামা পত্রিকা প্রাভদা এর সমালোচনা প্রসংগে যুদ্ধ-চিত্র সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত এবং চাহিদার কথা বলতে যেয়ে লিখেছিলেন, "Art must always be Truthfull. In war time it must be particularly truthfull. Because the authors of the film succeeded in showing the most important thing—the spiritual strength of the nation and its faith in victory—they were able to show likewise the monstrosity and agony of war."

"শিল্প সব সময়ই সত্যকে প্রকাশ করবে। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় তাকে কেবলমাত্র সত্যকেই প্রকাশ করতে হবে। এই চিত্রখানির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে কর্তৃপক্ষ কৃতকার্য হ'য়েছেন— এবং সে বিষয়টী হ'চ্ছে জাতির নৈতিক শক্তি এবং সুনিশ্চিত জয়ের আত্মবিশ্বাস —কর্তৃপক্ষ এই সত্যই যেমনি চিত্রখানিতে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন—তেমনি পেরেছেন যুদ্ধের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা ফুটিয়ে তুলতে।" লালফৌজের বীর সেনারা— কলকারখানার মেয়েরা ছবি দেখে বুঝতে পেরেছিলেন —তাঁদের আত্মত্যাগের কথা সবই চিত্রে ফুটে উঠেছে—কিছুই অস্পষ্ট রয়নি। প্রত্যেকটী প্রধান প্রধান বিষয়গুলিকে নিয়েই ডকুমেণ্টারী চিত্র গৃহীত হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সম্মেলন, জার্মান মুক্তাঞ্চলের জার্মানীর মৃত্যু-শিবির, খারকোভের প্রথম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রভৃতি বিষয় এই ডকুমেণ্টারীতে স্থান পেয়েছিল এবং এই যুদ্ধ চিত্রগুলি যুদ্ধের বাস্তব রূপ নিয়েই দেখা দেয় দর্শক সাধারণের সামনে।

এই ঘটনাগুলি এবং জনসাধারণের প্রতি তাদের দুর্জয় প্রভাব কেবলমাত্র 'feature films'এর ভিতর দিয়েই ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। এবং অতীতের মত চরিত্রগুলিকে এক একটী প্রতীক রূপে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করা হয়। এবং বিভিন্ন দলীয় শক্তির অমনণীয় মনোভাব দেখতে পাই Donskoiর 'Rainbow'তে। Lukovএর Two Soldiers চিত্রে ফুটে উঠেছে লালসেনার বন্ধুত্ব ও দুর্জয় সাহসীকতার কথা। এই গল্পগুলির চরিত্রগুলি তাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হ'য়েছে এইজন্য যে, সহস্র সহস্র লোকের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আদর্শকে তারা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হ'য়েছে। এই জন্যই সোভিয়েট সমালোচকদের প্রশংসা বাণীতে এই সব চিত্রগুলি অভিনন্দিত হ'য়েছে। নূতন মানুষের আবির্ভাব হয়েছে—তাদের অন্তরের বাণীকে —বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ঘাত প্রতিঘাতকে যেরূপ ভাবে যুদ্ধকালীন চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে ইতিপূর্বে তা হ'য়েছে কিনা সন্দেহ। The New Teacher and Masquerade এর পরিচালক এস, গারেসিমোভ (S. Gerasimov) লিখেছিলেন, আমাদের প্রত্যেকটী যুদ্ধরত লোকের উল্লেখযোগ্য জীবনী রয়েছে—বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত সে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণ করছে এবং প্রত্যেকেই সাহস এবং শক্তিবলে বিভিন্ন পথ বেয়ে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে সমর্থ। "Every one of our fighting men has a biography, a complicated detailed life, and each of them finds his way to courage along different roads."

যুদ্ধের সময় চিত্রনাট্য রচনার জন্য মস্কোতে পৃথক ষ্টুডিও গড়ে উঠেছিল—চিত্রনাট্যকারদের এবং নূতন প্রতিভাকে সাহায্য করবার জন্য। ১৯৪৪ খৃঃ স্থানান্তরিত ষ্টুডিওগুলি আবার স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে। আরো বেশী উদ্যমে কাজ চলে। সোভিয়েটের সমালোচকেরা আরও বেশী সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে পরবর্তী চিত্রের চরিত্র-সৃষ্টির বিচার করেন। এই পরবর্তী চিত্রগুলির ভিতর S. Gerasimov এর Mainland এবং I. Pyriev এর 6 P. M. and After the War উল্লেখযোগ্য। এই সময় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক চিত্রও নির্মিত হয়। V. Petrov (যিনি Peter I পরিচালনা করেছিলেন) এর Kutuzov চিত্রখানি ঐতিহাসিকগণ অনুমোদন করেন।

সমালোচকেরাও এই চিত্রের জেনারেলের চরিত্রাঙ্কন এক বাক্যে প্রশংসা করেছেন। S. Eisensteins এর Ivan the Terrible এর কথাও উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রখানিতে জারের চরিত্র এবং রাশিয়ার ইতিহাসে তার বৈশিষ্ট্যকেই নূতন করে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে। যদি যুদ্ধ আরো চলতো—এবং দেশাত্মবোধক চিত্রগুলিই প্রাধান্য লাভ করতো—তাহলে হালকা চিত্রগুলিকে যে বাদ দেওয়া হ'তো একেবারে, তা যেন কেউ মনে না করেন। এই নিয়ে যে বাকবিতণ্ডার দৃষ্টি হয়েছে সংক্ষেপে S. Gerasimov তার একটী সুন্দর উত্তর দিয়েছেন।

"In wartime the existence of every style known to art is justifiable." যুদ্ধ সময়ে যে কোন কিছু শিল্প বলে পরিচিত তার প্রয়োজনীয়তা সব সময়েই স্বীকৃত হবে। G. Alexandrov এর Volga. J. Protazanov এর Adventures in Bokhara. প্রভৃতি কমেডি চিত্রগুলির কথা বাদ দিলেও এই ধরণের আরও বহু চিত্রই দেখতে পাই।' "... and the deficiency is an old problem for soviet films. studios"

হাস্যরসাত্মক রচনার লেখকদের উৎসাহ দেবার জন্য ১৯৪৪ খৃঃ Script Studio থেকে হাস্যরসাত্মক চিত্র নাট্যের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এবং ১৯৪৫ খৃঃ চিত্রগুলির উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

এই পরিকল্পনা যেমনি ব্যাপক তেমনি চিত্তাকর্ষক। যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের পটভূমিকায় এবং ঐতিহাসিক চিত্রের প্রভাব চিত্র জগতের ওপর এখনও বেশী সে কথা ঠিক, কিন্তু জীবনী চিত্র, কৌতুক চিত্র, এবং পৌরাণিক চিত্রের ওপরও কম দৃষ্টি দেওয়া হয় না। যুদ্ধের সময় S. Ivannov এর 'Sterescopic—system' আরো নিখুঁত রূপ লাভ করেছে। এবং রবিনসন ক্রুসো'র কাহিনী অবলম্বনে এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে চিত্র গ্রহণের সংবাদও আমরা রাখি। সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পের প্রসারের গতি কেবল সুরু হয়েছে। সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের কর্মীরা যেন খুব বেশী মাত্রায় সচেতন হ'য়ে উঠেছেন। এবং যুদ্ধের জন্য চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবসায় এবং শিল্পোন্নতির গতি যে মন্থর হ'য়ে উঠেছিল বর্তমানে তা যেন শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে যে সব চিত্র নির্মাণ শেষ হ'য়েছে—সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরের দর্শকসাধারণ সোভিয়েট জনসাধারণ সম্পর্কে তা'থেকে যেমনি একটা ব্যাপক ধারণা করতে সমর্থ হবেন, তেমনি গোড়ার দিকের চলচ্চিত্র থেকে বর্তমানের চিত্রগুলি অনেক কিছু অসাধারণত্বের কথা প্রকাশ করবে সোভিয়েট জনসাধারণ সম্পর্কে।

"দি স্পেকটাটর"

দে ব দা সী চিত্রে :—
শ্রীমতী মণিকা দেশাই
রূপ-মঞ্চ : ১৩৫২

একদিন কা-সুলতান চিত্রে—

লাস্যময়ী মেহ্‌তাব

রূপ-মঞ্চ : ১৩৫২

আমাদের ছায়া-চিত্র

বারীন দাশগুপ্ত

ছায়াচিত্র আমাদের দেশে যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় এর প্রসারতা যেমনি একটা বৃহৎ সত্বার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে জনসাধারণের চাহিদাকে মুখর ক'রে তুলেছে, সাথে কোরে তেমনি এনেছে যুগান্তরও। ব্যবসার কথা ছেড়ে দিয়ে সিনেমার ভিতর দিয়ে এমন শিক্ষা জনগণের ভিতর প্রচলন করা চলে, যার অনুগ্রহে জাতি আগামী কালের পথে নিজেদের দুর্বলতা ও অভাবের কথা ভাববার অবসর পায় ও প্রতিকারের পথও খুঁজতে শেখে।—কিন্তু সে পথে চলবার পিপাসা থাকলেও অনেক বাধা এসে পিপাসার কণ্ঠ চেপে ধরে ব'লেই নিছক ব্যবসার মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্যবসাকে বাঁচাতে গিয়ে লাভের টাকা ঘরে এলো কিনা সেদিকে গাঢ় ও আন্তরিক নজর দিতে গিয়ে আজকাল বাজারে দেখা যাচ্ছে প্রায় সব বইর পিছনে ঐ একই পরিকল্পনা ও মনোবৃত্তি। প্রতিষ্ঠান বাঁচার জন্যে যতটা ব্যাকুল ব্যস্ততা নিয়ে তাড়াহুড়া দেখা যায়, দেখা যায় না ততোটা আগ্রহ, বইর সত্যিকারের প্রাণ ফুটিয়ে তোলার দিকে আন্তরিক দৃষ্টি।

বইর সকল কথা ও আলোচনার পিছনে র'য়েছে ভালোবাসাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ক'রে প্রতিষ্ঠা করা এবং মিলনের আঙিনায় এসে হ'বে প্রতিষ্ঠিত। সংসারের প্রতিদিনকার ওঠা-নামার ভিতর ভালোলাগা ও ভালো-বাসার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে এবং তার জন্যে তাকে নানাভাবে পরিবেষণ করাটাই হবে একমাত্র লক্ষ্য। সমাজের বা অভিভাবকদের শাসনে নিভৃতের চোখের জলকে সাদরে সম্মুখে টেনে এনে তার সম্মান দিতেই হবে—এই ব্যাকুল প্রচেষ্টা সত্যিই চমৎকার। কিন্তু তার ভিতর নতুন দৃষ্টির একান্তই অভাব, যার জন্যে আজকাল প্রায় বইতেই আসছে একটা বিশ্রী ধরণের "Monotony" এই Monotonyর রাজত্বে ছায়া চিত্রের প্রতিপত্তি Stagnation এসে দাঁড়াতে পারে। সেটা reaction-এর জন্য না হোলেও—না পাওয়ার শ্রীহীন অভাবে।

মনে হয় না House full বা পঞ্চাশ বা একশ সপ্তাহে বা জুবিলী সপ্তাহের উপর বইর মর্যাদা নির্ভর করে। ঐ সপ্তাহ গুনে কেবল লাভের হিসাবই নির্ধারণ করা যায় অন্যদিকে বিচার করলে ঐ 'জুবিলী'র মর্যাদা দেওয়া মুস্কিল হ'য়ে ওঠে। দেখা যায় যে, কোন জিনিষ Propa-gandaর সাহায্যে তার কাট্‌তি বেশ চলে, অপর দিকে আমাদের দেশে Cheap amusement এই ছায়াচিত্র ছাড়া আর এমন কিছুই নাই—যা সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম আমরা ঐ অল্প পয়সায় বেশ লাঘব করতে পারি। House full বা গুণ্ডাদের কাছ থেকে বেশী দামে টিকিট কেনা বইর মর্যাদার মাপকাঠী কোন দিক দিয়ে হতে পারে না। বইর পরিবেষণের পিছনে এই monotonyকে ভেংগে দিয়ে এমন এক নতুন দৃষ্টি ভংগির প্রয়োজন যা মনের কাছে যথার্থ আসন দাবী করতে পারে এবং কোন অবসাদ না আনে। অবসাদ ক্রমশঃই মুখর হোয়ে উঠছে। কারণ নায়কনায়িকার মিলনের ভিতর প্রেমের যে আকর্ষণ সে প্রেম যদি সস্তা হোয়ে ওঠে সেখানে বইর Standard যে নেমে আসবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে এমন Stageএ নেমে আসে যা চিবান আকের মত প্রাণহীন, রসহীন। তবে ঐ সস্তার বাজারে যাঁরা অভিনয় করেন সেখানে তাঁরা হয়তো সুনিপুণ ভাবেই সম্মান রেখে চল্‌ছেন কিন্তু তাঁদের ঐ অভিনয়ের ভিতর মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে নজর যখন পড়ে তখন মনটা অবসাদে ভরে ওঠে। থিয়েটারের মঞ্চ হতে ছায়াচিত্রের দিকে দৃষ্টি পড়লেই আমাদের স্বতঃপ্রণবিত হয়ে এই ধারণাটাই আসে যে Natural environment গুলো ঐ সব চিত্রের বিশেষ অংগ। অভিনেতাদের সেখানে বেশ বড় রকমের সুবিধা। প্রেম আমাদের কাছে খুবই আদর্শময় এবং এর বিরাট তেজোময় স্বরূপ ধ্যানালোকে উপলব্ধির মত এবং যে অনুভূতি ও ত্যাগ দ্বারা সে প্রেমকে জয় করা দরকার, কর্মযাত্রার পথে সাংসারিক আদান প্রদানের ভিতর অন্তরের যে বিকাশের একান্ত প্রয়োজন প্রেমকে মূর্ত

কোরে তোল্‌বার, ছায়াতে নায়ক নায়িকার সে অনুভূতি যেন খুবই হালকা বলে মনে হয়।

লেখকদের এর জন্য এক দিক দিয়ে দায়ী করা চলে। ডাইরেকটারদের ব্যাকুল তাড়নায় লেখক দু' পয়সার লোভে যেন-তেন প্রকারে বই লিখে ছেড়ে দিলেন। আদা জল খেয়ে ডাইরেকট'র অমনি Casting শুরু কোরে Shootingএর ব্যবস্থায় নেমে গেলেন। লেখকের বই-খানায় কিছু না থাক্‌লেও চলবে, কারণ সাহিত্যের বাজারে যে তাঁর প্রতিপত্তি রয়েছে। ঐ যশ ও খ্যাতির বিনিময়ে বই পর্দায় নেমে এলো। জোর করেই যেন বইর আদর করতে হয় এমনি এবং বইর ভিতরকার প্রাণ ফুটিয়ে ওঠাবার জন্যেও নিজের ডিরেকশনের কৃতিত্ব আনবার জন্যে এমন তার পরিবেষণ হয় যে তাতে তাঁরা সত্যি কোরে বুঝিয়ে দিতে চান যে, Culture আমাদের নেই—broad outlookও তেমনি। আদর্শ যেন সেখানে অনেক নেমে আসে। ভালোবাসা জানাবার যে শুভ মুহূর্ত নায়ক ও নায়িকা পেল, সেখানকার আবহাওয়া যে প্রকারই হউক না কেন তাদের প্রেম সংগীতের প্রতিটি লাইনের সংগে সংগে যে ভাবে তারা ছুটোছুটি ক'রে থাকেন এক প্রজাপতির মত পাখা উড়িয়ে জান্‌লার পাশে—কখনও বা কোন উলংগ মৃন্ময়ী নারী মূর্তির পাশে, কখনো বা গানটি শেষ কোরে ভাবের ব্যাকুল উন্মত্ততায় বিছানায় নিজেকে একেবারে এলিয়ে দিয়ে—এমনি ভাবে আর্টের যে পরিবেষণ হয়ে থাকে এটা যে কতদূর সৌন্দর্যপূর্ণ তা বিবেচনার বিষয়, ঠিক এমনিভাবে ভালোবাসা বা প্রেম নিবেদন আমাদের কোন ঘরে সম্ভব হয় কিনা আমাদের জানা নেই। বর্তমানে কোন এক খ্যাতনামা ডাইরেকটার মশাইকে এই art সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি শুধু decryই করলেন না, আরো বললেন, 'এসব যে আমাদের আরো পিছিয়ে দেয়।' মেয়েটি এসে তার ভালোবাসার মালিককে পেলো প্রকাণ্ড লেবো-রেটরির ভিতর ("ডাক্তার")—সেখানে তারা ছুটোছুটি সুরু করলো—চোখে লাগে মনেও ধরে না—অথচ

কতো উচ্চাঙ্গের সে বই! ভালোবাসা ও প্রেমের পিছনে Sex এর appeal থাকলেও তাকে cheap কোরে দিয়ে বইর মর্যাদাকে পাওয়া কঠিন। সেখানে ঐ প্রেমকে অপমান করা হয় কেবল।

সাহিত্যিকরা এক পা দু'পা কোরে ছায়া চিত্রের দরজায় এসে হাজির হোচ্ছেন। সাহিত্যের বাজারে তাঁদের লেখনী যে দাম আমাদের কাছে পেয়ে আসছে এবং সেখানে তাঁদের যতোটা প্রয়োজন সে প্রয়োজন, কি তাঁরা বুঝতে পারেন নি? যার জন্য টাকার লোভে এখানে এসে অতৃপ্তমন নিয়ে বই তৈরী করার পরও ডাইরেকশন দিতেও কুণ্ঠা বোধ কচ্ছেন না? বই লেখা আর ডিরেকশন দুটো আলাদা থাকলে খুটিনাটির ভিতর দিয়ে পরিবেষণের দিক দিয়ে বই নিখুঁত হবার সম্ভাবনা থাকে। লেখক পিছনে থেকে ডাইরেকটারকে সময়োপযোগী প্রয়োজন মত সাহায্য করতে পারেন—ডাইরেকটার চিন্তার প্রাচুর্য নিয়ে কাজে এগিয়ে আসতে পারেন। অর্থের দিকে টান থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক হোলেও দেওয়া ও লোকের পাওয়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। মান ও প্রতিপত্তি যে ঐ পাওয়ার দিক থেকেই আসবে। ডাইরেকটার লেখককে তাঁর পারিশ্রমিকের চেকখানা ছেড়ে দিয়ে সম্বন্ধ চুকিয়ে নিলেন। ভুলের বোঝা ঐখান থেকেই সুরু হোলো—এবং চোখে এসে ঠেকলো—আমাদের এই বাঙ্গলাদেশের কৃষক লাঙ্গল কাঁধে করে মাঠের বুকের পাশ দিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছে—তার পরিধানে under-wear, মাথার চুলে hair-cream, মাথা back-brash করা, ধুতীখানাও চমৎকার পরিচ্ছন্ন—প্রশ্ন সেখানে এরকম কৃষক বাঙলা দেশে কটি আছে?—রান্না করবার সময় কোন মেয়েকেই দেখা যায় না পা'র গোড়ালী অবধি ঢেকে রান্না করতে—মনে হয় তিনি রান্না ঘরে কোন দিন ঢোকেন নি। অনাহার ক্লিষ্ট মরন্মুখ একটি লোক যার প্রতি মুহূর্তেই নিঃশ্বাস আটকে যাবার ভয় রয়েছে, সে দোতালার ছাত হোতে লাফ দিয়েও মরলো না, বা মাথা ফাটল না। সহরের ছেলে গাঁয়ে ডাক্তারী করতে গিয়ে যে মেয়ের সংগে তার দেখা—গ্রামের ঐ সমাজের ভিতর তাদের প্রেম নিবেদন করবার যে জায়গাটি তাঁরা বেছে নিল সেখানে তারা দুজনে একই গান গাইছে—এমনি ভাবে অনেক প্রশ্নই মনে জাগে এবং মূর্ত হোয়ে ওটে। একটা keen observation থাকা দরকার। লেখকের কাছ হ'তে বই হাতে নিয়ে ডাইরেকটার টাকার অঙ্কের দিকে এত বেশী চিন্তাশীল হ'য়ে পড়েন যে, বইর সুনিপুণ পরিবেষণের দিকে তাঁদের নজর ঝিমিয়ে আসে। বইর মর্যাদা বর্তমানে জহর গাঙ্গুলী, অহীন চৌধুরী, সুনন্দা দেবী, মলিনা দেবী ইত্যাদি না থাকলে আসরে জমবে না—টিকিটও বিক্রী হবে না। এটা নির্ভুল হ'য়ে ডাইরেকটারদের পেয়ে বসেছে। সম্মানের সহিত স্বীকার করি, তাঁরা ছায়া চিত্রে চমৎকার আর্টিষ্ট। কিন্তু analyse করলে ধরা যায়, অহীনবাবু যেন সময় সময় সাজাহানের ভূমিকায় নেমে আসছেন—জহর বাবুকে দিয়ে সুসাহিত্যিক এবং ডাইরেকটার শৈলজানন্দবাবু যে সব কথা বলিয়ে নিতে চেয়েছেন—চলতি দিনের চিন্তার সংগে তার সামঞ্জস্য থাকলেও লোকের মনোরঞ্জন তিনি কতদূর করতে পেরেছেন সে ভাববার বিষয়। Serio comic এর পার্টগুলো সত্যি জহরবাবু না হোলে আমাদের মন বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে তাঁর ঐ কথাগুলো বলার পিছনে প্রাণ ছিল প্রবল আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় নি। যেটা হ'য়েছে সেটা কেবল হাসির বন্যা। সুন্দর সারগর্ভ কথা উপভোগ করতে গিয়ে বিফল হোতে হ'য়েছে, কারণ প্রথম কথা যা শোনা গেল পরের কথাগুলো দর্শকের হাসির বন্যায় ভেসে গেল। Casting এর উপর এগুলি নির্ভর করে। ডাইরেকটারদের এক দিকে বই হাতে পেলে যেমন প্রত্যেকটি চরিত্র নিয়ে research করা দরকার ঘটনাগুলোর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি যে আন্তরিক মনোযোগ প্রয়োজন ঠিক ততটা প্রয়োজন বইর Casting এর দিকে।

যাঁরা খ্যাতনামা—জহরবাবু, অহীনবাবু, ইত্যাদি এঁদের নিয়ে বই দাঁড় করবার বেলায় মনে হয় ডাইরেকটার মশাই তাঁদের ঐ খ্যাতির সম্মান দিতে গিয়ে তাঁদের ডিরেকশন দিতে সাহস পান না। "সব ঠিক হয়ে যাবে" বলে তাঁরা নেমে পড়েন। এ ছাড়াও নতুন artist খুঁজে বের করবার চেষ্টা বা আগ্রহ ডাইরেকটারদের দেখা যায় না।

এম, এল, রায় (শ্রীমঙ্গল : আসাম)

(১) গত কার্তিক মাসের রূপ-মঞ্চ পেয়ে খুবই খুশী হলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নিউ থিয়েটার্সের শ্রেষ্ঠ চিত্র "উদয়ের পথে"র নায়ক ছবি বিশ্বাস এবং নায়িকা চন্দ্রাবতী এর কারণ কিছুই বুঝতে পারলাম না তবে আমার মনে হয় সেটা ছাপার ভুল হতে পারে। (২) অশোককুমারের 'বম্বে টকীজ' ছাড়ার কারণ কি? এবং তিনি কি বাঙ্গালী? বাঙ্গালী হ'য়ে বাংলা ছবিতে অভিনয় করেন না কেন? (৩) রাণীবালা কি রঙ্গজগৎ ছেড়ে দিলেন? (৪) বাংলার তরুণ নট অসিতবরণের Qualification কি? রবীন মজুমদার এবং অসিতবরণের মধ্যে অভিনেতা হিসাবে কে শ্রেষ্ঠ স্থান পেতে পারেন?

* * * (১) কার্তিক সংখ্যা রূপ-মঞ্চে ছবি বিশ্বাস বা চন্দ্রাবতীকে 'উদয়ের পথে'র নায়ক নায়িকা বলে অভিহিত করা হয়নি—হ'য়েছে নিউ থিয়েটার্সের চিত্রগুলির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী বলে। উক্ত সংখ্যার ঐ প্রশ্নটী এবং তার উত্তর আবার পড়ে দেখবেন, তাহলে আপনার ভুল বুঝতে পারবেন। (২) তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের সংগে মতবিরোধের জন্মই অশোককুমার এবং বম্বে টকীজের আরো অনেক মাথা বেরিয়ে এসে 'ফিল্মিস্তান' নামে একটী চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন। অশোককুমার উক্ত প্রতিষ্ঠানে একজন অংশীদার এবং শিল্পীরূপে যোগদান করেন। অশোককুমার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। তাঁর পুরো নাম অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ভাগলপুরে এঁরা বসবাস করতেন। আজীবন বাংলার বাইরে থেকে হিন্দি ছবিতে অভিনয় করতে করতে—চিত্রামোদীদের কাছে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন—বাংলা ছবিতে অভিনয় করে যদি তা কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে, হয়ত সেকথা চিন্তা করেই বাংলা ছবিতে অভিনয় করেন না—। আমার এ ধারণা ভুলও হতে পারে। (৩) শারীরিক অসুস্থতার জন্য রাণীবালা সাময়িকভাবে বিদায় নিয়েছিলেন—ব্যক্তিগত বাধাবিপত্তির জন্মই তাঁকে নিয়মিত রঙ্গমঞ্চে দেখতে পাচ্ছেন না। এটা শীঘ্রই কেটে যাবে হয়ত। (৪) শিক্ষিত, ভাল গাইতে জানেন—অভিনয় করতে পারেন—ভদ্র, সদালাপী, প্রিয়দর্শন। অসিতবরণ এবং রবীন মজুমদারের মধ্যে অসিতবরণকেই আমি উচু স্থান দেবো।

হরিদাস মুখোপাধ্যায় (রাসবিহারী এ্যাভিনিউ কলিঃ)

(১) কানন দেবীর 'তুমি ও আমি' চিত্রে একসংগে অভিনয় করিবার জন্য 'Side role' এ কাহাকে স্থির করা হইয়াছে। (২) এমন অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, যাহারা গান গাইতে জানেন তাহাদিগকে সুযোগ না দিয়া 'play-back' করা হয়। এর কারণ কি জানিতে ইচ্ছা করি। (৩) মণিকা গাঙ্গুলীর পরবর্তী চিত্র কি? (৪) অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর জন্য কোন বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে কি না?

* * * (১) 'Side role বলতে আপনি কি বুঝেছেন? বিপরীত ভূমিকা? তাই যদি বুঝে থাকেন তবে, সম্ভবতঃ পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু 'Side-role'এর অর্থ তা নয়। Side role বলতে প্রধান চরিত্রকে ঘিরে যে যে চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে—সেই সব চরিত্রগুলিকে বোঝায়। তাহ'লে 'তুমি ও আমি'র ভূমিকালিপি আমাকে বলতে হয়। পরেশ ব্যানার্জি, ছবি বিশ্বাস, সন্ধ্যা, দেবী মুখার্জি, তুলসী লাহিড়ী, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

(২) সম্ভবতঃ সেসব 'গলা' কর্তৃপক্ষের কানে আঘাত

লাগাতে সক্ষম হয় না। (৩) মণিকা বর্তমানে কোন চিত্রে অভিনয় করছেন না। (৪) না।

কুমারী রেণুকা বন্দ্যোপাধ্যায় (বহুবাজার, কলিকাতা)

এম, পি, প্রডাকসন্সের তুমি আর আমি চিত্রে নায়কের ভূমিকায় কে অংশ গ্রহণ করবেন? সুমিত্রার পরবর্তী বাংলা চিত্র কি? নিউ থিয়েটার্সের হামরাহী কলিকাতায় কবে এবং কোথায় মুক্তিলাভ করবে? বরুণার পরবর্তী চিত্র কি? নিম্নোক্ত নামগুলি পর পর সাজিয়ে দিন: কানন দেবী, সুমিত্রা, সন্ধ্যা, বিনতা, মলিনা, মমতাজ শান্তি, স্নেহপ্রভা, রেণুকা, সাবিত্রী, চন্দ্রাবতী, ছায়াদেবী, বন্দনা, পূর্ণিমা, যমুনা, পদ্মা দেবী।

* * * পরেশ ব্যানার্জী। বিরাজ বৌ। এখনও কোন ঠিক নেই। শ্রীমতী বরুণা সম্ভবতঃ সংসারলোকে প্রবেশ করেছেন।

চন্দ্রাবতী, মলিনা, কানন দেবী, স্নেহপ্রভা, মমতাজ, শান্তি, সুমিত্রা, পদ্মা দেবী, ছায়া দেবী, রেণুকা, বিনতা, সন্ধ্যা, যমুনা, পূর্ণিমা, সাবিত্রী, বন্দনা।

এইচ, বর্ম্মন (কলিকাতা)

(১) দুই পুরুষ এবং উদয়ের পথের মাঝে পার্থক্য কি?

(২) অভিনেতা অমল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছেন যে, তিনি অকৃতদার ছিলেন—তা কি সত্য? তিনি কি অভিনেত্রী শান্তি গুপ্তার সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হননি?

* * * আদর্শবাদী নুটবিহারী আদর্শচ্যুত হ'য়ে ধীরে

ধীরে কেমন প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠলেন—বিভিন্ন ঘাত প্রতি-ঘাতের ভিতর দিয়ে তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—এবং শেষ পর্যন্ত আদর্শের কাছে প্রতিক্রিয়াশীলতার পরাজয়। প্রজা এবং জমিদারের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে যদিও দুই পুরুষের মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে, তবু দুই পুরুষকে এজন্য শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে পারি না। দুই পুরুষের সুটু চরিত্র বিশ্লেষণই হচ্ছে দুই পুরুষ চিত্রের সার্থকথা। উদয়ের পথে চিত্রে মজুর এবং ধনী এই শ্রেণী সংঘাত ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন কাহিনী-কার। শ্রেণী সংঘাত এবং শ্রেণী বৈষম্য দুখানি চিত্রেই ফুটে উঠেছে। তবে দুই পুরুষের (অবশ্য মূল নাটকের কথা আমি বলছি) চরিত্রগুলি যে শক্ত বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত উদয়ের পথে তা নয়। দুই পুরুষের চরিত্র বিশ্লেষণ 'উদয়ের পথে'র চেয়ে বেশী প্রশংসা পাবার দাবী রাখে। (২) আনন্দবাজার পত্রিকা যদি অমল বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকৃতদার বলে অভিহিত করে থাকেন তবে তাঁরা ভুল করেছেন। আপনার কথাই সত্য। তিনি অভিনেত্রী শান্তি গুপ্তাকে বিবাহ করেছিলেন এবং এই বিবাহকে অস্বীকার করবার মত অনুদার আমরা নই।

দেবকুমার চক্রবর্তী (ক্ষেত্রেশকুমার রোড, মজঃফরপুর, বিহার)

আমরা বাঙ্গালী, কার্যব্যপদেশে আমাদিগকে বিদেশে থাকিতে হয়। যখন আমরা বাংলা সংবাদপত্র এবং মাসিক প্রভৃতি খুলিয়া দেখিতে পাই যে, বাংলা দেশে নতুন নতুন বাংলা ফিল্ম তোলা হইতেছে—তখন আমাদের মন আনন্দে নাচিয়া ওঠে। কিন্তু আমাদের সেই আনন্দকে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন এবং সমালোচনা পড়িয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। যেহেতু আমাদের ভাগ্যে সেই সমস্ত ফিল্ম (বাংলা) দেখা হয় না, কেননা সেই সমস্ত ফিল্ম এখানে আসে না। মাসের পর মাস, অপেক্ষা করার পর হয়ত দেখিলাম যে, প্রেক্ষাগৃহে ছবি টাঙ্গান হইয়াছে—কোন বাংলা ফিল্মের—আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া দিনের পর দিন গুনিতে লাগিলাম—কবে বাংলা ফিল্ম দেখিব। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখিলাম যে, আমাদের সব আনন্দকে নিরানন্দে পরিণত করিয়া সেই স্থানে একটী হিন্দি ফিল্মের ছবি

একদিন কা সুলতান চিত্রে ওয়াস্তি

টাঙ্গানো হইয়াছে—দুঃখে মুসড়াইয়া পড়িলাম। যদিও বা কখনও বাংলা বই দেখার সুযোগ হইল দেখিলাম যে, সে ফিল্মটী অন্ততঃ ৫।৭ বৎসর পূর্বে তোলা হইয়াছে এবং ফিল্মের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এই সেদিন এখানে সাপুড়ে (বাংলা) চিত্রখানি প্রদর্শিত হইল (প্রথমবার) এই সহরে)। এখন আমার প্রশ্ন এই যে, এর জন্য দায়ী কে? আমাদের এই সহরের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যেখানে ১০০০ ঘর বাঙ্গালী আছে, সেখানে কেন আমরা নতুন নতুন বাংলা ফিল্ম দেখিতে পারিব না? আশা করি আপনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানাইবেন যে, এ জন্য দায়ী কে? প্রদর্শক না পরিবেশক? যদি প্রদর্শক দায়ী হন তাহা হইলে চলচ্চিত্র সঙ্ঘকে অনুরোধ করিতে হইবে যাহাতে এখানে বাংলা চিত্র প্রদর্শিত হয়। বাংলা চিত্রের জনপ্রিয়তার কথা বলিতে গেলে আমরা দেখিয়াছি যখন এখানে কোন বাংলা ছবি প্রদর্শিত হয় প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হইতে বেশী দেরী লাগে না। যাই হউক এর জন্য প্রবাসী বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের জন্য আপনার এবং রূপ-মঞ্চ পাঠকদের

দায়িত্ব আছে। আশা করি আপনারা কতদূর কি করতে পারেন তাহা জানাইলে বাধিত হবো।

* * * বাংলার বাইরে বাংলা চিত্র প্রদর্শিত হয় না কেন এই অভিযোগ করে বহু প্রবাসী বাঙ্গালী আমাদের পত্র লিখেছেন ইতিপূর্বে। আমরা স্থানীয় বাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ীদের ভিতর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের কাণে এই অভিযোগ পৌঁছে দিয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও যে না করেছি তা নয়—মুষ্টিমেয় প্রবাসী বাঙ্গালী দর্শকদের চাহিদা মিটাবার জন্য তাঁদের ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে অনুরোধ করিনি আমরা, অনুরোধ জানিয়েছিলাম বাংলা চিত্রের ব্যবসায় ক্ষেত্রের প্রসারের দিক চিন্তাকরে। সারা ভারতে প্রদর্শিত হ'য়ে একখানি হিন্দি চিত্র যে অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়, বাংলা চিত্র শুধু বাংলাতেই কেবলমাত্র প্রদর্শিত হয়ে সে অর্থ সংগ্রহ থেকে বিরত থাকবে কেন? শুধু প্রবাসী বাঙ্গালী নয়, বাংলার বাইরেও অবাঙ্গালী এবং বাঙ্গালী প্রত্যেক দর্শকের মনকে আকর্ষণ করতে বাংলার বাইরে বাংলা ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থার জন্য আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে যে উত্তর পেয়েছিলাম তাকে ঠিক সদুত্তর বলা চলে না। উত্তর ছিল 'বাংলার বাইরে অনেক প্রেক্ষাগারের মালিক তাঁদের প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছবি প্রদর্শনের মোটেই অনুমতি দেবেন না'—এর প্রত্যুত্তরে আমরা বলেছিলাম, তাহ'লে বাংলায় হিন্দি ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হউক। অন্ততঃ কোন বাঙ্গালী প্রদর্শক তাঁর প্রেক্ষাগৃহে হিন্দি ছবি দেখাবেন না। কিন্তু হিন্দি ছবি দেখিয়ে অর্থোপার্জনের লোভ সম্বরণ করবার মত বাঙ্গালী প্রদর্শক কোথায়? প্রাদেশিকতার গণ্ডি সৃষ্টি করে আমরা এই প্রস্তাব উত্থাপন করিনি, আমরা বলেছিলাম পরস্পরের সাহায্য এবং সহানুভূতিতে ভারতের সর্বত্র সর্বশ্রেণীর চিত্র (অবশ্য জাতীয়) প্রদর্শনের পথকে সহজ করে তুলতে। যেমন মনে করুন, আপনি একজন প্রেক্ষাগৃহের মালিক। বাংলার বাইরে আপনার প্রেক্ষাগৃহ রয়েছে এবং সেখানে কেবলমাত্র হিন্দি ছবিই প্রদর্শিত হয়। হিন্দি ছবির পরিবেশকদের সংগে রয়েছে আপনার সম্পর্ক। আমিও বাংলার একটী প্রেক্ষাগৃহের মালিক। বাংলা ছবির প্রদর্শকদের সংগে রয়েছে আমার সম্পর্ক—দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকেরই ব্যবসায়গত সম্পর্ক একটা 'cyclic-order'এ বাধা—তাহলে বাংলায় যদি হিন্দি ছবি প্রদর্শিত হয়, বাংলার বাইরে বাংলা ছবি প্রদর্শনের অন্তরায় কী থাকতে পারে? যদি থাকেও, বাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ীরা যদি সচেতন হ'য়ে ওঠেন তাহ'লে সে অন্তরায়কে দূর করতে কী বেশী বেগ পেতে হয়? যদি বাংলা ছবি বাংলার বাইরে দর্শক আকর্ষণে সমর্থ না হয় সেকথা স্বতন্ত্র এবং আমারত মনে হয়—হিন্দি ছবি দেখতে দেখতে বাঙ্গালী দর্শক যেমন আজ হিন্দি ছবির ভক্ত হ'য়ে উঠেছেন—বাংলা ছবি দেখতে দেখতে অবাঙ্গালী দর্শকরাও একদিন না একদিন বাংলা ছবির ভক্ত হ'য়ে উঠবেন এবং এ 'না উঠা'র সময়টুকু পর্যন্ত ঝুঁকিটুকু নিতে হবে বাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ীদের—বাংলা চিত্রের ব্যবসাক্ষেত্রকে ভবিষ্যতে প্রসার করে তুলবার জন্য এর দায়িত্ব একমাত্র নিতে পারেন 'Bengal Motion Pictures Producers' Association' যারা Indian Motion Pictures Producers' Associationএর মারফৎ বাংলার বাইরে বাংলা ছবি প্রদর্শনের পথকে সহজ করে তুলবেন। B. M. P. P. Aর কাণে আমাদের কথা পৌঁছেও কোন সুফল হয়নি কারণ তাহ'লে আজ আর এই অভিযোগ আসতো না। তাই আপনারা, প্রবাসী বাঙ্গালী দর্শকেরা সংঘবদ্ধ হ'য়ে স্থানীয় প্রেক্ষাগারের মালিকদের কাছে আবেদন করুন, আমরা বিষয়টা আবার B. M P. P. A.র কাছে উত্থাপন করে দেখি কতদূর কী করতে পারি!

এস, এস, বি (বহুবাজার কলিকাতা)

আমি যদিও তরুণ তবুও কলকাতারই কোন এক মাসিক পত্রিকার মঞ্চ ও পর্দা সম্বন্ধীয় আলোচনার ভার গ্রহণ করেছি। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি রূপ-মঞ্চের সমালোচকদেরই আমি 'Ideal' হিসাবে ধরে থাকি। সকল পত্রিকারই

সিনেমা সংক্রান্ত বিষয়গুলি আমি মনোযোগ সহকারে পড়ি কিন্তু রূপ মঞ্চের রূপের কাছে সবাই ম্লান হ'য়ে যায়। আমিও এদিকে শিক্ষানবীশ হিসাবেই নিজেকে মনে করি। তাই আশা করি আপনাদের দিক থেকে কোন পরামর্শ ও উপদেশ আশা করলে হয় তো বিফলকাম হবো না। রূপ-মঞ্চের একজন regular পাঠক না হ'লে আমার এ জ্ঞান হ'তো কি না সন্দেহ। আমি যদি আপনাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য আশা করি সেটা কি আমার পক্ষে ভুল হবে?

* * * রূপ মঞ্চের সমালোচনা আপনার ভাল লাগে, রূপ-মঞ্চের রূপসজ্জা আপনাকে মুগ্ধ করে—রূপ-মঞ্চের আদর্শ আপনার কর্মজীবনকে অনুপ্রেরিত করে তোলে—রূপ-মঞ্চের একজন নগণ্য কর্মী হ'য়ে—আপনার মত তাঁর একজন পরম হিতৈষীকে রূপ-মঞ্চের কর্মীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের ব্যক্তিগত সাহায্য যদি আপনার কর্মজীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে—আমরা সে গৌরবের অংশ থেকে কেন নিজেদের বঞ্চিত রাখবো? অন্যান্য পত্রিকার আদর্শ কী—তাঁরা কতখানি ভাল কচ্ছেন কী খারাপ করছেন সে বাকবিতণ্ডায় আমাদের প্রয়োজন নেই—আমরা কতখানি কী করতে পেরেছি সেই কথাই হচ্ছে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা। আমাদের সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলতে পারি—আজ পর্যন্ত কোন চিত্র প্রতিষ্ঠানের আনুগত্য স্বীকার আমরা করিনি—আমাদের আদর্শ যতদিন অম্লান থাকবে—আমাদের এই গর্বোন্নত শির কারো কাছে নত হবে না—রূপ-মঞ্চের সমালোচক গোষ্ঠী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই চিত্র বা নাটকের সমালোচনা করে থাকেন। রূপ মঞ্চের এই স্পষ্টবাদীতাই তাকে আপনাদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে। এই স্পষ্টবাদীতাই আমার মতে পত্রিকার সবচেয়ে বড় আদর্শ। আপনার বিচারে রূপ-মঞ্চ সমালোচক যদি একমত না হন—তাহ'লেই মনে করবেন না যে, তিনি কারো প্রভাবান্বিত হ'য়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন—রূপ-মঞ্চের সমালোচকেরা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনায় যে সত্যকে উপলব্ধি করেন—স্পষ্ট কথায় তাই রূপ মঞ্চের পাতায় তাঁরা ফুটিয়ে তোলেন

বাংলার মহিলা-প্রযোজক শ্রীযুক্তা প্রতিভা শাসমল

—আপনাদের অর্থাৎ রূপ-মঞ্চের পাঠক গোষ্ঠীর বিচারে যদি তা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়—রূপ-মঞ্চ সমালোচকেরা সে ন্যায় বিচারের রায় সব সময় মাথা পেতে নেবেন। আপনি নিজে সাংবাদিক জীবনে প্রবেশ করেছেন, আপনার যাত্রারম্ভে আমাদের শুভাশীষ চেয়েছেন—যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আপনার যাত্রাপথ সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠুক। এর চেয়ে আর আমাদের কিছু বলবার নেই।

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় (হ্যারিসন রোড কলিকাতা)

(১) আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আজে বাজে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ফটো না দিয়ে আপনাদের উচিত 'রূপ-মঞ্চ'কে সমৃদ্ধ করা 'নেতাজী'র ফটো দিয়ে—আশা করি এ অনুরোধ রাখবেন এবং এও আশা করি এই সংখ্যাতে রূপ-মঞ্চের ভিতর 'নেতাজী'কে দেখতে পাবো। (২) ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় গৃহীত পরবর্তী চিত্র কি? তিনি কি এখনও প্রতিকারের ব্যর্থতার গ্লানি কাটিয়ে উঠতে পারে নি? (৩) প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় গৃহীত আমীরী কি তার 'কলঙ্ক' মোচন করবে? জুইভোড় 'বঞ্চিতা'র

সৌন্দর্য্যে ও অলঙ্কার শিল্পে
হরিচরণ দত্ত
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস
১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

খবর কি? 'বন্ধুর পথে'র কোন খবর পেয়েছেন? ..(৪) বহুদিন পূর্বে দেখেছিলাম অজয় স্মৃতি সংখ্যার কয়েক কপি অবশিষ্ট আছে—যদি থাকে কী ভাবে পেতে পারি জানাবেন। জয় হিন্দ ধ্বনির মধ্য দিয়ে আজকের মত চিঠি লেখা শেষ করছি—জয় হিন্দ।

* * * রূপ-মঞ্চ পূজা সংখ্যা আপনি দেখেছিলেন কিনা জানি না, অন্যান্য পত্রিকা নেতাজীর ছবি প্রকাশের পূর্বেই আমরা উক্ত সংখ্যায় নেতাজীর ছবি প্রকাশ করেছিলাম। তাতে অনেকেই বিদ্রূপ করেছিলেন এইজন্য যে, চিত্র ও নাট্যমঞ্চের পত্রিকায় রাজনৈতিক যোদ্ধার ছবি কেন? সেই সব অদূরদর্শীদের উত্তর দিতে যেয়ে আমরা বলেছিলাম, রাজনীতিই হচ্ছে আমাদের মূল—সর্বপ্রকার আন্দোলন আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। চিত্র ও নাট্যমঞ্চের মারফৎ আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পথকে সুগম করে তুলতেই রূপ-মঞ্চের আত্মপ্রকাশ।

সুপ্রসিদ্ধা রাশিয়ান অভিনেত্রী

একদিনকা সুলতান চিত্রে মেহতাব

একখানা ছবি ছাপলেই যে সে কর্তব্য পালন করা হলো এবং ছবি না ছাপলে হলো না, এরূপ ধারণা মনে স্থান দেবেন না। অবশ্য আপনার অনুরোধ পত্র আসবার পূর্বেই আমরা এর ব্যবস্থা করেছিলাম কারণ আমরা জানি—আমাদের পাঠকদের চাহিদা কী। পূজা সংখ্যায় নেতাজীর বিভিন্ন প্রতিকৃতি ছাপবার পেছনেও একটা উদ্দেশ্য ছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বুঝেছিলেন—চিত্র ও নাটকের ভিতর দিয়ে আমাদের সংগ্রামকে কতখানি এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে—মহাজাতিসদনের ভিত্তি স্থাপনার ছবিটি এই জন্য ছেপেছিলাম যে, মহাজাতিসদনের সংলগ্ন একটী জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। প্যারাডাইসের জীবন প্রভাতের ছবিখানি মুদ্রিত করে আমরা জনসাধারণের কাছে এই কথাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলাম, চিত্রকলাকেও নেতাজী অস্পৃশ্য বলে অভিহিত করেননি। চিত্র ও নাট্যকলার ভিতর সংগ্রাম-সাফল্যের যে বীজ নিহিত রয়েছে, অনেক দেশনেতার মত সুভাষচন্দ্র যে তার শক্তি সম্পর্কে অবিদিত নন, তার প্রমাণ সম্প্রতি আমরা পেয়েছি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' সম্পর্কিত প্রকাশিত

তথ্য থেকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য 'আজাদ হিন্দ নাট্যাভিনয়, সংগীত, চিত্র প্রভৃতি সব কিছুরই সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে ফলও পেয়েছেন। পৃথিবীর অপরাপর যে কোন দেশের দিকে তাকাই না কেন—দেশের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য চিত্র ও নাট্যকলাকে পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ করা হ'য়েছে, যেজন্য সোভিয়েট রাশিয়ার চিত্র ও নাট্যকলা আজ আমাদের কাছে এতখানি শ্রদ্ধার বস্তু। এই চিত্র ও নাট্যকলার সেবায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আপনার এই অনুদার উক্তি কিছুতেই আমি মেনে নিতে পারি না—"আজে বাজে অভিনেতা অভিনেত্রী" যাঁদের মনে কচ্ছেন - তাঁরাই যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কতখানি কাজে আসতে পারে সে কথা কী চিন্তা করে দেখেছেন? আজ হয়ত তাঁরা পংকিল পরিস্থিতির মাঝে হাবুড়ুবু খাচ্ছেন—আজ হয়ত তাঁরা আমাদের বিশ্বাস অর্জন করবার মত কোন কার্যকলাপের পরিচয় দিতে পারেননি—কিন্তু তাই বলে দূর থেকে তাঁদের গালিগালাজ করলে চলবে না। তাঁদের ভিতর যে সম্ভাব্য রয়েছে, সেই সম্ভাবাকে ফুটিয়ে তুলবার দায়িত্ব নিতে হবে। যখন দেখবো, নেতাজীর আদর্শ তাঁদের মাঝে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে—ভারতের জাতীয় আন্দোলনের তাঁরাও এক একজন সৈনিক হ'য়ে উঠবেন। এদের তাচ্ছিল্যের আঘাতে দূরে রেখে সেই সম্ভাব্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না—এঁদের ভাল বেসে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে নেতাজীর আদর্শকে এঁদের মাঝে প্রতিফলিত করে তুলুন! নেতাজীর প্রতি সেদিনই আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবো—তাঁকে সেদিনই প্রকৃত সম্মান দেওয়া হবে। নেতাজীর ছবি ছেপে আজ রূপ মঞ্চ যতখানি না সম্পদশালী হবে, সেদিন তার চেয়ে হবে অনেক বেশী। (২) শ্রীযুক্ত বিশ্বাস বর্তমানে কোন চিত্রের পরিচালনা করছেন না। প্রতিকারের ব্যর্থতায় যদি শ্রীযুক্ত বিশ্বাস চিত্র পরিচালনা থেকে বিরত থাকেন তাহলে তাঁকে কি নিন্দা করবার কিছু আছে? বরং তাঁকে প্রশংসাই করবো এই জন্য যে, নিজের দুর্বলতাকে স্বীকার করে নেবার মত সবলতা শ্রীযুক্ত

> পত্রলেখক-লেখিকাদের ভিতর যাঁরা রূপ মঞ্চের গ্রাহক-গ্রাহিকা, দয়া করে গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

বিশ্বাসের আছে। (৩) আমীরীর মুক্তির পর এর উত্তর পাবেন রূপ মঞ্চের পাতায়। বঞ্চিতা মুক্তির অপেক্ষায় আছে। বন্ধুর পথের কোন খবর পাইনি। (৪) অজয় স্মৃতি সংখ্যা, ১৲ মনিঅর্ডার যোগে পাঠালে রূপ-মঞ্চ কার্যালয় থেকে পেতে পারেন। ব্যক্তিগত ভাবে এসেও নিয়ে যেতে পারেন। জয়হিন্দ ধ্বনির আদর্শকে আপনাদের মাঝে বিকশিত করে তুলুন - সেই কথা বলেই আমি আপনার চিঠির উত্তরের শেষ করলাম।

শৈলেন ভট্টাচার্য (কলিকাতা)

বর্তমানে যেকজন চিত্রাভিনেত্রী আছেন তাদের মধ্যে কাকে আপনারা শ্রেষ্ঠ স্থান দেবেন।

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী কে।

অরুনা চট্টোপাধ্যায় (চারু এভেন্যু, টালীগঞ্জ)

আপনাদের কার্তিক সংখ্যা রূপমঞ্চে চিত্র সমালোচনা ও নানাকথা' বিভাগে শ্রীপার্থিব কর্তৃক শ্রীদুর্গা' সমালোচনা কালে তিনি রাণীমন্দোদরী ও লঙ্কার পুরনারী কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে অভিসম্পাৎ দানের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "এই দৃশ্যটি স্বর্গত যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের সীতা নাটকের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বালির মৃত্যুতে তুঙ্গভদ্রার অভিশাপ দৃশ্যটির কথা মনে করিয়ে দেয়।" (পৃ ৬৯) যোগেশ চৌধুরী প্রণীত সীতায় বালির উল্লেখমাত্র নাই। মনে হয় 'বালি' স্থলে 'শম্বুক' হইবে। বালির মৃত্যুতে তারা কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে অনুরূপ অভিসম্পাতের কথা রামায়ণে লিখিত আছে বটে কিন্তু যোগেশবাবুর 'সীতা' তাহার অনেক পরবর্তী ঘটনা লইয়া রচিত।

* * * আপনার অনুমান সত্য—শ্রীদুর্গার সমালোচনায় শম্বুকের স্থলে ভুলক্রমে 'বালি' লিখিত হয়েছে। সীতা নাটকের 'শম্বুকের মৃত্যু দৃশ্যটীর কথাই সমালোচক বলতে চেয়েছেন। এই দৃশ্যটীও অবশ্য কাল্পনিক। মূল রামায়ণে বালির মৃত্যুদৃশ্যে শ্রীরামের প্রতি তারার অভিশাপের কথা উল্লেখ আছে। সমালোচনা লিখবার সময় সীতা নাটকের শম্বুকের মৃত্যুদৃশ্যটীর কথা উল্লেখ করতে যেয়ে বালির কথা অসতর্ক অবস্থায় এসে গেছে।

মহুয়া

(নৃত্য-নাটিকা)

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রথম দৃশ্য

বামুন কান্দা গ্রাম—ব্রাহ্মণ জমিদার নদেরচাঁদের ঠাকুর বাড়ী—মন্দিরের এক পার্শ্বে বহু লোক—অন্য পার্শ্বে সৌম্য মূর্তি হেমকান্তি নদের চাঁদ—মন্দির চত্বরে 'দেবদাসী' নৃত্য দেখিতেছেন। নৃত্য—চলিতেছে—হঠাৎ নৃত্যের মাঝখানে একটা অপ্রাকৃত শব্দ শোনা গেল—সকলে চমকিয়া উঠিল—নৃত্য থামিয়া গেল—সকলেই বাহিরের দিকে তাকাইল—দেখিল—একটি অনিন্দ্য সুন্দরী বালিকা প্রবেশ পথে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। নদেরচাঁদ ক্রুদ্ধ হইলেন—বালিকার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন—

মহুয়া : এই কি নাচ নাকি ?

নদেরচাঁদ : হ্যাঁ নাচ—তুমি কে ?

মহুয়া : আমি ? (হাসি)

নদেরচাঁদ : হ্যাঁ তুমি ? কে—তুমি ?

মহুয়া : হ্যাঁ আমি ? কে আমি ? (হাসি)

নদেরচাঁদ : হাসি নয়—বল'—কে তুমি

মহুয়া : আমি আমি—

[বেদের দলের প্রবেশ]

হুমড়ো : ও—মহুয়া ?

নদেরচাঁদ : কি ?

মাণিক : মহুয়া—

নদেরচাঁদ সুজনের দিকে তাকাইল—

সুজন : মহুয়া—

দল : মহুয়া।

নদেরচাঁদ : মহু—য়া—।

মহুয়া : হ্যাঁ—ম—হুয়া।

নদেরচাঁদ : কিন্তু কেন তুমি দেবদাসীর নাচ বন্ধ করে দিলে।

মহুয়া : ও নাচ নয়,—আকাশে যখন মেঘ ডাকে দেখেছ'—ময়ূরের নাচ,—বনে যখন আসে বসন্ত —দেখেছ ফুলের নাচ,—নদীতে যখন জোয়ার আসে —দেখেছ'—ঢেউএর নাচ ? সুজন বাজাত' মাদল— পালং—গাত গান—সর্দার দেত' তোর হুকুম—

হুমড়ো—বিকট শব্দ করিয়া উঠিল যে শব্দ মহুয়া পূর্বে করিয়াছিল—। সুজন বাজাইল মাদল,—পালং ধরিল গান—গাহিল বেদের দল'—, নৃত্য আরম্ভ করিল—মহুয়া— (গান)—

মহুয়া ফুলের বনে বনে,
মাতলা ভ্রমর এল' কিসের টানে ?
কেবা জানে ও গো কেবা জানে ?
নেশায় নেশায় পবন ঝিমায়,
দোলন লাগে পাতার-শিরায়,
চাঁদের হাসি ঝিলিক লাগায় গো—
নাচন জাগায় বুঝি ফুল নয়ানে ॥
কেবা জানে ও গো কেবা জানে ॥
মহুয়া কি ফুল না নেশার আগুন,
ফাগুন এসে বুঝি করিল গুণ
মহুয়া মহুয়া মহুয়া ফুলগো,
কুলভাঙ্গা ও ফুল কি শায়ক হানে,
কেবা জানে ও গো কেবা জানে।

মহুয়া : দেখেছ এমন নাচ ?

নদেরচাঁদ :—না।

মহুয়া : তোমার ঐ নাচ থেকে ভাল নয় ?

নদেরচাঁদ : ভাল, কিন্তু তার চেয়ে তুমি যে আরও ভাল।

মহুয়া : হাঃ হাঃ হাঃ—শুনেছ সর্দার কি বলে ও। রাগ করেছিল,—রাগ নেই,—নাচ দেখে ভাল লেগেছে— আমাকে দেখে আরও ভাল লেগেছে—হাঃ হাঃ হাঃ। আমাদের অত ভাল লাগতে নেই ঠাকুর—আমরা বেদে। এই যে হুমড়ো—এই আমাদের সর্দার, এই যে সুজন—এই যে মাণিক—এরা সব খেলোয়াড় এই যে পালং সই— আমারই মত পারে নেচে সবার মন জয় করতে—দেখবে ওদের নাচ—আমাদের বেদের দলের নাচ ?

[আবার মাদল বাজিল—মহুয়া ও ছমড়া বাদে সকলেই বেদিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল—নৃত্য শেষ হইল]

নদেরচাঁদ : বেশ নাচ—বড় ভাল লাগল'—কি চাও তোমরা।

বেদেরা : জানে ঐ সর্দার।

নদেরচাঁদ : সর্দার।

হুমড়ো : কি তুমি দেবে।

নদেরচাঁদ : যা তোমরা চাও।

মহুয়া : যা আমরা চাই,—

নদেরচাঁদ : হ্যাঁ যা তোমরা চাও।

মহুয়া : যদি চাই তোমার গলার মতির মালা?

[পালং হাসিল এবং মহুয়ার দিকে চাহিল]

নদেরচাঁদ : নাও মতির মালা,—কিন্তু কথা দাও মন্দিরের আরতির শেষে, নাচবে তুমি প্রতিদিন।

মহুয়া : সে সর্দার জানে।

নদেরচাঁদ : সর্দার, থাক তোমরা আমার জমিন নিয়ে বাঁধ সেখানে ঘর—কেন বেড়াবে ঘরছাড়া হ'য়ে—দলবল নিয়ে—দেশে দেশে?

সর্দার : দেবে তুমি আমাদের জমিন্?

নদেরচাঁদ : মন্দিরে নাচবে মহুয়া?

সর্দার : কিরে বেশ, নাচবি?

পালং : নাচবে বাপুজী। এ মন্দির ওর খুব ভাল লেগেছে।

সর্দার : কিরে সুজন—থাকবি?

সুজন : জায়গা যদি পাও থাক।

সর্দার : শোন ঠাকুর রাজা, থাকতে আমরা পারি।

নদেরচাঁদ : থাকতে তোমরা পার?

সর্দার : জমিন দেবে, ঘর দেবে, বাড়ী দেবে তবে মন্দিরে দেখবে মহুয়ার নাচ।

নদেরচাঁদ : বেশ উলইকান্দা গ্রাম—লিখে দিলাম—মহুয়ার নামে, তৈরী কর ঘর, চাষ কর জমি,—থাক মনের সুখে।

বেদের দল : সাবাস মহুয়া সাবাস—

আবার সর্দার দিল ইঙ্গিত,—মাদল উঠিল বাজিয়া—গান ও নাচ চলিল—

(গান) প্রথম গানের একাংশ—

"মহুয়া কি ফুল না নেশার আগুণ
ফাগুন এসে বুঝি করিল গুণ,
মহুয়া মহুয়া মহুয়া ফুল গো
কুল ভাঙ্গা এফুল কি শায়ক হানে।"

জনতা ও বেদের দল চলিয়া গেল—মন্দির ধারে দেখা গেল'—কে যেন প্রণাম করিবার ভঙ্গীতে পড়িয়া রহিয়াছে,—নদেরচাঁদ তাকে দেখিল।

নদেরচাঁদ তাহার নিকটে আসিয়া ডাকিল—নদেরচাঁদ। ওরা সব চলে গেল—কে তুমি তবু রইলে?

মহুয়া : (উঠিয়া) আমি মহুয়া।

নদেরচাঁদ : মহুয়া, আমি নদেরচাঁদ—

মহুয়া : তুমি এত দিলে—তাই তোমার মালা—

[তাড়াতাড়ি মহুয়া নদেরচাঁদের গলায় মালা পরাইয়া দিয়া—হাসিয়া দৌড়াইয়া পালাইল—]

নদেরচাঁদ : মহুয়া—মহুয়া—

[একটু অগ্রসর হইল]

[সিন]

সর্দার : সাক্ষী।

নদেরচাঁদ : সাক্ষী—ঐ মন্দিরের বিগ্রহ, উপরে নির্মুক্ত আকাশ,—সাক্ষী ঐ নদীর জল—সাক্ষী তুমি সাক্ষী তোমার মহুয়া?

দ্বিতীয় দৃশ্য

উলইকান্দা গ্রাম পথ—

বেদিয়া রমণীগণ :

বেদের মেয়ে মোরা
বেদের মেয়ে কলসী কাঁকে যাই জল ভরিতে।
শাপ্‌লা ফুল' তুলিগো,
শাপলা ফুল তুলি এমন কালো খোপায়
লীলুয়া বাতাসে গায়ে জর এল গো,
নদীর জলে ঝাপি সরম বাচাই গো,
ঢেউএর নাচের পরাণ কি বাঁচে গো,
বাঁশী বাজে বনে মন হরিতে॥

প্রস্থান—

মেড়ো : (প্রবেশ)

এরা বেশ সুখে আছে। বেদে তার তীর ছেড়ে ঘরে থেত খামার,—ঝরণার জল ছেড়ে—শান বাঁধা পুকুরে করে স্নান,—দেশ বিদেশের সকলে আমাদের খেলা দেখে না—দেখে শুধু ঠাকুর রাজা নদের চাঁদ—। ও সব—আমাদের হরণ করতে চায়—আমাদের পঙ্গু ক'রে আমাদের সোনাকে চুরি করতে চায়—

মাণিক : (প্রবেশ) সর্দার আমায় তুমি ডেকেছিলে।

সর্দার : ওরে মানকে সুজন কোথায়—

মাণিক : বাজারে গেল'—।

সর্দার : বেগুন বেচতে না ?

মাণিক : হ্যাঁ—ক্ষেতে আমাদের কত জিনিষ হয়েছে,—তুমি দেখতে যাও না কেন সর্দার।

সর্দার : ও রাক্ষসী মাটিকে আমি চাইনি মাণিক—ও শয়তানী—ও মায়াবিনী—মায়া দিয়ে তোদের ভুলিয়ে রাখল'—কিন্তু আমি যে বেদের সর্দার। তুই জানিস্‌নে মাণিক তুই জানিস্‌নে—আমার বেদের দলে চোর ঢুকেছে—কিন্তু আমিও তা বলে রাখছি মাণিক—আমি—বেদে—আমি তা হ'তে দেব না।

(প্রস্থান)—

মাণিক : কি হলো ? সর্দার বলে কি ? বেশত' সুখে ছিলাম আমরা—আবার কি হলো ? সর্দারকি পাগল হলো নাকি ? চোর ঢুকেছে—বেদের দলে চোর—কেসেই—চোর—

রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইল, দৃশ্যান্তরে—আলোকের বিকাশ হইলে দেখা গেল,—একটি নদী,—মহুয়া একা নদীতে জল ভরিতেছে—সন্ধ্যা লাগিয়া গিয়াছে—দূরে শোনা গেল—বাঁশের বাঁশীর সুর—মহুয়া চকিত হইল'—আবার জল ভরিতে লাগিল—প্রবেশ করিল—নদেরচাঁদ হাতে তার বাঁশের বাঁশী। মহুয়া নদেরচাঁদকে দেখিল—এবং হাসিয়া জল ভরিতে লাগিল—।

নদেরচাঁদ : জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিলে মন।
এমন ক'রে আমার কথা হইলে বিস্মরণ ?

মহুয়া : সন্ধ্যা বেলা চাঁদ উঠেছে সুরুয গেল পাটে।
একলা পেয়ে কেন ঠাকুর এলে জলের ঘাটে।

নদেরচাঁদ : সন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা এলে তুমি,
ভরা কলসী তোমার কাঁকে তুলে দিব আমি।

মহুয়া : লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর আমার, কথা ধর
গলায় কলসী বেধে ঠাকুর জলে ডুবে মর।

নদেরচাঁদ : কোথায় পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুবে মরি।

(পালং প্রবেশ করিল)

পালং : সর্দার, ব'লে, চোর, চোর, চোর - আমি ভাবি কোথায় চোর—

মহুয়া ও নদেরচাঁদ পালং এর দিকে তাকাইল'—এবং পালং ছি ছি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মহুয়া : সুজন কোথায় রে পালং—

পালং : বুঝেছি চলে যাব এইত। সুজন ত' আর নদের ঠাকুর নয়, সে বসে বসে তীরে ধার দিচ্ছে ?

মহুয়া : কেনরে ?

পালং : সর্দার ব'লে—বেদের চোখ থাকবে আকাশে তারার চোখে,—মাটির দিকে নয়। বেদের ঘর থাকবে মুক্ত পাহাড়ের কোলে—মাঠের বুকে গাছের ছায়ায়,—বাঁধা ঘরে তারা থাকবে না—তারা স্নান করবে—বর্ষা ধারায়, ঝরণার ক্ষর স্রোতে, পুকুরের মরা জলে নয়—

নদেরচাঁদ : আমি যাই মহুয়া—(প্রস্থান)।

পালং : খুব ভালবাসে না সই।

মহুয়া : খুব। কিন্তু কেন ওকে ভাল লাগে পালং... ও আমার কে।

পালং : এমন ক'রে নিজেকে জড়াস্‌নে সই ? ওরা বড়লোক, ওরা ঠাকুর—আমরা যে বেদে—

মহুয়া : কিন্তু ভালবাসা—তার আবার জাত কি ?

সুজনের প্রবেশ—

সুজন : এ, তোরা সন্ধ্যা বেলা এখানে কেন ? সর্দার ডাকছে তোদের।

মহুয়া : সুজন···পালং কি বলেছে জানিস্—

পালং : কি বলেছি ?—উহু বলে'ছ কি ছাই বলেছি—

(মহুয়ার প্রতি ভেংচি কাটিয়া চলিয়া গেল)

সুজন : কি ব'লেছে মহুয়া—

মহুয়া : কিছুই না—তোকে ও বড় ভালবাসে।

সুজন : আর তুই—

মহুয়া : আমি—আমি ভালবাসি—

সুজন : ঐ নদেরচাঁদ ঠাকুর কে ..না ? কিন্তু সর্দার—কি আদেশ করেছে জানিস্—আজ রাত্রেই আমাদের এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মহুয়া : সুজন।

সুজন : উপায় নেই মহুয়া,—সর্দার ব'লেছে—

মহুয়া : সর্দার বলেছে চলে যেতে হবে ?

সুজন : কেমন মজা হলো দেখ দেখি—হাঃ হাঃ হাঃ—

মহুয়া : চুপ (সুজনের গালে একটি চড় বসিয়ে দিল) যাও চলে যাও—আমি পালং নই সুজন। যা, বলগে যেয়ে সর্দারকে যাবনা আমি।

[সুজন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল]

মহুয়া কথা বলিল না চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল—

(গান) পড়ে রইবে বাড়ীঘর পড়ে রইবে তুমি।
পড়ে রইবে এইনা নদী মোদের শিলা ভূমি ॥
আরনা শুনবরে বন্ধু তোমার গুণের বাঁশি।
একদিনে না ফুটে ফুল গো.. ঝরে হ'লো বাসি ॥
আর না জাগিয়া বন্ধু পোহাইব রাতি।
বিদায় বিদায় নিলাম বন্ধু পরাণের সাথী।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া—পরে কহিল—

মহুয়া : কিন্তু কেন—কেন আমি আর—আমিত' বেদে নই,—আমি শুনেছি—আমাকে ওরা চুরি ক'রে এনেছিল'—আমাকে বলে না কিন্তু ওরা বলাবলি ক'রে। কে সেই চোর যে আমাকে এনেছে চুরি করে—?

[দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটিল,—দেখা গেল দূরে ছায়া মূর্তি—চুপি, চুপি চলেছে,—একটু পরেই সে ফিরে এল—হাতে তার দেখা গেল—একটি শিশু। ছায়া মূর্তিকে ভাল করিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে—সে হুমড়ো সর্দার]

আবার পূর্ব দৃশ্য :—দেখা গেল—মহুয়ার সামনে দাঁড়িয়ে হুমড়ো।

হুমড়ো : তোকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাকব'। তুই তখন, এতটুকু, তোর মা ছিল না, আমি ওরে মহুয়া, শুধু আমি, তোকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমি কি তোর কেউ নই—মহুয়া। তুই বুঝতে পারিস্‌নে মহুয়া—জাতির মেরুদণ্ডে যখন আঘাত লাগে—জাতি যখন বৈশিষ্ট্য হারায়—তখন তার বেঁচে থেকে কি লাভ ?—বেদের তীরে ধরচে মরচে, ধনুকে নেই ছিলা—, তুই কি বলিস মহুয়া, এই বেদের বাঁচার লক্ষণ ?

মহুয়া : চল বাপুজী—

হুমড়ো : চল্ মা চল্—

(উভয়ের প্রস্থান)

ভিন্নপথে—পালং ও নদের চাঁদ প্রবেশ করিল—

নদেরচাঁদ : চলে যাবে কি ?

পালং : হ্যাঁ চলে যাবে—আজই রাত্রে।

নদেরচাঁদ : চলে যাবে, আজই রাত্রে ?

পালং : আমাদের যেতেই হবে ঠাকুর—সর্দার হুকুম দিয়েছে।

নদেরচাঁদ : সর্দার হুকুম দিয়েছে—

পালং : তুমি একটু বস ঠাকুর—আমি সইকে বলি—তুমি এসেছ—(প্রস্থান)।

নদেরচাঁদ : কিন্তু আমি যদি—(দেখিল পালং চলিয়া গিয়াছে) মহুয়া—মহুয়া—, চলে যাবে ? তবে কার জন্যে গান, কার জন্যে বাঁশী বাঁশী—, আমার মহুয়া বাঁশী—। প্রথম যেদিন এল দেখেছিলাম—ওকে—ও যেন এক আগুনের ফুলকি ? বেদের মেয়ের এত রূপ ? কিন্তু সেও চলে যাবে—, ওকে আমি যেতে দেব না—

মহুয়ার প্রবেশ—

মহুয়া : যেতে তো দেবে না, —তাই বলে কি বাঁশীও বাজাবে না।

নদেরচাঁদ : মহুয়া ?

মহুয়া : তোমার বাঁশী শুনতে বড় ইচ্ছে হলো ঠাকুর, ..শুনেছ ত' আজ আমরা চলে যাচ্ছি।

নদেরচাঁদ : সত্যি চলে যাবে ?

মহুয়া : সর্দারের হুকুম—যেতে ত' হবেই ঠাকুর—

নদেরচাঁদ : তুমি যদি যাও তা হ'লে আমি ও কি থাকব ?

মহুয়া : আমি সে কথা কেমন করে বলি ঠাকুর, তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার বাড়ী, তোমার ঘর।

নদেরচাঁদ : মহুয়া তুমি কাঁদছ—। না—না, তোমার চোখের জল, আমি সইতে পারিনা মহুয়া।

মহুয়া : না—কাঁদিনি,—আর তোমার সংগে আমার দেখা হবে না।

নদেরচাঁদ : আমাদের প্রেম যদি মিথ্যা না হয়—কেউ আমাদের ধরে রাখতে পারবে না মহুয়া।

মহুয়া : তুমি বলেছিলে, ভরা কলসী আমার কাঁকে তুলে দেবে—দিলেনা ত—ঐ দেখ—কলসী পড়েই আছে।

নদেরচাঁদ : তুলে দেব কলসী—কিন্তু তার আগে—

মহুয়া : তার আগে ঐ আকাশের চাঁদ সাক্ষী, তোমাকে প্রণাম করি ঠাকুর...

মহুয়া : বিদায় বেলায়...আর একবার ডাকবে না নাম ধ'রে ..

নদেরচাঁদ : মহুয়া...

ভরা কলসী, তোমার কাঁকে তুলে দিলাম আমি

মহুয়া : তুমি আমার জীবন, আমার মরণ,

তুমি আমার স্বামী

[কলসী উঠাইয়া তাহার পরে একটি হাত...মহুয়া সেই হাতের উপর হাত রাখিল...এমন সময়ে হুমড়ো ডাকিল...

হুমড়ো : মহুয়া...

[উভয়ে চমকিয়া উঠিল ...এবং কলসী পড়িয়া গেল, ..]

হুমড়ো : বেশ হ'য়েছে...চলে আয় ..

[একবার শেষ চাহিয়া মহুয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল...যবনিকা পামিল নদেরচাঁদ স্থির নেত্রে দাড়াইয়া রহিল তাহার হাত হইতে অনন্ত বাঁশীটা পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(১ম দৃশ্য)

গারো পাহাড়ের একাংশ,...একদল বেদে নৃত্য করিতেছে,...হুমড়ো প্রবেশ করিল সংগে মাণিক ও সুজন ..নৃত্য থামিল।

হুমড়ো : দেখ...মাণিক, দেখ, সুজন ..বেদের...দলে আবার জীবন ফিরে এসেছে,...বেগুণ বেচে আর কলা বেচে...এ জীবন হারাতে হয় রে।

মাণিক : চৈত্র মাস শেষ হ'য়ে এল সর্দার।

সুজন : ঋতু উৎসবের আয়োজন করবে না সর্দার।

হুমড়ো : করব...কিন্তু...ঋতু উৎসব ..মহুয়ার যে... অসুখ। তারি রচনা এই ঋতু উৎসব...নাচবে কে... মেয়ে আমার দিন দিন কালি হয়ে গেল ..

সুজন : তাই বলে আমাদের জাতের এই উৎসব...

হুমড়ো : বন্ধ হবেনা সুজন...তাই কি হয়...বেদে জাতের উৎসব ...যাদের মহুয়া নেই...তাদের উৎসব হবে না ?...আয়োজন কর সুজন, আয়োজন কর মাণিক...যা তোরা ভাল ভাল শিকার ধরে নিয়ে আয়...বেদে জাতের উৎসব...উৎসব আমাদের করতেই হবে। যা সব ছুটে যা...(সকলের প্রস্থান) আস্তে আস্তে হুমড়ো চলে গেল।

হঠাৎ বনে শোনা গেল যেন কার বাঁশী ..ছুটে মহুয়া প্রবেশ করিল,...আলুথালু তার কেশ, রুগ্ন শরীর।

মহুয়া : পালং, পালং...পালং (পালং প্রবেশ করিল) ও কার বাঁশী...শুনিস্ নি ? ঐ শোন..., তাঁর বাঁশী না ?

পালং : তারইত বাঁশী।

মহুয়া : এখন উপায় ? যদি ওরা কেউ দেখে ফেলে...

পালং : ওরা সব শিকারে গেছে,...আমি যাচ্ছি সই, তোর কোন ভয় নেই।

মহুয়া : সত্যি তুমি এলে...। আমি এই ভাবে কেমন ক'রে তোমার সংগে দেখা করব'...তাই কি হয়,... কে আমাকে সাজিয়ে দেবে ..আমার বন্ধু আস্‌বে... আমার নদেরচাঁদ...। কিসের আমার অসুখ,...আমি সাজব'...আমি সাজব'...।

(দ্রুত প্রস্থান)

[একখানা ছোরা হাতে হুমড়ো সর্দার প্রবেশ করিল ছোরাখানা দেখিতে দেখিতে অন্য দিকে প্রস্থান করিল]

নদেরচাঁদ প্রবেশ করিল...

নদেরচাঁদ : পালং বলে দিল, এইখানে...কিন্তু কই কোথায় মহুয়া...মহুয়া...মহুয়া।

হুমড়োর পুনঃ প্রবেশ···

হুমড়ো : মহুয়া নয়, আমি আমায় চিনতে পার... ঠাকুর রাজা ?···

নদেরচাঁদ : মহুয়া কোথায় ?

হুমড়ো : কেন, মহুয়াকে কেন ?

নদেরচাঁদ : মহুয়াকে একবার দেখব'...। মহুয়াকে না দেখলে আমি বাঁচবনা।

হুমড়ো : মহুয়াকে না দেখলে তুমি বাঁচনা,...মহুয়া না হ'লে·· আমি, আমার বেদের দল বাঁচে না। আমাদের একজনকে তাহ'লে ঠাকুর মরতেই হয় কি বলো। শোন ঠাকুর, মহুয়াকে তুমি বিয়ে কর...বিয়ে ক'রে আমাদের দলে ভিড়ে যাও · কেমন পারবে ? পালং···

পালংএর প্রবেশ···

চিনিস্ এই ঠাকুরকে ?

পালং : না।

হুমড়ো : বামুন কান্দার নদের চাঁদ ঠাকুর···

হুমড়ো : ওকে নিয়ে যা, একটু মদ খেতে দে। মহুয়ার সংগে ওকে আমি বিয়ে দেব।

পালং : এস ঠাকুর...(পালং ও নদেরচাঁদের প্রস্থান)

হুমড়ো ? ও মহুয়াকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে...কিন্তু তাও' হয় না।

[মহুয়া ফুল সাজে সজ্জিত·· হাতে তার···কুসুম সম্ভার, হুমড়োকে দেখিয়া ম্লান হইয়া গেল]

আরে···মহুয়া...। এত সাজ ? বেদের...মেয়ে··· এইত চাই··। নদেরচাঁদ ঠাকুর এসেছে...আমি বলেছি, তার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব...হাঃ হাঃ হাঃ। এই বিষ লক্ষের ছুরি, এই হবে তোদের রাখী বন্ধন !

মহুয়া : বাপুজী···তুমি ওকে মারবে ?

হুমড়া : আমি না···তুই···। ও আমাদের জাতের দুষমন্...। আগামী কাল...তোর ঋতু···উৎসব . সেই উৎসব রাঙ্গা করে দেবে নদের চাঁদের...রক্ত...পারবি না ?···

[ফুলগুলি একটি একটি করিয়া খসিয়া গেল···মহুয়া বিদায় নিয়া বলিল ?

মহুয়া : পারব···বাপুজী দাও ছুরী...

হুমড়া : হাঃ হাঃ হাঃ···

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাহাড়ের সমতল···বেদেরা সব সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে···অপরূপ তাদের সজ্জা···আজ তাদের ঋতু উৎসব··· হুমড়ো প্রবেশ করিল, প্রবেশ করিল সংগে···মহুয়া, পালং, নদের চাঁদ,···। সুজন, মানিক...এরা ঋতু উৎসবে মত্ত ছিল...সর্দারের হুকুমের জন্যে মাদল লইয়া···অপেক্ষা করিতেছিল।

সর্দার : জান ঠাকুর, এরা আজ ঋতু উৎসব ক'রবে। তোমার ঐশ্বর্যের মধ্যে যেয়ে এসব আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি আজ এসেছ...দেখে যাও। পালং ঠাকুরকে মদ খেতে দিয়েছিস্···

পালং : দিয়েছি···

সর্দার : তবে নিয়ে যা ঐ হিজলগাছের তলায়··· দেখগে ঠাকুর ওখানে বসে...বেদের ছেলে মেয়েরা কি ক'রে।

পালং : চল ঠাকুর·· (উভয়ের প্রস্থান)

সর্দার : মদ্ খেয়েছিস্ মহুয়া।

মহুয়া : না···মদ্ খেলে···আমি পারব' না।

সর্দার : তবে এরা আরম্ভ করুক···তোর ঋতু রাজদের'···তুই পাঠিয়ে দে...

সর্দার : কিন্তু শোন বেটী·· নৃত্যের শেষে দেখব'... তোর নৃত্য···রক্ত রাঙ্গা···মহুয়ার উচ্ছল নৃত্য···

মহুয়া : আমি যাই সর্দার। (প্রস্থান)

সর্দার : ওরে সুজন, ওরে মাণিক···দে · তোদের মাদলে ঘা···উৎসব কর আরম্ভ...মাদল বাজিয়া উঠিল... বেদে রমণীগণ···গান ধরিল...এবং এক পার্শ্বে অর্দ্ধ চন্দ্রের আকারে দাঁড়াইল...। গান আরম্ভ হইল···গ্রীষ্ম বধুর গান···গ্রীষ্ম ঋতু প্রবেশ করিল···এবং নাচিল ··

গান : .. রুদ্র তোমার রৌদ্র নাচন।

আনে কাল বোশেখীর এলো চুলে
ঝড়ের কাঁ জন।

ঝিমুর ভাসে ক্ষণে ক্ষণে,
পাখীর গানে বনে বনে,
উদাসীগো...তোমার ভাষায়...
আলোছায়া মধুর মিলন।

গ্রীষ্মের প্রস্থান

বর্ষার প্রবেশ :···

বর্ষা প্রবেশ করিল...ও নৃত্য···

(গান) কে এল, কে এল সজল ঘন বরষানে।
কে দিল, কে দিল, কাজল ধরা...নয়ানে॥
কেন বেদনার করুণ গীতি,
গোপন বুকের মধুর স্মৃতি,
বিরহী গো...আনলে তুমি..
বাদল বাউল গানে॥

বর্ষার প্রস্থান।

শরতের প্রবেশ : ও নৃত্য

গান .. শিউলি বনের···সবুজ ওড়নায়
কে দিল দোল, কে দিল দোল···শিশির দোলনায়॥
নীল আকাশের গায়ে গায়ে,
স্নেহের পরশ অরুণ ছায়ে,
সুন্দর হে তোমার গানে,
মিলন হবে সুরের ছলনায়॥

শরতের প্রস্থান

পালং আসিয়া সর্দারের কাছে দাঁড়াইল ও তাহার কানে কানে কি যেন বলিল।

হেমন্তের প্রবেশ : ও নৃত্য

গান··· অশ্রুজলের বিদায় মাখা,
কেগো তুমি ওগো পথিক।
নীরব করা বিরাগ বাণী
আজকে কেন দেয় ভরি দিক।
কণ্ঠে তোমার কি রাগিণী,
ঘর ভাঙ্গান ব্যাকুল বাণী,
বৈরাগীহে তোমার পথের রিক্ত দিনে
সঙ্গিত দিক্।

হেমন্তের প্রস্থান।

শীতের প্রবেশ : ও নৃত্য

গান··· কে দিল এমন আজ,
আবরণ হীনবেশ, কে পরাল ধরা আজ।
সিক্ত হিমেল বাসে,
সুদূর সুনীলাকাশে,
সন্ন্যাসী হে গৈরিকে তব ঘনিয়ে আসে যে সাঁঝ

শীতের প্রস্থান।

বসন্তের আগমন : ও নৃত্য

গান... আকুল উপবন কাহার পরশন,
লেগেছে ধরনী বুকে।
ব্যাকুল অলিকুলে মঞ্জুলবন ফুলে
রঞ্জিত বাণী সুখে।
তনু মন জাগে রাঙ্গা অনুরাগে
মাধবী মিলন ফুল যার মাগে
হেপ্রিয় সুন্দর মদন মনোহর
গাহে কুহুকেকা বসি মুখে মুখে।

বসন্তের প্রস্থান।

সর্দার :—মহুয়া—মহুয়া—সুজন

বাজা মাদল—এবার আস্‌বে—আমার মহুয়া—

(মাদল বাজিল) মহুয়া—মহুয়া—

বেদে : মহুয়া ত ওখানে নেই সর্দার।

সর্দার : মহুয়া নেই—সুজন—পালং দেখ, হিজল গাছের তলায়—। (পালং ও সুজন চলিয়া গেল) আরে পাগলী মেয়ে—ভাল বেসেছিস—তা এত--দেরী কর্তে হয়,

সুজন : সর্দার, ঠাকুর নেই—

সর্দার : দেখতে পেলে রক্ত—

সুজন : না,

সর্দার : তাহলে মহুয়া তাকে নিয়ে গেল কোথায়—

সুজনের প্রস্থান

পালং : ছাউনিতে নেই, মহুয়া।

সর্দার : মহুয়া নেই—। তবে কি মহুয়া পালাল।

পালং : কেমন ক'রে বলব বাপুজী, আমিত ছিলাম তোমার কাছে।

সর্দার : আমার তাজী ঘোড়া সুজন—

(সুজনের প্রবেশ)

সুজন : ঘোড়া নেই সর্দার—মহুয়া নদেরচাঁদকে নিয়ে তোমার তাজী ঘোড়ায় পালাল।

সর্দার : পালাল মহুয়া, পালাল আমারি বুকের

উপর দিয়ে, আমারি তাজী ঘোড়ায়, আমারি দুষমনকে নিয়ে—পালাল—স্বজন, মাণিক—ফেলেদে মাদল—বন্ধ করেদে উৎসব—উঁচু করে ধর বর্ষা, ছুট্‌তে হবে—বনে পাহাড়ে—জঙ্গলে খুঁজতে হবে—মহুয়া নদেরচাঁদ. বাঁচাতে হবে বেদের সম্মান, হত্যা করতে হবে দুষমন শয়তানকে সকলে হুমড়ার পিছনে পিছনে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় অঙ্ক

পাহাড়িয়া পথ

নদেরচাঁদ ও মহুয়া...মহুয়া গান গাইতেছিল ও নাচিতেছিল—নদেরচাঁদ বাঁশী বাজাইতেছিল—। অদূরে চাঁদ। গান...

আমি, পাহাড়িয়া ঝরণা
চকিত চঞ্চলা বিদ্যুৎপর্ণা
নাচন আমার সোহাগ যাঁচায়,
পাহাড় ঘুমায় পুলক ব্যথায়,
ফুলের হাসি সবুজ যে পায়
রঙ্গীন রাম ধনু বর্ণা।

নদেরচাঁদ : পাহাড়ের বাঁশী যখন থেমে যায়, তখন ঝরণা কি ক'রে?

মহুয়া : তখন ঝরণা, পাহাড়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। (নদেরচাঁদের পাশে বসিল)

নদেরচাঁদ : পাহাড় যদি তখন বলে, না ঘুমোতে হবে না।

মহুয়া : ঝরণা তখন বলে...না···আমি গল্প করতে পারবনা···চোখে বড্ড ঘুম···এই বলে···পাহাড়ের কোলে মাথা রেখে ঝরণা শুয়ে পড়ল...(নদেরচাঁদের কোলের উপর মাথা রেখে মহুয়া শুইয়ে পড়ল।

নদেরচাঁদ : আচ্ছা তুমি দুই দুইটি মানুষকে বিষ দিয়ে মেরে ফেল্লে।

মহুয়া : মারব না, আচ্ছা, মানুষগুলি কি বলতো? (উঠিয়া বসিবে) প্রথমে সেই সাধু···তোমাকে যে নৌকা থেকে ফেলে দিয়েছিল, যে আমায় বিয়ে করতে চায় তারপর সেই সন্ন্যাসী যে তোমাকে মন্দিরে ঠাঁই দিয়েছিল সেও বলে···একই কথা...তুমি আমার হও, বেশ হয়েছে

নদেরচাঁদ : মহুয়া...

মহুয়া : কি !

নদেরচাঁদ : উপরে আকাশে চাঁদ, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ফুল...পাশে ঝরণার ছল ছল নৃত্য...মাটীর এই শ্যামল বুকে আমি আর তুমি···।

মহুয়া : আর কোন দুঃখ নেই ঠাকুর ··তোমার সামনে আজ যদি মরি...

নদেরচাঁদ : মহুয়া।

মহুয়া : বারে আমি বলি চিরকালই বেঁচে থাকব।

নদেরচাঁদ : ভগবান যেন করেন আমরা দুজন এক সঙ্গেই মরি মহুয়া।

নদেরচাঁদ : আচ্ছা তুমি কি সত্যিই বেদে ?

মহুয়া : তোমার কি মনে হয় .

নদেরচাঁদ : কেন যেন মনে হয়, তুমি বেদের দলের কেউ নও ···।

মহুয়া : সত্যিইত এখন আমি কি বেদের দলের কেউ? আমি এখন ..হঠাৎ দূরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল) ও কার বাঁশী ? (ধড় মড়িয়ে উঠিয়া বসিল)

নদেরচাঁদ : উঠলে যে,···।

মহুয়া : শুনই না ..বাঁশী দূরে .অনেক দূরে ? ওগো (কাঁদিয়া উঠিল এবং নদেরচাঁদকে জড়িয়া ধরিল)

নদেরচাঁদ : কি হয়েছে মহুয়া, তুমি এমন করছ কেন ?

মহুয়া : আমাদের এখনই পালাতে হবে।

নদেরচাঁদ : কোথায়।

মহুয়া : যেখানে বেদে যেতে পারেনা। আমি জানি··· তারা একদিন আস্‌বে···আর

মহুয়া : আর আমার সুখের বাসা এমনি করে ভেঙ্গে দেবে। ও পালং এর···বাঁশী···শুনছ না···।

নদেরচাঁদ। বেদেরা আস্‌ছে···এখন উপায় ?

মহুয়া : এস পালাই চল···(নদেরচাঁদের হাত ধরিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল ··ভিন্ন পথে···বেদের দল মাদল বাজাইতে বাজাইতে···প্রবেশ করিল—)

সর্দার : খোঁজরে সুজন—আমি জেনেছি···এই বনেই তারা আছে···

সুজন। সর্দার দেখতো, এ নিশ্চয়ই নদেরচাঁদের বাঁশী।

সর্দার : তাহলেত এই বনেই তারা ছিল···খোঁজ খোঁজ···ছোট···। এগিয়ে চল (বেদের দল···আবার মাদল বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান করিল)

প্রবেশ করিল পালং হাতে তার বাঁশী···

পালং : এখন উপায় ? ওরা খেপে উঠেছে···পালাও পালাও সখি···

[বাঁশী বাজাইল···]

২য় দৃশ্য

বনপথ : Shadowplay

দেখা গেল : বেদেরদল উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

তৃতীয় দৃশ্য

নদেরচাঁদ ও মহুয়া

নদেরচাঁদ : আমি আর পারি না মহুয়া...

মহুয়া : বুঝ্‌তেত পারি, এমন কাঁটা পথে হাটার তোমার অভ্যাস নেই···পাথ'রে পথ···রক্তে পা দুখানা তোমার লাল হয়ে গেছে। কিন্তু...বেদেরদল...তারা যে হন্যা কুকুরের মত ছুটেছে আমাদের পিছনে। তোমাকে কেমন করে আমি হারাব ·।

নদেরচাঁদ : একটুও বস্‌তে দেবে না···।

মহুয়া : একটু এগিয়ে চল, যদি পাহাড়ের একটা গুহা পাই...

নদেরচাঁদ : এস···

পালং এর প্রবেশ

পালং : সখি···

মহুয়া : কে পালং ? আমাদের বাঁচা সখি···চেয়ে দেখ ওর ভয় ব্যাকুল···মুখ···।

পালং : বেদেরা যে সারা বণ ঘেরোয়া করে ফেলেছে তবু আয় যদি···

[হুমড়া দলবল লইয়া প্রবেশ করিল]

হুমড়া ও দল : এইযে···মহুয়া···

মহুয়া : ওগো···(নদেরচাঁদকে জড়াইয়া ধরিল)

হুমড়া : সুজন ··ধরে নিয়ে আয় মহুয়া শয়তানীকে, বেদে জাতির কলঙ্ক···(সুজনের তথাকরণ)

মাণিক : আর ঐ নদেরচাঁদ ঠাকুর ?

হুমড়া : ও আমাদের হুষমণ।

হুমড়া : বাপুজী...

হুমড়া : চুপ, কে তোর বাপজী-বেদের সর্দার আমি··· বেদে তার অপমান ভোলে না।

নদেরচাঁদ : তাই কর সর্দার···আমাকেই তোমরা মার...মহুয়াকে তোমরা মের' না। ওরত' দোষ নেই।

সুজন : সর্দার আদেশ কর।

মাণিক : আদেশ কর সর্দার।

সর্দার : প্রস্তুত তোরা।

সকলে : হ্যাঁ সর্দার।

সর্দার। আগে মারতে হবে হুষমণ তারপর মারব'— বেইমানী।

মহুয়া : সর্দার তাইকর, যদি মার · হুজনকে এক সংগেই মারো। আমাদের রক্তে, তোমার মহুয়ার রক্তে, তোমার বেদের দলের কলঙ্ক ঘুচে যাক...আদেশ কর সর্দার—মার হুজনকে এক সংগে···।

পালং : মহুয়াকে তুমি মারবে সর্দার?

সর্দার : জানি মহুয়াকে মারলে তোর চোখে আসবে জল···আমার চোখে জল আসবে···তবু বেদের প্রতিজ্ঞা···

মহুয়া। আমি যদি মারি·· তোমার হুষমণকে?

সর্দার : তুই মারবি?

মহুয়া : তুমিত বলেইছিলে···ওকে মারতে···আমিও বলেছিলাম পারব। এইও সেই ছুরী। তুমি···আদেশ কর সর্দার।

সর্দার : তুই মারবি?

নদেরচাঁদ : তুমি মারবে···? মার মহুয়া···

সর্দার। পারবি, পারবি মহুয়া...?

মহুয়া : বেদের মেয়ে কিনা পারে বাপুজী,

সর্দার : বেদের মেয়ে. হাঃ হাঃ হাঃ···ঠিক হয়েছে, বেদের মেয়ে···। শুনেছ ঠাকুর বেদের মেয়ে...হাঃ হাঃ হাঃ

নদেরচাঁদ : জীবনের...এই পরমক্ষণে আমার এতবড়

সুখে...আমি ভাবতে পারি না মহুয়া···ধর ঐ ছুরী··· আঘাত কর আমার বুকে, মৃত্যু আমার মহান হোক।

মহুয়া। দেখ সর্দার, পালং সই কাঁদছে···বেদের মেয়ের আবার কান্না।

সর্দার: সুজন আর মহুয়ার হবে বিয়ে...হাসির দিন আস্‌বে···কান্না কেনরে বেটী।

মহুয়া: পালং সুজনকে ভালবাসে বাপুজী।

সর্দার। বেশ তাহ,লে ওর সংগেই সুজনের বিয়ে দেব।

মহুয়া। পালং সই, তবে আর কান্না কেন ভাই··· কাঁদতে নেই···ওই দেখ নদেরচাঁদ ঠাকুর কেমন করে চেয়ে আছে।

মহুয়া: কি ঠাকুর, বলেছিলাম না বেদের মেয়েকে ভালবাস্‌তে নেই। এই বার মর।

নদেরচাঁদ: মরতে এতটুকু দুঃখ নেই মহুয়া। তোমাকে ভালবেসেছি···পেয়েছি তোমার ভালবাসা...আর আমার ভয় কি...আমার সবইত পাওয়া হয়েছে···মহুয়া। আবার তোমার হাতেই মরব···

মহুয়া: হ্যাঁ...তাই মরবে।

নদেরচাঁদ: শুধু একটা অনুরোধ···প্রথম যেদিন দেখেছিলাম তোমার নাচ...মুগ্ধ হয়েছিলাম, মাদলের তালে তালে···আবার তুমি তেমনি করে নেচে ওঠো··· বসিয়ে দাও ছুরী আমার বুকে...তোমার চোখের দিক চেয়ে চেয়ে...জীবনের সব গান আমার ফুরিয়ে যাক...

মহুয়া: সর্দার...

সর্দার: বাজা মাদল সুজন·· [সুজন মাদল বাজাইল...। মহুয়া নৃত্য আরম্ভ করিল···নৃত্যের তাণ্ডব মুহূর্তে যে ছুরী নিজের বুকে বসাইল...]

মহুয়া: নদেরচাঁদ···প্রিয়তম···(মৃত্যু)

সর্দার ও দল: মহুয়া...মহুয়া...

সর্দার: মহুয়া...মহুয়াই...যদি মল...তাহ'লে তুমিই কি বেঁচে থাকবে ঠাকুর···সুজন·· মাণিক·· হত্যাকর ছোড় তীর, মার·· মার···ঐ দুষমণ। [একসংগে সকলে তীর ছুড়িল···এবং নদের চাঁদ ঢলে পড়িয়া গেল।]

নদেরচাঁদ: মহুয়া···মহুয়া...

যাহা কিছু গেল চুকে

[গল্প]

সনৎ কুমার মৌলিক

কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছিলাম আমার এই অভিশপ্ত জীবনের কথা। চাকরীর জন্য কতইনা চেষ্টা করলাম, ভাগ্যে কিছুই জুটলনা। দরখাস্ত লিখে লিখে হয়রান হোয়ে গিয়েছি। ব্যবসা করব? কিন্তু টাকা কোথায় পাব—কে দেবে? এমন সময় কে যেন ঘাড়ে হাত দিল। চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখি অভয়।

...কি রে বুড়োর মত কি ভাবছিস? গালে হাত দিয়ে ভাবা আমি দু'চোক্ষে দেখতে পারিনা। আয় আমার সংগে। অভয় আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল এক হোটেলে। আমাকে একটা সিংগল-সিটেড রুমে বসিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। অভয়ের সংগে একক্লাসে পড়েছিলাম। অভয় ছিল আমাদের ক্লাসে মস্ত ধনীর ছেলে। এক একদিন এক-এক রকম সাজ পোষাক পরে ক্লাসে আসত। মানাতো তাকে ভারি সুন্দর। লম্বা পোণে ছ'ফিট। ফর্সা রং। চোখা নাক, টানা টানা চোখ। কালো কুচ কুচ ঢেউ খেলান চুল। অভয় ফিরে এল, সংগে বয় নিয়ে এসেছে চা আর কেক।...বল তোর কি খবর? লেখাপড়া সব ছেড়ে দিলি—বলেই চিৎ হোয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

—এম-এ পড়তে গেলে মেরিটের চাইতে মানির প্রয়োজন বেশী একথাটা মানিসত। বল্লাম আমি।

—সে কথা ঠিক বলেছিস। নইলে অভয় কুমার এম-এ পড়ছে আর তোর মত ছেলের কিনা অর্থাভাবে পড়া হচ্ছেনা।

কেকটা মুখে দিয়ে ভাবতে লাগলাম, অভয়ের ত বেশ সহানুভূতি রয়েছে আমার উপর। ওর বাবাও কোলকাতার বিরাট বড়লোক। ব্যাঙ্ক, কারখানা, আরো যেন কি সব ব্যবসা আছে ওদের। অভয়কে ধরলে হয়তো একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। বলবো নাকি?

—তুই বড্ড গম্ভীররে ..আনলাম গল্প করতে, আর তুই কিনা ফিলজফারের মত কি ভাবছিস। অভয় বলে।

...চাকরীর চেষ্টাত আর তোর করতে হয় না—তাই বুঝবিনা আমাদের দুঃখ।

—আচ্ছা, তোর ব্যাকিং আছে?

—না...ব্যাকিং থাকবে কেমন করে?

মুখে একটা চুরুট ধরিয়ে অভয় বলে—এটা হচ্ছে ব্যাকিং এর যুগ। চাকুরী-পরীক্ষা-মায় বিয়ে পর্যন্ত ব্যাকিং-এর প্রয়োজন।

—বিয়েতে আবার ব্যাকিং কোথায়?

—কেন বাবার-বাবার ব্যাকিং না থাকলে কখনও বড়লোকের মেয়ের সংগে বিয়ে হয় না দেখে নিস। আমি মনে মনে ভাবলাম—আমি বাপু গরীবের ছেলে, আমার কি দরকার বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করা। আর বড় লোকের মেয়েই বা আমার মত দরিদ্রকে বিয়ে করবে কেন? যার চাকুরা জুটছেনা তার কি এখন বিয়ের চিন্তা করা শোভা পায়। অভয় চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে—

—ভগবান তোকে জন্মটাও দিল দরিদ্রের ঘরে—ভগবানের পর্যন্ত ব্যাকিং নেই। তুই একটা হতভাগা।

—তোর পাশে বসলে আমারও তাই মনে হয়। এমন সময় দরোয়ান এসে জানালো একজন মেয়ে অভয়ের সংগে দেখা করতে চায়।

—বলগে আসছি। দরোয়ান চলে যায়।

অভয় বলে—ভাবতে পারিস তুই, কোলকাতায় এমন হোটেলে থাকি যে মেয়ে মানুষ উপরে আনতে দেয় না। এটাকে হোটেল না বলাই উচিত। বাবার হুকুম এখানেই থাকতে হবে।

—কলেজ হোষ্টেলে থাওয়া আমার সহ্য হয় না। বাড়ীতে পড়া হয় না।

টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একখানাও এম-এ ক্লাসের বই নেই। কতকগুলো সিনেমার সস্তা বই টেবিলে রয়েছে। ঘরময় আধা থাওয়া সিগারেট, চুরুট আর দিয়াশলাই এর কাঠি।

—ওঠ মেয়েটাকে দেখে আসি।

—বারে আমি যাব কেন? না অভয় আমি যেতে পারব না।

—ছি এখনো মেয়ে দেখে লজ্জা পাস...তোর জীবনে উন্নতি হবে না।

আমাকে জোর করেই নীচে নিয়ে গেল। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন কি ভাবছিল মেয়েটাকে দেখেই অভয় একটু চমকে ওঠে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—আরে অনামিকা তুমি এখানে, মানে হঠাৎ—

—হ্যাঁ হঠাৎ। তোমাকে সব কথা বলতে চাই। কিন্তু দাঁড়িয়েত সব বলা যাবে না। মেয়েটি বল্ল।

—চলো কফি হাউসে যাওয়া যাক। অভয় বলে।

এবার আমি বাড়ী ফেরার সুযোগ পেলাম। বল্লাম অভয়, তা হলে আমি আসি।

অভয় আমার সার্টের পেছনটা টেনে ধরলো—পালিয়ে গেলে চলবেনা। এসো পরিচয় করিয়ে দিই। এ আমার বান্ধবী অনামিকা, আর ও আমার বন্ধু কিশলয়।

মেয়েটি আমাকে নমস্কার জানায়। কোন কালে মেয়েদের সংগে মিশিনি। লজ্জায় আমি আর তাকে প্রতি নমস্কার জানাতে পারলাম না।

অভয় জোর করেই আমায় নিয়ে এলো কফি হাউসে। এককোনে তিনটি চেয়ারে তিনজন বসে রয়েছি। অভয়ের অর্ডার মত বয় খাবার আর কফি দিয়ে গেল। মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর দেখে আমি অবাক হোয়ে গেলাম।

অভয় বল্ল..সংক্ষেপে আস্তে আস্তে কি ঘটনা বলো। অভয় চারদিক তাকালো। কফি হাউসে ভিড় তখন পাতলা হোয়ে এসেছে।

অনামিকা কফিতে চুমুক দিয়ে বলে—বলছি শোনো। তোমার আমার মধ্যে যে সব চিঠি পত্তর লেখা লেখি চলতো সেটা আমার স্বামী অনলবাবু টের পেয়েছেন। শুধু টের পেলে কোন কথা ছিলনা, এ ব্যাপার নিয়ে তিনি আমায় অপমান পর্যন্ত করেছেন।

আমিও অনল বাবুকে বলেছি—স্বামী আমার কেউ নয়—স্বামী আমার কেউ নয়। বিয়ের আগে অভয়কে ভালোবেসেছি—আজো ভালোবাসি, চিরকাল তাকে ভালোবাসবো। অভয়ই আমার সব। কুমারী অবস্থায় অভয়কেই আমি দেহদান করেছি। এসবশুনে অনলবাবু আমাকে বাড়ী থেকে তৎক্ষণাৎ দূর হোয়ে যেতে বল্লেন। শেষে ঠিক হলো অনলবাবু ভবিষ্যতে তার স্বামীত্ব আমার প্রতি দাবী করবেন না, আর আমিও জীবনে কখনো খোরপোশের মামলা আনবনা।

অভয় বল্ল - তারপর ?

—তারপর আর কি ? সোজা চলে এলাম কোলকাতায়। মফস্বলকে দুপায়ে লাথি দিয়ে এলাম।

হেসে ওঠে অনামিকা। আমি ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলাম, কেউ কি শুনতে পেয়েছে নাকি এসব কথাবার্তা কে জানে। আমি ভাবতে লাগলাম, আমার সামনে এই বিশ্রী ঘটনা বলতে অনামিকার একটুও লজ্জা হোলনা।

অভয় বল্ল—এখন আমাকে কি করতে হবে ?

অনামিকা তর্জনী উঁচু করে বলে...আমায় বিয়ে করতে হবে।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল..হিন্দু'ল অনুসারে এদিগে কিন্তু......

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে অনামিকা চেঁচিয়ে উঠলো..আপনি ল-এর কি জানেন কিশলয় বাবু যে, এ ব্যাপারে নাক ঢোকাতে এসেছেন ?

আমার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। কেনই বা ওদের ব্যাপারে কথা বলতে গেলাম। অনামিকা যে কফি হাউসে অমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠবে তা আমি ভাবতেই পারিনি।

এবার অনামিকা গলার স্বর নরম করে বলে—কিছু ভয় পেওনা অভয়, আমি বালীগঞ্জে যে মাসীর বাড়ীতে উঠেছি সে বাড়ীতে মাসীর এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকেন। তিনি হাইকোর্টের বড় উকিল। আমার সব কথা তাঁকে বলা হোয়েছে, তিনি বলেছেন বিয়েতে আটকাবেনা। যাক সে সব কথা পরে হবে। আগে তোমার মত চাই।

অভয় আমতা আমতা করে, বিয়ে…বিয়ে…তা…তা…আমায় একটু ভাবতে দাও।

—এতে এাত ভাববার কি আছে ? বয় এসে বিল দিলে, অভয় বিল চুকিয়ে দিল। আমরা তিনজন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

—আজ রাত্তিরটা ভেবে কাল তোমায় কথা দেব অনামিকা ! বলেই অভয় তাকাল অনামিকার মুখের পানে।

অনামিকা বল্ল, বেশ কাল আমি আসব। সম্মুখে ট্রাম যাচ্ছিল, অনামিকা ট্রামের ভেতরে উঠে পড়লো। ট্রাম চলে গেল।

—খাওয়াটা একটু বেশী হোয়েছে। চল একটু হেঁটে আসি। অভয় বল্ল।

—নারে আমি যাই। এক জায়গায় চাকুরীর দরখাস্ত করব বলে মনে মনে ঠিক করেছি।

—সে পরে করলেও চলবে—আয়না।

কি আর করি কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে তার সংগে হাঁটতে লাগলাম।

মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই মনে উদয় হচ্ছিল; কিন্তু একটা কথাও অভয়কে জিজ্ঞেস করবার মত প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, আমি যে একজন অসচ্চরিত্র লোকের সংগে রাস্তা চলছি, একথাটা ভাবতেই আমার অপরিসীম ঘৃণা হোতে লাগলো। অভয়ের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ওর গায়ে আমার গা লেগে যাচ্ছিল। আমি নিজেকে অপবিত্র মনে করতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে ঠন্‌ঠনে কালী বাড়ী পর্যন্ত এসে গিয়েছি।

—কি ভাবছিস্ রে কিশলয় ?

—কই কিছুনাত, আর তুইও যেন কি ভাবছিস তাই না?

—হাঁ অনামিকা আমার ঘাড়ে ভাবনার বোঝা চাপিয়ে গেল। তবু তোর মত ভাবুক নই। চুপচাপ ভাবাও এক কঠিন ব্যাপার।

আমি বল্লাম—কালীবাড়ীর কাছে একটু দাঁড়া। আমরা

দাঁড়ালাম। অভয় বল্ল—তুই চাকরী চাকরী করছিসত ? একটা ঢোক গিলে বল্লাম—হ্যাঁ।

—বাবা অনেকদিন থেকে একজন অনেষ্ট্যান খুঁজছেন, আমাকেও খুঁজতে বলেছেন। আমি ভাবছি তোকে বাবার কাছে নিয়ে যাব। মাইনে ভালো পাবি। যাবি কিশলয় ?

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। চাকরী পাব বেশী টাকা মাইনে। আনন্দে মুখ দিয়ে আর কথা বে[illegible] অভয় বলে—বন্ধু হোয়ে যদি বন্ধুর উপকার না করতে পারলাম তবে জীবনে কি করলাম।

—সত্যি চাকরী পাব ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ-কাল সকালে আমার কাছে আসিস্।

—নিশ্চয়ই

আশ্চর্য এতক্ষণ অভয়ের উপর যে ঘৃণা বিরক্তি জমে উঠেছিল চাকরীর কথাতে মন থেকে সব মুছে গেল। ছেঁড়াজুতাটা খুলে মা কালীকে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলাম।

অভয় হেসে বল্ল, তোর দেখছি ঠিক মেয়েদের মত ভক্তি।

আমার আবার একটা বাতিক ছিল যেবারই ঠন্ ঠনে কালীবাড়ীর সম্মুখ দিয়ে গিয়েছি ; প্রণাম না করে পারিনি। ভাবলাম এই কথাটা বলি একবার অভয়কে। পরক্ষণেই মনে হোল ; না যাক শেষে হয়তো আমাকে ছেড়ে মা কালীকে নিয়ে ঠাট্টা করবে।

—তুই একটা প্রণাম করলি না ? আমি বল্লাম।

নিজের বাবাকে পর্যন্ত প্রণাম করি না, তার আবার মা কালীকে প্রণাম !

—কাল সকালে তোর কাছে আসব। অভয় আমার পিঠটা চাপড়ে দিল।

সে রাত্রিরে ভালো করে ঘুম হোল না। চাকরীর টাকা জমিয়ে মা-মরা বোনটিকে বিয়ে দিতে হবে। বাবাকে ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। ছোট ভাইটাকে হাইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে। মহাদায়িত্ব মাথার উপর। সকালে উঠেই শরীরটা বড় খারাপ লাগলো। ত্রিফলার জল খেয়ে ছুটলাম অভয়ের হোটেলে। দরজায় টোকা না দিয়েই ঢুকে পরলাম ওর ঘরে। অভয় আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি কাঁচের গেলাসটা টেবিলের তলে লুকিয়ে ফেল্ল। আমি ওর বিছানায় যেয়ে বসলাম।

—দেখেই যখন ফেলেছিস তখন আর লুকই কেন, বলেই অভয় সেই কাঁচের গ্লাসে বোতল থেকে মদ ঢেলে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেল্ল।

—ঘরে ঢুকতে হোলে নক্ করে ঢুকতে হয়, এসব এটি-কেট শিখিসনি...ভদ্র সমাজে মিশবি কি করে ?

—তুই মদ খাস ! আমি বল্লাম।

—তুই একটু খা, তোফা লাগবে।

—সিগ্রেট পর্যন্ত খাই না ..কাজেই ও কথাত উঠতে পারে না। তুই যে খাস ..কেউ যদি জানতে পারে ? আমি বল্লাম।

অভয় বল্ল, জানবে কি করে, আমি যে লুকিয়ে রাখি, অভয়কে মদ খেতে দেখে মনটা দমে গেল।

বন্ধু হোল গিয়ে মাতাল, অসচ্চরিত্র। থাক্ তাতে আমার কি ? জগতে সব লোকইত ভালো নয়। আমি নিজে ভালো থাকলেই হোল। বন্ধু যা ইচ্ছে তাই হোক। আমার ক্ষতি না হোলেই হোল। আর ভালো মন্দ বাছতে গেলে দুনিয়াতে বাস করাই মুস্কিল। অভয় বোতল গ্লাস লুকিয়ে রাখলো। দরোয়ান এসে জানালো, কালকের সেই মহিলাটি দেখা করতে এসেছে।

অভয় বল্ল, তোকে বখশীস দেবো। তুই বল গিয়ে বাবু নেই। দরোয়ানটি গোঁফে তা দিয়ে বল্ল, আমি মিছা কথা বলব না বাবু। অভয় মাথা চুলকে বল্ল—তবে যা, বসতে বলগে আসছি আমি।

দরোয়ান চলে গেল গোঁফে তা দিতে দিতে। দরোয়ানকে মনে মনে নমস্কার জানালাম তার এই সত্য নিষ্ঠা দেখে। অভয় আমার হাত জড়িয়ে ধরলো : কাল ভাই সারারাত ঘুমুতে পারিনি। আচ্ছা তুই বল, ভালোবাসার সংগে বিয়ের সম্পর্ক কোথায় ? অনামিকাকে ভালোবেসেছিলাম সেজন্য তাকে বিয়ে করতে হবে ? না—সে আমি পারব না—সে আমি পারব না। আর তাছাড়া ওকে বিয়ে

করলে বাবা আমায় ত্যাজ্যপুত্র করবে। তাহলেত আমি পথের ভিখারী—তোর চেয়ে দরিদ্র হোয়ে যাবো। বল কি উপায় করি?

বন্ধুকে সমর্থন করতে ইচ্ছে হোল না। বলে ফেল্লাম, যে মেয়েটা স্বামীর ঘর ছেড়ে তোর কাছে চলে এসেছে, ভেবে দ্যাখ সে তোকে সিন্‌সিয়ারলি ভালোবাসে। তুই ওকে সাহসের সংগে গ্রহণ কর। তাহলেইত সমস্যার সমাধান হোয়ে যায়।

অভয় লাফিয়ে উঠলো, তুই একটা গাধা। অনামিকার গোলাপী গাল দেখেই ভুলে গেছিস।

আমিও রুখে উঠলাম, সাটসাপ ইতরের মত কথা বলো না। হয়তো একথাতে একটু ফল হোল।

অভয় করুণ স্বরে বল্ল, আমাকে ক্ষমা কর ভাই। মেজাজটা ভালো ছিল না।

আমি কোন কথা বল্লাম না। অভয় আবার আরম্ভ করলো···আমি বিয়ে কাউকে করবো না। বাবাও বিয়ের জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। বাবাকে কথা দিচ্ছি, বিয়ে করবো তবে কিছু পরে। এমনি করে করে দেরী করছি। আর জানিস বাবাও বুড়ো হোয়েছেন। ব্লাডপ্রেসার। বেশী দিন বাঁচবেন না। বড়জোর দুবছর বাঁচতে পারেন। তার পর ভেবে দ্যাখ বিপুল সম্পত্তির মালিক তখন আমি। সে সময় আসিস যতটাকার চাকরী চাই—দেব।

—কালকে যে তুই বল্লি আমাকে তোর বাবার কাছে আজ নিয়ে যাবি।

—বলেছিলাম? ও হ্যাঁ-হ্যাঁ। ভুলে গেছি। ডাল ব্রেণ, কিচ্ছু মনে থাকে না। দরোয়ান আবার এসে হাজির।

—এ যাঃ বড্ড দেরী হোয়ে গেল। বলগে আসছি, অভয় বল্ল। দরোয়ান চলে গেল।

—চলরে কিশলয়।

—তোর বাবার কাছে ত ?

—না-না-আগে অনামিকার ব্যাপারটা মিটিয়ে দিই তারপর।

— তাহলে তুই যা অভয়।

—উহুঁ—তাহচ্ছেনা। অভয় আমাকে টেনে নিয়ে চল্ল। নীচে নেমেই চোখ ডলতে ডলতে অভয় বলে··· ঘুম থেকে উঠতে ভয়ানক দেরী হোয়ে গেল। অবলীলা ক্রমে মিথ্যা কথা বলে গেল।

—চলো লেকে যাওয়া যাক। অভয় বল্ল। তিনজনে বাসে উঠলাম।

লেকে এসেই অভয় জেদ ধরলো আমাকে অনামিকার পাশে বসতে হবে আমি কিছুতেই বসব না। অভয় জোর করে বসিয়ে দিল। অভয় অনামিকার অন্যপাশে বসল অর্থাৎ অনামিকা আমাদের দুজনের মাঝখানে। অনামিকার শাড়ীর আঁচলটা বাতাসে বার বার আমার গায়ে এসে ঠেকতে লাগল। আমি জবু থবু হোয়ে বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ চুপ চাপ।

অনামিকাই প্রথমে কথা বল্ল, আমায় বিয়ে করবেত ? ব্যাকুল কণ্ঠস্বর। অভয় কিছুমাত্র বিচলিত হোল না।

অভয় বল্ল—তোমায় বিয়ে করলে বাবা আমায় ত্যাজ্যপুত্র করবেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি তোমার জন্য ত্যাজ্যপুত্র হোতেও পরোয়া করি না, কিন্তু তুমিত জানো অনামিকা, আমার নিজের উপার্জনের ক্ষমতা নেই। ব্যবসা, চাকরী ওসব আমার জন্য নয়, ভগবান আমাকে পৃথিবীতে উপার্জনের জন্য পাঠাননি, শুধু খরচের জন্য পাঠিয়েছেন। যতকাল বেঁচে থাকব, ততকাল পরের উপার্জনের টাকা খরচ করব।

—তুমি উপার্জন না কর আমি করব, অনামিকা বলে।

—স্ত্রীর উপার্জনে খেতে আমার বুঝি লজ্জা করে না।

অনামিকা আর কি কথা বলবে কিছু ঠিক করতে পারেনা। অভয় বলে, বাবা আমায় এই বছরেই বিলেত পাঠাতে চাচ্ছেন। তোমাকে বিয়ে করলে আমার বিলেত যাওয়া নষ্ট হয় অর্থাৎ আমার মানুষ হওয়া আর হবে না, তাই লক্ষী অনামিকা আমার, তুমি আমার মানুষ হবার পথে বাধা দিও না

আমার রাগে সর্বশরীর জ্বলতে লাগলো। অনামিকা কেঁদে ফেল্ল। রুমাল দিয়ে মুখটা চেপে ধরলো। চোখের জলে রুমাল ভিজে গেল। অনামিকা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে—মেয়ে মানুষের কান্না আমি সহ্য করতে পারি না। আমার নিজেরও কেঁদে ফেলবার ইচ্ছা হোল। অভয় হাসতে হাসতে বলে, তোমায় পথে বসতে হবে না অনামিকা, কিশলয় তোমাকে ভালোবাসে। ও যেদিন প্রথম তোমায় দেখেছে সেইদিনই তোমার প্রেমে পরে গেছে, যাকে বলে লাভ য়্যাট ফার্ষ্ট সাইট। হাঁ ভালো কথা, তুমি যদি কিশলয়কে বিয়ে করো, তাহলে আমি কিশলয়ের পাঁচশ-টাকার চাকরী জুটিয়ে দেব।

আমার ইচ্ছা হোল অভয়ের নাকে একটা ঘুষি মারি। কিন্তু অনামিকা তখনো কাঁদছে দেখে কেন জানি না ইচ্ছাটা চেপে গেলাম।

আমি বল্লাম—অভয় যা বলেছে সব মিথ্যা, আমাকে বিশ্বাস করুণ অনামিকাদেবী, আমি আপনাকে ভালোবাসি না।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে অনামিকা বলে, অভয়, তোমার মত বর্বরকে এতো দেরীতে চিনলাম, এই আমার দুঃখ।

বেহায়ার মত হাসতে হাসতে অভয় বলে, তোমাদের বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি যেন পাই। গুডবাই বলে, লম্বা লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি অভয় ভেগে গেল। কেবল আমি আর অনামিকা। জীবনে আমি এমন বিপদে পড়িনি।

—অভয় একটা মিথ্যুক। আমি বল্লাম।

—আপনি ত আবার তারই বন্ধু! আমার কানে যেন বোলতা কামড়ালো। অনামিকা চোখ মুছতে মুছতে চলে যাচ্ছিল। আমিও তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম।

—মাসীর বাড়ী যাচ্ছেন বুঝি ?

—এমুখ নিয়ে ও বাড়ী আর যাবনা।

—জীবনটা কাটাবেন কি করে ?

—কেন সিনেমা অভিনেত্রী হোয়ে···

— সেখানে যদি স্থান না হয়, তবে ?

—নার্স

—সে জীবন···সে আদর্শ···সে ব্রতপালনে যদি অসমর্থ হন!

—তবে ············ তবে ········· পতিতা············

এই কথা বলেই দুহাত দিয়ে দুকান ঢেকে অনামিকা ছুটতে ছুটতে আমার চোখের সাম্নে থেকে দূরে চলে গেল।

অভ্যুদয়—

গত ১১ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, কাপুরচাঁদ লিঃ পরিচালিত রক্সী প্রেক্ষাগৃহটির অভিনব সাজসজ্জা দেখে পথচারীদের বিস্ময়ের অবকাশ ছিল না। যেন কোন আদর্শ মহিমার বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ জ্যোতি···গোধূলীস্নাত তাজমহলের মত তার গা বেয়ে বেয়ে—পথচারীদের আকর্ষণ করতে চায়। পাশপাশের দোকানীদের সচকিত দৃষ্টি—উচ্ছসিত-আলাপন কানে এসে আঘাত করে—প্রেক্ষাগৃহের অভিনব আয়োজনের কথা বার বার বলতে থাকে। আজ যে অভিনয় হবে—তা ব্যক্তিগত মন দেয়া নেয়ার চটুল কথা নিয়ে নয়—ভারতের চল্লিশ কোটী নরনারীর আশা—আকাঙ্খা ভাঙ্গা-গড়ার কথা নিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের অভিনয়—এ অভিনয় গড়ে উঠেছে ভারতের চল্লিশ কোটী নরনারীর

প্রবোধ সান্যাল—'অভ্যুদয়ে'র সূত্রধার রূপে তাঁর নৈপুণ্য অতুলনীয়

সুকৃতি সেন—অভ্যুদয়ের সাফল্যের মূলে এঁর সুর-সংযোজনাকে অস্বীকার করি কী করে?

মুক্তি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে—গড়ে উঠেছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুদয়ের ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস নিয়ে।

বেলা তখন পাঁচটা বেজে গেছে। লোক-সমাগম আরম্ভ হ'য়েছে। একখানি প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে—প্রবেশ পথে পা বাড়ালাম। নির্দিষ্ট আসনে বসে চারিদিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। চতুর্দিকে সজ্জিত—সত্য, ন্যায় ও অহিংসার প্রতীক ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতের জাতীয় পতাকা—প্রেক্ষাগৃহটীকে কত গরীয়সী করে তুলেছে। রক্সীর ঐ রূপ, যাঁরা ওদিন উপস্থিত না ছিলেন, তাঁদের বোঝানো দায়! তার শ্রদ্ধেয় দর্শকদের কাছে নূতন বাণী শোনাতে সে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল—এ বাণী সে আর কোনদিন শোনায় নি—ওদিনের দর্শক সমারোহে সে যতখানি গৌরবান্বিত হ'য়ে উঠেছিল, তার জীবনের ইতিহাসে ততখানি গৌরব আর কোনদিন সে লাভ করেনি।

৭টায় অভিনয় আরম্ভ হবার কথা। আমরা সচকিত

নিরুপমা দেবী (প্রথম অভিনয়ের প্রযোজনা ও পরিচালনা।)

হ'য়ে উঠেছি। মাইক্রোফোনের ভিতর দিয়ে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো: আমাদের অভিনয় ৭টায় আরম্ভ হবার কথা ছিল···কিন্তু কলকাতায় যেসব দেশনেতারা উপস্থিত হ'য়েছেন, এক'দিনের পরিশ্রমে তাঁরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন, আজ এই প্রেক্ষাগৃহে আসবেন একটু আনন্দ উপভোগ করবার জন্য —তাঁদের আসতে একটু বিলম্ব হবে। আমরা আধ ঘণ্টা বাদে অভিনয় আরম্ভ করবো। নেতারা আসছেন—সাধারণ দর্শকের মত—আপনারা দর্শক হিসাবে তাঁদের গ্রহণ করবেন—নীরব অভিনন্দনের ভিতর দিয়ে।"

আমাদের চঞ্চল মুহূর্তগুলি—কাটতে লাগলো—বাইরের মুহুর্মুহু ধ্বনি নেতাদের আগমন ঘোষণা করলো। নীরব অভিনন্দনের ভিতর দিয়ে আমরা তাঁদের আগমনীকে বরণ করে নিলাম।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইড়ু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, আচার্য কৃপালনী, হরেকৃষ্ণ মহাতপ, আচার্য নরেন দেব, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, বেলুচী গান্ধী খান আবদাস সামাদ. শ্রীযুক্ত নগিন দাস টি মাষ্টার, লালা শঙ্করলাল, বিশ্বম্ভর দয়াল ত্রিপাঠী, নাথেলাল পারেখ, কানু গান্ধী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শিবনাথ ব্যানার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, ডাঃ কুমারাপ্পা, শ্রীযুক্তা আভা গান্ধী, সুচেতা কৃপালনী, লাবণ্য প্রভা দত্ত, হেমপ্রভা দাশগুপ্তা, ইন্দিরা গান্ধী, লাবণ্যলতা চন্দ এবং আরো অনেকে এলেন।

শ্রীযুক্তা নাইডু অভিনয়ের উদ্বোধন করতে মাইক্রোফোনের সামনে যেয়ে দাঁড়ালেন। দর্শক ভাড়ে নত প্রেক্ষাগৃহে তাঁর উদ্বোধনী—ঝঙ্কার তুললো: বাংলার দেশ প্রেম, স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদান—ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে অনুপ্রাণিত করেছে—এই বাংলাই আমার পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমি, আমি এজন্য গর্ব অনুভব করি। এদেশ স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে যে ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করেছে—ভারতে তা অতুলনীয়। বাংলা শিল্প-সংগীত চারুকলার জন্য চিরদিন বিখ্যাত। এদেশের শিল্প-সংগীত ও নাটকে দেশপ্রেম ও জাতীয় মর্যাদাবোধ অভিব্যক্তি লাভ করছে। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের অভ্যুদয় নাটকই তার প্রমাণ।"

অভিনয় আরম্ভ হলো। সংস্কৃত নাটকের ধারা অনুসরণ করে সুত্রধার অভিনয়াংশের বিষয়গুলি বলে যেতে লাগলেন—সুত্রধার রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন—বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে—নাটকের আদর্শ বিশ্লেষণ আমাদের অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেয়ে পৌঁছতে লাগলো। শিল্পীরা নৃত্যচ্ছন্দে নাটকের রূপ ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন—শান্তিনিকেতনের পরিবেশের মাঝে নৃত্যের সংগে সামঞ্জস্য ভাবে সংগীতের সুরে চরিত্র গুলির বাণী গীত হ'তে লাগলো।

পর্তুগীজ দস্যুদের এদেশে আগমনের সংগে সংগে সমগ্র ইউরোপের লুন্ঠনকারী বণিকদের লোলুপ দৃষ্টি স্বর্ণময় ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হ'লো। বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এলো—অতিথিপরায়ণ ভারত দিগদেশাগত বুভুক্ষ অতিথিদের

মুখে অন্ন তুলে দিল, পথক্লান্ত অতিথিদের বরণ করে নিল আপন ঘরে আশ্রয় দিয়ে। কে জানতো—কেই বা বুঝেছিল, তাদের ঐ বাইরের বণিকরূপী মুখোসের অন্তরালে রাজনৈতিক কূটচক্রীর রূপ লুকায়িত ছিল। বিস্ময়াভিভূত সরল ভারত – নিজেদের ইচ্ছাকৃত এই সর্বনাশা ভুল বুঝতে পারলো তখন, যখন—"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে।"

বণিকের আস্তিনার মাঝে গোপন অস্ত্রের ঝনঝনায় ভারত বুঝতে পারে তাদের অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁরা সচকিত হ'য়ে ওঠে। নিজেদের শোণিত ধারায় নিজেদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেনা। আজও সে সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়নি। যতবার তাঁরা মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে...বৈদেশিক শৃঙ্খল উন্মোচন করতে—ততবার তাঁদের সকল প্রচেষ্টা শাসক সম্প্রদায়ের সবল ও নির্দয়

বিমল ঘোষ—'মৌমাছি' নামে যিনি সুপরিচিত। বর্তমান অভিনয়ের প্রযোজনা করেছেন।

প্রহ্লাদ দাস—প্রথম অভিনয় থেকেই নৃত্য পরিচালনার দায়িত্ব ছিল এঁর ওপর।

আঘাতে ব্যর্থতায় চুরমার হ'য়ে গেছে। বাইরের আগুন হয়ত তাতে সাময়িক ভাবে নির্বাপিত হ'য়েছে কিন্তু চল্লিশ কোটী নরনারীর অন্তরে অন্তরে দেশপ্রেমের যে দাবানল জ্বলছে, শাসক সম্প্রদায় সে আগুণ নির্বাপিত করবেন কী করে? কোনদিনই তা পারেন নি। বরং ব্যর্থতার আঘাতে সে বাধাপ্রাপ্ত শিখা আরো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে। চল্লিশ কোটি নরনারী যে মহাযজ্ঞের জন্য, চল্লিশ কোটী হৃদপিণ্ড দিয়ে আহুতি দিতে প্রস্তুত, সে মহাযজ্ঞ নষ্ট করবার শক্তি পৃথিবীতে কোন জাতির নেই। হবেও না কোনদিন।

সিপাহী বিদ্রোহের লোমহর্ষ কাহিনী শতাব্দীর পর আজও আমাদের উদ্দীপনা দেয়—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অগ্নি পরীক্ষার কথাও আমরা ভুলিনি—প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর রোলট আইন ও জালিওয়ানাবাগের—হত্যাকাণ্ডেও আমরা ধ্বংস হ'য়ে যাইনি। ভারতের মহামানব মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সত্যাগ্রহী রূপে শত লাঞ্ছনা সহ্য করেও শাসক সম্প্রদায়কে আমরা নৈতিক সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছি—দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধে পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির মুক্তির বাণী প্রচার করে—

মঞ্জুশ্রী দত্ত

তপতী বসু

মন্ত্রে আমরা নূতনভাবে দীক্ষিত হয়ে উঠেছি। নির্যাতিত শোষিত ভারতের জনশক্তির এই প্রাণ প্রাচুর্যের অভ্যুত্থানের ক্রমাভিব্যক্তিই স্থান পেয়েছে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের বর্তমান নৃত্য-নাট্য অভ্যুদয়ে।

রূপ-মঞ্চের আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই আমরা প্রচার করে আসছি—জাতির মুক্তি আন্দোলনের যাত্রাপথে সহায়ক হতে হবে নাট্য-মঞ্চকে। দীনবন্ধু, দ্বিজেন, গিরিশচন্দ্র এই আদর্শে'ই অনুপ্রাণিত হ'য়ে নাট্যশালার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন—বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে মঞ্চ-প্রাঙ্গণে শিশিরকুমারের পা বাড়াবার মূলেও এই একই আদর্শ। দেশবন্ধু জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য দেশগৌরব তাকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য—মহাজাতিসদনের পরিকল্পনা থেকে নাট্যমঞ্চকে বাদ দেন নি—ভারতের পূর্ব প্রান্তে

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নিজের পতাকা শত নির্যাতন সহ্য করেও উড্ডীন রেখেছে। শাসক সম্প্রদায়ের অবিমৃশ্যকারীতা ও শোষণনীতির ফলে—আগষ্ট আন্দোলন ও ১৩৫০শের মন্বন্তরে বহু মূল্যবান জীবন আমাদের বিনষ্ট হ'য়েছে—তবুও আমরা রয়েছি অম্লান—অমননীয়। মুক্তি সংগ্রামের বিগতদিনের শহিদদের কথা স্মরণ করে আমাদের চোখ ছলছল করে ওঠেনি—গভীর শ্রদ্ধায় আমাদের মন ভরে উঠেছে—ভবিষ্যতের কঠোর সংগ্রামের বীর সৈনিকের

শক্তি রায়

অনিল কুমার

উমাপতি সেনগুপ্ত

গুণেন সেন

ভারতের মুক্তি যুদ্ধে নাট্যাভিনয়ের সাহায্য গ্রহণে বিরত হননি।

কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থিত ভারতের বর্তমান এই পাঁচটী পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন থেকে জাতীয় নাট্যশালার ছাপ মেখে জাতীয় আদর্শের যে জারজ রস পরিবেশন করছে—তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠ—বার বার প্রতিঘাতে মিলিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ যে এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টায় যে আশার আলোক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে—আজ সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে তাকে বিশ্লেষণ করবোনা—সর্বান্তকরণে তাঁদের এই শুভ প্রচেষ্টার অম্লান জয় কামনা করবো। অভ্যুদয়ের অভিনয় করে তাঁরা জাতীয় নাট্যমঞ্চগুলির কর্তব্য সম্পর্কে যে দাবী উত্থাপন করলেন—স্থানীয় নাট্যশালার দৃষ্টি আমরা সেদিকে আকর্ষণ করছি—অভিনন্দন জানাচ্ছি কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের প্রতি শিল্পী...প্রতি কর্মীকে—বন্ধু, তোমাদের অভ্যুদয়ের অভিযান সার্থক হউক। —জয়-হিন্দ। শ্রীপার্থিব।

তারা গুপ্তা দীপ্তি সান্যাল

কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘ কর্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। সহ-সভাপতি—শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীসজনীকান্ত দাস, মিঃ হুমায়ুন কবীর। যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুবোধ ঘোষ। সহ-সম্পাদক—শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীঅনাথনাথ বসু। সদস্যগণ—শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীঅতুল সেন,

মঞ্জু সেন

গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়

রমা দাস

গৌরী সেন

অমরেন্দ্র কুমার

উমা দাস

আরতি বিশ্বাস অলকা মিত্র

ভূপেন সেন

মিহির রায় চৌধুরী

অধীর বিশ্বাস

বলাই দত্ত

ভুবনেশ্বর

মাণিক রায়

বাচ্চু রায়

শ্রীঅমল হোম, শ্রীকেদার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীবিজয় দাশগুপ্ত, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমল ঘোষ, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীমন্মথ সান্যাল, মৌলবী মৈনুদ্দীন হোসেন, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী রাণী চন্দ, মৌলবী রেজাউল করিম, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীসরোজ রায়-চৌধুরী, শ্রীসাগরময় ঘোষ, শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুজাতা রায়, শ্রীহরিপদ রায়।

"অভ্যুদয়"—প্রযোজনা—শ্রীবিমল ঘোষ, সুর-সংযোগ ও সংগীত পরিচালনা—শ্রীসুকৃতি সেন,। নৃত্য প্রযোজনা—শ্রীপ্রহ্লাদ দাসও শ্রীঅমরেন্দ্র কুমার। সূত্রধর (আবৃত্তি)—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। সঙ্গীতাংশে—অলকা মিত্র, অরুণা মল্লিক, আরতি বিশ্বাস, উমা দাস, কবিতা রায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী সেন, জয়া দাস, নিরুপমা দেবী, মঞ্জু সেন, মায়া গুপ্ত, রমা গুপ্ত, রমা দাস, লীনা চৌধুরী, সংযুক্তা গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, উমাপতি সেনগুপ্ত, কানাই দত্ত, গুণেন সেন, চুনীলাল দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্র ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, পরিমল রায়চৌধুরী, পরিমল সেন, মণ্টু সিংহ, শিবব্রত রায়, হিতব্রত রায়, হীরক রায়, দীপ্তি মিত্র, চিন্ময়ী ভট্টাচার্য, লীলা রায়, পারুল মুখার্জি, প্রীতি সেন, রমণী দত্ত, অন্নদা ভট্টাচার্য, তারা গাঙ্গুলী, পৃথ্বীশ রায় চৌধুরী, গুনেন সেন। নৃত্যাংশে—তপতী বসু, তারা গুপ্তা, দীপ্তি সান্যাল, মঞ্জুশ্রী দত্ত, মিনতি বসু, মীরা চৌধুরী, নীলিমা দাশগুপ্তা, স্মৃতি চক্রবর্তী, অনিল পাল, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত দাস, অধীর বিশ্বাস, অনিলকুমার, অমরেন্দ্রকুমার, অমল সেন, কুলভূষণ গুপ্ত, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, গোপাল দে, দিলীপ কুমার, বলাই দত্ত, বিমল পাল চৌধুরী, ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন সেন, মিহির রায়চৌধুরী, লাবণ্য ঘোষ, শক্তি রায়, ইন্দ্রনারায়ণ ভৃঙ্গার, অরুণ শান্তি দেও।

আরতি বসু

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

"ভারতের জাতীয় জীবনের সমস্ত মহিমার বিষয় গুলি শিল্পগত প্রকাশলাভ করবে, কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের কাছে আমরা সেই উদ্যোগ, কৃতিত্ব ও সাফল্য আশা করি।"

সুগন্ধে
রূপ হবে রমনীয়
VICTORIA ROSE
• হোয়াইট রোজ—ভোরের শিউলির
মতই টাটকা আর শিশিরের মত স্নিগ্ধ
• ভিক্টোরিয়া রোজ—সর্ব্বজনপ্রিয় বসোরা
গোলাপের অনুপম সৌরভ
• ডা মা স্ক রো জ—প্রাচ্যের লুপ্ত-প্রায়
সৌন্দর্য্যের রেশ........
SERVICE
pmb
পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং, লিঃ কলিকাতা

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও পরিক্রমা—

মঙ্গলবার, ২৫শে, অগ্রহায়ণ। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর প্রবেশ দ্বারে যেয়ে হাজির হ'লুম। ডান দিকে ষ্টুডিওর অফিস। আমাদের আজকের উপস্থিতি—ষ্টুডিও পরিদর্শন করবার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম। ষ্টুডিওর ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত সেন সাদরে আমাদের গ্রহণ করলেন। প্রবীণ চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন—আমার সংগে ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত অজয় বসু। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি 'বঞ্চিতা' বাংলা চিত্রখানি শেষ করে—ভ্যারাইটী পিকচার্সের একখানি হিন্দি চিত্রের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর বর্তমান চিত্রের কথা নিয়ে আলোচনা করলাম। একদিন এই চিত্রের দৃশ্যপটে উপস্থিত থাকবার জন্য আমাদের অনুরোধ জানালেন। 'কলঙ্কিনী'র সমালোচনায় তিনি একটু ব্যথিত হ'য়েছিলেন—আমরা তাঁকে 'রূপ মঞ্চে'র আদর্শ বিশ্লেষণ করে বললাম, চিত্র নির্মাণ সময়ে যে কোন পরিচালকের পরিচালনাধীন যে-কোন চিত্রের প্রচার কার্য মুক্ত কণ্ঠে আমরা করে থাকি—কিন্তু চিত্র সমালোচনার সময় আমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর দুর্বলতার কথা মুক্ত কণ্ঠে বলতে আমরা দ্বিধাবোধ করি না—'রূপ-মঞ্চ' সমালোচক গোষ্ঠীর অন্তরের আদর্শের গতিপথ রুদ্ধ করতে আজ অবধি কোন প্রযোজকই সমর্থ হননি—ভবিষ্যতে যে কোন প্রলোভনের সামনেও আমাদের আদর্শ থাকবে অমননীয়। তাই 'রূপ-মঞ্চে'র নিরপেক্ষ সমালোচনায়—তার স্পষ্টবাদীতায় যদি কোন পরিচালক অথবা প্রযোজক তাকে ভুল বুঝে নিজের শত্রু বলে মনে করে থাকেন—আমাদের যে-কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সে শত্রুতা আমরা মেনে নেবো।' শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বয়সে প্রবীণ, বহুদিন চিত্র পরিচালনা ক্ষেত্রে আছেন···নূতনের আদর্শকে সর্বান্তকরণে তিনি স্বীকার করে নিলেন।

চিত্র শিল্পের উন্নতিতে যে নবীন যাত্রীদল অভিযান শুরু করেছেন—তাদের সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করে শুভাশীষ জানালেন। প্রবীণের উদারতায় নবীনের মন যে শ্রদ্ধায় অবনত হ'য়ে পড়লো—আশা করি আমাদের পাঠক-পাঠিকারা তা উপলব্ধি করবেন।

এবার শ্রীযুক্ত সেন আমাদের নিয়ে ষ্টুডিও পরিক্রমায় বেরোলেন। আমরা প্রথমে গেলাম যে 'ইউনিটে' সেখানে পি, আর প্রডাকসন্সের একটী সেট তৈরী করতে শিল্পী বটু সেন ব্যস্ত ছিলেন। মাঝ বয়সী ভদ্রলোক। কোন দৃশ্যটীকে কীভাবে সাজাতে হবে না হবে—পরিচালকের কাছ থেকে জেনে ঠিক চাহিদামত দৃশ্যটী সাজিয়ে রাখেন। বলতে গেলে ষ্টুডিওর এই আর্ট ডিরেকটর বা শিল্প—নির্দেশক—ছোটখাটো একজন বিশ্বকর্মা। তাঁকে গড়তে না হয় এমন কিছু নেই। রাজরাজার প্রাসাদ থেকে গরীবের কুঁড়ে ঘর অবধি। তাঁর শিল্প-দৃষ্টি হওয়া চাই খুব তীক্ষ্ণ···অভিজ্ঞতা থাকা চাই সর্ববিষয়ে—এই অভিজ্ঞতা, শিল্পদৃষ্টি এবং কর্মনৈপুণ্য দিয়ে তিনি বিভিন্ন চিত্রের চাহিদা মেটাবেন। অন্য কথায় বলতে গেলে তাঁকে যাদুকর বলতে হয়। এই যাদুকরী শক্তির সাহায্যে তিনি ক্যামেরার চোখকে যেমনি ফাঁকি দেন—তেমনি দেন দর্শকের দৃষ্টিকে—ক্যামেরার চোখ দিয়ে দেখা গেল—আমরাও দেখলাম, বা কী চমৎকার একখানি বাড়ী—তার গাঁথুনী কত দৃঢ়...কী সুন্দর তার দর্শন...অনেক সময় ভাবি, ঐ বাড়ীখানা যদি হতো আমার! কিন্তু যখন এই যাদুকর তাঁর বাড়ী তৈরী করতে ব্যস্ত থাকেন...তখন যদি উপস্থিত থাকেন...এক মিনিটেই বলবেন ..না দরকার নেই আমার ও বাড়ীর। তার না আছে ছাদ. .না আছে দেয়াল...আর কাঠামোর কথা যদি বলেন. .সরু কাঠের ফালি ..কাপড় আর তার ওপর রংএর পোঁচ। শ্রীযুক্ত বটু সেন হচ্ছেন ইন্দ্রপুরীর যাদুকর...প্রত্যেক ষ্টুডিওতেই এক একজন যাদুকর থাকেন...তাঁর অধীনে—তাঁর নির্দেশমত কাজ করবার জন্য বহু কর্মী থাকেন। শ্রীযুক্ত সেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ইষ্টার্ণ টকীজের 'নতুন-বৌ'র দৃশ্যপটে হাজির হলাম। নটসূর্য...শ্রীমতী প্রভা ও সন্ধ্যারাণী রূপ-সজ্জা করে বসে আছেন। ইষ্টার্ণ টকীজের

প্রযোজক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার চিত্রখানি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন...দৃশ্য গ্রহণের বিলম্ব থাকাতে পরে উপস্থিত থাকবো বলে কথা দিয়ে আমরা নিকটস্থ 'সাউণ্ড-ভ্যানে'র কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। শব্দযন্ত্রী জে, ডি, ইরাণী পাশেই অপেক্ষায় ছিলেন. .তাঁর 'সাউণ্ড-ভ্যানে'র ভোজবাজী উদ্ঘাটনে এগিয়ে এলেন। মাইক চুম্বকটী দ্বারা শব্দ আকর্ষিত হ'য়ে কীভাবে তরঙ্গায়িত হয়... ইনডিকেটর বা নির্দেশকের দোলনে শব্দযন্ত্রী কী ভাবে শব্দের গতিবেগের তারতম্য উপলব্ধি করে শব্দ গ্রহণ করেন...মিঃ ইরাণী আমাদের তা বুঝিয়ে দিতে 'সাউণ্ড-ভ্যানে'র ভিতর নিয়ে গেলেন। তাঁর সহকারীকে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। সহকারী ভদ্রলোক এবং আরো কয়েকজন মাইকের নীচে যেয়ে দাঁড়ালেন ..তাঁরা মহা সমস্যায় পড়ে গেছেন...শব্দ গ্রহণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা তা বেশ বুঝতে পারলাম। কথা বলতে হবে, অথচ কী কথা তাঁরা বলবেন? সেখানে শিল্পীরাও উপস্থিত ছিলেন...মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এত যাঁরা কথা বলেন...এসময় কারোরই মুখে বলার মত কোন কথা আসছিলনা। মিঃ ইরাণী তখন তাঁর অপর সহকারীদের হাতে আমাদের ছেড়ে দিয়ে, নিজেই গেলেন কথা বলতে...যিনি অসংখ্য শিল্পীর কণ্ঠস্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁর কণ্ঠস্বরের পরীক্ষা দিতে হলো আমাদের কাছে। মিঃ ইরাণী ছোট বেলার একটা ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। 'ইনডিকেটর' মিঃ ইরাণীর উচ্চারিত শব্দ গ্রহণ করে তার তরঙ্গায়িত গতি আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে লাগলো। শব্দ এবং ছবি দু'টোর সংগে সামঞ্জস্য রেখে কীভাবে 'ফিল্ম' মুদ্রণ করা হয়, প্রদর্শক যন্ত্রের সাহায্যে কেমন ভাবে রূপালী পর্দায় নিষ্প্রাণ চরিত্রগুলি

যান্ত্রিক কারসাজিতে আমাদের কাছে প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে, মিঃ ইরাণী আমাদের তা বিশ্লেষণ করে বলতে লাগলেন। শব্দের যে মায়াজাল মিঃ ইরাণী ও তাঁর সহযোগীরা চিত্রের মারফৎ আমাদের সামনে বিস্তার করেন...ব্যক্তিগত ভাবে তার রহস্য আবিষ্কার করেই খুশী হলুম না...'রূপ-মঞ্চে'র পাতায় 'রূপ-মঞ্চ' পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও সে রহস্য উদ্ঘাটনের অনুরোধ জানালুম মিঃ ইরাণীকে। তিনি স্বীকৃত হলেন।

এরপর যে ইউনিটে যেয়ে আমরা হাজির হলুম 'কৃষ্ণ-লীলা'র দৃশ্যপট গড়ে উঠেছে সেখানে। ইউনিটের বাইরে প্রাচীন আমলের রথ পড়ে রয়েছে। এখানে ওখানে সাজ-সরঞ্জাম বিক্ষিপ্ত পড়ে রয়েছে...পরিচালক দেবকী বসু ব্যস্ততায় মত্ত। চিত্র-শিল্পী অজয় করের সংগে আলাপ হ'লো। ছোট-খাটো মানুষটী কিন্তু তাই বলে তাঁর দায়িত্ব প্রচুর...একখানি চিত্রের সার্থকতার মূলে চিত্র-শিল্পীর রূপ-সৃষ্টির ক্ষমতাকে অস্বীকার করবার সাধ্য কার? শ্রীমতী কানন দেবী রূপ সজ্জা করে অনতিদূরে দাঁড়িয়ে কয়েকখানা গানের রেকর্ডিং শুনছিলেন...সংগীত পরিচালক কমল দাশগুপ্ত তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন...দেবী মুখার্জি রূপ-সজ্জা নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরছিলেন, আমরা যেয়ে দাড়ালাম একটু দূরে। কিছুক্ষণ বাদে কমল বাবু এলেন আমাদের কাছে...নিরীহ ভদ্রলোক। কথা বলেন খুব কম। সুরের মায়াজালে যে লোকটী বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সর্বশ্রেণীর দর্শকদের অন্তর জয় করতে সক্ষম হ'য়েছেন... ব্যক্তিগত আলাপেও কেউ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারবেন না...তাঁর সরল বেশভূষা, অমায়িক ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ না হ'য়ে পারিনি। বাইরে থেকে এই লোকটীকে দেখে মনে হবে...কী এমন অসাধারনত্ব লুকিয়ে আছে তাঁর ভিতর? তিনি নিজের চারিদিকে যেন একটা গণ্ডি দিয়ে রাখেন...যাঁরা আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে তাঁকে জানতে পারেন...তাঁরাই সংগীত শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অনুরাগের পরিচয় পাবেন।

শ্রীমতী কাননকে আমরা এড়িয়ে গেলাম...অথবা তিনি আমাদের এড়িয়ে গেলেন...দুটোই হতে পারে।

শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ পরিচালিত 'মৌচাকে ঢিল' চিত্রে নবাগতা সমিতা দেবী

আমরা এড়িয়ে গেলাম এইজন্য—সাংবাদিকদের সম্পর্কে তাঁর একটা অভিমত আমাদের কানে এসেছিল—তিনি নাকি সাংবাদিকদের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন, **(I am fed up with the Journalists)** যদি তা সত্যও না হয়—'রূপ-মঞ্চ' সাংবাদিকেরা তাঁর কাছ থেকে যে অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছেন—তা মনে করে আত্ম-সম্মানের খাতিরেই আমরা সরে দাঁড়ালাম। 'রূপ-মঞ্চে'র তরফ থেকে বারবার তাঁর সংগে চিত্রশিল্প সম্পর্কিত আলাপ আলোচনার জন্য আবেদন করা সত্বেও—তার উত্তর দেবার সৌজন্যবোধটুকুর পরিচয়ও আমরা পাইনি—শিল্পী হিসাবে শ্রীমতী কানন যতখানি উন্নতির শিখরে উঠতে পেরেছেন—সাংবাদিকরূপে আমরা হয়ত ততটা যেয়ে উঠতে পারিনি···তাই আমাদের সংগে আলাপ আলোচনা করবার প্রবৃত্তি তাঁর নাও হ'তে পারে!

পরিচালক বন্ধু নীরেন লাহিড়ী এসে উপস্থিত হ'লেন। যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় সব সময়েই যিনি টগবগ করছেন···বাঙ্গালী দর্শকের মনোরঞ্জনে যাঁর মস্তিষ্ক এতটুকুও অলস ভাবে নেই। আরও বহু সময় ষ্টুডিওতে তাঁকে দেখেছি—একটী মুহূর্তও বৃথা কাটাতে তাঁকে দেখিনি। হাতে কাজ নেই—বা যা আছে—সহকর্মীরা তা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে

পড়েছেন—তিনি বেঞ্চের উপর বসে ষ্টুডিওর হই-হট্টগোলের মাঝেও বই নিয়ে পড়ছেন! ষ্টুডিও আবহাওয়ায় এ দৃশ্য সচরাচর চোখে পড়ে না। পড়লে যে আনন্দ লাগে সে আর বেশী কথা কী? ভাবীকাল তখনও মুক্তিলাভ করেনি—ভাবীকালের 'আগমন' কেবল ঘোষিত হয়েছে, ভাবীকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন...'আমি নূতন কিছু দেবার চেষ্টা করেছি—কতখানি কৃতকার্য হ'য়েছি...সে বিচার করবেন আপনারা...সাংবাদিকেরা ও বাঙ্গালী দর্শক সমাজ।' তাঁর বর্তমান চিত্রে—আরোগ্য উপন্যাসের সে কাহিনীটাকে রূপায়িত করে তুলছেন... তারও প্রায় অর্ধেক শেষ করে এনেছেন। এছাড়া চিত্রবাণী লিঃ এর 'এইতো জীবন'-এর প্রযোজনা নিয়েও তিনি ব্যস্ত আছেন...তাঁরই নির্দেশনায় শ্রীযুক্ত মানু সেন ও ধীরেশ ঘোষ চিত্রখানি পরিচালনা করছেন।

ষ্টুডিওর রসায়নাগার বা লেবরেটরীতে যেয়ে আমরা হাজির হলাম। প্রথম যেয়ে যে ঘরটায় প্রবেশ করলাম... আমাদের আশ্চর্যের অবধি রইল না...এ্যারোপ্লেন তৈরী হচ্ছে নাকি? আমাদের ভুল ভেংগে গেল তখনই... এ্যারোপ্লেনের খাঁচা বলে যেটাকে মনে করেছিলাম, তার সত্যিকারের রূপটা আবিষ্কার করলাম যখন। ঠিক এ্যারোপ্লেনের খাঁচার মত বিরাট একটা খাঁচা তাতে ফিল্ম গুটিয়ে ধোয়া হচ্ছে...উপরে চলছে বৈদ্যুতিক পাখা, সংগে সংগে ফিল্ম শুকিয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে এঁকে বেঁকে যাওয়া রাস্তা দিয়ে যেখানে ঢুকলাম, সে একটা অন্ধকার কারাগৃহ...বাইরের জগতের সংগে যেন এর কোন যোগ নেই...সূর্যের আলোক প্রবেশ করবার এখানে কোন পথ নেই...এটা হলো ষ্টুডিওর "ডার্ক-রুম"। ফিল্ম কী করে মুদ্রণ করা হয়, কার্যরত বিশেষজ্ঞরা আমাদের তা বুঝিয়ে দিলেন।

চিত্র সম্পাদকের ঘরে যেয়ে উপস্থিত হলাম। কাঁটাছাটা করা এর কাজ...বাইরে থেকে মনে হয় এ আর এমন কঠিন কী? কিন্তু তাঁর কাজেও দায়িত্ব কম নয়। একটা টেবিলের সামনে তিনি বসে আছেন...পাশে তাঁর মেসিনটি, এই মেসিনটি বলতে গেলে একটা ছোটখাটো প্রদর্শক যন্ত্র... এই মেসিনের সাহায্যে শব্দ এবং চিত্রের সংগে সামঞ্জস্য

রেখে চিত্র সম্পাদককে কাজ করতে হয়। একটু ভুল হলে আর উপায় নেই...তখন দেখবেন ছবির মুখ নাড়ার সংগে তার কথা বলার সামঞ্জস্য থাকবে না।

ষ্টুডিওতে ছোটখাটো একটী 'সিনেমা' হলও রয়েছে। যেসব সিনেমা হলের সংগে আমারা পরিচিত.. এই সিনেমা গৃহটি ঠিক তদনুরূপ সজ্জিত। প্রদর্শক যন্ত্রের সাহায্যে রূপালী পর্দায় এখানেও ছবি দেখানো হয়। তবে দর্শকেরা হচ্ছেন আমাদের থেকে পৃথক—চিত্র নির্মাণ শেষ হবার পর—বিশেষজ্ঞরা এখানে ছবি প্রথম দেখে থাকেন...দোষগুণ বিচার করে তার ওপর চলে চিত্র সম্পাদকের কাঁচি। এই প্রেক্ষাগৃহটী দ্বিতলে অবস্থিত। এরই নীচে রসায়নাগার...তারই পার্শ্বে আর একটী 'ইউনিট' সেখানটায় কোন কাজ হচ্ছিল না। দ্বিতল থেকে আমরা বৈদ্যুতিক আলো গুলি কীভাবে সাজানো হয় তা দেখলাম।

মডার্ণ টকীজের 'সংগ্রামের' একটী দৃশ্যে সাবিত্রী ও বিপিন মুখার্জি।

ষ্টুডিওর 'রূপ-সজ্জা বিভাগটীতে উপস্থিত হ'লে ভারী হাসি পায়...বিশেষ করে যখন শিল্পীরা রূপ-সজ্জায় ব্যস্ত থাকেন। অবশ্য আমরা যেয়ে যেখানে হাজির হলাম, সেখানে কেবল অভিনেতারা রূপ-সজ্জা করে থাকেন। অভিনেত্রীদের জন্য পৃথক ঘর। (এমন কী বিশেষ বিশেষ প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীদের জন্য আবার পৃথক পৃথক ঘর থাকে) সবে মাত্র একজন শিল্পী তাঁর বা দিকের গোঁফটা লাগিয়েছেন, ডানদিকটা তখনও বাকী...আমাদের সংগে আলাপ করতে লাগলেন। কেউ হয়ত পরচুলা একটা দিকের লাগিয়েছেন—বিরাট টাকের পর দিয়ে কেমন কুচ কুচে ভুল ভুলে চুল গজিয়ে উঠছে...কথা বলাত দূরের কথা, তখনকার শিল্পীদের সেই অসমাপ্ত সজ্জা দেখে হাসিই চেপে রাখতে পারছিলুম না। ভুল হয়েছিল আমাদেরই মস্ত, একটা ক্যামেরা যদি সংগে থাকতো তবে ফটো তুলে নিতাম...কেমনভাবে রূপ-সজ্জাকরের সুনিপুণ হাতের সাহায্যে শিল্পীরা আমাদের চোখে ধুলো দেন, তা আপনারা বেশ পরিষ্কার করে বুঝতে পারতেন। এত গেল শিল্পীরা যে ঘরে বসে রূপ-সজ্জা করেন...সেখানকার কথা...এবার শ্রীযুক্ত সেন ইন্দ্রপুরীর অতুল ঐশ্বর্যের মাঝে আমাদের নিয়ে হাজির করলেন...অর্থাৎ যে ঘর থেকে রূপসজ্জাকরের চাহিদা মত মাল সরবরাহ করা হয়...রূপ-সজ্জার গুদম ঘর বা 'ষ্টোর-রুমে' যেয়ে আমরা হাজির হলাম। একটা মেঝের সম্পূর্ণ দ্বিতলে প্রকাণ্ড একটী হল ঘরকে 'Store room' করা হ'য়েছে। এখানে না আছে এমন জিনিষ নেই... ছেড়া জুতো থেকে নবাব বাদশাদের মূল্যবান পাদুকা... রাজরাজাদের পোষাক থেকে ভিখিরীর জীর্ণ বস্ত্র... পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যোদ্ধাদের তরোয়াল, তীর ধনুক থেকে বর্তমানের অশীতিপর বৃদ্ধের যষ্টি। নারদের

পরচলা থেকে কেবলরাম পণ্ডিতের টিকি। মোট কথা মানুষ হারালে মানুষ...গরু হারালে গরু সব কিছু পাওয়া যাবে এই ঘরে। কত রূপ-কুমারীদের পায়ের নূপুর...কত রাজা-রাণীদের ঝলমলো পোষাক আমাদের চোখ ঝলসে দিল। এমনকি মরার মাথার খুলি অবধি আমাদের তাজ্জব বানিয়ে দিল। দ্বিতলের এই সাজ ঘর থেকে আমরা ছাদে যেয়ে ষ্টুডিওর সীমানার একটা আঁচ পেলাম।

এরপর এলাম মডেল বিভাগে। মৃত-শিল্পীরা কাগজ, মাটি, খড়, কাঠ আর বাঁশ দিয়ে মডেল তৈরী করছেন। এদেরই নিপুণ হাতের ছোয়াচে নিষ্প্রাণ গাছ...জীবন্ত হ'য়ে ছবির ভিতর আমাদের চোখে ধরা দেয়। কত প্রস্তর যুগের কারুকার্য খোচিত চিত্রাবলী সংগ্রহ করে রাখা হ'য়েছে এই মডেল বিভাগে।

ষ্টুডিওর আসবাব গৃহটী আসবাবে পরিপূর্ণ। কখনও ওরা দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ-সভার শোভা বর্ধন করছে, কখনও বা আমাদের বিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত ঘরে স্থান পাচ্ছে। ষ্টুডিওর আওতায় এসে ঐ নিষ্প্রাণ...অচল আসবাব গুলি কিন্তু বেশ পরিভ্রমণ করে বেড়াতে পারে। যুদ্ধের সময়ও 'ভ্রমণ কমান' বিজ্ঞাপন ওদের ভ্রমণে বাধা-সৃষ্টি করতে পারেনি।

ষ্টুডিওর নিজস্ব 'ফিল্ম' যেখানে রাখা হয় সে ঘরটীও আমরা পরিদর্শন করলুম...আর একটা নির্মীয়মান মেঝেও দেখলাম। তারপর এসে হাজির হলাম 'নতুন বৌ'-এর দৃশ্যপটে। 'নতুন-বৌ'কে দেখবার উৎসুক্য সকলেরই মনে জাগে বৈকী? 'নতুন বৌ'এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন প্রযোজক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার। তাঁর সহকর্মীরা সবাই নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত.. সুরেনবাবু আমাদের সাদরে গ্রহণ করে বল্লেন, "আজ আপনারা অতিথি। আমার 'সেটে' এসেছেন, ব্যবসায়গত মনোমালিন্য যতই থাকনা কেন, আপনাদের উপস্থিতিতে খুবই খুশী হ'য়েছি।" সুরেন বাবুর আতিথেয়তা সশ্রদ্ধ ভাবে গ্রহণ করে আমরা বলাম, "ব্যবসায়গত মতানৈক্য যতই থাক না কেন, নিছক কর্তব্যের অনুরোধেই আমরা এখানে আজ উপস্থিত হ'য়েছি। ব্যবসায়-স্বার্থের দিক বিচার করে 'রূপ-মঞ্চ' কোনদিন কারো প্রচার কার্য করেনা...আপনি একজন বাঙালী প্রযোজক...আপনার চিত্রের প্রচার কার্য নিঃস্বার্থ ভাবেই আমরা করবো।

বিজ্ঞাপনের পাতা মেপে কোন'দিন রূপ-মঞ্চ কারো নিন্দাস্তুতি করে না—সুযোগ সুবিধানুযায়ীই রূপ-মঞ্চ কর্তব্যবোধে প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের প্রচার কার্য করে থাকে। চিত্র শিল্পের প্রসার ও সুষ্ঠুগতি নিয়ন্ত্রণের আদর্শে রূপ-মঞ্চের প্রচার কার্য অনুপ্রাণিত।" চিত্রশিল্পী শচীনদাশ-গুপ্ত এলেন। খদ্দরের পোষাক পরিহিত এই শিল্পীটির সংগে ইতিপূর্বে পরিচয় হয়নি—কয়েক মিনিটের আলাপে তাঁর হৃদয়ের যে পরিচয় পেলাম, তা ম[illegible]বে অনেকদিন। চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হবে—তিনি তাঁর [illegible]রা সংস্থাপনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। সুরেন বাবু চিত্রনাট্যের খাতা নিয়ে শিল্পীদের অভিনয়াংশগুলি বলে যেতে লাগলেন। আমাদের পেছন থেকে শ্রীমান জহর একবার উঁকি মেরে গেলেন—ঘাড় ফিরিয়ে নীরব অভিনন্দন জানালুম তাঁকে। এই আত্মভোলা অভিনেতাটী যখনই কোথাও উপস্থিত হউন না কেন--কারো দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হন না। কী যে আছে ওর ঐ কাঠখোট্টা ষণ্ডা মার্কা চেহারা ও চাহনীতে!—

আমাদের দৃষ্টি সামনের একটা তুলসীমঞ্চের ওপর যেয়ে পড়লো। তার উপরে ঝুলছিলো মাইক যন্ত্রটী। তুলসীমঞ্চকে কেন্দ্র করে চিত্রশিল্পী তাঁর ক্যামেরা সংস্থাপনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন—তুলসীমঞ্চের ও পাশে একটা কুঁড়ে ঘর—কুঁড়ে ঘরের দু'পাশে কলা গাছের ঝাড়। কুঁড়ে ঘরের বারান্দায় রয়েছে তরকারী কোটার কাটারী—তরকারীর ঝুড়ি—আরও সাংসারিক তৈজসপত্র। তার জানলা বেয়ে ধুম নির্গত হতে হতে জানালার মুখের দেয়ালকে কলঙ্কিত করে তুলেছে। ঘরটী বোধ হয় রান্না ঘর। শ্রীমতী প্রভা তুলসীমঞ্চের কাছে এসে দাঁড়ালেন। "Scilent please" সমস্ত দৃশ্যপটটী নিঝুম হ'য়ে এলো। শ্রীযুক্ত সরকারের সহকারী 'ক্লাপ-ষ্টিক' দিয়ে সংকেত ধ্বনি করে চিত্রগ্রহণের নির্দেশ দিয়ে গেলেন। অহীনবাবু চটির ফটর ফটর আওয়াজ করতে করতে ঢুকে

শ্রীমতী প্রভাকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন, 'আচ্ছা বৌদি, শুনলাম— সুরেশ জমিটা বিক্রী করবে...শ্রীমতী প্রভা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'।' অহীন বাবুর আশ্চর্যের অবধি রইল না। তিনি প্রত্যোত্তরে বল্লেন, 'হ্যাঁ, তুমিও মত দিয়েছো নাকি?' "খারাপ কাজ হ'লে মত দিতাম না, ভাল কাজ।" "ভাল কাজ! জমি বিক্রী করে ভিখিরী খাওয়ানো..." শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়েছিলেন আস্তে আস্তে তিনি এসে অহীন বাবুর পার্শ্বে দাঁড়ালেন.. "হ্যাঁ বাবা, চাঁদা উঠছে না কিনা...তাই। চাঁদা উঠলে জমি বিক্রী করতে হতো না। তুমি কত চাঁদা দেবে বাবা?" "তাহ'লে তুইও বুঝি ঐ ভিখিরী খাওয়ার দলে ভিড়েছিস? সুরেশ ফিরলে একবার পাঠিয়ে দিস।" অহীন বাবু চলে গেলেন। পরিচালক 'O. K.' "বলে ঐ দৃশ্যটির চিত্রগ্রহণ অনুমোদন করলেন। আবার দৃশ্যপটটি মুখরা হ'য়ে উঠলো। পঞ্চাশের মন্বন্তরে 'নতুন বৌ'র কাহিনী গড়ে উঠেছে কিনা শ্রীযুক্ত সরকারকে জিজ্ঞাসা করে তা সঠিক জেনে নিলাম। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে বাজে...বেশীক্ষণ সময় আর আমাদের হাতে ছিল না। ওদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বক্তৃতার সময় ছিল সন্ধ্যা ৬টা, ৭টায় ছিল আবার কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের 'অভ্যুদয়ের' অভিনয়

'গৃহলক্ষ্মী'র একটী দৃশ্যে পদ্মা দেবী ও পূর্ণিমা

রক্ষীতে, দু জায়গায়ই উপস্থিত থাকতে হবে...তাই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে হলো...অহীনদা তাঁর চির স্নেহমাখা স্বরে..."ভায়া আমার অভিনন্দন ও শুভ কামনা নিও" বলে বিদায় দিলেন। শ্রীযুক্ত সরকার ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর অফিস কক্ষে এলাম। শ্রীমতী রেণুকা আমাদের আগমন শুনে অপেক্ষা কচ্ছিলেন...তাঁর প্রাণ-প্রাচুর্য হাসি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। সবেমাত্র তিনি কাশী থেকে ফিরেছেন...'রূপ-মঞ্চে'র প্রতিনিধিরা ষ্টুডিও পরিদর্শনে এসেছেন শুনে তিনি আলাপ করবার জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলেন। রূপ-মঞ্চের কথা শ্রীমতী রেণুকাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'রূপ-মঞ্চের জন্য আমি অস্থির হ'য়ে থাকি·· রূপ-মঞ্চের প্রশংসা আমায় প্রেরণা দেয়... রূপ-মঞ্চের সমালোচনা আমায় দুর্বলতা শুধরে নিতে সাহায্য করে···রূপ-মঞ্চের আমি হচ্ছি এক নম্বরের পাঠিকা।' রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকাদের তরফ থেকে তার এরূপ একজন দরদী শিল্পীর নিজের কথা শুনবার জন্য তাঁর সুযোগ ও সুবিধা মত কিছুটা সময় কেড়ে নেবো—একথা বলাতে শ্রীমতী রেণুকা গভীর আন্তরিকতার সংগে সম্মতি জানালেন। ষ্টুডিওর বিভিন্ন বিভাগ থেকে তাঁর ডাকাডাকি আসাতে তাঁকে তাড়াতাড়ি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হলো।

ক্লান্তিতে আমরা ঝিমিয়ে পড়ছিলাম। অবশ্য শ্রীযুক্ত সুরেন সরকার কিছুটা তাজা করে দিয়েছিলেন, তবু আমাদের ক্লান্তি শ্রীযুক্ত সেন উপলব্ধি করে পূর্বে থেকেই প্রচুর আয়োজন করে রেখেছিলেন—। টোষ্টে কামর দিতে দিতে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর আরও জ্ঞাতব্য সংবাদগুলি আমরা টুকে নিচ্ছিলাম।

রায়বাহাদুর শুকলাল কার্ণানী ম্যাডান কোম্পানীর কাছ থেকে এই ষ্টুডিওটী ক্রয় করেন। ষ্টুডিওর কাজ তদারক করতেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র স্বর্গতঃ রায় সাহেব চন্দ্রমল কার্ণানী। পুত্রের অকাল মৃত্যুতে রায়বাহাদুর ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু যে আদর্শ নিয়ে তিনি চিত্রজগতে প্রবেশ করেন—পুত্র শোকাতুর বৃদ্ধের সে আদর্শ তাঁর সুযোগ্য পৌত্র ইন্দ্রকুমার কোনদিনই ব্যাহত হতে

লেন নি—। পৌত্রকে অবলম্বন করে রায় বাহাদুর ষ্টুডিওর অভ্যন্তরীন উন্নতিতে আবার তৎপর হ'য়ে ওঠেন। টালীগঞ্জ ট্রাম ডিপো সংলগ্ন প্রশস্ত জায়গায় এই বিরাট ষ্টুডিওটী অবস্থিত। ট্রাম থেকে দু'এক মিনিটের পথ এগোলেই ষ্টুডিওর প্রবেশ পথ। তিনটি প্রশস্ত মেঝেতে এতদিন চিত্রগ্রহণের কাজে চলতো। বর্তমানে আরো একটি মেঝে (floor) তৈরী হচ্ছে। নৃত্য এবং সংগীত রিহার্সেলের জন্য পৃথক হল ঘর আছে। অভিনেত্রীদের বিশ্রামাগারও আছে। মডেল বিভাগ, শিল্প বিভাগ, রূপ-সজ্জা বিভাগ, রসায়নাগার, প্রযোজনা বিভাগ—আলোক বিভাগ, প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে প্রায় দেড়শত জন কর্মী এই ষ্টুডিওতে কাজ করেন। চারিটি ক্যামেরা, চারিটী সাউণ্ড ভ্যান (একটী সংগীত বিভাগের জন্য) এই ষ্টুডিওতে আছে। চিত্রবিভাগের ভার নিয়ে আছেন চিত্রশিল্পী সুরেশ দাশ, অজয়কর, শচীন দাশগুপ্ত এছাড়া রয়েছেন এঁদের সহকর্মিরা ও আলোক শিল্পীরা, শব্দগ্রহণ বিভাগের ভার নিয়ে আছেন শব্দ যন্ত্রী গৌর দাস, জে, ডি, ইরাণী, শিশির চট্টোপাধ্যায়ও সত্যেন ঘোষ। এঁদের সাহায্য করবার জন্য রয়েছেন একদল সুযোগ্য কর্মী। রসায়না-গারের ভার রয়েছে শ্রীযুক্ত ধীরেন দাশগুপ্তের ওপর। মিঃ এস, সামসুদ্দিন চিত্র সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে আছেন। মিঃ নারায়ণ দাশ এর সুযোগ্য সহকারী। আমাদের বিশেষ যত্ন সহকারে ইনি চিত্র সম্পাদকের কারসাজী দেখান। শ্রীযুক্ত সুধীর সরকার প্রয়োজনা বিভাগ তদারক করেন। ষ্টুডিওটী তত্ত্বাবধানের ও প্রচার বিভাগের ভার রয়েছে শ্রীযুক্ত অজিত সেনের ওপর। ষ্টুডিওর ক্যাসিয়ার হচ্ছেন মিঃ, বি, কে, পাল, টাকা পয়সার আদান প্রদান তাঁরই হাত দিয়ে হ'য়ে থাকে। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওটী সাধা-রনতঃ পৃথক পৃথক প্রযোজকদের ভাড়া দেওয়া হ'য়ে থাকে। তাছাড়া এঁদের নিজেদের পরিবেশনা ও প্রযোজনা বিভাগও রয়েছে।

পাঁচটা বেজে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। শ্রীযুক্ত অজিত সেন ও জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে আমরা ষ্টুডিও থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।—শ্রীপার্থিব।

রূপ-মঞ্চ রবীন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডার

(পূর্বে প্রকাশিতের পর) কলিকাতা অলিম্পিক ক্লাব—২৲ উমা দত্ত—১৲ রূপ-মঞ্চ পত্রিকা (দ্বিতীয় দফায়)—২৲। মোট আদায়ীকৃত ৩২৫৲ টাকা প্রথম দফায় নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডারের সম্পাদককে প্রদান করা হ'য়েছে।)

শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র কুমার সেন মারফৎ রূপ-মঞ্চের সুদূর বম্বের পাঠক এবং পৃষ্ঠপোষকবর্গের নিকট হ'তে সম্প্রতি প্রাপ্ত অর্থের তালিকা :

আর, আর, গোপাল	১০৲
টি, পি, সোমদার	১০৲
এস, শ্রীনিবাসন	৫৲
পি, কেলু	৫৲
এম, আর, মানিকম	৭৲
সুবোধ কহালী...	৫৲
সৌরেন্দ্র কুমার সেন	২০৲
এম, সিংহ	২৲
ডি, সিংহ	১৲
এম, এ, খান...	১৲
পি, ডি, সিংহ	১৲
প্রেম, কুমার	২৲
হুসেন	৩৲
পদ্মা নাভান	২৲
আর, এল, শর্মা	৫৲
এস, কে, শর্মা	৫৲
আর, ডি, আর, দাশ	৫৲
এম, কে, শঙ্করম	৫৲
জি, পি, চন্দোলা	৫৲
শিসপদ রায় চৌধুরী	৫৲

চিত্র-সংবাদ ও নানাকথা

ভাবীকাল—

রচনা: প্রেমেন্দ্র মিত্র, পরিচালনা—নীরেন লাহিড়ী, আবহ-সংগীত—কমল দাশগুপ্ত। চিত্রগ্রহণ—অজয় কর, শব্দগ্রহণ—গৌর দাস, রসায়নাগার—ধীরেন দাশগুপ্ত, অভিনয়াংশে—দেবী মুখার্জি, জহর, রবীন, মিহির, রতীন, অমর মল্লিক, ফণীরায়, ছায়া, রবিরায়, হরিধন, চন্দ্রাবতী, মীরা দত্ত, সিপ্রাদেবী প্রভৃতি।

কে, বি, পিকচার্সের 'ভাবীকাল' এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় মিনার, ছবিঘর ও বিজলীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। বাংলা চিত্র শিল্প যে সর্বনাশা গতিপথ বেয়ে চলছে···এপথ বেয়ে যদি চলতে থাকে, কোনদিন সে তার গন্তব্যে যেয়ে পৌছতে পারবে না—পারবে না সে তার অভীষ্টকে লাভ করতে। চলচ্চিত্র যাদের কাছে শিল্প বলে পরিগণিত নয়—সে সব অদূরদর্শীদের মতবাদকে আমাদের অবজ্ঞা করেই চলতে হবে। জাতীয় মহত্তর কল্যাণের বীজ চলচ্চিত্রের ভিতর নিহিত রয়েছে বলে আমরা যাঁরা বিশ্বাস করি—চলচ্চিত্রের গতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিতে হবে তাঁদেরই। বৈদেশিক সরকার যেখানে জনসাধারণের টুটি টিপে ধরে রেখেছেন, জাতির কৃষ্টি, শিল্পকলা ও সভ্যতার গতি যে তারা রুদ্ধ করে রাখবেন—তাত আমরা জানি। তাই আজ যদি বৈদেশিক সরকারের আওতায় এই শিল্পটী সহজভাবে প্রসারলাভ করতে না পারে, তবেই তার দিক থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবার কোন যুক্তি থাকতে পারে না যেমন—তেমনি পারে না তার সম্ভাব্যকে তাচ্ছিল্যের আঘাতে পদদলিত করবার। সোভিয়েট রাশিয়াতে চলচ্চিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-রূপে বিবেচিত হ'য়েছে। জাতির সর্বপ্রকার উন্নতিতে তার কর্মদক্ষতা আমাদের বিস্ময়াভিভূত করেছে। জাতীয় সরকার যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হবে—জাতির শাসন কার্য পরিচালনার জন্ত—ততদিন কোন শিল্পেরই সুষ্ঠুরূপ আশা করা আমাদের দুরাশামাত্র। তাই বলে নৈরাশ্যের হাহাকারে হাবুডুবু খাবার সপক্ষেও কোন যুক্তি দেখতে পাই না। আধারের বুকচিরে আমাদের যে অভিযান সুরু হ'য়েছে—সপ্তরঙ্গে তা একদিন রঞ্জিত হ'য়ে উঠবেই।

আমাদের চিত্রশিল্পের যাঁরা কর্ণধার—যাঁরা এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁরা জানেন, তাঁদের পথ কণ্টকাকীর্ণ, তাঁরা যে পথ বেয়ে, যে ভাবে চলতে চাইবেন, সে পথের প্রতি বাঁকে বাঁকে 'Road closed' এর সাইন বোর্ড অথবা নিষেধাজ্ঞা জারী করা হ'য়েছে—তাই দেখে যদি তাঁরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেন—তাঁদের সেই ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিতে পারবো না কোন মতেই। বরং অনুরোধ জানাবো: অন্ত কোন সবল কর্ণধারের হাতে দায়িত্ব সপে দিয়ে সড়ে দাঁড়াতে। আমাদের গন্তব্য যদি তাঁরা জানেন, সমস্ত বাধা নিষেধ এড়িয়ে অথবা ডিঙ্গিয়ে সুচতুর ভাবে তাঁদের চলতে হবে। আজ চলচ্চিত্র শিল্পের এই শোচনীয় মুহূর্তে সেই সুচতুর কাণ্ডারী-দেরই আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

বাংলা ছায়াজগতে কয়েকখানা বিশেষ চিত্রের আবির্ভাবে ছায়া চিত্রের শুভযুগের সূচনা ঘোষিত হ'য়েছে সন্দেহ নেই। যাঁরা এই সব সার্থক চিত্র সৃষ্টির মূলে রয়েছেন, তাঁদের পৃথকভাবে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি—আজও একবার সমষ্টিগতভাবে তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই কাণ্ডারীদের দলে আমি তাঁদেরই টানবো, চিরাচরিত পথ বেয়ে যাঁরা চলেননি—বৈশিষ্ঠ্যের ছাপ নিয়ে যাঁরা আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য চিত্র 'ভাবীকাল' এই বৈশিষ্ঠ্যের ছাপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে—তাই তার পরিচালক নীরেন লাহিড়ী ও কাহিনীকার প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রেমেন্দ্র মিত্র খ্যাতনামা সাহিত্যিক, চিত্র পরিচালনা ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করতে পারেননি সত্য—কিন্তু তাঁর আহুতি, সমাধান, দাবী, বিদেশিনী, পথবেঁধে দিল, প্রতিকার—প্রভৃতি চিত্রগুলির কাহিনীর ভিতর যে-ছাপ ছিলো—তাকে আমরা অস্বীকার করবো কী করে? তাঁর বর্তমান কাহিনী 'ভাবীকাল'

আরও সুষ্ঠু রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতদিনকার কাহিনীতে একটা অস্পষ্ট ধূমায়িত ভাব থাকতো কিন্তু ভাবীকাল যে গঠনমূলক কার্যের ইংগিত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে—ইতিপূর্বে তা আমরা দেখতে পাই নি অপর চিত্রে। প্রেমেন্দ্রবাবুর সাফল্যমণ্ডিত চিত্র 'সমাধান' দেখে অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন—'সমাধান' কোথায়? ভাবীকালের কাহিনীকারকে সে বাকবিতণ্ডার উত্তর দিতে হবে না। গ্রামের জন্ম—থেকে আধুনিক সভ্যতার উপযোগী তার রূপ দিতে প্রেমেন্দ্র বাবু পিছু হটেননি। আমাদের সমাজজীবনে অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা—ধর্মের কুসংস্কার কি ভাবে পঙ্গুতা আনে-এবং তার হাত থেকে সমাজকে সতর্ক হতেই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন গঠনমূলক কার্যের ভিতর দিয়ে। মিউনিসিপ্যাল বা পৌরকার্য কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে সে কথাও বলতে তিনি ভুল করেন নি। সংবাদ পত্র কি ভাবে জনমত গঠন করতে পারে—কি তার আদর্শ, কিভাবে তাকে প্রলোভনের হাত থেকে বাঁচতে হবে—এবং সর্বোপরি সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুবশক্তির অমননীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়ে তিনি যেমনি আশাদীপ্ত ভাবীকালের ছবি এঁকেছেন, তেমনি ভাবীকাল চিত্রখানির মর্যাদা বাড়িয়েছেন অনেকখানি।

এই চিত্রের পরিচালনা যিনি করেছেন—ইতি পূর্বে কোন বিশেষ ছাপ নিয়ে তিনি আমাদের কাছে দেখা দেননি সত্য, তবে জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে বিচার করলে—তাঁর পরিচালিত চিত্র দর্শক মনোরঞ্জনে যে সমর্থ হ'য়েছে সেকথা স্বীকার্য। তবে নূতন কিছু দেবার আশ্বাস তিনি সব সময়েই আমাদের দিয়ে এসেছেন। এবং এবার সে আশ্বাস ফলবতী হ'য়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই চিত্রে তিনি যে সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছেন—তার প্রশংসা না করে পারবো না। এতদিন সংগীত বর্জিত বাংলা চিত্রের কল্পনা করাটাই আমাদের পক্ষে দুরূহ ছিল—অথচ পরিস্থিতি বিবেচনা না করে পরিচালকদের সংগীত সংস্থাপনে বাঙালী দর্শক মন বিষিয়ে উঠছিল—তাছাড়া যে চটুল প্রেম ভূতের মত চিত্র পরিচালকদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল, তাকেও কিছুতেই তারা ঝেড়ে-ফেলতে পারেন নি। কিন্তু আলোচ্য চিত্রের পরিচালক এই দুটোকেই সবল হস্তে বর্জন করে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন—তা শুধু প্রশংসারই নয়, বাংলা চিত্রের আশাদীপ্ত ভবিষ্যতেরও নির্দেশ দিয়েছে। ভাবীকালের সার্থকতার জন্য তার পরিচালক এবং কাহিনীকার এই দুই স্রষ্টাকে আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এবার ভাবীকালের ভিতর যে সব দুর্বলতার পরিচয় পেয়েছি সে সব সম্পর্কে দু' একটী কথা বলতে চাই। প্রথম, কাহিনীতে তিন পুরুষ দেখানো হ'য়েছে—যুবক শিবনাথ চৌধুরী ও তার শিশু পুত্র থেকে—বৃদ্ধ শিবনাথ—ও তার মধ্যবয়সী পুত্র সোমনাথ এবং যুবক ইন্দ্রনাথ—এই দীর্ঘ সময়ের ঘটনা গুলি ১১,০০০ ফিটের ভিতর ফুটিয়ে তুলতে যেয়ে অনেক ঘটনাগুলি যেমনি আকস্মিক মনে হ'য়েছে—অনেকগুলি আবার সুষ্ঠুভাবে ফুটেও ওঠেনি। যেমন চিত্রের প্রারম্ভেই শিবনাথ চৌধুরীর গৃহত্যাগ দর্শকদের কাছে একটু আকস্মিকই মনে হয়। তারপর শিবনাথ চৌধুরী যখন মায়াঘাটে ফিরে এলেন, যাবার সময় দেখানো হ'য়েছে, ষ্টীমারে তিনি মায়াঘাট পরিত্যাগ করলেন অথচ ফেরার সময় মনে হলো এই পাশের কোন গা থেকে এলেন। ইন্দ্রনাথের মায়াঘাটে আসাটাও ঠিক অনুরূপ। গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে যখন শিবনাথ চৌধুরী প্রতাপ সিং পরগণার জঙ্গলের ভিতর এলেন—বটগাছের নীচে তাদের আশ্রয় গ্রহণ খুবই বিশদৃশ্য লাগে। কাছে যদি গ্রামই না থাকবে তবে সাধন ওরা এলো কোত্থেকে? আর শিবনাথের স্ত্রীর মৃত্যুও আকস্মিক। এবং সবচেয়ে আরও বেশী আকস্মিক হ'লো স্ত্রীর স্মৃতি সৌধ নির্মাণ। জনহীন ঐ অঞ্চলে এগারো দিনের মধ্যে ছোট হলেও যে স্মৃতি মন্দির গড়ে উঠেছে—এবং দীর্ঘদিনেও যখন তা অটুটই ছিল (নিশ্চয়ই ভিত্তি ছিল পোক্ত) তা কিরূপ ভাবে গড়ে উঠলো। তারপর যেদিন খাল কাটা শেষ হলো, খাল দিয়ে যখন প্রথম লোক এলো, যে ঘাটে দাঁড়িয়ে মনোহর,

শিবনাথ আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করে আনলো—সেই ঘাট যে নূতন ঘাট নয়—ক্যামেরার চোখ যে আমাদের তা বলতে ভোলেনি। অর্থাৎ নূতন কোন ঘাটের তীর ওরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় দেখা যায় না। যে ঘাটটী দেখানো হ'য়েছে চিত্রে, সে ঘাট বহুদিনের পুরোণ ঘাট। বহুলোকের যাতায়াতে সে ক্ষয় প্রাপ্ত হ'য়ে উঠেছে। তারপর মুষ্টিমেয় কয়েকটী গুণ্ডা দিয়ে কেদার সান্যাল যে ভাবে অত্যাচার করতে লাগলো তাও নেহাৎ ছেলেমানুষীর মত দেখানো হ'য়েছে। যখনই কোন নগর গড়ে উঠলো—সেখানে নিশ্চয়ই থানা থাকবে—যেখানে মিউনিসিপ্যাল রয়েছে সেখানে সরকারী শাসনের কোন চিহ্নও নেই। এ অঞ্চলটা কি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত কোন অঞ্চল? জহর অভিনীত চরিত্রটীও আকস্মিক। সম্ভবতঃ রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে মনোহর মাষ্টারের অনুরূপ চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজন বোধেই পরিচালক এরূপ করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন, তবু তার একটা পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। কেদার সান্যালের মেয়ে এবং সোমনাথের পরিচয়ের দৃশ্যটীরও প্রশংসা করতে পারবো না। এমনি আরো খুঁটি নাটি ত্রুটি যে ভাবীকালে না আছে তা নয়, তবু-ভাবীকালের পরিচালক যে সবল মনের পরিচয় দিয়েছেন—তার কাছে উল্লেযোগ্য নয়।

অভিনয়ে শিবনাথের ভূমিকায় দেবী মুখার্জির প্রশংসা করবো সর্বাগ্রে। শিবনাথের পুত্রবধূরূপে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী আমাদের খুশী করেছেন। পুত্র সোমনাথের ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্য ব্যর্থ। ইন্দ্রনাথরূপে রবীন মজুমদার তাঁর অপরাপর চিত্রের অভিনয় থেকে বেশী প্রশংসার দাবী করতে পারেন। রবি রায়ের সাধন, স্বর্গতঃ রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোহর মাষ্টার, ফণী রায়ের সম্পাদক প্রশংসনীয়। নবাগতা শ্রীমতী সিপ্রা দেবীর প্রতিভা বিকাশের যদিও কোন সুযোগ বিশেষ ছিল না, তবু

তাঁর চেহারা, কণ্ঠস্বর এবং অভিব্যক্তি তাঁর ভাবী অভিনেত্রী জীবনের সম্ভাব্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। কূটচক্রী কেদার সান্যালরূপে অমর মল্লিক তাঁর পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

চিত্রগ্রহণ প্রশংসনীয়। শব্দ গ্রহণে মাঝে মাঝে বিকৃত ভাব পরিলক্ষিত হ'য়েছে। সর্বশেষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবো কর্তৃপক্ষকে, বাঙ্গালী দর্শক সাধারণের তরফ থেকে—চিত্রখানিকে বাংলার তরুণ নট স্বর্গত রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে বলে। —শ্রীপার্থিব

গৃহলক্ষ্মী

কাহিনী—নিজস্ব। সংলাপ—বিধায়ক ভট্টাচার্য। সুরশিল্পী—হিমাংশু দত্ত। গীতিকার—শৈলেন রায়। চিত্রগ্রহণ-বীরেন দে' শব্দযন্ত্রী-পুরুষোত্তম গোয়েঙ্কা। পরিচালনা-গুনময় বন্দ্যোপাধায়। অভিনয়াংশে—অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, চন্দ্রাবতী, পদ্মাদেবী, পূর্ণিমা, রাজলক্ষ্মী, তুলসী লাহিড়ী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত প্রভৃতি।

সমালোচনার পূর্বে প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি, রূপ-মঞ্চ সমালোচকেরা রূপ-মঞ্চের পয়সা খরচ করেই সাধারণ দর্শকদের একজন হ'য়ে চিত্র বা নাটকের অভিনয় দেখে থাকেন। 'প্রেস-সো' বলে সাংবাদিকদের জন্য চিত্র ও নাট্য প্রতিষ্ঠান গুলি যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকেন—নিমন্ত্রিত হয়ে সে সব প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকলেও সমালোচনা করবার জন্য আমরা টিকিট কেটেই অভিনয় দেখে থাকি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, দর্শক সাধারণের একজন হ'য়ে যেমনি দর্শক মনের সমষ্টিগত অনুভূতির সংগে নিজেদের অনুভূতিকে যাচাই করে নিতে পারবো—তেমনি দর্শকদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ থাকবে সমসূত্রে গাঁথা।

শ্রীভারতলক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ চিত্র (!)(প্রোগ্রামপুস্তিকায় অনুরূপ উল্লিখিত হ'য়েছে) গৃহলক্ষ্মী সম্প্রতি আমরা দেখে এসেছি। চিত্রখানি রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। গৃহলক্ষ্মীর কাহিনী-নিজস্ব। এই 'নিজস্ব' বলতে কন্ত ? এসম্পর্কে আমাদের কাছে জনৈক পত্রলেখক একটা গুরুতর কথা লিখেছেন : শুনলাম গৃহলক্ষ্মীর কাহিনীটা কোন দুস্থ অখ্যাতনামা সাহিত্যিকের কাছ থেকে পঞ্চাশটি মুদ্রায় ক্রয় করা হ'য়েছিল। কাহিনীটি যত নিকৃষ্টই হউক না কেন এবং যত কম মূল্যেই ক্রয় করা হউক না কেন, কর্তৃপক্ষ সেই কাহিনীকারের নাম প্রকাশ করলেন না কেন ?" পত্রলেখকের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়—। কর্তৃপক্ষ কাহিনীটাকে নিজস্ব বলে অভিহিত করাতে যেমনি আমাদের একটা ধোয়াটে আবর্তের মাঝে ফেলেছেন, তেমনি দর্শকদের মাঝে আবার যে গুজব ছড়িয়ে পড়ছে, তার সত্য মিথ্যা নিরুপণ করতে পারেন একমাত্র কর্তৃপক্ষই। তবে আমরা 'নিজস্ব' বলতে কর্তৃপক্ষকেই মনে করে চিত্র-সমলোচনা করবো।

এই 'নিজস্ব' বলতে একজনও হ'তে পারেন, বহু ও হ'তে পারেন—বহু উর্বর মস্তিষ্কের সন্ধিতেও এই কাহিনীর জন্ম হতে পারে—কারণ কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের মূলতঃ একজনই। কিন্তু তিনি বহুরূপে বিরাজ করেন—বা বিকশিত হ'য়ে ওঠেন। 'একোহহং বহু স্যাম' আর কি! চিত্র প্রযোজকদের এই 'একোহহং বহুস্যাম' রূপই আমাদের সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হয়। আমি প্রযোজক, আমি চিত্র জগতের সর্বভূতে বিরাজিত—কাহিনী, পরিচালনা, অভিনয়—সংগীত—নৃত্য—সর্ববিষয়েই আমার দক্ষতা অপরের চেয়ে বেশী', চিত্র প্রযোজকদের এই মনোভাব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, নইলে বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্বশীল কর্মী থাকা সত্বেও তাঁরা তাঁদের ওপর কর্তৃত্ব করতে যেতেন না, এখানেও ঠিক তাই—কোন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের স্বাধীন কলম থেকে যে এরূপ কাহিনীর উদ্ভব সম্ভব নয়, একথা জোর করেই আমরা বলতে পারি—হলেও তিনি সাহিত্যিক জগতের কোন সভ্য নন—চিত্র প্রযোজকদের সৃষ্ট ভিন্ন জাতের এক পদার্থ। তবে এই নিজস্ব একবচনই হউন আর বহু বচনই হউন—অন্ততঃ এখন একবচন ধরে নিয়েই সেই প্রতিভাধরের উদ্দেশ্য মিনতি জানিয়ে বলছি, হে অদৃশ্য

প্রতিভা, তুমি যেখানেই অবস্থান করো—আমাদের আকুল মিনতিতে সাড়া দিও—হে গুণীশ্রেষ্ঠ, তুমি আর কিছু করতে পারো বা না পারো—বাংলা চিত্রজগতের অগ্রগতি শুধু দ্বন্ধই করতে সক্ষম নও—দশবছর ধরে বাংলা চিত্রজগত যতখানি অগ্রসর হতে পেরেছিল, তুমি তোমার কাহিনীর অত্যাশ্চর্য মহিমায় তাকে দশবছর পেছিয়ে দিতে সক্ষম, তোমার লেখনি এ্যাটমবোমা থেকেও তাই শক্তিশালী। পবননন্দন বীর হনুমান সূর্যকে অবরোধ করে যে বীরত্ব ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিল, তুমি বিংশ শতাব্দীতে সেই শক্তি নিয়ে জন্মলাভ করেছো—তোমার লেখনী সমস্ত চিত্রজগৎকে দশবছর পেছনে ঠেলতে সক্ষম হয়েছে—তাই তোমাকেও কপীন্দ্রানুরূপ বীর ভেবে আমাদের কোটি কোটি নমস্কার জানাচ্ছি।

আলোচ্য চিত্রের কাহিনী গড়ে উঠেছে চিত্রজগতের চিরপরিচিত দশবছর পূর্বেকার সেই গৃহকোণের বাংলার কুল বধূকে নিয়ে—যিনি উচ্ছৃঙ্খল স্বামী দেবতাটীকে নিজের সতীত্বের বলে গোয়ালিনীর মোহজাল বিস্তার করে গৃহকোণে আবার ফিরিয়ে আনলেন, তারই এক 'লোমহর্ষ' 'অত্যাশ্চর্য'—'চাঞ্চল্যকর' ঘটনা নিয়ে। বাংলার গৃহকোণের বধূকে নিয়ে আলোচ্য চিত্রে যে ভাবে টানা হ্যাচড়া করা হ'য়েছে—তাতে কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে—বধূ হয়েছেন ষ্টুডিওর বধূ—বাংলার বধূর সম্পর্কে তাদের যে আদৌজ্ঞান নেই—এবং সেই নির্লজ্জতার কথা বেশ পরিষ্কার ভাবেই আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

তাই বাংলার বধূকে নিয়ে যে ভাবে টানাটানি করে ছেন এবং তার সতীত্বের মহিমা প্রচারে—যে পথ বেয়ে চলেছেন তাতে বধূ মহিমা প্রচারিত হয় নি...বরং তাতে বধূর শ্লীলতা হানিই হ'য়েছে...তাই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যদি শ্লীলতা হানির অভিযোগ আনা হয়, তার বিরুদ্ধে কি তারা কি জবাব দেবেন ?

বাংলার বধূর (অবশ্য চিত্রজাগতিক) সতীত্বের মহিমা কীর্তন করতে যেয়ে অনাবশ্যক ভাবে কর্তৃপক্ষ যে সব ঘটনা সংস্থাপন করেছেন...তাতে তাদের সুস্থ মনের পরিচয় পাইনি মোটেই। ষ্টুডিওর আবহাওয়ার এবং বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মীদের ব্যঙ্গ করতে যেয়ে কর্তৃপক্ষ যে সব দৃশ্যের অবতারণা করেছেন.. তাতে নিজেদের ছেলেমানুষী স্পর্ধারই শুধু পরিচয় দেন নি···অন্তত তাদের সম্পর্কে (তাদের বলতে আলোচ্য চিত্রের নির্মাণ মূলে যাঁরা) একটা সুস্পষ্ট ধারনা করবার সুযোগ পেয়েছেন দর্শক সমাজ। স্পর্ধা বললাম এইজন্য, যাদের রয়েছে অসংখ্য ক্রটী···সেইক্রটি সম্পর্কে যারা মোটেই সচেতন নয়... তারা অপরকে ব্যঙ্গ করতে যান কোন স্পর্ধায় ? তাই ষ্টুডিওর আভ্যন্তরীন গলদের যে ব্যঙ্গরূপ দেখতে পেয়েছি আলোচ্য চিত্রে, তাতে হাসিই পেয়েছে তার ব্যঙ্গ রূপের সুষ্ঠু পনিবেশনে নয়...কর্তৃপক্ষের হাস্যাস্পদ স্পর্ধার কথা চিন্তা করে। আজীবন চুরি করে যে লোক—চৌর্য বৃত্তির জন্য অপরকে দোষারোপ করে এবং চৌর্যবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হ'তে উপদেশ দেয়, তার সেই হিতোপদেশ শুনে যে ধরণের হাসি পাওয়া স্বাভাবিক, আলোচ্য চিত্রের ঐ ব্যঙ্গ দৃশ্য গুলিও আমাদের অনুরূপ হাসিয়েছে।

চিত্রের পরিচালক—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়...সংলাপ মধুসংলাপী বিধায়কের। গীতরচনা করেছেন শ্রদ্ধেয় শৈলেন রায়...পৃথকভাবে এঁদের বিশেষ কিছুই বলবার নেই···কি বা বলবার আছে ? এরা সকলেই যে আমাদের হতবাক্ করে ফেলেছেন। কাহিনীর বীভৎসতা—সংলাপের কদর্যতা—গীতরচনায় ভাব এবং শব্দের চটুলতা—পারচালনায় অপটুতা আমাদের এদের সকলেব ওপর যে অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়েছে সেকথা বলতে গভীর ব্যথাই অনুভব করছি।

সবচেয়ে আমাদের আশ্চর্য লাগে 'সেন্সর-বোর্ড' এসব চিত্র অনুমোদন করেন কি করে ? তার সভ্যরা শিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন এবং অনেকেই দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তাদের কি শিল্পদৃষ্টি বলে কোন দৃষ্টি নেই ? তারা কি শুধু কোন যায়গাটায় সরকারের বিরুদ্ধে বলা হলো, এই টুকুই লক্ষ্য করে চিত্র প্রদর্শনের জন্য অনুমোদন করেন ? কিন্তু আমরাত জানি...শিল্পোৎকর্ষের দায়িত্বও অনেক খানি তাদেরওপর আছে। যদি তা বিচার করবার তাদের

ক্ষমতা না থাকে, তবে ঐ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের সভ্য-থেকে তারা অবসর নিয়ে উপযুক্তের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেন না কেন? অভিনয়ে মিঃ নাগের ভূমিকায় স্বর্গত রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই উল্লেখ করতে হয়। মিঃ নাগের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হ'য়েছে নিখুঁত। অভিনাংশে অন্যান্য শিল্পীরা যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা নয়···কিন্তু চিত্রের বিকট পরিস্থিতির মাঝে তাঁরা সকলেই তলিয়ে গেছেন।

বাঙ্গালী দর্শক দিন দিন যে সুরুচী সম্পন্ন হ'য়ে উঠছেন, এই চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বিরত হ'য়ে আশা করি কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট উত্তর দেবেন। চিত্রখানি দেখে আমরা যে প্রবঞ্চিত হ'য়েছি...চিত্রখানি সম্পর্কে সেই কথা বলেই দর্শক সাধারণকে সতর্ক করিয়ে দিতে চাই। —শ্রী পার্থিব

মডার্ণ টকীজ

মডার্ণ টকীজের নির্মীয়মান চিত্র 'সংগ্রাম' দর্শক সাধারণের কাছে বিশেষ দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে বলে কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন। খ্যাতনামা নাট্যকার ও কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে বর্তমান চিত্রখানি গড়ে উঠেছে। আজীবন দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, দেশের বিভিন্ন সমস্যার সংগে নিতাই বাবুর যথেষ্ট পরিচয় আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বিভিন্ন মানুষের সংগে ঘনিষ্ট ভাবে মিশে নিতাই বাবু মানব চরিত্রের প্রতিটি অলিগলির সন্ধান জানতেও সক্ষম হয়েছেন···তাঁর বর্তমান কাহিনীতে তাই প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত রূপই পরিগ্রহণ করেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রের মনস্তত্ব বিশ্লেষণে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাবে। তাঁর প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত রূপ পরিগ্রহণ করে আশা আকাঙ্খার প্রতীক-রূপে দেখা দেবে। শোষিত এবং শোষক, হিংসা··· এবং অহিংসার রূপ বিশ্লেষণে নিতাই বাবু যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন চিত্রখানি মুক্তিলাভ করবার পর দর্শকেরা তার বিচার করতে পারবেন।

কাহিনীর ট্র জটিলতা যথাযথ ভাবে রূপায়িত করে তুলতে পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। ছবি বিশ্বাস, মলিনা, জীবন বসু, সন্ধ্যারাণী, বিপিন মুখার্জি, সাবিত্রী, রবিরায়, সুশীল রায়, রেবা বসু, মাষ্টার শম্ভু, সন্তোষ সিংহ, বটুগাঙ্গুলী, প্রভৃতি আরো অনেক সংগ্রামের অভিনয়াংশে রয়েছেন। এসকে প্রভাকসন্সের পরিবেশনায় চিত্রখানি মুক্তি লাভ করবে।

ইউনিটি প্রডাকসন্স

প্রযোজক পরিচালক রামেশ্বর শর্মা তাঁর 'তপস্যার' কাজ ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। নায়ক নায়িকারূপে শ্রীমতী কৌশল্যা ও অজিত অভিনয় করছেন। শিল্পী চারুরায় 'তপস্যার শিল্প নির্দেশক রূপে কাজ করছেন। চিত্রগ্রহণের কাজ করছেন মিঃ জি, কে, মেঠা এবং সংগীত পরিচালনা করছেন মিঃ গণপৎরাও তপস্যার কাজ শেষ করে জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্যের জীবনী ও দার্শনিক মতবাদ অবলম্বনে মিঃ শর্মা একখানি চিত্র নির্মাণের মনস্থ করেছেন।

পরাশের ব্রাদার্স

এদের আগামী চিত্র পাঞ্জাবের খ্যাতনামা কবি "সৈয়দ ওয়ারীশা"র জীবনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। চিত্রখানির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন লাহরীরাম পরাশর। চিত্রখানিকে নিখুঁত করে তুলতে কর্তৃপক্ষ বহু অর্থ ব্যয় করছেন—জাকজমকময় দৃশ্যপট দর্শক সাধারণকে অভিভূত করবে।

ইষ্টার্ণ টকীজ

ইষ্টার্ণ টকীজর বর্তমান বাংলা চিত্র 'নতুন বৌ'র পরিচালনা ভার প্রযোজক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার নিজেই গ্রহণ করেছেন। 'নতুন-বৌ এর কাহিনী রচনাও সুরেন বাবুর। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, দেবী মুখার্জি, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী, জীবেন বসু, নৃপতি চট্টো, শ্যাম লাহা, কানু বন্দ্যো (এঃ) পশুপতি কুণ্ডু, নবদ্বীপ হালদার, রেনুকা দেবী, সন্ধ্যাবাণী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী রাণীবালা প্রভৃতি। নতুন-বৌ-এর সংগীত পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত সুবল দাশগুপ্ত। চিত্রগ্রহণ ও শব্দ গ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীযুক্ত শচীন দাশগুপ্ত ও মিঃ জে,ডি, ইরাণী।

চিত্র-মঞ্চ

পিপলস থিয়েটার (বম্বে)

বম্বের পিপলস থিয়েটার প্রযোজিত 'দি পিপল ইন চিলড্রেন অফ দি আর্থ' চিত্রখানির সম্পর্কে আমাদের বহু পাঠক পাঠিকা অনুসন্ধান করে চিঠি লিখেছেন। চিত্রখানি সম্পর্কে বিস্তারীত আমরা এখনও বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। আমরাও পিপলস থিয়েটারের উক্ত চিত্রের জন্ত উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছি।

রাজকমল কলা মন্দির (বম্বে)

পরিচালক ভী সান্তারাম প্রযোজিত রাজকমল কলামন্দিরের Dr. Kotnis-Ki-Amar-Kahaniর সংবাদ জানবার জন্তও বহু পাঠক পাঠিকাদের কাছথেকে আমরা পত্র পেয়েছি। চিত্রখানির প্রধানাংশে অভিনয় করছেন ভী সান্তারাম ও তাঁর স্ত্রী জয়শ্রী দেবী এবং অপরাংশে দেওয়ান সারার, বাবুরাও পেণ্ডরকার, ভিনায়ক, উলহাস জানকীদাশ প্রভৃতিকেও দেখা যাবে।

ভ্যারাইটী পিকচার্স

ভ্যারাইটী পিকচার্সের হিন্দী চিত্র 'প্রেম-কি দুনিয়া' ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে শ্রীযুক্ত জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চ সাফল্য নাটক 'পি ডবলিউ ডি' র কাহিনী অবলম্বনে 'প্রেম-কি দুনিয়া' গড়ে উঠেছে। এর বিভিনাংশে অভিনয় করছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, অলকনন্দা, আমিনা খাতুন, ছবি বিশ্বাস, নবাগতা কল্পনা রায়, রাজলক্ষ্মী, বসির হোসেন প্রভৃতি। প্রযোজক শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন বসু চিত্রখানির সাফল্যের জন্য পূর্বে থেকেই যত্নবান হয়ে উঠেছেন।

সিনে প্রডিউসার্স

শ্রীযুক্ত গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এদের 'মাতৃহারা'র চিত্রগ্রহণ কালীফিল্মস ষ্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, কানু বন্দ্যো, ভূপেন চক্র, কমল মিত্র, বেচু সিংহ, মঞ্জিনা, রাজলক্ষ্মী এবং আরো অনেকে এর বিভিনাংশে অভিনয় করছেন।

কাপুরচাঁদ লিঃ

কাপুরচাঁদ লিঃ পরিচালিত প্যারাডাইস চিত্রগৃহে বম্বের ফিল্মিস্তান প্রযোজিত মজদুর চিত্রখানি মুক্তিলাভ করেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত নীতীন বসু। কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

মজদুর এবং মালিকের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে আলোচ্য চিত্রের কাহিনী গড়ে উঠেছে। কাহিনীর নূতনত্ব কিছুই নেই। অবাস্তবতায় তার গতিপথ কলঙ্কিত। চরিত্র সৃষ্টিতেও কাহিনীকার বা পরিচালক কোন নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। চিত্রের প্রথমাংশ নেহাৎ হাস্যাস্পদ বলেই মনে হয়। দ্বিতীয়ার্ধে মজদুরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের আদর্শ এবং শক্তি বিশ্লেষণে কাহিনীকার কৃতকার্য হ'য়েছেন। সমস্ত চিত্রের শুধু এই অংশটুকুর জন্তই কাহিনীকার এবং পরিচালককে প্রশংসা করতে পারি। ট্রেড ইউনিয়নের শক্তিকে নষ্ট করবার জন্য কর্তৃপক্ষের কুট চক্রান্ত এবং শেষ পর্যন্ত প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীর আত্মবিশ্বাসের জয় যে ভাবে চিত্রে ফুটে উঠেছে—তাও প্রশংসার যোগ্য। চিত্রখানির সংগীত দর্শক সাধারনকে আনন্দ দেবে। দৃশ্যপট এবং আনুসংগিকও উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলার খ্যাতনামা পরিচালক নীতীন বসুর ঘটনা সংস্থাপনা ও চরিত্র বিশ্লেষণের অজ্ঞতার কথা যে মজদুরে প্রকাশ পেয়েছে সেকথা নিসন্দেহে বলতে পারি।

অভিনয়ে কে এন, সিং এর কথাই সর্বাগ্রে বলতে হয়। ইন্দুমতীর বলে যে অভিনেত্রীটীর দর্শণ পেয়েছি তার সম্ভাব্যকেও অস্বীকার করবো না। নায়ক রূপে একটী নূতন অভিনেতা নিরাশ করেছেন। কাপুর চাঁদ লিঃ এর পরিবেশনায় ইউনাইটেড ফিল্মের ভাইজান চিত্রখানি আগামী ৪ঠা জানুয়ারী থেকে ক্রাউন সিনেমায় প্রদর্শিত হবে। ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শে চিত্রখানি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শানিরাজ, নূরজাঁ, করণ দেওয়ানও মীনা।

রূপশ্রী লিঃ—

রূপশ্রী লিঃ-এ 'মৌচাকে ঢিল' আগামী জানুয়ারীতে মুক্তিলাভ করবে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর মৌচাকে ঢিল নাটক কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে।

রূপ-মঞ্চ

৬ষ্ঠ বর্ষ ★ ১ম সংখ্যা ★ ফাল্গুন ★ ১৩৫২

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্য-কলার সচিত্র মাসিক।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মুখপত্র।

কার্যালয়ঃ
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ফোন: বি, বি,: { ৪২৯২ / ৫২০৪

প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে প্রতি সংখ্যার: মূল্য আট আনা।

সডাক এক বছরের গ্রাহক মূল্য আট টাকা।

এক বছরের কম কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না।

নূতন লেখকদের উপযুক্ত রচনা রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হয়।

অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠাবার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি না।

—পৃষ্ঠপোষকতায়—

নিতাইচরণ সেন
এন, সি, ঘোষ
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
বিভূতি ভূষণ দত্ত
দীনেশ দত্ত
এস, কে, রায়
এইচ বোর্ণ

আমাদের আজকের কথা—

রূপ-মঞ্চ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করলো। প্রথম বর্ষেই সে সবল শিশুর প্রাণ প্রাচুর্য নিয়ে পাঠক সাধারণেব দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হ'য়েছিল। পাঠক সাধারণেব সস্নেহ দৃষ্টির মাঝখান দিয়ে পুষ্টিলাভ করে—সে তার সাফল্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শিশু জীবনের কত ভুল ত্রুটি—কত দুষ্টুমী ভরা দৌরাত্ম পাঠক সাধারণ মহানুভবতার সংগে সহ্য করেছেন। অভিজ্ঞের উপদেশ—নির্দেশকের আদেশ মাথা পেতে নিয়ে বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে রূপ-মঞ্চ অতীতের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে নিতে যত্নপর হ'য়ে উঠেছে।

আমরা জানি—সময় মত রূপ-মঞ্চ আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি—আমরা বুঝি, পাঠাক সাধাবণের অধীব চাঞ্চল্য উপশম করতে রূপ-মঞ্চ নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করতে পাবেনি—রূপ মঞ্চের বিরুদ্ধে পাঠক সাধারণের এইটাই সবচেয়ে প্রধান অভিযোগ। রূপ-মঞ্চের পাঠক গোষ্ঠীর দরদী মনের পরিচয় পেয়েছি তখনই—তখনই তাঁদের মহানুভবতায় আমাদের মস্তক শ্রদ্ধা ভরে অবনত হয়ে এসেছে—যখন দেখেছি, অনাদরের আঘাত হেনে তারা রূপ-মঞ্চের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি—বরং অভিভাবকের মত তার অতীত ও বর্তমানের ভুল ত্রুটির সমালোচনা কবে নিখুঁত ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করে নিয়েছেন। কাগজ নেই—কাজ কববাব লোক নেই—নেই আর্থিক সংগতি—তবু রূপ-মঞ্চেব কর্মীরা নিরুৎসাহ হননি—রূপ-মঞ্চের যে শক্তিশালী গোষ্ঠী পেছনে থেকে আমাদেব মনোবল, আমাদের আদর্শকে উজ্জীবিত রেখেছেন—তারই প্রেরণায় সমস্ত বাধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে আমরা পথ চলতে পেরেছি।

আঁধাবের বুক চিরে পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের যাত্রাপথ অংকিত—পথ দ্রষ্টার নির্ঘোষিত ধ্বনি—আমাদের মন্থর গতিকে চঞ্চল করে তুলছে—পর্বত শিখরে আমাদের আরোহণ করতে হবে—সেইত আমাদের গন্তব্য। কত জংগল, কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আমাদের চলতে হবে—আমাদের গন্তব্য, আমাদেব পূর্ণ স্বাধীনতা—চল্লিশ কোটী নির্যাতিত—শোষিত জনসাধারণের স্বাধীনতা - যে পথ বেয়ে আমরা চলবো, আমাদেব পূর্ব পথ প্রদর্শকগণ তা তৈরী করে গেছেন। পরাজয়ের গ্লানিমা আমাদের গতিকে রুদ্ধ করতে পারবে না, অতীতের মত নূতন উদ্দীপনা এনে দেবে। শহীদের মত মৃত্যুপণ গ্রহণ করে আমরা আমাদের যাত্রা আরম্ভ করেছি—মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের মত গন্তব্যে না পৌছান অবধি আমাদের গতি থাকবে অপ্রতিহত। —জয় হিন্দ

অনিয়মের

চিত্রবাণী লিমিটেডের
'এই তো জীবন' চিত্রে
সুনন্দা দেবী

শিল্পী গঠনে সোভিয়েট রাশিয়া

কালীশ মুখোপাধ্যায়

★

মস্কো আর্ট থিয়েটারের যে খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল—এবং যে-খ্যাতির ব্যাপ্তি আজ সর্বদেশে ছড়িয়ে পড়েছে—তার মূল কারণ এখানকার অভিনেতৃ-সম্প্রদায় নিজেদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। অভিনেতা বা অভিনেত্রী হ'তে হ'লে যে সব বৈশিষ্ট্যগুলি করায়ত্ব করতে হয়—তাঁরা তা থেকে বঞ্চিত নন। কী ভাবে সে বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করতে হয়, থিয়েটারেই সে বিষয়ে তাঁরা শিক্ষা পেয়ে থাকেন। নাট্য-জগতে গর্ডন ক্রেগের নাম কারো কাছে অপরিচিত নয়। ষ্টানিশ্লাভস্কির পদ্ধতির প্রতি কোনদিনই তাঁর আস্থা ছিল না—কিন্তু তিনিও মস্কো আর্ট থিয়েটারের শিক্ষা-পদ্ধতির প্রশংসা না করে পারেননি। ১৯০৮ খৃঃ মস্কো আর্ট থিয়েটারের এই শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ক্রেগ লিখেছিলেন, "..... working continually, new ideas each minute with consummate care and patience and always with intelligence, Russian intelligence." প্রতিটি মুহূর্তে নূতন নূতন চিন্তাধারাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য এঁরা গভীর জ্ঞান, ধৈর্য এবং যত্নসহকারে কাজ করে যাচ্ছে—নিখুঁত রূপদান দিতে যেয়ে কোন পরীক্ষাকেই অর্ধসমাপ্ত রেখে দেয় না। মঞ্চকে জীবনের পেশারূপে গ্রহণ করবার প্রয়োজনীয়তা মস্কো আর্ট থিয়েটারের শিল্পীরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। এবং এই উপলব্ধি যেন সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পীদের মাঝে পরম্পরাগত ভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠছে। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্যমঞ্চের শিল্পীদের শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে। আমাদের দেশে ত কোন সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি নেই-ই—তাই আমাদের কথা থাক। এমন কী ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশে যে ভাবে শিল্পীদের শিক্ষা দেবার রীতি দেখতে পাই—সোভিয়েট রাশিয়ার মায়ারহোল্ড, কী ষ্টানিশ্লাভস্কি—অথবা অপর যে কোন পদ্ধতির কাছে তা ম্রিয়মান হয়ে পড়বে।

মস্কোর 'দি ক্যামারণী থিয়েটার স্কুল' নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করছি। আমার আলোচনার মালমশলা সংগৃহীত হয়েছে বর্তমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনতিপূর্ব কালে। যুদ্ধোত্তর সময়ে কতখানি পরিবর্তন হ'য়েছে না-হয়েছে সে তথ্য এখনও সংগ্রহ করতে পারিনি। সুযোগ মত তা পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে এবং আমাদের আলোচনাকে সংশোধন করে নেবার জন্য প্রকাশ করবার ইচ্ছা আছে। এই ক্যামারণী থিয়েটারের চার বছরের উপযোগী শিক্ষার জন্য প্রতি বছর গড়ে ৫০ জন করে শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হয়। এই শিক্ষার্থীদের বয়স আঠারো থেকে পঁচিশের ভিতর হওয়া চাই। ভর্তি হবার সময় ছাত্রদের কণ্ঠস্বর, বাচন-ভংগী প্রভৃতি বিষয়ে মোটামুটি একটা প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়ে তিন মাসের জন্য শিক্ষানবীশ হিসাবে থাকতে হয়। প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় যে সব ছাত্রেরা উত্তীর্ণ হয় কেবলমাত্র তারাই সম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণের অধিকার লাভ করে। প্রাথমিক পরীক্ষায় মজুর শ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই শিক্ষাগ্রহণে ছাত্রদের কোন প্রকার মাহিনা দিতে হয় না—বরং প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতি মাসে পঁয়তাল্লিশ থেকে পচাত্তর রুবেল অবধি বৃত্তি দেওয়া হ'য়ে থাকে। থিয়েটার সংলগ্ন ছাত্রাবাসে ছাত্রদের থাকতে হবে এবং বিশ থেকে তেইশ রুবেল পর্যন্ত খাদ্য এবং বাসস্থানের খরচের জন্য তাদের দিতে হয়। এথেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি—নাট্য-মঞ্চ সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদেরত কোন ব্যয়ভার বহন করতেই হয় না—অধিকন্তু প্রতি মাসে তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে বৃত্তি পায়—তার অর্ধেকেরও বেশী নিজেদের পকেট খরচার জন্য উদ্বৃত্ত থাকে। আর্থিক সমস্যায় কণ্টকিত না হ'য়ে শিক্ষার্থীরা খুব স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

সম্পূর্ণ শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু চার বছরে পড়ানো হয়।

এক এক বছরের জন্য নির্দিষ্ট কোর্স আছে। এই চার বছরে কি কি শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে—তার উল্লেখ করছি।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণী: শিক্ষার প্রথম বর্ষে ছাত্রদের স্কুল এবং কলেজে প্রাপ্ত সাধারণ শিক্ষা প্রভৃত অংশে সাহায্য করে। সাধারণ ইতিহাস, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (পলিটি-ক্যাল ইকোনমি), মনস্তত্ব কৃষ্টিমূলক ইতিহাস এবং একটী বৈদেশিক ভাষা (সাধারণতঃ জার্মান) শিক্ষা করতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে সংযম, উচ্চারণ ভংগিমা, রূপ-সজ্জা, এবং চার বৎসর কাল ধরে নাট্য-মঞ্চের যে ব্যাপক ইতিহাস ছাত্রদের পড়তে হয়—প্রথম বর্ষে সে সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত ভাবে পড়ানো হয়।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী: এই বৎসরে বিশেষভাবে রাশিয়ার ইতিহাসের ভিতর শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, 'ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম', লেনিনের মতবাদ এবং সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের গঠন-পদ্ধতি শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কার্যকরী শিক্ষারূপে চলন-পদ্ধতি এবং বাচন-পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। শিক্ষা গ্রহণের দ্বিতীয় বর্ষের সমাপ্তির দিকে ক্যামারণী থিয়েটারের যে কোন নাটকে 'জনতা' দৃশ্যে অভিনয় করবার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত থাকতে হয়।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী: তৃতীয় বর্ষে বিপ্লবের ইতিহাস এবং সোভিয়েট রাশিয়ার নাট্য-মঞ্চের ইতিহাসই পড়ানো হ'য়ে থাকে। এই বছর থেকে ছাত্রদের কার্যকরী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় বেশী। এই বছরের পূর্বে সাধারণতঃ মঞ্চে সেরূপ কোন চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য ছাত্রদের ডাক পড়ে না। তৃতীয় বর্ষে চলন-পদ্ধতি সম্পর্কে ছাত্রদের খুঁটি নাটি ব্যাপক ভাবে অভ্যাস করতে হয়। সুইডীস ড্রিল, নৃত্যের বিভিন্ন কসরৎ, ছন্দ ও গতি, মুষ্টিযুদ্ধ, দৌড়া-দৌড়ী, লাফালাফি সর্ব বিষয়ে ছাত্রদের রীতিমত কার্যকরী শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এই সব শিক্ষার ভিতর দিয়ে—মঞ্চের ওপর চরিত্রানুযায়ী যেভাবে চলন-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে—তাও আয়ত্ব করতে হয়। যাতে মঞ্চের ওপর শিল্পীদের অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক গতি পরিদৃষ্ট না হয়। এমন কী হৃদয়াবেগানুযায়ী দেহস্পন্দনও শিল্পীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রনাধীন যাতে থাকে তারও অভ্যাস করতে হয়। অভিনয়াংশ আবৃত্তি করবার সময় ভাব এবং ভাষানুযায়ী অংগ সঞ্চালন সম্পর্কেও শিল্পীদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ছোট গল্প থেকে আরম্ভ করে বড় উপাখ্যান…এবং পূর্ণাংগ উপন্যাসের চরিত্রের উক্তি কী ভাবে ভাবাভিব্যক্তির দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে হবে ছাত্রদের সে সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। ছাত্রেরা উপন্যাস বা নাটকের এক একটী দৃশ্য থেকে সংলাপানুযায়ী অভিনয় করে যায়—এইভাবে যোগ্যতা অর্জন করে—তৃতীয় বর্ষের শেষের দিকে তারা একাঙ্ক নাটিকার অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবার অধিকার লাভ করে। তৃতীয় বর্ষ সমাপ্তির সংগে সংগে ছুটির সময়—ছাত্রেরা এই একাঙ্ক নাটিকাগুলি—কলকার-খানা ও ক্লাবে ক্লাবে অভিনয় করবার জন্য সফরে বের হয়। এই অভিনয়ের মারফৎ যেমনি তারা জনসাধারণের শিল্প ও রুচী জ্ঞানকে বিকশিত করে তোলে—তেমনি শিল্পী হিসাবে নিজেরা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সমর্থ হয়। এরপর থিয়েটারের প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ততা বিচার করে থিয়েটারের অভিনয়ে ছাত্রদের ভিতর ছোট ছোট চরিত্র বণ্টন করা হয়।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী: এই বছরে পূর্ণাংগ নাটক নিয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং পৌরাণিক ও সম-সাময়িক নাটক, প্রহসন ও কৌতুক নাটকের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয় ছাত্রদের কাছে। চতুর্থ বছরের শিক্ষা সমাপ্তির সংগে সংগেই ছাত্রেরা স্বভাবতঃই ক্যামারণী থিয়ে-টারের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'য়ে পড়েন—অবশ্য শিক্ষা-সমাপ্তির পর কোন ছাত্র যদি অন্য কোন রঙ্গমঞ্চে যোগদান করতে ইচ্ছা করেন—কর্তৃপক্ষ তাতে বাধাদান করবেন না কোন মতেই।

ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও নাট্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পরিচালনার দিক থেকে সেগুলি যে নিকৃষ্ট আমি তা বলতে চাইছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, নাট্য-শিক্ষার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার মত সুব্যবস্থা এবং ছাত্রদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন—এমন

কী পরবর্তী জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিতে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাইনা। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা কল্পনা করতেও শিউরে উঠবে—একমাত্র সমাজতন্ত্র-রাষ্ট্রের দ্বারাই তা কার্যে পরিণত করা সম্ভব। সেখানে জনসাধারণের শুধু রাষ্ট্রিক দায়িত্বই নয়, অর্থনৈতিক দায়িত্বও সরকারের ঘাড়ে। এখানে কেবল মাত্র একটী স্কুলের কথাই উল্লেখ করা হ'লো—এরূপ বর্তমানে কেবলমাত্র R. S. F. S. R—এর অধীনে চুয়াল্লিশটী নাট্য-বিদ্যালয় আছে। এবং একমাত্র মস্কো সহরেই আছে সতেরোটী। বাকী সাতাশটীর ভিতর বারোটী আছে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিভিন্ন রিপাবলিকে, এবং পনেরোটী আছে গর্কী, ভোরোনেজ্, সিমফারপুর এবং আর্কএ্যাঞ্জেল প্রভৃতি প্রাদেশিক সহর গুলিতে।

এখন আর একটী অন্য ধরণের নাট্য-বিদ্যালয়ের পরিচয় দেবো। আসুন আমরা মস্কোর সেণ্ট্রাল টেকনিক্যাল স্কুল অফ্ থিয়েট্রিক্যাল আর্ট-এ (Central Technical School of Theatrical Art) যেয়ে হাজির হই। এর পরিচালকের সংগে আলাপ করলে কেবল কতগুলি সমস্যার কথাই শুনতে পাওয়া যাবে। এই সব সমস্যা প্রধানতঃ জাতীয় সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিয়ে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিতর বিরাট সংস্কৃতি কেন্দ্র ও জাতীয় নাট্য-মঞ্চ প্রতিষ্ঠার সমস্যার কথা।

এই স্কুলটীর প্রবেশ দ্বারে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়। আজ যে বাড়ীটীতে একটী নাট্য-বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, পূর্বে সেই বাড়ী ছিল কারোর বাসস্থান। বাড়ীটা বার্ধক্যের জীর্ণতায় যেন ধ্বংসে পড়েছে। এর ভারী ভারী দরজাগুলির গায়ে রং বোলান দরকার। মেজেটাও এবড়ো খেবড়ো। ঘরের বাতাসও স্যাঁতসেঁতে—চুণ ওঠা দেয়ালের গা বেয়ে ছাদের কিনারায় নানান গাছ ঢলে পড়েছে। কিন্তু তাতে কী হ'য়েছে? নাইবা থাকলো বাড়ীটার বাইরের চাকচিক্য। দূর থেকে বাড়ীটা দেখে পরিত্যাক্ত ও নির্জীব মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় কিন্তু ভিতরে পা বাড়ালে সমস্ত নির্জীবতা ভুলে যেতে

নবাগতা পদ্মা ব্যানার্জি রণজিৎ পিকচার্সে'র মূর্তি চিত্রে

হয়। সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করে যে কোলাহল শুনতে পাওয়া যায়—তখন আর বহির্দৃশ্যের দিকে খেয়াল থাকে না। যুবক-যুবতী, মেয়ে-পুরুষ হল ঘর বেয়ে ওপরে যাচ্ছে, আসছে—কাঁধের পর হাত দিয়ে কেমন পাশাপাশি ভাবে যাতায়াত করছে তারা! তাদের চোখ মুখ বেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস উপচে পড়ছে। এখানকার ছেলে মেয়েদের শ্রেণী বিভাগ করবেন কী করে? বিভিন্ন নদী যখন এসে সংগম স্থলে পৌঁছায়—সে সংগম স্থলে দাঁড়িয়ে নদীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যটুকু আর চোখে পড়ে না—তাদের মিলনের অপূর্ব আনন্দ মনকে উন্মনা করে তোলে। এখানেও তাই। এদের ভিতর পীতমঙ্গোলীয়, তাম্রাভ তাতার, প্রসস্ত মুখাবয়ব বিশিষ্ট নীলাক্ষী ইউক্রেনবাসী—জর্জিয়ার শ্যেন নাসা বিশিষ্ট গর্বিত সাহসী জীপ্সী বালক সকলে এসে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এখানে এসে মিশেছে। জনতার মাঝখান দিয়ে থিয়েটার হ'লে উপস্থিত হ'লে দেখা যাবে, উন্মুক্ত একটী ঘর—কতকগুলি বেতের আসন আছে—আর আছে এক পার্শ্বে একটী মঞ্চ।

শিক্ষা-কেন্দ্রে কোন প্রকার জনতা নেই। যারা শিক্ষার্থী —বা এই স্কুলের সংগে সংশ্লিষ্ট ··যারা এখানে উপস্থিত তাদের দেখে বিস্ময়ের অবকাশ থাকে না। এরা আবার সংস্কৃতিমূলক কোন কিছুর জন্ম দেবে কী করে? জার্মান ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় হ'লে সোজা এদের পাঠিয়ে দিত কলকারখানায়—হাড়ভাঙ্গুনী খাটুনীর জন্ম—অথবা পাঠিয়ে দিত জমিতে চাষাবাদের জন্য। এদের দেখে কিছুতেই মনে হবে না যে শিক্ষার একটা দানাও তাদের পেটে পড়েছে। এদের সাহায্যে—এদেরই দিয়ে সংস্কৃতির বিরাট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানের চিন্তাও কী বাতুলতা নয়? এদের দ্বারা নাট্য শিল্পের ভিতর দিয়ে সংস্কৃতিকে গড়ে তুলবার পরিকল্পনা কী স্বপ্ন বিলাসী মনের খেয়াল নয়? আর যদি গড়েই ওঠে, তা কী নাট্য-শিল্পকে অধোগতির অতল তলে তলিয়ে দেবে না? নিশ্চয়ই! সাম্রাজ্যবাদী শাসকের অধীনে থেকে আমরা এর উত্তর এক 'নিশ্চয়ই' ছাড়া আর কিছুই দিতে পারি না। ধনতান্ত্রিক দেশের নিপেষিত জনশক্তির ঐ 'নিশ্চয়ই' ছাড়া আর কোন উত্তর দেবার মত দূরদর্শীতা নেই—যেদিন হবে সেদিন সমস্ত নিষ্পেষণের সমাধি পরে বসেত আমরা সাম্যের জয়গানে মত্ত থাকবো। তাই এর সঠিক উত্তর দিতে পারে একমাত্র সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়া। নিষ্পেষণের সমাধি থেকে যারা নব জীবন লাভ করেছে—সোভিয়েট রাশিয়ার মুক্ত জনগণ—তাই তাদের কাছে এর উত্তর জিজ্ঞাসা করলে সমস্বরে বলবে, "নিশ্চয়ই নয়"। কেন সেই কথাই এখন বলছি।

আমাদের আলোচ্য নাট্য বিদ্যালয়ের পরিচালিকা একজন বিধবা মহিলা। পরিচালিকা ফারম্যানোভার (Furmanova) স্বামী ছিলেন সোভিয়েটের একজন নাট্যকার। ফারম্যানোভা খুব সাধারণ বেশ পরিধান

করেন। চুলগুলি তাঁর পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। তাঁর দৃষ্টিতে শিল্পীর পরিচয় নেই—আছে একজন ব্যবসায়ীর। মঞ্চের সামনে এসে তিনি বিদ্যালয় সম্পর্কে বলতে থাকেন। কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে আমি বিদ্যালয় সম্পর্কে পরিচালিকার অভিমত এখানে ব্যক্ত করছি। এথেকেই বিদ্যালয়টী সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা জন্মাবে বৈকী ?

পরিচালিকা ফারম্যানোভা বলেন, "আমাদের এই স্কুলে বত্রিশটী পৃথক জাতীয় ছাত্র অধ্যয়ন করেন—আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের কঠিন এবং দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের উপযুক্ত করে এদের গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলবার জন্য আমরা ১৯৩১ খৃঃ আমাদের স্কুলের ভিতর একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করি এবং শিশু বিভাগ, শিল্পী গঠন বিভাগ, সমালোচক বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগগুলি খোলা হয়। আমাদের এখানকার শিক্ষকেরা মস্কো থিয়েটার গুলি থেকে মঞ্চ ও অভিনয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। কিন্তু যেহেতু প্রাক বিপ্লব যুগে ব্যক্তিগত পদ্ধতি ছাড়া নাট্য-মঞ্চ নিয়ে সেরূপ কোন বিজ্ঞান সম্মত গবেষণা হয়নি, আমরা সেই অভাব দূর করার জন্য নাট্যকলা বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত গবেষণার কার্যে হস্তক্ষেপ করেছি। অন্যান্য থিয়েটারে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রেরা এবং এমন কী অন্যান্য থিয়েটারের শিক্ষকরাও, যাঁরা ইতিপূর্বে এরূপ গবেষণা লব্ধ শিক্ষালাভ করতে পারেন নি তাদেরও আমাদের এখানে যোগদান করবার জন্য অনুরোধ করছি—আমাদের গবেষণা চলবে মঞ্চাধ্যক্ষ ও অভিনেতার সৃজনী ক্ষমতা নিয়ে এবং মঞ্চ বিষয়ক সংখ্যা আবিষ্কারেও আমরা হবো তৎপর—প্রাক বিপ্লব যুগে আদৌ সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হ'তো না। অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে জাতীয় সংখ্যা লঘিষ্টদের সৃজনী ক্ষমতা আমরা উপলব্ধি করে আসছি—জারের আমলে এদের নিজেদের ভাষায় নাট্যাভিনয়ের অনুমতি দেওয়া হ'তো না কখনও। এই সব অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভিতর শিক্ষা বিস্তারের ফলে তারা বৃহত্তর

ফিল্মিস্তান লিঃ শিকারী চিত্রে অশোক কুমার

কৃষ্টিমূলক জীবনের স্বপ্ন দেখছে—যা আজ তাদের জাতীয় নাট্যমঞ্চের অভাব মোচনের প্রেরণা জোগাচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি বত্রিশটী অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের সংস্পর্শে এসে। এবং এতে আমরা যে সাফল্য লাভ করেছি—বহু পরিশ্রম এবং কষ্টলব্ধ সে সাফল্য।"

অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির জাতীয় নাট্যশালা গঠনে এই বিদ্যালয়ের আগ্রহ এবং প্রচেষ্টার কথা পরিচালিকার উপরোক্ত কথাগুলি থেকেই আমরা জানতে পারি। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা তিন বছর ধরে গ্রহণ করতে হয়, এবং অন্যান্য নাট্য-বিদ্যালয়ের মতও এখান থেকে ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হ'য়ে থাকে। ক্যামারণী থিয়েটার স্কুল আর এই স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতির কোন তারতম্য নেই। তবে ক্যামারণী থিয়েটারের শিক্ষাপদ্ধতি যেমন সেই থিয়েটারের বিশেষ ধারাকে অনুসরণ করে চলে—এখানে তার ব্যতিক্রম দেখতে

পাই। এখানে কোন বিশেষ পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয় না। এখানকার শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রেরা সোভিয়েট ইউনিয়নের যে কোন থিয়েটারে যেয়ে যোগদান করতে পারে, তাতে তাদের অসুবিধায় পড়তে হয় না। আবার নিজেরাও পৃথকভাবে এক একটী নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি সর্ব নাট্যমঞ্চের উপযোগী করে সাধারণ ভাবে গড়া—তবে কার্যকরী শিক্ষার ওপরে এখানে দৃষ্টি দেওয়া হয় বেশী। এই নাট্য বিদ্যালয়টী গড়ে উঠবার কিছু পরেই কার্যকরী শিক্ষার দিকে কর্তৃপক্ষ বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন—তাই বিদ্যালয়ের প্রথম দিককার পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে। বাচনিক এবং সংক্ষেপন—থিওরেটিক্যাল এবং এ্যাবস্ট্রাক্ট (Theoretical and abstract) শিক্ষার পরিবর্তে কার্যকরী শিক্ষার প্রতি বেশী দৃষ্টি দেবার জন্য ছাত্রদের শিক্ষা সময়ও বেশী বাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে। শিশু বিভাগে অভিনয়ে শিশুর ভাবাভিব্যক্তি কী ভাবে ফুটিয়ে তোলা হবে—তা বক্তৃতার সাহায্যে পূর্বে শিক্ষা দেওয়া হ'তো, এখন তা মডেলের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। কার্যকরী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়াতে কর্তৃপক্ষ প্রথম বর্ষ থেকেই ছাত্রদের ইউনিয়নের বিভিন্ন কালেকটিক ফার্মে পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন। সেখানে দলনেতা বা মঞ্চাধ্যক্ষ কৃষকদের ভিতর খেলা, গান, নাচ এবং বিভিন্ন কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ গ্রাম্য পাঠাগার এবং ফার্মক্লাবে (Farm-club) অনুষ্ঠিত হয়। আট থেকে দশজন করে এক এক দলে পাঠানো হয়। এবং যেসব একাঙ্ক নাটিকাগুলি ইতিপূর্বে ছাত্রেরা স্কুলে মহলা দিয়েছে—যেসব নাটিকায় জটিল দৃশ্য নেই বা আসবাবের প্রয়োজন হয় না—সেই সব নাটকগুলির অভিনয় করবার জন্যই ছাত্রদের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। যে সব ছাত্র মঞ্চাধ্যক্ষের শিক্ষা গ্রহণ করে, শিক্ষার দ্বিতীয় বর্ষে তাদের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে সহকারী মঞ্চাধ্যক্ষরূপে কাজ করতে হয়। সমাবর্তন বর্ষে স্বাধীন ভাবে হয় কোন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অথবা কোন সৌখীন থিয়েটার ক্লাবে এদের মঞ্চাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। দ্বিতীয় বর্ষে কার্যকরী শিক্ষা গ্রহণের সময় বিষয়গুলিকে ভাগ ভাগ করে দেওয়া হ'য়ে থাকে। প্রথম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষের কার্যকরী শিক্ষা স্বভাবতই জটিলতর। তৃতীয় বর্ষে অর্থাৎ শিক্ষার শেষ বর্ষে সমস্ত কার্যকরী শিক্ষাই কোন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অথবা ক্লাব-মঞ্চে গ্রহণ করতে হয়।

এই স্কুলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হ'লো মজুর এবং কৃষকদের ছেলে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাদের সৃজনী-ক্ষমতা সম্পন্ন এক একজন শিল্পীতে পরিণত করা। ১৯৩০ খৃঃ শরৎকালে এই স্কুলের শতকরা ৭০ জন ছাত্র কৃষক এবং মজুর সম্প্রদায়ের ছিল। ১৯৩৩ খৃঃ ছিল শতকরা ৭৫ জন। কৃষক এবং মজুর শ্রেণীর যুবক যুবতীদের নাট্য-জগতের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য এই স্কুল থেকে কালেকটিভ-ফার্মে লোক পাঠানো হয় এবং কী করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে তাও বাতলে দেওয়া হয় তাদের। এইভাবে নাট্য শিক্ষার্থী এবং নাট্যামোদীদের সংগে সংযোগ রক্ষা করে এই স্কুল নিজের গৌরবময় ইতিহাস রচনা করছে।

মিশরের রঙ্গমঞ্চ

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(১)

পৃথিবীর সর্বপ্রথম নাটক রচিত হয়েছিল প্রাচীন মিশর দেশে। সে প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্বের কথা। সে নাটকের আখ্যানবস্তু ছিল নীল নদের বেলা ভূমিতে রাজ্য লাভের জন্য ওসিরিস এবং সেথ দেবতার সংগ্রাম। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন দেবতার আগমনের সংগে সংগে অন্যান্য ঘটনা উপলক্ষ্য করে আরও বহু নাটক রচিত হয়েছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ বলেন (খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দ), ফেরায়ুন যুগে এই নাটকগুলিকে অবলম্বন করে প্রাচীন গ্রীসে, সর্বপ্রথম ধর্ম সম্বন্ধীয় নাটক রচিত হয়েছিল। প্রাচীন মিশরীয় দেবতা ওসিরিসের পূজা-পদ্ধতি এবং গ্রীক ভূমি দেবতা ডায়োনিসাসের পূজা-পদ্ধতি প্রায় একই প্রকার। পিরামিড প্রাচীর গাত্রে অংকিত অনেকগুলি চিত্র আমি দেখেছি। প্লুটার্ক বর্ণিত গ্রীক পূজা-পদ্ধতির সংগে এই চিত্র গুলির বহুধা সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে ভাবপ্রকাশের বহির্ভংগি নানাপ্রকার সামঞ্জস্য সূক্ষ্মদর্শী চক্ষে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রাচীন মিশরের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ধর্ম সম্বন্ধীয় নাটকগুলি মন্দিরের অভ্যন্তরেই অভিনীত হ'ত। অষ্টাদশ রাজবংশের ইতিহাস আলোচনার ব্যাপদেশে জানা যায় যে, প্রাচীন মিশরের জনসাধারণের মধ্যে নাটক এবং অভিনয় যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল এবং এই বংশের শেষ অংশে নাটক মন্দিরের বাহিরেও অভিনীত হ'ত। এই সমস্ত নাটকের আখ্যানভাগে বিভিন্ন দেবতার জন্ম, বিবাহ, যুদ্ধ, বিলাস এবং বিভব প্রদর্শন ছিল নাটকের মূল উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরাণ আলোচনা করলে দেখা যায় যে এই দেশের দেবতাগণ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করেছিলেন। বৌদ্ধ যুগে জাতক গ্রন্থে ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'বিমান' যোগে লোক শিক্ষার জন্য নাটক অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক নাটকে কোন দেবতাকে কেন্দ্র করে আখ্যানভাগ পরিকল্পিত হয়নি, কারণ দেবতার ভূমিকা গ্রহণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত বলে বিবেচিত হ'ত। ক্রমশঃ এই ধর্মভাব বহুভাবে শিথিল হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী যুগে যখন ক্রমান্বয়ে গ্রীস, রোম এবং পারসিক জাতি মিশরে আধিপত্য স্থাপন করল, তখন মিশরের সমাজ ও ধর্মজীবনে অনেক নূতন নূতন চিন্তাধারার ও কর্মপদ্ধতির সমাবেশ হয়েছিল; কয়েকটী গ্রীক ও রোমান দেবতা মিশরের দেবচক্রের অভ্যন্তরে স্থান পেল, এমন কি গ্রীসের জাতীয় উপাখ্যানের নায়ক নায়িকা স্থান লাভ করেছিল। আমি টেল-এল-আমার্ণা নগরে আখেটাটেনের সূর্য-উপাসনা মন্দির দেখেছি। সে মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে আবিসিনিয়ার পরাজিত রাজার সূর্য দেবতার প্রাধান্য স্বীকৃতির বহু নাটকীয় চিত্র অংকিত আছে। প্রাচীন গ্রীসের (খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দ) সর্বশেষ মিশরীয় রাজধানী লিবিয়া মরু প্রান্তরের সান্নিদেশে টুন্-এল-গাবেলের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। সমাধি মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে গ্রীক পুরাণ বর্ণিত 'ইসাডোরো' ও 'ইডিপাস' উপাখ্যানও অংকিত দেখেছি। এই ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে মিশরে বহু নাটক রচিত হয়েছিল। রোমান যুগের কয়েকটী উপাখ্যানের চিত্র 'আল-আসমুনিন' নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অংকিত দেখেছি। এই সমস্ত নাটকের প্রচ্ছদপট সাধারণতঃ ধর্ম ও ধর্ম সংক্রান্ত ঘটনা।

মুসলমান আরব জাতি কর্তৃক মিশর জয়ের সমসাময়িক যুগে মিশর অধঃপতিত আত্মবিস্মৃত জাতি। ধর্ম, সংস্কৃতি, অতীত, বর্তমান সমস্ত দিকে মিশর তখন নিঃস্ব। দুর্ধর্ষ আরব জাতি ইসলামের সংস্পর্শে এসে অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক যুগে মুসলিম আরবগণ ধর্মাতিরিক্ত কোন অনুশাসন অনুসরণ করতে প্রস্তুত ছিল না। ইসলামের চক্ষে কোন মানুষের চিত্রাংকন কল্পনাতীত। মৃত মানুষকে কেন্দ্র করে কোন অভিনয় অশাস্ত্রীয় সুতরাং ধর্ম অথবা দেবতাকে কেন্দ্র করে

'ফেরায়ুন' গ্রীক অথবা রোমান যুগের অভিনয়-ধারা মিশরে রুদ্ধ হয়ে গেল, যদিও তখন প্রতিবেশী ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলিতে বাইবেল বর্ণিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানাপ্রকার অভিনয় প্রদর্শিত হত। পারশ্য দেশে অবশ্য মুসলিম শিয়া সম্প্রদায় মহম্মদ দৌহিত্র হোসেনের শোচনীয় মৃত্যুকে উপলক্ষ করে মহরম উৎসব পালন করেছিল এবং 'এজিদ', 'মোয়াবিয়া', 'হাসান', প্রভৃতি মুসলমানের ভূমিকা গ্রহণ উৎসবের অংশ বিশেষরূপে পরিগণিত হত। মিশর দেশে কিছুকাল মহম্মদ কন্যা ফতিমার বংশধরগণের কীর্তিকলাপ ব্যাখ্যানের আবরণে মুসলমানগণ নানাপ্রকার সামাজিক উৎসব পালন করেছিল। সেই সংগে সংগে আরব বীরগণের বীরত্ব কাহিনী গাথা রূপে মুসলিম মিশর সমাজে প্রচার লাভ করেছিল। 'খেয়াল-উল-আফজল' (কল্পনার প্রতিচ্ছবি) নামক পুস্তকে আরবীয় বীরগণের শৌর্য কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত নাটকরূপে কোন কাহিনী অভিনীত হয়নি।

নেপোলিয়ন কর্তৃক মিশর জয়ের কাহিনীর সংগে মিশরের নব জন্মের (Renaissance) ইতিহাস অতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সিরিয়া ও মিশর ইউরোপকে কেন আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল তার কারণ আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। নেপোলিয়ন ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত নাটক বিলাসী ছিলেন। যুদ্ধাভিযানের অন্তরালে অবসর বিনোদনের জন্য নৃত্য, অভিনয় ও সংগীতের ব্যবস্থা করেছিলেন। নেপোলিয়নের মিশর ত্যাগের পরে প্রায় ৪০০০ ফরাসী সৈনিক মিশরে অবরুদ্ধ হয়। তাদের মধ্যে কেহ কেহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মিশরে বসবাস আরম্ভ করেছিল। ফরাসী বিদ্রোহের পরে যখন 'মেটারনিকের' দৌরাত্ম্যে বহু ফরাসী সৈনিক কর্ম বিচ্যুত হ'ল তখন তারা মিশরে মহম্মদ আলি পাশার অধীনে নানা বিভাগে কার্য গ্রহণ করেছিল। তারপর মহম্মদ আলি পাশার রাজত্বকালে বহু মিশরীয় যুবক ফরাসী দেশে শিক্ষার্থীরূপে প্রেরিত হয়েছিল। তাদের অনেকেই ফরাসী মহিলার পাণি গ্রহণ করে। সস্ত্রীক দেশে প্রত্যাবর্তন করে তারা ফরাসী সভ্যতার বাহন রূপে পরিগণিত হয়।

'শিকারী' চিত্রে নবাগতা বীরা

সুতরাং নেপোলিয়নের পরিত্যক্ত ফরাসী সৈন্য, মহম্মদ আলির নব নিযুক্ত ফরাসী বিদ্রোহীগণ এবং ফরাসী দেশে শিক্ষা প্রাপ্ত সস্ত্রীক প্রত্যাবৃত্ত মিশরীয় যুবকগণ মিশরে এক 'ইয়োলো' মিশরীয় সভ্যতা প্রচারে সাহায্য করেন। সেই সভ্যতার অন্যতম অংশ ছিল সেলুন, ক্লাব, কাবেরে প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং তৎসংগে আনুসংগিক ব্যবস্থা প্রচলন। অবসর বিনোদনের জন্য সময় সময় এই মিশ্র সমাজে নাটক অভিনীত হয়েছে সত্য, কিন্তু কোন প্রকার নাট্য প্রতিষ্ঠান বা রংগমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

(২)

'খেদিভ' ইসমাইল পাশা ১৮৬৮-৬৯ সালে প্রথম রয়েল অপেরা হাউস নামে একটী প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন করেন। মাঝে মাঝে সেখানে বিশেষ বন্ধু বান্ধবের জন্য সমাবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। কখন কখন সুধীবৃন্দের আলোচনা এবং শিল্পকলার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুয়েজ কানেল প্রবর্তন-উৎসবে বহু ইউরোপীয় সুধীসজ্জন রাজকীয় প্রতিনিধির মিশরে আগমন হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে অপেরা হাউসে অভ্যর্থনার আয়োজন হয়।

সেই সময় এই অপেরা হাউস জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। ফরাসী অনুকরণে পরিকল্পিত হলেও এই প্রেক্ষা-গৃহের কর্ম পদ্ধতি সিরিয়া, আরব এবং লেবাননের আদর্শানুযায়ী ব্যবস্থিত হয়েছিল এবং অভিনীত নাটকগুলি প্রধানতঃ ফরাসী ভাষা অথবা ফরাসী নাটকের আরবীয় অনুবাদ। সেই উপলক্ষে প্রথম মহম্মদের মক্কা হতে মদিনা যাত্রার কাহিনীকে নাটকের বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৮৮৮ সালে লেবানন থেকে একটা নাটকের দল কাইরো সহরে অভিনয় উদ্দেশ্যে এসেছিল। একজন 'মেরোনাইট' সম্প্রদায়ের খৃষ্টান ধর্মযাজক কর্তৃক প্রাক্ মুসলিম যুগে অর্চিত দেবদেবীর উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত কয়েকটী নাটক অভিনীত হয়েছিল। কিছুকাল পরে আর একটী দল 'আলফ্-ও-লাইলা-ও-লাইলা' (আরব্যোপন্যাসের সিন্ধুবাদ কাহিনী) নাটকে রূপান্তরিত করে অভিনয় করেছিল। যদিও অভিনয় বিচারে এই নাটকখানির মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটী ছিল, তথাপি মিশরীয়গণ দেশীয় উপাখ্যানে অবলম্বিত নাটকটি অত্যন্ত গর্ব ও আগ্রহের সংগে গ্রহণ করেছিল। এই নাটকটির প্রধান উপকরণ ছিল সংগীত। আরব জাতি অত্যন্ত সংগীত প্রিয় সুতরাং এই নাটকটি বর্তমান যুগে ও ন্যূনাধিক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে অভিনীত হয়। এইখানে একজন সংগীত বিশেষজ্ঞের সম্মান প্রায় রাজ সম্মান। আবু খলিল আল কাব্বানি ও তাঁর প্রিয় শিষ্য আল্-মিসকার-আল্ দামাস্কির সংগীত সমসাময়িক যুগে নীলের হিল্লোলের মত মধ্য প্রাচীর মরুভূমিতে রস সঞ্চিত করেছিল। আবু—নাদ্দারা নামক একজন মিশরবাসী ইহুদী প্রথমদিকে কিছুকাল রয়েল অপেরা হাউস পরিচালনা করেন। এই কার্য উপলক্ষে ১০৩২ খানি নাটক, গল্প এবং হাস্য চিত্র রচনা করেন। সেই রচনার বিষয় বস্তু ছিল দেশীয় উপাদানে, দেশীয় ভাষায় মিশরীয় নারী সৌন্দর্য ও হাস্যরস পরিবেশন। এই সমস্ত নাটকগুলি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, সমসাময়িক মিশরীয় সমাজ জীবনের প্রতি স্তরে এই অভিনয়গুলির প্রভাব অনুভূত হয়েছিল।

মিশরের রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করার সময় ফরাসী সাহিত্য, নাটক ও সমাজ জীবনের কথা উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসর শীত ঋতুতে একাধিক ফরাসী নাট্য সমিতি মিশরের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় উদ্দেশ্যে আগমন করত এবং তাদের অনুকরণে পরবর্তী যুগে ইটালীয় কয়েকটী নাট্য সম্প্রদায় মিশরে এসেছিল। তারা বিভিন্ন দেশে প্রসিদ্ধ নাটকগুলি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে অভিনয় করত। এই সুযোগে ক্রমশঃ মিশরের নাট্যকার-সম্প্রদায় কয়েকখানি ফরাসী, ইংলিস এবং নরওয়েজিয়ান নাটকের অনুবাদ করেন। অবশ্য এই নাটক পরিবেশনে নাট্যকারের রুচি এবং পরিচালকের প্রয়োজন অনুসারে কর্মধারা নির্দিষ্ট হত। বিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থকে ইউরোপীয় সমাজে যে শিথিল ভাব এসেছিল, তার ছায়া সম্পাতে মিশরীয় সুধীগণ একটু চাঞ্চল্য অনুভব করলেন। রাজ সরকার এই চাঞ্চল্যকে সমাহিত করবার উদ্দেশ্যে একটী রাজকীয় অনুবাদ গোষ্ঠী গঠন করে তাদের হস্তে অনুবাদের ভার অর্পণ করলেন, সুতরাং বিনা অনুমতিতে কোন নাটক অভিনয় কিংবা অনুবাদ প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। এই অনুবাদক দল অতি অল্প কালের মধ্যেই অসকার ওয়াইড়, বার্ণাড শ, মলিয়ে রেসিন, ডুমা, ইবসেন প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকের নাটক অনুবাদ করলেন। ইউরোপীয় নাট্য রসিকগণ ইউরোপীয় নাটক আরবী ভাষায় অনুবাদ এবং মিশরের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে দেখে খুব প্রীতি লাভ করেন। সমাজ জীবনে নাটকের প্রভাব অপরিমিত। ফলে বর্তমান মিশর সমাজে নাটকের প্রভাবে সমাজ ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। এই সময় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বহু হাস্যরসাত্মক নাটক অনুবাদ করা হয়েছিল। সেইগুলি প্রদানতঃ প্রাদেশিক সহরগুলিতে অভিনীত হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন লেখক স্থানীয় মিশরীয় ভাষায় কয়েকটী নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাদের ভাষা রচনা কৌশল, এবং নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি ও রঙ্গমঞ্চে টেকনিক খুব উচ্চাঙ্গের ছিল না। সুতরাং রাজধানীতে এই নাটকগুলির খুব সমাদর হয় নাই।

রূপ-মঞ্চ

(৩)

১৯১৯ সাল মিশরীয় জাতির জীবনে এক সন্ধিক্ষণ। সেই বৎসর ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। বিজেতা ইংরাজ ও ফরাসী জাতি মিশরকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পূর্ণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল। জগলুল পাশার নেতৃত্বাধীনে মিশরে ভীষণ অসন্তোষ সৃষ্টি হ'ল। জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত হয়ে মিশর বিদেশীয় সমস্ত সংস্পর্শ বর্জন করে স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্তনের চেষ্টা করল। সংগে সংগে মিশরের নাট্যকারগণ বিদেশীয় নাটকের অভিনয় ত্যাগ করে জাতীয় জীবনের ঘটনা অবলম্বনে জাতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার আবেষ্টনে নূতন নাটক রচনা করতে চেষ্টা করলেন। এই প্রচেষ্টার ফলে, মিশরীয় সুন্দরী ক্লিওপেট্রা, বীর কর্মী কাম্বাইসিস্, খেদিভ মহম্মদ আলি পাশা, রসিক লায়লা মজনু, এবং বীর আন্তারের উপাখ্যান নাটকে রূপান্তরিত হল। এই স্বদেশী নাটক প্রবর্তনের প্রাণশক্তি সুবিখ্যাত মিশরীয় কবি আহম্মদ শাওকী। অবশ্য তখনও ইউরোপীয় নাট্য সম্প্রদায় মিশরে অর্থ উপার্জন উদ্দেশ্যে নাটক দল নিয়ে এসে জনসাধারণের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছেন। সুতরাং দুইটী বিভিন্ন ধারা একই সময়ে মিশরে প্রচলিত ছিল। একদিকে বিদেশী সাজসজ্জা এবং উপাখ্যান অবলম্বিত নাটক, অন্যদিকে স্বদেশী ভাবাপন্ন দেশীয় উপাখ্যান অবলম্বিত নাটক। কিন্তু ইউরোপের উন্নততর সাজসজ্জা, ব্যবস্থা এবং রঙ্গমঞ্চ জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে মিশরীয়গণ অনুকরণ করে চলেছিল। এই উপলক্ষে মিশরে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হয়েছিল—যথা মহম্মদ তৈমুর প্রণীত আল্ মক্‌বাহ্ (আশ্রয়) এবং কানাবেল (বংশদণ্ড); তৌফিক-উল্-হাকিম প্রণীত আহল্-উল-কাহাফ্ (গুহাবাসী) এবং শহর-জাদ্ (রাজকন্যা) ইত্যাদি। প্রত্যেকখানি নাটকের অন্তরালে একটী রূপক ও রাজনৈতিক আভাষ ছিল। বিশর্-ফায়ারিস রচিত মফারক্-উল-তারিখ (বহুপথ) এই যুগের একটী অতি অপরূপ সৃষ্টি। এই নাটকের অন্তর্নিহিত বাণী একমাত্র মিশরের কথা নহে, সমস্ত মানব জগতের মর্মকথা।

ক্রমশঃ স্বাদেশিকতাকে কেন্দ্র করে মিশরের রঙ্গমঞ্চ যথার্থ মিশরীয় হবার প্রয়াসকরে চলেছে। বর্তমান যুগে অভিনীত নাটকের আখ্যান বস্তু যথেষ্ট স্বাদেশিকতা পূর্ণ। এই নাটকগুলি প্রাচীন মিশর, ফেরায়ুন যুগের ধর্ম, কর্ম, স্থপতি, পিরামিড্, নীলনদকে গৌরবের বস্তু বলে গ্রহণ করেছিল। মুসলমান যুগের আরব জাতীয় বীর কাহিনী এবং বীর পুরুষগণের কীর্তিকলাপকে নাটকের সংগে সংযুক্ত করেছে। এমন কি জাতীয় ভাবপ্রকাশের জন্য প্রয়োজন হলে তারা বহুক্ষেত্রে ধর্মানুশাসনকে অতিক্রম করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। অপর পক্ষে ইউরোপীয় ভাব, সমাজনীতি এবং চরিত্রকে বহুস্থানে ব্যঙ্গ করে তৃপ্তি লাভ করেছেন। আমি কয়েকটী মিশরের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখেছি। সামাজিক নাটকগুলি প্রায়ই ব্যঙ্গাত্মক এবং ব্যঙ্গরসের মূলবস্তু ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি শ্লেষ।

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশের লোক নানাজাতি ধর্ম ও অবস্থার সংঘাতে একটু অধিক মাত্রায় অনুকরণ প্রিয় এবং নাটকীয় ভাবাপন্ন। বিলোল-ফরাসী জীবনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে এসে মিশরের অন্তর্নিহিত অনুকরণপ্রিয়তা যথেষ্ট স্ফুরিত হয়ে উঠেছে। তদুপরি কয়েকজন আধুনিক যুগের বিখ্যাত অভিনেতা ফরাসী ও ইটালী দেশে অভিনয় শিক্ষা লাভ করেছেন। মশিয়ে আবদুর রহমান রুশদি প্রারম্ভ জীবনে একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন। ১৯১২ সালে শিক্ষিত মিশরীয়দের মধ্যে তিনি প্রথম জীবনের বৃত্তিরূপে রঙ্গমঞ্চ জীবিকা গ্রহণ করেন। এই অপরাধে তিনি বহু অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। তাঁর পরবর্তী যুগে তাঁকে অনুসরণ করে সম্ভ্রান্তঘরের বহু তরুণ তরুণী অভিনয় জীবন গ্রহণ করেছে। অবশ্য মুসলমান অপেক্ষা খৃষ্টান এবং ইহুদী সম্প্রদায় অধিকাংশ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নারী অপেক্ষা পুরুষই অবশ্য নাটকীয় ভূমিকায় অধিকতর পারদর্শী। অবশ্য ফাতেমা রুশদি, রোজএল ইউসুফ এবং আল্-আসমাহান ও যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছেন।

—(ক্রমশঃ)

বাংলা নাটক ঃ মাইকেল

অজয় বসু, এম-এ

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় * রাম নারায়ণ তর্করত্নের "রত্নাবলী" নাটকের মহলা হচ্ছে। মহলা-ঘরের এককোণে মাইকেল তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাকের সংগে বসে গল্প করছেন। কথায় কথায় মাইকেল বললেন, 'রাজারা একটা বাজে নাটকের জন্ত এত টাকা খরচ করছেন দেখলে দুঃখ হয়।'—গৌরদাস বললেন, 'বাংলায় যদি ভাল নাটক থাকতো তবে আমরা 'রত্নাবলী'র অভিনয় করতাম না।' মাইকেল বললেন, 'ভাল নাটক?—আচ্ছা আমি রচনা করবো।' গৌরদাস জানতেন, মধুসূদন 'পৃথিবী' বানান করতে জানেন না। কিন্তু তবু তিনি বললেন—'ভালই। ইচ্ছে হলে চেষ্টা করে দেখতে পার।'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যে জিনিষ তিনি গড়তে চেয়েছেন তা বেশ ভালো ভাবেই গড়েছেন, কিন্তু গড়বার আগে তিনি পুরোন জিনিষটি ভেঙ্গে বাইরের আমদানি মালমশলার আর এদেশের ভাবধারার সমন্বয় ক'রে যা গড়ে দিয়ে গেছেন, বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ গঠনপ্রণালী তারই অনুসরণ করেছে অনেক সময় অন্ধভাবে। যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে যুগ ছিল ভাঙ্গনের যুগ। জাতীয় জীবনের এসেছিল দৈব-দুর্বিপাক। ইংরেজী সভ্যতার আপাত মনোহর রূপ দেখে বাংলার যুগ-সম্প্রদায়ে তখন ধাঁধাঁ লেগে গেছে। অন্ধ অনুকরণ ও সাহেবিয়ানার মধ্যদিয়ে কখনো কোন মহৎ জিনিষের সৃষ্টি হতে পারে না এদেশে। মধুসূদন ছিলেন এই ইংরাজি সভ্যতার স্তাবকদের অন্ততম। ছোটকালে তিনি কবিতা লিখেছিলেন।

And, oh! I sigh for Albion's strand
Asif she were my native land!

১৮৪৯ খৃঃ মাদ্রাজে তিনি Captive Ladie নামদিয়ে প্রথম ইংরাজি কাব্য রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল ছোট বেলায় পড়া মহাভারত রামায়ণ। এই নব্য সম্প্রদায়ের একজন যখন বললেন তিনি বাংলায় নাটক লিখবেন, তখন সবাইর আশ্চর্য হ'য়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। শিক্ষিত বাঙ্গালী মহলে রাষ্ট্র হয়ে গেল—মাইকেল বাংলা নাটক লিখবেন। বন্ধুরা বিস্মিত হলেন, আর পণ্ডিতরা করলেন উপহাস। কিন্তু মাইকেল চালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন—সংস্কৃত ব্যকরণ অভিধান ও অন্যান্য কাব্য নাটক পাশে নিয়ে একের পর এক অঙ্ক শেষ করে যেতে লাগলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম নাটক "শর্ম্মিষ্ঠা" লিখিত ও প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি লেখা হওয়ার পর মাইকেল প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ নামক একজন পণ্ডিতকে দোষ গুলো দেখে দিতে বলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় বই পড়ে বললেন—'শুদ্ধ ক'রে দিতে গেলে যে কিছুই থাকবে না।' নাট্যকার রাম নারায়ণ তর্করত্ন মাইকেলকে পরামর্শ দেন, "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকটিকে সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী পরিবর্তন করতে। গতানুগতিকতার ওপর বড় প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিলেন বিদ্রোহী মাইকেল। তার প্রথামত গড়বার আগে আগে তিনি পুরনোকে ভেঙ্গে নিলেন। এই সমস্ত পণ্ডিতদের কথা যদি সেদিন মাইকেল গ্রহণ করতেন, তবে বাংলা নাটকের যে-রূপ আমরা আজ দেখছি, সেরূপ আর চোখে পড়তো না। কিন্তু এদের প্রত্যুত্তরে মাইকেল লিখলেন—"I shall either stand or fall by myself. You know that a man's style is the reflection of his mind. I am aware, my dear fellow that there will, in all likelyhood some thing of a foreign air about my drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters wellmaintained, what care you if there be a foreign air about the thing?...don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old rascals in the shape of pandits."

* রূপ-মঞ্চ অগ্রহায়ণ সংখ্যা

প্রসাধন
সামগ্রী

ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কোং
২৯, ল্যান্সডাউন রোড
কলিকাতা

'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক রচনা। এর আগে অবশ্য রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমেশ চন্দ্র মিত্র, তারক চন্দ্র চূড়ামণি, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নাটক লিখেছিলেন; কিন্তু সে নাটক সর্বাঙ্গীন গুণসম্পন্ন ছিল না। তাতে না ছিল প্লটের কোন সংহতি, না ছিল ভাষার সারল্য। যেন কতোগুলো দৃশ্যকে জোর করে এক সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। এ গুলোর একমাত্র উপভোগ্য রস ছিল হাল্কা ভাঁড়ামির অথবা অতি রঞ্জিত melodramatic সামাজিক রূপকথার।

শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে বাংলা নাটকের প্রথম সম্পূর্ণ সুস্বরূপ ফুটে উঠলো। মাইকেল নাটক লিখেছিলেন সম্পূর্ণ বিদেশী কাঠামোতে। নান্দী-সূত্রধার বিদায় নিল, অঙ্ক বিভাগও হলো ইংরাজী নাটকের মতো। কিন্তু মাইকেল নাটকের কাহিনী নিয়েছিলেন মহাভারত থেকে। মহাভারতে শর্ম্মিষ্ঠার যে কাহিনী আছে তা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে ছিল মাইকেলের নাটকে। তার কারণ, মহাভারতের আদিপর্বের ৭৮-৮৫ অধ্যায়ে যে কাহিনীটি আছে তা আধুনিক রুচি অনুযায়ী নয়। মাইকেলের সাহেবি মেজাজে রুচি বোধ ছিল খুব প্রবল, তাই তিনি কাহিনীকে নিজের মনোমত পরিবর্তিত করে নিয়েছিলেন। বিদেশী কাঠামোতে তৈরি হলেও মাইকেল "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকে আমাদের দেশী জিনিষই পরিবেশন করেছেন। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের প্রভাব পড়েছিল বিশেষভাবে তার ওপর। যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠা যেন অনেকটা দুষ্মন্ত শকুন্তলার মতো। শর্ম্মিষ্ঠার বিদূষকও অনেকটা শকুন্তলার মাধব্যের অনুরূপ। মাঝে মাঝে ভাষার মিলও পাওয়া যায়; যেমন—"আর তার মধুর অধরকে রতিসর্ব্বস্ব বললেও বলা যেতে পারে"—(তৃতীয় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)। এর মিল পাওয়া যায় কালিদাসে—"পিবসি রতি সর্ব্বস্ব-মধরং (প্রথম অঙ্ক)।"

পণ্ডিতদের মত যাই হোক না কেন, তৎকালিন নব্য সম্প্রদায় শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের আগমনে অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর লেখেন—I am of opinion that Sermistha is the best drama in our language (মধু স্মৃতি, ১১২)। ঈশ্বরচন্দ্র বলেন—the drama is a complete success "আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাংলা নাটক এপর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জণগনে শর্ম্মিষ্ঠাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিবেন, সন্দেহ নাই—বিবিধার্গ সংগ্রহ, ১৭৮০ শকাব্দা, মাঘ।"

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় হয়। বাংলার গভর্ণর স্যার পিটার গ্রাণ্ট, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মচারীরা অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। অভিনয়ের পর দেশে একটা সাড়া পড়ে যায়—এতদিনে একটা ভাল বাংলা নাটক লেখা হ'লো। শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের লেখক এজন্য সম্বর্ধিত হলেন: সংগে সংগে সম্বর্ধিত হলেন তাঁরা, যাঁরা বাংলা নাট্যমঞ্চের উন্নতির জন্যে, বহু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন পাইকপাড়ার রাজভ্রাতা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। শর্ম্মিষ্ঠার বিজ্ঞাপনে মাইকেল লিখেছিলেন:

"Sermistha is to be acted at the elegant Private theatre attahed to Belgatchia Villa of the Rajas of Paikpara. Should the drama ever again flourish in India, posterity will not foget these noblemen—the earlest friends of our rising national theatre." কবি মাইকেলের স্বপ্নের national থিয়েটারে আজ কি ভূতের নৃত্যই না হচ্ছে!

শর্ম্মিষ্ঠার মহলা যখন চলছিল, তখন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মধুসূদনকে একটি প্রহসন লিখবার জন্যে অনুরোধ করেন। মধুসূদন লেখেন, 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' তাঁর অন্যান্য সকল বই এর মতো এই প্রহসনও বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক প্রহসন। এই দুই প্রহসনে তিনি যথাক্রমে "Young Bengal" ভণ্ড বৃদ্ধদের আক্রমণ করেছেন। প্রহসন দুটির ভাষা কথ্য ভাষা; প্রথমটিতে বেপরোয়া ইংরেজি ব্যবহার করা হয়েছে। এর পর অনেকদিন পর্যন্ত প্রহসনগুলো এই

ছাঁচেই লেখা হ'তো। কিন্তু মাইকেল এছটি প্রহসনে নব্যতন্ত্রী ও প্রাচীনপন্থী উভয়দলকেই চটিয়েছিলেন বলে নাটক দুটি বহুদিন অভিনয় হতে পারে নি। পরবর্তীকালে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ছায়া দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র ওপর এসে পড়েছিল।

প্রহসন দুখানা লিখবার পরই মাইকেল গ্রীক পুরাণের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে একটি রোমান্টিক ও গল্প সর্বস্ব নাটক রচনা করেন। কিন্তু এর মধ্যেও আমরা সংস্কৃত নাটকের প্রভাব দেখতে পাই বিশেষ ভাবে। বিদূষক মানবক সংস্কৃত থেকে গৃহীত। মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকের অনুকরণ দেখা যায়। যথা—'শুভে, যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী উন্মিলিতা হয়, দেখ তোমার সখীও মোহান্তে আপন কমলাক্ষি উন্মিলন কল্যেন। আহা! ভগবতী জাহ্নবী দেবী, ভগ্নতট পতনে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই আপন নির্ম্মলশ্রী পুনর্দ্ধারন করেন।"

তুলনীয়—মোহেনাগুর্ব্বয়ন্তনুরিয়ং মূচ্যমানা বিভাতি
গঙ্গা রোধঃপতন কলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্॥
—বিক্রমোর্ব্বশীয়াম্

মাইকেল নাটকে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন পদ্মাবতীতে। এর ভাষা দেখলে বোঝা যাবে কি ভাবে পরবর্তীকালের অমিত্রচ্ছন্দ মাইকেলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল।—যেমন-

মুরজা। (স্বগত)
হেন দুরাচার আর আছে কি জগতে ?
(প্রকাশ্যে)
ভাল কলিদেব—
কিছু কি হ'লো না দয়া তোমার হৃদয়ে ?
কলি। সে কি দেবি ! হরিণীরে মৃগেন্দ্র কেশরী
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
সদয় হইয়া সেকি ছাড়ি দেয় তারে ?

এর পর মাইকেল কৃষ্ণ কুমারী নাটক রচনা করেন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর। তবে প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। বাংলা নাটকের ইতিহাস থেকে আখ্যান বস্তু নিয়ে নাটক রচনার মধ্যে প্রথম কৃষ্ণকুমারী। টডের রাজস্থান পরবর্তীকালে অনেক এমন ধরনের নাটকের কাহিনী যুগিয়েছে। কৃষ্ণকুমারীর রচনাকালে মধুসূদন লিখেছিলেন—

"In the great European Drama you have stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and drama of Fairy lands···I shall endeavour to create characters who speak as nature sggests not mouth-mere poetry. ("জীবন চরিত, পৃ ৪৬১)" "I shall look to the great dramatists of Europe for models. That will be founding a real National Theatre." (মধুস্মৃতি, ৩০১)

রূপ-মঞ্চ

'কৃষ্ণকুমারী' শুধু বাংলাভাষার প্রথম ঐতিহাসিক নাটকই নয়, এ হচ্ছে বাংলার প্রথম বিষাদান্তক নাটক। নাটকের মধ্যে আধুনিক যুগের নাটকের সব লক্ষণ প্রকাশিত হয়ে উঠলো বিশেষ ভাবে। ট্রাজেডির রস পরিবেশিত হলো নাটকের মধ্যদিয়ে। সাহিত্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে 'কৃষ্ণ কুমারী' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটক গুলির অন্ততম। ঐতিহাসিক বিষয় থেকে কাহিনী নেবার জন্য নাটকের প্লট খুব দ্রুত ও পরিবর্তনশীল। ঘটনাপ্রবাহ সাবলীল ও অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জিত। কৃষ্ণকুমারীর মধ্যে রিয়ালিজম্ নেই কিন্তু মানবতা আছে। গ্রীক ট্রাজেডির মত নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধান সমস্ত নাটকের মধ্যে তার বিষাদের ছায়া ফেলেছে। সমস্ত নাটকটি যেন কোন ছুর্লঙ্ঘ্য বিধানে এক অনিবার্য ট্রাজেডির দিকে এগিয়ে চলেছে; অসহায় মানুষের সাধ্য নেই সেই অনিবার্য শক্তির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। সংস্কৃত সাহিত্যে ট্রাজেডির স্থান ছিল না, নাটক মাত্রই মিলনান্ত হতে বাধ্য। মাইকেল কোন বাধাকেই বাধা বলে স্বীকার করেন নি, আজও করলেন না। বন্ধুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করে তিনি ট্রাজেডি লিখলেন, কাব্যে ও নাটকে। ট্রাজেডির এই রস মাইকেল তাঁর জীবন পাত্র থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। গ্রীক ট্রাজেডির মহান গাম্ভীর্য নেমে এলো চিতোরের মরুপ্রান্তরে; কিন্তু রূপ তার গেল বদলে। বর্তমান যুগে ট্রাজেডি বলতে আমরা মনের যে বিশেষ অবস্থাটিকে বুঝি, মাইকেল সেই মতবাদের সাথে পরিচিত ছিলেন না। তাই তাঁর লিখিত ট্রাজেডির সাথে আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জনের' ট্রাজেডির তুলনা করি তাহলে আমরা নিরাশ হবো নিশ্চয়ই। গ্রীক ট্রাজেডিতে মনের স্থান কখনো খুব ওপরে ছিল না। মানসিক সংগ্রামেও যে ট্রাজেডির বীজ থাকতে পারে, সে মতবাদ তখনও প্রাবল্য লাভ করে নি। তাই মাইকেলের কৃষ্ণকুমারীর ট্রাজেড়ি হচ্ছে বাইরের ট্রাজেডি। তবুও মাইকেল অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে ছিলেন কৃষ্ণকুমারী নাটকে। কৃষ্ণকুমারী মাইকেলের বিদ্রোহী মনের প্রতিচ্ছবি: নবীনের আগমনী বার্তাবহ। মাইকেল যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তা তিনি পুরোনকে ভেঙ্গে আরম্ভ করেছিলেন। সে কাজ তিনি শেষ করেন নি, সে কাজ শেষ করেছেন অর্ধশতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথ। আজ বাংলা সাহিত্যের নাটকের ধারার দিকে তাকালে একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, বাংলা নাটকের প্রাণরস ধারা মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক থেকে উৎপত্তি লাভ করে রবীন্দ্রনাথে এসে শেষ হয়ে গেছে: তারপর বাংলা নাটকে শুধু প্রাণরসের অভাবই হয়নি, নাটকের কোন সুসংবদ্ধ শক্তির বিকাশ নেই। সামাজিক নাটক বলতে দেখতে পাই সমাজচেতনাহীন কতোগুলো মেলোড্রামা অথবা বিলিতি গন্ধ যুক্ত কতকগুলো ষ্টাণ্ট ও অবাস্তবের সংমিশ্রণ। ঐতিহাসিক নাটকের নামে যে বই বাজারে চলছে. তা হচ্ছে ঐতিহাসিক চরিত্রের ওপর আধুনিক মতবাদের আরোপ—ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন কতগুলো আধুনিক চরিত্র যেন ঐতিহাসিক ছদ্মবেশ পরে বর্তমান যুগের কতকগুলো মতবাদের প্রতিধ্বনি করছে। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী এই উভয় দোষ থেকে মুক্ত। এতে মেলোড্রামার কোন প্রকাশ নেই; আর ঐতিহাসিক চরিত্রের ওপর আধুনিকতা আরোপ করা হয় নি। চিতোরের আকাশে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠেছিলে, তার ছায়া পড়েছে কৃষ্ণকুমারীতে, কিন্তু সে দুর্যোগের ঘনঘটা যেন কৃষ্ণকুমারীই অনিবার্য ট্রাজেডির ছায়া।

যেদিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন, কৃষ্ণকুমারী বাংলা নাটকের ইতিহাসের একটি দিগ্‌দর্শনী। এখান থেকে নাটকে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে, যার ধারা বহন করে এসেছেন দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদ প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্র লাল ও রবীন্দ্রনাথ। এই সময়ে বাংলা নাটক যেন হঠাৎ জেগে উঠেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিণতি লাভের আগেই তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা নাটক সৃষ্টি হয় নি; একমাত্র একটি মাত্র প্রহসনের নাম করা যেতে পারে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য হিসেবে "মানময়ী গার্লস স্কুল"।

কৃষ্ণকুমারী নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত

হয় নি—তার কারণ তৎকালিন্ মনোভাব। এই নাটক অভিনীত না হওয়ার জন্যই মাইকেল নাটক লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। মানসদুহিতা কৃষ্ণকুমারীর অনাদর তাঁকে আঘাত দিয়েছিল বিশেষ ভাবে।

এর পর মাইকেল যখন নাট্যরচনায় হাত দেন, তখন তাঁর প্রতিভা অস্তাচলগামী। হাউই এর মত মাইকেলের বিরাট প্রতিভা হঠাৎ জ্বলে উঠে নিজেকে নিজে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। অর্থাভাবক্লিষ্ট কবি রচনা করেন "মায়া কানন"। মায়াকাননও ট্রাজেডি। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর ট্রাজেডির সংগে এর পার্থক্য আছে। কৃষ্ণকুমারী ট্রাজেডি সবল মনের সুস্থ বিকাশ: আর 'মায়াকানন' দারিদ্র্য পীড়িত হতাশ মনের সৃষ্টি। মায়াকাননে অজয় আর ইন্দুমতীর যে ট্রাজেডি, তা যেন মাইকেলের ভেঙ্গেপড়া মনের আত্মোপলব্ধির ছবি। তাই এর মধ্যে আমরা খুঁজে পাইনা বিদ্রোহী মাইকেলকে—এর মধ্যে যেন আমরা দেখতে পাই "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিলি হায়"-এর কবিকে। কোথায় লুকালো সেই মহান স্বপ্ন বিলাসীর পর্বতগাত্র উদ্ভাসী সতেজ বহ্নিদাহ। এ যেন তুলসীতলার প্রদীপের মৃদু আলো, এর স্নিগ্ধতা আছে, কিন্তু তেজ নেই। অজয় আর ইন্দুমতীর ট্রাজেডি মাইকেলের শেষ জীবনের শোকাবহ ছবির অগ্রগামী ছায়া মাত্র। নির্বাপিত প্রতিভার ভস্মরাশি থেকে এর জন্ম।

এর পর মাইকেল "বিষ না ধনুর্গুণ" নামে একটি নাটক লিখতে চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। জীবনের সব আশার মতো এও অপূর্ণই থেকে গেল।

আমরা এখানে কেবল নাট্যকার মাইকেলকে নিয়েই আলোচনা করেছি, এ আংশিক আলোচনা মাত্র। মাইকেল ছিলেন মহাকবি। সেই মহাকবি মাইকেলের প্রতিভার অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশভাগ মাত্র নাটক রচনায় নিয়োজিত হয়েছিল। তারই তেজে নাটক এগিয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। জীবনের পানপাত্রকে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন তাঁর যৌবনে, তাই শেষ জীবনের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে রেখে যেতে পারেন নি। বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহ কেবল ভেঙেই যায়নি, তা' গড়েও তুলেছে। বাংলার দুলাল যে দিন তাঁর অভিলাষ জ্ঞাপন করেন—'রচিব মধুচক্র', সেদিন বাংলার সাহিত্য সত্যিই এমন যায়গায় এসে দাঁড়ালো, যখন বলা যায় "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

মাইকেলের সময়কে বাংলা নাটকের গঠনকাল (formative period) বলা যেতে পারে। এসময়ে নাটকের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত হ'লো। এর কারণ হচ্ছে, বাংলা গদ্যের উন্নতি। বাংলা গদ্য যদি নাটক রচনায় উপযুক্ত না হতো তবে নাটক মাইকেলের সময়ে এ-রূপ গ্রহণ করতে পারতো না। অন্য কারণ হচ্ছে: শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিলিতি মনোভাবের প্রাধান্য। সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক দেখে তাঁদের মাতৃভাষায় নাটক লিখবার উৎসাহ দিয়েছিলেন।

মাইকেল বাংলা নাটকের গঠনশৈলী ঠিক করে দিয়ে গেলেন। তিনি নিজস্ব নাটক রচনা করা ছাড়াও, আর একটি সমসাময়িক নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন সে নাটকটি বাংলা দেশের ওপর যে আন্দোলন সৃষ্টি করলো তা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বাংলা দেশের পথে প্রান্তরে বিদেশী বণিকের যে নির্মম অত্যাচার চলছিল, বৈদেশিক রাজত্বের যে বিষক্রিয়া সমস্ত সমাজ জীবনকে কলুষিত করে দিয়েছিল, তার ছায়া সাহিত্যেও এসে পড়েছিল। সে সময়ই প্রথম গণনাট্য আন্দোলন আরম্ভ হয় এদেশে। নাটকের বিষয় বস্তু ছিল গ্রামের চাষী, দুঃস্থসংস্থান বাংলার গ্রাম, কাহিনী বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। নাটকে লেখকের নাম ছিল না, লেখাছিল—

নিলকর বিষধর দংশন কাতর
কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রেরিতং॥

এই নাটক বাংলা নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ প্রকাশ করলো। নাটক হ'য়ে উঠলো জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, সমাজের ছায়া পড়লো তার ওপর।

কবি মাইকেলের প্রতিভার পাশে এই প্রতিভা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন স্বকীয় স্বাতন্ত্র নিয়ে। বাংলা গ্রামের অশ্রুসজল কাহিনীকে ঘিরে, তার দৈনন্দিন সুখ দুঃখকে নিয়ে গড়ে উঠলো নাটকের কাহিনী। নাট্যকার নাম প্রকাশ করেন নি—কিন্তু আমরা তাঁকে চিনি। তিনি হচ্ছেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র।

কবি মাইকেলের পতাকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

নটশ্রেষ্ঠ শিশির কুমারের কাছে আমাদের আশা ও আশা-ভঙ্গ

শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়

সাধারণ দর্শক হ'তে সুরু ক'রে রসবেত্তা ও রস বোদ্ধা বিদগ্ধজন পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে বলবেন যে, শিশির ভাদুড়ির সমকক্ষ নটপ্রতিভা আর নেই দেশে। সাধারণ দর্শক হাজার বার দেখেও আবার "আলমগীর" "জীবানন্দ" দেখতে ছোটে। রসিকজন মজলিসে ব'সে দ্বিধাশূন্য হ'য়ে বলেন যে, শিশির বাবুর অভিনয়-ক্ষমতা সমৃদ্ধ, সূক্ষ্ম ও বিচিত্র। দেশ বিদেশের নানা বিদগ্ধ-সমাজ ফেরৎ কলাবিৎ দিলীপকুমার তাঁকে কোনো বিখ্যাত পাশ্চাত্য নট-প্রতিভার সংগে তুলনা ক'রেছিলেন। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শিশিরকুমারের প্রতিভায় বিস্মিত হয়ে দার্জিলিং যাবার পূর্বে তিনলক্ষ টাকা দিয়ে একটি জাতীয় নাট্যশালার পত্তন করবার আশ্বাস দিয়ে ছিলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সবিশেষ অর্থেই তাঁকে নাট্যাধিনায়ক আখ্যা দিয়ে ছিলেন এবং শিশির কুমারের নটন ক্ষমতায় প্রীত হ'য়ে "যোগাযোগ" ও "তপতী" পর্যন্ত অভিনয় করতে দিয়েছিলেন।

শিশিরকুমার সংস্কৃতি সম্পন্ন অভিনেতা। এবিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়। বিমুগ্ধ সমাজের খ্যাতনামা লেখক 'বীরবল' তাঁকে যখন বলেছিলেন, "আপনি সাহিত্য রচনা করেন না কেন?' তখন গর্বী শিশির কুমার উত্তর করে ছিলেন, 'কেউবা সাহিত্য লিখে রচনা করে, কেউ বা সাহিত্য রচনা করে কথনে। আমি সাহিত্য কথক।" বাস্তবিক শিশির বাবুর বাক্যালাপ নিপুণ বৈদগ্ধ্যে ঐশ্চর্যময়। শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় লেখককে পণ্ডিচেরীতে শিশির প্রসংগে আলাপাদির সময় বলেছিলেন, "তিনি তো অদ্ভুত কথালাপী?" কথাটা সত্য। বি, এ, এম, এ পাশ করা অভিনেতা আজকাল যে মেলে না তা নয়। কিন্তু ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে এতোখানি অধিকার এবং সে অধিকারকে এতো ঐশ্চর্যময় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে প্রকাশ করার ক্ষমতা শিশির বাবুর মতো খুব কম ব্যক্তিরই আছে।

আমার এতো কথার অবতারণা শিশির স্তুতির জন্য নয়। আমার উদ্দেশ্য বিপরীত মুখী। আমি বলতে চাই, শিশির কুমারকে আমরা স্বীকার করেছি, গ্রহণ করেছি, তাঁর নট প্রতিভায় মুগ্ধ হ'য়েছি। দাম দিয়েছি তাঁর ক্ষমতার। তাঁর সংস্কৃতির তারিফ্ করতে সংস্কৃত সমাজ কার্পণ্য করেনি। তাঁর শক্তিমত্তার কথা তাঁর গুণগ্রাহীর অপরিচিত নয়।

গিরীশচন্দ্রের পর ক্ষমতাবান অভিনেতা দেশ দেখে ছিলো। শিশিরকুমারই স্বয়ং বহুবার লেখকের কাছে অর্ধেন্দু মুস্তফি প্রভৃতির প্রশংসা করেছেন। এমন কি নরেশ মিত্রের অভিনয়ের প্রশংসাও তিনি কয়েক বারই লেখকের কাছে করেছেন। প্রভূত প্রতিভাবান নট প্রচুর না দেখলেও বিশেষ ক্ষমতাবান নট কতিপয় আমরা পেয়েছি বাংলা রঙ্গমঞ্চে, কিন্তু গিরীশচন্দ্রের মতো অতো শক্তিমান মানুষ নাট্যজগতে বেশি পাই নি। গিরীশচন্দ্রের পর একমাত্র শিশিরকুমারকেই আমরা শক্তিমান নট রূপে পেয়েছি। যারা অভিনয় ভিন্ন অন্য অবকাশে অর্থাৎ আলাপ আলোচনায় শিশির বাবুকে দেখেছেন শুনেছেন, তাঁরা বলতে পারবেন কতোখানি শক্তি বিধাতা তাঁকে দিয়েছিলেন। প্রাণে কাঙাল আমরা। জীর্ণশীর্ণ প্রাণ প্রবাহ আমাদের ধমনীতে বইছে কি বইছে না—জানাই যায় না, অবশ্য ফুৎকার চীৎকার, আস্ফালন, উল্লম্ফন কিছু কিছু থাকলেও কতিপয় অসাধারণ প্রতিভাই আমাদের একমাত্র সম্বল। শিশির কুমার তেমনি একজন প্রতিভাবান। মাইকেলের মতো শক্তি ছিলো তাঁর। ততোখানিই তপ্ত প্রাণ নিয়ে তিনি রঙ্গমঞ্চে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সবিশেষ অর্থেই নাট্যাধিনায়ক বলেছিলেন, একদা কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় পুরুষ শিশির কুমারকে বলেছিলেন ; ""শিশির বাবু আপনার মতো শক্তি নিয়ে জন্মালে আমি সারা দেশ ঢুলিয়ে দিতুম।" কথাটা তিনি সত্যিই বলেছিলেন ; রসিকতা মাত্র নয়।

শিশির বাবুর অভিনয়ে একটি বিশেষ শক্তিমত্তার

পরিচয় আছে। যে যে চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন তাতে স্বতন্ত্র চরিত্র তিনি ফুটিয়েছেন। আমাদের দেশে নাটক দুর্বল। কাজেই রচিত চরিত্র ক্ষীণশক্তি। ঠিক ঠিক চরিত্রটী ঠিক্ ঠিক্ রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে না আমাদের নাটক রচনায়। আমরা মোগল সম্রাটের চরিত্রকে নাটকে এমন রূপে লিখি, যাতে তাঁকে যে কোনো হতভাগ্য বৃদ্ধ পিতা বলা চলে। বাহ্যিক ঘটনার পটভূমিকা ভিন্ন স্বতন্ত্র মোগলই সম্রাটত্ব সেখানে ফোটে না। কিন্তু শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ে যে-রামচন্দ্র, যে-সাজাহান, যে-আলমগীর, যে-রাসবিহারী, যে-জীবানন্দ, যে-মাইকেল ফুটিয়ে তোলেন তাঁর একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। অবশ্য সেক্সপীয়রের মতো ঋষি প্রতিভার লেখনি প্রসূত চরিত্র পেলে তাকে শিশির কুমার ছাপিয়ে যেতে নিশ্চয়ই পারতেন না, কিন্তু তাকে অপরূপ সৌষ্ঠব ও সূক্ষতায় ফুটিয়ে তুলতে পারতেন।—

অভিনয়ে নট একটি চরিত্রকে বিকশিত করেন। সে—চরিত্র যতোই পূর্ণাঙ্গ হোক জীবনের সে একটি দিক মাত্র। কিন্তু প্রতিভাবানের সৃষ্টি হ'লে সে চরিত্রের মধ্যে জীবনের বৃহত্তর নিশ্বাসের আভাষ থাকবে। শ্রেষ্ঠ নট তাকেই ইঙ্গিত করেন। মাইকেল (নাটকের মাইকেল) এর বাচন তাঁকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না। ভঙ্গীতে, সংঘাতে, ব্যক্তিত্বে, চরিত্রের নানা অভিব্যক্তিতে চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রাণকে জাগিয়ে তুললেই মস্ত কাজ হ'য়ে গেলো নটের পক্ষে। সে কাজ অভিনয়ে একমাত্র শিশিরকুমারই করেছেন।

শিশির কুমারের অদ্বিতীয় ক্ষমতা তাঁর অধিনায়কত্বে। অভিনয় শেখাতে তিনি অসাধারণ। এই সেদিনও রেবা ও রাধারাণীকে হেনরিয়েটা দেবকী বোঝাতে গিয়ে নেল্সন ও নেপোলিয়নের প্রণয় জীবনকেও বলতে বলতে, প্রতিভাবানের প্রাণে প্রেরণা জাগাবার কাজে প্রণয়ের স্থান কোথায়, সে কথাটা কতো চমৎকার ক'রেই না বলছিলেন। বাচন ভঙ্গী ব'লে দেবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর, একই শক্তিশালী বাচ্যাংশ একই রকমে কখনই তিনি বলেননা। সেই জন্যই সামান্য শক্তির নটনটীর শিখবার অসুবিধা তাঁর কাছে। কেননা সেখানে মাছিমারা কেরাণী হবার উপায় নেই। ঠিক সেই জন্যেই নটনটী গড়তে পারলেন একমাত্র তিনিই, সমসাময়িক আর কেউ নন।

অতীত, বর্ত্তমান সকল নাট্যকারেরই নাটক শিশির কুমার অভিনয় করেছেন। যেখানেই দেখেছেন চরিত্রের মধ্যে মনস্তাত্বিক সঙ্কট (Psychological conflict) আছে, যেখানেই দেখেছেন নাটকের তত্বে (Theme এ) ভাববস্তু (Idea) আছে, সেখানেই তাকে বিকশিত করেছেন তিনি। প্যাচ কস্তে তিনিও কম ওস্তাদ নন কিন্তু এটা তাঁর বাহুবিলাস। প্যাচেই তাঁর উপজীব্য নয়। রামচন্দ্রে তিনি অবতার রাম ও মানব রামের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়েছেন, শাজাহানে তিনি করুণ প্রেমকে ইঙ্গিত করেছেন, (তার বেশি অবসর নাটকে নেই) জীবানন্দে উচ্ছৃঙ্খল ও স্বস্তিকামীর দুর্ভাগ্য দেখিয়েছেন। রীতিমতো নাটক ও 'মায়া' প্রভৃতিতে তাঁর পরিশ্রান্ত নটজীবনকে

হাল্কা অভিনয়ে বিশ্রাম দিয়েছেন, আবার "যোগাযোগ "তপতী" তে নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় যুগ তো শিশিরকুমারেরই যুগ। তাঁর বাচন ভঙ্গী হুবহু নকল করা যায় না। এইখানেই তাঁর প্রতিভা। কিন্তু তাঁর আবৃত্তির প্রভাবে বর্তমান মঞ্চে আবৃত্তির ধারাই বদলে গেছে।

নাটকের অবয়ব গঠনে শিশির কুমারের ক্ষমতা অসাধারণ, তাঁর হাতে যে উপন্যাস নাট্যরূপায়িত হ'য়েছে, স্বতন্ত্র স্বাধীন অনেক নাটকের রূপও তার কাছে হীন হয়ে যায়। দৃশ্য সমাবেশে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটককেও হুবহু মেনে চলেননি তার প্রমাণ আছে এবং কবীন্দ্রের অনেক গল্পকে নাট্যরূপ দেবার কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরামর্শকে অবহেলা করেন নি। সবক্ষেত্রেই তাতে ভালো হয়েছে কি তাতে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে তার বিচার স্বতন্ত্র কিন্তু নাট্যাবয়ব গঠনে শিশির কুমারের ক্ষমতা অনস্বীকার্য।

এতো শক্তি যাঁর, এতো ক্ষমতা নিয়ে এলেন যিনি তাঁর হাতে স্থায়ী কিছু পেলুম কই? তাঁরই জীবিতকালে তাঁরই প্রভাবান্বিত স্বাভাবিক আবৃত্তি ভঙ্গীকে অবহেলা ক'রে চীৎকার আবৃত্তি করতালি তো পাচ্ছে! তাঁর সুগঠিত নাটকের পাশাপাশি বহু কুগঠিত নাটকও দেখছে তো দর্শকরা। আজ যদি শিশিরকুমার আমাদের মধ্য হ'তে চলে যান, তবে রঙ্গমঞ্চে তাঁর স্থায়ী দান থাকবে কি কিছু? 'দেহ পট সনে নট' সকলই মিলায় জানি। কিন্তু সে তো নটের নিজের কথা। দেশের রঙ্গভূমিতে যে পলিমাটি পড়ে নটের ক্ষমতার উচ্ছ্বাসে, সে তো লোপ পাবার নয়। অবশ্য শিশির কুমারের দান কোনো না কোনো রূপে রঙ্গজগতে থাকবেই। কিন্তু রঙ্গশালা যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সেখানে যে জাতির সমষ্টিসত্তার পরিচয় থাকে। তার ব্যবস্থা কই রইলো? জাতিকে রঙ্গালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হ'লো কই? রবীন্দ্রনাথকে একদা শিশির কুমার স্বয়ং একথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কবীন্দ্র উত্তর করেছিলেন "চলতে চলতেই জাত্ জাতীয় নাট্যশালা গড়বে।" কথাটা সত্য হ'লেও কবি প্রশ্নটীকে যে এড়িয়ে গিয়েছিলেন তা' স্পষ্ট বোঝা যায়। জাতীয় নাট্যশালা একমাত্র শিশির বাবুই করতে পারতেন বলে বহু ব্যক্তির ধারণা। অবশ্য জাতীয় নাট্যশালার অর্থ যদি হয় একের বা কতিপয়ের প্রভুত্ব বর্জিত পৌর-নাট্যশালা তবে তার মূল্য বাহ্যতঃ কিছু হ'লেও মূলতঃ খুব বেশি নয়। নাটক নির্বাচন, নাট্যের আয়োজন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আদর্শবাদী জাতীয় সংস্কৃতিবান্ কোনো ভাবুক অধিনায়ক মূলে না থাকলে জাতীয় নাট্যশালা গড়ে উঠবে কি ক'রে?

ঠিক এইখানেই শিশির কুমারের গুণগ্রাহীদের আশা-ভঙ্গ। কিন্তু বহুজনের এই ক্ষোভ, নাট্যামোদীর এই আশা-ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী হলেও ন্যায্য কি?

শিশির কুমার যতো শক্তিমানই হোন্, যতো খানি নটপ্রতিভাই তাঁর থাক্, যতো গুণগরিমাই তাঁর অধিনায়কতায় পাই, তিনিও একজন সাধারণ মানুষ। মাইকেলের মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি ছিলো তার সব খানি কি আমরা পেয়েছি? গিরীশের সব শক্তিই কি আমাদের অঞ্জলিতে এসে পড়েছিলো?

জাতির সমষ্টি জীবন বড়ো কাঙাল, তাই যেখানেই কেউ মাথা তুলে দাঁড়ায় তাঁর কাছেই দরিদ্র ভিখারীর মতো আমরা প্রচুরতর দান আশা করি। কিন্তু মানুষের জীবনে বাধা আছে, বিঘ্ন আছে, দ্বন্দ্ব আছে, দ্বিধা আছে; শত্রুতা আছে, বঞ্চণা আছে; ঔদাস্য আছে, আলস্য আছে। যে কাজ শিশির কুমার করে যেতে পারেন নি "ভ্রমে প্রমাদে বাধায় বিঘ্নে" তার জন্য ক্ষোভ কেন? রঙ্গমঞ্চের তৃতীয় অধ্যায়ের জন্য অন্য পন্থা কি নেই; প্রতিভাবানের আগমনে যুগের প্রবর্তন হয়। কিন্তু যুগের প্রয়োজনে প্রতিভাবানের উদ্ভব হয় না কি? আমাদের নাট্যামোদী সংস্কৃতি সম্পন্ন মন যদি ব্যাকুল হয়, আমাদের রস পিপাসু প্রাণ যদি কাতর হয়, আমাদের ভাবুক চিত্ত যদি আদর্শগ্রাহী হয় তবে সম্মিলিত আগ্রহের সমবেত চেষ্টায় আমরা মঞ্চকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারি, যার মধ্যে নানান্ নবতর ক্ষমতার উদ্ভব হবে এবং একদা প্রতিভাবানের অভ্যুদয়ে জাতীয় নাট্যশালা গড়ে উঠবেই। লেখক বেহিসাবী ভাবুক। আশাভঙ্গের দলে সে নয়। সে জানে, যা পেয়েছি সেই যথেষ্ট। তারপরের কাজ তারপরের লোকেরা করবে। এক্ষেত্রে আক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ন্যায্য নয়।

সুগন্ধে
রূপ হবে রমনীয়
VICTORIA ROSE
হোয়াইট রোজ—ভোরের শিউলির মতই টাটকা আর শিশিরের মত স্নিগ্ধ
ভিক্টোরিয়া রোজ—সর্ব্বজনপ্রিয় বসোরা গোলাপের অনুপম সৌরভ
ডামাস্ক রোজ—প্রাচ্যের লুপ্ত-প্রায় সৌন্দর্য্যের রেশ........
SERVICE
pmb
পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং, লিঃ কলিকাতা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

[নাটক]

অধ্যাপক নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

—প্রথম অঙ্ক—

১ম দৃশ্য

আমার কথা :—

নেতাজী সম্বন্ধে যে সব সংবাদ সংগ্রহ করেছি তার মধ্যে বিশদভাবে সমস্ত ঘটনা প্রাপ্তি ঘটে নি। নাটক লেখার উপাদান বিশেষভাবে এই সব সংবাদের মধ্যে যা পেয়েছি—তা যথেষ্ট নয়। সংবাদ পত্রের মারফতে যে সব ঘটনা প্রকাশিত হ'য়েছে—তারই উপরে ভিত্তি ক'রে এই প্রচেষ্টা। সে কারণে দোষ, ত্রুটী, অসংলগ্নতা হয়তো চোখে পড়বে। তবে কাব্যিক প্রশ্রয় যাতে বেশী না নিতে হয় তার চেষ্টায় আমার ত্রুটী হয়নি। আমি নাটক লিখি—মহান নাটকীয় চরিত্র সুভাষচন্দ্রের কর্মময় জীবনের ঘটনাগুলি নাটকীয় সংলাপে রূপান্তরিত করবার দারুণ স্পৃহা, আমার দোষত্রুটীগুলি ক্ষমার সম্পদে ভ'রে দেবে এই ভরসা করি। —জয়হিন্দ।

[দৃশ্যপট উঠিতেই দেখা যাইবে অন্ধকার। ক্রমে রঙ্গমঞ্চের পশ্চাত ভাগে সাদা পর্দায় –ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র ভাসিয়া উঠিল'—তার মধ্যভাগে লৌহশৃঙ্খল পরা ভারত মাতার দুইটি হাত। তার মধ্য হইতে উদাত্ত কণ্ঠে কথা ভাসিয়া আসিল]

সুভাষ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস না হ'লে ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'তে পারবেনা। এই সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যদি জয় হয়, ভারত মাতার হস্ত শৃঙ্খল হবে—দৃঢ়তর। একে আমাদের ধ্বংস করতে হবে। বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ ভেঙ্গে পড়ছে—ভারতের মুক্তি দিবসও আগত। আমার স্বদেশ বাসিগণ, তোমরা ওঠো, জাগো তোমরা, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে, স্বাধীন, স্বতন্ত্র ভারত গ'ড়ে তুলতে তোমরা কোমর বেঁধে দাঁড়াও।...... আমি জানি জার্মানীতে থেকে আমি আমার দেশের জন্যে কিছুই করতে পারব না। আমি শুনেছি আমার বন্ধুদের ডাক—তাই আমাকে যেতে হবে—সুদূর মালয়ে। আমি জানি, আমার যাত্রা পথ বিপদ সঙ্কুল—তবু, তবু আমাকে যেতে হবে। জার্মানী থেকে টোকিও যাত্রাপথে আমার যদি মৃত্যুও ঘটে, তবু জানব—আমার দেশ—আমার ভারতের জন্যেই আমি মরেছি,—

[দৃশ্যের পরিবর্তন হইল। আলোকের বিকাশ হইল সোনানের একটি রাজপথ। পথে ভারতীয়দের হুড়াহুড়ি—]

একদল। (প্রবেশ) এসে গেছেন টোকিওতে, তিনি এসে গেছেন। দুই একদিনের মধ্যেই সোনানে আস্‌বেন। জার্মানী থেকে টোকিও আস্‌তে ছ' সপ্তাহ লেগেছে,—সাবমেরিণে এসেছেন, (দলের প্রস্থান)।

অন্যদল। (প্রবেশ) হ্যাঁ, হ্যাঁ এসে গেছেন। টোকিও এসে বক্তৃতা দিয়েছেন। এইত কাগজে বেরিয়েছে—শোন, শোন আমি পড়ি।

পাঠক। (খবরের কাগজ পাঠ)

এ সুযোগ শত বর্ষের মধ্যেও হয়তো আস্‌বেনা। রক্তের বিনিময়ে আমাদিগকে আজ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। নিজেদের চেষ্টায় যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করব নিজেদের শক্তি দিয়েই তাকে রক্ষা করতে হবে। ভারতের বীর সন্তানেরা আজ তরবারি কোষমুক্ত করেছে—তাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনই রূপান্তরিত হলো আজ সসস্ত্র বিদ্রোহে। (উহারা চলিয়া গেল)

অন্যদল। (প্রবেশ)

পাঠক। (খবরের কাগজ পাঠ)

আপোষের পথে স্বাধীনতা আস্‌বেনা। ওরা যখন আপোষ আলোচনার কথা বলে, তখন স্বাধীনতার প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই বলে। আমাদের দাবী স্বাধীনতা, ইংরেজ ও তাদের তাবেদারেরা যে দিন ভারত ত্যাগ করবে, সেই দিনই আস্‌বে সেই স্বাধীনতা।

(উহারা চলিয়া গেল)

অন্যদল। (প্রবেশ)

পাঠক। (খবরের কাগজ পাঠ)

সেই স্বাধীনতা যারা অর্জন করতে চায়, স্বাধীনতার বেদীমূলে, আত্মদানের জন্যে, রক্তদানের জন্যে এগিয়ে

আসতে হবে। এ সংগ্রামে আপোষ নেই, দ্বিধা নেই—প্রশ্ন নেই পিছনে হ'টে যাবার। দুর্বার গতিতে স্বাধীনতার যুদ্ধে আমরা এগিয়ে যাব,—যুদ্ধে করব আমরা জয়লাভ—যতদিন বিজয়লক্ষ্মী প্রসন্ন না হন – ততদিন—ক্ষান্তি নেই—বিরাম নেই—স্বস্তি নেই— (উহারা চলিয়া গেল)

একদল মেয়ে (প্রবেশ)

পাঠিকা। (খবরের কাগজ পাঠ)

ভারতবর্ষের বন্ধন মোচনই আমাদের কর্তব্য—আমাদের ধর্ম।—এ পবিত্র দায়িত্ব-পালন আমাদেরই করতে হবে। অন্যের সাহায্য লাভের আশায়, সে দায়িত্ব আমরা এড়াতে পারব' না। (উহারা প্রস্থান করিল)

অন্যদল। (প্রবেশ)

পাঠক। (খবরের কাগজ পাঠ)

আমার বিশ্বাস আছে পূর্ব এসিয়া-প্রবাসী, আমার দেশবাসীর সাহায্যে এমন এক বিরাট সেনা বাহিনী গঠন করতে পারব—যার তীব্র আক্রমণে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভেঙ্গে পড়বে তাসের ঘরের মত। স্বাধীনতার বেদীতলে—ভারতের বীর পুত্রগণ, যখন অকাতরে রক্তাঞ্জলি দিতে এগিয়ে আসবে—সেই দিন—সেই দিনই দেশ মাতৃকার হস্ত শৃঙ্খল ধূলিতে খসে পড়বে। আজই ত' সেইদিন—আজইত সমাগত সেই শুভদিন— (উহারা চলিয়া গেল)

[সহসা বাজিয়া উঠিল সমর বাদ্য :—]

সমস্বরে ধ্বনি হইল—"আজাদ হিন্দ ফৌজ কি জয়—সম্মুখে মেজর মোহন সিংহ, প্রভৃতি সকলেই সামরিক পোষাকে সজ্জিত। সৈন্য বাহিনী কুচকাওয়াজ করিতে করিতে—অদৃশ্য হইয়া গেল—সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—

সুস্বাগত—সুভাষচন্দ্র—সুস্বাগত সুভাষচন্দ্র

২য় দৃশ্য

সোনান হেড কোয়াটারস

[রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র প্রবেশ করিলেন]

রাসবিহারী। তুমি এলে—কত যে ভাল হলো। আর কোন চিন্তা আমার রইল না। জীবন ব্যাপী যে সংগ্রাম করে এসেছি, তার সমস্ত ভার তোমার উপরে ন্যস্ত ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হবো। নব সূর্যের প্রদীপ্ত আলোকে আজ সমস্ত পূর্ব এসিয়া উদ্‌ভাসিত—আমি জানি এই গুরুভার বহন ক'রে, সুচিন্তিত কর্মধারায়—উৎসাহে, উদ্দীপনায়—ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সাধনাকে তুমিই দেবে রূপ—পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলে দিয়ে, ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করবে—তুমিই।

সুভাষ। ভারতীয় জাতীয় ইতিহাসে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতিরূপে যে অমানুষিক পরিশ্রম আপনি করেছেন, তার মূল্য কেউ দিতে পারবেনা।

রাসবিহারী। সিঙ্গাপুরের পতনের পর ১৯৪২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী জাপানী হেড কোয়াটারের মেজর ফুজিয়ারা, ভারতীয়দের নিয়ে এক সম্মেলন আহ্বান করেন এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে আমাদের সাহায্য করবেন—এমন আশ্বাস দেন। জাপানীদের ইচ্ছে, আমরা তাদের তাঁবেদার হ'য়ে কাজ করি। মালয়ে, টোকিওতে, ব্যাঙ্ককে আমরা ভারতীয়রা, একটা কর্মপন্থা নির্ধারণে সম্মিলিত হই। এবং ঠিক হয় পূর্ব এসিয়ায় ভারতীয়গণের নেতৃত্বে—আজাদ হিন্দ সংঘ ঘটিত হবে। এই সংঘ জাপানের বন্ধুত্ব চাইবে কিন্তু প্রভুত্ব বরদাস্ত করবেনা।

সুভাষ: বৈদেশিক প্রভুত্ব আমরা কোনদিনই মানি নি। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে জাপান আমাদের উপরে প্রভুত্ব করবে—এও তেমন করেই আমরা উপেক্ষা করব।

রাসবিহারী। ঠিক হলো আজাদ হিন্দ সংঘের আদর্শ হবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব আমাদের মেনে নিতে হবে। এবং পূর্ব এসিয়ার ভারতীয় বাহিনী হতে এবং বে-সামরিক জনসাধারণের মধ্য হ'তে সৈন্য সংগ্রহ করে—আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করতে হবে।

সুভাষ। পূর্ব এসিয়ায় ভারতীয়দের এই বিরাট সংগঠনের মূলে রয়েছেন আপনি। ক্ষেত্রত প্রস্তুত করেই রেখেছেন।

রাসবিহারী। এমন সময়ে সংবাদ এল—ভারতে আরম্ভ হয়েছে জাতীয় জাগরণ, আগষ্ট আন্দোলনে সারা ভারতে

পড়ে গিয়েছে সাড়া। তাই আমরাও কালক্ষেপ না করে মেজর মোহন সিংহের অধিনায়কত্বে—এক বিরাট আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলেছি। একে তোমাকে আবার নতুন করে গড়ে নিতে হবে। হাজার হাজার ভারতীয় সেনা, সেনানায়কগণ এতে সানন্দে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু জাপানীদের তাবেদার না হওয়ায় জাপানীরা আমাদের প্রতি তুষ্ট হ'তে পারেনি। গত ১৯৪২ ডিসেম্বর মাসে ৮ই তারিখে তারা কর্ণেল এন, এস, গিলকে গ্রেপ্তার করে। জাপানীরা আজাদ হিন্দ সংঘ ভেংগে দিতেও বহু চেষ্টা করেছে, হ্যাঁ, এখনও করছে। এই সঙ্কট মুহূর্তে তোমার আগমন নিতান্ত প্রয়োজন, তাই তোমাকে আহ্বান জানিয়েছিলাম ভাই। আমার পরিচালনায় হয়তো অনেকের বিশ্বাসও নেই, তাই আমি তোমাকে এই গুরুভার অর্পণ করে...

সুভাষ। কিন্তু যে মহাপ্রাণ ভারত থেকে বাইরে এসে—ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সারা জীবন উৎসর্গ করলেন—তাঁকে দায়িত্ব মুক্ত করে ভারতের ক্ষতি করতে কেউত চাইবে না। আজাদ হিন্দ সংঘের পরিচালক না হন—পরামর্শদাতা হিসাবে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন এই আশ্বাস দিন।

রাসবিহারী। কনিষ্ঠের যে অধিকার জ্যেষ্ঠর কাছে—তা থেকে তোমাকে আমি বঞ্চিত করব না ভাই।

সুভাষ। আমি ধন্য হ'লাম।

[একজন সংবাদদাতার প্রবেশ—রাসবিহারী বসুকে একখানি পত্র দেওন।]

রাসবিহারী। যাও—ওদের—এই ঘরেই পাঠিয়ে দাও। মেজর মোহন সিংহ, ক্যাপটেন ধীলন, ক্যাপটেন সারগল, লেঃ কঃ এ সি চ্যাটার্জী, ক্যাপটেন বারহানউদ্দিন প্রভৃতি প্রবেশ করিলেন একদিক দিয়ে—অন্যদিক দিয়ে ক্যাপটেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপটেন মিস্ লক্ষ্মী, ক্যাপটেন ভোঁসলে প্রবেশ করিলেন এবং সামরিক কায়দায় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুকে ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে অভিবাদন জানাইলেন।

রাসবিহারী। আপনারা সকলেই আসন পরিগ্রহ করুন। সুভাষচন্দ্রকে আজ আমাদের মধ্যে পেয়েছি। ভারতের জন্যে তাঁর ত্যাগ, তাঁর কর্মনিষ্ঠা, তাঁর সংগঠন শক্তি—তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে। সুভাষচন্দ্র আমাদের গৌরব, সারা ভারতের গৌরব। একান্ত ভরসায়, তাঁর মত একজন সুযোগ্য পরিচালকের হাতে—আজাদ হিন্দ সংঘের পরিচালনা—ন্যস্ত ক'রে ভারতের স্বাধীনতার পথ আরও সুগম করতে চাই। আমি প্রস্তাব করি আজাদ হিন্দ সংঘের পরিচালকের পদে আমার ইস্তাফা পত্র আপনারা গ্রহণ করবেন এবং তৎস্থলে ভারত গৌরব সুভাষচন্দ্রকে এই পদে বরণ করবেন।

শাহনওয়াজ। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

সকলে। জয় সুভাষজী কি জয়—জয় সুভাষজী কি জয়।

[রাসবিহারী বাবু সুভাষ বাবুর গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। গৃহ করতালিতে ভরিয়া গেল।]

সুভাষ। যে গুরুভার আপনারা আজ আমাকে অর্পণ করলেন, জীবন দিয়েও যেন তার মর্য্যাদা আমি রাখতে পারি। পরাধীন ভারত আমাদের জন্মভূমি—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে থেকে মুক্ত ক'রে সেই পুণ্য ভূমিকে আমাদের উদ্ধার করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু, মেঃ মোহন সিংহ, শাহনওয়াজ প্রভৃতি আপনারা সকলে আজাদ হিন্দ সংঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে যারা অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি যেন আমার কর্মপন্থাকে জয়যুক্ত ক'রে তোলে। (করতালি)

সুভাষ। যে সুযোগ আমার এতদিনের প্রত্যাশা ছিল, সেই সুযোগ আজ এসেছে। ভারতের অভ্যন্তরে যে যুদ্ধ, ভারতের বাইরে থেকে শক্তি দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, রক্ত দিয়ে সেই যুদ্ধকে জয়মণ্ডিত করতে হবে—সে যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধ—সে যুদ্ধ ভারতকে—বৃটিশের লৌহ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে—স্বাধীন ভারত গড়ে তুলবার যুদ্ধ।

সকলে। [করতালি]

সুভাষ। আজাদ হিন্দ সংঘের সভাপতি পদে আপনারা আমাকে বরণ করেছেন—আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাই জানাই আমার ভাইদের কাছে। আমরা ত' একই ভারতমাতার সন্তান, এখানে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন নেই,

শিখের প্রশ্ন নেই, খৃষ্টানের প্রশ্ন নেই, বাঙালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবীর প্রশ্ন নেই—আমরা এক জাতি—স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী।

সকলে। [করতালি]

রাসবিহারী। জাপানের অভিসন্ধি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন হবে। তাদের কর্মপন্থা আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে—বাধা সৃষ্টি করেছিল।

সুভাষ। ধন্যবাদ মেঃ মোহন সিংকে, ধন্যবাদ আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানায়কগণকে যে ভাবে আপনারা সংঘবদ্ধ হ'য়েছেন—আমার স্বপ্নকে যেভাবে আপনারা রূপদান করেছেন,—জাপানের সাধ্য নেই তাকে অন্তভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে। জাপান আমাদের ঠকাতে পারবেনা—এ ভরসা আপনাদের আমি দিতে পারি। যে আজাদ হিন্দ ফৌজ আপনারা গঠন ক'রেছেন—তাকে আরও শক্তিশালী আমাদের করতে হবে। মেঃ মোহন সিং, ক্যাঃ শাহনওয়াজ ক্যাঃ ধীলন, ক্যাঃ সায়গল, ক্যাঃ লক্ষ্মী, আপনারা নতুন শক্তি নিয়ে—আজাদ হিন্দ ফৌজকে অধিকতর শক্তিশালী করুন—যদি স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা শক্তিশালী সেনাদল গঠন করতে না পারি—তবেই জাপানী আমাদের সংগে শঠতা করতে পারে। বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদ জাপানের আমলাতন্ত্র দুইয়েরই বিরুদ্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। পূর্বতন সভাপতির কথাই বলি—আমরা জাপানের বন্ধুত্ব চাই—চাই না তাদের প্রভুত্ব।

[সেনানায়কগণ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

শাহনওয়াজ। আপনার আনুগত্য আমরা আজ নত মস্তকে প্রকাশ করছি। আপনার কর্ম-প্রেরণা আমাদের নতুন জীবন দান করেছে—আপনাকে অধিনায়ক রূপে পেয়ে আজ আমরা ধন্য। (সকলে বসিলেন)

মোহন সিং। (উঠিলেন) জাপানীরা আমাদের পত্র আপনার কাছে পাঠাতে প্রথমে অস্বীকার করে—কিন্তু কিকানের ষড়যন্ত্র রাসবিহারী বাবুকে এবং আমাদের সকলকেই চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। শুভ মুহূর্তে আপনি এলেন—শঙ্কা আমাদের দূরে গেল। আমি শপথ করছি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে—আপনার আদেশে—মৃত্যুকে আমি বরণ করতে পারব নেতাজী। (বসিলেন)

সকলে। নেতাজী কি জয়—নেতাজী কি জয়।

লক্ষ্মী। আমার আনুগত্য আপনি গ্রহণ করুন নেতাজী। আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী বাহিনীর পক্ষ থেকে আমরা আপনার আনুগত্যে শপথ গ্রহণ করি।

সুভাষ। মনে পড়ে আজ সিপাহী বিদ্রোহের কথা,—ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই কি করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী বাহিনীর নামকরণ তাই আমি করতে চাই "ঝান্সীর রাণী ব্রিগেড" আর দেখতে চাই তাঁদের সুযোগ্যা পরিচালিকা—তাঁর বাহিনীর প্রত্যেককে এক একজন ঝান্সীর রাণী তৈরী ক'রেছেন।

লক্ষ্মী। আপনার আদেশ অনুযায়ীই কাজ হবে নেতাজী।

সুভাষ। নারী বাহিনী ছাড়া সমস্ত আজাদ হিন্দ ফৌজকে চারটি ব্রিগেডে বিভক্ত করতে চাই—প্রথমত স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সেবক, মহান ভারতের মহান চরিত্র মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র নাম অনুসরণে—গান্ধী ব্রিগেড।

সকলে। মহাত্মা গান্ধী কি জয়।

সুভাষ। এই গান্ধী ব্রিগেডের অধিনায়ক থাক্‌বেন—কর্ণেল ইনায়ৎ কয়ানিব। তারপর রাষ্ট্রপতি আজাদ ও বন্ধুবর নেহেরুর নাম অনুসরণে আজাদ ব্রিগেড ও নেহেরু ব্রিগেড।

সকলের করতালি।

সুভাষ। কর্ণেল মোহন সিংহ থাকবেন আজাদ ব্রিগেডের দায়িত্বে—গুরুবক্স ধীলন থাকবেন—নেহেরু ব্রিগেডের পরিচালনায়।

(সকলের করতালি)

এবং আর একটি থাক্‌বে রিজার্ভড বাহিনী।

রাসবিহারী। আমি প্রস্তাব করি তার নামকরণ হবে নেতাজী সুভাষের নাম অনুসারে—সুভাষ ব্রিগেড।

সকলে। নেতাজী সুভাষ কি জয়, নেতাজী জিন্দাবাদ।

রাসবিহারী। এবং আমি আরও প্রস্তাব করি সেই সুভাষ ব্রিগেডের অধিনায়ক হবেন বীর সেনানায়ক ক্যাপটেন শাহনওয়াজ।

সকলের করতালি।

সুভাষ। আমার ভরসা আছে, আমার নামে যে ব্রিগেডের নামকরণ আপনারা করলেন—তার মর্যাদা ক্যাপটেন শাহনওয়াজ রক্ষা করতে সক্ষম হবেন।

শাহনওয়াজ। জীবনের এই পরম গৌরবের দিনে আমি পুনরায় শপথ করে বলছি—নেতাজীর আনুগত্য আমার জীবন, ভারতের স্বাধীনতা আমার মন্ত্র—আমার সাধনা। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারবে। নেতাজী—নেতাজী—একি তোমার শক্তি—ভারতবাসীকে আমি ভারতবাসীর চোখে কোন দিন দেখিনি। ইংরাজের চোখে আমি তাদের বিচার ক'রেছি—ইংরাজ আমাকে সিঙ্গাপুর পাঠানোর আগে উচ্চ সামরিক সম্মানে ভূষিত করেছিল। আজ দেখছি—কি ছার সেই সম্মান, কি তুচ্ছ সেই সম্মান। আজ শুনি—এখানে হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, শিখ নাই, খৃষ্টান নাই—আছে শুধু ভারতবাসী - আছে শুধু—ভাইএর প্রতি ভাইএর ভালবাসা। আমি পুনরায় অংগীকার করছি—ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে, আমার জীবন—আমার ধনসম্পদ—আমার সমস্ত—আমি তোমাকেই অর্পণ করলাম।

সুভাষ। এইত চাই বীর শাহনেওয়াজ। স্বাধীনতা চায় তার বেদীমূলে আত্ম বলিদান, স্বাধীনতা চায় তোমার শক্তি, তোমার সম্পদ, তোমার যা কিছু মূল্যবান—যা কিছু তোমার আছে। স্বাধীনতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শুধু সৈনিকই চান না, তিনি চান বিদ্রোহী নর, বিপ্লবী নারী, যাঁরা আত্মঘাতে দ্বিধা করেনা—মৃত্যুকে যাঁরা জানে নিশ্চিত বলে, যাঁরা নিজের রক্ত ধারায় শত্রুকে নিমজ্জিত করে দেয়।

সকলে। নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ—নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ।

৩য় দৃশ্য

সোনানের রাজপথ

[বহু লোকজন ভারতীয়গণ সারি বাঁধিয়া—"নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া চলিয়াছে। এমন করিয়া একদল, দুই দল, তিন দল চলিতে লাগিল। তারপর দুইজন ভারতীয় প্রবেশ করিল]

১ম জন। আজ নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ঘোষণা করবেন। জগতের অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মত ভারতবাসীর যে স্বাধীন সৈন্যবাহিনী আছে সকলে আজ তা জানতে পারবে। ভারত আর পরাধীন থাক্‌বে না। দলে দলে ভারতীয় ছেলে-মেয়ে সব আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান ক'চ্ছে।

২য় জন। কিন্তু জাপানী সেনাপতি তারুইচি, নাকি বলেছেন, ভারতীয় সৈন্যরা অনেকেইত ইংরেজের ভাড়া করা সৈন্য, তারা কি জন্মভূমির জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করতে পারবে? তিনি নাকি বলেছেন, জাপানীরা ভারত উদ্ধার করে দিক—পরে ভারতবাসীকে জাপান ভারত ছেড়ে দেবে।

১ম জন। কিন্তু নেতাজী সে কথায় সায় দেন নি। তিনি বলেছেন—ভারতকে উদ্ধার করবে ভারতবাসী,—পরাধীন ভারতকে মুক্ত করতে ভারতবাসীই সর্বপ্রথম রক্ত তর্পণ করবে। জাপানীরা আমাদের সাহায্য করবে বটে কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের উপরে তাদের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। তারুইচিকে সে কথা মেনে নিতে হয়েছে।

২য় জন। সারা পূর্ব এসিয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে যেন নতুন জীবন ফিরে এল। সময় যখন এসেছে আর চুপ করে বসে থাকব না– আমিও সৈনিকের ব্রত গ্রহণ করবো, যোগ দেব আমি আজাদ হিন্দ ফৌজে—এস এস আর দেরী নয়। নেতাজী সুভাষ—নেতাজী সুভাষ! [উহারা চলিয়া গেল আবার দল বাঁধিয়া লোকজন চলিতে লাগিল—মুখে তাদের সেই একই কথা—]

"নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ—"

৪র্থ দৃশ্য

সোনান মিউনিসিপ্যালিটির বিরাট প্রাঙ্গনে বিপুল জনসভা। উচ্চতর মঞ্চের উপরে সামরিক বেশে সুভাষচন্দ্র তাঁর পাশেই নির্মুক্ত আকাশে—ভারতীয় জাতীয় পতাকা যেন আপন গর্বে—উড্ডীয়মান। পার্শ্বে অন্যান্য সেনা-নায়কগণ, নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী—অন্যদিকে জনগণ। সে এক অপূর্ব প্রাণচঞ্চল দৃশ্য। সমর বাদ্য শ্রুত হইল। সৈন্যেরা বাদ্যের তালে তালে **মার্ক টাইম** করিতে লাগিল। বাদ্য থামিল'—সুভাষচন্দ্র উঠিলেন এবং সকলকে জলদ গম্ভীর কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া জানাইলেন :—

সুভাষচন্দ্র। বন্ধুগণ, মুক্ত বাতাসে, স্বাধীন এবং মুক্ত ভারতের জাতীয়তার প্রতীক যে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত মুক্ত পতাকা উড্ডীয়মান—সেই পতাকাই ভারতের তথা আজাদ হিন্দ ফৌজের জাতীয় পতাকা—আসুন—আমরা সর্বপ্রথম এই পবিত্র পতাকার প্রতি আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করি।

[সকলে অভিবাদন করিলেন এবং পতাকা সঙ্গীত গীত হইল]।

"স্বাধীন ভারত কি জয়"—"স্বাধীন ভারত কি জয়—"

সমবেত সঙ্গীত : : পতাকা সঙ্গীত

সর পর তিরংগা ঝাণ্ডা, জলয়া দিখা রহা হৈ।
কৌমি তিরংগা ঝাণ্ডা, উঁচে রহো জাহা মৈ,
হো তেবি সরাবাজি জো চাঁদ আস্‌মান মই।
তু মান হায় হামরা, তুসান হায় হামারি,
তু জিত কো নিশান হো, তুহি হায় হামারি।
হর এক্ বস্‌রকি লুই পর জারি হায় ঘ্যাঁ ডুবাইয়ঁ,
কৌমি তিরিংগি ঝাণ্ডা হাম সোভাবৈ উদয়েঁ।
আকাশ অর জমিন পর হো তেরে বোল বালা,
ঝুক জয়ে তেরাঁ হর তাজ তখত' ওয়ালা।
হর কোম কি নজর মৈঁতু আমান কা নিশান হো,
হো ম্যায়সা মুসার সারা তেরা জাহান হো।
সন্তক বাই নওয়ারী খুন ছকাই গা রহা হই।
কৌমি তিরঙ্গা ঝাণ্ডাই উচাঁ রহো জাহা মাই।

জনগণ। তিরঙ্গা—ঝাণ্ডা—জিন্দাবাদ—[সুভাষচন্দ্র সবাইকে নির্দেশ দিলেন—সবাই বসিলেন শুধু সৈন্যবাহিনী দাঁড়াইয়া রহিল—সুভাষচন্দ্র বলিলেন—]

সুভাষ। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকগণ—তোমরা সকলেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করে শপথ গ্রহণ করেছো—আমিও সেই সংকল্পে শপথ গ্রহণ কচ্ছি, আমাকে আজাদ হিন্দ ফৌজের এক জন সৈনিক হিসাবে—তোমরা গ্রহণ কর।

মোহনসিংহ। সেনা বাহিনীর সকলে এবং প্রত্যেক সেনানায়কগণ এই শপথ গ্রহণ করছেন—কিন্তু আমি আশা করি—নেতাজীর সংগে সংগে—এই সংকল্প বাণী সেনাবাহিনীর প্রত্যেকের মুখে প্রতিধ্বনিত হবে।

সুভাষ। সংকল্প বাক্য :—

আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা ক্রমেই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিতেছি—। আমি কায়মন বাক্যে ভারতের সেবার জন্য, ভারতের জন্য ও ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিতেছি। আমি ভারতের সেবা ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমার সকল শক্তি ও সামর্থ নিয়োজিত করিব। এজন্য নিজের জীবন বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে আগে স্থান দিব না। জাতি, ধর্ম, ভাষা, নির্বিশেষে সকল ভারত বাসীকেই ভ্রাতা ও ভগিনী হিসাবে জ্ঞান করিব। [অন্য সকলে সুভাষচন্দ্রের সংগে সংগে এই বাণী উচ্চারণ করিল]

সুভাষচন্দ্র। ভারতের-মুক্তিকামী সেনাবাহিনী,

আজ আমার জীবনের পরম গৌরবের দিন। সর্ব শক্তিমান ভগবান এ গৌরব আমাদের দান করেছেন। সে গৌরব আমি ঘোষণা কচ্ছি— সারা পৃথিবীর কাছে ঘোষণা কচ্ছি--ভারতের মুক্তি বাহিনী আজ সংগঠিত হয়েছে। এই বাহিনী আজ সিঙ্গাপুরে সমবেত হয়েছে—আর এই সিঙ্গাপুর ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্বে এসিয়ার লৌহ দুর্গ। এই বাহিনী শুধু ভারতকেই ব্রিটিশ শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত করবে না—এই বাহিনী ভবিষ্য ভারতের জাতীয় বাহিনীর স্বরূপ হবে।

সকলে। আজাদ হিন্দ ফৌজ—জিন্দাবাদ।

সুভাষচন্দ্র। প্রত্যেক ভারতবাসী এই কথাই জেনে গর্ব অনুভব করবে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ—ভারতীয় নেতৃত্বে গঠিত তাঁদের নিজেদের সৈন্য বাহিনী, ইতিহাসের পরম শুভলগ্নে ভারতীয় নেতৃত্বাধীনে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-সূর্য অস্ত যায় না,—এই বিশাল সাম্রাজ্যের পতন অসম্ভব—হয়তো অনেকে ভেবেছেন, অবশ্য একথা আমি কোন দিনই ভাবিনি—। ইতিহাস বলে—কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হ'তে পারে না—পারে নি। আমিত দেখেছি নিজের চোখে—কত নগর, কত দুর্গ, কত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে এসেছে—সেই গুলিই আবার সাম্রাজ্যের শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে—যে কোন শিশু একথা আজ বলতে পারে—সর্বশক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ অতীতের গল্প মাত্র।

সকলে। করতালি—

সুভাষচন্দ্র। ১৯৩৯ সালে ফ্রান্স যখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোষণা করে—জার্মাণ বাহিনীর মুখে ছিল একই কথা— প্যারিস্ চলো, প্যারিস্ চলো—

১৯৪১ সালে নিপ্পানের বীর বাহিনীর রণ অভিযানে শুনতে পাই—সিঙ্গাপুর চলো—চলো—সিঙ্গাপুর। সহকর্মিগণ, বীরসৈনিকগণ,—তদ্রূপ আমাদের ও রণধ্বনি হোক—দিল্লী চলো—চলো দিল্লী।

সকলে। দিল্লী চলো, চলো দিল্লী।

সুভাষচন্দ্র। এই স্বাধনীতা সমর শেষে জানি না আমরা কতজন বেঁচে রইব। তবে একথা আমি জানি, যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ অনিবার্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সমাধি ক্ষেত্রে দিল্লীর লাল কেল্লায় বিজয় গর্বে যতদিন আমরা প্রবেশ করতে না পারব, ততদিন এ অভিযানের আমাদের ক্ষান্তি নেই, ততদিন মুখে থাকবে একই কথা—দিল্লী চলো, চলো দিল্লী—

সকলে। দিল্লী চলো—চলো দিল্লী।

সুভাষচন্দ্র। আমি ভেবেছি—কত ভেবেছি—ভারত

বর্ষের যদি একটি জাতীয় বাহিনী থাকতো। জর্জ ওয়াসিংটনের সৈন্য ছিল, ইটালীর গারিবলডির ছিল সৈন্যবাহিনী, তাই তারা পেরেছিলেন—নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করতে। আজ ভারতীয় সেনা বাহিনী গঠিত হ'য়েছে, স্বাধীনতা লাভের আর ত কোন বাধা নেই—। এই মহৎ কার্যের অগ্রদূত তোমরা, এ তোমাদের গর্ব—পরম তৃপ্তি।

সকলে। [করতালি।

সুভাষচন্দ্র। কর্তব্য তোমাদের দুইটি। রক্তের বিনিময়ে অস্ত্রবলে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাধীন ভারতে— স্থায়ী সৈন্য বাহিনী গঠন করা। সেই স্থায়ী সৈন্য বাহিনী ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করবে। তারপর করতে হবে এমন ব্যবস্থা যাতে ভবিষ্যতে আর, কোনদিন পরাধীনতার গ্লানি আমাদের ভোগ না করতে হয়। সৈনিক জীবনে তোমাদের আদর্শ হবে—বিশ্বাস, কর্তব্য পালন—ও ত্যাগ। এই আদর্শ এই বাহিনীকে অপরাজেয়—দুর্নিবার ও দুর্ভেদ্য বাহিনীতে পরিণত করবে।

সকলে। [করতালি]

সুভাষচন্দ্র। ব্রিটিশ আমাদের যে সব শিক্ষা দিয়েছে তার অনেকেই আমাদের ভুলে যেতে হবে, আর যা তারা আমাদের শিক্ষা দেয়নি,—সেগুলি আমাদের শিক্ষা করতে হবে।

বন্ধুগণ, তোমরা স্বেচ্ছায় এই ব্রত গ্রহণ করেছো, মানব জীবনের এ মহত্তম ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনে কোন ত্যাগই যথেষ্ট নয়। না, জীবনও নয়। ভারতের মর্যাদা আজ তোমাদের হাতে, তোমরাইত ভারত মাতার একমাত্র ভরসা। এমনি ক'রে তাই তোমরা এগিয়ে যাবে—ভারতবাসীর আশীর্বাদ যাতে তোমরা পাও--জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তোমাদের স্মরণ ক'রে গর্ব অনুভব করে।

সকলে। [করতালি]

সুভাষচন্দ্র। পূর্বেই বলেছি, আজ আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবের দিন। পরাধীন জাতির পক্ষে—স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সৈনিক হওয়ার চেয়ে বড় গৌরব আর কি হ'তে পারে। আমি জানি, আমার

এই সম্মান কত দায়িত্বপূর্ণ। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক্‌বে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে—আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, আলোকে, অন্ধকারে, সুখে দুঃখে, জয়ে, পরাজয়ে আমি তোমাদের সংগেই—থাকব ভাই। বর্তমানে তোমাদের দেবার—দেবার মত আমার কিছুই নাই—আছে শুধু ক্ষুধা, তৃষ্ণা। স্বাধীন ভারত আমরা প্রত্যেকে দেখতে পারব কিনা জানি না—কিন্তু একথা ত জেনে যাব, ভারত স্বাধীন হবে—ভারতের স্বাধীনতায় আমাদের সর্বস্ব সমর্পণ সার্থক হবে। ভগবান তুমি প্রসন্ন হও—আমাদের সেনাদল লাভ করুক তোমার আশীর্বাদ—আসন্ন সংগ্রাম আমাদের জয়যুক্ত হোক—

(সকলে বলিবে)। ইনক্লাব—জিন্দবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দবাদ—

সুভাষচন্দ্র। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

ভারতে থেকে বহুদিন আমি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম। আমার বিশ্বাস হয়েছিল, ভারতের বাইরের কোন সাহায্য-শক্তি—ভারতের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী না করলে—ইংরাজকে ভারত ত্যাগ করান সোজা হবেনা। তাই আমার স্বদেশ ত্যাগ। আজ সময় আসন্ন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়েছে,—অর্থ দিয়ে, সামর্থ দিয়ে একে আরও শক্তিশালী করতে হবে। প্রয়োজন হলে—বৈদেশিক শক্তির সাহায্যও আমরা নেব। প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সরকারের স্কন্ধে কেন আজ ভিক্ষার ঝুলি—কেন দেখি তাকে আমেরি—কার এমনকি ভারতের দ্বারস্থ হ'তে। নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস রেখে—মিত্রশক্তির সাহায্য তাই আমরাও গ্রহণ করতে পারি। ভারতের বীর বাহিনী যেদিন ভারতে প্রবেশ করবে—ভারতের জনসাধারণ, ইংরাজের ভারতীয় সৈন্য সব এক সংগে মিলিত হবে—এবং সেই দিনই ৪০ কোটী ভারতবাসীর দেশমাতৃকা পুণ্য ভারত ভূমি থেকে ইংরাজকে—চলে যেতে হবে বাধ্য হয়ে। স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ—জয় হিন্দ।

সকলে। স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ—জয় হিন্দ।

সুভাষ। জাপানের প্রধান মন্ত্রী আসবেন আমাদের সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করতে—হয়তো আগামী কালই তিনি আসবেন।

সকলে। [করতালি]

সুভাষচন্দ্র। আজাদ হিন্দ ফৌজের সামনে আজ বিরাট কর্তব্য—আমি জানি আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা সে কর্তব্য পালনে পরাম্মুখ হবে না। স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। সে অধিকার থেকে কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারবেনা। বন্ধুগণ আমাদের কার্য আরম্ভ হয়েছে। "দিল্লী চলো" ধ্বনি নিয়ে আমরা আমাদের অভিযান শুরু করবো। দুর্বার গতিতে আমরা এগিয়ে যাব, অভিযান আমাদের সহজে শেষ হবে না—শেষ হবে সেইদিন, যেদিন এই আমাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা দিল্লীর লাল কেল্লায় গর্ব ভরে উড়তে থাক্‌বে—আর আজাদ হিন্দ ফৌজ—বিজয় পদভরে—তার মধ্যে কুচকাওয়াজ করবে। দিল্লী চলো—চলো দিল্লী—

সকলে। দিল্লী চলো—চলো দিল্লী—

সুভাষচন্দ্র। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, আজাদ হিন্দ ফৌজের সংকল্প রক্ষায় এই বাহিনীর গুরুভার আমি গ্রহণ করছি, গ্রহণ করছি পরম গর্বে ও আনন্দে। কারণ ভারতের মুক্তি বাহিনীর পরিচালকের সম্মান অতুলনীয়। ভারতের ৪০ কোটী সন্তানের সেবক আমি—আমার দায়িত্ব পালনে প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশ্বাস আমি অর্জন করবো। তোমরা আমাকে তোমাদের রক্ত দাও, তোমাদের স্বাধীনতা আমি দেব—প্রতিজ্ঞা করছি। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের দুর্নিবার শক্তি—ভারতের স্বাধীনতাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য—তাঁদের একমাত্র প্রতিজ্ঞা—করিব অথবা মরিব। করেংগে ইয়া মরেংগে—

সকলে। করেংগে ইয়া মরেংগে

সুভাষ। দিল্লী চলো

সকলে। দিল্লী চলো

সুভাষ। ইনক্লাব জিন্দাবাদ

সকলে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ

সুভাষ। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ

সকলে। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ

সুভাষ। জয় হিন্দ

সকলে। জয় হিন্দ

সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার শিল্পে
হরিচরণ দত্ত
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস্
১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

৫ম দৃশ্য

[জেনারেল তোজো আজাদ হিন্দ বাহিনী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। অদূরে তাহার অবস্থান মঞ্চ। সমর বাদ্য, ও সমর সঙ্গীত শুরু হইল। দুই দিক হইতে দুইটি ছোট দল মঞ্চের অদূরে স্থির হইয়া দাঁড়াইল একদল সমর বাদ্য বাজাইতেছে অন্যদল গাইতেছে সমর সংগীত। সকলে নীরব হইল। জেনারেল তোজো ও নেতাজী সুভাষ মঞ্চোপরি আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"জেনারেল তোজো—জিন্দাবাদ" "নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ" জেনারেল তোজো অভিবাদনের ভংগীতে দাঁড়াইলেন—দাঁড়াইলেন নেতাজী সুভাষ। আবার বাদ্য ও সংগীত আরম্ভ হইল। আরম্ভ হইল আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ। এক এক জন সেনা নায়ক তাহার নিজ নিজ সৈন্য শ্রেণী লইয়া জেনারেল তোজো ও নেতাজীকে অভিবাদন জানাইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। নেতাজী ও তোজো তাহাদের প্রতি অভিবাদন জানাইলেন। উপরের আকাশে উড্ডীয়মান চরকা শোভিত ভারতের জাতীয় পতাকা। বাদ্যের তালে তালে সংগীত—সংগীতের তালে তালে—সৈন্য শ্রেণীর কুচকাওয়াজ সে যেন এক অবিস্মরণীয় উদ্দীপনা, অভাবনীয় কীর্তি।]

সমর সংগীত

(১)

কদম কদম বাঢ়ায়ে যা,
খুশী কে গীত গায়ে যা।
ইয়ে জিন্দিগী হ্যায় কৌম কি,
(তু) কৌম পে লুটায়ে যা।

জয় হিন্দ।

(২)

তু শেরে হিন্দ আগে বঢ়,
মরণসে ফিরভি তুন' ডর।
আস্‌মান তঁক উঠাকে শির,
যোসে বতন্ বাঢ়ায়ে যা।

জয় হিন্দ।

(৩)

তেরি হিম্মৎ বাঢ়তি রহে,
খোদা তেরি শুনতা রহে।
যো সামনে তেরি চড়ে,
তো খাক্‌সে মিলায়ে যা।

জয় হিন্দ।

(৪)

'চল্লো দিল্লী' পুকার কে
কৌমি নিশান সামাল কে,
লাল কিল্লে গাড় কে
লহরায়ে যা, লহরায়ে যা

জয় হিন্দ।

সকলে — জয় হিন্দ
জয় হিন্দ
জয় হিন্দ

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[ঝান্সী রাণী বাহিনী শিক্ষা কেন্দ্র। নারীগণ সামরিক পোষাকে সামরিক কায়দায় দণ্ডায়মানা। সমর বাদ্য বাজিল। নেতাজী প্রবেশ করিলেন, লক্ষ্মী স্বামীনাথন তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন এবং নেতাজী অতঃপর নারী বাহিনী পর্যবেক্ষণ করিলেন। এবং তৎপরে বলিলেন।

সুভাষচন্দ্র। ভগ্নিগণ,—

"ঝান্সীর রাণী বাহিনী"র শিক্ষাকেন্দ্র উদ্বোধনের দিন আজ। এই শিক্ষা কেন্দ্র উদ্বোধন একটা স্মরণীয় ঘটনা। পূর্ব এসিয়ায় আমাদের সংগ্রামের অগ্রগতির পথে ইহা অবিস্মরণীয় কাহিনী। নারীদের পক্ষে সমর-শিক্ষার যে সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা আছে অন্তর দিয়ে তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, মনে রাখতে হবে—আমাদের এ আন্দোলন, এ সংগ্রাম, শুধু রাজনৈতিক নয়, মাতৃভূমিকে আমরা নতুন করে, নব আদর্শে গ'ড়ে তোলবার মহান কার্য গ্রহণ করেছি। ভারতের জন্যে নিয়ে এসেছি আমরা নবযুগ, সুতরাং আমাদের নব জীবনের বনিয়াদ হবে অতীব সুদৃঢ়। এ শুধু বক্তৃতা নয়, এ পরম সত্য।

আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভারতের পুনর্জীবন আগত প্রায়। ভারতের নারীদের মধ্যেও এই নব জাগরণ তাই আমি দেখতে পাই। যে শিক্ষাশিবিরের আজ উদ্বোধন দিবস তাতে ১৫৬ জন ভগিনী শিক্ষা লাভ করতে পারবে। আমি আশা করি, সোনানে শীঘ্রই এদের সংখ্যা হবে এক হাজার। থাইল্যাণ্ডে ও ব্রহ্মদেশে নারী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সোনান হবে তাদের হেড কোয়াটারস্। ক্যাপটেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনকে আমি ধন্যবাদ দেই,—ধন্যবাদ দেই, রেবা সেন, সিপ্রা সেন, মায়া গাঙ্গুলী, রাণু ভট্টাচার্য প্রভৃতি তাঁর সহকর্মিণীদের। আমার একান্ত বিশ্বাস, তাদের ঐকান্তিকতায় এই শিবিরে হাজার ঝান্সীর রাণী তৈরী হবে। জয় হিন্দ,—

আবার সমর বাদ্য, বাজিল সকলে বলিল 'জয় হিন্দ'। নারী বাহিনীর গায়িকা, সৈন্যগণ, জাতীয় সংগীত গাহিল :—

জাতীয় সংগীত

সব সুখ চৈঁ কি বরসে ভারত ভগ হৈ জাগ।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ।
চঞ্চল সাগর বিন্ধ হিমলা নীলা যমুনা গঙ্গা ;
তেরে নিত গুণ গাওয়ে,
তুঝনা জীবন পায়ে,
সব তালে পায়ে আশা ;
সূরজ বন কর জগপর চমকে ভারত নম সুভগা।
জয় হো, জয় হো, জয় হো
জয় জয় জয় জয় হো
সব কো দিল মে প্রীত বসায়ে তেরি মিঠি বাণী
হর সুবে কে বহনে ওয়ালা হর মাঝারকে প্রাণী,
সব ভেদ ও ফারাক মিটাকে
সব ঘরমে তেরি এক
গুন্ধেন প্রেমকি মালা
সূরজ বন কর জগ পর চমকে ভারত নম সুভগা
জয় হো, জয় হো, জয় হো,
জয় জয় জয় জয় হো।
সুবা সবেরে, পাঁথ পাখেরু ডেরেহি গুণ গাঁয়ে
সব ভার ভরপুত হয়ারেঁ জীবন মেঁ বত লেয়েঁ।
সব মিলকর হিন্দ পুকারে
জয় আজাদ হিন্দ কে নারে
প্রিয়ারা দেশ হামারা
সূরজ বনকর জগ পর চমকে ভারত নব সুভগা
জয় হো, জয় হো, জয় হো
জয় জয় জয় জয় হো
ভারত নম সুভগা

২য় দৃশ্যঃ

টোকিও, জনৈক ভারতীয়ের ঘরের কোন বিশিষ্ট স্থানে একটি রেডিও। গৃহস্বামী ও তাহার দু'তিন জন বন্ধু প্রবেশ করিলেন। উহারা বসিলেন জনৈক ভারতীয় ঘড়ি দেখিলেন এবং বলিলেন।

জনৈক ভারতীয়। Yes It is just the time Set on the Radio let us hear Mr. Bose's proclamation on his newly formed Azad Hind Government at Synan.

[রেডিও সেট খোলা হইল এবং কথা ভাসিয়া আসিল]

Synan speaking. Synan speaking Proclama tion of Azad Hind govt by Netaji Subhas Chandra Bose -Proclamation of Azad Hind Govt. —আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ জয়হিন্দ।

ঘোষণা

সুভাষচন্দ্র। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর আজ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই ২১শে অক্টোবর চিরস্মরনীয় হয়ে রইল—কারণ, আমি ঘোষণা কচ্ছি—পূর্ব এসিয়ার—মুক্তি কামী ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় অস্থায়ী আজাদ হিন্দ, গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হ'য়েছে—আজ তার প্রতিষ্ঠা দিবস। (হর্ষধ্বনি ও করতালি)

ঘোষক। আজাদহিন্দ গভর্ণমেণ্ট যাদের অধিনায়কত্বে গঠিত হয়েছে—তাদের নাম আপনাদের কাছে প্রকাশ করি। সুভাষচন্দ্র বসু রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পর-

রাষ্ট্র সচিব। রাসবিহারী বসু, প্রধান পরামর্শদাতা। ক্যাপ্টেন মিসলক্ষী স্বামীনাথন—নারী সংগঠন-সচিব

এস, এ আয়ার—প্রচার সচিব'

লেঃ কঃ এ, সি, চ্যাটার্জি—অর্থ সচিব

লেঃ কঃ আজিজ আহম্মদ

লেঃ কঃ এন ভগৎ

লেঃ কঃ জে, কে, ভোঁসলে।

লেঃ কঃ এম, জেড, কিয়ানি,

লেঃ কঃ এ, ডি, নগানাদান,

লেঃ কঃ এহসান কাদির

লেঃ কঃ শাহনওয়াজ—সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধি।

এ, এম সহায় (মন্ত্রীর পদ মর্যাদা সম্পন্ন সেক্রেটারী)।

করিম গনি,

দেবনাথ দাস,

ডি, এমশা।

এইয়েল্লাপ্পা,

জে, থিবি,—

সর্দার ঈশ্বর সিং (পরামর্শ দাতাগণ—।

এ, এন সরকার—(আইন বিষয়ক পরামর্শ দাতা)

সকলে। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট জিন্দাবাদ—(হর্ষধ্বনি)

সুভাষচন্দ্র। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সংগঠন কথা, ঘোষক এই মাত্র—ঘোষণা করেছে। আমার মন্ত্রী ও পরামর্শ দাতাগণ এই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। আমাকে এই রাষ্ট্র যে সম্মান দান করেছেন—তা স্মরণ করে—ঈশ্বরের পবিত্র নামে আমি সকলের সামনে শপথ কচ্ছি—আমি সুভাষচন্দ্র বসু—এই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে, প্রকাশ কচ্ছি এই রাষ্ট্রের যে উদ্দেশ্য—ভারতের স্বাধীনতা, ৪০ কোটী ভারত বাসীর স্বাধীনতা,—সেই স্বাধীনতা অর্জন করতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম আমার নিরুদ্ধ হবে না।

আমি এই রাষ্ট্রের তথা ভারতের সেবক, ৪০ কোটী ভারতবাসীর সেবক— ভারতের কল্যাণ—৪০ কোটি ভাই বোনের কল্যাণ—আমার জীবনের-শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য।

(করতালি)—

সুভাষচন্দ্র। ১৭৫৭ সালে, বাংলা দেশে ব্রিটিশের হাতে প্রথম পরাজয়—তার পর ভারতের বীরগণ দীর্ঘ একশত বৎসর ধ'রে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছে—এই সময়কার ইতিহাস উজ্জল হ'য়ে আছে তাদের বীরত্বে, তাদের আত্মত্যাগে। সিরাজদ্দৌলা, মোহনলাল, হায়দার আলি, টিপু সুলতান, দক্ষিণ ভারতের ভেলু তাম্বি, আপ্পা-সাহেব ভোঁস্‌লে, পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দারসিং আত্রিওয়ণ। ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাই, তাঁতিয়াটোপী, মহারাজ কুনোয়ারসিং, নানাসাহেব—প্রভৃতি বীরগণের গৌরব পূর্ণ নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। (মঞ্চ ঘুরিয়া গেল)

দৃশ্যান্তর

[কলিকাতা একটী বাঙ্গালী পরিবার ঘরের অর্গল বন্ধ করিয়া রেডিও শুনিতেছেন।

সুভাষচন্দ্র। তারপর এক ১৮৫৭ সাল—বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে—পরাধীন ভারত সম্মিলিত ভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীন জাতি হিসাবে শেষ যুদ্ধ করে—। সেবারও হলো পরাজয়—পরাধীনতার নাগপাশে—তারা আরও পড়ে-লেন জড়িয়ে। ভীতি ও পাশবিকতার দ্বারা নিরস্ত্র ভারত হতবাক্ হয়ে রইল—। ১৮৮৫ সর্ব প্রথম হলো—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। ১৮৮৫ সাল থেকে গত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বহুভাবে কংগ্রেস স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়েছে—কিন্তু সব চেষ্টাই তাদের ব্যর্থ হয়ে গেছে। ১৯২০ সালে—এলেন এক মহাপুরুষ—ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে তিনি আনলেন—নতুন পথ—নতুন অস্ত্র—অসহ-যোগ ও আইন আমান্য—। তার পর এই ২০ বৎসর ধরে—বহুত্যাগ, বহুকারাবাস, নির্যাতনের মধ্য দিয়ে—ভারতের জনগণ কংগ্রেসের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এমন কি ১৯৩৭ হতে ১৯৩৯ পর্যন্ত আটটি প্রদেশে দক্ষতার সংগে—তারা শাসন ব্যবস্থা চালিয়েছে। এমনি করে—বর্তমান সামগ্রিক যুদ্ধের সময়ে—ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। সময়—আগত—কেবলমাত্র একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন—আজাদ হিন্দ ফৌজ সেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করবে।

[করতালি] (মঞ্চ ঘুরিয়া গেল)

দৃশ্যান্তর

[দিল্লীতে একটী পাঞ্জাবী পরিবার ঘরের অর্গল বন্ধ অবস্থায় রেডিও শুনিতেছেন]

সুভাষচন্দ্র। স্বাধীনতা আজ আসন্ন। প্রত্যেক ভারতবাসীর আজ কর্তব্য একটি অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করে তার নির্দেশ মত স্বাধীনতা সংগ্রাম করা। কিন্তু ভারতের নেতারা—আজ কারারুদ্ধ—জনসাধারণও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। ভারতে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপন এখন সম্ভব হবে না—তাই আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের-ই হবে কর্তব্য—অস্থায়ী স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করা। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ সেই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট আজ গঠন করেছেন। এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রধান এবং প্রথম কর্তব্য—ভারত হ'তে ব্রিটিশ ও তার মিত্রদের বিতাড়িত করবার সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং ভারত যখন ব্রিটিশ মুক্ত হবে—তখন—জনগণের ইচ্ছা অনুসারে স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করা। এই গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভারতবাসীর আনুগত্য দাবী করছে—এবং সংগে সংগে ঘোষণা করছে—বিদেশী সরকার সৃষ্ট সর্বপ্রকার—বাধা বিপদ অতিক্রম ক'রে—ইহা ভারতের সকলকে সমান ভাবে পোষণ করবে, বিধান করবে দেশের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি। (করতালি)

দৃশ্যান্তর

[বোম্বাই অর্গল বন্ধ ঘরে একটী উচ্চশিক্ষিত যুবক রেডিও শুনছে পায়চারী করছে—আর উত্তেজিত হ'য়ে উঠছে।]

সুভাষচন্দ্র। ভগবানের নামে, অতীতে যাঁরা ভারতবাসীকে সংঘ বদ্ধ করেছিলেন,—তাঁদের নামে,—ভারতের শহীদ বীর আত্মত্যাগের মহান আদর্শ আমাদের সামনে স্থাপন করেছেন—তাঁদের নামে, আমরা ভারতীয় জনগণকে আমাদের গর্বোন্নত পতাকা তলে সমবেত হ'তে বলছি এবং আহ্বান কচ্ছি স্বাধীনতা সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করতে। যতদিন না শত্রু ভারত থেকে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কৃত হয়, এবং যতদিন না ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ততদিন অদমনীয় সাহস, অধ্যবসায় ও পূর্ণ জয়ের বিশ্বাস নিয়ে এই সংগ্রাম চালাতে হবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,—প্রার্থনা করি, তাঁর আশীর্বাদ আমাদের কার্যে—মাতৃভূমির এই মুক্তি সংগ্রামে। দেশ মাতৃকার মুক্তি আমরা চাই-চাই তাঁর কল্যাণ—বিশ্বের দরবারে চাই তাঁর গৌরবমণ্ডিত সুউচ্চ আসন এবং তাঁর জন্তে আমি এবং আমার সহকর্মীরা জীবনপণ কচ্ছি—এই ঘোষণা করি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ,
আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ
জয় হিন্দ

৩য় দৃশ্য

সোনান—বিস্তৃত সামরিক শিক্ষাপ্রাঙ্গন। জাতীয় পতাকা উড়িতেছে তার মধ্যখানে—সমরবাদ্য বাজিল—একদল সৈন্ত জাতীয় সঙ্গীত গাহিল—

"সব সুখ চৈঁ, কি বরসে—ভারত ভগ হৈ জাগ"—ইত্যাদি তাহারা চলিয়া গেল—প্রবেশ করিল সৈন্তশ্রেণী—এক এক সেনানায়কগণের অধীনে—এক একদল। তাহারা কুজকাওয়াজ করিল—এবং শান্ত হইয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল—নেতাজী সুভাষ তাঁর পার্শ্বচরদের লইয়া প্রবেশ করিলেন বিউগিল বাজিল।

সুভাষচন্দ্র। আজ ২৮শে অক্টোবর—আমার প্রিয় সেনানায়ক ও সৈন্যগণ তোমাদের কর্মে ও কর্তব্যে অটুট বিশ্বাস রেখে—পরস্বোপহারী ইংরাজ ও তার মিত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমরা আজ যুদ্ধ ঘোষণা করেছি।

সকলে। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।

সুভাষচন্দ্র। জাপানগভর্ণমেণ্ট আমাদের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করেছেন। জার্মান, ইটালী আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি আরও আটটি স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট আমাদের আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট—স্বীকার করেছেন—এসংবাদও আমি পেয়েছি—আয়ারল্যাণ্ডের বীরপুত্র, ডি, ভ্যালেরা—আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রকে অর্থ সাহায্য করতে ও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

সকলে। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট জিন্দাবাদ—

সুভাষচন্দ্র। আজাদী ফৌজের একমাত্র আদর্শ দেশের স্বাধীনতা অর্জন। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রথম উচ্ছ্বাসের বলে এই ফৌজে যোগদান ক'রে থাক এবং এখন ছেড়ে দিতে চাও—তাহ'লে এখনই তা কর—কোন বাধা আমি দেব না—কোন শাস্তি আমি দেব না—কোন বাধ্যবাধকতা এখানে থাকবে না। নিজের ইচ্ছায় যে প্রাণ বলি দেবে—শুধু তারাই থাকবে এই বাহিনীতে

[একটি সৈন্যও সৈন্যবাহিনী ছাড়িয়া নড়িল না।]

সুভাষচন্দ্র। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেকে আমার গর্ব। শীঘ্রই আমাদের সোনান থেকে বর্মায় হেড কোয়াটারস্ স্থানান্তরিত করতে হবে। কারণ শীঘ্রই আমাদের ভারত অভিযান সুরু হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন যুদ্ধে অগ্রসর হবে তখন আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের নির্দেশেই হবে। ভারতের অভ্যন্তরে যখন এরা প্রবেশ করবে, মুক্ত অঞ্চল সমূহের শাসন কার্য এই গভর্ণমেণ্টই করবে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হবে শুধু ভারতীয়দের সংগ্রামে, তাদেরই একান্ত আত্মত্যাগে।

সকলে। "আজাদ হিন্দ ফৌজ জিন্দাবাদ", "আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট জিন্দাবাদ"—

সুভাষচন্দ্র। যুদ্ধ ঘোষণার এই প্রথম দিনে, স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের কল্যাণ আমরা কামনা করি, কামনা করি তার সৈন্য বাহিনীর বীরত্ব আর আত্মত্যাগ। শ্রদ্ধায় স্মরণ করি তার নির্দেশ—"আরজি হুকমৎ ই আজাদ হিন্দ—"

আমাদের মূলমন্ত্র—

সকলে। বিশ্বাস—একতা—বলিদান।

সুভাষচন্দ্র। চরকা সম্বলিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা—

সকলে। আমাদের জাতীয় পতাকা।

সুভাষচন্দ্র। বাঘের সংগে টিপু সুলতানের প্রতিকৃতি—

সকলে। আমাদের জাতীয় প্রতীক।

সুভাষচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের "জয় হে"—

সকলে। আমাদের জাতীয় সংগীত।

সুভাষচন্দ্র। আমাদের রণ হুঙ্কার

সকলে। দিল্লী চলো।

সুভাষচন্দ্র। আমাদের শ্লোগান—

সকলে। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'—'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ—'

সুভাষচন্দ্র। আমাদের জাতীয় অভিবাদন—

সকলে। জয় হিন্দ।

[দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটিল। দেখা গেল উত্তাল তরঙ্গময় সাগর—ক্রমে সাগর অস্পষ্ট হইয়া আসিল। দেখা গেল আন্দামান দ্বীপের পোর্টব্লেয়ার শহরের একটি সভাস্থলে মঞ্চোপরি দাঁড়াইয়াছেন সুভাষচন্দ্র। নিম্নে বহুলোক সমাগত। সম্মুখে জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। জেনারেল লগানাদান একটা মাল্য হস্তে মঞ্চোপরি আসিলেন এবং জয়হিন্দ বলিয়া নেতাজীকে সম্বর্ধনা করিলেন। নেতাজীও জয়হিন্দ বলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন। জেঃ লাগানাদান মালাটি নেতাজীর গলায় পরাইয়া দিলেন। সকলে করতালি দিল এবং 'নেতাজী কি জয়' ধ্বনি করিল।]

সুভাষচন্দ্র। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,—

ভারতের জাতীয় পতাকা ভারতের প্রথম স্বাধীন অঞ্চল এই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আজ গর্ব ভরে উড়ছে। এ গর্ব আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর। জাপান সরকারি ভাবে এই দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রকে ছেড়ে দিয়েছে। বিশ্বের দরবারে সগর্বে মাথা উচু করে দাঁড়াবার শক্তি আমরা অর্জন করেছি—স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র আমরা গড়ে তুলেছি। নয়টি স্বাধীন রাষ্ট্র আমাদের এই জাতীয় রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিয়েছে। নিয়েছে শুধু এই জন্যে যে, এসিয়া বা ইউরোপের কোন রাষ্ট্রের অপেক্ষাই আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা কম নয়।

সকলে। [করতালি] আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।

সুভাষচন্দ্র। বৃটিশ রাজত্বে এই আন্দামান ছিল মুক্তিকামী ভারতবাসীর দ্বীপান্তরের স্থান। সহস্র শহীদের স্মৃতিতে এই আন্দামান পবিত্র। তাই আপনাদের কাছে ঘোষণা করি এই আন্দামানের নতুন নামকরণ হবে শহীদ দ্বীপ।

সকলে। করতালি।

সুভাষচন্দ্র। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করা

হয়েছে স্বরাজ দ্বীপ এবং শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপের নব নিযুক্ত চীফ্ কমিশনার জেঃ লগানাদান।

সকলে। [করতালি]

লগানাদান। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই গুরু দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, জীবন দিয়েও আমি আমার স্বাধীন রাষ্ট্রের নির্দেশ রক্ষা করব।

সুভাষচন্দ্র। আপনারা জানেন, শীঘ্রই আমাদের ভারত অভিযান সুরু হবে। রেঙ্গুনকে কেন্দ্র করে আমাদের আক্রমণ পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেছে। শীঘ্রই আমরা রেঙ্গুণে অবতরণ করব। কিন্তু এই সামগ্রিক যুদ্ধে চাই সামগ্রিক আয়োজন, চাই মরণকে তুচ্ছ করে—এমন ভারতের বীর সন্তানের দল, চাই অস্ত্র, চাই বস্ত্র, চাই রসদ—সর্বোপরি প্রভূত অর্থ।

[বহুলোক বহু টাকার তোড়া নেতাজীকে উপহার দিতে লাগিল। সে কি উন্মাদনা। যখন সকলে স্থির হইলেন তখন নেতাজী বলিলেন।]

সুভাষচন্দ্র। আমি আমার গলার এই মালাটি বিক্রয় করতে চাই, যদি কেউ এই মালাটি কিনতে চান, তবে সেই বিক্রয় লব্ধ টাকা আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যে ব্যয় করব।

১ম জন। ও মালা আমি কিনব। এক লক্ষ টাকা দেব আমি ওর দাম।

২য় জন। দেড় লাখ—

৩য় জন। দুই লাখ—

৪র্থ জন। তিন লাখ –

৫ম জন। চার লাখ—আমি দেব চারলাখ।

৬ষ্ঠ জন। সোয়া চার লাখ—

৭ম জন। পাঁচ লাখ।

৮ম জন। ছ' লাখ—

৯ম জন। আমি দেব সাত লাখ।

সুভাষচন্দ্র। আর যখন কেউ ডাকছেন না তখন বুঝবো ৭ লাখই এই মালার সর্বশেষ দাম। সাতলাখ যিনি দিতে চেয়েছেন তিনি ধন্য, ভারতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসারই অভিব্যক্তি। আসুন মালা গ্রহণ করুন।

১ম যুবক। (মঞ্চের উপরে লাফাইয়া উঠিল) না, না,—আমি যে আমার সর্বস্ব, আমার সমস্ত কপর্দক, ঐ মালার জন্যে উৎসর্গ করেছি।

(যুবক হতাশায় কাঁপিতেছিল, চোখে ছিল তার জল।

সুভাষচন্দ্র। শান্ত হও তুমি (তাহাকে ধরিয়া) নাও এ মালা তোমারই। তোমার মত স্বদেশ প্রেমিকই আজাদ হিন্দ ফৌজের বিজয় মুকুট পাবার যোগ্য।

যুবক। (মালা লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল এবং অশ্রু সজল চোখে বলিল) নেতাজী, আমার অর্থ সম্পদ কিছুই নেই, আছে আমার জীবন। সাত লাখ টাকা কি আমার জীবনের মূল্য হবে না? আমি শুধু ফৌজে যোগ দিতে চাই—স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে আমার জীবন আমি উৎসর্গ করলাম।

[নেতাজীর পায়ের কাছে বসিল। নেতাজী তাহাকে ধরিয়া উঠাইলেন এবং আলিঙ্গন করিলেন—বলিলেন—'জয়হিন্দ'—জয়হিন্দ শব্দে চারিদিক মুখরিত হইল।]

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(রেঙ্গুনের রাস্তা। কত লোকজন যাতায়াত করিতেছে কাগজের হকার চীৎকার করিয়া প্রবেশ)।

হ'কার। আজাদ হিন্দ কাগজ—আজাদ হিন্দ কাগজ।

জনতা। দেখি হে, আমাকে একখানা দাওত'—

(অনেকে কাগজ লইয়া পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল)

২য় জন। রেঙ্গুন এসে আজাদ হিন্দ কাগজ পর্যন্ত বের করে ফেল্লে? এইত ৮ই জানুয়ারী সুভাষ বাবু সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে এলেন।

২য় জন। শুধু কি কাগজ—আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কও হয়েছে, জানেন না বুঝি!

১ম জন। কাগজে কি লিখেছে?

২য় জন। লিখেছে আগামী কাল আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত অভিযান আরম্ভ করবে।

১ম জন। তা যাই বলুন, বর্মায় আমরাত' ধনে প্রাণে মরেছিলাম আরকি। দুর্দান্ত বর্মীদের অত্যাচার আমাদের কি কম সহ্য কর্তে হয়েছে মশাই। মহাপ্রভুরা ত আমাদের ফেলে বেশ চলে গেলেন। আমাদের খোঁজ কি আর নিলেন তারা। বীর ধর্ম রক্ষা করে ত' পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন। যারা যারা যেতে পারল গেল,—বর্মা থেকে হেটে গেল ভারতে। কেউ রাস্তায় মরে গেল। তাও আবার ভারতীয়দের এক পথ, শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের অন্য পথ। আর আমরা? বেশ আছি মশাই, আজাদ হিন্দ সংঘ আমাদের বাঁচিয়েছে, নইলে এই বর্মাদেশে ভারতীয়দের বাঁচাত কে?

২য় জন। সুভাষ বাবু এসে, কলের পুতুলের মত যেন কাজ করাচ্ছেন—পরাধীন ভারতবাসী এতবড় কাজ করতে পারবে, স্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে পারবে—তা কি আমরা ভাবতে পেরেছি।

১ম জন। ভগবান করেন ভারত অভিযান ওদের সফল হয়।

২য় জন। সফল হবে বৈকি? স্বাধীন রাষ্ট্রের যা কিছু থাকা দরকার সব এদের—এদের কেন,—আমাদের আছে।

২য় জন। এই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট কত কাজ করছে বলুন তো। সেবা কেন্দ্র, শিক্ষা কেন্দ্র, স্কুল, কলেজ আমরা যেন রাম রাজত্বে বাস কচ্ছি।

১ম জন। শুনেছি বাংলা দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট নাকি বাংলা দেশে চাউল পাঠাতে চেয়েছিলেন?

২য় জন। হ্যাঁ,—চেয়েছিলেন, এক লক্ষ মণ চাউল পাঠাতে কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তা নিলেন না।

১ম জন। তা নেবেন কেন? তা যাক, যাই বলেন সুভাষ বাবুকে নমস্কার। তিনি আমাদের ভারতের গৌরব। আগামী কাল ১৮ই মার্চ ওরা ভারত অভিযান করবে—না?

২য় জন। হ্যাঁ—আগামী কাল ১৮ই মার্চ।

১ম জন। আচ্ছা জয় হিন্দ।

২য় জন। জয় হিন্দ।

২য় দৃশ্য

[রেঙ্গুন হেড কোয়াটার্স,—নেতাজী, শানাওয়াজ, ধীলন, সায়গল, মোহন সিং, ইয়ানং, সমাসীন। অদূরে পাহাড় শ্রেণী। তখনও ভোর হয় নাই। লক্ষ্মী স্বামীনাথন প্রবেশ করিলেন। এবং একখানা রক্তে লেখা কাগজ সুভাষ বাবুর সম্মুখে দিলেন]

লক্ষ্মী। নেতাজী, নারী বাহিনীর সৈন্যগণ,—সম্মুখ যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে চায়? তাদের রক্ত দিয়ে লিখে চেয়েছে আপনার অনুমতি।

নেতাজী। সেবা কার্যেরও ত প্রয়োজন আছে ভগ্নী। বেশ, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তারা যদি যেতে চায়, নিশ্চয়ই যাবে। ভারতের বীরাঙ্গনা তোমরা, তোমাদের আদর্শে ভবিষ্য ভারতের প্রত্যেক নারী হবে বীর নারী। অভিযান সময় আসন্ন।

লক্ষ্মী। আমরাও প্রস্তুত নেতাজী। আমি তাদের প্রস্তুত রাখি নেতাজী। জয়হিন্দ (লক্ষ্মীর প্রস্থান)।

(কয়েকজন বালক সেনার প্রবেশ)।

১ম জন। সম্মুখ রণাঙ্গনে আমরা যাবনা নেতাজী?

নেতাজী। যাবে বৈকি ভাই। ভারতের বীর বালক তোমরা, মৃত্যুকে তোমরা জয় করেছ। যাত্রার সময় আসন্ন, যাও তোমাদের পরিচালকের আজ্ঞার জন্যে অপেক্ষা কর।

বালকগণ। জয়হিন্দ (প্রস্থান)

নেতাজী। কর্ণেল ইয়ানং?

কঃ ইয়ানং। আদেশ করুন নেতাজী।

নেতাজী। মহাত্মা গান্ধী, ভারতের স্বাধীনতার পবিত্র প্রতীক। সেই মহাপুরুষের নামকরণে যে সৈন্য বাহিনী, তার দায়িত্ব তোমার উপরে ন্যস্ত ক'রে আমি নিশ্চিন্ত রইলাম। নির্দেশ অনুযায়ী তুমি তোমার সৈন্য পরিচালনা করবে।

ইয়ানং। নেতাজী, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে এই জীবন আমি উৎসর্গ করেছি। আপনার আনুগত্য, নির্দেশ আমার জীবনের মূল মন্ত্র। গান্ধী ব্রিগেডের মর্যাদা যদি না রাখতে পারি, সেদিন আমার যেন মৃত্যু হয়।

নেতাজী। জেঃ মোহন সিংহ! রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ,

সেই আদর্শ কর্মীর নামে আপনার অধীনস্থ সেনাবাহিনীকে গৌরব দান করেছে— সেই গৌরব রক্ষার ভার আপনার।

মোহন সিংহ। তা জানি নেতাজী। আপনার নির্দেশ ও আজ্ঞা প্রতিপালন করে আজাদ ব্রিগেডের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে আমার কোন ত্রুটী হবে না। ত্রুটী যদি আসে, মোহন সিংহ সেদিন প্রাণে জীবিত থাকবে না।

নেতাজী। কে: গুরুবক্স ধীলন! তোমার অধীনে নেহেরু ব্রিগেড। পণ্ডিত নেহেরু—স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সেবক। তাঁর নামের মর্যাদা তুমি অক্ষুন্ন রেখ।

ধীলন। নেহেরু ব্রিগেড পরিচালনার যে গুরু দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করেছেন, সে দায়িত্ব পালনে আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ব্যয় করব। ভারতের স্বাধীনতা আমার লক্ষ্য। নেহেরু ব্রিগেড সে লক্ষ্য হ'তে কখনও বিচ্যুত হবে না।

নেতাজী। লে: ক: সায়গল, তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছি সেইভাবে তুমি রণক্ষেত্রে অগ্রসর হবে। সব সময় ধীলনের সংগে সংযোগ রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। তোমরা সব প্রস্তুত।

সকলে। প্রস্তুত।

নেতাজী। ক্যাপটেন শাহনাওয়াজ?

শাহনেওয়াজ। নেতাজী!

নেতাজী। তোমাকে আমার একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে ভাই! আমি জানি তুমি বীর, আমি জানি তুমি দুর্নিবার। ৩২০০ হাজার সৈন্য নিয়ে তুমি যে অভিযান করবে তা রোধ করতে কেউ পারবেনা। তবু জিজ্ঞাসা করি, আমি সংবাদ পেয়েছি তোমার আপন সহোদর ইংরাজের হ'য়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। ভাইএর প্রতি ভাই কি অস্ত্র ধারণ করবে শাহনাওয়াজ!

শাহনাওয়াজ। স্বাধীন ভারতের মূর্তি আমি দেখতে পাই নেতাজী। পরাধীন ভারতের গ্লানি তাই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। দৈত্যের মোহিনী মায়ায় ঘুমিয়ে ছিলাম আমি, সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে আপনি আমার ঘুম ভাঙিয়েছেন নেতাজী। আমি চিনিনা হিন্দু, আমি চিনিনা মুসলমান, চিনিনা খৃস্টান, শুধু চিনি স্বাধীন ভারতের স্বাধীন ভারতবাসী।

নেতাজী। যাত্রার কাল আসন্ন। এক্ষুনি হবে অভিযানের সংকেত ধ্বনি। আমি শুনতে চাই, যে-ভাই, ইংরেজের হয়ে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে, তার প্রতি তোমার কর্তব্য?

শানাওয়াজ। আমার কর্তব্য? আমার বিবেক আমার কর্তব্য পথ চিনিয়ে দিয়েছে নেতাজী। শপথ ক'রে আমি একদিন বলেছিলাম, দেশ মাতৃকার উদ্ধারের জন্যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে, আমি আমার জীবন, আমার সর্বস্ব উৎসর্গ করলাম। সম্মুখ সমরে যাত্রার আসন্ন সময়েও সেই শপথই আজ আমি করবো নেতাজী। ভারতের স্বাধীনতা আমার জীবনের ব্রত, সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে কেউ যদি আজ বাধা দিতে আসে, হোকনা সে আমার আত্মীয়, হোক না সে আমার সহোদর ভাই, আমার সমস্ত পরিবার—সকলকে—কামানের গোলায় ধুলোর সংগে আমি মিশিয়ে দেব।

নেতাজী। এইত মুক্তিকামী বীরের কথা। ধন্য তুমি বীর শাহনাওয়াজ। তোমাদের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নিয়ে আমার যা গর্ব, আমি জানি, সে গর্ব কোনদিনই খর্ব হবে না। অন্তরের সমস্ত কামনা আমার উন্মুখ হয়ে রইবে তোমাদের সাফল্যের পথের দিকে। এস শাহনাওয়াজ, গ্রহণ কর এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতের জাতীয় পতাকা—তুলে দেব তোমার হাতে—স্বাধীন ভারতের, মুক্ত মাটীতে এ পতাকা উত্তোলনের ভার রইল তোমার উপরে।

[শাহনাওয়াজ যেই মাত্র পতাকা গ্রহণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ একটি বিরাট সংকেত ধ্বনি হইল—বুঝা গেল অভিযানের সময় আসিয়াছে। সকলে সচকিত হইলেন এবং নিজ নিজ স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন]

নেতাজী। অভিযানের সময় আগত। আমার প্রিয় বীরগণ! তোমরা প্রস্তুত হও। কর্ণেল ইনায়ৎ, মোহন সিং, ধীলন, সেগল, শাহনাওয়াজ (প্রত্যেকে এ্যাটেনসন হইয়া Salute করিল) আরত সময় নেই, তোমরা নিজ নিজ সৈন্য বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—অগ্রসর হও — দূরে — বহুদূরে — ঐ নদী ছেড়ে — ঐ

জংগল, ঐ পাহাড় পর্বত ছেড়ে আমাদের দেশ—ঐ দেশ আমাদের জন্মভূমি—ঐ দেশে আবার আমরা ফিরে যাব। শোন, ভারত আমাদের ডাকছে—ভারতের রাজধানী দিল্লী আমদের ডাকছে; ৩৮ কোটী ৮০ লক্ষ ভারতবাসী আমাদের ডাকছে—আত্মীয়েরা ডাকছে—আত্মীয়দের। ওঠ, আরত' সময় নেই, গ্রহণ কর অস্ত্র। দেখ, যে পথ তোমাদের সামনে—সে পথ তৈরী করে গেছেন আমাদেরই পথ প্রদর্শকগণ। আমরা অগ্রসর হবো সেই পথে, পথ করে নেব শত্রু সেনার ভিতর দিয়ে। ভগবান যদি চান, আমরা শহীদের মত মৃত্যু বরণ করবো। যে পথ দিয়ে আমাদের সৈন্যগণ দিল্লী পৌছবে—শেষ শয্যা গ্রহণ করবার সময় সেই পথ আমরা চুম্বন করব। দিল্লীর পথ, স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।

সকলে। (সমস্বরে) চলো দিল্লী।

[রংগমঞ্চ হঠাৎ অন্ধকার হইয়া গেল সমর বাদ্য শ্রুত হইল সংগে সংগে মার্চের গান। মঞ্চের অগ্রভাগ অন্ধকার রহিল। পশ্চাতে সাদা পর্দায় আলোক পাত হইল রংগমঞ্চের পশ্চাত ভাগ হইতে। তাহাতে দেখা গেল নেতাজী বীর গর্বে আলো ছায়ায় দাঁড়াইয়া সৈন্য শ্রেণীর অভিযান দেখিতেছেন, সৈন্য বাহিনী, নারী বাহিনী, বালক বাহিনী একে একে সকলেই কুচকাওয়াজ করিতে করিতে চলিতে লাগিল। মুখে তাহাদের সংগীত, হাতে তাদের জাতীয় পতাকা।

গান

অব্ দিল্লী চলো দিল্লী চলো দিল্লী চলেংগে।
রোকেন হম কিসী কে রুকে হৈঁ ন রুকেংগে।
ঝাণ্ডা তিরংগা লাল কিলেপৈ উড়ায়েংগে,
জয়হিন্দ কিনারো সে ফলক কো হিলায়েংগে
হিন্দোস্তাঁ মে হিন্দী হী অব্ রাজ করেংগে।
অব দিল্লী চলো—ইত্যাদি—
'আগে হী বড়েংগে ন কিসী সে ভী ডরেংগে,
হম মৌত কাভী সামনা হস, হসকে করেংগে।
অব পাক জমী পৈ ন ওদু পাও ধরেংগে॥
অব দিল্লী চলো—ইত্যাদি—
আংরেজ চলে যায়—এ হৈ দেশ হমারা,
প্রাণো সে হৈ প্যারা হমে এজীসে দুলারা,
ইস্‌কে লিয়ে সব্ রখকে হথলী পৈ লড়েংগে!
অব দিল্লী চলো—ইত্যাদি—
ঈমানকে হিন্দী যেঁামে গরচে বহেগী,
লন্দন পৈ তেগে হিন্দ বঢ়েগী ঔর বাড়েগী,
শাহে জফরকে কৌল কী হম শান রখেংগে।
অব দিল্লী চলো—ইত্যাদি।

[যতক্ষণ গান শেষ না হইবে ততক্ষণ সৈন্যশ্রেণী চলিতে থাকিবে এবং নেতাজী উৎসুক নেত্রে তাদের প্রতি চাহিয়া রহিবেন।]

৩য় দৃশ্য

[সুভাষচন্দ্র বসিয়া আছেন সম্মুখে তার মাইক্রোফোন। তিনি রেডিও বক্তৃতা করিতেছেন, সামনে মহাত্মা গান্ধীর পুষ্পমাল্য শোভিত একখানি প্রতিকৃতি। মহাত্মাজীকে সুভাষচন্দ্র নমস্কার করিলেন।]

মহাত্মাজী,

ব্রিটিশ অবরোধে, দেবী কস্তুরীবার মৃত্যুর পর আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করা স্বাভাবিক। ভারতের বাইরে ভারতবাসী...আমাদের কাছে, আপনিই বর্তমান জাগরণের স্রষ্টা। ১৯৪২ সালের আগষ্ট প্রস্তাব "ভারত ছাড়" এই নীতি যখন আপনি প্রয়োগ করেন তখন হ'তেই ভারতের স্বাধীনতাকামী বিদেশী সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে আপনার মর্যাদা শত গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। ব্রিটিশ জনসাধারণ ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে মনে করলে সাংঘাতিক ভুল করা হবে। ব্যবহারিক পক্ষ হ'তে বিচার করলে দেখা যায়, ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশজনগণের ধারণা একরূপ,—অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, সে খুবই অল্প।

মহাত্মাজী,

আপনাকে আমি শপথ করে বলতে পারি, এই বিপদের পথ বেছে নিতে আমি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চিন্তা ক'রেছি। যদি আমার বিন্দুমাত্র আশাও থাকত যে, বাইরের কোন সাহায্য না

নিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব, এই সংকট কালে, আমি তাহ'লে কখনই ভারত ত্যাগ করতাম না। অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে আমি প্রতারিত হ'বো এমন ধারণা অনেকে করেন। কিন্তু কুট বুদ্ধি, কৌশলী ব্রিটিশের সংগে আমি কাজ করে এসেছি—সারা জীবন তাদের সংগে যুদ্ধ করে এসেছি—পৃথিবীর অন্য কোন রাজনীতিকের দ্বারা প্রতারিত হবার ভয় আমার নেই। অমি কখনই এমন কাজ করিনি বা করব না, যাতে আমার স্বদেশের স্বার্থ ও মর্যাদায় এতটুকু আঘাত লাগে।

মহাত্মাজী, জাপান,—বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে আমি জাপানে যাই নি। চুংকিং গভর্ণমেণ্টের প্রতি আমারও সহানুভূতি কম ছিলনা। আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে, কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে, ১৯৩৮ সালে আমিই চুংকিংএ মেডিকাল মিশন পাঠাই।

মহাত্মাজী, জাপানীরা আমাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় নি। জাপানীদের নীতি ঘোষণার মধ্যে আমি স্তোক বাক্য দেখতে পাইনি—তাহ'লে, জাপানীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'বার কোন কারণ ছিলনা।

মহাত্মাজী, আমরা এখানে সাময়িক যে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেছি, তার উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশের অধীনতা শৃঙ্খল হ'তে ভারতের মুক্তি সাধন। ভারতবর্ষ হ'তে ইংরাজ বিতাড়িত হ'লে—দেশে শান্তি ফিরে আসবে—আসবে শৃঙ্খলা, সম্পদ,—তখন আমাদের সাময়িক গভর্ণমেণ্টের কোন প্রয়োজন হবে না। আমাদের সাধনা, আমাদের ত্যাগ, আমাদের দুঃখ বরণের জন্যে আমরা একটী মাত্র পুরস্কার চাই—সে আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা। আপনার "কুইট ইণ্ডিয়া"—ইংরেজ মেনে নেবেনা—ভারতের মধ্যেও আন্দোলন চালান কার্যকরী হবে না, অতএব সশস্ত্র সংগ্রাম অপরিহার্য। ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে।

আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে ভারতের পথে অগ্রসর হয়েছে—দুর্বার তাদের গতি। যতক্ষণ একটি ইংরেজ ও ভারতবর্ষে থাকবে—যতক্ষণ পর্যন্ত নয়া দিল্লীতে বিজয় গর্বে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতকা না উড়তে থাকবে—ততক্ষণ এই সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষান্তি হবে না।

হে আমাদের জাতীয়তার জন্মদাতা,

ভারতের এই পুণ্য মুক্তি সংগ্রামে আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা আমার কামনা—আমার প্রার্থনা।

—জয়হিন্দ

[দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটিল—দেখা গেল পর্বতের বন্ধুর পথ। চারিদিকে বন্দুক ও মেসিনগানের শব্দ! ধোঁয়ায় যেন চারিদিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। দূরে দেখা গেল একদল নারী সৈন্য মেসিনগান চালাইতেছে—বন্দুকের শব্দ চলিয়াছে, মঞ্চ ঘুরিয়া গেল, দেখা গেল একদল বালক সেনা হাত বোমা নিয়ে অগ্রসর হইতেছে, পিঠে তাহাদের মাইন বাঁধা। তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল "ঐ ঐ ইংরেজের ট্যাঙ্ক" তাহারা সব দৌড়াইয়া গেল—ভীষণ শব্দ হইল। নেপথ্যে আবার শব্দ হইল—"জয় নেতাজী", "জয় হিন্দ।" মাইন ফাটার শব্দ হইল। বন্দুকের শব্দ, উপরে এরোপ্লেনের শব্দ। তাহার মধ্যে মঞ্চ আবার ঘুরিয়া গেল, দেখা গেল সংগীন হাতে করিয়া সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছে মুখে তাহাদের রণ হুঙ্কার "দিল্লী চলো।" আবার বন্দুকের শব্দ, আবার মঞ্চ ঘুরিয়া গেল,—একটি আহত সৈন্য টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল।

সৈনিক। ওঃ ভীষণ লেগেছে, বন্দুকের গুলি আমার পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছে।

[আর একটি সৈনিকের প্রবেশ]

২য় সৈনিক। তুমি আহত হয়েছো ভাই, চল তোমাকে শিবিরে নিয়ে যাই।

১ম জন। শিবিরে নিয়ে যাবে? কিন্তু বলতে পার জাপানীরা এমন মরিয়া হ'য়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে কেন?

২য় জন। সংবাদ এসেছে যারা যুদ্ধ করছে তারা জাপানী নয়—তারা আজাদ হিন্দ ফৌজ। যে ব্রিগেড আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে—তার নাম হ'চ্ছে সুভাষ ব্রিগেড। সুভাষ ব্রিগেড—পরিচালক—মেঃ জেঃ শাহনাওয়াজ।

১ম জন। শাহনাওয়াজ ?

২য় জন। হ্যাঁ। তুমি অমন করে উঠলে কেন ?

১ম জন। শাহনাওয়াজ — শাহনাওয়াজ — আমার ভাই।

২য় জন। এখানে থাকাও নিরাপদ নয়—তারা বিপুল বিক্রমে কোহিমার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে, চল তোমায় শিবিরে নিয়ে যাই।

(তাহাকে ধরিল)।

শেষ দৃশ্য

বর্মা,—

[সম্রাট বাহাদুর শাহের সমাধি। চারিদিকে ধূপ ও আলোক বর্তিকা—চন্দন গন্ধে চারিদিক গন্ধিত। তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পরণে তাহার সৈনিকের বেশ।]

নেতাজী। ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট, বাহাদুর শাহ—তুমি আমার অভিবাদন গ্রহণ কর জনাব! ভারতের স্বাধীন সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ শহীদ, ভারতে তোমার জন্ম এতটুকু মাটীর ব্যবস্থা হলোনা, তাই সুদূর বর্মা দেশে এনে তোমাকে ওরা রাখল—তোমার স্মৃতি-সমাধিরও দিল ওরা দ্বীপান্তর।

তোমার পবিত্র সমাধি মন্দির স্পর্শ করে আমি প্রতিজ্ঞা করছি জনাব—তুমি আশীর্বাদ করো—দিল্লীশ্বরের স্থান দিল্লীতেই যেন আমি করতে পারি, তোমার পবিত্র সমাধি, আমি দিল্লীর লাল কেল্লায় নিয়ে যাব জনাব।

আমি জানি, আমি স্বপ্নবিলাসী, সে স্বপ্ন আমার বিলাস নয়, আমার গর্ব! সে গর্বের স্বপ্ন—আমার স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন—সে স্বপ্ন কি আমার সত্য হবে ?

তুমি দেখেছিলে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন—ভারতের হিন্দু-মুসলমান-শিখ—জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাই তোমার পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছিল। ইংরাজেরা মিথ্যা অপবাদ দেয়, সে সিপাহী বিদ্রোহ। কিন্তু আমরাত জানি, সে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। সে সংগ্রাম তোমার বিফলে যায়নি,—স্বাধীনতার সংগ্রাম কোনদিন বিফল হয়না—বিফল হবে না।

ভারতের বাইরে এই বর্মা দেশে থেকে ভারতের শতবর্ষ আগের স্বাধীনতার সংগ্রাম আবার আরম্ভ হয়েছে—মৃত্যু দিয়ে এই সংগ্রামকে আমরা অটুট রাখব। তুমি শক্তি দাও জনাব—তুমি সাহস দাও, তোমার স্বপ্নকে যেন আমরা রূপ দিতে পারি। বীরদর্পে ভারতের সন্তানেরা এগিয়ে চলেছে ভারতের দিকে। ভারতের বীর পুত্র শাহনাওয়াজ কোহিমায় ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ক'রেছে তুমি তাদের আশীর্বাদ কর জনাব।

হে সম্রাট,—

তুমি শুধু মানুষের মধ্যে সম্রাট ছিলেনা—তুমি ছিলে সম্রাটের মধ্যে মানুষ। তোমার সমাধির পার্শ্বে দাঁড়িয়ে, তোমার পবিত্র বাণী উচ্চারণ করে আমি আবার প্রতিজ্ঞা করছি—যতদিন ভারতের মুক্তিকামী সত্যাগ্রহীদের মনে এতটুকু স্বাধীনতার বিশ্বাস থাকবে—ভারতের মুক্ত তরবারি লণ্ডনের অন্তস্থলে অবিরাম আঘাত হানবে—অনিবার আঘাত হান্‌বে—আমরণ আঘাত হান্‌বে—জয়হিন্দ।

[নেতাজীর চোখে জল। সামরিক কায়দায় তিনি আবার সম্রাটের সমাধি পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সম্রাটের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানাইলেন।]

ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল।

সমাপ্ত

[নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মহান জীবনের একাংশ নাটকাকারে প্রকাশ করা হ'লো। নাটকটী রচনা করেছেন বন্ধুবর অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী, এঁর একাধিক নাটিকার সংগে রূপ-মঞ্চ পাঠক গোষ্ঠী পরিচিত আছেন। ব্যক্তিগত ভাবে বহু পাঠক পাঠিকারা নেতাজীর জীবনী লিখতে আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁদের সে অনুরোধ সশ্রদ্ধ ভাবে গ্রহণ করে এই মহান কাজে আমি অনেকখানি অগ্রসর হ'য়েছি। যাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন—তাঁদের তরফ থেকে কৈফিয়ৎ আসতে পারে বলেই আমি এখানে কয়েকটী কথা বলে নিতে চাই। রূপ-মঞ্চে কোন রাজনৈতিক যোদ্ধার জীবনী প্রকাশে যদি আইনগত বাধাও থাকে—নাটক প্রকাশে সে বাধা অচল। কারণ

নাট্য-মঞ্চ সম্বলিত পত্রিকা হ'য়ে নাটক প্রকাশের অধিকার রূপ-মঞ্চের আছে। নাটক লিখতে আমি অভ্যস্ত নই, সুভাষচন্দ্রের মহান নাটকীয় চরিত্রকে নাটকাকারে রূপ দিতে যেয়ে নিজে যদি কোন অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে ফেলি, সে লজ্জা আমি সহ্য করতে পারবো না বলেই, আমার চেয়ে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত লোকের হাতেই এই ভার দিলাম। পাঠক সাধারণ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নেতাজীর জীবনী রচনা করতে যে অনুরোধ জানিয়েছেন —পুস্তকাকারে নেতাজীর জীবনী প্রকাশ করে আমি সে অনুরোধ রক্ষা করতে সচেষ্ট আছি। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং নেতাজী সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হ'য়েছে, তারই ওপর ভিত্তি করে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী বর্তমান নাটকটী রচনা করেছেন—নেতাজীর মহান আদর্শ, স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি ও তাঁর সহকর্মীদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের কাহিনী, হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টান বিভেদে সকল ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধতা—আমাদের আদর্শ স্থানীয়। বর্তমান নাটকের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি যদি নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন মর্যাদাহানি করে থাকে, আশা করি নাট্যকার ও আমাদের আন্তরিকতার কথা চিন্তা করে পাঠক সাধারণ সে ত্রুটি বিচ্যুতিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে সংশোধন করে নেবেন।] —সম্পাদক : রূপ মঞ্চ

ভুল-সংশোধন : ৪০ পৃঃ ২০ পঙক্তিতে ২৫শে অক্টোবরের স্থানে ২৮শে অক্টোবর ভুলক্রমে মুদ্রিত হ'য়েছে।

সম্পাদকের দপ্তর

অমিতাভ সেন (একডালিয়া রোড, কলিকাতা)

আপনাদের পত্রিকা প্রতি বারেই উৎসাহের সংগে পড়ে থাকি। আমার বহুদিন থেকে কয়েকটা জিনিষ জানবার ইচ্ছা। সিনেমা সংক্রান্ত পত্রিকা হিসেবে রূপ-মঞ্চ অনায়াসেই শ্রেষ্ঠ স্থানের দাবী করতে পারে। তাই আমি আপনার কাছেই আমার প্রশ্নগুলির অবতারণা করলাম। প্রায়ই শোনা যায়, অমুক লোকে প্রযোজনা করেছেন। প্রযোজনা কথাটার মানে কি? প্রযোজক, পরিচালক আর ব্যবস্থাপক এর মধ্যে প্রভেদ কি?

: প্রযোজনা যিনি বা যাঁরা করেন তাঁকে বা তাঁদের বলা হয় প্রযোজক। অর্থাৎ একটী ছবির নির্মাণ-দায়িত্ব যাঁর বা যাঁদের ওপর নির্ভর করে। ইংরেজীতে ছবির এই নির্মাতাকে বলা হ'য়ে থাকে প্রডিউসার। যেমন মনে করুন নিউ থিয়েটার্স লিঃ, এম, পি প্রডাকসন্স, চিত্রভারতী, চিত্ররূপা, চিত্রবাণী প্রভৃতি। এখানে একটু বিশ্লেষণের প্রয়োজন। অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে চিত্র-নির্মাণের দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতেও অর্পিত হ'য়ে থাকে—যেমন চিত্রবাণী লিঃ একটী প্রযোজক প্রতিষ্ঠান—তাদের বর্তমান বাংলা চিত্র 'এই তো জীবন'-এর প্রযোজনা ভার শ্রীযুক্ত নীরেন লাহিড়ীর ওপর অর্পিত হ'য়েছে। পরিচালক হচ্ছেন তিনি, চিত্র-সৃষ্টির সর্বপ্রকার দায়িত্ব নির্ভর করে যার ওপরে। (অবশ্য আর্থিক দিকটা বাদে)। ইংরেজীতে পরিচালককে বলা হয়—Director—The person who superintends the actual production of the motion picture; ব্যবস্থাপক—চিত্র নির্মাণাবস্থায় চিত্রের সর্বপ্রকার প্রয়োজনের প্রতি যিনি দৃষ্টি রাখেন। সাধারণতঃ একে বলা হ'য়ে থাকে প্রডাক্সন ম্যানেজার। কর্তৃপক্ষদের সব সময় ষ্টুডিওতে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়—তাই তাঁর বা তাঁদের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবস্থাপক চিত্র নির্মাণ সময়ে সব তদারক করেন।

মঞ্জুশ্রী সেনগুপ্তা (একডালিয়া রোড, কলিকাতা)

(১) উদয়ের পথে, দুই পুরুষ এবং ভাবীকাল এই তিনটীকে পর পর সাজাইয়া দিন (২) অভিনেত্রীদের মধ্যে সুনন্দার স্থান কোথায়—২য়—৩য়—না ৪র্থ?

: (১) পরিচালনা এবং চিত্র হিসাবে যদি বলেন উদয়ের পথে—দুই পুরুষ—ভাবীকালকে এই ভাবেই মান হিসাবে সাজাতে হবে। (২) বাংলার প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীদের ভিতরই শ্রীমতী সুনন্দা স্থান পাবার যোগ্যা।

কান্তি সেন (শীতলাতলা, নারিকেলডাঙ্গা)

(ক) নিম্নলিখিত সুরশিল্পীদের গুণের তারতম্য হিসাবে সাজিয়ে দিন—কমল দাশগুপ্ত, শচীন দেববর্মন, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনিল বাগচী, গিরীন চক্রবর্তী।

(খ) নিম্নলিখিত পরিচালকদের পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দিন—প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু, নীরেন লাহিড়ী, নীতীন বসু, শৈলজানন্দ, বিমল রায়, সুবোধ মিত্র, প্রেমেন মিত্র, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(গ) ছবি বিশ্বাস এবং জহর গাঙ্গুলীর মধ্যে কার বৈশিষ্ট্য কি? সব দিক থেকে বিবেচনা করে কার স্থান উচ্চে?

(ঘ) শ্রীপার্থবের প্রকৃত নাম কি?

: (১) শচীন দেব বর্মন, কমল দাশগুপ্ত, রাইচাঁদ বড়াল পঙ্কজ মল্লিক, অনিল বাগচী, গিরীন চক্রবর্তী, রবীন চট্টো-

পাধ্যায়। কণ্ঠ এবং গাইয়ে হিসাবে—শচীন দেব বর্মন, পঙ্কজ মল্লিক, গিরীন চক্রবর্তী (পল্লী সংগীতে এর স্থান শ্রীযুক্ত মল্লিকেরও ওপরে) কমল দাশগুপ্ত, (রাইচাঁদ বড়াল, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনিল বাগচী এঁদের গান আমি শুনিনি ...তাই এঁদের সম্পর্কে কোন রায় দিতে পারলুম না।)

(খ) প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতীন বসু, বিমল রায়, শৈলজানন্দ, দেবকী বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীরেন লাহিড়ী, সুবোধ মিত্র, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(গ) 'Smart and dashing' চরিত্রে ছবির তুলনা হয় না। তড়বড়ে খড়খড়ে চরিত্রে জহর অতুলনীয়। সবদিক বিবেচনা করে বল্লে ছবির স্থান অনেক উচ্চে। ছবির ভিত্তি পাকা বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(ঘ) প্রকৃত নাম নিশ্চয়ই একটা আছে। কিন্তু তা যদি বলেই দি, তাহ'লে অ-প্রকৃত নামের তাৎপর্য থাকবে কোথায়? তাই এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করবেন।

অনাদি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (দেউলভিড়া বাঁকুড়া)

গত সংখ্যা রূপ-মঞ্চে আপনার প্রশ্ন 'অসিতবরণ ঘোষ এখন কোথায় এবং কি করিতেছেন'—এর উত্তরে আমি ভুল করে অভিনেতা অসিতবরণের কথা উল্লেখ করেছি। হলিউড প্রত্যাগত অসিতবাবু বর্তমানে রাধাফিল্ম ষ্টুডিওর তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করছেন। তবে তিনি অসিতবরণ নন-অসিতকুমার ঘোষ। হলিউডে অসিতরঞ্জন নামে সুপরিচিত ছিলেন।

এস, দত্ত (১১৯২, জলপাইগুড়ি)

সুমিত্রা, নাসিম, জয়শ্রী, সুনন্দা এদের মধ্যে রূপ ও অভিনয়ের দিক থেকে কাহার স্থান উচ্চে? (২) বম্বে টকীজের সুরেশ কি চিত্র জগত থেকে বিদায় নিয়েছে?

: (১) রূপে—জয়শ্রী, নাসিম, সুমিত্রা, সুনন্দা।

অভিনয়ে—সুনন্দা, জয়শ্রী, সুমিত্রা, নাসিম।

(২) বর্তমানে সুরেশের কোন খবর রাখিনা। তবে কিছুদিন পূর্বে শুনেছিলাম—বম্বের বালক অভিনেতারা একত্রে একখানি ছবি গড়ে তুলবে—এবং সে ছবিখানি

পরিচালনা করবে অনন্ত মারাঠে—সুরেশও তার ভিতর থাকবে বলে গুজব শুনেছিলাম।

শ্রীপ্রভাকর বরাট (লোকপুর বাকুড়া)

(১) দুর্গাদাস সংখ্যাটী পাইতে হইলে কত খরচ লাগিবে—

(২) অসিতবরণ ঘোষ যিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন তিনি এখন কোথায় ও কি করিতেছেন?

: (১) দুর্গাদাস সংখ্যাটী এক বছরের ওপর হোল—'out of print' হ'য়ে আছে। সম্প্রতি যে প্রেসটী দুর্গাদাস পুনর্মুদ্রণের ভার নিয়েছিল—৬ মাসের মধ্যেও তাঁরা মুদ্রণ কার্য সমাধান করে উঠতে পারেন নি। তাই কত খরচ পড়বে আগে থেকেই জানিয়ে লাভ কি? (২) শ্রীযুক্ত অসিতকুমার ঘোষ সম্পর্কিত উত্তর এই বিভাগে অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।

হরেণ চক্রবর্তী (যশোর রোড, দমদম)

(১) রেডিও মেকানিজম সম্বন্ধে বাংলায় কি ভাল বই আছে—আপনার যদি জানা থাকে জানাবেন।

(২) ইংরেজী স্বরলিপি শিখতে চাই এ বিষয় বাংলায় কিংবা ইংরেজীতে যদি কোন বই আপনার জানা থাকে দয়া করে জানাবেন।

: (১) রেডিও মেকানিজম নিয়ে সে রকম কোন বই বাংলায় নেই—তবে রেডিও সম্পর্কে—তার আদি পর্ব থেকে যান্ত্রিক কারসাজী বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ করতে হ'লে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থ মালার 'বেতার' পুস্তিকাখানি পড়ে দেখতে পারেন। লিখেছেন ডাঃ সতীশ রঞ্জন খাস্তগীর। ইংরেজীতে অবশ্য অনেক বই আছে। প্রয়োজন বোধে তার নাম জানাতে পারবো।

(২) এ সম্পর্কে আপনার কোন সংগীতজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন দেশের সংগীতজ্ঞদের সম্পর্কে যদি কিছু জানতে চান আমি আমার সাধ্যমত জানাতে পারি—কিন্তু সংগীত বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার নিজেরও যেমন কোন পড়াশুনা বিশেষ নেই—তেমনি ও সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু খোঁজ খবরও দিতে পারবো না।

'শিকারী' চিত্রে নবাগতা প্যারো

সুকুমার মুখোপাধ্যায় (১২৩৩ খুরোপ, হাওড়া)

আমি কোন ফিল্ম কোম্পানীতে বিশেষ করিয়া বড়ুয়া আর্ট প্রডাকসন্স এবং নিউথিয়েটার্সে player হিসাবে কাজ করতে চাই।

: তোমার চিঠিতে জানলাম—তুমি এখনও ছাত্র। বয়সও তোমার কম। জ্যেষ্ঠের দাবী নিয়ে তোমাকে বলবো—বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর গোড়া ডিঙ্গিয়ে আসবার পূর্বে এ দিকের বাহ্যিক রূপ জৌলুসে ভুলে যেও না ভাই! তাই ফিল্ম কম্পানীর ঠিকানা দিয়েই বা তোমার কী হবে?

নিতাইকুমার রায় (১১৯৩ : মুর্শিদাবাদ)

মিঃ পি, সি, বড়ুয়ার বাড়ীর ঠিকানা কি?

: ১৪, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড।

সুনীল দাস (১২০২: মালদহ)।

কি পর্দায় কি রেকর্ডে সব জায়গাতেই নবদ্বীপ হালদারের বিকৃত গলা শুনতে পাই। তবে কি তিনি সেই রকমেরই?

: না! গলার ঐ বিকৃতরূপ তাঁর নিজেরই সৃষ্ট। এবং এই জন্তই অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতার জন্তই শ্রীযুক্ত হালদারকে প্রশংসা করা চলে। নইলে তিনি যে কৌতুকাভিনয় করেন—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা ঐ কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার মত—এবং তা অতি নিম্নস্তরের।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (দিঘড়া, ২৪, পরগণা)

(১) প্রমথেশ বড়ুয়া কোন বইয়ে সবচেয়ে ভাল অভিনয় করিয়াছেন। (২) বাংলার চিত্র জগতে বর্ত্তমানে সব চেয়ে বেশী সুন্দরী কে?

: আমার নিজের কাছে বড়ুয়ার 'রূপ-লেখা'র অরূপ এখনও দাগ কেটে আছে। তবে দেবদাস, মুক্তি, শেষ উত্তর, উত্তরায়ণ, অধিকার, শাপমুক্তি প্রত্যেকটী চিত্রের অভিনয়েই দর্শক মনে বড়ুয়া বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিতে সক্ষম হ'য়েছেন। (২) শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী।

অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (১১৪৯-জলপাইগুড়ী)

(১) ছবি দেখে প্রকৃত শিক্ষালাভ করা গেছে এমন কয়টা দেশীয় ছবির নাম করুন। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে এ রকম ছবির অভাব কেন? আমাদের দেশের পরিচালকগণ এদিকে নজর দেওয়া দরকার বোধ মনে করেন না কেন? তাদের কি অর্থোপার্জ্জনই আসল উদ্দেশ্য। ছবি দেখে শিক্ষা লাভ করা যায় এমন ছবি আমাদের মত দেশে একান্ত দরকার। আমার মনে হয় যাতে এ রকম ছবি তোলা হয় সে দিকে আপনাদের নজর দেওয়া উচিত।

(২) অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের বেতন কম দেওয়া হয় কোন?

(৩) খুব কম পক্ষে একটা ছবির পেছনে কত খরচ হ'তে পারে?

(৪) কাশীনাথ ও উদয়ের পথে এই দু'টো ছবির মধ্যে আপনার মতে কোনটা ভাল?

: (১) শিক্ষনীয় কিছু না কিছু প্রত্যেক ছবিতেই আছে—তবে সেটা কী ভাবে দয়িতের কাছে চিঠি বিলি

করতে হয়—অথবা মদের গেলাস ধরতে হয় এই যা। সত্যিকারের শিক্ষনীয় চিত্র একটীও আমাদের গড়ে ওঠেনি যদি বলি—আশা করি আমার কথাটা খুব অন্যায় হবে না। অর্থাৎ শিক্ষার জন্য একটা ছবিও তৈরী হয় নি—দু'একটায় যা শিক্ষনীয় বিষয় বস্তু আছে—তা যেন আগাছার মত ছবিতে এসে পড়েছে। তাই নাম করবো কী করে? তবু পড়শী, ভক্ত কবীর, দেশের মাটী, রোটী, এই ধরণের উদ্দেশ্যমূলক চিত্রগুলির প্রশংসা করবো বৈকী—আর আমাদের আরোরা ফিল্মের কতগুলি 'সর্ট-রীলারের'ও কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষনীয় ছবির অভাবের জন্য—মূলতঃ দায়ী আমাদের বৈদেশিক সরকার—পরাধীনতার নাগপাশে বেধে রেখে তাঁরা জাতীয় সর্বপ্রকার অগ্রগতিকে রুদ্ধ ও পঙ্গু করে ফেলেছে। তাই যেদিন এই নাগপাশের বন্ধন আমরা ছিন্ন করতে পারবো, সেদিন কোন অভাবই আমাদের থাকবে না। আমাদের বর্তমান সরকার যেমনি জনসাধারণের রক্ত চুষে স্ফীত হতে শিখেছেন—সাম্রাজ্যবাদী সরকারের যেমনি রাজ্যলিপ্সা ও অর্থ লিপ্সার শেষ নেই, তেমনি তার আওতায় আমরাও ঐ শোষণ নীতি ছাড়া আর কিছু শিখিনি—অর্থই হচ্ছে আমাদের চরম এবং পরম উদ্দেশ্য—এই শোষণ নীতি তার চরম রূপ-নিয়ে জনসাধারণের সামনে প্রকটিত হ'য়ে উঠেছে—তাই আজ দেখতে পাই গণ-চেতনা ও গণ-জাগরণ। এই চেতনা ও জাগরণ যখনই সর্বশক্তি সম্পন্ন হবে—এবং শোষণ-নীতি যখন শেষ সীমায় পৌছাবে তখনই জনসাধারণ burning point—এ যেয়ে হাজির হবে—এবং স্বাধীনতার আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করবে। সেদিনই আমাদের সমস্ত চাহিদা, সমস্ত অভাব দূরীভূত হবে। এখন থেকেই আপনাদের এবং আমাদের সর্ব প্রচেষ্টাই সেজন্য নিয়োগ করতে হবে।

'এই তো জীবন'-এর একটী দৃশ্যে তুলসী লাহিড়ী, হরিধন ও সীতাকে দেখা যাচ্ছে।

(২) একখানি ভারতীয় চিত্রের আর্থিক সম্ভাবনা বৈদেশিক চিত্রের তুলনায় অনেক কম বলে।

(৩) বর্তমানে আশী হাজার টাকা আনুমানিক।

(৪) উদয়ের পথে। পরিচালনা,অভিনয়-নৈপুণ্য ও তার নূতন দৃষ্টি ভংগীর জন্য।

"তুমি কি শুধুই ছবি ?"

কুমারী অজন্তা কর

★

"তুমি কি শুধুই ছবি, পটে লিখা !"

ছবি ! শুধুই ছবি ! ভাষাহীন মূক মুখরতায় মূর্ত নিষ্প্রাণ ছবি ! তা'রি মাঝে লুকিয়ে আছে কত শিল্পীর কলাকুশলী, ভাবুক মনের পরিচয়, কত দরদীর অন্তরের গোপন কথা !...ভাষা নেই, চাঞ্চল্য নেই, তবু তা'র মাঝে জেগে আছে কত প্রেরণা, কত সম্ভাবনা !......

যখন ছোট ছিলাম, এই ছবিই তখন ছিল আমার কাছে এক পরম বিস্ময়ের বিষয় ; ভাব্‌তাম, কেমন করে এর জন্ম হ'ল, কোন অনাগতের ইংগিত নিয়ে ধরণীর পারিপার্শ্বিকতায় এ চোখ মেল্‌ল ! ভেবে কূল পেতাম না ! এমনি করে কেটে গেছে কত দিনের পর দিন ! ছবির বিস্ময় তবু আমার মন থেকে বিস্ময়ের ছবিকে অপসারিত কর্‌তে পারেনি !......

তা'রপর একদিন যখন শুন্‌লাম যে পৃথিবীর যে কোনও দৃশ্যমান ব্যক্তি বা বস্তুর নিখুঁত ছবি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এক অদ্ভুত যন্ত্রের সাহায্যে সুস্পষ্ট ভাবে অংকিত হ'য়ে যায়, তখন কৌতূহল আর বিস্ময় যেন একে অন্যের সংগে প্রতিযোগিতা করে বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল ! 'ক্যামেরা' তখন আমার কাছে ছিল 'আলাদীনের মায়া প্রদীপের' চাইতেও বিস্ময়কর, কারণ আলাদীনের দীপের কথা কেবল বই-এই পড়েছিলাম, 'ক্যামেরার' মাহাত্ম্য কিন্তু নিজের চোখেই দেখ্‌তে পেলাম ! 'বাস্তবতাই যে কল্পমায়া অপেক্ষাও চমকপ্রদ' তা'র চাক্ষুষ প্রমাণ আমার শৈশবেই আমি এমনি করে পেয়েছিলাম।

অতঃপর শৈশবের সীমা অতিক্রম করে যেদিন কৈশোরে পদার্পণ কর্‌লাম, শুন্‌লাম, ছবি শুধু 'পটেই লিখা' নয়, সে নড়ে চড়ে, কথা বলে ! শুন্‌লাম, পশুপক্ষী থেকে মানুষের জীবনের বহু ঘটনাই—যা' এতদিনে গল্পের বইএই লেখা থাকে বলে জান্‌তাম—চলন্ত ও মুখর ছবির আকারে সকলের চোখের সাম্‌নে দেখা দেয় !...সেদিনকার মনের অবস্থা আজ বোঝাতে গেলে হয়তো ভাষা খুঁজে পাব না, শুধু এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হ'বে যে আমার কিশোর মনে সেদিন 'আরব্যোপন্যাসও' ততখানি বৈচিত্র্য আন্‌তে পারেনি ! অবশেষে একদিন নিজের চোখে সেই অদ্ভুত চলন্ত ছায়াছবি দেখ্‌লাম। যতক্ষণ ছবি দেখ্‌ছিলাম, ততক্ষণ মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছি ! তা'রপর যখন ছবি শেষ হ'য়ে গেল, মন্ত্রমুগ্ধের মত মা'র হাত ধরে বেরিয়ে এলাম। মাকে শুধোলাম, "কি নাম, মা, এই ছবিটার ?" মা উত্তর দিলেন, "মুক্তি।"

"আর ঐ যে মেয়েটা - যা'কে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছ্‌ল—ওর নাম কি, মা ?" পুনশ্চ প্রশ্ন করেছিলাম।

মা উত্তর দিয়েছিলেন, "গল্পর নাম চিত্রা, আসল নাম কানন !"
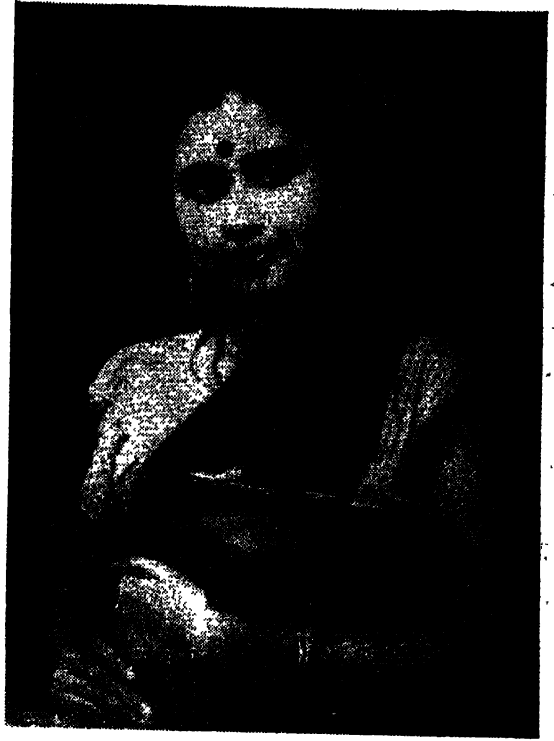
কুমারী অজন্তা কর চিত্র জগতে নবাগতা। বর্তমানে রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওর সংগে চুক্তিবদ্ধা আছেন।

গল্পের নাম, আবার আসল নাম! একজনের আবার এতগুলো নাম থাকে নাকি? বেশ একটুখানি অবাক হ'য়েছিলাম!...আরেকটা প্রশ্ন করেছিলাম, মনে আছে, "হ্যাঁ মা, ঐ লোকটা সত্যি সত্যিই মরে গেল?"

"দূর বোকা মেয়ে, সত্যি সত্যি মরতে যাবে কেন?" মা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "ওতো অভিনয় করল শুধু!"

অভিনয়! অভিনয়! সে আবার কি! তা'তে কি না-মরেও মরার ভাণ করা যায়, তা'তে কি, না-কেঁদেও কাঁদা যায়! একের পর এক প্রশ্ন এসে সেদিন আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা বাবা, কেউ যদি আমারও অমনি করে ছবি তুলে নেয়, তা'হ'লে আমাকে কেমন দেখাবে?"

অভিনয় আর 'ফিল্মে নামা' এ দু'য়ের মধ্যে যে কি যোগাযোগ আছে, তা'রই চিন্তায় আমার কিশোরচিত্ত সেদিন দুলে উঠেছিল! মনে হ'য়েছিল, আচ্ছা, আমিও কি অমনি করে অভিনয় করতে পারি না? অমনি করে আমারও চলন্ত ছবি কি কেউ তুলে নিতে পারে না? আমার হাসি, আমার চোখের জল, আমার কণ্ঠস্বরও কি অমনি করে সকলের বিস্ময় বর্দ্ধন করতে পারে না? এমনি করে মনে মনে রচনা করেছি কত স্বপ্নসৌধ! কত আকাশ কুসুমের স্বপ্ন কতদিন আকাশেই মিলিয়ে গেছে, দুদমনীয় আশা তবু বাধা মানেনি; কেটে গেছে কত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।... ...

তা'রপর কত ছবি দেখেছি, সেই সংগে ছবিতে অংশ গ্রহণের অদম্য ইচ্ছাও মনে মনে পোষণ করে এসেছি! অবশেষে সত্যিই একদিন আমার সেই শৈশবের স্বপ্ন, কৈশোরের স্বপ্ন সাফল্যমণ্ডিত হ'ল। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, "ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সে'এর কর্তৃপক্ষ তাঁ'দের 'গৃহলক্ষ্মী' ছবির জন্যে কয়েকজন শিল্পী চান! মন নতুন আশায় দুলে উঠল! তখখুনি বাবা মার মত নিয়ে দরখাস্ত পেশ করলাম, এবং আমার সেই আবেদন সংগে সংগেই গৃহীত হ'ল। "গৃহলক্ষ্মীর" একটী দৃশ্যে অভিনয় করার জন্যে আমি নির্ব্বাচিত হ'লাম!......

অতঃপর আমার এতদিনকার স্বপ্নের মায়াপুরী 'ষ্টুডিয়োয়' এলাম। মনে হ'ল এ যেন কোন নতুন জগতে প্রবেশ করলাম! আশ্চর্য দৃষ্টিতে দেখলাম, এতদিন যা' শিল্পীর তুলির টানে ছবির রূপ ধরে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠত, সে সবই বুঝি কোন যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে দেখা দিয়েছে!......

ক্রমে সময় হ'ল! এল আমার জীবনের এক পরম স্মরণীয় মুহূর্ত! অপূর্ব্ব সাজ সজ্জা করে সেই মায়াপুরীর মধ্যে প্রবেশ করলাম! 'আর্ক্-ল্যাম্পের' তীব্র আলো মুখে এসে পড়ল, 'ক্যামেরার' মায়াবী চোখ কাছে এগিয়ে এল,—আমার প্রাণবন্ত ছবিও উঠে গেল যাদুমন্ত্রে! শুনলাম, "গৃহলক্ষ্মীর" প্রারম্ভেই আমার ছবি দেখা যাবে।......

এতদিন যার স্বপ্ন দেখতাম, আজ তাই হ'ল আমার জীবনে পরম স্বাভাবিক, দিবালোকের মতই সত্য ও স্বচ্ছ! অভিনেত্রীর জীবনকেই আমি বরণ করে নিলাম।

যখন ছোট ছিলাম, তখন মনে হ'ত, ছায়াচিত্রে অভিনয় করার মত সৌভাগ্য বুঝি আর নেই! আজ কিন্তু চিত্র-জগতের সংস্পর্শে এসে দেখছি, একদিক দিয়ে চিত্রাভি-নেতা ও অভীনেত্রীর জীবন সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ পূত হ'লেও, অন্যদিকে তা' চরম দুর্ভাগ্যের অভিশাপগ্রস্ত! আজ বিস্মিত চোখে দেখছি, যে চিত্র-তারকা স্বকীয় অভিনয়নৈপুণ্যে দিনের পর দিন শত শত দর্শকের চিত্ত-বিনোদন করে, ব্যক্তিগত জীবনে সেই হয় সবার কাছে অপাংক্তেয়! সমাজ তা'কে পক্ষান্তরে পতিত বলেই নির্দ্ধারিত করে; তা'র ব্যক্তিগত জীবন হয় সকলের আলোচনার বিষয়! অবশ্য কয়েক বছর পূর্বেও অভিনেতা—অভিনেত্রীর প্রতি জনসাধারণের যে মনোবৃত্তি ছিল, আজ তা'র অনেকাংশ দূরীভূত হ'য়েছে। তবুও এখনও তা'র পূর্ণ সমাপ্তি ঘটেনি! এখনও কোনও ভদ্রঘরের মেয়ে চিত্রজগতে যোগদান করলে তা'র পরিণতির চিন্তায় অনেকেই শিউরে উঠেন; আজও ভদ্রঘরের শিক্ষিত সন্তান চিত্রজগতকেই তা'র জীবিকানির্বাহের উপায় স্থির করে অভিনেতার জীবনকে বরণ করলে সমাজ তা'কে সন্দেহের চোখে দেখে! এই ধরণের মনোবৃত্তির আজ পরিসমাপ্তির একান্তই প্রয়োজন। কারণ, আজ সকলেরই

চিন্তা করে দেখা উচিত যে, এই ছায়াছবির মাঝে জাতির উন্নতির কতখানি সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে!

আজ অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছেন যে, জাতির উন্নতিকল্প ও শিক্ষাবিস্তারে চলচ্চিত্রের সাহায্য অপরিহার্য। আর সেইজন্যে শিক্ষিত, ভদ্রবংশের ছেলে-মেয়েদের চিত্রে যোগদানও অবশ্যম্ভাবী!

আমি যদিও চিত্রজগতে নবাগতা, তবুও আজ আমার মানশ্চক্ষের সামনে ফুটে উঠ্ছে চলচ্চিত্রের ভাবী উন্নতির এক অপূর্ব, অনাগত ইতিহাসের অনবদ্য প্রতিচ্ছবি! আমি আজ স্বপ্ন দেখ্ছি সেই দিনের, যেদিন আমাদের সমাজ তা'র উন্নতির এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে 'ছায়াচিত্রকেও' স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে; যেদিন দেশের শিক্ষাবিস্তারে কেবল নিষ্প্রাণ পুঁথির সাহায্যই নেওয়া হবে না, ছায়াচিত্রকেও সেখানে প্রধান স্থান দেওয়া হবে; যেদিন কিশোর কিশোরীদের উপযোগী শিক্ষামূলক ছবি তোলা হ'বে, যেদিন কেবলমাত্র নিছক প্রেমকাহিনীই নয়, নতুন ধরণের উদ্দেশ্যমূলক কাহিনীই হবে 'ছায়াছবির' প্রাণ; যেদিন ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা নিঃসংশয়ে চিত্রজগতে যোগ দিতে পারবে এবং চিত্রজগতে যোগ দেওয়া যেদিন আর দোষণীয় বলে গণ্য হ'বে না!—সেদিন এই ছায়াচিত্রই হবে জাতির মঙ্গল ও অগ্রগতির প্রধান সহায়; প্রত্যেকটী শিল্পীর মনে সেদিন জাগরূক থাকবে নতুন আদর্শ; চিত্রজগতের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সেদিন দুর্নীতির বিষবাষ্প মুক্ত হবে; আসবে এক নতুন দিন! কতদূরে সেদিন? কবে আসবে সেদিন?

সিনে প্রডিউসার্সের 'মাতৃহারা' চিত্রে পূর্ণিমা ও প্রমীলা

জানিনা। তবে, এ আমার বিশ্বাস যে, সেদিন আগতপ্রায়! আমি জানি, আমার এ স্বপ্ন মরুমায়ার মত মিথ্যা নয়। আমি জানি, চিত্রজগতের উপর হ'তে এই কুহেলিকার আবরণ অচিরেই সরে যাবে এবং নবীন সম্ভাবনার নবারুণ আলোকে তা'র দিঙমণ্ডল আচ্ছন্ন হ'য়ে যাবে! ছবি সেদিন নিছক ছবিই থাকবে না! কবির ভাষায় সেদিন আমরা যথার্থই বলতে পারব:—

"নহ তুমি ছবি! নহ শুধু পটে লিখা!"

চিত্র-সংবাদ ও নানাকথা

ফিল্মিস্তান লিঃ (বম্বে)

ফিল্মিস্তান লিঃ এর শিকারী চিত্রখানি বম্বের রক্সী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন স্তাভক ভাচ্চা। কাহিনী রচনা করেছেন জ্ঞান মুখার্জী এবং এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন, অশোক কুমার, রমা শুক্লা, ভি, এইচ, দেশাই, বীরা, প্যারো, লীলা মিশ্র প্রভৃতি। এই চিত্রে দু'জন নবাগতার সংগে আমাদের পরিচয় হবে--তাঁরা হচ্ছেন শ্রীমতী বীরা ও প্যারো। শ্রীমতী বীরা শিকারীতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন বলে বম্বের এক সংবাদে প্রকাশ। শ্রীমতী বীরার ইন্দোরের এক পারসী পরিবারে জন্ম। সম্প্রতি মহসিন আবদুল্লার সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হ'য়েছেন। শ্রীযুক্ত শচীন দেববর্মন শিকারীর সুর সংযোজনা করেছেন।

এদের পরবর্তী চিত্র 'সফরে' শ্রীমতী শোভা ও কানু রায়কে দেখা যাবে। মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা দেশ নেতা স্বর্গত লোকমান্য তিলকের জীবনী অবলম্বনে ফিল্মিস্তান একখানি চিত্র তুলবেন। এবং এদের পাঁচ নম্বর প্রডাকসনের—সম্ভবতঃ লোকমান্য তিলকের প্রযোজনার ভার থাকবে শ্রীযুক্ত অশোককুমারের ওপর।

পরলোকে কমলা চ্যাটার্জী

বম্বের খ্যাতনামা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী কমলা চ্যাটার্জী গত ১০ই জানুয়ারী হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে মারা গেছেন। বিভিন্ন হিন্দি চিত্রে অভিনয় করে—নৃত্য, সংগীত এবং অভিনয় চাপল্যে শ্রীমতী কমলা দর্শকসাধারণকে এতদিন আনন্দ পরিবেশন করে এসেছেন। রঞ্জিৎ মুভিটোনের বহু চিত্রে তাঁর সংগে আমাদের সাক্ষাৎ হ'য়েছে। তান্‌সেন, শঙ্কর পার্বতী প্রভৃতি প্রত্যেকে চিত্রেই কমলা নিজের প্রতিভায় দর্শকসাধারণের অন্তর জয় করতে সমর্থা হ'য়েছিলেন। কিছুদিন পূর্বে চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত কেদার শর্মার সংগে কমলা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন।

স্বর্গতা কমলা চাটার্জি

ব্যক্তিগত এবং অভিনেত্রী জীবনের কত সম্ভাধনাই না পরিপূর্ণতা লাভ করবার পূর্বেই—শ্রীমতী কমলার জীবনদীপ নিবাপিত হ'লো। ভারতীয় চিত্র জগতে একদিন যে তরুণী অভিনেত্রীটী—প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন—মৃত্যুর হিম শীতল স্পর্শে তার অকস্মাৎ অন্তর্ধান যে চিত্রজগতের অনেক ক্ষতি করলো, আশাকরি প্রত্যেক দর্শকই তা অন্তরে অন্তরে অনুভব করবেন। আমরা বাঙ্গালী দর্শক সমাজ ও রূপ-মঞ্চ পাঠকগোষ্ঠীর তরফ থেকে শ্রীমতী কমলার অকস্মাৎ মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করছি।

অমর পিকচার্স (বম্বে)

বম্বের খ্যাতনামা চিত্র সাংবাদিক শ্রীযুক্ত বাবুরাও প্যাটেল অমর পিকচার্সের হ'য়ে 'গোয়ালা' (Gvalan) নামে একখানা চিত্র পরিচালনা করছেন। 'দ্রৌপদীর' পর বাবুরাও প্যাটেলের এই দ্বিতীয় চিত্র। চিত্রের কাজ অনেকদূর অগ্রসর হ'য়েছে। বাংলার খ্যাতনামা মঞ্চাভিনেতা শ্রীযুক্ত বিপিন গুপ্ত গোয়ালা চিত্রে একটী বিশেষ চরিত্রে

ঝরা ফুল চিত্রে দেবীপ্রসাদ

অভিনয় করছেন। শ্রীমতী সুশীলারাণী নায়িকার চরিত্রকে রূপায়িত করে তুলছেন।

মুরলী পিকচার্স (বম্বে)

প্রযোজক পরিচালক শ্রীযুক্ত মোহন সিংহ 'ওমর খৈয়াম' চিত্রখানি প্রায় শেষ করে এনেছেন। চিত্রের উপযোগী কাহিনী রচনা করেছেন ডাঃ সফদর আ। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সায়গল, সুরাইয়া, ওয়াস্তি, লীলা, বেঞ্জামিন, সাকীর প্রভৃতি। মুরলী পিকচার্সের পরবর্তী চিত্রের কহিনী গড়ে উঠবে ১৮৫৭ খৃঃ কে কেন্দ্র করে। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ১৮৫৭ খৃঃ ভারতীয়দের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি স্মরণীয় বছর হ'য়ে আছে।

মুরলী মুভিটোন (বম্বে)

পরিচালক রাম দরিয়ানী তার 'শ্রাবণকুমার' চিত্রের কাজ শেষ করে এনেছেন। অবশ্য কয়দিনের ভিতরই চিত্রখানি স্থানীয় কোন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। শ্রাবণকুমারের বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, কে, সি, দে, মেনকা, চন্দ্রমোহন, মমতাজ শান্তি, গুলাব, তারাবাঈ, রাজরাণী, প্রভৃতি। শ্রাবণকুমারের কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কে, এস, দরিয়ানী।

দীন পিকচার্স (বম্বে)

'জগবিথী' নামে দীন পিকচার্সের সামাজিক চিত্রখানির পরিচালনা করছেন মিঃ এম সাদীক। চিত্রখানির সংগীত পরিচালনা করছেন মিঃ গোলাম হায়দার। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন—সুরাইয়া, সাদীক আলী, সুলোচনা চ্যাটার্জি, প্রভৃতি। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন মিঃ আগাজানি কাশ্মিরী।

দুর্গা পিকচার্স (বম্বে)

পরিচালক ফণী মজুমদার তাঁর সংগীতমুখর চিত্র 'দূর চলের' কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে 'দূর চলে'র সংগীত পরিচালনা করেছেন। নাসিম (ছোট'), দময়ন্তী, রাজকুমারী, বলরাজ, আগাজান, ডেভিড, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি দূর চলের বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন।

প্রফুল্ল পিকচার্স (বম্বে)

প্রযোজক পরিচালক কে, ভিনায়ক তার পৌরাণিক চিত্র সুভদ্রার কাজ শেষ করে এনেছেন। এদের পরবর্তী সামাজিক চিত্র 'বাজারের' কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। সুভদ্রার বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন শান্তা আপ্তে, ঈশ্বরলাল, ইয়াকুব, মীনাক্ষী, শান্তারীন, লতা, সালভি এবং প্রেম আদিব প্রভৃতি।

ওঁ পিকচার্স (বম্বে)

এদের সামাজিক চিত্র 'ব্রীজ'-এর কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত সুধীর সেন। সংগীতাংশের ভার গ্রহণ করেছন মিন্টু মজুমদার, রাজলক্ষ্মী পিকচার্স চিত্রখানির তত্ত্বাবধান করছেন। এর বিভিন্নাংশে দেখা যাবে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বলরাজ মেহ্‌তা, ই, বিলমোরিয়া, বিক্রম কাপুর, মদন পুরী, জাহানারা, মণি চ্যাটার্জি, প্রীতি মজুমদার ও অনেককে। রেহানা বলে একজন নবাগতা এই চিত্রে দর্শকসাধারণকে অভিবাদন জানাবেন।

স্টাণ্ডার্ড পিকচার্স (বম্বে)

জী, জাগীরদার স্টাণ্ডার্ড পিকচার্সের বিরাট ঐতিহাসিক চিত্র' 'বৈরম খাঁ'র কাজ সুনিপুণ ভাবে এগিয়ে নিয়ে

চলেছেন। প্রযোজক এম, চাভেওয়ালা বৈরাম খাঁকে একখানি সার্থক চিত্র করতে পরিশ্রম এবং অর্থ কিছুরই কার্পণ্য করছেন না। বৈরাম খাঁর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কমল আমরাহী। সংগীত পরিচালনা করছেন গোলাম হায়দর এবং এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন, জাগীরদার, মেহতাব, ডেভিড, সাদিকালী, শানওয়াজ, মুনলিনী, লতিকা প্রভৃতি।

রমনিক প্রডাকসন্স (বম্বে)

প্রযোজক মজহর খাঁ তার 'মায়া' চিত্রের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন আশরফ মুরী। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন মজহর খাঁ, মুনায়ের সুলতানা, আনওয়ার, আসরফ খাঁ, সাজ্জাদী, সিরাজ প্রভৃতি। এদের অপর আর একখানি চিত্র 'সোনা'র পরিচালনা করবেন মজহর খাঁ নিজে। সোনার কাহিনী লিখেছেন চিত্র পরিচালক মিঃ চৌধুরী।

হিন্দুস্থান চিত্র (বম্বে)

প্রযোজক কিশোর সাহু বীর কুনালের কৃতকার্যতায় একসংগে দু'খানি সামাজিক চিত্রের কাজ আরম্ভ করেছেন। শ্রীযুক্ত সাহুর মতে তাঁর বর্তমানের এই সামাজিক চিত্র দু'খানি 'সিন্দুর' ও 'ছোট ঠাকুর' জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হবে। এর কাহিনী দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

রঞ্জিত মুভিটোন (বম্বে)

রঞ্জিৎ মুভিটোনের 'চাঁদ চক্রী' ও 'প্রভুকা ঘর' বম্বেতে মুক্তিলাভ করেছে। 'প্রভুকা ঘর' চিত্রে খুরশীদ, সুলোচনা, বিপিন গুপ্ত, ত্রিলোক কাপুর প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। পরিচালক চতুর্ভুজ 'ফুলওয়ারী' নামে একখানি সামাজিক চিত্রের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। এই চিত্রে একজন নবাগতার সন্ধান পাওয়া যাবে। পরিচালক আসপী 'রাজপুতানী'র কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন—জয়রাজ এবং বীণাকে এই চিত্রে দেখা যাবে। পরিচালক মণিভাই ভাসও 'ধাত্রী' চিত্রখানিকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছেন। ধাত্রী চিত্রে ত্রিলোক কাপুর, ও মমতাজ শান্তি অভিনয় করছেন।

ঝরা ফুল চিত্রে অজিত মুখার্জি

প্রশান্ত প্রডাকসন্স (কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন কুণ্ডুর প্রযোজনায় প্রশান্ত প্রডাকসন্সের প্রথম সামাজিক চিত্র 'রক্তরাখী' শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত হবে।

চিত্রবাণী লিঃ (কলিকাতা)

সম্প্রতি চিত্রবাণী লিঃ এর আগতপ্রায় চিত্র 'এইতো জীবন' এর ছবি তোলার কাজে কলকাতার একটি অন্যতম বৃহৎ কারখানায় জহর গাঙ্গুলী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ, পরিচালক, আলোক চিত্রশিল্পী ও অন্যান্য কর্মীদের দেখা গিয়েছিল। 'এইতো জীবন' এর চিত্র গ্রহণের কাজে সমাপ্ত হয়েছে। আলোক চিত্র, শব্দগ্রহণ, প্রযোজনা, পরিচালনা ও অভিনয় সর্ববিষয়ে চিত্রখানি বৈশিষ্ট্যের ছাপ নিয়ে দর্শকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে বলে প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত, এস, চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন। চিত্রখানি এখন সম্পাদকের ঘরে। শীঘ্রই স্থানীয় কোন বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির অপেক্ষায় চিত্রখানি দিন গুনছে।

এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্স লিঃ (কলিকাতা)

সুপ্রসিদ্ধ চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান এসোসিয়েটেড ডিস-ট্রিবিউটার্স প্রযোজনা ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছেন। এদের

প্রযোজনায় প্রথম বাংলা চিত্র 'মন্দির' এর মহরৎ উৎসব রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। মন্দিরের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস ও চন্দ্রাবতী। দারিদ্র পীড়িত সমাজ জীবনের পট ভূমিকায় মন্দিরের কাহিনী রচনা করেছেন খ্যাতনামা গীতিকার শ্রীযুক্ত প্রণব রায়। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত ফণী বর্মা।

ইউনিটি ফিল্ম এক্সচেঞ্জ (কলিকাতা)

ইউনিটি ফিল্ম এক্সচেঞ্জ সম্প্রতি বাংলা চিত্র প্রযোজনায় হস্তক্ষেপ করেছেন। এদের প্রথম চিত্র 'প্রিয়তমা' খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গৃহীত হবে। 'প্রিয়তমা'র কাহিনী রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। চিত্র পরিচালক হিসাবে পশুপতিবাবু বাঙ্গালী দর্শক-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হ'য়েছেন—চিত্র সাংবাদিক রূপেও ইনি কম খ্যাতি অর্জন করেন নি। আমরা শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের বর্তমান চিত্রের সাফল্য কামনা করি।

এই তো জীবন চিত্রে শ্যামলাহা ও সুনন্দা দেবী

ছায়া নট পিকচার্স (কলিকাতা)

নব নির্মিত ছায়া নট পিকচার্সের বাংলা চিত্র 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া'র মহরৎ উৎসব ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্রখানির সম্পর্কে আর কোন বিশদ বিবরণ আমরা জানতে পারিনি।

জগবিথী চিত্রে সুলোচনা চ্যাটার্জী

নিউসেঞ্চুরী (কলিকাতা)

নিউ সেঞ্চুরীর বর্তমান বাংলা চিত্র 'রায়চৌধুরী'র কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 'রায়চৌধুরীর' কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ হালদার, কুমার মিত্র, হারাধন প্রভৃতিকে নিয়ে একটা আদালতের দৃশ্য গ্রহণ করা হ'য়েছে। এই দৃশ্য গ্রহণের সময় দৃশ্যপটে উপস্থিত সকলেই বেশ হাস্য-কৌতুক উপভোগ করেছিলেন।

অঞ্জলি পিকচার্স (কলিকাতা)

অঞ্জলি পিকচার্সের 'ঝরাফুল' চিত্রের কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এগিয়ে চলেছে। ঝরাফুলের কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত রঞ্জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এবং এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন সুধা মুখার্জি, অজিত মুখার্জি, দেবী প্রসাদ, অহীন্দ্র চৌধুরী, রমলা দেশাই প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। শ্রীমতী মনিকা গাঙ্গুলীরও ঝরা ফুলে অভিনয় করবার কথা ছিল। সম্ভবতঃ মনিকা পড়াশুনার জন্য কিছুদিন অভিনয় থেকে অবসর গ্রহণ করবে এবং তার ভূমিকায় দেখা যাবে শ্রীমতী রমলা দেশাইকে। শ্রীমতী রমলা—লীলা দেশাই ও মনিকা দেশাইর ভগ্নী।

রূপছায়া লিঃ (কলিকাতা)

চলচ্চিত্র যে নিছক বিলাসের উপকরণ নয়—এর আদর্শ যে মহান এবং এর দ্বারা যে মহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে—তা দেশীয় চিত্রশিল্পপতিগণ অনুধাবন করতে পারেন না বলেই অদ্যাবধি আমাদের দেশে শিক্ষামূলক বাণীচিত্র তৈরী হয় নি। চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়ে যে দেশের ও দশের বহুবিধ সুকার্য ও উন্নতি সাধন করা যায় তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। শিক্ষা-আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে নবগঠিত 'রূপছায়া লিমিটেড' এর কর্তৃপক্ষ 'জ্ঞানের আলোক' নামক একখানি পূর্ণাংগ শিক্ষামূলক কথাছবি নির্মাণ করছেন। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত অলোক নাথ বাগচী। রূপছায়া লিঃ এর এই আদর্শ যাতে প্রথমেই ম্লান হ'য়ে না পড়ে তাই আমরা কামনা কচ্ছি।

মডার্ণ টকীজ (কলিকাতা)

মডার্ণ টকীজের বাংলাচিত্র 'সংগ্রাম' এস্ কে প্রডাকসন্সের পরিবেশনায় মুক্তির দিন গুনছে। সংগ্রামের কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্য। জাতীয় জীবনের পটভূমিকায় শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের সংগ্রাম—জাতির রাজনৈতিক বন্ধন-মুক্তির ইংগিত দেবে বলেই প্রকাশ। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের জাতীয় আন্দোলনের সংগে রয়েছে নিবিড় যোগাযোগ। বাস্তব জীবনে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সাহিত্যিক জীবনে তাই তাঁকে যশ ও খ্যাতি এনে দিতে সমর্থ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন পরিচালক নিজে, ছবি বিশ্বাস, মলিনা দেবী, কমল মিত্র, জীবেন বসু, সন্ধ্যারাণী, প্রভৃতি আরও বহু খ্যাতনামা শিল্পী বৃন্দ। চিত্রের সুর-সংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত নিতাই মতিলাল। আমরা 'সংগ্রামের' মুক্তির জন্য অধীর প্রতীক্ষায় আছি।

রূপ-মঞ্চ

এম, পি, প্রডাকসন্স (কলিকাতা)

পরিচালক শ্রীযুত সুকুমার দাশগুপ্ত এম, পি প্রডাকসন্সের সাত নম্বর বাড়ীর কাজ শেষ করে ফেলেছেন। চিত্রখানি মুক্তির অপেক্ষায়। আগামী সংখ্যায় হয়ত সাতনম্বর বাড়ীর সমালোচনা করবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

পরিচালক শ্রীযুক্ত অপূর্ব মিত্রের পরিচালনায় এদের দ্বোভাষী চিত্র 'তুমি আর আমি', কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 'তুমি আর আমি' চিত্রে শ্রীমতী কাননকে এক অভিনব রূপসজ্জায় দেখা যাবে। 'তুমি আর আমি'র কাহিনী রচনা করেছেন কবি শৈলেন রায়।

এস, ডি প্রডাকসন্স (কলিকাতা)

এস, ডি, প্রডাকসন্সের হিন্দি চিত্র 'ও দোনো' বীরেন্দ্র দেশাইর পরিচালনায় রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে। এই চিত্রে রবীন মজুমদার ও চঞ্চলা অভিনেত্রী নলিনী জয়ন্তকে নায়ক নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে।

নিউথিয়েটার্স লিঃ (কলিকাতা)

খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নিউথিয়েটার্সের দ্বোভাষী চিত্র সমাজচ্যুত (Outcast) এর পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন। মানুষের জীবনে প্রেম বড় না সমাজ বড় এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে সমাজচ্যুতের কাহিনী গড়ে উঠেছে বলে প্রকাশ। সমাজচ্যুতের বিভিন্নাংশে দেখা যাবে অসিতচরণ, ভারতী, সুমিত্রা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতিকে।

শ্রীযুক্ত সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় নার্স সিসির (বাংলা) চিত্রগ্রহণ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক পরিচালিত শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' চিত্র রূপায়িত (বাংলা) হ'য়ে মুক্তির অপেক্ষায় আছে। 'মাইসিস্টার' হিন্দি চিত্র নিউ সিনেমা, চিত্রা, রূপালী এবং চিত্রলেখায় সম্ভবত শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

নবীন পরিচালক শ্রীযুক্ত সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' হিন্দী চিত্ররূপ ওয়াশীয়াৎনামার চিত্রগ্রহনের কাজও শেষ হ'য়েছে বলে প্রকাশ।

সুবর্ণভূমি চিত্রে স্বর্ণলতা

ডি, জি পিকচার্স (কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রযোজিত ডি, জি, পিকচার্সের বাংলা চিত্র 'শৃঙ্খল' এর ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে চিত্রগ্রহনের কাজ আরম্ভ হ'য়েছে। শৃঙ্খলের কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পাঠক সাধারণের স্মরণ থাকতে পারে, নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের শৃঙ্খল নামে একটী কাহিনীর চিত্ররূপ দেবেন বলে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন ইতিপূর্বে। বর্তমান চিত্রটী শৈলজানন্দের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে। এবিষয়ে পাঠক সাধারণ যেন ভুল না করেন।

ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্স (কলিকাতা)

জনপ্রিয় চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত নীরেন লাহিড়ী গলফক্লাব রোডে উক্ত নামে নিজস্ব একটী চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সংগে যোগাযোগ রেখে চিত্র নির্মাণই হবে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।

রূপশ্রী লিঃ (কলিকাতা)

খ্যাতনামা চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠান রূপশ্রী লিঃ সম্প্রতি ৪১, ঝাউতলা রোড়ে নিজেদের একটী ষ্টুডিও স্থাপনা করেছেন। ইতিমধ্যে এই ষ্টুডিওতে স্বপনপুরী

প্রডাকসন্স এর 'চোরাবালি' , মহালক্ষ্মী প্রডাকসন্সের 'মহাসম্পদ' নামক দু'খানি চিত্রের মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। দু'খানি চিত্রই পরিচালনা করবেন শ্রীযুত তুলসী লাহিড়ী। ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে চিত্র দু'খানি নির্মিত হবে।

রূপশ্রীর পরবর্তী ছবির পরিচালনা করবেন 'মৌচাকে ঢিল' খ্যাত পরিচালক শ্রীযুত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ। কর্তৃপক্ষ বর্তমানে কাহিনী নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত আছেন। বাংলার যশস্বী সাহিত্যিকদের সংগে কাহিনী নিয়ে তাঁরা বর্তমানে আলাপ আলোচনা করছেন।

শুভা প্রডাকসন্স (কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত শশধর দত্তের কাহিনী অবলম্বনে নবনির্মিত শুভা প্রডাকসন্সের প্রথম বাংলা চিত্র 'যুগের দাবী'র কাহিনী গড়ে উঠেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুত সত্যেন দত্ত। সংগীত পরিচালনা করবেন শ্রীযুত শৈলেশ দত্ত গুপ্ত এবং এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন—জহর গাঙ্গুলী, পান্না দেবী, প্রমোদ, নীতীশ, সুশীল, বেচুসিং, জ্যোৎস্না, অমিতা, শান্তি, সবিতা, পঞ্চানন প্রভৃতি। স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত অমলকুমার দাস চিত্রখানিকে সার্থক করে তুলতে পূর্বে থেকেই সচেতন হ'য়ে উঠছেন।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন (কলিকাতা)

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন প্রযোজিত বাংলা চিত্র 'পথের সাথী' ১লা মার্চ শ্রী ও উজ্জ্বলা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। পথের সাথীর কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুত নরেশ মিত্র। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, সন্ধ্যারাণী প্রভৃতি। আগামী সংখ্যায় 'পথের সাথীর' সমালোচনা প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের পরবর্তী চিত্র সম্ভবতঃ শ্রীযুত নিতাই ভট্টাচার্যের একটী কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। শ্রীযুত প্রবোধ সরকার সম্প্রতি সহকারী পরিচালকরূপে অরোরা ফিল্মে যোগদান করেছেন।

বাসন্তী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স (কলিকাতা)

অঞ্জলী পিকচার্সের 'ঝরা ফুল' চিত্রখানি বাসন্তী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় প্রদর্শিত হবে। এদের পরিবেশনায় অপর আর একখানি চিত্র আমরা দেখতে পাবো। চিত্রখানি কবিকঙ্কণ রামপ্রসাদের জীবনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। রামপ্রসাদের চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুত দেবনারায়ণ গুপ্ত। এবং অভিনয়াংশে সুধা মুখার্জি ও রমলা দেশাইকে দেখা যাবে।

পরিচালক সাদিকের জগবিথী (হিন্দি) চিত্রখানির পরিবেশনা স্বত্বও এরা লাভ করেছেন। এর বিভিন্নাংশে সুরাইয়া, সাদিক আলি, সাকির ও সুলোচনা চ্যাটার্জিকে দেখা যাবে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রডাকসন্স (কলিকাতা)

শ্রীযুত নরেশ মিত্র মহাশয়ের পরিচালনায় 'ভারতবর্ষে'র অন্যতম সহ-সম্পাদক শ্রীযুত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বয়ংসিদ্ধা' উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে এরা অগ্রসর হ'য়েছেন। 'স্বয়ংসিদ্ধা'র নায়িকার ভূমিকায় একজন নবাগতা শিক্ষিতা তরুণীকে দেখা যাবে। গুহস ষ্টুডিওর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত মনি গুহ চিত্রখানির প্রযোজনা করছেন।

গুহস স্টুডিও (কলিকাতা)

রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত চিত্রতারকাদের চিত্র গ্রহণ করে গুহস ষ্টুডিও আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন। এর অন্যতম চিত্রশিল্পী শ্রীযুত অধীর বসু (যদুবাবু) প্রত্যেক খানি চিত্রগ্রহণেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া

শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে একখানি বাংলা চিত্রের কাজ আরম্ভ হ'য়েছে। চিত্রখানির নামানুকরণ হ'য়েছে 'অভিমান'—এর কাহিনী শ্রীযুত বড়ুয়াই রচনা করেছেন। অভিমান সম্পর্কে বিস্তারীত সংবাদ আগামী সংখ্যায় দিতে পারবো বলে আশা করি। শ্রীযুত বড়ুয়া রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে—আরও একখানি দোভাষী চিত্রের পরিচালনা করেছেন। সে সম্পর্কেও বিস্তারীত সংবাদ প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল। তাছাড়া

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে নিউ মহারাষ্ট্র পিকচার্স প্রযোজিত 'ইয়াদ-কী-একরাত' চিত্রখানিও শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। এর বিভিন্নাংশে দেখা যাবে বড়ুয়া, নারাং, নীলা নাগিনী, চন্দ্রাবতী প্রভৃতিকে।

ষ্টার নাট্য-মঞ্চে 'শতবর্ষ আগে' নাটকের পঞ্চাশৎ অভিনয়োৎসব

ষ্টার নাট্য-মঞ্চে শ্রীযুত মহেন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'শতবর্ষ আগে', নাটকের পঞ্চাশৎ অভিনয়োৎসবে আমরা উপস্থিত ছিলাম। প্রতি নাটকের সময়ই কর্তৃপক্ষ এরূপ উৎসবের আয়োজন করে শিল্পী ও কর্মীদের পুরস্কার বিতরণ করে উৎসাহিত করে থাকেন। সেদিনকার উৎসবে পৌরহিত্য করেন অধ্যাপক মন্মথ বসু। পুরস্কার বিতরণ করেন ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। শ্রীযুত রাম চৌধুরী, অশোকনাথ শাস্ত্রী, কালীশ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেকে এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। উৎসবান্তে 'শতবর্ষ আগে' নাটকের অভিনয় হয় এবং কর্তৃপক্ষ অভ্যাগতদের জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

সিনে প্রডিউসর্সের 'মাতৃহারা'

সিনে প্রডিউসর্সের বাংলা সামাজিক চিত্র 'মাতৃহারা'র চিত্রগ্রহণ গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমাপ্ত হয়ে মুক্তি প্রতীক্ষায় আছে। জহর, মলিনা, কমল মিত্র, প্রভা, পূর্ণিমা, প্রমিলা, সন্তোষ সিংহ, বেচু, কানু, ফণী রায়, শচীন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির অভিনয়ে, বিধায়কের সংলাপে, শচীন্দ্র দেব বর্মনের সুরযোজনায় ছবিখানি সামাজিক চিত্রের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আনতে পারবে আশা করা যায়।

ন্যাশনাল ফিল্মস্ অফ ইণ্ডিয়া

কলকাতার নবতম চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম ন্যাশনাল ফিল্মস্ অফ ইণ্ডিয়া বিধায়কের নাটক 'বিশ বছর আগে'র হিন্দী ও বাংলা চিত্র রূপ দান করবে বলে ঘোষণা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ষ্টুডিও ব্যারাকপুর অঞ্চলে নির্মাণ আরম্ভ হয়েছে। ছবিখানি পরিচালনা করবেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন ভূমিকার জন্য ভারতের বহু নামকরা শিল্পীর সংগে চুক্তি করা হয়েছে। প্রযোজক মঙ্গল চক্রবর্তীর এই উদ্যমের আমরা সাফল্য কামনা করি।

ক্যালকাটা আর্ট প্রডিউসার্স লিঃ

ক্যালকাটা আর্ট প্রডিউসার্স লিমিটেড তাহাদের প্রথম চিত্রের নাম দিয়েছেন 'অঞ্জলি'। জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অভিযানকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। কাহিনী লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। বাংলা ছায়াচিত্রের গতানুগতিক ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহাস করতে কর্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।

নবগঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি ও তাহাদের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

ছবির ভাল মন্দ বিচারের ভার থাকবে দর্শকসাধারণের উপর।

বালী ইন্সটিটিউট (বালী)

বালী ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীপঞ্চমীর দিন বিকালে রূপ-মঞ্চ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নেতাজী উৎসব ও চতুর্থ বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিভাগে বহু প্রতিযোগী যোগদান করেন। সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট নজরুলের সব্যসাচী কবিতায় সুবোধ মুখোপাধ্যায় ও নবকুমার চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট নজরুলের ছাত্রদলের গান কবিতায় সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ও অলোক চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতায় রেখা ঘোষ প্রথম এবং শান্তি ঘোষ, রমা দাশ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেফালিকা সেনগুপ্তা প্রত্যেকেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট নজরুলের 'কুলি মজুর' কবিতায় সন্ধ্যা মান্না প্রথম ও সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই আবৃত্তি প্রতিযোগীতায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী দক্ষতার পরিচয় দেন।

নেতাজী উৎসব উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের অন্যতম সভ্য

শ্রীযুক্ত নির্মল রায় রচিত নেতাজী 'আবাহন গীতি' সভ্যগণ কর্তৃক গীত হয়।

নেতাজী আবাহন গীত

ভারত-জন-অধিনায়ক তুমি হে বিদ্রোহী বিপ্লবী নেতা!
হিন্দু মুসলমান, শিখদল খৃষ্টান,
সব প্রাণে জ্বালিয়াছ অগ্নি;
ভেদাভেদ নাহি আর, ধরিয়াছি তরবার
মিলিয়াছে ভ্রাতা সাথে ভগ্নী;
চল্লিশ কোটী আজি জাগে
তব দরশন শুধু মাগে,
জাগো ভারত-বিধাতা!
গগন পবন ভেদি ওঠে মহাসংগীত, গাহি মোরা
'জয় হিন্দ' গাথা
জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় জয় জয় জয়হিন্দ ॥
বর্মা সিঙ্গাপুরে কোহিমা আন্দামানে
স্থাপিয়াছ তব জয়স্তম্ভ;
'দিল্লী চলো' রবে আজাদী ফৌজ তব
ভাঙ্গিয়াছে বৈরীর দম্ভ;
মিলিয়াছে অপরূপ মিলন,
শানওয়াজ সাইগল, ধীলন
দানব-শক্তি বিজেতা;
গগন পবন ভেদি ওঠে মহাসঙ্গীত গাহি মোরা
জয় হিন্দ গাথা
জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় জয় জয় জয়হিন্দ ॥
আজি তব চরণে অর্ঘ লও হে বীর!
আমাদের রক্তের বিন্দু
তব নব স্বপ্নে রচিয়া তুলিব গো
অনন্ত স্বাধীনতা সিন্ধু;
তব সিংহাসন শূন্য
নেতাজী, করো তাহা পূর্ণ
ডাকিছে ভারত মাতা,
গগন পবন ভেদি ওঠে মহা সংগীত, গাহি মোরা
জয় হিন্দ গাথা।
জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় জয় জয় জয়হিন্দ।

আবাহন সংগীতটী গীত হবার পর উপস্থিত ভদ্রো-মহোদয়গণ নেতাজীর বিভিন্নমুখী প্রতিভা, স্বদেশপ্রেম ও কর্মশক্তি নিয়ে বক্তৃতা করে। সভাপতি তাঁর অভি-ভাষণে নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর কর্মবহুল জীবন ও আত্মত্যাগ দেশবাসীর আদর্শ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। নাট্যকার শ্রীযুক্ত তারাকুমার মুখোপাধ্যায়, ডক্টর দেবব্রত চক্রবর্তী এম, এ পি, এইচ, ডি, বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, এম, এ, শিবপদ ভট্টাচার্য, বি, এ, অলকেশকুমার বড়ুয়া (খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র) ও বালীর বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জয় হিন্দ ধ্বনির মধ্য দিয়ে সভা ভংগ হয়। সভাশেষে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

জলসানুষ্ঠান

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ সেন মহাশয়ের বাগবাজারস্থিত 'ক্ষেত্রধাম' বাড়ীতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে এক জলসা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করে রূপ-মঞ্চ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায়। এই উৎসবে খ্যাতনামা কৌতুকাভিনেতা শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ হালদারের স্কেচগুলি সকলকে তৃপ্ত করে। তাছাড়া কুমারী ভবানী সেনগুপ্তার আধুনিক ও ভাটিয়ালী কণ্ঠসংগীত, কুমারী রেখা বিশ্বাসের কণ্ঠসংগীত এবং শ্রীমতী ছবি বিশ্বাস ও রেখার কয়েকখানা নৃত্য উপস্থিতবৃন্দকে প্রীত করে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ধর, পুষ্পকেতু মণ্ডল, কৌতুকাভিনেতা আশু বসু, অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস ও বাগবাজারস্থিত বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ সেন, ফটিক দত্ত ও শ্রীমান রবীন সেন উপস্থিত অতিথিদের আপ্যায়নে সর্বদা যত্নপর ছিলেন।

আলগী বালিকা বিদ্যালয় (ফরিদপুর)

অন্যান্য বছরের মত এবারো গত সরস্বতী পূজার দিন আলগী বালিকা বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ এক জলসানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গাথানার অধীনস্থ এই গ্রামটী তার

রাজনৈতিক ও কৃষ্টিমূলক ঐতিহ্য নিয়ে সমান ভাবে দাঁড়িয়ে আছে—দুর্ভিক্ষ, মহামারী রাজনৈতিক নির্যাতন কোন কিছুই আলগীর অধিবাসীদের নৈতিক শক্তিকে দমাতে প্পারেনি। আলগীর বহু কৃতি সন্তান আজও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে —তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু মুসলমানের মিলিত কেন্দ্র আলগী স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনেও আশপাশের গ্রামের অগ্রবর্তী। স্থানীয় কর্মীবৃন্দের আপ্রাণ চেষ্টায় আলগী বালিকা বিদ্যালয়টীও দিন দিন উন্নততর হ'য়ে উঠছে। প্রতি বছর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সংগীতানুষ্ঠান ও নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করে গ্রামবাসীদের আনন্দ বিতরণ করে থাকে। এবার বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক রূপমঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী লিখিত মহুয়া নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। মহুয়ার ভূমিকায় কুমারী মলিনা গুহ মল্লিকের অভিনয় শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করে। নদের চাঁদের ভূমিকায় কুমারী মীরা রায়ের অভিনয় হ'য়েছে সর্বাংশে সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত হ'য়েছে। নৃত্য ও সংগীত পরিচালনায় কুমারী সাধনা গুহ মল্লিক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নাট্য পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। নাট্য প্রয়োজনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য। বিদ্যালয়ের উন্নতির মূলে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম গ্রামবাসী শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করে থাকেন। অভিনয় শেষে উপস্থিত মহিলা ও মহোদয়গণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

সুদূর সহর থেকে বাংলার এই গ্রাম—যে গ্রাম বাংলার প্রাণ প্রাচুর্যের অফুরন্ত উৎসব—তার ছাত্রীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা।

শক্তি সংসদ (শিলচর)

গত ১৬ই পৌষ শিলচরস্থিত রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকাদের উদ্যোগে স্থানীয় ওরিয়েণ্টাল টকী প্রেক্ষাগৃহে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্য কল্পে সংগীতানুষ্ঠান ও অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় 'কদম কদম বাড়ায়ে যা'। এই সংগীতটি দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। পাঁচজন মেয়ে—পরণে তাদের ছিল লালপাড় সাড়ী—গায়ে সাদা ব্লাউজ, মাথায় গান্ধীটুপি, হাতে জাতীয় পতাকা—কণ্ঠে সংগীত—হৃদয়ে অপূর্ব উন্মাদনা—সামনে আশা। সংগীতটি গীত হবার পর শ্রীযুক্ত যোগমায়া মুখোপাধ্যায় লিখিত ইন্দ্রানী নামে একটী নাটক অভিনীত হয়। সংগীত পরিচালনা করেন কুমারী হেনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপসজ্জার দায়িত্ব নিয়েছিলেন—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র রায় ও শ্যামকান্ত গাঙ্গুলী। আলোক সজ্জার ভার ছিল শ্রীযুক্ত সুশান্তকুমার চক্রবর্তী ও চিত্তরঞ্জন দাশ গুপ্তের ওপর। মঞ্চাধ্যক্ষরূপে কাজ করেন শ্রীযুক্ত সুশান্তকুমার চক্রবর্তী। স্মারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীযুক্তা সুশীলা দাস, এম এ, ও সুখময় সিংহ। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন যোগমায়া মুখার্জি, উষা দেব, হেনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা চক্রবর্তী; যোগমায়া ভট্টাচার্য, তুলসী ভট্টাচার্য, পূর্ণিমা ভট্টাচার্য, মণিকা দত্ত, বীনা ধর, রমা ব্যানার্জি, উমা দেবী, উমালক্ষ্মী বেলা দত্ত, সন্ধ্যা দাশগুপ্তা, রেণুদাস, প্রভৃতি। নৃত্যাংশে আত্মপ্রকাশ করেন আরতি গুপ্তা, ছবি ও ডলু দেবরায়, বেলা রায়, উপমা ভট্টা, বাসন্তী দেবী, শান্তা সেন, টুকটুক চন্দ প্রভৃতি। উদ্বোধন ও বিদায় সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন মৃণালিনী ভট্টাচার্য, আনন্দময়ী ভট্টাচার্য, পূর্ণিমা ভট্টাচার্য, বাসু দাস, হেনা বন্দ্যো, সবিতা চক্র এবং আরো অনেকে।

"ঊর্দ্ধে তুলিয়া বৈজয়ন্তি, উন্নত রাখি শির
লাঞ্ছিত এই ভারতবর্ষে দাঁড়াবে বন্দী বীর"

সংগীতটী দিয়ে উৎসবটী শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রযোজনার ভার নেন শিলচরস্থিত শক্তি সংসদের সভ্যবৃন্দ। টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থের ৫৯২ টাকার ভিতর ৫৫১ টাকা সরাসরি আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাণ্ডারে (কলিকাতা) প্রদান করা হয়। শক্তি সংসদের সভ্যবৃন্দ—যাদের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটী সাফল্য মণ্ডিত হ'য়েছে, রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকারা—যাঁরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন এবং শিলচরের জনসাধারণ —যাঁরা এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন—তাঁদের সকলকে আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মলঙ্গা বয়েজ এ্যাথলেটিক ক্লাব (কলিকাতা)

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে মলঙ্গা বয়েজ ক্লাবের সভ্যবৃন্দ এক সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন বসু উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। এবং এই অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দে, বিশ্বনাথ মৈত্র, প্রভাস মৈত্র, বেচু দত্ত, সেফালি সেনগুপ্তা প্রভৃতির সংগীত সকলের আনন্দ বর্ধন করে। অনুষ্ঠানটীকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে উক্ত ক্লাবের শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নায়েক, মনিলাল সাহা। বিশ্বনাথ মল্লিক, পান্নালাল সাহা, জ্যোতীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সভ্যবৃন্দ যথেষ্ট পরিশ্রম করেন।

ভারতী বিদ্যাভবন (কলিকাতা)

ভারতী বিদ্যাভবনের ছাত্রীবৃন্দ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে একটী সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায়। নেতাজীর প্রতিকৃতিকে পুষ্প মাল্যে ভূষিত করেন ছাত্রী-আবাসের লেডী সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রীযুক্তা কে, কে, বসু। ছাত্রী আবাসের ছাত্রীবৃন্দ সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন। কুমারী শ্যামলী মুখোপাধ্যায় ও লতিকা গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত অতিথিদের জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

উত্তর কলিকাতা ফাইন এণ্ড কমার্শিয়াল আর্ট একজিবিশন।

কালীকৃষ্ণ লেনস্থিত সবুজ সংঘের উদ্যোগে মহারাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর কে, সি, এস, আইর নাট্য মন্দিরে উত্তর কলিকাতা ফাইন এণ্ড কমার্শিয়াল আর্টের এক প্রদর্শনী হয়। উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ সাহা।

সাঁঝের আসর (কলিকাতা)

গত ১২ই ফাল্গুন রবিবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে রামমোহন লাইব্রেরী হ'লে সাঁঝের আসরের উদ্যোগে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে সংঘের বালক-বালিকাদের দ্বারা মদন-ভস্ম গীতি নাট্য অভিনীত হয়। নাটকটী রচনা করেন শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মিত্র। পরিচালনা করেন বিনয় বসু ও তারাপদ বড়াল। সংগীতাংশের ভার ছিল শ্রীযুক্ত প্রতাপ পালের উপর। নৃত্য পরিকল্পনা করেন শ্রীযুক্ত চিত্ত দাশগুপ্ত। এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করে—শ্রীমান প্রদোষকুমার মিত্র (মহাদেব), ডলি মুখার্জি (নারদ), গোপাল চক্রবর্তী (অগ্নি) প্রশান্ত ঘোষ (বরুণ), শ্যামাপদ বসু (পবন), কৃষ্ণ ব্যানার্জি (ইন্দ্র), সপ্তমী ভৌমিক (মদন), কল্যাণী বসু (উমা), বাসন্তী চক্রবর্তী (বিজয়া), অঞ্জলী বসু (জয়া) নমিতা মজুমদার (রতি), মিনতি সরকার (বাসন্তিকা) অনিমা সাহা (চপলিকা), বাণী বসু (উর্ব্বশী) এবং অন্যান্যাংশে শিপ্রা মিত্র, পুরবী ভৌমিক, বাসন্তী বসু, ঝরণা মজুমদার, লক্ষ্মী ও রমা প্রভৃতি আত্মপ্রকাশ করে। ছোটদের এই অভিনয়টী বেশ উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছিল। এর ভিতর সপ্তমী ভৌমিক, নমিতা মজুমদার, বাণী বসু, ডলি মুখার্জি, কৃষ্ণ ব্যানার্জির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সাঁঝের আসরের সভ্যদের এই আয়োজনকে আমরা প্রশংসাই করবো—তবে ছোটদের দিয়ে ভবিষ্যতে যদি তারা এরূপ নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন—তখন তার বিষয় বস্তুর প্রতি একটু যেন দৃষ্টি দেন—কারণ মদন ভস্মের বিষয় বস্তু মোটেই ছোটদের উপযোগী নয়।

নূতনের অভিযান

জগদীশ শ্যাম

ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাদেশে যুদ্ধের সময় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান সমূহের নির্দ্দিষ্ট একটা গণ্ডীর মধ্যে পরিক্রম করিতে হয়েছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার বাহাদুরের নিয়ন্ত্রণাদেশ উঠে যাওয়ায় আমাদের দেশের চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসা প্রসারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। অনেক নূতন প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবও হচ্ছে। তাঁদের প্রস্তুতির খবর আমরা কাগজে কলমে কিছুদিন আগেই পেয়েছিলাম। নানান খবরের কাগজে অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহার্থে বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় ব্যবসা প্রসারের জন্য তাঁদের শিল্পীরও প্রয়োজন হয়েছে। নূতন অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহের প্রয়োজনীতা উল্লেখ করাই আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

চিত্র ব্যবসায়ের গোড়ার দিকে শোনা যেত পরিচালকগণ অতি দুঃখ করে বলছেন যে অভিনয় করবার জন্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী পাওয়া যায় না কিন্তু আজ নিশ্চয়ই তাঁদের সে দুশ্চিন্তা অনেক পরিমাণে দূর হয়েছে। বর্ত্তমানে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত তরুণ তরুণী সম্প্রদায়ের মধ্যেও চিত্র জগতে প্রবেশ করবার জন্য বেশ একটা সাড়া পড়ে গিয়াছে। কাজেই উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ শিল্পী সংগ্রহার্থে ছাটাইয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কাগজে প্রকাশ করা শুধু একটা নিয়মানুবর্ত্তিতা মাত্র। বিভিন্ন অপিস থেকে যেমন "চাকুরী খালি" বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং প্রকৃতপক্ষে নিয়োগ করা হয় বাবুদের আপনার লোক সেইরূপ চিত্র জগতে প্রবেশ লাভ ব্যাপারেও ঐ অপ্রিয় সত্যের পুণোরোক্তি করতে দ্বিধা বোধ করবো না। এইজন্য প্রত্যেক তরুণ তরুণীর নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী প্রবেশ সম্ভব হয়ে উঠে না। এই ব্যবস্থার ফলে বহু উজ্জ্বল তারকা হয়তো চিত্রজগতের বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

অর্থ উপার্জ্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই চিত্র-শিল্প ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ ব্যবসা ফেঁদেছেন কাজেই তাঁদের দৃষ্টি থাকে অধিকতর অর্থলাভের পথে। এ জন্য বিশেষ করে তাঁরা সহজে নূতন অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিয়োগ করতে সাহস করেন না অথবা ইচ্ছুক নহেন। যে সকল শিল্পী বহুপূর্বে বিভিন্ন চিত্রে অভিনয় দক্ষতা দেখিয়ে দর্শক সাধারণের বাহবা পেয়েছিলেন তাদের নির্বাচনই এক চেটিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে অভিনেতা অথবা অভিনেত্রী হয়তো প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছেন কিন্তু দেখা যায় মেক্‌আপের জোরে তাকে অবলীলাক্রমে অল্পবয়স্ক তরুণ অথবা তরুণীর ভূমিকায় চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবসায় চিত্র প্রতিষ্ঠান সমূহের হয়তো অর্থ সমাগম ভালই হচ্ছে কিন্তু এই নীতি অবলম্বন করার ফলে দেখা যায় যে কোন অভিনেতা অথবা অভিনেত্রী হঠাৎ অবসর গ্রহণ করলে অথবা ইহলোক ত্যাগ করলে তাঁদের পরিবর্ত্তে অনুরূপ ভূমিকার অভিনয় উপযুক্ত শিল্পী পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আমার অনুরোধ চিত্র প্রতিষ্ঠান গুলির কাছে যে তাঁরা যেন সর্বপ্রকার ভূমিকায় অভিনয়ার্থে নূতনের সন্ধান করেন।

এ কথা স্বীকার করা চলে যে বর্ত্তমানে পুরাতন নীতির কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও পুরাতন নীতির অনুগামী। আমার স্মৃতিশক্তি অনুযায়ী ধারণা যে শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়াই নূতন সন্ধানের উদ্যোক্তা। তারপরল ব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নিউ-থিয়েটার্স নূতন শিল্পী সংগ্রহে সাহসী হয়েছেন। নূতনের জয় ঘোষণা করে আমাদের জনপ্রিয় নট রাধামোহন ভট্টাচার্য্য ও অভিনেত্রী সুনন্দাদেবী, সুমিত্রাদেবী প্রভৃতি প্রথম বর্ষেই লোকচিত্ত হরণ করে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। আমাদের চিত্র প্রতিষ্ঠান সমূহের হয়তো ধারণা যে নূতন শিল্পী এসে ভূমিকায় অনুযায়ী অভিনয় করতে সক্ষম হবেন না; কিন্তু তাঁরা যেন স্মরণ রাখেন যে নবাগত হয়েও শ্রীযুত দেবী মুখার্জ্জি "উদয়ের পথে" সৌরেনের ভূমিকায় এবং পরে "ভাবীকাল" চিত্রে শিবনাথের ভূমিকায় যে অভিনয় দক্ষতা দেখিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেরূপ কঠিন চরিত্রে তাঁর সে অভিনয় পুরাতন যে কোনও বহুখ্যাত অভিনেতার সমকক্ষ। দর্শক সাধা-

রণের মধ্যে সন্ধান নিয়েও জানা গেছে যে তাঁরা নূতন মুখ দেখবার জন্য উদ্গ্রীব।

বোম্বাই চিত্র প্রতিষ্ঠান সমূহে বাংলাদেশের বহুপূর্বেই নূতনের সন্ধান ও সংগ্রহ আরম্ভ হয়েছে। চিত্রলোকের স্বপ্নপুরী হলিউডের একখবরে প্রকাশ যে সেখানে প্রতি-বৎসর প্রায় ৮০,০০০ হাজার নরনারী চলচ্চিত্রে অভিনয় প্রয়াসী হয়ে আসেন। প্রতি বৎসর এত নূতন শিল্পী গ্রহণ করা হয় না অথবা অসম্ভব নয় তথাপি হলিউডের দ্বার নূতনের জন্য সদাই উন্মুক্ত। এছাড়া আরেকটি খবরে প্রকাশ যে হলিউডের চিত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ একদল লোক নিয়োগ করেন যারা দেশের সর্বত্র ঘুরে নূতনের সন্ধান করেন। আমাদের দেশে হলিউডের মত শিল্পী সংগ্রহে এত ব্যাপক উদ্যম সম্ভব নয় তথাপি আমাদের চিত্র প্রতিষ্ঠান সমূহের নূতন শিল্পীর প্রবেশলাভের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধার নিঃস্বার্থপর ব্যবস্থা করা উচিত। আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এ নহে যে চিত্র জগতে কেবলমাত্র নূতনের স্থান হোক ও পুরাতন শিল্পীদের ত্যাগ করা হোক। প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য এই যে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো অনেক পুরাতন শিল্পী অবসর গ্রহণ করবেন এবং তাঁদের বর্তমানেই যদি উপযুক্ত অভিনয় করবার জন্য আরেক দল তৈরী না করা হয় তা'হলে আমাদের দেশের চিত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলির তরী সব দিকে কূলহারা হয়ে পড়বে। আমার অতিসামান্য অভিজ্ঞতা ও সম্পূর্ণ ধারণা এখানে উল্লেখ করলাম। পাঠক সাধারণ প্রবন্ধটী ইচ্ছানুযায়ী সমালোচনা করতে পারেন।

প্রঃ গোসেন

যাদুকর গোসেনের নাম সকলের কাছে সুপরিচিত—এর বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া-কৌশল অনেককেই চমক লাগিয়েছে। আমরা এই শিল্পীর দিন দিন প্রসার কামনা করি।

গ্রাহকগণের প্রতি

রূপ-মঞ্চ বর্তমান সংখ্যা থেকে ষষ্ঠ বৎসরে পদার্পণ করলো। ৫ম বর্ষ সমাপ্তির সংগে সংগে যাঁদের বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, তাঁদের বার্ষিক চাঁদা (আট টাকা) পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করছি। অনেক ক্ষেত্রে ভিঃ পি যোগেও কাগজ পাঠানো হয়ে থাকে—সে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়ে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না আশা করি।

বিনীত
পুষ্পকেতু মণ্ডল
কার্যাধ্যক্ষ : রূপ-মঞ্চ

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্য-
কলার সচিত্র মাসিক।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির
মুখপত্র।

কার্যালয়ঃ
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা।
ফোন: বি, বি,: ৪২৯২ / ৫২০৪

প্রতি বাংলা মাসের শেষের দিকে
রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হয়।
বর্তমানে প্রতি সংখ্যার:
মূল্য আট আনা।
সডাক এক বছরের গ্রাহক মূল্য
আট টাকা।
এক বছরের কম কাহাকেও
গ্রাহক করা হয় না।
নূতন লেখকদের উপযুক্ত রচনা
রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হয়।
অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠাবার
দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি না।

—পৃষ্ঠপোষকতায়—
নিতাইচরণ সেন
এন, সি, ঘোষ
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
বিভূতি ভূষণ দত্ত
দীনেশ দত্ত
এস, কে, রায়
এইচ বোর্ণ

রূপ-মঞ্চ

৬ষ্ঠ বর্ষ ★ ২য় সংখ্যা ★ চৈত্র ★ ১৩৫২

যাত্রী হুঁশিয়ার

সংবাদ বিভাগের চিঠির থলি নিয়ে প্রতিদিন যখন বসি, নূতন নূতন চিত্র প্রতিষ্ঠানের নামের সংগে পরিচিত হ'য়ে উঠি। শুধু আমরাই নই, অন্যান্য সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দৈনিক প্রত্যেক পত্রিকার সাংবাদিকদের সংবাদ থলি থেকে একটা চিঠি ওলটানের সংগে সংগে ম্যাজিকের যাদুমন্ত্রের মত এক একটা নূতন চিত্র প্রতিষ্ঠানের নাম চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চিত্রশিল্প ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে দেখে মনটা আনন্দে মেতে ওঠে—এমনিভাবে এই অনাদৃত শিল্পটি শুধু ব্যবসায়ীদেরই নয়, দেশের সুধী সমাজেরও যে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে—সে আশাবাদ আমাদের হৃদয় ভরে রেখেছে। এই নূতন যাত্রীদের আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু সংগে সংগে নূতন যাত্রীদের একটু হুঁশিয়ার করে দেবারও প্রয়োজন আছে। এই নূতনদের ভিতর এমন অনেকে আছেন, যাঁরা কালো বাজারের কালো অর্থে স্ফীত হয়েছেন—আবার অনেকে শূন্য কুম্ভের ডাকে বাজার মাতিয়ে তুলেছেন—চিত্রশিল্পের শিল্পরূপে এঁদের খুব কম জনই আকৃষ্ট হ'য়েছেন—বেশীর ভাগ স্বার্থকামী লোকদের জালে ধরা পড়েছেন। এই স্বার্থকামীরা এতদিন ষ্টুডিওতে ঘুরাঘুরি করে কোন কিছু করতে পারেননি—করবার যোগ্যতা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত—কালো বাজারে স্ফীত অর্থশালীদের সামনে সুযোগ বুঝে তাঁরা চিত্রজগতের বাহ্যিক রূপজাল বিস্তার করেছেন—এবং রুই বোয়াল টেনে তুলতেও তাতে সক্ষম হ'য়েছেন। এঁরা কেউ পরিচালক হচ্ছেন—গল্প লিখছেন। কোন অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন হচ্ছেনা—এঁদের অনেকেই যে ভরা তরী ডোবাবেন—তা যদি বলি তাতে সন্দেহের কী থাকতে পারে। তাই আমাদের হুঁশিয়ার বাণী। আমরা এঁদের ব্যর্থতা কামনা করি না—শুধু সতর্ক হয়ে পথ চলতে অনুরোধ জানাই—। কারণ, এমনি এপথে কেউ পা বাড়াতে চাননা—যাঁরা বাড়িয়েছেন, অনভিজ্ঞের পথনির্দেশে যদি তাঁদের চলা রুদ্ধ হয়ে যায়—তখন ব্যর্থতার মসীরেখায় চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ যে আরও ভয়াবহ হ'য়ে উঠবে!

মিশরের রঙ্গ-মঞ্চ

দ্বিতীয় পর্যায়

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

★

(কাবারে)

(৪)

বর্তমান মিশরে রাষ্ট্র অভিনয়, অভিনেতা, নাটক ও সিনেমা, পরিচালন ও পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করেছে। তাদের ধারণা এই যে, নাটক এবং সিনেমা জাতীয় জীবনের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। একটু দুরদৃষ্টি নিয়ে পরিচালনা করলে রঙ্গালয় ও সিনেমার মধ্য দিয়ে সমাজকে অতি সহজ উপায়ে সু-শিক্ষা বা কু-শিক্ষা দেওয়া যায়। মিশরে সমাজব্যবস্থা বিভাগের জন্য একজন মন্ত্রী নিযুক্ত আছেন এবং এই বিভাগ 'মিনিষ্ট্রী অব সোশ্যাল এফেয়ার্স' (Ministry of Social Affairs) নামে পরিচিত। সেই বিভাগ অভিনয় শাখা নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই শাখার অধীনে তিনটি উপশাখা রয়েছে—নাটক, সিনেমা, সংগীত। উপশাখাগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ততা সঞ্চয় উদ্দেশ্যে ইউরোপে শিক্ষা লাভ করেছেন—বিশেষ করে ফরাসী দেশে নৃত্য, ইতালীতে সংগীত, ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশে অভিনয়। মূল নীতি নিয়ন্ত্রণ করেন স্বয়ং মন্ত্রী এবং কার্যক্রম নির্ধারণ করেন বিভাগীয় পরিদর্শক (ইন্‌সপেক্টার)। মিশরে ইচ্ছা করলেই যে কোন নাটক কিংবা অনুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রকাশ বিভাগের অনুমতি না নিয়ে পুস্তক প্রকাশ করলে লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকরের বিপদের সম্ভাবনা আছে।

(৫)

প্রেক্ষাগৃহ : মিশরের প্রথম রঙ্গ-মঞ্চ 'গান ও গায়ক' সমিতি নামে স্থাপিত হয়েছিল। কিছুকাল পরে সম্রাট স্বয়ং এই সমিতির পৃষ্টপোষকতা করেন। মোল্লা সম্প্রদায় এই সমিতিকে "ফতোয়া" ছাড়িয়ে নরকের আগুণে জ্বালাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু অতি অল্পসময়ের মধ্যেই এই 'গান ও গায়ক সমিতি'র অনুকরণে আরও কয়েকটি সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। আরব জাতি সংগীত প্রিয় হ'লেও, ইসলাম সংগীতকে খুব প্রীতির চোখে দেখেনা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের সহজাত সৌন্দর্য বোধ এবং আনন্দের প্রেরণাই তার ভিতরে সংগীত প্রীতি সঞ্চারিত করে। ক্রমশঃ এই 'গান ও গায়ক সমিতি' মিশরে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল, এবং এই প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, আসুয়ান, পোর্ট সুয়েজ, তানতা প্রভৃতি সহরে অনেকগুলি অভিনয় সমিতি ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হ'লো। কায়রো সহরে প্রধানতঃ তিনপ্রকার রঙ্গমঞ্চ রয়েছে।

(১) অপেরা হাউস—নৃত্যমঞ্চ এবং রঙ্গমঞ্চ। নৃত্যগীতই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপজীব্য। কখনো কখনো অভিনয় অনুষ্ঠান হয়।

(২) সাধারণ রঙ্গালয় : (ক) মিশরীয়, (খ) ফরাসী, (গ) ইতালীয়, (ঘ) সিরিয়ান, এইখানে সাধারণ অভিনয় ব্যবস্থা।

(৩) কাবারে—গান, ভোজন, নৃত্যব্যবস্থা।

আমরা প্রথমে কাবারে নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের দেশে কাবারে নাই। Cabaret ফরাসী শব্দ, অর্থ ক্ষুদ্রকুটীর। প্রথমে ফরাসীদেশে সাময়িক ক্ষুদ্র কুটীর তৈরী করে নৃত্য ব্যবস্থা করা হত, মধ্যপ্রাচ্যে এই জিনিষটি এসেছে ফরাসী সংস্পর্শের পর, কিন্তু কাবারে বিলাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। বর্তমান যুদ্ধের জন্য খুব সাধারণ শ্রেণীর মধ্যেও এই কাবারে প্রসার লাভ করেছে, দামাস্কাস ও বেরুথ সহরকে ত কাবারে সহরই বলা যেতে পাবে। ইয়ুদী উপনীবেশ তেল-এল-ইভ্ সহরটিতে বহু কাবারে রয়েছে। জেরুজালেমের কাবারে প্রকাশ্য নয়, কায়রোর কাবারের কথাই বলব।

কায়রো শহরে ফরাসী কাবারে "ডলস্" গ্রীক কাবারে, "কিট্‌কাট" সিরিয়ান কাবারে, "বাদিয়া" মিশরীয় কাবারে, "আলবেবা" বিখ্যাত। আমি তার মধ্যে বিখ্যাত "বাদিয়া" সম্বন্ধে বলব। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন রয়েছে

আহারের ব্যবস্থা, মদের "বার", নৃত্যমঞ্চ ও আনুসংগিক আয়োজন। আমাদের দেশে কাবারে নেই, কারণ আমাদের সমাজ পরিবার কেন্দ্রীয় এবং প্রত্যেক পরিবারেই রন্ধন ও আহারের আয়োজন আছে। ফরাসী রীতি অনুসারে মিশরীয় সমাজের অভিজাত বংশে রন্ধনের কোন ব্যবস্থা নেই। কোথায়ও ষ্টোভ রয়েছে একটু গরম জল করে নেয়, আর সব খাদ্য সামগ্রী হোটেল রেস্তোরা থেকে আসে।

দর্শক মন নন্দিতা শান্তা আপ্তে

কিশোর কিশোরী ৮-৩০টার সময় বিদ্যালয়ে চলে যায়, ব্যবসায়ী দোকান খুলে বসে, রাজকর্মচারী ৯ থেকে ১টা পর্যন্ত অফিস করে; শিশুরা নার্সের সংগে পার্কে খেলা করে। ১টা থেকে ২টা লাঞ্চের সময়। প্রায় প্রত্যেকেই হোটেলে ভোজন সমাধা করে। মহিলারাও হোটেলে খায় অথবা হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে বাড়ীতে খায়। মিশরের জল বায়ুতে সাধারণতঃ খাদ্যদ্রব্যাদি নষ্ট হয় না; রান্না করা মাংস, ভাজা মাছ, সিদ্ধ বীণ (সীম) এবং ডিম ৫।৬ দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। একখানি 'খুব্জ' রুটি (আমাদের দেশে তন্দুরের নান রুটির মত) প্রায় ১০ দিন ভাল থাকে। আবার বৈকালে ২।৩ থেকে ৪।৫টা পর্যন্ত অফিস করে হোটেলে কফি খেয়ে কিটকাট খেলে। কিটকাট অনেকটা 'কেরম' খেলার মতন, তবে হাতের নিপুণতা প্রয়োজন হয় না, বুদ্ধির প্রয়োজন আছে। এবং জুয়া খেলার জন্তই মিশরে কিট্‌কাট খুব জনপ্রিয়। সন্ধ্যাবেলায় নীলের ধারে বা পার্কে বেড়িয়ে রাত্রি ৯টার সময় ভদ্রলোকগণ কাবারে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন।

আমি আমার বন্ধু মিঃ সালেহউদ্দিন এল আজমের সংগে ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের এক শীতের সন্ধ্যায় "কাসিনো" প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। কায়রো সহর মধ্যস্থলে ইব্রাহিম পাশার কৃষ্ণ মর্মর মূর্তির অপর দিকে বিরাট অট্টালিকা, উজ্জল আলোকমালা বিভূষিত, সমস্ত প্রাচীর গাত্রে বিরাট চিত্র—বিখ্যাত নর্তকী বাদিয়ার নৃত্যের বিভিন্ন ভংগীমা। এই কাসিনো প্রাসাদের কাবারের নাম "আল্ বাদিয়া"। মাদাম বাদিয়া একজন সিরিয়ান মহিলা। বহুকাল মিশরের নৃত্যমঞ্চ পরিচালনা কচ্ছেন। সাধারণতঃ নর্তকী বল্লে মানুষ তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু কল্পনা করে নেয়। কিন্তু বাদিয়া খুব অভিজাত বংশীয়া, এবং তিনি সাধারণ নর্তকী পর্যায়ভুক্ত ন'ন।

তখনও নৃত্য আরম্ভ হবার প্রায় আধঘণ্টা দেরী। আমরা প্রাংগনের সম্মুখে বারান্দায় বসেছিলাম। বারান্দা রাস্তা থেকে প্রায় ১৫ ফুট উচু। বহু দর্শক বারান্দায় বসে পান ভোজন ক'রছেন, বারান্দার নীচের তলায় দোকান। এদেশের প্রায় সমস্ত বড় অট্টালিকার মাটির নীচে একতলা রয়েছে। সেখানে রন্ধনশালা, ভৃত্যদের আবাস এবং গুদাম। এবং কোথাও বা দোকান। বৃষ্টি এদেশে বৎসরে ২।১ দিন হয়, সুতরাং মাটির নীচের ঘরে অসুবিধা নেই। আমাদের টেবিলে আর এক ভদ্রলোক মিঃ সালেহউদ্দিনের বন্ধু যোগ দিলেন। তিনি একটি সংবাদপত্র ফতেহনীল

পত্রিকার সম্পাদক। আমাদের জন্য এল "সারলাব" নামক পানীয় দুধের সরবৎ, বাদাম, পেস্তা ও অন্যান্য মসলা দিয়ে তৈরী। ভারি সুস্বাদু, ভারতে সে প্রকার পানীয় কোথাও দেখিনি। ৯টার সময় অভিনয় আরম্ভ হবে।

প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করবার সময় ভৃত্যের নিকট ওভারকোট ও হেট্ গচ্ছিত রেখে টিকেট নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ দক্ষিণা প্রথমশ্রেণী ৫০ পিয়াস্তা —৬।৵০ আনা। প্রেক্ষাগৃহটি সুবিশাল—একসহস্র দর্শকের স্থান রয়েছে। প্রাচীর গাত্রে নানা দেশীয় চিত্র সম্বলিত। আলোর খেলা অপরূপ। ঝিলমিলিগুলির পশ্চাৎদেশ থেকে আলো স্ফুরিত হচ্ছিল—বিচিত্র বর্ণ ও বিচিত্র আকার। জ্যামিতির নানা প্রকার রেখা আলোচ্ছটায় দর্শকের মুখ মণ্ডলে প্রতিফলিত হচ্ছিল। সম্মুখের যবনিকা ১০০ ফুট দৈর্ঘ, ৫০ ফুট প্রস্ত, গাঢ় ঘন নীল মখমল। দুপাশে কৃত্রিম স্তম্ভের সজ্জায় প্রাচীন গ্রীক রঙ্গমঞ্চের অনুকরণ এবং যবনিকার বর্ণের সংগে সু-সামঞ্জস্য। সম্মুখে ঐক্যতান বাদ্য।

যবনিকা উত্তোলনের সংগে সংগেই "জালালত্-উল-মালিক"—রাজার জয় হউক বলে জাতীয় সংগীত আরম্ভ হল, এদেশে কোন উৎসবই রাজার জয়গান তথা জাতীয় সংগীত ভিন্ন অনুষ্ঠিত হয় না। জাতীয় সংগীতের সংগে সংগেই ৭টি যুগল দ্বৈত-নৃত্যের জন্য রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হলেন। তারা কাবারের অংশ নয়। যে কোন নরনারী এখানে নৃত্যে যোগ দিতে পারেন। কাবারের পরিচালক কয়েকজন নৃত্যকুশল নরনারী নিযুক্ত করেন, তাঁরা প্রতিদিন নৃত্যের আসরে যোগদান করেন। কিন্তু কাবারের অভিনয়ের পুর্বে যে কোন নৃত্যাভিলাষী কাবারে নর্তকীদের সংগে যুগল নৃত্যে যোগ দিতে পারেন। প্রবেশ দক্ষিণা ভিন্ন অন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। খাদ্য ও পানীয়ের জন্য যথাযথ মূল্য দিতে হয়। যে সমস্ত কাবারে নারী এই দ্বৈত-নৃত্যে যোগ দেন, তাঁরা পারিশ্রমিক রূপে কিছু খাদ্য কিংবা রংগীন পানীয় আশা করেন। অবশ্য এই খাদ্য পানীয় সমাজে বাধ্য-বাধকতা নেই, তবে এটা ভদ্রতা এবং সকল নর্তকী বিভিন্ন নৃত্যের অবসর সময়ে নৃত্য-বিলাসী পুরুষের নিকট আশা করেন। যদি না দেওয়া হয়, তবে দ্বিতীয় বার তার সংগে নৃত্য করবেন না। অনেক নৃত্যামোদী নারীও এখানে সমবেত হন। রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করবার জন্য দক্ষিণার রীতি নাই এবং নৃত্যের জন্য কোন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। সর্বসাধারণের জন্য আধঘণ্টা সময় নির্ধারিত রয়েছে। নৃত্যের জন্য আহুত হয়ে কেহ প্রত্যাখান করেনা।

বাদিয়াতে আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখলাম—আমেরিকান, কানাডিয়ান, ফরাসী, মিশরীয়, সিরিয়ান, তুর্ক, ইহুদী প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক—নৃত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন, নারীদের মধ্যে দেখলাম গ্রীক, মিশরীয়, সিরিয়ান, ইহুদী, ফরাসী এবং সার্কেসিয়ান। একজন ইংরেজ কাপ্টেন বয়স ষাটের উপর। সংগিনী প্রায় পঞ্চাশ—দ্বৈতনৃত্য চল্ল—অট্ট-হাসিতে সকলে তাদের অভ্যর্থনা করল।

সাড়ে নয়টার সময় কাবারের কার্যক্রম আরম্ভ হল, প্রথমেই একটি সংগীত আরবী ভাষায় "আমি তোমাকে জলকূপের পাশে দেখেছি," একটি মাত্র কলি। সংগে সংগে চলেছে নৃত্যস্রোত, এই অংশের সকল নৃত্যশিল্পী কাবারের বেতনভোগী। এখানে বিভিন্ন দেশীয় নৃত্যের জন্য বিভিন্ন লোক নিযুক্ত রয়েছে, কোন শিল্পীই দুই ভূমিকায় নৃত্য করেনা। পরিচ্ছদ ও নৃত্যের সংগে খুব সামঞ্জস্য রয়েছে, নৃত্যছন্দের সংগে আলো ও ছায়ার সংমিশ্রন অপুর্ব। নৃত্যাংশের প্রথমভাগেই স্পেন দেশীয় গ্রাম্য নৃত্য -"ডবল-ফান" খুব জীবন্ত, হাতে খুব বড় দুখানি পাখা মৃদু সঞ্চালিত, পদক্ষেপের সংগে সুস্পষ্ট। স্পেনদেশের লোক খুব জাঁক-জমক পূর্ণ পরিচ্ছদ ভালবাসে এবং তারা কথা বলে না, চিৎকার করে। নৃত্যের মধ্যেও দেখলাম শব্দের বাহুল্য যথেষ্ট। হাংগেরিয়ান নৃত্যের ভূমিকায় ছিল একটি খর্বা-কৃতি নারী—বামন বলা যেতে পারে,—হাতে দুটি কাঠের খড়ম, অদ্ভুত শব্দ, পায়ের জুতার নীচে লোহার কিংবা কাঠের পেরেক। হাতের খড়ম ও পায়ের লোহার শব্দে এক বিকট ঐক্যতান। ব্যাপারটি একটি সার্কাসের খেলা। নাম শুনলাম—হাংগেরিয়ান (স্প্রীং) বসন্ত নৃত্য। এই নৃত্য যদি বসন্তের প্রতীক হয়, বিধাতা বসন্ত থেকে

আমাদের রক্ষা করুন। রাশিয়ান নৃত্য খুব সহজ—দীর্ঘাংগী মসৃণবরণী, স্বর্ণকুন্তলা, শ্বেতাম্বরা সার্কেশিয়ান রমণী এই নৃত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রূপে ইনি মিসরের ইসাডোরা ডানকান বলে বিখ্যাত। এই নৃত্যের নাম ক্লপ নৃত্য—অত্যন্ত সহজ ও অনাড়ম্বর। ফরাসী ব্যালেট নৃত্যও দেখলাম। এই নৃত্য প্রায় নগ্ন; যাদের চক্ষু শিশুকাল থেকে নগ্ন নৃত্য দেখে অভ্যস্ত, তারা এই নৃত্য-মঞ্চের নগ্নতার মধ্যে বীভৎসতার চিহ্ন খুঁজে পায় না, অনভ্যস্ত চক্ষে বড় বিসদৃশ। কংগো নৃত্য দেখলাম। আমাদের দেশের রায়বেশে নৃত্যের মতন। তারপর প্রাচ্য নৃত্য, অর্থাৎ ভারতীয় নৃত্য। একটি প্রায় নগ্ন নারী বক্ষস্থলে ও কোমরে পটভূমিকায় মখমলের আবরণ ও আভরণ, শ্লীলতার কোন আবেদন নাই, নৃত্যের অবসরে শরীরের অংশ বিশেষকে দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করাই অন্যতম প্রয়াস। ভারতবর্ষে আমি বহু স্থানে নৃত্য দেখেছি। বরোদা, মহীশূর রাজদরবারে নৃত্যও দেখেছি, মাদ্রাজে দেবদাসী নৃত্য দেখেছি, উদয় শংকরের ও অমলা দেবীর নৃত্য দেখেছি, বিশ্বভারতীয় শান্তিদেব ঘোষের নৃত্য দেখেছি, জাভা নৃত্য, মণিপুর নৃত্য দেখেছি। মিশরের প্রাচ্য নৃত্যের মতন নৃত্য দেখিনি। নৃত্যের নামে অংগ-বিস্তার, লালসা-উদ্দীপনা। এই নৃত্য ভারতের সৌন্দর্যজ্ঞান সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা সৃষ্টি করে। সম্প্রতি মধ্য প্রাচ্যে সৈন্যদের আমোদ-উৎসবের জন্য কয়েকটি নৃত্যদল মিশর পরিভ্রমন করছেন। মাদ্রাজী রঙ, কোটরগত চক্ষু, ব্রণ-বিভূষিত মুখমণ্ডল, উল্কি-চিহ্নিত-চিবুক—এই নর্তকীদলের নৃত্যও বাদিয়া পরিবেশিত নৃত্য অপেক্ষা শালীনতর। এই নৃত্যকে ভারতীয় প্রাচ্য নৃত্য ভিন্ন যে কোন আখ্যায় বিভূষিত করা যেতে পারে।

এবার বিরাম—১৫ মিনিট, বিরামধ্বনির সংগে সংগে যবনিকা পতন—ঐক্যতান বাদ্যারম্ভ। যুগপৎ প্রায় ১৫।২০টি বালক নানা প্রকার খাদ্য, পানীয়, কাজুজা (লেমোনেড্) রঙিন পানীয় (জিন, হুইস্কী, সাম্পেন, বিয়ার,) চকোলাতজ (চকুলেট্), সুদানী, (চিনাবাদাম), সিগারেট, আইসক্রিম (সালজ্) নিয়ে এল। ত্রিপোলিতে দেখেছি প্রত্যেকটি ফিরিওয়ালা তার বিক্রেয় দ্রব্যের সংগে এক একটি গান গেয়ে তার দ্রব্যের পরিচয় দেয়, এখানে সে গানের আভাস নেই, তবে সকল ফিরিওয়ালার সুর এক রকম। তাদের পোষাক একই রকম, এবং বাদিয়ার মোহরাংকিত। বিরাম এর পরে যবনিকা উত্তোলন, নৃত্য আরম্ভ। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে গিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে গৃহখানি নবীন আলো মণ্ডিত। সে আলোর রঙ মিশরের আকাশের মত স্বল্লাভ নীল। নৃত্য-পটভূমিকাও নীল, বাদিয়া স্বয়ং নৃত্যের জন্য আবির্ভূতা, ঘন ঘন করতালিতে দর্শকগণ নৃত্য পটিয়সী মাদাম বাদিয়াকে আহ্বান করলেন। অতি ধীর পদবিক্ষেপে অপ্সরীর মতন ক্ষীণ নীল পরিচ্ছদে আবৃত মাদাম বাদিয়া প্রবেশ করছেন—পরিচ্ছদে কোন বাহুল্য নাই—অলংকারের মধ্যে কর্ণে হীরার দুল, অতি উজ্জল, মখমল অথবা গাঢ় রেশমের বস্ত্র। বয়স প্রায় পঞ্চাশোর্ধ। বার্ধক্যের কোন চিহ্ন নাই—মুখ মণ্ডলে অথবা অবয়বে কোন অংশে একটি রেখা পর্যন্ত নাই। বসন্তের হিল্লোলে সঞ্চারিত পল্লবের মত অতি মৃদু গতিতে মঞ্চের ওপরে শান্ত নৃত্য—যেন চিত্রের অতি চলমান ক্ষীণ রেখা। ঘন ঘন করতালিতে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ মুখর, বাদিয়া চারটি নৃত্য পরিবেশন করলেন। এই নৃত্যের বিবরণ দেওয়া যায় না—উপভোগ করা যায়।

নৃত্যের পরে দুইটি মিশরীয় যুবক সার্কাসের খেলা দেখালেন, তাদের সংগে দুই বোন এ সার্কাসের ক্রীড়া কৌশল পরিবেশন করলেন। নৃত্যের সংগে এর কোন সম্বন্ধ নেই। তবু মিশরের এই জিনিষ নূতন বলে সকলেই খুব সাগ্রহে উপভোগ করলেন।

নৃত্যশেষে অনেকেই পান ভোজন কক্ষে চলে গেলেন। সেখানে কি ভীড়! শেষ হবার পূর্বেই অনেক যুগল পানের টেবিলে আসন গ্রহণ করেছেন। কারণ, পরে স্থান দুর্লভ। এই পান ভোজন রাত্রি ২টা পর্যন্ত চলবে।

এই কাবারের অভিনয়ের অন্তরালে জ্ঞানের দিক শূন্য। সামাজিক দিকের মধ্যে সময় কাটান এবং পরস্পর পরিচয় ছাড়া আর কোন অভিনবত্ব কিছুই নেই, শেষ অংশে জুয়াখেলার ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে কাবারের সত্ত্বাধিকারী বেশ উপার্জন করেন। এই কাবারে নৃত্যকলা চর্চায় কিছু সাহায্য করে বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে সমাজকে অনেক বেশী মূল্য দিতে হয়। অবসর বিনোদনের জন্য এই কাবারে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতা, নিয়মানুমোদিত অনিয়ম। যুদ্ধের সুযোগে এই কাবারে মধ্যপ্রাচ্যের অভিজাত শ্রেণীর জীবনে একটি অংগ রূপে গৃহীত হয়েছে।

নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যকলার স্বরূপ

অপূর্বসুন্দর মৈত্র বি, এ

নাট্যকলা ও নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন আসে,—নাটক কি? নাটকের সংজ্ঞা নির্দেশ এইভাবে করা যেতে পারে,—'কতকগুলি চরিত্রের পরস্পর কথোপকথনের সাহায্যে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনীর অবতারণা ও রূপদানই নাটক।' কিন্তু এখানেও ফাঁক থেকে গেল, কারণ আবার প্রশ্ন ওঠে, কতকগুলি চরিত্রের পরস্পর কথোপকথনের সাহায্যে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনীর অবতারণা করা হয় উপন্যাসেও, তবে উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য বলতে পারি—প্রধানতঃ এইখানে যে, নাটকের কাহিনী বর্ণিত হয় কেবলমাত্র কথোপকথনের সাহায্যে আর উপন্যাসের কাহিনী রূপপরিগ্রহ করে কথোপকথন এবং ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়। নাটকে বর্ণনার স্থান একেবারেই নাই। নাট্য-মঞ্চের সীমাবদ্ধ স্থানে নাটক তার রূপপরিগ্রহ ক'রে নাট্যরূপে রূপায়িত হয়ে ওঠে,—সেখানে অসীমের সাহায্য অবাধ স্বাধীনতার সুযোগ সে পায়না—যা পায় উপন্যাস—যা পায় গল্প। সুতরাং সংলাপই যে নাটকের প্রধান, বিশিষ্ট এবং অধিকাংশ স্থানই অধিকার ক'রে থাকে তা' সহজেই অনুমেয়। শুধু সংলাপের সাহায্যেই নাটকের সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং সবকিছুই ফুটিয়ে তুলতে হয় নাট্যকারকে। বর্ণনার স্থান নাটকে নেই, আর যদিওবা থাকে তা' ঐ সুসংবদ্ধ সংলাপের মধ্যেই। সুতরাং আরও একটু স্পষ্টভাবে নাটককে আমরা ব'লতে পারি,—

'The art of telling story in dialogue.'

ব'লতে পারি বটে এবং ব'ললে মিথ্যা কথাও কিছু বলা হয়না। তবু বলার অনেক কিছুই বাদ থেকে যায়,—নাটকের স্বরূপ নির্দেশে ভুল হয়। কেন ভুল হয় সেই কথাই ব'লছি।

'The proper study of mankind is m[...]

একথা আমরা জানি এবং মানি। মানুষই সৃষ্টি ক'রেছে সাহিত্য—তারই জীবনের ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের রূপদান ক'রে ভাষার তুলিকায়। মানুষের জীবনের সাথে ভাষা এবং সাহিত্য অংগাংগীভাবে জড়িত, সাহিত্যের গণ্ডির ভিতরে নাটককেও জন্ম নিতে হয়। কারণ জীবনের বাইরে সাহিত্য ত' যেতে পারে না—নাটক একেবারেই নয়। কিন্তু সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রলেও শুধু তারই গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে নাটক বাঁচতে পারে না। নাটক সাহিত্য এবং সাহিত্যাতীত—সাহিত্যের বাইরে আরও কিছু। সেই আরো কিছু হ'চ্ছে তার practical aspect—তার জীবনীশক্তি। সংগীত শাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায়, মাত্র সাতটি স্বর নিয়েই সংগীতের বিভিন্ন রূপপরিগ্রহের অপূর্ব কৌশল। এই সাতটি স্বরই শত-সহস্র রাগরাগিণীর স্রষ্টা। কিন্তু মজা এই—আসলে এই স্বর ক'টি একেবারেই জড়—তাদের সৃজন ক'রবার কোন ক্ষমতাই নেই। তাদের দ্বারা কোন সৃষ্টিই সম্ভব হ'তনা যদিনা আর একটি শক্তি এসে তাদের সঞ্চারিত ক'রত। এই শক্তির নাম সঞ্চারী। প্রকৃতপক্ষে সঞ্চারীই শিল্পীর আসন গ্রহণ ক'রেছে—স্বর হ'য়েছে তার উপাদান। ঠিক এমনিই হ'য়েছে নাটকের বেলায়। সংলাপ র'য়েছে জড় উপাদানরূপে। তাকে সঞ্চারিত যে ক'রেছে—তাকে জীবন্তরূপে যে রূপায়িত ক'রেছে সে আর একটি শক্তি এবং সেই শক্তিই হ'চ্ছে তার practical aspect অথবা তার জীবনী শক্তি। কি সেই শক্তি? সে শক্তি তার অভিনয়—তার ব্যঞ্জনা।

সুতরাং নাটকের আর্ট সমষ্টি মূলক। এই কথাটাই আমরা ভেবে দেখিনা এবং এইখানেই হয় আমাদের ভুল।

আরো একটু পরিষ্কার করে বলি।—নাট্যকার যিনি তিনিও সাহিত্যিক। কল্পনার অনুপ্রেরণায় সাহিত্যের তুলি তিনি বুলিয়ে দিলেন কাগজের উপরে আর আমরা পেলাম একটি সুসংবদ্ধ কাহিনীর ছবি। ছবি পেলাম বটে, কিন্তু ছবি জীবন্ত নয়—নিতান্ত জড়। নাট্যকার এছবি কল্পনা করেন নি। তিনি কল্পনা ক'রেছেন জীবন্ত ছবিটিকে—পাত্রপাত্রির জীবন্ত রূপকে, অনুভব ক'রেছেন সমগ্র ঘটনাটি,

সমগ্র গতিগুলি জীবন্তরূপে আপনার মনের মধ্যে। কিন্তু যা তিনি প্রত্যক্ষ ক'রেছেন মনে, তার সব কিছুই ধ'রে দিতে পারেন নি ভাষার তুলিকায়। তিনি শুধু দিতে পেরেছেন কথাগুলি, পারেন নি দিতে কাহিনীর সমগ্র গতিশীলতাকে—জীবনের স্পন্দনটিকে।

আগ্রার দুর্গে পিতৃদ্রোহী পুত্রের ছলনায় বন্দী সাজাহানের কাছে যখন সংবাদ এসে পৌছুল যে, ঔরংজেব তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছে তখন কত উত্তেজনায় বৃদ্ধ পঙ্গু সাজাহান দুর্গপ্রাকারের কাছে এসে বারে বারে ব'লে উঠেছিলেন, 'দিই লাফ! দেব লাফ?' নাট্যকার লিখেছেন দুটি কথা—যা'র মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট আলোড়নের আভাস—গভীর উত্তেজনার বেগ। শুধু পড়ে গেলেই কি এই উত্তেজনা আমরা অনুভব করতে পারি? অনেকে বলবেন—কেন পারব না? যে ভাব নিয়ে কথা দু'টি এসেছে—কথা দু'টি পড়ে কল্পনায় সেই ভাব কেন মনে ফুটে উঠবে না? উঠবে না যে তা নয়। কিন্তু ওঠাতে হ'লে পাঠকের কল্পনাশক্তি লেখকের মতই প্রখর হওয়া প্রয়োজন। সে শক্তি ক'জনের থাকে! সকলে সব ভাব নাটক পাঠের মধ্য দিয়ে মনে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। এবং পারেনা ব'লেই ব্যঞ্জনার প্রয়োজন—অভিনয়ের প্রয়োজন, নইলে নাট্যকলার কোন প্রয়োজনই হ'তনা। সাজাহানের 'দিই লাফ—দেব লাফ' কথা দু'টি যখন সাজাহানরূপী অভিনেতা দুঃখের দুর্গপ্রাকারে দাঁড়িয়ে চঞ্চলচিত্তে বিক্ষুব্ধস্বরে তেমনি আকুলতা নিয়েই ব'লে উঠেন তখন সে ভাবটি—সবার মনে আপনিই ফুটে ওঠে—যে কল্পনায় ফোটাতে পারে তার মনে, যে পারে না তার মনেও। সম্মুখে দেখি সেই বৃদ্ধ—অক্ষম বন্দী সাজাহানকে, দেখি সেই অভিশপ্ত দুর্গ—প্রত্যক্ষ করি—পুত্রের হাতে বন্দী পিতার অসীম লাঞ্ছনা! কষ্ট ক'রে কিছু ভাবতে হয়না—ভাবিয়ে দেন অভিনেতাই। নাটকের জড়ত্ব দূর হ'য়ে যায়, মূর্ত হ'য়ে ফুঠে ওঠে সাজাহান তার ক্ষুব্ধ অন্তরের বেদনা নিয়ে জীবন্তরূপে আমাদের চোখের সম্মুখে, সাহিত্যের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে জড় নাটকের প্রাণের স্পন্দন স্বভাবিক গতিতে স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। এত কথা ব'ললাম শুধু নাটকের আর্টএর সমষ্টিমূলক ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে, জানাতে যে নাটক পূর্ণতা লাভ করে তার অভিনয়ে—পাঠে নয়।

আরও একটা ভুলের কথা এইবার বলি। সে হচ্ছে নাটকের form অর্থাৎ তার রূপ সম্বন্ধে। আমাদের অনেকের ধারনা (সকলের নয়) যে, ভাবই আসল—অনুভূতিই সব, আইডিয়া আসে অনুভূতির সাহায্যে। তাই যদি হয় তবে যা'র অনুভূতি আছে সেইত আর্টিষ্ট। প্রত্যেকের অনুভূতি আছে,—প্রত্যেকেই কি আর্টিষ্ট? কেউ যদি বলেন, অনুভূতির গভীরতাই আর্টিষ্ট চিনিয়ে দেয়, তবে আমি পুত্র শোকাতুরা মা'র অনুভূতির নির্দেশ করবো। পুত্রের মৃত্যুতে মা'র অনুভূতির মত প্রবল অনুভূতি আর কারও জাগে না—পিতারও নয়, ভাবুকেরও নয়। তবে পুত্রশোকাতুরা মা'র বিলাপ আর্ট হ'য়ে ফুটে ওঠেনা কেন? ওঠেনা এই জন্যে যে, সেখানে form এর অভাব। অথচ অনুভূতি যার মা'র চেয়েও কম সেই আর্টিষ্ট এই অনুভূতিটুকু কেমন সুন্দররূপে যথার্থরূপে রূপায়িত ক'রে তোলেন। এই রূপদানেই আর্টএর চরম উৎকর্ষ! Formকে তাই আমরা অস্বীকার ক'রতে পারিনা। ঔপন্যাসিকের, কবির, নাট্যকারের সাহিত্যিকের সর্বপ্রকার আর্টিষ্টেরই মর্যাদা এবং সফলতা নির্ভর করে রূপদানের দক্ষতার উপর। আর্টও পায় মর্যাদা—যথার্থ form এ ধরা দিলে। তাই আর্টএর জন্ম এবং বিকাশ শুধু অনুভূতিতে নয়, অনুভূতির সুসংবদ্ধ প্রকাশে। এ সত্য আমরা বেশ সুন্দর ভাবে উপলব্ধি করি শরৎসাহিত্য আলোচনা ক'রলে। মনের একান্ত পরিচিত অনুভূতি শরৎসাহিত্যে খুব অল্পকথার মধ্যে এমন সত্য হ'য়ে ফুটে উঠতে দেখি যে, বিস্মিত না হ'য়ে পারি না। এই অনুভূতি হয়ত আমাদের সবারই আছে, কিন্তু যখনই তাকে প্রকাশ ক'রতে যাবো—দেখবো এত বেশীকথার অবতারণা ক'রে এত ব'লে ফেলেছি যে, আসল বলাটি না বলাই থেকে গেছে, নয়ত সে অনুভূতির কিছুই প্রকাশ ক'রতে পারিনি। অর্থাৎ অনুভূতি আছে, কিন্তু সে অনুভূতির রূপদান

ক'রবার ক্ষমতা আমার নেই, যা' আছে রূপস্রষ্টার—আর্টিষ্ট-এর। বড় বড় অজস্র কথা সাজিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার ক'রে মানুষের মনে যে দাগ আঁকা যায়না—অনেকে তা একটি কথাতেই এক মুহূর্তে এঁকে দেন। এইটিই রূপদক্ষতা—সৃজনীশক্তি, আর্ট্এর মূল কথা। ভিন্ন ভিন্ন আর্টিষ্টের সৃষ্টির উপাদান অবশ্য—ভিন্নপ্রকারের। যেমন কবির উপাদান ভাষা এবং ছন্দ, ঔপন্যাসিকের উপাদান কেবলমাত্র ভাষা এবং সংগীতজ্ঞের উপাদান সুর এবং কথা। নাট্যকলার (নাটক এবং অভিনয়) উপাদান আরও একটু বেশী—কথা, অভিনয় এবং মঞ্চ। নাট্যকলার (Drama) স্রষ্টা তিনজন,—নাট্যকার, অভিনেতা এবং মঞ্চাধ্যক্ষ। এই তিনটি উপাদান স্ব স্ব সৃজনীশক্তির সাহায্যে সমগ্র নাট্যকলার প্রাণদান করেন। শুধু নাট্যকার, শুধু অভিনেতা অথবা শুধু মঞ্চাধ্যক্ষ পৃথক হ'য়ে ড্রামার রূপদান ক'রতে পারেন না। পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের অস্তিত্বের কোন সার্থকতা নেই।

রূপদানের কথায় আরও একটা কথা এল,—সে হ'চ্ছে ভাব। ভাব খুব উঁচুদরের হ'লেই যে সাহিত্য তথা নাটক উঁচুদরের হবে এ যাঁরা ধারণা করেন, তাঁরা ভ্রান্ত। কারণ আমরা এখুনিই দেখেছি যে, formই আর্টএর প্রাণ। আইডিয়া অকিঞ্চিৎকর হলেও শুধু সৃজনের গুণেই যে কোন সাহিত্য রস সৃষ্টি ক'রে—আর্টএর পর্যায়ে উঠ্তে পারে এবং বড় আসনও অধিকার ক'রতে পারে। এর দৃষ্টান্ত সেক্স্পিয়ারের হ্যাম্লেট্ নাটক।

আমরা দেখেছি নাটকের সৃষ্টির মূলে র'য়েছে তিনটি উপাদান। সেই উপাদান গুলির দিকে এবার দৃষ্টি ফেরান যাক। প্রথম উপাদান—কথা। এ সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু বলা হ'য়েছে। ড্রামাতে 'art of telling story in dialogue'—সব কিছু না হ'লেও যে বিশেষ কিছু এবং প্রধান কিছু তা অনস্বীকার্য। সংলাপের মধ্য দিয়ে যে কাহিনী রূপ পরিগ্রহ ক'রছে সেখানে কথাইত প্রধান। তাই কথার সৌন্দর্যের উপর সমস্ত নাটকের সৌন্দর্য নির্ভর করে। সুসংবদ্ধ সংলাপই নাটকের

হিন্দি চিত্রে এই নবাগতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে

মর্যাদা দান করে এবং তার নাটকত্ব বজায় রাখে। আমাদের দেশের অধিকাংশ নাটকেই দেখা যায় বিশেষণের পর বিশেষণ জুড়ে অতি সাধারণ কথাকে দশহাত লম্বা ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। অভিনেতারা মঞ্চারূঢ় হ'য়ে যখন ঐ বিশেষণ বহুল কথাগুলি চিৎকার করে আবৃত্তি ক'রে যান, তখন কোথাইবা থাকে ভাব আর কোথাইবা থাকে চারিত্রিক মনোবিশ্লেষণ। অভিনয় সামঞ্জস্যহীন, অস্বাভাবিক হয় এবং বাচন শ্রুতিকটু হ'য়ে উঠে। অনেকের ধারনা যে, শক্তি এবং তেজবীর্য প্রকাশের সহায়ক প্রচুর কথার গলাফাটানো চিৎকার এবং দ্রুতসঞ্চরণ, কিন্তু সংযম ও ধীরতার ভিতর দিয়ে যে কত শক্তি—কত তেজ ফুটিয়ে তোলা যায় তা অনেকেই ভেবে দেখেন না। বেশী কথা বলা যেমন দোষের, অত্যন্ত অল্পকথা বলাও তেমনি দোষের। যতটুকু কথা প্রয়োজন—অর্থাৎ যতটুকু কথা না বললে ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না নাটকে ততটুকু ব'লতে হবে। অনেক স্থলে কথার প্রয়োজন মঞ্চ পূর্ণ ক'রে দেয়। সেখানে সতর্ক হ'য়ে

কৌশলে কথাকে বর্জন ক'রতে হবে। সংলাপ রচয়িতা অর্থাৎ নাট্যকার যদি মঞ্চকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে শুধু অনাবশ্যক কথার জাল বোনেন তবে তাঁর নাটক নাট্য-জগতে শাশ্বত স্থান অধিকার ক'রতে পার্‌বেনা।

দ্বিতীয় উপাদান অভিনেতা। অভিনেতার কাজ হচ্ছে নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথরূপে দর্শকের চোখে ধরিয়ে দেওয়া। জড় নাটককে তিনিই প্রাণবন্ত ক'রে তোলেন কথায়, ভাবাভিব্যক্তিতে এবং এক্‌শনএ। এর জন্য তাঁর প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন। প্রথমতঃ তাঁকে নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটি বুঝতে হবে; বুঝতে হবে, জান্‌তে হবে এবং দেখ্‌তে হবে তিনি যে ভূমিকাতে অবতীর্ণ হবেন তার সমগ্র রূপটিকে যেরূপ কল্পনায় দেখেছেন নাট্যকার। তাই অভিনেতারও কল্পনাশক্তি প্রখর হওয়া প্রয়োজন নাট্যকারের মতই। কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিনেতাই এত শ্রম স্বীকার করতে চাইতেন না অথবা এত শ্রম করা তাঁদের সাধ্যের বাইরেই থাক্‌ত। ফলে তাঁদের অভিনয়ে নাটকের প্রকৃত রূপটি প্রায়ই ফুটে উঠত না, এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবে চরিত্রগুলি দর্শকের সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে নাটক সম্বন্ধে দর্শকের ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করত। বর্তমানকালে শিক্ষিত অভিনেতৃবর্গের সহায়তায় এ ত্রুটি বহুল পরিমাণে সংশোধিত হ'য়েছে। নাট্যকারের কাছে কথাই সব, অভিনেতার কাছে বাচন, ভাবাভিব্যক্তি এবং এ্যাক্‌শন্ সমান মূল্যবান। এই তিনটি দিকে অভিনেতাকে সমান দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। আগেকার দিনে নাট্যকার ও অভিনেতারা ভাবাভিব্যক্তি ও গতিকে উপেক্ষা করে কথাকেই বড় আসন দিতেন। ফলে নাটকের নাটকত্ব প্রকাশ পেতনা,—তার জড়ত্ব ঘুচ্‌তনা। আজকের দিনে পাশ্চাত্য জগৎ 'ড্রামার' এই অভাবগুলি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে এখন producer, মঞ্চ ও আলোকের মূল্য বড় বেশী। সে দেশের অভিনেতারাও জানেন যে, মঞ্চ এবং আলোকের মায়ায় কত সুন্দর ক'রে, সত্য ক'রে তাঁর বক্তব্যটি তিনি ব'ল্‌তে পারেন,—শুধু কথার সাহায্যে নয়—কথা না ব'লেও। সে দেশে নাট্যাভিনয় তাই হ'য়ে উঠেছে 'realistic'—প্রাণবন্ত! পাশ্চাত্যের এই নির্দেশ আমরা বর্তমানে গ্রহণ ক'রেছি,—আমাদের নাট্যোন্নতির পক্ষে শুভলক্ষণ সন্দেহ নেই।

তৃতীয় উপাদান মঞ্চ। Producer অথবা মঞ্চ নিয়ন্তার খোঁজ আমাদের দেশে বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ তিনিইত' সমগ্র ড্রামার 'ground' তৈরী করেন—যার উপর রঙ্ ফলান অভিনেতা। আলোক সম্পাত, দৃশ্যসজ্জা, আবহ সংগীত এবং দৃশ্যের দ্রুত পরিবর্তনেই র'য়েছে নাটকের গতিশীলতা। এগুলি শুধু যে অভিনেতার ভাবপ্রকাশে সাহায্য করে তা নয়, সাহায্য করে সমগ্র নাটকের যথার্থ ব্যঞ্জনায়। Producerকে বাদ দিয়ে আমাদের দেশের নাট্যমন্দিরগুলির যন্ত্র হাতে নিয়ে ব'সে আছেন অর্থলোলুপ ম্যানেজারগণ। তাঁদের দৃষ্টি production এর দিকে তত নয়, যত অর্থের দিকে। 'যেন তেন প্রকারেণ' দর্শকদের দু'একটা চমক্ দেবার ব্যবস্থা ক'রেই তাঁরা প্রডাকশনের কাজ শেষ করেন, তা' সে ব্যবস্থা যতই অবাস্তব হ'কনা কেন। এতে চমক্ বিলাসী সাধারণের পকেট থেকে অর্থের কাঁড়ি তাঁদের হাতে আসতে পারে বটে, কিন্তু 'ড্রামার' যে ক্ষতি হয় তা' অপূরণীয়। অবশ্য আমার একথা বলার উদ্দেশ্য নয় যে, producer এদেশে একটিও জন্মাননি এবং জন্মাতে পারেনও না। জন্মাতে নিশ্চয়ই পারেন এবং জন্মেছেনও, কিন্তু পুষ্ট হ'য়ে উঠতে পারেন নি মালিক সম্প্রদায়ের কৃপণতায়। সুযোগ পেলে পাশ্চাত্য দেশের মতই সাফল্যমণ্ডিত production যে আমাদের দেশেও সম্ভব তার দৃষ্টান্ত আধুনিক মঞ্চে অভিনীত "সিরাজদ্দৌলা", "মহারাজ নন্দকুমার", "দুই পুরুষ," "বিপ্রদাস," "রামের সুমতি" প্রভৃতি নাটক।

সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সুযোগ নেই। দুর্ভাগ্য আমাদের! নাটক ও নাট্যকলা সম্বন্ধে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি। এইবার তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাবা যাক। প্রয়োজনের প্রশ্নে জন-সমাজের প্রশ্ন আসে এবং আসে বাস্তবতার প্রশ্ন।

আমরা জানি, সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে নাটকের জন্ম।

এই সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছে কে?—মানুষ। কিসের প্রেরণায়? প্রয়োজনের প্রেরণায়। মানুষ যখন ছিল অসামাজিক জীব—তখন তার সুখ দুঃখ—তার অব্যক্ত সাহিত্য—দৈহিক জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকৃত। তার প্রকাশের প্রয়োজন সেদিন ছিল না। নিজের সুখে দুঃখে নিজেই সে হাস্‌ত এবং কাঁদ্‌ত। যখনই মানব সংঘবদ্ধ হ'ল, যখনই জাতীয় অনুপ্রেরণায় তারা সমাজ সৃষ্টি কর'ল, তখনই এই দৈহিক অনুভূতিগুলি প্রকাশিত হবার পথ পেল। নিজের সুখ-দুঃখকে সহানুভূতি ও প্রতিকারের প্রত্যাশায় অপরের কাছে প্রকাশ করার স্বাভাবিক চেতনা মনে জাগল। ভাষা সৃষ্টি হ'ল, নৃত্য সৃষ্টি হল—সংগীত সৃষ্টি হ'ল; নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি তখনই প্রকাশিত হ'য়ে সমষ্টির অনুভূতি জাগিয়ে তুল্‌ল। তার পর সংঘবদ্ধ জীবনে সকলের কল্যাণে একের কল্যাণ মিশে গেল। দেখা গেল জীবনের সমস্যা যেখানে উপাদান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, জাতীয় সমস্যাও সেখানে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে গেছে। সাহিত্য তখনই ভাষার সহায়তায় আত্মপ্রকাশ কর্‌ল এবং মানব অনুভূতির রূপ ধ'রে সমষ্টির সাথে জড়িত ব্যক্তিত্বের সংগে সবার মাঝে ধরা দিতে বাধ্য হ'ল। তাই জাতীয় জীবনের সাথে সাহিত্যের সংযোগ অচ্ছেদ্য। এমনি করেই মানব সাহিত্য জাতীয় সাহিত্যে পরিণত হ'ল। কিন্তু কি সেই প্রয়োজন, যার প্রেরণায় অসামাজিক মানুষের অব্যক্ত সাহিত্য মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল এবং পরিশেষে প্রকাশ হবার পথ পেয়েছিল সমাজ জীবনে? প্রয়োজন এসেছে জীবের আত্মরক্ষার স্বধর্ম থেকে। জড় জগতে মানুষ আবির্ভূত হ'য়েছে, সেখানেই পেয়েছে তার জীবন রক্ষার উপাদান, উপাদান সংগ্রহ ক'রে নিঃশঙ্ক চিত্তে সে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু গিয়ে পেয়েছে বাধা। কার কাছে? জড় জগতেরই কাছে। বাধা পেয়েও তবু সে বাধা মানে নি,—জড় জগতকে জয় ক'রে তার অগ্রগতি বজায় রেখেছে, প্রয়োজন মত জড় জগতের কাছ থেকেই ছিনিয়ে এনেছে তার জীবন রক্ষার উপাদান। এই সংগ্রামে সে যা দুঃখ পেয়েছে সেই তার প্রথম জীবনের অনুভূতি—আত্মানুভূতি। জড়

চঞ্চলা স্নেহপ্রভা

জগতই তাই মানব মনে অনুভূতির তরংগ তুলেছে। জড়-জগতের বিপ্লবের প্রখরতা ও প্রসারতাই সেই আদিম কাল থেকে মানব মনের পরিবর্তন ও বিবর্তন নির্ধারণ ক'রে এসেছে। মানব সংঘবদ্ধ হ'য়েছে এই জড় জগতেরই আঘাত পেয়ে, জড় জগতের বাধাই মানুষকে সক্রিয় ক'রে তুলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার নব নব পথ আবিষ্কারের সুযোগ দিয়ে তার মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করেছে। সুতরাং মানুষের দৈহিক ও মানসিক চেতনার মূলে যে জড় জগত সে কথা অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। তাই জীবন যেখানে জড়ের জালে জড়িত—সেখানে জীবনের সংঘাতে সৃষ্ট সাহিত্যও জড়ের সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দূরে স'রে দাঁড়াতে পারেনা। যে মাটিতে জড় দেহের অন্তরালে ক্রমবর্ধমান দৈহিক পূর্ণতার সংগে তার বিবর্ধনের সূত্রপাত, সেই মাটি থেকেই তাকে তার সবটুকু রূপ-রস-গন্ধ আহরণ ক'রতে হবে। বাস্তব বর্জিত সাহিত্য সৃষ্টি তাই অসম্ভব এবং সাহিত্যের মর্যাদা, সৌন্দর্য ও আবেদন নির্ভর করে তার বাস্তবতার উপরেই। অভিনয় যত সুন্দরই হ'কনা কেন, নাটক যদি অবাস্তব হয় তবেতো মানব মন কখনই জয় ক'রতে পার্‌বেনা। আর মানব মনই যদি নাটক জয় কর্‌তে না পার্‌ল তবে তার অস্তিত্বের সার্থকতা

জীনৎ চিত্রে নুরজাহান

কোথায়! মানুষ তারই জীবনের সুখ-দুঃখ, সফলতা, ব্যর্থতা দেখ্‌তে চায় সাহিত্যের দর্পণে এবং দেখে সে তৃপ্ত হয়। মানব সমাজে শাশ্বত স্থান অধিকার ক'রে নিতে হ'লে যে কোন সাহিত্যেরই তাই হওয়া উচিৎ—

"—Type of the wise who soar but never roam,
True to the kindred point of heaven and home.—"

আমাদের দেশের নাট্যসাহিত্যের একটি দোষ এই বাস্তববিরোধিতা—বিষয়বস্তুতেও, Technique এও। এমন সব কাহিনী আমরা গ'ড়ে তুলি, জীবনের সংগে যার সম্বন্ধ খুব অল্প। ফলে জীবনের কাছ থেকে কোন সমর্থ নাই সে কাহিনী পায় না। তারপর প্রতিপাদ্য বিষয়টি, সমগ্র কাহিনীটি প্রকাশ ক'রতে এমন সব বাস্তব বিরুদ্ধ কাজ করি যে, সাধারণ জীবনে তার স্থান নেই। যেমন অত্যন্ত দুঃখের সময় প্রায়ই দেখা যায়—নায়িকা গান গেয়ে তাঁর মনোব্যথা জানাচ্ছেন, অথবা নায়ক নায়িকা অন্তরের প্রেমানুরাগ জানাচ্ছেন পরস্পর গান গেয়ে। দুঃখ প্রকাশ এবং প্রেমপ্রকাশের বাহন যে সংগীত—এইটেই বড় হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সংগীতের উদ্দেশ্য এবং কার্য কি সেইটিই পূর্বে বিচার্য। অভিনেতার দোষ এগুলি নয়—দোষ তাঁদেরই, যাঁরা নায়ক নায়িকাকে ঐভাবেই চালিয়েছেন।

মানুষের জীবনে সবকিছুরই মূল্য আছে। গৃহের সামান্য আস্‌বাবও মনে ভাবের তরংগ তুল্‌তে পারে। দৃশ্যসজ্জা এবং জীবনের সংগে তার সামঞ্জস্য বিধান ভাব প্রকাশের পথ বহুল পরিমানে প্রস্তুত ক'রে দেয়। অভিনেতা সেই সুসজ্জিত দৃশ্যে নির্দিষ্ট চরিত্রের মনোভাব তাঁর পারিপার্শ্বিকের সহায়তায় ফুটিয়ে তোলেন। শুধু যে কথা ব'লেই মনের কথা প্রকাশ ক'রতে হবে, সে কথা ভাবা ভুল। জীবনে আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করি যে, মানুষের মনের ভাব তার মুখাবয়বে এবং আচারে, ব্যবহারে ও চলনে এমন সুন্দর ও সত্যভাবে ফুটে ওঠে যা শুধু কথাতে কিছুতেই তেমন Impressive রূপে প্রকাশ পায়না। এই সত্যটিকে অভিনেতার মনে রাখ্‌তে হবে,—শুধু অভিনেতার কেন—মনে রাখ্‌তে হবে নাট্যকারকে এবং producerকেও। কারণ অভিনয় জীবন সংগ্রামেরই প্রতিচ্ছবি, 'realistic representation of life.'

"The aim of the dramatist to employ naturalistic technique is obviously to create such an illusion of actual life passing on the stage as to compel the spectator to pass through an experience of his own, to think and talk and move with the people he sees thinking, talking and moving with him. A false phrase, a single word out of tune or time will destroy the illusion…we want no more basterd dreams, no more attempts to dress out the simple dignity of every day life in the peacock feathers of false lyricisim ; no more straw-stuffed heroes and heroines'—(Galsworthy).

মেটার্‌লিঙ্ক্‌ও ব'লেছেন—

"There is a tragic element in the life of every day that is far more real, far more penetrating and far more akin to the true self that is in us than in the tragedy that lies in great adventures. It goes beyond the eternal conflict of duty & passion. Its province is rather to reveal to us how truly wonderful is the mere art of living, to hush the discourse of reason and sentiment, so that above the tumult may be heard, the solemn, uninterrupted whisperings of man and his destiny".

মেটারলিঙ্ক্‌ ব'লেছেন সুন্দরভাবে, এবং আর্ট-এর উদ্দেশ্যই যে, 'to reveal to us how truly wonderful is the mere art of living'—সে কথাও সত্য। কিন্তু একটি কথা তাঁর উক্তিতে ফোটেনি—সে হ'চ্ছে আদর্শের কথা। আর্ট-এর পূর্ণতা ও সফলতা তার আদর্শের উপর নির্ভর করে না সত্য, তবুও আমার মনে হয় আদর্শ বিমুখতা আর্ট-এর দিক থেকে সুন্দর রচনাকেও অসুন্দর ক'রে ফেলে, তার প্রয়োজনীয়তাকে খর্ব করে এবং তার অমরত্বের সম্ভাবনাকে নষ্ট ক'রে দেয়। সাহিত্যে তাই আদর্শবাদকে বাদ দিলে চ'লবেনা। কারণ আমরা দেখেছি, সমাজ নিয়েই সাহিত্য এবং জাতির সংগে সমাজের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। উন্নত আদর্শ, উন্নত ভাবধারাই সমাজের তথা জাতির উন্নতির মূল এবং সাহিত্য জাতীয় ভাবধারা প্রকাশের অঙ্গ। সুতরাং সাহিত্যে আদর্শবাদ বর্জন করা সাহিত্যের পক্ষে যেমনি অকল্যাণকর জাতির পক্ষেও তেমনি।

নাট্য-সাহিত্যে আদর্শবাদের স্থান অত্যন্ত উচ্চে। কারণ অন্যান্য সাহিত্য থেকে নাট্য সাহিত্য অনেকাংশে পৃথক। নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের মনের খোরাক যোগান। সাধারণ অর্থাৎ সমাজের নিম্নস্তরের মনের খোরাক কাব্য, উপন্যাস, গল্প যোগাতে পারে না। কারণ ঐ সব সাহিত্য শুধু তাদেরই জন্যে, যারা পড়তে পারে, পড়ে বুঝতে পারে এবং বুঝে রস গ্রহণে সমর্থ হয়।

লাস্যময়ী শ্রীমতী সুরাইয়া

নাটকের রসোপলব্ধির জন্যে এত পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। কারণ নাটক পূর্ণতা লাভ করে তার ব্যঞ্জনায় এবং এই ব্যঞ্জনার ভার নেন অভিনেতৃবর্গ। তাঁরাই দর্শকের মনে নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটি ধরিয়ে দেন। দর্শক সেখানে নিরক্ষর হ'লেও কিছু যায় আসে না, কষ্ট ক'রে তাকে ভাবতে হয় না—অভিনেতাই ভাবিয়ে দেন। তাই নাট্য-সাহিত্যকে সর্বসাধারণের সাহিত্য ব'লতে পারি, অর্থাৎ জনসাধারণ এর থেকে রস গ্রহণে সমর্থ হয়। কিন্তু এই গুণটিই এর গুরুত্ব। নাট্যাভিনয় দেখে মানুষের 'passive' মনে ভাবের তরংগ ওঠে। ভাব যদি লঘু হয় তবে মনও সেই মত লঘু হ'য়ে যাবে, ভাব যদি বিকৃত, অসুন্দর হয়—মনও সেই মত বিকৃত, অসুন্দর হ'য়ে উঠবে। সুতরাং নাটককে এমন হ'তে হবে যাতে দর্শকের চারিত্রিক উন্নতি ও মানসিক উন্নতি সাধিত হয়। অর্থাৎ নাটক আনন্দের মধ্য দিয়ে আদর্শবাদকে দর্শকের অন্তরে এঁকে দিয়ে যাবে। এই কারণেই technique ও সব কিছু বজায় রেখেও নাটকের আদর্শমুখী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বহুকাল থেকে আমাদের দেশে নাট্য-সাহিত্য

ও নাট্যকলার অনুশীলন চ'লে এসেছে। যদিও পূর্বের নাটকগুলি ছিল কাব্যধর্মী এবং সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ তবুও তাদের আদর্শবাদ ও আবেদন ছিল খুবই উঁচু ধরণের। তাই সাধারণের মন সেদিনের নাট্যাভিনয়ে আকৃষ্ট হ'ত। স্টেজ্ আমাদের দেশে পূর্বে ছিলনা, এটা পাশ্চাত্যেরই দান। তখন আমাদের অভিনয় হ'ত উন্মুক্ত স্থানে। 'ড্রামার' যে তিনটি উপাদান দেখেছি—কথা, অভিনয়ও মঞ্চ—তার শেষ উপাদানের একেবারেই দরকার হ'তনা। ফলে মঞ্চ বাদ দেওয়ার জন্যে অভিনয়ের বাস্তবতা বজায় থাকত না, অভিনয় হ'য়ে উঠত বক্তৃতাধর্মী। তবুও দেশের নিরক্ষর জনসাধারণ ও শিক্ষিতগণ একই স্থানে ব'সে এই অপূর্ব নাট্যাভিনয় সারা রাত্রি ধরে সাগ্রহে শুনে যেতেন। নাটকের নাটকত্ব ছিল না সেদিন, তবু জনমন আকৃষ্ট করবার ক্ষমতা ছিল—যা techniqueএর সম্পদে সমৃদ্ধ এখনকার অনেক নাটকের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় না। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, পূর্বের অধিকাংশ নাটকই ধর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করত। ভারতের চিরপরিচিত এবং হৃদয়গ্রাহী পুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনীগুলিই ছিল নাটকের কাহিনী। এই সব কাহিনীর সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ভাবপ্রবণতা এত বেশী যে, শুধু গল্পচ্ছলে কাহিনীগুলি ব'লে গেলেও সবার মন মুগ্ধ হ'য়ে যায়। নাট্যকার কাব্যের সহায়তায় এবং গানে এই সব কাহিনীগুলি গেঁথে ফেল্‌তেন নাটকে। Formএর দিকে চাইবার তাঁর প্রয়োজন হ'তনা। কারণ স্বভাবতঃই যা' হৃদয়গ্রাহী তাকে যেমন ক'রেই প্রকাশ করা যাকনা কেন, তা যে হৃদয়গ্রাহী হ'য়েই উঠবে তা তিনি জানতেন। ফলে নাটক দাঁড়াতো কাব্য ও সংগীতের মহিমা নিয়ে। দর্শকগণ দেখ্‌তেন সেই চির পুরাতন এবং চির নূতন পুরাণের চরিত্রগুলি, শুন্‌তেন তাঁদের কণ্ঠসৃত বাণী। ভাবপ্রবণ ধর্মপ্রবণ মন তাঁদের ভাবে বিভোর হ'য়ে উঠত। এর সুফল ছিল। পুরাণে যে নাটকের জন্ম, তার সবগুলিই হ'ত আদর্শমুখী এবং জনমন জয় করবার অস্ত্র আদর্শমুখী হওয়ায় সমাজের শিক্ষা বিস্তার আনন্দের মধ্যেই অবাধে প্রসার লাভ ক'রত। তাই সেকালে স্কুল কলেজের চৌকাঠ না মাড়ালেও দেশে প্রকৃত শিক্ষিত লোকের অভাব হ'তনা। সেকালের ঐ সব রস-সমৃদ্ধ, শিক্ষাপ্রদ যাত্রা, কবিগান, কথকথা, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের কথা স্মরণ করে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ একস্থানে ব'লেছেন,—

"এমনি কতকাল চলেছে দেশে, বারবার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুব, প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচ দান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্ব ত্যাগ। তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবন যাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে। কিন্তু সেই সংগে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল, যাতে ক'রে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার অন্তরের সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় ক'রতে পারেনা তার পরিচয়কে সমুজ্জল ক'রেছে। আর যাই হোক আমেরিকান টকির দ্বারা এ কাজটা হয় না।"

বাস্তবিক, বর্তমানের উন্নত নাট্য-শিল্পও পুরাতনের সে আবেদনটুকু—সে সম্পদটুকু মানুষকে বিলাতে পারে নি। পারে নি এইজন্যে যে, আজ নাট্য-শিল্প আদর্শ বিমুখ হ'য়ে পড়েছে এবং আদর্শ বিমুখ হ'য়েছে ব'লেই সাধারণের কাছে তার মূল্য কমে গেছে। এই কারণেই বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের নাট্যসাহিত্যের এত দৈন্য। অবশ্য একথা আমার বলার উদ্দেশ্য নয় যে, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন একটি নাটকও আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে সৃষ্ট হয়নি, যার মধ্যে আদর্শ এবং আবেদনের সম্পূর্ণ অভাব। পরন্তু আধুনিক নাট্যসাহিত্যের দিকে চাইলে এমন কতকগুলি দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে যা', সাহিত্যের দিক্ থেকে, নাটকীয়তার দিক থেকে এবং আদর্শ, আবেদন ও রসের পূর্ণতার দিক থেকে সত্যই অপূর্ব। কিন্তু এ ধরনের নাট্যসাহিত্য আজ পর্যন্ত এত অল্প সৃষ্ট হ'য়েছে যে, সহজে তাও চোখে পড়ে না। আর যাওবা সৃষ্টি হ'য়েছে তাও একটা class এর জন্যে— সমাজের একটা ক্ষুদ্রস্তরের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে। এই class inclinationই অন্যতম প্রধান কারণ যার জন্যে perfect drama কিছু কিছু জন্ম নিলেও নাট্যসাহিত্য

আজ পর্যন্ত প্রসারতা লাভ ক'র্তে পারেনি আমাদের দেশে। সামাজিক নাটক যেদিন থেকে জন্মলাভ ক'রেছে সেইদিন থেকেই আমরা এই class নিয়ে মেতে উঠেছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র উল্লেখ করা যেতে পারে। তখন নাট্যসাহিত্যের প্রথম যুগ (প্রথম নাট্যচেতনার যুগ)। কিন্তু সেই যুগের 'সধবার একাদশী'র satire এবং নিমচাঁদের উক্তি সর্বসাধারণের বোধগম্য হ'য়ে ওঠেনি। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্যেই যেন নাটকটী রচিত। সুতরাং সামাজিক নাটকের জন্ম ও প্রসারের যুগথেকেই আমরা class এর দিকে ঝুঁকে পড়েছি। সৃষ্টি ক'র্ছি তাদেরই জন্যে, যাদের আছে প্রচুর। কিন্তু যারা সর্ব-প্রকারেই সর্বহারা, তাদের জন্যে সুন্দর কিছু, উন্নতিকর কিছু সৃষ্টি করার সহানুভূতি মনে জাগেনা। অথচ তাদেরই প্রয়োজন বেশী—তাদেরই চাহিদা অনেক এবং তাদের আনন্দ, তৃপ্তি ও শিক্ষাদানেই নাট্যকলার সার্থকতা। আমরা ভুলে গেছি যে, গৃহের একটী আলোকিত ক্ষুদ্র কক্ষ সহস্র দীপালোকে আরও আলোকিত ক'রে, নইলে সারা গৃহের অন্ধকার দুর ক'র্বার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবেই।

তাই সর্বাগ্রেই আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন—গণ-মন উদ্দীপক সুস্থ সুমার্জিত আদর্শমুখী নাটক যা, জাতির মনকে, জাতির জীবনকে সুস্থ, সবল ও উন্নত ক'র্তে পার্বে। পাশ্চাত্য শিল্পের অপূর্ব উন্নতির মূল তথ্যটি আবিস্কার ক'রে—আমাদের দেশের আদর্শবাদের ভিত্তির উপর নূতন ও পুরাতনের সামঞ্জস্যপূর্ণ, শিল্পপূর্ণ সংমিশ্রণে এমনই এক অভিনব নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি ক'র্তে হবে যা, শুধু আনন্দই দেবেনা—দেবে কর্মের অনুপ্রেরণা, শিক্ষার অনুপ্রেরণা, নীতি ও কর্তব্যের অনুপ্রেরণা, ধর্মের অনুপ্রেরণা—দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা।

অনেকে সবকিছু বর্জনের পক্ষপাতী, অনেকে সবকিছু গ্রহনের পক্ষপাতী। কিন্তু নূতন ও পুরাতনের কোনটিকেই আমরা বাদ দিতে পারিনা নিজেদের উন্নতিকে খর্ব না ক'রে। যে ভাল আমাদের নেই—অপরের কাছে তা যদি পাই তবে কেন গ্রহণ ক'র্বনা। লজ্জা আসে তখনই, যখনই নিজের সম্পদ থাকা সত্বেও পরের দ্বারস্থ হ'য়ে ভিখারীর মত হাত বাড়াবার প্রবৃত্তি জাগে। আমাদের একান্ত আপন, একান্ত নিজস্ব যা, তাকে যদি ভুলে যাই কিম্বা উপেক্ষা করি, তবে বিপথে প'ড়ে দিশেহারা হ'য়ে যাব। আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের দিকে চাইলে মনে হয় বুঝি সত্যই আমরা বিপথে চলেছি, বুঝি সুপথের সন্ধান আর পাব না। তবু এই নিরাশার অন্ধকারেও আশার দীপশিখা নজরে পড়ে, যখন দেখি ভুলের চেতনা হৃদয়ে আঘাত ক'রেছে। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে রুশিয়ার মতই বাঙ্গালীর নাট্যসাহিত্য সারা বাংলার মনে—সারা ভারতের মনে—সারা বিশ্বের মনে তার প্রভাব বিস্তার ক'র্বে, বহুযুগের ব্যর্থতার গ্লানি নবীন আলোকে নির্মল হয়ে উঠবে।

তাই আজ নব সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টাদের মনে রাখতে হবে যে, সব সৃষ্টির মূলেই চাই তেজ, চাই বীর্য, চাই প্রাণ। নাট্যকারকে এই শুভ নব যুগের প্রারম্ভে তাঁর অসীম দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে; সংযমী হ'য়ে, নিষ্ঠাবান হ'য়ে সমাজের দিকে দৃষ্টি রেখে জাতির মহাকল্যাণাদর্শে লক্ষ স্থির করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, জাতির কোমল মন যে কোন আকারে তিনিই গড়ে তুলতে পারেন,—তিনিই বাজাতে পারেন ধ্বংসের কিম্বা জাগরণের ডঙ্কা। আর অভিনয় শিল্পীদের মনে রাখতে হবে যে, তাঁদেরই সাধনায় সফল হবে নাট্যকারের সাধনা, তাঁদেরই নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে জয়যাত্রার পথে সহস্র আলোকবর্তী জ্ব'লে উঠ্বে। আজিকার এই দুঃখ জর্জরিত দিনে হৃদয় ভেংগে পড়ে, দেহ অবসন্ন হ'য়ে আসে,—মন কেবলই কেঁদে কেঁদে ব'লে ওঠে—

—'বড় দুঃখ, বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দারিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বড় অন্ধকার!'—

তবুও স্বল্পালোকিত গৃহাংগনে দাঁড়িয়ে আশার স্বর্ণআ-লোকোদ্ভাসিত পূর্বাচল পথগামী অভিযাত্রীদের ডেকে তার স্বরে ব'লে উঠতে হবে,—"যাও বীর, এগিয়ে যাও! অন্ধকারের বুক চিরে নিয়ে এস নবারুণ আলোক-শিখা। রিক্তের ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে দিতে আজ যে আমাদের অনেক সম্পদ চাই!—"

"—'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট! এ দৈন্য-মাঝারে কবি
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি!"
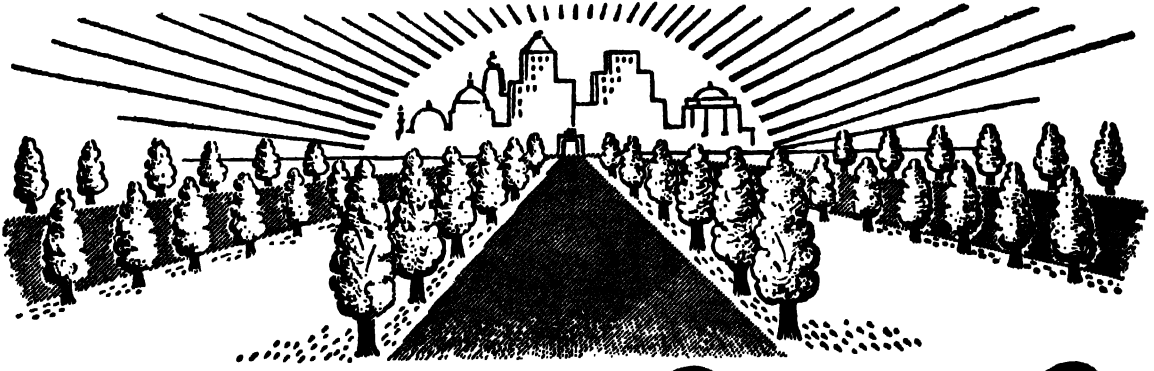
ভাল রাস্তা জাতির সমৃদ্ধি
সাধনে সাহায্য করে
ভারতে আরও পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ ও উন্নত ধরণের শস্য উৎপাদন প্রবর্ত্তনের জন্য, বার্ম্মা-শেল্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত কতিপয় বিজ্ঞপ্তির মধ্যে এইটা শেষ বিজ্ঞপ্তি।
সহর ও গ্রাম এবং শিল্প ও কৃষি পরস্পর নির্ভরশীল। শিল্পকার্য্যে স্বাস্থ্যবান কর্ম্মী পেতে হ'লে কৃষিজাত যাবতীয় ফসল আরও অধিক পরিমাণে সহরে নিয়ে আসার একান্ত প্রয়োজন এবং শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভারগুলি আরও অধিক পরিমাণে তৈরী করে যদি বেচিতে হয় তাহা হইলে তাহাদের কিনিবার মত আয় আরও বৃদ্ধি পাওয়া দরকার।
আজও রেলপথ ও নদীপথগুলিকে সহর ও গ্রামের একমাত্র যোগসূত্র বলে ভারতবাসীকে ইহাদের উপর খুব বেশীই নির্ভর করতে হয়—নদীপথ অল্প কাজে লাগলেও রেলপথ সরবরাহ কাজে অনেকখানি সাহায্য করে; এমন কি এখনও ভারতবাসীরা শিল্পজাত ভারি ভারি দ্রব্য সম্ভার দূরদেশে পাঠাইবার জন্য ইহাদিগকে একমাত্র সরবরাহ পথ বলে জ্ঞান করে। কিন্তু ভাল রাস্তা রেলপথ ও নদীপথের প্রধান যোগসূত্র। ভারতে ইহার একান্ত অভাব বলে, এই কতিপয় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা দেখানো হচ্ছে—জাতির সমৃদ্ধি সাধন, ভাল রাস্তা অভাবে কতখানি পেছিয়ে আছে।
এই ধারাবাহিক ১৭টী বিজ্ঞপ্তির একত্রে প্রয়োজন হইলে বার্ম্মা-শেল কোম্পানীর বম্বে, কলিকাতা, করাচি, মাদ্রাজ ও নয়াদিল্লী যে কোন শাখায় আবেদন করিলে পাওয়া যাইবে।

অতনু'র প্রেম

[] নাটক : রঙ্গ-ব্যঙ্গ []

নাট্যকার : শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়

পাত্র : চন্দ্রনাথ—উজ্জলা-র পিতা।
তপেশ—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র।
অতনু—কবি অর্থাৎ কাব্য-রোগী।
নরহরি—অতনু'র ভৃত্য।
ভজহরি—উজ্জলা র ভৃত্য।
কাব্য রোগী-গোষ্ঠী। কুলিবালক।
কুলি গোষ্ঠী।

পাত্রী : উজ্জলা—কবির কাব্য উৎস।
অতনু'র মা
বরদা—তাঁর দাসী।
কুলি বালকের মা।

[যাঁদের রসবোধ প্রচুর এবং সংস্কার অল্পই, তাঁদের বৈঠকখানায় এই নাটকের বৈঠক বসতে পাববে। নাটকের প্রথম অংকের শেষে যবনিকা পতনের পরক্ষণেই আবার যবনিকা উঠবে।

নাটকের পাত্র পাত্রীদের মধ্যে একমাত্র তপেশই বাস্তব চরিত্র। নায়িকা উজ্জলাও বাস্তব চরিত্র কিন্তু অবাস্তব চরিত্র অতনুর সংগে কথার আদান প্রদানে কদাচ আতিশয্য বিশিষ্ট। নায়িকা উজ্জলার পিতা চন্দ্রনাথ মৃতদার বৃদ্ধ; উচ্ছ্বাসের বাহুল্যে অতিশয়তা বিশিষ্ট চরিত্র। কবিকুলের সকলেই কৃত্রিম চরিত্র।

দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করতে গেলে, তাকে নিয়ে রঙ্গ করতে গেলে, কৃত্রিম চরিত্রের কল্পনার সংগে বাস্তব চরিত্রের অবতারণা করা ঠিক ঠিক রঙ্গ-ব্যঙ্গ নাটকের প্রয়োজনীয় উপায়। একটুখানি অবাস্তবতা বিলাসকে ফোটাতে গিয়ে নিছক অবাস্তব কৃত্রিম চরিত্রের আমদানি করেছি। —নাট্যকার।]

প্রথম অংক—প্রথম দৃশ্য।

[কাব্যিয়ানার ছঁদে সাজানো ঘরের দেয়ালে বায়রন্, শেলি, কীট্স্, ব্রাউনিং, মাইকেল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবির প্রতিকৃতি। তাছাড়া ইতিহাস বিখ্যাত দেশী-বিদেশী সুন্দরীদের ও চলচ্চিত্র জগতের বিখ্যাত সুন্দরীদের প্রতিকৃতিও আছে।

যবনিকা উঠলে দেখা গেলো ঘরে কেউ নেই। ক্ষণপরে ভৃত্য নরহরি প্রবেশ করলো। তস্করের সতর্কতায় চারদিক নিরীক্ষণ ক'রে লিখবার টেবিলের ব্লটিং প্যাডের তলা থেকে একখানি ফটো বাহির করলো। সৌন্দর্যের প্রশংসায় হাস্যোদ্রেকী অংগভংগী করতে থাকলো।

নরহরি : (গানের সুরে) রমণীর পদ কমলে মজলো আমার মন ভোমরা। (ইতিমধ্যে কখন দাসী বরদা ঘরে এসে নরহরির রংগ দেখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি রোধ করবার চেষ্টা করছিলো।)

নরহরি : (চাপা হাসির শব্দে চমকে উঠে ফটোখানি রেখে) তুই? কখন এলি বরদা? হায়রে, আমরা বাবু নই। আমরা সামান্য মনিষ্যি। কবি গাইতে পারিনা বর'।

বরদা : পারলে কী করতিস?

নরহরি : কী করতুম? ছড়া লিখতুম বর'। ছড়া লিখতুম। তোকে নিয়ে।

বরদা : আহারে আমার ভালোবাসা!

নরহরি : বাসি না? আলবৎ বাসি। বাহারে মোর ভালবাসা। তোর কথা ভালোবাসি। তোর মুখখানি ভালোবাসি। তোর সংগে গল্প করতে ভালোবাসি। যা তোর ভারি গতর। না হ'লে কোলে তুলে নাচতুম।

(বরদা খুসীর হাসি টেনে প্রস্থানের উদ্যোগ করলো।)

নরহরি : হায়রে! (কবি অতনুর প্রবেশ। আকৃতি প্রকৃতি ও বেশভূষায় হাস্যোদ্রেকী কাব্যিয়ানার আতিশয্য পুরা বর্তমান। কথাবার্তা কৃত্রিম।)

অতনু : কিরে, কী করছিস? ওঃ সব গুছিয়ে রাখছিস? হ'য়ে গেলো কাজ? আচ্ছা এখন যা। (নরহরি ভালো মানুষের মতো চলে গেলো। কবি অতনু শেখর দেয়ালভরা কবিদের দিকে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সুন্দরীদের মূর্তিগুলির দিকে চেয়ে ফুঁপিয়ে

উঠলো। একখানি আসনে বসে' বলে উঠলো, "সুন্দরী, তুমি অনুপম।" ব'লেই চক্ষু মুদ্রিত ক'রে মৃদু দোলনে দেহ দোলাতে থাকলো। এমন সময় কবি বন্ধু কন্দর্প কেশরের প্রবেশ। দুই বন্ধুর কথা আবিষ্ট।)

কন্দর্প: বন্ধু!

অতনু: প্রিয়তম!

কন্দর্প: এসেছি।

অতনু: এসো, এসো বন্ধু এসো, হৃদয় কন্দরে বোসো। (অতনু মুদ্রিত চক্ষু খুললো।) সারা বুক ভ'রে তোরে ধরি।

(উভয়ের আলিঙ্গন।)

কন্দর্প: (দেয়াল সংলগ্ন সুন্দরীদের উদ্দেশ্যে) এরা সব সুন্দরী!

অতনু: ওরা সব অনুপম।

উভয়ে: (সমস্বরে) সুন্দরী, তুমি অনুপম।

অতনু: কিন্তু নুরজাহান, ক্লিওপাট্রা, মার্লিন ডিট্রিচ্ কেউই আমার মানস সুন্দরী তুল্য নয়।

কন্দর্প: বন্ধু, লেখো কবিতা।

অতনু: লিখবো। কতো লিখেছি, আরো লিখবো। কাব্য লিখবো মনোহর আমার মানস সুন্দরীকে নিয়ে। লিখে লিখে প্রেমের বন্যা বহাবো। মেদিনীপুরের বন্যাকে হার মানাবো। দেশ ভাসাবো। রাজনীতি, সমাজ নীতি, ধর্মনীতি—সব ভাসাবো।

কন্দর্প: রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম—সব ডুবে যাবে।

অতনু: সুভাষ, গান্ধী, সাভারকার হাবুডুবু খাবে।

কন্দর্প: চার্চিল, রুজভেল্ট, ষ্টালিন কোথায় তলিয়ে যাবে।

অতনু: কংগ্রেস, মন্দির, মঠ—সব উবে যাবে।

কন্দর্প: থাকবে শুধু...?

অতনু: থাকবে শুধু প্রেম। নরনারীর প্রেম। তরুণ-তরুণীর প্রেম।

কন্দর্প: আর থাকবে?

অতনু: আর থাকবে কাব্য। শেলি, রবীন্দ্রনাথ নয়। থাকবে শুধু 'অতনু'র কাব্য। 'উজ্জলা অতনু'র তন্দ্রা কাব্য।

কন্দর্প: আমাদের এই তৃষ্ণা, এই কাব্য তৃষ্ণা......

অতনু: এই তরুণী তৃষ্ণা কোনো কালেই মিটবে না। মিটবে না, মিটবে না, এ তৃষ্ণা যে মিটবে না। জন্মে জন্মে যুগে যুগে—

কন্দর্প: নিববে না, নিববে না, এ দাহ যে নিববে না।

অতনু: আজ আমি কাব্য লিখবো, কী নিয়ে জানো?

কন্দর্প: কী নিয়ে বন্ধু?

অতনু: মানসীর আঁখি নিয়ে। আধুনিক গদ্য ছন্দে নয়।

কন্দর্প: কখনই নয়।

অতনু: লিখবো দোদুল ছন্দে, চপল ছন্দে, কামনা-পীড়িত উৎকণ্ঠিত ছন্দে। প্রিয়তমা বাগ্দেবী রূপসী, তোমার গোলাপের কাঁধে ভর করো।...আহা, কী সুন্দর মানসীর আঁখি দুটি। পোষা পাখী যেনো উড়বার মুখে। (তারপর দুই বন্ধু ছন্দাবেশে দোদুল্যমান।)

অতনু: সজল তোমার কাজল আঁখি ..

কন্দর্প: কাজল আঁখি! (ফোঁপাতে লাগলো।)

অতনু: কলিজা মোর ভাঙলো।

কন্দর্প: ওরে কলিজা মোর। (কান্নার ভংগী ও দীর্ঘশ্বাস। অতনু প্যাডের তলা থেকে উজ্জলার ফটো বাহির ক'রে বুকে চেপে ভাবে বিভোর। কন্দর্প হাহুতাশে মশগুল।)

অতনু: আহা, কী রূপ! জল ভরা মেঘের মতো কোমলাঙ্গী তুমি। (চোখ মুদলো। আবার চাইলো।) জল ভরা মেঘের মতো সজল চাহনি তোমার। (ছবিখানি চুম্বন করলো। শিহরণে ভ'রে গেলো দেহ।—অতনুর বিধবা মায়ের প্রবেশ।)

মা: কিরে নবু—

অতনু: নবু, নবু, নবু। ঐ পচা ধ্বসা নামটা না বললেই নয়? আমার নাম নবগোপাল নয়। কোনো কালে ছিলো না। চিত্রগুপ্তের খাতায় আমার যে নাম লেখা আছে সে অতনু শেখর, নবগোপাল নয়।

মা: বাবা, সে নাম তোমার বন্ধু মহলে। আমার ঐ গোপাল, নবগোপাল নামই বেশ।...ওটা কিসের ছবিরে তোর হাতে?

অতনু : ও একটা...ও কিছু নয়...না না...ও মহাত্মা গান্ধীর ফটো।

মা : মহাত্মা গান্ধীর ফটো? দেখি দেখি।

অতনু : কি মুস্কিল! না না। দেখতে হবে না। গান্ধীর ফটোতো অনেক দেখেছো। ঐ নেড়া মাথা, হাড় বের করা, নেংটি পরা বুড়োকে বারবার না দেখলে চলে না, নয়?

মা : সে যাই হোক আজ বিকেল বেলাই তোর মামা বাবু আসবে। কোথাও যাস্‌নি যেনো। একটু দরকার আছে। (প্রস্থান। নরহরি চা নিয়ে এলো। পকেট হ'তে পত্র বাহির করলো।)

নরহরি : উজ্জলা দিদিমনির চাকর ভজা, ভজহরি দিয়ে গেলো।

অতনু : (সোল্লাসে) দেখি দেখি। (চিঠিখানা নিবিষ্ট চিত্তে পড়া শেষ ক'রে উঠে দাঁড়াতেই অসাবধানতায় চায়ের পেয়ালা উল্টে গেলো।) ঐ যাঃ।

নরহরি : যাক্ যাক্। আমি আবার এনে দিচ্ছি। (প্রস্থান)।

কন্দর্প : পত্র? প্রেম পত্র? (ফুঁপিয়ে উঠলো।)

অতনু : সজল তোমার কাজল আঁখি...

কন্দর্প : কাজল আঁখি। (দীর্ঘ শ্বাস।)

অতনু : কলিজা মোর ভাঙলো।

কন্দর্প : ওরে কলিজা মোর! (ফুঁপিয়ে উঠলো।)

(নরহরি চা আনলো। অপরিচ্ছন্নতা সংশোধন ক'রে নিল।)

নরহরি : দাদাবাবু!

অতনু : ফের দাদাবাবু বলবি?

নরহরি : কবি দাদা!

অতনু : ঠিক।

নরহরি : কবিদাদা, আজ নাকি মামাবাবু আসতেছেন।

অতনু : কখন আসবেন জানিস?

নরহরি : মাতো বললেন পাঁচটার সময়।

অতনু : ওঃ। প্রলয়, তুই এখন যা।

নরহরি : যাচ্ছি। কিন্তু দাদা বা......ভুল হ'য়ে যাচ্ছিলো। কবিদাদা, প্রলয় নামটা আমার বদলে দাও। নরহরিই বেশ।

কন্দর্প : নরহরিই বেশ?

নরহরি : হ্যাঁ। নরু ব'লে ডাকলে খুশী হয় মনটায়।

অতনু : না, না; ঐ প্রলয় নামই বেশ। নরু নাম শুনলে ভজার দিদিমনি কী ভাববে বল্ দেখি?

নরহরি : কিন্তু ভজা নামটা কি নরু নামটার চেয়ে ভালো? ওটা বদলাওনি কেন?

অতনু : বদলাবো, বদলাবো। এখন ওর দিদিমনি রাজি নয়। পরে রাজি হ'তেই হবে। (নরহরির প্রস্থান।) নরহরি!!! নরহরি কি একটা নাম? প্রলয়। প্রলয় নাম কতো সুন্দর। প্রাণের মধ্যে যে তাণ্ডব দিবারাত্রি চলছে—

কন্দর্প : কাব্যের মধ্যে প্রকাশ ক'রেও যার তৃপ্তি নেই—

অতনু : সজল তোমার কাজল আঁখি—

কন্দর্প : কাজল আঁখি (দীর্ঘশ্বাস)

অতনু : কলিজা মোর ভাঙলো।

কন্দর্প : ওরে কলিজা মোর। দম আটকাবার ভংগী।

অতনু : র‍্যাঁ!!! (সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলো)।

প্রথম অংক—দ্বিতীয় দৃশ্য।

[অতনু-র গৃহের পিচন দিকের জমিতে স্বল্পপরিসর বাগান। ছোটো একখানি ঘর ভৃত্যদের থাকবার। কবির ঘর থেকে ফিরে এসেই নরু এই ঘরে সম্মুখে ব'সে তার দড়ির খাট মেরামত করছে। এমন সময় মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বরদা হাসি রোধ করতে করতে সেখানে এলো। এসে নরহরির গায়ে ঢলে পড়লো।]

নরহরি : বজ্জাত্ মাগির রকম দেখো। কথা নেই বার্তা নেই, হেসে হেসে গায়ে ঢলে পড়ছে। বলি, হ'লো কিরে? এতোদিন বাদে পচুর বাপ ঘরে ফিরে এলো নাকি?

বরদা : কি! সেই মিন্‌সের কথা আবার বলবি আমার কাছে? মিন্‌সে মরেছে রে, মরেছে। 'পচু' যখন নেই, সে মুখপোড়াও নেই। মুখপোড়া গেছে

বেঁচেছি। খবরদার তার কথা আর বলবি না। এই আমার কোমরের দিব্যি রইলো। (কোমর বাঁকালো।)

নরহরি : পচুর কথা মনে করিয়ে দিয়ে তোকে দুঃখ দিলুম বর'। কিছু মনে করিস্ নি। আহা, ছেলেটা যদি বেঁচে থাকতো—

বরদা : না, না, আর বেঁচে কাজ নেই, বেশ গেছে। অমন বাপের ছেলে হয়ে বেঁচে সুখ কি?

নরহরি : আমি যদি তোর 'পচুর' বাপ হতুম—

বরদা : কানা বিধাতা তেমন যোগাযোগ লিখেবেন কেন কপালে? নরু, সত্যি বলছি, তোর ভালোবাসা আহারে!

নরহরি : মোর ভালো বাসা বাহারে। দেখ বর' এই কটকটে দিনের আলোয় দাঁড়িয়ে যদি না হ'তো তবে আচ্ছা ক'রে জানিয়ে দিতুম।

বরদা : কী করতিস্?

নরহরি : সারারাত ঘরে খিল দিয়ে নাচানাচি করতুম। কিন্তু তুই এতো হাসছিলি কেন বল্‌তো?

বরদা : জানিস্ নরু, কবি দাদা আর তার বন্ধু কি কাণ্ডটাই কর্‌তেছে ঘরে ব'সে। এ এক চরণ ছড়া কাটে, ও এক চরণ ছড়া কাটে। আর সে কি কান্না-রে বাবা। ঢের ঢের মানুষ দেখেছি কিন্তু এদের মতো কখনো দেখিনি—এই এতো বড়ো চিঠিতে।

নরহরি : ভজার দিদিমণির জন্তে কবিদাদা যে হেদিয়ে গেলো।

বরদা : সে ছুঁড়ি কিন্তু আচ্ছা বাঁদরটাই নাচাচ্ছে।

নরহরি : বাঁদর নাচাচ্ছে কিরে?

বরদা : বুঝিস্ না? ন্তাকা পুরুষ পেয়ে একটু রঙ্গ করছে আর কি।

নরহরি : বর' তবে তুইও আমার সংগে রঙ্গ করিস্ বল্? আসলে একটুও পীরিত নেই তোর পেরাণে।

বরদা : সেকি কথা প্রাণেশ্বর!

নরহরি : থাক আর ঢং করতে হবে না।

বরদা : মাইরি না। কোন শালি মিথ্যে কথা বলে।

নরহরি : নিশ্চয় মিথ্যে। সব মিথ্যে।

বরদা : আ মোলো, মিন্‌সের আবার দর বাড়ানো হচ্ছে। বল দেখি তবে ছড়া, ঐ কবিওয়ালোর মতো? পারিস্?

নরহরি : ভেবেছিস্ পারি না? এককালে যাত্রাদলে আমিও—

বরদা : কি সাজতিস্ রে? তামাক?

নরহরি : দেখ উমেশের বউ, ভালো হবে না বলছি।

বরদা : আবার সেই হতভাগার নাম? মনে কর, সে মরেছে। তার নাম আর মুখে ও আনবি না বলছি, আমার কাছে সে মরেছে। না হ'লে কি বর' বাগ্দিনী তোর ফাঁদে পা দেয়? না, না, সত্যি নরু, কি সাজতিস্ রে যাত্রায়? মাথা খা। বল ভাই। তোর পায়ে হাত দিচ্ছি।

নরহরি : থাক্, ঢের হ'য়েছে।

বরদা : বল্ না। আর যে খোসামোদ করতে পারি না।

নরহরি : কিন্তু দু'জনে মিলে মস্‌করা করবো বাগানে আর গিন্নী গাল দেবে না?

বরদা : এখনি তো যাবো। কাজের ফাঁকে এমনি তারা একটু না হ'লে পেরাণ ডা থির্ থাকবে কি ক'রে বল্? কি সাজতিস্ রে যাত্রায়?

নরহরি : সেকি এক আধটা পাট। কখনো কৌশল্যে, কখনো বিন্দে দূতী। কখনো আবার……

বরদা : ওমা, মেয়ে সাজতিস্? তবে একটা ছড়া কাট্ না নরু।

নরহরি : ওহে, চতুর কালা চাঁদ।

তোমার তরে ছি রাধা যে পাতলো কতো ফাঁদ।

বরদা : ওমা, তুই কিরে! দাদাবাবুর চেয়ে একটুও কম নস্।

নরহরি : সাঁজের কালে হাবুর বাবা দাঁড়িয়ে উঠোন ভুঁয়ে।
রান্নাঘরে কালুর মায়ের চচ্ছড়ি খায় চুঁয়ে॥

বরদা : ওমা কালুর মা'র সংগে হাবুর বাপের একটু ছিলো বুঝি? ওরে নরু, তোরে যে গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। একদিন দাদাবাবুর সংগে কবির লড়াই দে না। বস্তিতে খবর দিয়ে আসি, সবাই শুনবে।

নরহরি : যদি আড়চোখে ভাই চাউনি খানিই দিলে।
তবে পরাণ তারে দাও না কেন একটু খানি ঢিলে॥

বরদা : (নরুর দাড়ি ধরে) ওরে আমার চাঁদরে। আজ বাড়ি যাবার আগে তোর ঘরে একবার আসবো। কথা আছে। বুঝলি ?

নরহরি : উঠে পড়্। মা আসছে। (অতনুর মায়ের প্রবেশ।)

মা : বরদা, ক'জ রইলো পড়ে, আর দুজনে মিলে এখানে......

বরদা : যাই মা যাই। দেশ থেকে ননদের মেয়ের অসুখের খবর পেয়েছি। তাই নরুকে দিয়ে তাদের গাঁয়ের একজনকে খবর দেবার কথা বলতে এসেছি মা। কাজ রয়েছে পড়ে জানি মা। যাচ্ছি।

মা : খুব বুঝি অসুখ ? না তুই কি সেখানে যাবি ?

বরদা : না, মা, না, তোমাদের কাজ কন্ম ফেলে আর কোথাও গিয়ে দুদণ্ড থির থাকতে পারবো না যে মা। খবরটা শুধু পাঠিয়ে দেবো, আর, গোটা দুই টাকা।

মা : তবে একটু পরে আসিস্। (প্রস্থান)

নরহরি : সাবাস মেয়েরে বাবা! অমনি ননদের মেয়ের অসুখ হ'য়ে গেলো ? বুদ্ধি আছে বটে।

বরদা : না হ'লে আর লোকে চরাচ্ছি।

নরহরি : (সরোষে) কি ?

বরদা : হ্যাঁ, তাই। (ছলাকলার ভংগীতে প্রস্থান)

প্রথম অংক—তৃতীয় দৃশ্য।

[শ্রীমতী উজ্জ্বলা ড্রইংরুমে ব'সে রবীন্দ্রনাথের একখানি গান করছিলো। গান থামতেই ভজহরির প্রবেশ।]

উজ্জ্বলা : কিরে, বাবুকে চিঠি দিয়ে এসেছিলি ?

ভজু : হ্যাঁ দিদিমনি।

উজ্জ্বলা : একটু পরে বাগান থেকে গোলাপ তুলে এনে টেবিলটা সাজিয়ে রাখিস্।

ভজু : রাখবো।

উজ্জ্বলা : আচ্ছা এখন যা।.....হ্যাঁ শোন। সেই যে তোর বোনের মেয়ের বিয়েতে টাকা পাঠাবি বলেছিলি, না ? এই পাঁচটি টাকা দিয়ে আমি তাকে আশীর্বাদ করলুম।

ভজু : আজই আমি এ আশীর্বাদ পাঠিয়ে দেবো দিদিমনি, তোমার বিয়েতে কিন্তু আরো বেশি বখ্‌সিস্ চাইবো।

উজ্জ্বলা : বেয়াে, আস্কারা পেয়ে পেয়ে বড়ো বেড়েছিস্, নয় ? (ভজুর প্রস্থান, চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

চন্দ্রনাথ : কে বড়ো বেড়েছে রে ? কেন মা ? ওতো খুব খাটে মা।

উজ্জ্বলা : না, না, ও আমি এমনি বলছিলুম।

চন্দ্রনাথ : তাই তো বলি। মা আমার কি মিছি মিছি রাগ করবে ? খাটে না আবার ? কতো কাজ করে।

উজ্জ্বলা : কি কাজ বাবা ?

চন্দ্রনাথ : এইধরো বইগুলো ঝাড়ামোছা। বইগুলো বার ক'রে তুলে রাখা। বইগুলোর তদারক করা। বই পত্তর সব ঠিক রাখা।......

উজ্জ্বলা : বইগুলো বইগুলোই তো বলছো। আর কি করে ?

চন্দ্রনাথ : তা আমি অতো মনে রাখতে পারি কি ? বুড়ো মানুষের আর কতোই বা মনে থাকবে ?

উজ্জ্বলা : তা যদি না থাকবে তবে তোমার এত এতো বই পড়ে মনে রাখো কি ক'রে ?

চন্দ্রনাথ : হ্যাঁ, তা একটু মনে থাকে, সেদিন সাইকলজির একখানা বই পড়ছিলুম ম্যাক্‌ডুগালের। লিখছে... (ভজুর প্রবেশ)

ভজু : কিছু কি দরকার আছে আমাকে ?

চন্দ্রনাথ : দরকার ? তা হ্যাঁ বইগুলো একবার সাজিয়ে···

উজ্জ্বলা : বইগুলো তো সবই সাজানো রয়েছে বাবা। কেবল টেবিলের উপর যে কখানা রয়েছে···

চন্দ্রনাথ : ও কখানা থাক্। ও কখানা থাক্। ওগুলো যে এখন পড়ছি মা।

ভজু : তা হ'লে দরকার নেই তো এখন ?

চন্দ্রনাথ : না। আমার কোনো······

উজ্জ্বলা : আমারও না, তুই এখন যা। (ভজুর প্রস্থান)

চন্দ্রনাথ : কি বলছিলুম ? হ্যাঁ বলছিলুম, মনে আমার থাকে, যা পড়ি সব মনে থাকে। কিন্তু দেখ উজ্জ্বল

সুগন্ধে
রূপ হবে রমনীয়
VICTORIA ROSE
হোয়াইট রোজ—ভোরের শিউলির মতই টাটকা আর শিশিরের মত স্নিগ্ধ
ভিক্টোরিয়া রোজ—সর্ব্বজনপ্রিয় বসোরা গোলাপের অনুপম সৌরভ
ডামাস্ক রোজ—প্রাচ্যের লুপ্ত-প্রায় সৌন্দর্য্যের রেশ........
SERVICE
pmb
পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং, লিঃ কলিকাতা

একটা কথা কাল থেকে কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

উজ্জলা : কী কথা বাবা ?

চন্দ্রনাথ : সেই কথাই তো মনে আসছে না ?

উজ্জলা : তা বলছি না, কিসের বিষয় ?

চন্দ্রনাথ : তোর মায়ের বিষয় উজল। তোর মা যখন আমার উপর রেগে যেতো……

উজ্জলা : মা তোমার উপর রেগে যেতো ? তুমি বুঝি…?

চন্দ্রনাথ : না, না, তার কথার অমান্য আমি আদৌ করতুম না। তবে ঐ মাঝে মাঝে ভুল ক'রে যা তা বলে' ফেলতুম।

উজ্জলা : ভুল ক'রে ব'লে ফেলতে ? তুমি ভুল করতে ?

চন্দ্রনাথ : আহা সাইকলজি বা ফিলজফির কথা তো নয় যে নির্ভয় বলবো ? সে সব……

উজ্জলা : কি সে সব ?

চন্দ্রনাথ : সাংসারিক কথা মা, সাংসারিক কথা! ব'লতো, 'নেপুর বিয়েতে বৌভাতে কি দিতে হবে ?' আমি বলতুম, ভালো দেখে একখানা সাইকলজির বই……। যেই না বলা, তোর মা ভীষণ রেগে……হাঁ রেগে গিয়ে কী যে বলতো—এ টী মনে করতে পারছি না কাল থেকে।

উজ্জলা : বোধ হয় বলতো. "আচ্ছা পাগল তো।"

চন্দ্রনাথ : ইউরেকা, ইউরেকা। "পাগল!" ঐকথাটাই ব'লতো।

উজ্জলা : কথাটা আমিই আবিষ্কার করলুম। খ্যাতিটা কে পাবে বাবা ? তুমি, না, আমি ?

চন্দ্রনাথ : তুমি. মা, তুমি। দেখ উজল, যতো তোর বয়স বাড়ছে ততোই যেনো তোর মায়ের মতো হ'য়ে উঠছিস। (কন্যাকে এক দৃষ্টে দেখতে দেখতে) কেবল ঐ তিলটা তার ছিলো না। ওতে তোকে আরো ভালো দেখায়! তা ছাড়া রংটাও আরো একটু করসা।

উজ্জলা : তা হবে না ? পরবর্তী সংস্করণ তো ?

চন্দ্রনাথ : আরে খুব কথা শিখেছিস তো ?

উজ্জলা : কেন বাবা, অন্যায় কথা বললুম ?

চন্দ্রনাথ : কি মুস্কিল! অন্যায় কেন হবে ? ঠিক কথা, চমৎকার কথা।……হ্যাঁরে উজল, তপেশ আর আসে না তো ?

উজ্জলা : মানে ? পরশুতো এসেছিলো।

চন্দ্রনাথ : পরশু ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ পরশুই বটে। আমার মনে থাকে না। এই ভুলের জন্য. জানিস উজল, তোর মা ভারি রাগ করতো, ভারি রাগ করতো।

উজ্জলা : বাবা, মায়ের জন্য তোমার মন কেমন করে ?

চন্দ্রনাথ : (থেমে থেমে) তা করে।……হ্যাঁ করে। এক একবার বড্ড করে।…… না, না। দুঃখ আমি করবো না। বুক আমার ভ'রে আছে। উজ্জলা মা আমার বুকটা উজ্জল ক'রে রেখেছে। অন্ধকার হ'তে দেয় না। ….. কিন্তু তপেশ তো সেই পরশু এসেছিলো। কাল এলো না, আজও দেখা নেই। (এমন সময় তপেশ প্রবেশ করলো। হাত কাটা। রক্ত পড়ছে।

তপেশ : শীগ্‌গির, ফার্ষ্ট এডের বক্স। বড্ড কেটে গেছে।

চন্দ্রনাথ : য়্যা ? কেটে গেছে ? কি ক'রে কাটলো ? না, তোমরা সব বড়ো চঞ্চল। (উজ্জলা উঠে গিয়েছে ইতিমধ্যে।)

তপেশ : কি ক'রে কাটলো পরে বলছি। আগে…

চন্দ্রনাথ : ভজহরি, ভজা, ওরে ও ভজা……কোথায় যে থাকে ? কোনো কর্মের নয়। আমার বইগুলোও দেখেনা। বাড়ির কাজও করে না! অপদার্থ। (ফার্ষ্ট এডের সরঞ্জাম হাতে উজ্জলা ও ভজুর প্রবেশ) ওঃ, এইযে মা : ভজহরি যখন আছে……বলতে না বলতেই এসে হাজির। উজল. আমি কি কিছু ধরবো ? ঐ ব্যাণ্ডেজটা ?

তপেশ : আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? সামান্যই লেগেছে। উজ্জলাই সব করতে পারবেন। উনি যে ফার্ষ্ট এডের সব শিখে নিয়েছেন।

চন্দ্রনাথ : তা আমি বসছি। (বসলেন।) এই বললে না বড্ড কেটে গেছে, আবার বলছো সামান্য লেগেছে। তোমরা বড্ড মিথ্যে কথা বলো, অত্যন্ত মিথ্যে কথা বলো।

উজ্জলা : যা বলেছো বাবা। কিছু কাটে নি। হয়

হো মিথ্যে কথা ব'লে আমাদের সেবাটা আদায় ক'রে নিলেন।

চন্দ্রনাথ: মিথ্যে? মিথ্যে কিরে? টকটকে রক্ত। আমি কি দেখি নি? না উজ্জল্। ঐ তোর কেমন দোষ। সব কিছুকে তাচ্ছিল্য করা।

তপেশ: যা বলেছেন। আমাকে উনি ভারি তাচ্ছিল্য করেন।

চন্দ্রনাথ: কি মুস্কিল। তোমাকে কেন? আমাকে তাচ্ছিল্য করে আমি বললুম? তোমরা বড্ড ভুল বোঝো। ও তোমাকে আদৌ তুচ্ছ করে না। বরং·· হ্যাঁ, বরং ভালোইবাসে।

উজ্জলা: (কৃত্রিম রোষে) বাবা?

চন্দ্রনাথ: রাগ ক'রে চোখ পাকালে কি হবে মা, সাইকলজিতে আছে, সাইক·····

উজ্জলা: সাইকলজি তোমার ভুল।

চন্দ্রনাথ: ভুল? বলিস কিরে? সাইকলজি ভুল?

উজ্জলা: হ্যাঁ।

চন্দ্রনাথ: না, না, প্র্যাগম্যাটিক্ জেম্স্ তো ভুল করে না মা। এমন কি ম্যাক্‌ডুগাল পর্যন্ত তার সোসাল্ সাইকলজিতে····· দাঁড়া নিয়ে আসি ওখানা।

উজ্জলা: বাবা, ওটা রাত্রে শুনবো, এখন থাক্।

চন্দ্রনাথ: সেই ভালো।...···আচ্ছা তপেশ তো বুড়ো হয়নি। ওর তো চোখের দৃষ্টি ঠিক রয়েছে। বলোতো বাবা, তুমি যখন রক্ত মেখে ঘরে এলে, মায়ের আমার যুঁইফুলী মুখখানা শুকনো ঘাসের মতো ফ্যাকাসে হ'য়ে যায় নি? মাথা নাড়লে কি হবে মা? আচ্ছা বেশ, রাত্রে তোমাকে ম্যাক্‌ডুগালের···

উজ্জলা: যাও।

চন্দ্রনাথ: যাবো? তা না হয় যাচ্ছি। দেখি গে বইগুলো আমার যা এলা মেলো হ'য়ে আছে।···(প্রস্থান)

তপেশ: বেশ বাঁধা হয়েছে। ভজা, এসব নিয়ে যা। (ভজু ফার্ষ্ট এডের সরঞ্জাম নিয়ে গেলো। তপেশ ও উজ্জলা স্বতন্ত্র আসনে বসলো।)

উজ্জলা: খুব লেগেছে? (চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

চন্দ্রনাথ: কিন্তু কাটলো কি ক'রে? হ্যাঁ?

তপেশ: আসবার পথে একটি মেয়েকে গলির মধ্যে এক গুণ্ডা পিছু নিয়েছিলো। যেই তার সামনে গিয়ে বলেছি, "কী মতলব?" অমনি "মতলব জবর" ব'লেই গপ্ ক'রে ছুরিটা···কব্জিটা ধরে ফেলেছিলুম তাই······

উজ্জলা: সত্যি?

তপেশ: মিথ্যে।

চন্দ্রনাথ: চমৎকার ছেলে তুমি তপেশ। এই চাই, এই বীরত্বই চাই। তা না হ'লে খালি স্নুস শুঁকে শুঁকে কোঁচা দুলিয়ে দুলিয়ে কাব্যি ক'রে বেড়ালে······

তপেশ: সে আবার কে?

চন্দ্রনাথ: উজ্জলকেই জিজ্ঞাসা করো। দেখ মা, যার সংগে হোক মেলামেশা কর। কিন্তু মানুষ চিনতে যেনো ভুল না হয়।...···তপেশ এখন আর কোনো কষ্ট?...

তপেশ: না, এখন বেশ সুস্থ হ'য়েছি।

উজ্জলা : সে-মেয়েটির কি হ'লো ?

তপেশ : সংগে এক বন্ধু ছিলো ; তাকে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছি।

চন্দ্রনাথ : তপেশ, তুমি আর আসো না কেন ? যতো সব বাজে লোক......রোজ তুমি আসবে। তোমাকে রোজ আসা চাই-ই।

উজ্জলা : ওঁর না দুমাস বাদে পরীক্ষা ? পড়াশুনা নেই বুঝি ?

চন্দ্রনাথ : কেন, এখানে এসে পড়া যায় না ? ওকি এতো মোটা যে আমার ঘরের কোনো চেয়ারে ওকে আঁটবে না ? (তপেশ ও উজ্জল হেসে উঠলো।) কি হ'লো আবার ? হাসবার কি হ'লো ? তোমরা ভারি চপল, ভারি ছেলে মানুষ ! (প্রস্থান)

উজ্জলা : (তপেশকে উঠতে দেখে) ওঠা হচ্ছে যে ?

তপেশ : আসা যাওয়া প্রেমের তুফানে। অর্থাৎ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আবার আসছি। আসতে হবেই। কারণ কিছু কথা আছে।

উজ্জলা : ভূমিকাটা ক'রে গেলে হ'তো না ?

তপেশ : না, উৎকণ্ঠায় রাখলুম।......কি হ'লো রাগ ? তা হোক্। ওটা সুলক্ষণ। (প্রস্থান।)

(যবনিকা প'ড়েই আবার উঠবে তখনই।)

দ্বিতীয় অংক—প্রথম দৃশ্য।

(শ্রীমতী উজ্জলার ড্রইংরুম। পুষ্পাধারে সদ্য ফোটা গোলাপ। ফুলের আঘ্রাণ নিয়ে উজ্জলা একখানি আসনে বসলো।)

উজ্জলা : ভজু ? (ভজহরি ঝাড়ন দিয়ে একখানি মোটা বই মুছতে মুছতে ঘরে প্রবেশ করলো।)

ভজু : কি দিদিমনি ?

উজ্জলা : একখানা বই আমি পড়তে পড়তে টেবিলের উপর রেখে দিয়েছিলুম। সেখানা গেলো কোথায় ? এই রাখলুম আর এই উবে গেলো ? (ভজহরি এদিক ওদিক চেয়ে একখানি চেয়ারের উপর থেকে সেখানি আবিষ্কার করলো।)

ভজু : এই তো। সামনেই ছিলো। তুমিও বাবুর মতো ভুলো হ'য়ে যাচ্ছো।

উজ্জলা : বেশ করছি। তোকে বকতে হবে না। এতোক্ষণ করছিলে কি ?

ভজু : (ঝাড়ন আর বই দেখিয়ে) এই যে। কি আর করি বলো, ধুলা না থাকলেও ঝাড়া চাই। গোছানো থাকলেও আবার গোছানো চাই। (নেপথ্যে চন্দ্রনাথ ডাকলেন "ভজহরি"।) ঐ আবার ডাকছেন। যাই। (প্রস্থান। উজ্জলা পাঠে মন দিলো। কিছু পরেই দ্বার পথে অতনুর আবির্ভাব।)

অতনু : আসতে পারি ?

উজ্জলা : ওঃ আপনি ? আসুন-আসুন। নিশ্চয় আসতে পারেন। আসবেন কিনা তার আবার অনুমতি চাইছেন ? আসবেন ব'লেই তো পথ চেয়ে ব'সে আছি। (অতনু বসলো।)

অতনু : কেন। বেশ তো বই পড়ছিলেন।

উজ্জলা : কি আশ্চর্য ! বই কি আর কেউ শুধু শুধু পড়ে ? বই পড়ে কাজের অভাবে। একলা একলা আর ভালো লাগে না কবি। বিশেষ এই সন্ধ্যার সময়টা।

অতনু : কেন, আপনার বাবার কাছে বসলেই তো—

উজ্জলা : বাবার কাছে বসাও যা, একলা থাকাও তাই। তিনি সমানে আপনার বই পড়ায় ডুবে থাকবেন আর কেবল মধ্যে মধ্যে বলবেন, "উজল ওঃ তুই আছিস্ ? থাক্।" কিন্তু আপনি হয়তো বাড়ি থাকলে এই সময়টা কাব্য লিখে, কতো মন-ভোলানো কাব্যলিখে কাগজের পর কাগজ ভরাতেন। এখানে এসে সময়টা মিছিমিছি নষ্ট হবে হয়তো।

অতনু : নষ্ট ? না, না, নষ্ট নয়। এই সন্ধ্যায় সময় যদি কাব্যের বদলে কাব্যের উৎসটার কাছে বসতে পাই, যদি তার বাণী শুনি কানে, যদি তার স্পর্শ অনুভব করি দেহের তন্তুতে তন্তুতে তবে যে আমার এই সন্ধ্যা আরো সার্থক হ'য়ে উঠবে উজ্জলা দেবী !

উজ্জলা : অর্থাৎ এইখানে সন্ধ্যাটা কাটাতে আপনার ভালোই লাগবে ?

অতনু : নিশ্চয়ই। এমন তরুণী সন্ধ্যা, এমন তরুণ

বসন্ত, এমন তরুণী……একি ! বাঃ চমৎকার। এমন গোলাপ আপনার, মাত্র আপনার বাগানেই ফোটে। (উজ্জলা একটা ফুল কবির হাতে দিলো।)

অতনু : (ঘ্রাণ নিয়ে) ফুলের সৌরভ যেনো দেহের সৌরভ।

উজ্জলা : কার ?

অতনু : (আবিষ্টতর স্বরে) ফুল কুমারী যেজন ওগো তার। (উজ্জলা ভংগীতে চুমকে পড়লো।)

অতনু : ফুলের রূপ যেনো দেহের রূপ।

উজ্জলা : কার ?

অতনু : (পূর্ববৎ আবিষ্টতর স্বরে) কুসুম রূপসী যে জন ওগো তার। (উজ্জলা ভংগীতে চুমকে পড়লো।)

উজ্জলা : ফুলের আদর কবিরাই জানে। তাই তো কতো যত্নে তুলে এনে রেখে দিয়েছি।

অতনু : যত্ন ? কতো যত্ন দেবী ? যতো যত্নে বেঁধেছেন কবরী……

উজ্জলা : সেও অতো যত্নে বাঁধিনী।

অতনু : যতো যত্নে পরেছেন শাড়ি খানি……

উজ্জলা : সেও অতো আদরে পরিনি।

অতনু : যতো যত্নে বেছে নিয়েছিলে শাড়ির অনুরূপ ব্লাউস……

উজ্জলা : সেও অতো খুশীতে করিনি, যেমন খুশীতে ফুলগুলি তুলেছি, তাদের এনেছি, তাদের রেখেছি। জানেন কবি ঐ ফুলগুলি আমার মুখে চেয়ে কতো কথা বললো !

অতনু : কথা ? কথা ! কাব্য।

উজ্জলা : ভাব আসছে নিশ্চয়। বলুন কবি, অতনু বাবু বলুন আপনার কোনো কথা, কোনো কল্পনা, কোনো রচনা। কবি শেখরের কল্প কাব্যের গুঞ্জন কানে নিয়ে উধাও হ'য়ে যাই……

অতনু : হ্যাঁ হ্যাঁ। বলুন, উধাও হ'য়ে যাই মেঘের দেশে, তারার রাজ্যে। উধাও হ'য়ে যাই, ছুটে যাই, উড়ে যাই, ডুবে যাই ··তবে শুনুন উজ্জলা দেবী, সারা বিকাল যে-কবিতার গুঞ্জন করেছি তা শুনুন।

উজ্জলা : বলুন।

অতনু :

সজল তোমার কাজল আঁখি কলিজা মোর ভাঙলো,
মধুর তোমার মদির দিঠি তীব্র শেল হানলো।

(উজ্জলা মুদ্রিত চক্ষে কবিতাটী অস্ফুটে আবৃত্তি করতে করতে দুলতে থাকলো।)

চন্দ্রনাথ : (ঘরের মধ্যে না এসে বাহির হ'তে) উজল আমি একটু বেড়িয়ে আসছি মা। ফিরে এসে তোমাকে ম্যাক্‌ডুগাল খানা প'ড়ে শোনাবো। জার্মান ফ্রেনোলজিষ্ট গলখানাও…(উজ্জলা দ্বারের কাছে উঠে এলো।)

উজ্জলা : হ্যাঁ বাবা, সে বেশ হবে।

চন্দ্রনাথ : আহা কি মুস্কিল ! উঠে আসতে তোকে কে বললো ? ব্যস্ত হওয়া তোর কেমন স্বভাব। বা তুই। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরবো ; কেমন ? জোসেফ গল বলেন…(প্রস্থান। উজ্জলা নিজের আসনে এসে বসলো।)

অতনু : উজ্জলা দেবী, আমি এবার আঁখি গ্রীবা, অধর, প্রত্যেকটা অংগ নিয়ে নতুন কাব্য লিখবো—

উজ্জলা : কালিদাসকে পিছু হটিয়ে দিতে হবে কিন্তু। (অতনুর ভৃত্য নরহরির প্রবেশ।) কি প্রলয় ? খবর কী ?

নরহরি : কবিদাদাকে মা খুঁজতেছেন। মামাবাবু চলে যাবেন কি এখনি। ব'লে দিলেন যে অবশ্য যেতে।

অতনু : প্রলয়, তোর নাম প্রলয় ঠিকই দিয়েছি। তুই মূর্তিমান প্রলয়। আমার এমন ভাবটা এমন কল্পনাটা মাটি ক'রে দিলি ? সৃষ্টিতে এমন বাদও সাধলি তুই ? সত্যিই তুই প্রলয়।...উজ্জলা দেবী, আমি প্রলয়ের ভাব নিয়েই কাব্য রচনা করবো। লিখবো প্রলয় চোখের চাহনি, প্রলয় গ্রীবার হেলনি, প্রলয় ঠোঁটের বলনি। (দেখা গেলো নরু দূরে সরে গিয়ে চোখ মুদে কবিতার ছন্দে ছন্দে দেহভংগী করছে।)

উজ্জলা : দেখুন, অতনুবাবু দেখুন, আপনার প্রলয়েরও ছন্দ এসেছে। সে তালে তালে নাচছে। (নরহরির কুণ্ঠা ও লজ্জার ভান)।

অতনু : ধন্য আমি। সামান্য নরু...ইয়ে···সামান্য প্রলয়কেও ছন্দে চন্দে জাগিয়ে তুলেছি।

উজ্জলা : কিন্তু অতনুবাবু, এই দুঃখিনী নারীর একটি অনুরোধ রক্ষা করতে হবে যে।

অতনু : নিশ্চয়ই। এখনই। বলুন।

উজ্জলা : মা ডাকছেন। বাড়ি গিয়ে শুনে আসুন। না হ'লে আমি দুঃখিত হবো। রাগ করবো।

অতনু : না, না। রাগ করতে দেবো না। দুঃখ পেতে দেবো না। যাবো আমি যাবো। কিন্তু আমি যে একটি কথা বলতে এসেছিলুম সে কথা তো বলা হ'লো না।

উজ্জলা : কি কথা ?

অতনু : একটু পরে আমি কাব্য সভায় যাবো। তিনখানি বাড়ি পরে। আপনাকে একবার দয়া ক'রে সেখানে চরণ ছোঁয়াতে হবে।

উজ্জলা : দেরি হবে না তো ?

অতনু : না, দেবী, না। শুধু আপনার ক্ষণিকের দর্শন। চকিত চপলার চমক যেমন। (নরহরি এতোক্ষণ সরে গেছে।)

উজ্জলা : যাবো। বন্ধুদের ব'লে রাখবেন। ভুলবেন না।

অতনু : (যেতে যেতে) মধুর দিঠি ভুলবো না, সজল আঁখি ভুলবো না, দুলের দোলা ভুলবো না। (প্রস্থান)

উজ্জলা : বাব্বাঃ, এইবার হাঁফিয়ে উঠেছি। (ভজুর প্রবেশ।)

ভজু : তপেশ বাবু এসেছেন।

উজ্জলা : (আনন্দে লাফিয়ে উঠে) চলো চঞ্চল। এই তো চাই। (ভজু চলে গেলো। তপেশের প্রবেশ।) একি ! আমিই যে এগিয়ে যাচ্ছিলুম অভ্যর্থনা করতে।

তপেশ : আমিই না হয় এগিয়ে এলুম অভ্যর্থনা নিতে, কিন্তু ঐ অতনু জর্জরটাকে আর কেন ?

উজ্জলা : বাজারে কাকাতুয়া পেলুম না, খরগোস পেলুম না—তবে কি পুষবো ?

তপেশ : ভারি ফাজিল হ'য়েছো, না ?

উজ্জলা : ধমক দাও, তোমাকে ভালো দেখা'বে আরো,.. কবি আবার ওদের কাব্য সভায় যেতে ব'লে গেলো। তুমি একটু বাবার সংগে গল্প করো-না ? আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসবো। ওদের আড্ডা জানি। তিনখানা বাড়ি পরে।......তুমি যেমন আমায় ফেলে পালিয়ে ছিলে তেমনি। ইতি শোধ বোধ।

তপেশ : কবি বাড়িতে আসে তাতে হ'লো না ? কবিদলের মধ্যে যেতে হবে ?

উজ্জলা : বকছো ?

তপেশ : হ্যাঁ।

উজ্জলা : খুব ভালো লাগছে। রেগেছো তো ? মনিবিরানা ? ওটা ভালো লাগে। সুলক্ষণ।

তপেশ : তবে রে (এগিয়ে গেলো। কৃত্রিম কোপে) যাদু চপেটাঘাত।

[এখানে 'যাদু' বা 'জাদু' দুইই সম্ভব। কেন না, আদরের যাদু অন্তঃস্থ 'য'। মোহাবিষ্ট করার অর্থ বুঝতে গেলে বর্গীয় জ।—ইতি নাট্যকার]

দ্বিতীয় অংক—দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ইন্দ্রনার বাগানে ভজু ও নরু)

ভজু : তোর দাদা বাবু চ'লে গেলো, তুই যাবি না?

নরু : পরে। আমি সংগে গেলুম কি গেলুম না, দাদাবাবুর খেয়াল থাকবে নাকি?

ভজু : বড়োলোকদের কতো না রোগ। ছড়া কাটার রোগ ঐ তোর দাদা বাবুর। ওদের একটি দল আছে পাড়ায়। ঐ বাড়িতে।

নরু : ছিষ্টি ছাড়ারে—ছিষ্টি ছাড়া। বর' বলে, আমার সংগে একদিন কবিদাদার কবির লড়াই দেবে। বস্তির সবাই শুনবে।

ভজু : বর' বলে ভালো।

নরু : আর আমিও ছড়া কাটতে পারি কি না, আগে যে যাত্রায় সাজতুম।

ভজু : আমার দিদিমনি কিন্তু লোক খুব ভালো।

নরু : কিন্তু ব্যাটাছেলে মরদকে নিয়ে এই রকম রং তামাসা করাটা কি ভালো? তুই-ই বলনা? দাদাবাবু তো তোর দিদিমনির রসে ঢলো ঢলো রস বড়া।

ভজু : মরেছে রে, রসো মালাই মরেছে' দিদিমনির যে খোঁটা বাঁধা আছে রে হতভাগা।

নরু : কই খোঁটা?

ভজু : কেন, তপেশ বাবু। সেই যে ডাক্তার হবে। খাসা লোক। ব্যাটাছেলে যাকে বলে। মরদ বটে।

(বরদার প্রবেশ)

বরদা : বলি নরু, এখানে বসে, বসে, মস্করা কাট ছিস্, ওদিকে ঘরের সব কাজকম্ম বর' মাগি একাই ক'রে মরবে বুঝি ?

ভজু : আর ও মিন্সে বুঝি খালি ফাঁকি মারে বরদা ?

বরদা : দেখতো ভজা, কখন এসেছে দাদাবাবুকে ডাকতে, দাদাবাবুকে দেখলুম পথে ফিরতেছে, আর এ মিন্সে এখানে মকেল মারতেছে।

ভজু : আহা বর' চটো কেন ? ছুটো ছড়া গেয়ে ও তোর হাড়টা জুড়িয়ে দেবে।

বরদা : মরণ আর কি ছড়ার।

ভজু : কেন, তোর দাদাবাবুর চেয়ে ভালো না ?

বরদা : তা ভালো, একশো বার। বল্-না নরু' সেই ছড়াটা বল্-না ভজাকে। সেই যে সেই। আমার আবার ছাই মনেও থাকে না। না ভাই ভজা' আজ যাই, অন্য এক সময় হবে। চল্ নরু, বাড়ি চ'।

ভজু : তা বর, নরুর সংগে চলছে কেমন ? ঐ সব কবিগুলার মতো ?

বরদা : মরণ আর কি ! কবিগুলোরা হাঁংলা। আমরা গরীবগুর্বোমনিষ্যি। খিদে আছে।......চল নরু, (হাত ধ'রে নরুকে উঠালো।)

নরু : (উঠে দাঁড়িয়ে বরদার দাড়ি ধরে)
নরুর পাশে বর' রাণী, রংটি এঁটেল কাদা।
কলিকালের লব কেষ্ট, তার পাশেতে রাধা।

বরদা : (হাত ছেড়ে) মরণ আর কি !

নরু : তোর রূপের গাঙে বান ডেকেছে ওরে পচুর মা।
মোর বুকখানা যে রোদে ফাটে করছে খাঁ খাঁ।

বরদা : এতো লোককে যমে নেয় তোকে মরণ ডাকে না ?

নরু। মরণের ডাক এসেছে বরদা সাগর।
তুনের জ্বালায় জ্বলে ম'লো নরহরি নাগর॥

ভজু : আহা বেশ ! (কোমর বেঁকিয়ে নেচে নিলো।)

দ্বিতীয় অংক—তৃতীয় দৃশ্য।

(কবি অতনু প্রমুখ কবিদের কাব্য কুঞ্জ। ঘরখানি ইতিহাস বিখ্যাত সুন্দরী তরুণী ও চলচ্চিত্রের দেশি-বিদেশী অভিনেত্রীদের প্রতিকৃতিতে ভরা। কাব্য সভার কবিরা প্রায় সকলেই উপস্থিত। কেবল অতনু শেখর নয়। কবিরা সকলেই বেদনাতুর। কেউ ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাস ফেলছে। কেউ ফোঁপাচ্ছে। কেউ উর্ধমুখে কোনো তরুণীর ছবির দিকে করুণ নয়নে চেয়ে আছে।

কন্দর্পকেশর : বড়ো বেদনা ! (বলার সংগে সংগে সকলেই ফুঁপিয়ে—উঠলো। এর পর কবিকুল প্রত্যেকে এক এক চরণ কবিতা আবৃত্তি ক'রে মর্মভেদী হা হুতাশ সহকারে বিষন্ন হ'য়ে পড়বে।)

প্রথম কবি : প্রেম ও কবিতা অভিন্ন।

দ্বিতীয় : তরুণী ও প্রেম তো একই।

তৃতীয় : তরুণীই প্রেম।

সকলে : সুন্দরী, তুমি অনুপম। (সুন্দরীদের দিকে করুণ নয়নে চাইলো।)

চতুর্থ : ফুল্ল তোমার অধর।

পঞ্চম : অধর তোমার কাঁদে॥

ষষ্ঠ : বাহু তোমার লতা।

সপ্তম : লতার মতো বাঁধে॥

অষ্টম : গ্রীবা তোমার দোলে।

নবম : পরাণ মোদের ভোলে॥

দশম : উদ্বেল তব বুক।

একাদশ : মুক থুবড়ে পড়ার সুখ, (সংগে সংগে সকলেই মুখ থুবড়ার ইংগিত দিয়ে ফোঁপাতে লাগলো।)

দ্বাদশ : বঙ্কিম ঐ কটি।

ত্রয়োদশ : ঐখানে মোরা লুট॥ (সংগে সংগে সকলে লুণ্ঠিত হবার ইংগিত দিয়ে ফোঁপাতে লাগলো।)

চতুর্দশ : নিতম্বিনীর ফাঁদে।...(অতনুর প্রবেশ।)

অতনু : নিতম্বিনীর ফাঁদে, তরুণেরা সব কাঁদে॥

সকলে : কাঁদে, ওগো, কাঁদে॥ (সকলেরই কান্নার বিচিত্র ভংগী।)

অতনু : আপনারা সব উঠুন।

সকলে : উঠবো। (উঠলো অর্থাৎ স্থির হ'লো।)

অতনু : ক্ষমা চাই প্রেমিকগণ। আমার বিলম্বের জন্য আপনাদের প্রণয়ী-চিত্ত উদ্‌গ্রীব ছিলো জানি,......

প্রথম কবি : বড়ো বেদনা।

দ্বিতীয় : অতি অসহ।

তৃতীয় : অতি অবহ।

অতনু : জানি, বন্ধু, জানি। কিন্তু বিলম্বের কারণ জানলে আপনারা কবি অতনুশেখরকে মার্জনাই করবেন, যেমন মার্জনা করে সকলে দেব অতনুকে।

সকলে : হায় দেব! হায় অতনু! (হাহুতাশ)

অতনু : অত্যন্ত আনন্দ সংবাদ আমি এনেছি।

কন্দর্প : (বিস্মিত) আনন্দ? (সকলেরই বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্র অতনুর দিকে)

অতনু : বুক-কাটা আনন্দ সংবাদের দূত আমি।

সকলে : বক্ষের বেদনা; (হাহুতাশ)

অতনু : শ্রীমতী উজ্জ্বলা দেবী……আপনারা তাঁকে জানেন।

সকলে : জানি।

অতনু : জানেন অর্থাৎ আমার মুখে তাঁর নাম শুনেছেন …

সকলে : শুনেছি।

প্রথম কবি : উজ্জ্বলা, হৃদি গহন তিমির নাশিনী।

দ্বিতীয়। প্রেজ্জ্বলা, চিত চমৎকারিণী দামিনী।

তৃতীয় : ওগো ভামিনী।

চতুর্থ : ওগো কামিনী।

পঞ্চম : অংগ তোমার ক্ষীণা।

ষষ্ঠ : বক্ষযুগল পীণা॥

সপ্তম : ঐ দেহে হবো লীনা।

(ব্যাকরণ অশুদ্ধি উদ্দ্যোগ্য-মূলক। অর্থাৎ অতিরিক্ত মেয়েলি পনা।—নাট্যকার)

সকলে : লীনা, লীনা লীনা। (মাটীতে মিশিয়ে লুটিয়ে পড়ার ভংগী)

অতনু : সংবাদ কি বুঝেছেন?

সকলে : না।

অতনু : শুনুন্।

সকলে : শুনবো। (সকলেই উৎকর্ণ)

অতনু : শ্রীমতী, উজ্জ্বলা……না, না, উজ্জ্বলা মাত্র নন তিনি……শ্রীমতী অত্যুজ্জ্বলা দেবী।

সকলে : সাধু সাধু! শ্রীমতী অত্যুজ্জ্বলা দেবী।

অতনু : থামুন।

সকলে : থামবো।

অতনু : অত্যুজ্জ্বলা দেবী বলেছেন, আজ তিনি সশরীরে এইখানে আমাদের এই কাব্য কুঞ্জে অবতীর্ণা হবেন। (সকলেই দাঁড়িয়ে উঠে উদগ্রীব নয়নে দ্বার পথ তাকালো।)

অতনু : (কব্জি ঘড়ি দেখে) আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

সকলে : (হতাশ ভাবে ব'সে প'ড়ে) উঃ। (বেদনার ভংগী)

অতনু : সজল তোমার কাজল আঁখি।

কন্দর্প : কাজল আঁখি। (ফোঁপাতে লাগলো। অপরের হাহুতাশ।)

অতনু : কলিজা মোর ভাঙ্গলো।

কন্দর্প : ওরে কলিজা মোর। (বেদনার ভংগী। অপরের বিচিত্র কাতরতা।)

অতনু : মধুর তোমার মদির দিঠি।

সকলে : মধুর! মদির! (মুহুর্মুহু শিহরণ পুলক)

অতনু : মধুর তব মদির দিঠি তীব্র শেল হানলো…

সকলে : হানলো, ওগো হানলো। (সকলে বুক চাপড়াতে থাকলো। উজ্জ্বলার আবির্ভাব।)

প্রথম কবি : আঁখির চাহনি শেল। (কাজল আঁকার ভংগী)

দ্বিতীয়। গ্রীবার হেলনি শেল। (গ্রীবাভংগী)

তৃতীয় : কটীর দোলনি। (কটীভংগীমা)

চতুর্থ : চরণ-চরনি শেল। (কর পল্লবের তরংগ ভংগে চরণ ক্ষেপের নর্তনাভাস।)

উজ্জ্বলা : কোথায় বসবো? ("ও:" ব'লেই সকলে আপন আপন আসনের অর্ধাংশ ছেড়ে দিলো। উজ্জ্বলা কর যোড়ে নমস্কার ক'রে অতনুর পাশের একটী শূন্য আসনে বসলো। সকলে হতাশায় দীর্ঘশ্বাসে ছমড়ে পড়লো। এমন সময় একটী কুলি বালক শশব্যস্তে ছুটে এলো।)

কুলী বালক : বাবুরা সব আসুন। আমার মাকে ছুবমন্ মেরে ফেললো।

কবিকুল : (তন্দ্রাচ্ছন্নের বিস্ময়ে) হ্যাঁ ?

উজ্জলা : (একান্ত উৎসুকে) কোথায় ?

বালক : এই কাছেই।...সর্দারকে খবর দিয়েছি, সে বাজারে গেছে।

উজ্জলা : পুরুষরা সব যে যার কাজ থেকে ফেরেনি বুঝি ?

বালক : আমরা বস্তিতে থাকি না। একটু দূরে আলাদা থাকি।

উজ্জলা : চলো, আপনারা সব চলুন,

কবিকুল : (তন্দ্রাচ্ছন্নের বিস্ময়ে) হ্যাঁ ?

উজ্জলা : চলুন, নির্যাতিতা নারীকে রক্ষা করবেন চলুন,

কবিকুল : (আত্মসংশয়ের বিস্ময়ে) হ্যাঁ ? আমরা ?

বালক : চলুন না। মাকে যে মেরে ফেলবে।

উজ্জলা : চলো। আপনারা থাকুন। আপনারা কাব্য-চর্চা করুন। আমি থাকতে পারবো না। (ছেলেটীর হাত ধরে বেগে প্রস্থান।)

কবিকুল : (আত্মসন্তোষে) আমরা কবি।

প্রথম কবি : তরুণীর চলা গেল।

দ্বিতীয় : মরম বিঁধিয়া গেলো॥

তৃতীয় : ত্বরিত চরণে চলা।

চতুর্থ : সে যে কতো কথা বলা॥ (দু'জন জোয়ান লোকের লাঠি হাতে প্রবেশ)।

প্রথম ব্যক্তি : বাবুরা সব চলুন। মা বললেন।

কবিকুল : (অপ্রত্যাশিতের বিস্ময়ে) মা ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : যে মা এই মাত্র ছুটে গেলেন। আমাদের পথে দেখতে পেয়ে আপনাদের নিয়ে যেতে বললেন। দলের বাকি দুজন মা'র সংগে গেছে।

কবিকুল : (অপ্রত্যাশিতের বিস্ময়ে) আমাদের ?

উভয় ব্যক্তি : হ্যাঁ। চলুন। (দুজনের মাত্র হাত ধরিল। বাকি সকলে সভয়ে উঠলো। জোয়ান দুজনের সংগে ওরা শংকিত পদক্ষেপে চললো। যাবার সময় পরস্পর পরস্পরকে বলতে থাকলো "আমাদের !!!")

দ্বিতীয় অংক—চতুর্থ দৃশ্য

[উজ্জলার ড্রইং-রুম। তপেশ ও চন্দ্রনাথ উপবিষ্ট।]

তপেশ : ও য়্যাডলার, জুং আর ফ্রয়েড আমি পড়িনি। তবে হ্যাভেলক এলিস আমি পড়েছি।

চন্দ্রনাথ : লকের "হিউম্যান আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং" পড়েছো ? ডাক্তারদেরও সাইকলজি ফিলজফি জানা ভালো। না ? ফ্রেনোলজিষ্ট গল্ বলেন...(উজ্জলার প্রবেশ) এই মা ; তোমরা গল্প করো তপেশ, আমি যাই। ম্যাক্‌ডুগালের "সোসাল সাইকলজি" খানা একবার... (প্রস্থান।)

তপেশ : কাব্য কুঞ্জবিহার হ'লো।

উজ্জলা : হ্যা। রাগ তাহ'লে সত্যিই হ'য়েছে। সুলক্ষণ। তারপর, কি কথা যে বলবার ছিলো ?

তপেশ : রাগ হয়নি।

উজ্জলা : তবে ? ঈর্ষা ?

তপেশ : রামো:, ওদেরকে আবার ঈর্ষা ?

উজ্জলা : ওরা ঈর্ষার অযোগ্য এইতো ?

তপেশ : বলতে গেলে তাই বলতে হয় ; অহঙ্কারের মতো শোনালেও।

উজ্জলা : সুলক্ষণ। অহঙ্কারটা ভালো লাগছে।

তপেশ : কাকাতুয়াটা এবার ছেড়ে দাও না ?

উজ্জলা : দেবো ছেড়ে।

তপেশ : কবে ছাড়বে ?

উজ্জলা : কবের খবর আমি কি জানি ? ওতে আমার একার হাত ?

তপেশ : মানে ? হেয়ালি নাকি ?

উজ্জলা : কেন, বোঝা গেলনা ?

তপেশ : বোধ হয় বুঝেছি। অর্থাৎ আমাদের দুহাত এক হ'লেই...... (চন্দ্রনাথের প্রবেশ)

চন্দ্রনাথ : হাতের কথা কি যেনো বলছিলে ? তোমার হাতে এখনো কি ব্যথা করছে তপেশ ?

তপেশ : সামান্য একটু করছে।

চন্দ্রনাথ : দেখ দেখি, মা, উজল্ ; এই তপেশ না হ'লে ছেলের কতো সাহস বুল্ দেখি ?

উজ্জলা : সাহস বলে সাহস ;—একেবারে বীর অর্জুন।

চন্দ্রনাথ : দেখ উজল, তোর সকল তাতেই ঠাট্টা।

তপেশ, বাবা, তুমি কিছু মনে ক'রো না। উজ্জল্ মা আমার অন্তরে তোমাকে খুবই ভালো বাসে কি না তাই বাইরে অবহেলার ভান করে।......হ্যাঁ, তাই; ঘাড় নাড়লে কি হবে মা? সাইকলজিতে আছে। কোন্ এক অষ্ট্রীয়ান সাইকলজিষ্টের লেখায় আছে......

উজ্জ্বলা : (কৃত্রিম কোপে) বাবা তুমি থামো। তুমি খালি আমায় বকবে?

চন্দ্রনাথ : ঐ দেখো, আবার অভিমান হ'লো। রাগ হ'লো। রাগের কথা কী বললুম? অমন রাগ তোর মায়েরও ছিলো রে, তোর মায়েরও ছিলো।

তপেশ : উঃ।

চন্দ্রনাথ : য়্যাঁ? কি হ'লো?

তপেশ : হাতটায় লেগে গেলো।

চন্দ্রনাথ : তবে যে বলছিলে সামান্য একটু ব্যথা আছে! তোমরা অত্যন্ত মিথ্যে কথা বলো। স্বীকার করো না ঐ তোমাদের দোষ।

তপেশ : কিন্তু অতো ভালো ক'রে শুশ্রূষা না পেলে ব্যথাটা এতোটুকু সময়েই এতোখানি কমতো না, ডাক্তারি পড়লে উজ্জ্বলা আমার চেয়েও বড়ো ডাক্তার হ'তে পারতেন।

চন্দ্রনাথ : খুব বুদ্ধিমতী। ঠিক ওর মায়ের মতো।... কি হ'লো? উজ্জল্ তুই চললি কোথায়? তুমি ওর প্রশংসা করতে কেন গেল? প্রশংসা ও নেয় না। আমি ঠকেছি কি না।

তপেশ : কিন্তু সত্যিই খুব ভালো ব্যাণ্ডেজ হ'য়েছিলো। আপনি ওঁকে ডাক্তারি পড়ালে বেশ হতো।

চন্দ্রনাথ : কোনো আপত্তি ছিলো না আমার। কোনো আপত্তি নয়। বি, এ পড়বার জন্যে কতো বললে সবাই। ও বলে, 'অতো প'ড়ে কি হবে?' বলে, 'বাবার লাইব্রেরীটাই আমার য়ুনিভার্সিটী, তা বলেছে মন্দ নয়। কি বলো? হ্যাঁ' ভালো কথা মনে প'ড়ে গেলো। ভজহরি? (ভজু প্রবেশ করলো।)

ভজু : কি বলছেন?

চন্দ্রনাথ : বইগুলো একবার ঝেড়েমুছে......(উজ্জ্বলার প্রবেশ। হাতে খাবারের থালা।)

উজ্জলা : কতোবার ঝাড়বে ? সব তো ঝক্ ঝক্ করছে। ভজা, জলের গেলাসটা নিয়ে আয়।

তপেশ : কিন্তু এসব কী ?

উজ্জলা : অনেক পরিশ্রম করেছেন, খিদে পেয়ে গেছে। তাই।

তপেশ : খিদে অবশ্য পেয়েছে। আমাকে ফেলে কাব্য বিহারে গেলেন। বিশ্রাম ক'রে ক'রে অবশ্যই পরিশ্রান্ত হ'য়েছি।

চন্দ্রনাথ : পাবে না খিদে? কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছো। আমারও মনে নেই, ভারি ভুলো মন হ'য়ে যাচ্ছে। আর উজলও বড়ো বেহুঁস। এত দেরি কেন করলি ?

উজ্জলা : অন্যায় হ'য়ে গেছে, বাবা, (বাপকে প্রণাম করলো। নিচু হ'য়ে একটা প্রণাম তপেশকেও করলো।)

চন্দ্রনাথ : তপেশ, তোমাকেও প্রণাম করলো। রক্তে আছে কি না। ওর মাও ঐ রকম প্রণাম করতো। সাইকলজিতে আছে……

উজ্জলা : চুপ্, চুপ্। উনি খাবেন না, গল্প করবেন ?

চন্দ্রনাথ : হ্যাঁ। তা বটে। কিন্তু মা, তুমি হিসেবে বড়ো কাঁচা। Young man, খিদে পেয়েছে। ঐ কখানা খাবারে কী হবে ? আমি বুড়ো মানুষ। আমার পক্ষেই ওটা কম। হ্যাঁ হ্যাঁ তপেশ, হাসছো কি ? যথেষ্ট কম; নিশ্চয়ই কম। তবু তুই উঠলি না উজল ? আমি যাচ্ছি। আমিই যাচ্ছি। ভজা...আঃ, ভজাটা যে কোথায় থাকে ? বইগুলোও দেখবে না, অন্য কাজও করবে না।

উজ্জলা : ব'সো তুমি। আমি আনছি। (বাপের দুটি হাত ধ'রে বলেই চলে গেলো।)

চন্দ্রনাথ : দেখো তপেশ, সাহসই চাই। তোমার মতো সাহসী ছেলেই চাই দেশে। না হ'লে ঐসব কাব্যি-বাতিক অকর্মণ্য ছেলেদের নিয়ে দেশের কোনো লাভ নেই, কোনো মঙ্গল নেই।

তপেশ : কাকে বলছেন ?

চন্দ্রনাথ : ঐ তোমার ওরা হে। (উজ্জলার প্রবেশ। হাতে দু'থালা খাবার।) দেখেছো তপেশ, দেখো একবার। মেয়ের রাগ দেখো। আনতে ব'লেছি ব'লে কি...ওরে ঐ রকম রাগ তোর মায়েরও ছিলো, তোর মায়েরও ছিলো। (প্রস্থান।)

তপেশ : তোমার বাবা তোমার মাকে খুব ভালোবাসতেন।

উজ্জলা : বাবাকে ছাড়িয়ে যেতে যে পারবে তাকেই বলি বীর।

তপেশ : বটে! হরধনুভঙ্গের চেয়েও কঠিনতর পরীক্ষা তো ?

উজ্জলা : তবে নাতো কি ? (অতনুর প্রবেশ। তপেশকে সে দেখলো না। সে আচ্ছন্ন।) এ কি ? আপনি যে ?

অতনু : আপনার সেই বীরাঙ্গনা-মূর্তি এখনো আমি ভুলতে পারছি না। তখনই যথার্থ মনে হ'লো "সুন্দরী, তুমি অনুপম।" (আবেশে চোখ মুদে ছলে ছলে আবৃত্তি করতে থাকলো ঐ কথা কয়টি। উজ্জলা এই অবসরে জিব্ বের ক'রে ভেংচে নিলো অতনুকে। তারপর অতনু চোখ চাইতেই ওর এতো হাসি পেলো যে আর চেপে রাখতে পারলো না। অতনু ওর হাসি দেখে ভ্যাবাচ্যাকার দৃষ্টিতে চাইলো।)

উজ্জলা : জানেন তপেশ বাবু, একটু আগে এক কাণ্ড হ'য়েছিলো। ওঁদের সংগে কাব্যালোচনা করছি এমন সময় কাছের বস্তি থেকে একটি কুলি ছেলে এসে ডাকলো। তার মাকে নাকি কে অপমান করছে। ওঁরা গেলেন না। আমিই গেলুম। শেষে ওঁরা গেলেন সেই কথাই বলছেন ; আমার দেরি হ'য়ে গেলো ঐ জন্যেই।...জানেন কবি; সেই গাছকোমর বাঁধা নিজের মূর্তিটা স্মরণ ক'রে কি হাসিই পাচ্ছে। নিশ্চয়ই আমাকে খুব বিশ্রী দেখতে হ'য়েছিলো তখন ?

অতনু : বিশ্রী ? না দেবী বিশ্রী নয়। সে মূর্তি অনুপম। সে-মূর্তির কাছে যে-কোনো বীরাঙ্গনা মূর্তিই নিভে যায়।

উজ্জলা : সত্যি ?

অতনু : তার কাছে রাণী দুর্গাবতী কিছু নয়, জোয়ান আর্ক নগণ্য। সে মূর্তি দেখে এইমাত্র বলা চলে, "সুন্দরী, তুমি অনুপম।"

উজ্জলা : আপনার ঐ এক কথা। কবিতার ভাণ্ডারে আজকাল দৈন্য ঘটছে। নতুন কিছু রচনা করুন। (গম্ভীর হ'য়ে ক্ষণকাল মৌন রইলো অতনু। আগন্তুক ছন্দের আবেশে দুলতে থাকলো।)

অতনু : রণরঙ্গিনী কবি দোলে।
গ্রীবা ভঙ্গিনী অসি খোলে॥

উজ্জলা : আসুন। পরিচয় হোক এবার। কবি, ইনি তপেশ বাবু। আমার বাবার অনুগত।

অতনু : আপনার বাবার অনুগত?

উজ্জলা, তপেশ : নিশ্চয়ই।

অতনু : ওঃ।

উজ্জলা : ডাক্তারি পড়ছেন। দুমাস বাদেই পরীক্ষা। আর তপেশ বাবু, ইনি কবি, সুকবি, নব্য বঙ্গের অতি আধুনিক তরুণ কবি অতনুশেখর।

তপেশ : কাব্য? কাব্য বোঝা আমার দ্বারা হ'লো না।

অতনু : কাব্য বোঝা হ'লো না? সে কি? কাব্য সে যে আমাদের বেদনা। সে যে আমাদের প্রেরণা। সে যে আমাদের জীবন।

তপেশ : আমরা অপদার্থ। আপনারাই ধন্য।

অতনু : তরুণীর প্রেমে অচল অঙ্গ।
তরুণীর প্রেমে ভাসাবো বঙ্গ।
তরুণীর প্রেমে চিত্ত ভৃঙ্গ।
তরুণীর দেহে দেব আনন্দ॥

তপেশ : বাঃ, বেশ মিল ক'রেছেন তো?

অতনু : মিল? এযে ছন্দ। কাব্যের ছন্দ সে তো তরুণীর চলার ছন্দ। তার গ্রীবার হেলনি, কটির দোলনি।

উজ্জলা : তপেশ বাবু, আপনার হাত কেমন আছে? আর ব্যথা আছে?

তপেশ : না।

উজ্জলা : জানেন কবি, গলির মোড়ে একটি মেয়েকে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তপেশ বাবু হাতে ছুরির ঘা খেয়েছেন।

অতনু : ছুরির ঘা ?

উজ্জলা : একেবারে সত্যি ছুরির ঘা। জলজ্যান্ত ছুরির ঘা।...তারপর ছুটতে ছুটতে আমাদের বাড়ি এসে পড়লেন কাটা হাত নিয়ে। কি করি, বাবার অনুরোধে বেচারিকে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলুম।...তপেশ বাবু, এখন তা হ'লে আর ব্যথা নেই ?

তপেশ : না।

অতনু : আর আপনিই বা কি কম উজ্জলা দেবী ? কতো সাহস আপনার। যখন কুলি ছেলেটির মায়ের পক্ষে রণরঙ্গিনী বেশে দাঁড়িয়ে ছিলেন...

উজ্জলা : আপনারা তো প্রথমটা গেলেন না ঘটনার ক্ষেত্রে। আমি যদি ডেকে না পাঠাতুম...

অতনু : তবে সে হ'তো কবি অতনুর অত্যন্ততম দুর্ভাগ্য। সেইক্ষণের সেই বীরঙ্গনা মূর্তি দেখতে পেতুম না তাহলে। তপেশ বাবুর সাহসও তার কাছে নিভে যায়।

উজ্জলা : কার সংগে কার তুলনা! তপেশ বাবুর সংগে কিনা আমার তুলনা!

অতনু : মানে ? তুলনা ? সত্যি, তুলনা আপনার নেই। আপনি অনুপমা, আপনি আশ্চর্যতমা, আপনি অভিনবতমা। আপনি আকস্মিক, আপনি আবির্ভাব, আপনি আবেশ। "রণ রঙ্গিনী, কটি দোলে, গ্রীবা ভঙ্গিনী অসি খোলে" ওঃ সেই বীরাঙ্গনা রূপ! ভুলবো না, ভুলবো না।

তপেশ : (উঠে উজ্জলার কাছে গিয়ে) এতো সাহস যখন আপনার, দেখি আপনার দেহ কেমন শক্ত ? (হাত দিয়ে প্রত্যঙ্গগুলি পরীক্ষা ক'রে ক'রে) humerus বেশ ভালো।

(অতনু বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তপেশকে দেখতে লাগলো) Scapula ঠিক আছে।

অতনু : (পরম বিস্মিত) হ্যাঁ!

তপেশ : ulna, radius—বেশ মজবুত।

অতনু : (পীড়িত) উজ্জলা দেবী!

উজ্জলা : কি হ'লো কবি ? আপনার শরীর খারাপ লাগছে। মুখ অমন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো কেন ?

অতনু : কাব্যের এই অপমান!!!

উজ্জলা : ওমা, এইজন্যে ? তপেশ বাবুর কথা ধরেন কেন ? ডাক্তারি পড়ছেন কিনা, হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না।

অতনু : বাহু লতিকার দোদুল দোলনে...

উজ্জলা : যা বলেছেন। আর সেই বাহুলতিকাকে টীপে চটকে বলা কিনা Humerus, ulna, radius ? তপেশ বাবু, ডাক্তারি পড়ে' পড়ে' কি আপনার অন্তরে নারীর জন্য আর কোনো মমতা নেই ? ছি, ছি! কবি,

ওঁর কথা ধরবেন না। বাবার অনুগত তাই। না হ'লে (নরহরির প্রবেশ।)

নরু: কবি দাদা, মামা বাবু ফিরে এলেন। ওঁর যাওয়া হ'লো না আজ। আপনি চলুন। মা ডাকতেছেন।

উজ্জলা: কবি, যান। হতভাগিনীর এই কথাটী রাখুন।

অতনু: হতভাগিনী? না, না, না,।

উজ্জলা: যদি কথাটী রাখেন তবে সৌভাগ্যবতী। না হ'লে হতভাগিনী।

অতনু: রাখবো না? আপনার কথা রাখবো না? নিশ্চয় রাখবো। (উঠলো সংগে সংগে উজ্জলাও উঠলো। যাবার সময় উজ্জলা তপেশকে ইংগিত ক'রে গেলো সে এখনই আসছে। ঘরে তপেশ একা। চন্দ্রনাথ এলেন। তপেশ তখন চোখ মুদে খুব হাসছে।)

চন্দ্রনাথ: একি? হ'লো কি?

তপেশ: কবির কাণ্ড দেখে আর হাসি রাখতে পারছিনা।

চন্দ্রনাথ: ওর সংগে উজ্জলাও তো গেলো দেখলুম।

তপেশ: এখনই আসবেন। বলুন তো ঐসব কাব্য রোগীর সাইকলজি কি?

চন্দ্রনাথ: ঠিক বলেছো! আমারও ঐ মত। ওসব রোগ। বাতিক। যাচ্ছে তাই ওসব। কি যে বলি...... একেবারে...হ্যাঁ...বিশ্রী, বিশ্রী। (উজ্জলার প্রবেশ।)

উজ্জলা: কি বাবা বিশ্রী?

চন্দ্রনাথ: (অকপটে ভেংচে) কি বাবা বিশ্রী? (বৃদ্ধের এই সরলতায় উজ্জলা ও তপেশের হাসি।) তা হাসো। আর যাই করো। রাগ হ'লে আমার ভালো লাগেনা কিছু। ও রকম যা' তা' একটু বলে' ফেলি অবশ্য সে আমার দোষই।

উজ্জলা: না, না,। দোষ নয়। (উজ্জলা এসে বাপের দুটী হাত ধরলো।)

চন্দ্রনাথ: হ্যাঁ? সত্যি? সত্যি নয়? তপেশ, উজ্জল ভুল করেনি যা ভয় আমার হয়েছিলো। উজ্জল তোমাকেই তপেশ, তোমাকেই ভালো বাসে। (উজ্জলা বাপের বুকে মাথা রাখলো। অতনুর পুনঃ প্রবেশ।)

উজ্জলা: বাড়ি গেলেন না? চলে এলেন?

অতনু: যেতে পারলুম না উজ্জলা দেবী। পায়ে পায়ে ধ'রে বাধা দিলো পথ। মন মনোরথ পশ্চাতে লভিল গতি। সেথা এই রূপবতী এই যে শ্রীমতী—উজ্জলা দেবী, এবার আমি অতি কোমল ক'রে অমিত্রাক্ষর লিখবো।

উজ্জলা: কবি, আপনার দল বল নিয়ে এখানে আসবেন কাল সন্ধ্যায়?

অতনু: আসবো? এখানে? সকলে?

উজ্জলা: হ্যাঁ আসবেন।

অতনু: কেন?

উজ্জলা: কাল খাওয়াবো আপনাদের। শীঘ্রই আমার বিয়ে।

অতনু (কিং কর্তব্য বিমূঢ়) হ্যাঁ,

উজ্জলা: হ্যাঁ। তপেশ বাবুর সংগে।

অতনু: ওরে কলিজা মোর, (মূর্ছিত। চন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

চন্দ্রনাথ: উজ্জল, এর কি মৃগী রোগ আছে নাকি? ওহে ছোকরা, তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ি যাও না।

উজ্জলা: বাবা, তপেশ বাবুর সংগে আমার বিয়ের খবরটা দিতেই উনি অজ্ঞান হ'য়েছেন।

চন্দ্রনাথ: হোক অজ্ঞান। অজ্ঞান কেন ও মরুকনা। কিন্তু সত্যি মা? খবরটা সত্যি?

উজ্জলা: আঃ, কতোবার মুখ ফুটে বলবো?

চন্দ্রনাথ: হাজার বার বলবি। গলা ফাটিয়ে বলবি, (অতনু অর্ধশায়িত দশায় ফোঁপাচ্ছে) স্বর্গ থেকে তোর মা শুনবে।...ওরে ভজা, বাজা, বাজা, নবৎ বাজা, ওরে, ভজা ওরে বইগুলো এখন থাক.. নবৎ নবৎ... (দরজার ফাঁকে ফাঁকে নরহরি ও বরদা। ভজার অর্ধশরীর ঘরের মধ্যে। সে স্তম্ভিত।)

যবনিকা

'জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনই আমার মনে হয় শিল্পীদের বর্তমানের সব চেয়ে বড় দায়িত্ব। কারণ, পরাধীনতার নাগপাশের ভিতর কোন শিল্পই সুষ্ঠু রূপ লাভ করতে পারে না। জাতীয় শিল্পের পূর্ণ বিকাশ একমাত্র স্বাধীন দেশেই সম্ভব।' মণিদীপা ও শ্রীপার্থিবের সংগে আলোচনা প্রসংগে কানন দেবীর অভিমত।

বুধবার। ২৯শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ)। সকাল বেলা। শ্রীপার্থিব এসে হানা দিলেন। হন্তদন্ত অবস্থায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সম্পাদকের নির্দেশনামা পান নি? এখনও ত প্রস্তুত নন দেখছি।" সহাস্যে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ পেয়েছি। আপনি বসুন। অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?" শ্রীপার্থিব আরো একটু উষ্ণ হয়ে বল্লেন, "ব্যস্ত হচ্ছি কেন! কানন দেবীর সংগে দেখা করতে যেতে হবে, আর আপনি এখনও তৈরী হ'য়ে নেননি!" আমি আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম, "সেত বেলা দশটায়। ঘড়িটা দেখুন না, এখনও যে দু'ঘণ্টা বাকী।" শ্রীপার্থিব তাঁর হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জিত হ'য়ে নরম সুরে বল্লেন, "আচ্ছা আমি অপেক্ষা করছি, আপনি তৈরী হ'য়ে নিন।"

সকাল থেকে আমারও অন্যান্য কাজে মন বসছিলো না। যে কাননের কণ্ঠ সারা ভারতের চিত্রামোদী ও সংগীতপ্রিয়দের মুগ্ধ করেছে—সহস্র দর্শকের অভিনন্দন আশীষে যে প্রতিভাময়ী শিল্পীর স্থায়ী আসন চিত্র জগতে প্রতিষ্ঠিত, আমার মত একজন অখ্যাতনামা মহিলা সাংবাদিক তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে যাবে—বিশেষ করে রূপ-মঞ্চের প্রতিনিধি হিসাবে—এতে মনের মাঝে যে ভীরুতা মাথা উঁচিয়ে উঠেছিল, তাকে অস্বীকার করি কি করে? কেবলই ভাবছিলাম—স্পর্ধা ভরে সম্পাদকের কাছ থেকে যেঁচে যে দায়িত্ব নিয়েছি, যদি তার মর্যাদা রক্ষা করতে অক্ষমতার পরিচয় দি? মনে পড়লো সেদিনের কথা, যেদিন অনুযোগ করে চিঠি লিখেছিলাম সম্পাদককে, "সাংবাদিক জগতে মহিলাদের সুযোগ দেওয়া হয় না কেন? মহিলা শিল্পীদের সংগে সাক্ষাতের দায়িত্ব মহিলাদের ওপর কি অর্পণ করা চলে না? অবশ্য সে মহিলা যদি শিক্ষা দীক্ষায় উপযুক্ত বলে বিবেচিতা হন।" উত্তর পেয়েছিলাম, "রূপ-মঞ্চ উপযুক্ততার বিচারে সে সুযোগ সর্বাগ্রে রূপ মঞ্চ পাঠিকাদেরই দেবে।" বলাই বাহুল্য, রূপ-মঞ্চের পাঠিকার দাবী নিয়ে উপযুক্ততার নজির দেখিয়ে একজন প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়ালুম। তারপর কিছুদিন বাদে একখানা নির্দেশনামা পেলাম, "আগামী ২৯শে ফাল্গুন, বুধবার সকাল ১০টা, কানন দেবীর সংগে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হ'য়েছে। আপনার সংগে শ্রীপার্থিব থাকবেন। তাছাড়া আপনার কোন বন্ধু অথবা আত্মীয় স্থানীয় কাউকে সংগে নিতে পারেন। আলোচনার সময় অবশ্য তাঁর সেখানে উপস্থিত থাকা চলবে না। যে যে প্রশ্নগুলি মোটামুটি জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁর একটা খসড়া পাঠালুম। বাকী প্রশ্নগুলি আলোচনার গতি বুঝে আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন।"

আজ সেই ২৯শে ফাল্গুন। সম্পূর্ণ নূতন জীবনে প্রবেশ করছি। যে দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি, তার সংগেও

রোড আর কবীর রোডের সংগমস্থলে এসে যখন শ্রীপার্থিব স্থানীয় কয়েকজন যুবকদের জিজ্ঞাসা করলেম, "পি ৩।১ কবীর রোডের বাড়ীটা কোথায়?" তখন বুঝলাম, আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি এসে গেছি। ভদ্রলোকেরা এগিয়ে এসে বল্লেন, "কানন দেবীর বাড়ী যাবেনত?—এক, দুই, তিন-খানা বাড়ীর পরেই ঐ দেখা যাচ্ছে।" আমি শুনেছিলাম, কানন দেবীর বাড়ীটা জাহাজী কায়দায় তৈরী। শ্রীপার্থিব সেই বাড়ীর সামনে গাড়ী থামালেন। একজন নেপালী দরোয়ান এগিয়ে এলো। শ্রীপার্থিব জিজ্ঞাসা করলেন, "কানন দেবী বাড়ীতে আছেন?" দরোয়ান বল্লো, "হ্যাঁ আছেন। কার্ড দিন" শ্রীপার্থিব তাঁর তলপি তলপা খুঁজে একখানাও কার্ড পেলেন না। এক-খানি সাদা কাগজের টুকরোতে লিখে দিলেন বাংলাতে—শ্রীপার্থিব, রূপ-মঞ্চ। দরোয়ানকে বিদায় দিয়ে শ্রীপার্থিব বল্লেন, "মাত্র সাড়ে নয়টা! অনেক আগে এসে গেছি। হয়ত

ইতিপূর্বে পরিচিতা হ'য়ে উঠতে পারিনি। ইতিপূর্বে বেতার বিভাগ এবং অন্যান্য বিষয়ে যা দায়িত্ব নিয়ে-ছিলাম—ঘরে বসেই তা সামাধান করে পাঠিয়েছি। এই নূতন দায়িত্বের সংগে জড়িত হ'য়ে একদিকে যেমনি ভয়—অন্যদিকে তেমনি গর্বও হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হ'য়ে নিলাম। অভিভাবকদের অনুমতি পূর্বেই পেয়েছিলাম।

শ্রীপার্থিব নিজেই স্টিয়ারিং ধরেছেন। আমরা পেছনে বসে। গাড়ীতে একটু সময় পেয়ে সম্পাদকের পাঠানো খসড়াটা বারবার দেখে নিয়ে মনে মনে আলোচ্য বিষয় গুলির একটা ছক একে নিচ্ছিলাম। এস, আর, দাশ-

অপেক্ষাই করতে হবে।" তারপর একটু হুসিয়ারী স্বরে আমাকে বল্লেন, "দেখুন! ব্যক্তিগত, বিশেষ করে বিবাহিত জীবন নিয়ে কোন প্রশ্ন করবেন না।" আমি একটু ক্ষুব্ধ হ'য়েই জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার এ সন্দেহ জাগবার কারণ?" শ্রীপার্থিব একটু আমতা আমতা করে বল্লেন, "কারণ, কারণ আপনারা ওবিষয়ে একটু বেশী অনুসন্ধিৎসু। সম্পাদকের দপ্তরে শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা জানতে চেয়ে যাঁরা চিঠি লেখেন, তাঁদের বেশীর ভাগ মহিলা। এই গতকালও কানন দেবীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই অনেক প্রশ্ন এসেছে।"

আমি একটু প্রতিবাদের সুরে বললাম, "সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে জানবেন।" শ্রীপার্থিব নিতান্ত অসহায়ের মত উত্তর দিলেন, "ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলিনি। কেবলমাত্র আমাদের ও বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, এই কথাই বলতে চেয়েছি।" শ্রীপার্থিবের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দরোয়ান এসে হাজির হলো আমাদের নিতে। আমি এবং শ্রীপার্থিব গাড়ী থেকে নেমে তার পিছু পিছু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করলাম। ঘেউ ঘেউ করে বাড়ীর আর এক-জন বাসীন্দা আমাদের আগমন বার্তা ঘোষণা করলো। আমাদের আগমন যে গৃহকর্ত্রী টের পেয়েছেন—'জীফ' বলে ডেকেই জীফকে জানিয়ে দিলেন। জীফ চুপ করলো। ওপরে আমরা তাকিয়ে দেখলাম, সিড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কানন দেবী—আমাদের অভ্যর্থনা করতে তিনি এগিয়ে এসেছেন। শ্রীপার্থিব নমস্কার করলেন। আমিও করলাম। কানন দেবী প্রতি নমস্কার করে আমাদের বসতে বল্লেন। বসবার চেয়ার ছিল দু'খানা—মানুষ আমরা তিনজন। আর একখানার অপেক্ষায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। শ্রীপার্থিব কেবলমাত্র কানন দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার শরীর ভাল আছে ত?"

২৬শে ফাল্গুন, প্রথমে আমাদের সাক্ষাতের তারিখ নির্ধারিত হ'য়েছিল। কানন দেবীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাধ্য হ'য়ে দিন পরিবর্তন করতে হয়। কানন দেবী উত্তর দিলেন, "আপাততঃ ভালই আছে। তবে শারীরিক দুর্বলতা এখনও কাটেনি।"

চেয়ার এলো আর একখানা। চেয়ারে বসতে বসতে শ্রীপার্থিব বল্লেন, "আমার পরিচয় প্রথমেই পেয়েছেন, আর ইনি মণিদীপা। আজকে ইনিই আপনার সংগে আলোচনা করবেন। আমি শুধু মাঝে মাঝে একটু আধটু ফোড়ন কাটবো।" কাননদেবী এবং আমি দু'জনেই হেসে উঠলাম। কানন দেবী বল্লেন, "এত তাড়াতাড়ি আপনাদের সংগে সাক্ষাতের দিন স্থির করলাম এই জন্য যে, আমার প্রতি নইলে একটা অযথা ভুল ধারণা নিয়ে থাকতেন আপনারা। আমি এমন অভদ্র নই যে, একজন সাংবাদিককে চিনে না-চিনবার ভান করবো! ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও পরিক্রমায় আপনি আমার সম্পর্কে যে ধারণা করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভুল। শ্রীপার্থিব বলে আজকেই প্রথম আপনাকে চিনলাম। আপনাদের আদর্শের কথা রূপ-মঞ্চ মারফৎ জানতে পারি। ষ্টুডিও মহলের অনেক বন্ধুদের কাছেও—চিত্র জগতের প্রতি আপনাদের সহানুভূতির কথা আমার কানে এসেছে। তাই আপনারা—এবং আপনাদের মারফৎ রূপ-মঞ্চের পাঠক গোষ্ঠী অযথা আমাকে অভদ্র ভাববেন কেন?"

শ্রীপার্থিব মুখ নিচু করে শুনছিলেন। কাননদেবীর কথা শেষ হবার পর বল্লেন, "তাহ'লে I am success-

ful in my tricks. অর্থাৎ বার বার চিঠি দিয়ে যখন আপনার কাছ থেকে উত্তর আসছিল না—তখন একটু খুঁচিয়ে নিলাম। আমার এই চাতুরীর জন্য আপনার কাছে যেমনি লজ্জিত—অপর দিকে নিজের কাছে কৃতকার্যতার জন্য একটু অহংকারও বোধ করছি।"

কানন দেবী সহাস্যে বল্লেন, "তাহ'লে আপনারা চাতুরীও বেশ জানেন।"

শ্রীপার্থিবের তখনকার অবস্থা দেখে ভারি হাসি পাচ্ছিল। ভয়ানক অসোয়াস্তি বোধ কচ্ছিলেন আমাদের মাঝে। আমি তাড়াতাড়ি প্রশ্নপত্র নিয়ে বসলাম।

—নিছক আনন্দদানই কি ছায়াছবির উদ্দেশ্য? শিক্ষার বাহনরূপে কি ভাবে তাকে নিয়োগ করা যেতে পারে।?

কাননদেবী মুখ উঁচু করে বল্লেন, "যদিও চলচ্চিত্রের আনন্দদানের উদ্দেশ্যকে আমরা কোনমতেই অবহেলা করতে পারি না—কর্মক্লান্ত দেহমন নিয়ে যখন সহস্র সহস্র দর্শক প্রেক্ষাগৃহে ছোটেন—কিছুক্ষণের জন্য ছবি দেখে যে তৃপ্তি লাভ করেন—ছবির এই তৃপ্তি বা আনন্দদানের উদ্দেশ্যও নেহাৎ কম নয়। তবে এই আনন্দদানই ছবির একমাত্র উদ্দেশ্য বলে যারা মনে করেন—আমি তাঁদের ভিতর থেকে সড়ে দাঁড়াবো। চলচ্চিত্রের সাহায্যে আনন্দ দানের ভিতর দিয়েই শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া যায়। বহু ভাবে আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা যেতে পারে চলচ্চিত্রের সাহায্যে। বর্ণমালার সংগেও যাঁদের পরিচয় নেই—তাঁদের শিক্ষার গুরু দায়িত্ব চলচ্চিত্র যতখানি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে—আমার মনে হয়, আর কোন শিল্পই তা পারে না। যেমন মনে করুন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বড় বড় গবেষণামূলক পুস্তক—প্রচারপত্র যতই প্রকাশ করুন না কেন, নিরক্ষর গ্রামবাসীদের ভিতর কিছুতেই ততটা সুফল পাওয়া যাবে না, যতটা পাওয়া যাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পটভূমিকায় একখানি চিত্র নির্মাণ করে যদি তাঁদের দেখানো হয়। দূষিত জল পান করা কেন উচিত নয়—জল দূষিত হয় কেন—দূষিত জল পান

করলে কি বিপদের সম্ভাবনা—ম্যালেরিয়ার হাত হ'তে রেহাই পেতে হলে কি ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বাড়ীর আনাচি কানাচি—কলেরা-বসন্ত প্রভৃতির হাত হ'তে রেহাই পেতে হ'লে কি কি ভাবে চলতে হবে, এসব সম্পর্কে শিক্ষামূলক চিত্রগ্রহণ করে সরকার থেকে গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমান প্রদর্শক দল পাঠানো উচিত। 'শস্য বাড়াও' সম্পর্কে খবরের কাগজ, বেতার প্রভৃতি মারফত প্রচার কার্যের কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? শস্য যারা বেশী জন্মাতে পারে—চলচ্চিত্রের সাহায্যে শস্য বাড়াতে তাদের অতি সহজেই উৎসাহিত করে তোলা যেতে পারে। কি ভাবে জমিতে সার দিলে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে—জলসেচন—হালের গরুর প্রতি যত্ন নেওয়া, শাকসব্জী উৎপাদনে বিভিন্ন পন্থা প্রভৃতি বিষয়ে অতি সহজেই নিরক্ষর গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এসব চিত্র বিভিন্ন প্রযোজক প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে দর্শনী নিয়ে গ্রামবাসীদের দেখাতেও পারেন—তাতে তাঁদের অলাভের চেয়ে লাভের পরিমাণই বেশী আবার সরকার থেকে বিনা দর্শনীতে যদি প্রদর্শন করা যায় তাহ'লেত কথাই নেই।"

এবার শ্রীপার্থিব কাননদেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা এই উদ্দেশ্যমূলক চিত্র যাতে তৈরী হয়, সে

জন্য আপনারা শিল্পীরা কিভাবে সাহায্য করতে পারেন ?"

একথার উত্তরে কাননদেবী বলেন, "আমরা বলতে শিল্পীরা কোন কিছুই করতে পারি না। কোন ধরণের চিত্রগ্রহণ করা উচিত—তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে প্রযোজকদের ওপর। প্রযোজক অর্থাৎ ছবির মালিক যে ধরণের চিত্র গ্রহণ করুন না কেন, আমরা তাতে অভিনয় করতে বাধ্য (অবশ্য যদি চুক্তিবদ্ধ হই)। তবে ব্যক্তিগত ভাবে কেবল প্রেমের ছবিতে অভিনয় করতে আমার আর ভাল লাগে না। কিন্তু আমার চাহিদা বা ইচ্ছামত ভূমিকা কর্তৃপক্ষ দেবেন কেন—? টাকা যখন তাঁদের, ভূমিকা নির্বাচনও তাঁরাই করবেন।"

দেশ এবং জাতীয় সেবায় কি ভাবে চলচ্চিত্র শিল্পকে নিয়োগ করা যেতে পারে, তার উত্তরে কাননদেবী বলেন, "ভারতের গৌরবময় প্রাচীনের বীরত্বপূর্ণ, দেশাত্মবোধক কাহিনীগুলিকে চিত্রে রূপায়িত করে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থায় গলদ কোথায়—কি ভাবে তাকে সংশোধন করে নিতে হবে—কি তার রূপ হওয়া উচিত—চিত্রের মারফৎ তার নির্দেশ দিয়ে দেশ এবং জাতির সেবায় চিত্রশিল্পকে নিয়োগ করা যেতে পারে।"

জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে শিল্পীরা সাহায্য করতে পারেন কিনা এবং কিভাবে করতে পারেন সেকথা জিজ্ঞাসা করলে কাননদেবী উত্তেজিত হ'য়ে বলেন, "নিশ্চয়ই পারেন। জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনই আমার মনে হয় শিল্পীদের বর্তমানের সব চেয়ে বড় দায়িত্ব। কারণ, পরাধীনতার নাগপাশের ভিতর কোন শিল্পই সুষ্ঠু রূপ লাভ করতে পারে না। জাতীয় শিল্পের পূর্ণ বিকাশ একমাত্র স্বাধীন দেশেই সম্ভব। তবে কোন শিল্পী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শিল্পের ভিতর দিয়েই তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন। এবং শিল্পীদের তাই করা উচিত। যেমন মনে করুণ, বর্তমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ওদেশীয় শিল্পীরা যুদ্ধক্লান্ত সৈন্যদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য দেশ দেশান্তর ঘুরে বেরিয়েছেন—তাঁদের হতাশ মনকে উৎসাহিত করেছেন, উদ্বুদ্ধ করে-ছেন। দেশে যাঁরা ছিলেন, যুদ্ধাতঙ্কিত দেশবাসীর মনকে সবল রেখেছেন—ভুলিয়ে রেখেছেন যুদ্ধের ভয়াবহতা হতে। আমাদের দেশের প্রাচীন রাজরাজরাদের কাহিনী যখন পড়ি, তখনও জানতে পারি, বহিশত্রু যখন দেশ আক্রমন করেছে, তখনকার শিল্পীরা সংগীত, অভিনয় ও নৃত্যের ভিতর দিয়ে দেশবাসীর কাছে ঐক্যেরবাণী—দেশাত্ম-বোধকবাণী প্রচার করেছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করে-ছেন। বর্তমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যদি আমাদের যুদ্ধ হ'তো, আমরা শিল্পীরা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় শিল্পী হিসাবেই সাহায্যের জন্য আত্মনিয়োগ করতাম। কোন শিল্পী যদি পাকা আর্থিক বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হন—এবং সেই অর্থের অংশ যদি কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করেন—জাতির সেবায় তাঁর এই-দানই সবচেয়ে বড় নয়—জাতির সেবায় তাঁর এই-ত্যাগ ততটা গর্বের নয়—যতটা গর্বের, যখন শিল্পের ভিতর দিয়ে শিল্পী দেশ সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেন।'

'জাতীয় সরকারের কোন রূপ আপনি আশা করেন ?—আমি যখন কাননদেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম—কোন রকম

জটিলতা বা জানার ভান না করে কাননদেবী নিতান্ত অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ করে বল্লেন, "এবার আমাকে মাপ করুন। এর উত্তর দিতে আমি অপারক। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।"

শ্রীমতী কাননের এই সহজ সরল উক্তিতে আমি এত মুগ্ধ হলাম যে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। কিছুক্ষণ কাননের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। মনের মাঝে যে আনন্দের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিলাম, তা বার বার বাইরে এসে বলতে চাইছিল, "কানন, তুমি সত্যই একজন উঁচুদরের শিল্পী। এরূপ নিরহংকার উক্তি একজন সর্বগুণ সম্পন্না শিল্পীরই যোগ্য বটে।" শ্রীপার্থিবের কথায় আমার চমক ভাঙলো।

শ্রীপার্থিব বল্লেন, "আপনাকে বিভিন্ন সরকারের রূপ (Forms of Government) বিশ্লেষণ করতে হবে না—শুধু আপনার ব্যক্তিগত অভিমত জানতে চাই—কোন জাতীয় সরকারের অধীনে আপনি থাকতে চান, যে সরকার আপনার মত আরও অনেকের ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির ও ভোগবিলাসের দায়িত্ব গ্রহণ করবে—না যে সরকার চল্লিশকোটী নরনারীর মোটা ভাত কাপড়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে—এই দুই জাতীয় সরকারের কোনটির অধীনে থাকতে চান?"

শিল্পীর মুখাবয়ব অপূর্ব দীপ্তিতে ভরে গেল। দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক কণ্ঠে তিনি বল্লেন, "তা যদি বলেন, তাহ'লে আমি মুক্ত কণ্ঠে বলবো—বলবো, যা আমার অন্তরের কথা। আমি সেই জাতীয় সরকারই চাই, যে সরকার ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের নয়—যে সরকার সর্ব সাধারণের—চল্লিশকোটী ভারতবাসীর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে—করবে সুখ সুবিধার ব্যবস্থা। আমি ভুক্তাবশিষ্ট পোলাও নর্দমায় ফেলে দিচ্ছি—আর আমারই পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীরা না খেয়ে ধুকছে—যে সরকারের আওতায় এই বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, সে সরকার আমার বাঞ্ছিত নয়। যে সরকারের অধীনে আমাদের ছেলে মেয়েরা মুক্ত বায়ু গ্রহণ করে—মুক্ত মন নিয়ে বৈষম্যহীন আবহাওয়ার ভিতর পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে গড়ে উঠবে, আমি সেই সরকারের পক্ষেই রায় দেবো।"

এবার আমি প্রশ্ন করলাম, 'শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা লাভে আপনি কি করতে পারেন?' তার উত্তরে কানন দেবী বলেন, "আমি কিছুই করতে পারি না। যদিও আমি চাই, শিল্পীরা যাতে সামাজিক মর্যাদা লাভ করেন। সমাজের সেবায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন—সমাজ যদি তাঁদের দূরে ঠেলে রাখে, সমাজের সেই অনুদার দৃষ্টিভংগীকে কি আপনারা প্রশংসা করবেন? শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা দানের দায়িত্ব সমাজেরই। তবে শিল্পীদের নিজেদেরও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে উঠতে হবে। সমাজ যদি শিল্পীদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়—শিল্পীদেরও উচিত সমাজের গোড়ামী থেকে দূরে সরে থাকা। নিজে-দের জগত নিয়েই শিল্পীদের খুশী থাকতে হবে। শিল্প-জীবনে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত, সমাজের গোড়ামীকে তাঁদের

রূপ হলো
অপরূপ
খরিদ্দারদের
চাহিদামত
স্বর্ণ ও রৌপ্যের হীরা-
মুক্তা-খোচিত সর্বপ্রকার
অলঙ্কার সত্বর সরবরাহ
করা হয়।
আধুনিকতম
পরিকল্পনা
আমাদের বৈশিষ্ট্য
SB

মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কে কী বল্ল—না বল্লো—কোন শিল্পীই সেদিকে দৃকপাত করবেন না।"

আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, "বেশ, যাঁরা শিল্পজীবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা নয় সমাজ থেকে দূরে থাকতে পারবেন। কিন্তু যাঁরা শিল্প-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হননি—সবেমাত্র পা বাড়িয়েছেন—যেমন বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা কাজ করে সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহ করতে আগ্রহান্বিত, তেমনি এ-ক্ষেত্রে পা বাড়িয়েছেন। অথচ স্থায়ী যশ লাভও করতে পারেননি—তাঁরাত সমাজকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করতে পারেন না—তাঁদের সম্পর্কে আপনার কী বলবার আছে?"

এ কথায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কানন দেবী বল্লেন, "এজন্য তাঁদের প্রস্তুত হ'য়েই আসতে হবে। অনেক শিক্ষিতা মহিলা—যাঁরা শিল্পী হিসাবে আজকাল চিত্র জগতে প্রবেশ করছেন—সমাজের নিজের যত ছিদ্রই থাকুকনা কেন—তা বন্ধ করবার জন্য যতটা না সমাজ যত্নবান, তার চেয়ে বেশী যত্নবান এঁদের ছিদ্র আবিষ্কারে—নানান বাধা বিপত্তি দিয়ে এঁদের যাত্রা পথের সামনে প্রাচীর গেথে তোলা হয়। তাই পা বাড়াবার পূর্বে ঐ বাধাবিপত্তির কথা চিন্তা করেই পা বাড়াতে হবে। এই বাধাবিপত্তির সংগে যুদ্ধ করে যিনি অগ্রসর হবেন—তাঁর প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। অবশ্য শিল্পী হবার উপযুক্ততা যদি তাঁর থাকে।"

এই অখ্যাত শিল্পীদের সংগে খ্যাতনামা শিল্পীরাও যে অনেক সময় সহজ মন নিয়ে আলাপ করেন না—খ্যাতনামা শিল্পীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলেন শ্রীপার্থিব কানন দেবীর কাছে। শ্রীপার্থিব বল্লেন, "অনেক দৃশ্যপটে দেখেছি, বড় বড় জাঁদরেল শিল্পীরা দু'তিনবার ডাকাডাকি করবার পর তবে ছোট শিল্পীদের প্রশ্নের বা কথার একটু ভাসা ভাসা উত্তর দিয়ে এমন ভাব প্রকাশ করে থাকেন যেন, তাঁদের অর্থাৎ ঐ অখ্যাতনামাদের সংগে যেটুকু কথা বল্লেন, তাতেই তাঁদের কৃতার্থ করে দিলেন।"

এই অভিযোগ প্রসংগে কানন দেবী উত্তর দিতে যেয়ে বল্লেন, "আপনার এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা আমি তা বলছিনা। তবে সত্যিকারের যাঁরা বড় শিল্পী, তাঁরা সব সময়েই এই নীচতা থেকে দূরে থাকেন। সত্যিকারের শিল্পীর ব্যবহারে কোনই তারতম্য বা আত্মাভিমান প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়—তাতে তাঁর মর্যাদা বাড়বে বৈ কমবে না।"

--শিল্পীদের সংযত জীবন যাপন কি শিল্পকে সুষ্ঠু রূপদানে সাহায্য করে? একথা কানন দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন, "নিশ্চয়ই। শুধু শিল্পী কেন, উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর কোন সুন্দরের জন্ম হয় না। বিশেষ করে শিল্পীদের জীবন এমন খাতে বওয়া দরকার, যাতে তাঁদের বিরুদ্ধে কারোর কোন অভিযোগই না থাকে।"

এবার আমি রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের নাট্য-বিদ্যালয়ের

EAGLE-LION'S

Second Anniversary Week

The Eagle-Lion group of film production units have in the very brief span of two years won recognition from audiences throughout the world as purveyors of quality entertainment. Their pictures both in cost and design are meant for the markets of the world.

BRITISH DISTRIBUTORS (INDIA) LTD. whose privilege it is to distribute these films in India renew their pledge to Indian audiences to provide abundantly of the good and healthy entertainment for which Eagle-Lion pictures are famed throughout the world.

★ HIGHLIGHTS OF THE WEEK ★

SPECIAL ANNIVERSARY RELEASES : "Brief Encounter", the film of Noel Coward's poignant drama of home life ; "Seventh Veil", starring James Mason and Ann Todd.

200 simultaneous showings of Eagle-Lion films throughout India, Burma and Ceylon.

পরিকল্পনার কথা নিয়ে কাননদেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, শিল্পীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এবং শিল্পীদের শিক্ষার জন্য যদি একটি নাট্যবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, আপনি কি তাতে সাহায্য করতে পারবেন?

এসম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে যেয়ে কাননদেবী বলেন, "আজ অবধিও আমাদের এখানে কোন নাট্যবিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। অথচ এর নিতান্ত প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমতঃ শিক্ষা না পাবার দরুনই আমাদের শিল্পজীবনে গলদ থেকে যাচ্ছে অনেকখানি। তাছাড়া কোন যুবক যুবতী অভিনয়কে যদি জীবনের পেশা রূপে গ্রহণ করতে চান—তাঁকে অন্ধকারেই হাতড়িয়ে বেড়াতে হবে—নিজের যোগ্যতার পরিচয় তিনি দেবেন কি করে? কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে থেকে যদি সুযোগ পান, তাঁদের আশা ফলবতী হবে, নইলে বাধ্য হ'য়ে অন্য পন্থা গ্রহণ করতে হবে। অথচ যদি কোন নাট্যবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে তাঁরা যেয়ে হাজির হন—কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টির জন্য তাঁদের উদগ্রীব হ'য়ে থাকতে হবে না, তাঁদের শিক্ষার দাবী নিয়েই তাঁরা উপস্থিত হবেন। কর্তৃপক্ষ সে দাবী উপেক্ষা করতে পারবেন না কোন মতেই। এ ব্যাপারে আপনারা আমার কাছে যে সাহায্যই চাইবেন না কেন—আমাদের বর্তমান ও ভাবী শিল্পী গোষ্ঠীর স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থানুযায়ী সর্ব প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

বাংলার ষ্টুডিও আবহাওয়া সম্পর্কে কানন দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "দেখুন, ষ্টুডিও বলতে আমি আমার নিজের জগতকে মনে করি। ২৪ ঘণ্টার ভিতর আমার বেশীর ভাগ সময় কাটে ষ্টুডিওতে। সেখানকার লোকজন আমার সুখ-দুঃখের সাথী, তাঁদের সম্পর্কে কোন বিরুদ্ধ অভিমতই আমি ব্যক্ত করতে চাই না সাধারণের কাছে। তবে শুধু এইটুকু বলতে পারি, ষ্টুডিওর আবহাওয়া আরও উন্নত ধরণের হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

অল্পবেতনের শিল্পীদের কথা প্রসংগে কানন দেবী বলেন, "কর্তৃপক্ষের এঁদের সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা উচিত। শিল্পজীবনে অন্ততঃ আর্থিক কৃচ্ছতা যাতে এঁদের পথ রুদ্ধ করে না দাঁড়ায়, তার প্রতি আমাদের কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি রাখা উচিত। আজকের এঁদের মাঝেই পরবর্তী যুগের প্রতিভা লুকিয়ে আছে। সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হবার সুযোগ যদি এঁরা না পান, তবে যে কুঁড়িতেই শুকিয়ে যাবেন। আজকের এঁদের মাঝে এমন প্রতিভা লুকিয়ে আছে হয়ত, যা পরবর্তী কালে কানন-মলিনা-চন্দ্রা-যমুনাকেও ছাড়িয়ে যাবে।" এই কথা শেষ করেই কানন দেবী হঠাৎ হেসে উঠলেন। আমরা একটু বিস্মিত হ'য়ে তাকালাম তাঁর দিকে। মিষ্টি মিষ্টি হাসতে হাসতে তিনি বলতে লাগলেন, "দেখুন আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমার অভিনেত্রী জীবনের সর্ব প্রথমে, মাত্র পঁচিশ টাকা পারিশ্রমিকে চুক্তিবদ্ধা হই"। কানন দেবী আবার খানিকটা হাসলেন। "কিন্তু সেই পঁচিশ টাকার ভিতর পাবার সময় পেলাম কুড়ি টাকা। বাকি, পাঁচ টাকা আর পেলাম না। সেকথা কোনদিনই ভুলিনি। সেই পাঁচটাকার ক্ষোভ আমার আজও মিটলো না।"

আমরা এবার কানন দেবীর হাসির তাৎপর্য উপভোগ করলাম। সংগে সংগে অভিনেত্রীদের প্রথম জীবনের করুণ ইতিহাসের আঁচ পেয়ে মনটা ব্যথায় ভরে উঠলো অনেকটা। সাধারণ ভাবে শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা উঠলে কানন দেবী বলেন, "পূর্বেই আমি বলেছি, ব্যক্তিগত জীবনও শিল্পীদের সংযত হওয়া প্রয়োজন। তবে শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনের যে ব্যক্তিগত টুকুর সংগে শিল্পের কোন যোগ নেই—তা নিয়ে আলোচনা না করাই শ্রেয়। শিল্পীর শিল্প প্রতিভাই সাধারণের বিচার্য। আমি বম্বে অথবা অন্য প্রদেশের শিল্পীদের সম্পর্কে কোন অভিমত ব্যক্ত করতে চাই না, তাঁদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তবে বাঙ্গালী শিল্পীরা বেশীর ভাগই যে ঘরমুখো একথা বলতে পারি জোড় করে। তাঁরা হই-হুল্লোড় এবং উচ্ছৃঙ্খলতা পছন্দ করেন না। ক্লাব বা মজলিসে যোগদানেরও তাঁরা বিরুদ্ধে। ঘর-কন্নায় তাঁরা যত আনন্দ পান—আমার মনে হয় আর কিছুতেই ততটা পান না।"

আমাদের আলোচনার মূল বিষয়গুলি শেষ হয়ে আসছিল। টেলিফোনে বার বার ডাক আসছিল কানন দেবীর। প্রত্যেককেই—'ব্যস্ত আছি পরে ডাকবেন' বলে উত্তর দিচ্ছিলেন। ঘর-কন্নায় কানন দেবীর নিজেই যে আনন্দ পান কত তার প্রমাণও একটু পেলাম। চাকরকে হটিয়ে দিয়ে তিনিই চা করতে বসলেন। নিজের হাতে চা করে আমাদের আপ্যায়িত করলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমার মাথায়ও একটু দুষ্টুমি চেপে

বসলো। কাননের ষ্টুডিওর বাইরের জীবন সম্পর্কে কিছুটা খুঁটিনাটি প্রশ্ন মনের মাঝে এসে ভীড় করতে লাগলো। শ্রীপার্থিবের দিকে একটু চেয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাননের ষ্টুডিওর বাইরের জীবন সম্পর্কে-প্রশ্ন করতে লাগলাম।

এসম্পর্কে আমার প্রথম প্রশ্ন হ'লো—'ষ্টুডিওতে কতক্ষণ আপনাকে কাজ করতে হয়—তারপর কি ভাবে সময় কাটান—ষ্টুডিওর বাইরের জীবন আপনার কেমন লাগে?'

শ্রীপার্থিব সম্ভবতঃ আমার অভিসন্ধি কিছুটা টের পেলেন কিন্তু যখন প্রশ্ন করেছি তখন তার প্রতিবাদ করবার উপায় ছিল না। কানন দেবী বেশ স্বাভাবিক ভাবেই এগুলির উত্তর দিতে লাগলেন—

"ষ্টুডিওতে এতদিন কাজের কোন ঠিক ছিল না। আজকাল দিনে রাতে আট ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়, যেদিন স্যুটিং থাকে। এই আট ঘণ্টা কাজ করতে একটুকুও ক্লান্ত বোধ করি না। বরং মনটা ছোট বয়স থেকে কাজ করতে করতে কিছুটা পুরুষোচিত হ'য়ে উঠেছে। যেদিন স্যুটিং থাকে না, বাড়ীতে নিরালা বসে থাকতে ভারি বিশ্রী লাগে। বাড়ীতে এসে ষ্টুডিওর কথা একদম ভুলে থাকতেও পারি না। ষ্টুডিওর আমি—অর্থাৎ যে ছবিতে যে চরিত্রে আমায় অভিনয় করতে হয়—সে চরিত্রটী মাথার মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে। তারপর যদি কোনদিন একটি 'shot এ কোন গোলমাল করে ফেলি, সে-দিনটা এমন অসোয়াস্তিতে কাটাই যে, তা আর বলবার নয়। এছাড়া আমার গৃহ-জীবন আমাকে খুব আনন্দ দেয়। বাড়ীতে ঢুকলেই মনে হয় আমি এক স্বাধীন রাজ্যের গণ্ডির ভিতর এসে গেছি—স্বাধীন ভাবে পায়চারী করছি—কথা বলছি—হাসছি। এখানকার সম্রাজ্ঞী আমিই। কোন বাধা নেই। ক্যামেরার চোখ রাঙানী—মাইকের সাবধানী বাণী—পরিচালকের হুসিয়ারী হুঙ্কার কোন কিছুই আমাকে শুনতে হয় না। রূপ-সজ্জার অন্তরালে থেকে আমায় লুকোচুরিও খেলতে হয় না।"

ষ্টুডিওর আবহাওয়া থেকে আমরাও এবার কানন দেবীর স্বাধীন পরিবেশের মাঝে এসে হাফ ছাড়লাম। আমরা

বিশ বছর পেছনের দিকে তাকালাম—। ১৯২৪-২৫ খৃঃ হবে। আমাদের সামনের কানন দেবীকে ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম আজকের প্রতিভাময়ী কাননকে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো ছোট একটি মেয়ে—ফ্রক পরে চলা ফেরা করছে—সাত আট-বছর হয়ত তার বয়স হবে। ছবি তখন কথা বলতে শেখেনি। তার ঐ নির্বাক রূপ অনেকের মনেই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। কানন—ঐ সাত আট বছরের কানন—ছায়ার রহস্যজালে নিজেকে ধরা দিল! আমরা অনেকেই দেখেছিলাম, ভীত পদক্ষেপে ঐ মেয়েটির প্রথম প্রকাশ—জয়দেব চিত্রে। চিত্রখানি শ্রীযুত জ্যোতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গৃহীত হ'য়েছিল। সে দিনকার সেই মেয়েটি ক'জনের মনেই বা রেখাপাত করেছিল? তারপর এলো জোড়বরাৎ, প্রহ্লাদ, বিষ্ণুমায়া, ঋষির প্রেম—শ্রীগৌরাঙ্গ, মা (হিন্দি ও বাংলা), কৃষ্ণ সুদামা, কণ্ঠহার, মানময়ী গার্লস স্কুল—প্রভৃতি—। সবাক ছবি মুখরা হ'য়েছে—বালিকা কানন কৈশোরের ধাপ ডিঙ্গিয়ে যৌবনের পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর সহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে পল্লীতে পল্লীতে যেয়ে পৌঁছেচে। মুক্তি, বিদ্যাপতি, সাপুড়ে, পরিচয়, সাথী, (হিন্দি বাংলা) মিলিয়ে প্রায় চৌদ্দখানা নিউথিয়েটার্সের চিত্রে অভিনয় করে সেদিনকার সেই ছোট্ট মেয়েটী পরবর্তী যুগে দর্শকদের কাছ থেকে অকৃপণ অভিনন্দন লাভ করতে লাগলো। শেষ উত্তর, জবাব (হিন্দি), যোগাযোগ, বিদেশিনী, পথ-বেঁধে দিল—এম, পি প্রডাকসন্সের কতগুলি চিত্রেও বিভিন্ন চরিত্রকে আজকের কানন দেবী নানারূপে রূপায়িত করে চলেছেন। সম্প্রতি বনফুল (হিন্দি), আরব্যোপন্যাস (হিন্দি), কৃষ্ণ-লীলা, (হিন্দি) তুমি আর আমি (হিন্দি, বাংলা) প্রভৃতি চিত্রে কানন দেবী নূতন রূপে দর্শক সাধারণকে অভিবাদন জানাবেন।

প্রতিটি চিত্রে যখন কানন দেবী অভিনয় করেন, পরিচালকের কাছ থেকে তাঁর চরিত্রটী জেনে নেন। ষ্টুডিওতে অবসর সময় Shootingএর পূর্বে চরিত্রটীর ভিতর মশগুল হয়ে থাকেন, তাই কাননের প্রতিটী চরিত্র পর্দায় স্বাভাবিক রূপলাভ করে—তাঁর

অভিনয়ে কোথাও জড়তা প্রকাশ পায় না। চরিত্রটি তিনি অভিনয় করেন না—নিজেই চরিত্রটী রূপে আত্ম-প্রকাশ করেন।

ষ্টুডিও থেকে এসে কানন দেবী নানান হইহুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে দিন কাটান। ষ্টুডিওর বাইরে এই সহজ সরল পরিবেশের মাঝে যাঁরা কাননকে না দেখেছেন, কাননের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁদের কাছে অজানাই রয়ে যাবে। হঠাৎ দেখে মনে হবে—কি শান্ত মেয়েটী। পরিচয়ের পরমায়ু যেই বাড়তে থাকবে—দেখবেন, অভিনেত্রী কাননের গাম্ভীর্য কোথায় দূরে সরে যেয়ে এক নূতন কানন আপনার সামনে ধরা দিয়েছে—হাসিতে, কথায়—প্রাণ-প্রাচুর্য উপচে পড়ছে।

কাননের অত্যাচার সবচেয়ে বেশী সহ্য করতে হয় তাঁর মাকে। টানাহ্যাঁচড়া করতে করতে তাঁকে কানন দেবী একবারে অতিষ্ঠ করে তোলেন। আব্দার আহুট আবার মায়ের পর চলে ঠিক ছোট্ট মেয়েটীর মত।

তাছাড়া বাড়ীতে তাঁর সাথীও আছে অনেক। জীফ, বেগম, টম, পল—ঘেউ ঘেউ শব্দে সারা বাড়ী মাতিয়ে তুলে খেলা করে কাননের সংগে। কানন ষ্টুডিওতে গেলে তাদের নির্জীব মুহূর্তগুলি আর কাটতে চায় না। এদের ক্ষুধা পেলে সে খাওয়াবে—স্নানের সময় স্নান করাবে। এদেখে আর এক জনের ঈর্ষার অন্ত থাকে না। তিনি রাগে ফুলতে থাকেন। কাননের বাড়ীর তিনিও আর একজন বাসীন্দা। তাকে অবহেলা করলেই বিরাট প্রতিবাদ করে ওঠেন। তিনি হচ্ছেন উলুমনি। কানন যখন তাকে রাণী বলে ডাকেন—কিচ মিচ শব্দে সারা বাড়ীটা তিনি মাতিয়ে তোলেন আনন্দে। তার গর্বেরও সীমা নেই, কারণ তারই পূর্ব পুরুষেরা সীতা উদ্ধারে রামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন—সেতু বেঁধেছিলেন—বিশল্যাকরণী এনে লক্ষণের জীবন রক্ষা করেছিলেন। একটী গরুও আছে কাননের বাড়ীতে। জারে জারে রং বে-রংএর মাছ নিয়ে খেলা করতে কাননের ভাল লাগে। শাক-সবজী ও ফুল বাগানে বসে যখন কানন কাজ করেন, তাঁকে এক-জন পাকা মালিনী বলেও ভুল করতে পারেন। বাড়ীর ছাদে টবে টবে চাড়া জিইয়ে কানন যে সবজী বাগান তৈরী করেছেন—প্রচুর টমেটো এবং বেগুন প্রতি বছর তা থেকে পান। গতবার এর পরিমাণ এতই বেড়েছিল যে, অনেক বন্ধু বান্ধবকেও বিলিয়েছেন প্রচুর।

গল্পে গল্পে কানন এমন একটী কথা বল্লেন যা, শুনলে আমাদের মত আপনারাও বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যাবেন। কানন দেবী বলেন, তাঁর গান গাইতে মোটেই ভাল লাগে না। বাড়ীতে অবসর সময়ে তিনি একটা গানের-ও সুর ভাজেন না কখনও এবং এই গান গাইবার ভয়েই তিনিই কোথাও বেড়াতে যান না। কারণ যদি কেউ তখন গান গাইবার জন্য অনুরোধ করে বসেন! বাংলার বুলবুল কাননের মুখে এই কথায় কিছুটা আশ্চর্য লাগে বৈকী?

সংগীত পরিচালকদের ভিতর রাইচাঁদ বড়াল, কমল দাশ গুপ্ত—এবং ধীরেন্দ্র মিত্রকে কাননের ভাল লাগে। শ্রীযুক্ত মিত্রের পাণ্ডিত্যের কথা বলতে বলতে কানন পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠেন। কুমার শচীন দেব বর্মনের কণ্ঠ কাননকে মুগ্ধ করে। শান্তা আপ্তে, সুভালক্ষ্মী, খুরশীদ এঁদের কণ্ঠ কানন প্রশংসা করেন মুক্ত কণ্ঠে। অভিনেতাদের ভিতর ছবি বিশ্বাসের অভিনয় প্রতিভাকে কানন শ্রদ্ধা করেন। স্বর্গত দুর্গাদাসের কথা উঠলে, কানন তাঁর প্রতিভার উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অভিনেত্রীদের কথা আমি এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। কানন আমার কাছ থেকে প্রশ্ন কেড়ে নিয়ে উত্তর দেন, "কেন, অভিনেত্রী নয় কেন? অভিনেত্রীদের ভিতর চন্দ্রাকে আমি সর্বাগ্রে স্থান দেবো।" পরিচালকদের ভিতর পৌরাণিক চিত্রে কানন দেবী দেবকী বসুর প্রশংসা করেন। বড়ুয়ার পরিচালন-দক্ষতায়ও কাননের বিশ্বাস রয়েছে অনেক-খানি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যিক প্রতিভাকে কানন শ্রদ্ধা করেন। মঞ্চাভিনয় কানন জীবনে খুব কম দেখে-ছেন। ছোট বেলায় শিশির কুমারের অভিনয় দেখে এতই মুগ্ধ হ'য়েছিলেন যে, আজও তা ভুলতে পারেন নি।

বাড়ীতে অবসর সময়ে গান না গেয়ে কানন দেবী কবিতা আবৃত্তি করতে ভাল বাসেন। কখনও মনে মনে, কখনও আবৃত্তির ভংগিমায় কানন রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের কবিতা পাঠে সময় কাটান। শরৎচন্দ্রের কথা বাদ দিয়ে বর্তমান সাহিত্যিকদের ভিতর তারাশঙ্করকে কানন প্রথম স্থান দেন। এপর্যন্ত যতগুলি চিত্রে কানন অভিনয় করেছেন—বিদ্যাপতি এবং কৃষ্ণলীলায় অভিনয় করে তৃপ্তি পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী।

সুভাষচন্দ্র কাননের আদর্শ দেশনেতা। সুভাষচন্দ্রের

পরেই জওহরলালকে তাঁর ভাল লাগে। সুভাষচন্দ্র এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সংক্রান্ত প্রত্যেকটা খবর কানন খুব আগ্রহের সংগে পড়েন। উত্তমচাঁদ বর্ণিত সুভাষচন্দ্রের পলায়ন কাহিনী পড়ে কাননের আশ্চর্যের অবধি নেই। সুভাষচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কানন দেবী বলেন, "তাঁর অন্তরে জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ডের ন্যায় দেশপ্রেম চির প্রজ্বলিত। এর এক কণাও যদি আমাদের থাকতো।"

চিত্র প্রযোজনা ও নিজস্ব ষ্টুডিও নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কিনা একথা কানন দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "হ্যাঁ ষ্টুডিও নির্মাণ ও চিত্র প্রযোজনার পরিকল্পনা আমার রয়েছে। ষ্টুডিও উপযোগী জায়গাও আমার কেনা আছে। তবে এই ষ্টুডিও নির্মাণে আমার যে পরিকল্পনা আছে তাতে আমি একাই এর মালিক হ'তে চাই না। প্রত্যেক বিভাগীয় শিল্পী এবং বিশেষজ্ঞরা যাতে অংশীদার রূপে যোগদান করতে পারেন সেই ইচ্ছাই আমার প্রবল। চিত্র প্রযোজনার কথা যদি বলেন, বছরে যদি একখানা চিত্রও প্রস্তুত করতে পারি, তাতে আমার আপশোষ থাকবে না, তবে সেই একখানি চিত্রই যাতে দর্শকদের অভিনন্দন লাভে সমর্থ হয় এবং বিশেষ দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, সেই দিকে তীব্র দৃষ্টি রেখেই চিত্র প্রস্তুত করবার আমার ইচ্ছা।"

সাড়ে ন'টায় আমাদের আলোচনা আরম্ভ হ'য়েছিল, সাড়ে বারোটা পেরিয়ে গেল আমাদের আলোচনা শেষ হতে। এই দীর্ঘ সময় অসুস্থ শরীর নিয়ে কানন দেবী অতি সহজ ভাবে আমাদের সংগে কথা বলেছেন। কোন সময় একটু বিরক্তি, অসোয়াস্তি, কি আত্মাভিমান তাঁর ভিতর মাথা উঁচু করেনি। যতক্ষণ আলাপ আলোচনা চলেছে আমি নিজেও একটুকুও সংকোচ বোধ করিনি, একটুকুও অনুভব করিনি যে, একজন খ্যাতনামা শিল্পীর সংগে কথা বলছি। মনে হ'য়েছে, যেন আমারই আর একজন বোন বা বন্ধুর সংগে প্রাণ খুলে গল্প গুজব করছি। মনও যেমনি সাদাসিধে, পোষাক পরিচ্ছদেও তেমনি কাননের নেই কোন জমকালো ভাব। বাড়ীটার ভিতর দিকে চোখ

বুলালে মনে হবে—কেমন সহজ পরিবেশ—জাকজমকের কোন বালাই নেই। আমাদের সংগে আলোচনার সময় তাঁর পরিধানে ছিল—সাধারণ ধরনের একখানা সুতির ছাপা শাড়ী। সাদা একটা ব্লাউজ গায়ে। হাতে সোনার বালা, পাশে কয়েক গাছা করে চুড়ি। কানে হীরের টব। চুলগুলি উসকো খুসকো। মনে হচ্ছিল—যেন কিছুক্ষণ পূর্বে ঘুম থেকে উঠে এসেছেন। ববছাটা চুলগুলি ঘাড় অবধি ঝুলে পরে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিল।

আমাদের বিদায় দেবার সময় অনেকটা পথ কানন এগিয়ে এলেন। আমরা বিদায় অভিবাদন জানিয়ে পা বাড়ালুম। গাড়ীতে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখি—দোতালার ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে কানন দেবী—আমাদের গতিপথের দিক চেয়ে আছেন—মুখে তাঁর তেমনি মিষ্টি হাসি। আসতে আসতে কেবলই মনে হ'তে লাগলো, এই যে বিরাট প্রতিভা—এই প্রতিভার অন্তরালে যে সহজ সরল অমায়িক মেয়েটি লুকিয়ে আছে—তাঁর খবর ক'জন রাখেন!

মধুর কাননের মিষ্টি ব্যবহার আমার মনে থাকবে অনেকদিন।

—মণিদীপা

পঙ্কজ

(চিত্র কাহিনীর জন্য লেখা)

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

★

হ্যাঁ কবিয়াল বটে! ও অঞ্চলটার মধ্যে সবাই এক-বাক্যে একথা স্বীকার করে গোপীঘোষ কবিয়াল!

শীতের রাত্রি, লালমাটির বুকচিরে জমাট শীতের হাওয়া হাড় অবধি কাঁপিয়ে তোলে, আকাশের তারার চিহ্ন মুছে গেছে, পশ্চিমাকাশে হেসে উঠেছে ছায়া-পথের পরিক্রমা। মেলাটার সব দোকান পাটই বন্ধ, করগেটের টিনের উপর জমেছে একপুরু শিশির, কুকুর গুলো লেজ গুটিয়ে ময়রার দোকানের বাইরে গাদাকরা ছাইএর উপর অঘোরে ঘুমুচ্ছে, জেগে রয়েছে কেবল মেলার আসরটা, ডেলাইটের আলোতে দেখা যায় স্থির নিস্পন্দ জনতা, স্থানুর মত বসে রয়েছে!

গোপী কবিগায়। হ্যাঁ! তরুণ চেহারা, চোখে অস্বাভাবিক একটা দীপ্তি, পাল্লাদার গণেশ কোটাল বহু-দিনের পুরোনো কবিয়াল—হিমসিম খেয়ে যায়, তার ছড়ার বাঁধুনীতে! আসরে টাঙ্গান একছড়া কলা আর একটা জিলিপী। হারলে নিতে হবে ঐ কলা সবার সামনে; শুক্‌নো গলা সরস করে গর্জন ছাড়ে গণেশ; "ভাই দোহার বৃন্দ—"

গোপী ঘোষ সবে চাপান দিয়ে আসরে বসেছে, সারা আসর উন্মত্তপ্রায়, এরা পল্লীর জনতা শুক্‌নো হাততালি দিয়ে কান ভরিয়ে তোলে না, প্রাণ থেকে কেউ বলে 'হরিবোল', কেউ বলে 'আল্লা', নৈশ গগন ভরে উঠে। গোপী ঘোষ সকলকে নমস্কার করে।

ভিড়ের মধ্যে একজনকে খুঁজে চলে গোপী, ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবে, যার গলায় সে পরিয়ে দেবে আজকের জয়-মালা; কিন্তু সারা আসর খুঁজে যমুনাকে পায়না, হয়ত আসেনি! জানে না সে গোপীর জয়ের কথা।

পুকুরটার পশ্চিপাড়ে তখনও রাতের আমেজ কাটেনি, মেলার মধ্যে এ জায়গাটার রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। ছোট ছোট তাল পাতার ঘেরা দেওয়া খুপরী ঘর, দেহ বিলাসীনিদের আড্ডা। মেলা কর্তৃপক্ষ মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসাবে এটাকে বাদ দেন না, ধানের মরসুম চাষীদের হাতে কাঁচা পয়সা কিছু আসে সুতরাং এদের কদর বুঝবার মত বুদ্ধির অভাব তাদের হয় না।

গোপী চলেছে, চাদর খানা কোমর থেকে খুলে ঘাম মুছতে মুছতে, পটলির কণ্ঠস্বরে ফিরে চায়—সাবাস গেয়েছে কিন্তুক কবিয়াল;

গোপী কথা কয়না, ক্লান্তিতে তার সারা দেহ ঘিরে আসছে! তালপাতার বেড়াটা সরিয়ে পথ করে নেয় সে!

যমুনার ঘুমের জড়তা কাটেনি, এসে সবে শুয়েছে, একখানা লালচে ডুরে শাড়ী, মুখে সস্তাদরের স্নো-পাউডারের শেষাবশিষ্ট! রাতের বিগত অভিসারের চিহ্ন! নীরবে গোপী দড়ির আলনাটায় কাপড় চোপড়গুলো ছেড়ে রেখে শুয়ে পড়ে ওদিককার খড় বিছান বিছানাটায়। পাশের খুপরী গুলোর গোলমাল তখনও থামে নি, কে যেন চীৎকার করে গালাগালি দিচ্ছে! হয়ত খদ্দেরের সংগে গোল-মাল।

দিনের আলোয় মেলাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখায়। তখন আর চাকচিক্য নাই, দোকান গুলো সব বন্ধ। একপাশের উনুনে খাবার ব্যবস্থা করে, মাঝখানকার ছোট পুকুরটার জল বছরান্তে একবার ব্যবহারে কাদা হয়ে ওঠে! পটলি, অমেও, ভোবন, যমুনা আর সকলেই ঘাটে নেমেছে! মেলার কে যেন নামতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায়, মেয়ে-ছেলে স্নান করচে দেখে;

যমুনার হাসির শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে সে ওই লাগর ফিরছ যি গো। ভাল লাগল নাই!

পটলি যোগান দেয়, 'জলেই পরাণটা দোব সাঙ্গাত' লোকটার চুরি করে দেখা ধরা পড়ে যায়, পালাবার পথ-পায় না! সকলেই ব্যস্ত; আমগাছের ডালে বিবর্ণ ভিজে শাড়ীগুলো মিলে দিয়ে—সিকে থেকে কালিমাখা হাড়ি গুলো নামিয়ে রান্নার যোগাড় করে।

রাঢ়দেশের পল্লীপ্রান্তরে এসেছে শীতের শেষ! মাঠের

বুকেলাগে দোলা, খেসারীর সবুজ লতার স্পর্শ! দূর দিগন্তে বাদশাহী শড়কটা চলে গেছে কোন দূর দূরান্তয়ের পথে! লঙ্কা, কুমড়ো বোঝাই ব্যাপারীদের গাড়ী চলেছে ধুলো উড়িয়ে, শীতের রোদ দূর আকাশে, আকের ক্ষেতে সাদা ফুলকোর মাথায় চিক চিক করে, গোপী চেয়ে থাকে নিস্তব্ধ ধরণীর দিকে।

আজ সে কবিয়াল। এইমাটির পূজারী।

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা, বাংলার বুকেই তার জন্ম, সে দেশের বন্ধ্যা রক্তাক্ত মাটি—ধরনীর শ্যামল উত্তরী ঘেরা শালবনের মায়া—তীর্থযাত্রা করে, মহুয়া গাছের পত্রহীন বাহু তাকে আঁকড়ে রাখতে চায় ভালবাসায়।

গোয়ালার ছেলে, ফণিপণ্ডিত চুলের মুঠিটা কসে ধরে খালি পিঠটায় বেদম ঘা কতক বসিয়ে দেয়, "ষাট বছরে সাবালক হবি তখন আসিস পড়তে, যা, কেন খাল মাটী করছিস—খসে পড়।

বুড়ো সনাতন ঘোষ অসহায়ের মত চেয়ে থাকে, "ছেলেটা যদি দু'অক্ষর শেখে ঠাকুর তোমাদের ক্রেপায়।

মাষ্টার ধমক দেয়, একি পাথর বাটীতে করে গুলে খাওয়াব ঘোষ! পাঠশালে আসবেই না। সুতরাং পড়াশুনা ঐ পর্যন্তই! পাঠশালে থাকতে গোপীর ভাল লাগত না বৈকালের রোদ গ্রামপ্রান্তে বাঁশবনে হলদে হয়ে আসে, বৌড়ি গাছে ল্যাজঝোলা নীলকণ্ঠ পাখীর ডাক, গ্রামের বাইরে সুরু হয়েছে কালো মিশমিশে কুঁচলে বন নির্জন ডাঙ্গাটায় কি মায়া তাকে পেয়ে বসে! চুপি চুপি বার হয়ে পালায়! একাই স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, কচি শাল পাতার ফাঁকে ফাঁকে শাল ফুল ফুটে রয়েছে।

সহসা একটা প্রচণ্ড চড়েই ফিরে চায়, কখন যে তাদের গরু মোষের দল গিয়ে মাঠের বীজধান শেষ করে দিয়েছে জানে না, সমস্তগুলোকে রাখালে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে জগন্নাথপুরের খোয়াড়ে পুরেছে!

"হতভাগা কোথাকার, দোব টুটীতে পা দিয়ে নেতার মেরে এইবার, বারটা টাকা গেল খোয়াড়ে!"

বাবার মার টা নীরবে হজম করে।

গোপগায়ের কথা আজও তার মনে পড়ে, গোপীর মন, থেকেও কোনদিন মুছে যাবে না, যাবার 'নয়'।

গরু চরাবার সময় পাথরের বুকে লাঠির আঁচড় কেটে মনে মনে সে ছড়া বাঁধে গোয়াল পাড়া বাগ্দী পাড়ায় গাইত নিজেরই তৈরী করা বারমাসী; জীর্ণ হলদে কানী বাঁধা দপ্তরটায় সরের কলম মাটির দোয়াতে মুড়িভাজা খোলা চাঁছা ভুষোকালী দিয়ে লিখত।

বামুন পাড়ার বৌ ঝিরা চৌধুরীদের ভিতর বাড়ীতে জমায়েত হয়েছে; ছোট বৌ লতিকা কলকাতার মেয়ে, শুনে চলেছে সাগ্রহে গোপীর গান,

> ষষ্ঠীমাসে ষষ্ঠীপুজো, ছেলের গলায় দড়ি
> আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, লোকের হুড়োহুড়ি॥
> ভাদ্রমাসে পদ্ম ফোটে গাছে পাকে তাল।
> বড় চৌধুরী কিপ্টে ভারি, গাছে বাঁধ জাল॥

মেয়েরা হেসে এ ওর গায়ে পড়ে। বড় চৌধুরীদের বড় গিন্নীও। যদিও অপবাদটা সত্যি! বামুনদের টুনি বলে ওঠে নতুন সেই ছড়াটা গা নারে!

ঘাড় নাড়ে গোপী, সে সুপুরীটা কামড়াতে ব্যস্ত! এতকম মজুরীতে গাইতে রাজী নয়! লতিকা গিয়ে ছুটো পান তৈরী করে আনতেই সোৎসাহে সুরু করে,—পড়া বন্ধ করে বাড়ীর ছোটবাবু রমেনও এসে পড়ে —লতিকা মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে চোখের তারায় অনুনয়ের সুরে তাকে যেতে বলে—কিন্তু যায় না রমেন! অবাক হয়ে শুনে যায় তার ছড়া! গাঁয়ের সব

হাস্থুড়ে গোবস্ত ডাক্তার কবরেজদের নিয়ে বাঁধা,—গোপী গেয়ে চলেছে—

"ডেকে যদি কবরেজ কয়,
গৌর করিসনেরে ভয়
গুড়ুরবাদের ভাইসাহেবরা বজায় থাকলে হয় !
পয়সায় তিন গণ্ডা বড়ী,
ভাঙ্গব ডাক্তারের জারি জুরী
দেশেতে আইচে কি এক মালোয়ারী ॥
এসেছে এক ডাক্তার মিস্তিরদের গোয়ালে
পেনটুল পরে হ্যাটম্যাট করে যেন এড়ে গরু গোয়ালে।
রাস্তার লোককে ধরে বলে ভিজিট তুমি নাইবা দিলে
(আমি) বিনি ভিজিটেও যৈতে পারি"—

রমেন হাসি থামাতে পারে না,—সলজ্জ দৃষ্টিতে গোপী চেয়ে থাকে তাদের দিকে !

সেই রাতের কথা ভুলতে পারেনা গোপী, রতনেশ্বরের মেলায় কাতারে কাতারে লোক জমেছে, নামকরা কবিয়াল গোপাল কলুর গান। আসরে চৌধুরী বাবুরা—আর সব গণ্যমান্য লোক উপস্থিত রয়েছেন—গোপাল সকলকে নিজের মহিমাই জাহির করে বেড়াচ্ছে। চৌধুরী কর্তা অবাক হয়ে যান—"তুই পারবি !"

প্রণাম করে সেদিন প্রথম আসরে নামে গোপী,—সকলেই হাসে, "সোনা ঘোষের ব্যাটা আবার কবি।" কিন্তু জনতা কিছুক্ষণের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে যায়—তার বাঁধুনি আর কণ্ঠমাধুর্যে। গোপাল কলুর বয়স হয়েছে, তরুণের কণ্ঠস্বরের কাছে তার পরাজয় হয়ই। থতমত খেয়ে যায়, চাপান দেবার ফাঁক খুঁজে পায় না। উত্তর দেয়, তাও এলোমেলো সব যেন কেমন ঘুলিয়ে যায়—আসরে তাদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে বাবা আর ছেলে! গনেশের কেমন মাথাটা পাক দিতে থাকে। ঢোলটাও যেন তাকে উপহাস করে।

গোপী হেলেদুলে গেয়ে চলে, কড়া চাপান !—

বুড়ো বাবাকে যেতে বল্লাম উত্তরে
বুড়ো গেল সোজা গুসকরা
ওগো বাহাত্তুরে বাবার তোরা
বলেকয়ে হুস করা।

গুসকরা দক্ষিণদিকে, গোপীর সূক্ষ্ম রসিকতায় আসর হাসির তালে ফেটে পড়বার উপক্রম।

চৌধুরী কর্তা নিজে হাতে তার গলায় বড় মেডেলটা ঝুলিয়ে দেন—গোপী যেন রাতের বেলায় স্বপ্ন দেখছে।

বাবার বকুনীটা হজম করে যায়।

কবিয়াল, দোব একচড়ে কালাকরে, ফের যদি কোনদিন গেছিস মেরে পা থেতলে দোব না। ঘোড়ারোগ। মা নেই গোপীর, থাকলে বাবা বোধ হয় এমনি করে বকতনা। মায়ের মুখটা মনে পড়ে।

সৎমা মুখখামচা দেন—মরণ আর কি বাউরী বাগ্দীর মত আসরে খেউর গান গাইবে।"

সব যশ খ্যাতি আসর ভরা লোকের প্রশংসাধ্বনি সব কিছু তার চোখে স্বপ্নের মত ঠেকে।

ধান বোঝাই গাড়ীখানা নিয়ে ফিরছে মাঠ থেকে, শীতের শেষ, রাশি রাশি সোনালী ধান, দূরদিগন্তে শালবন সীমায় পলাশের ডালে অস্তগামী সূর্যের লালিমা গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। নীরবতা ভঙ্গ হয়ে যায় দূরগামী বিহগের কাকলিতে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে গোপী। কোন নিভৃত কন্দরের স্বপ্নশিশু ক্লান্ত বিধুর সন্ধ্যাকাশে রঙের খেলায় আত্মহারা হয়ে যায়।

হঠাৎ কি যেন একটা ঘটে গেল, টের পেলনা। লোকজন জুটে যায় চারিদিকে, উচু আলের পাশ থেকে গাড়ীখানা উল্টে যায়,—গতিবেগে শূণ্যে চাকাটা বেগে ঘুরে চলেছে, ধানবোঝাই গাড়ীর টানে ডান দিককার বলদটার গলায় দড়ি এঁটে বসে যায় জিবটা বের হয়ে আসে, মুখে ফেনা ভেঙে চলেছে। লোকগুলো চীৎকার করে ওঠে, নটবর মোড়ল কোন রকমে শক্তদড়াটা কেটে বার করে বলদটাকে, সুন্দর বলদটা আর দাঁড়াতে পারে না, কাৎ হয়ে কর্ষিত ক্ষেতের বুকে পড়ে ফেন ভাঙতে থাকে। গোপী কল্পনা করতে পারে না, ব্যাপারটা।

বলদটা মারা গেল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে ছটফট করে বলদটা মারা গেল। বাবার দিকে চাইতে পারে না, সৎমার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—পাড়ামাথায় করে চীৎকার করে চলেছে—মরণ হলনা, তোর চেয়ে যে ঢের বেশী বলদের দামরে—পাঁচকুড়ি—! তুই মরলি না।

রমেন আর ও সকলের উদ্যোগে কবিগানের ব্যবস্থা হয়েছে, লতিকার আগ্রহ বেশী, মাসিক সাপ্তাহিকের পাতায় বাংলার পল্লীগীতির কথা শুনেছে, গোপীর বাঁধা বারমাসী ছড়া, লালন ফকিরের গান শুনে যেত—তারই আগ্রহেই বাধ্য হয়ে যোগাড় করতে হয়, গোপীর আর গণেশের পাল্লা।

টুনি হাসে, "বৌদি আবার কবিগান শিখবে নাকি?" রমেন ফোড়ন দেয়, "হ্যাঁ, নাহলে ঠিক জমছে না?

রাত্রি হয়ে গেছে, মরা বলদটার শোক মা তখনও ভুলতে পারে না। সেদিন রাতে খাওয়া হয় না, কেউ জিজ্ঞাসাও করে না তাকে। বাবার মারের দাগ তখনও মিলোয় নি। গালে কঠিন আঙুলের দাগ।

জীর্ণ হলদে কানি বাধা দপ্তরটা নিয়ে ধীরে ধীরে বার হয়ে আসে। মা মায়ের কথা মনে পড়ে না ভালকরে, তবুও মনটা ভারি হয়ে ওঠে! দাঁড়ায় না, সুপ্ত গ্রামখানা যেন বার বার তাকে ডাক দেয়, কালো কুচলেনে রাতের বাতাস গুমরে ওঠে। বাঁশঝাড় গুলো আর্তনাদ করে চলেছে, পা চালায় গোপী সামনের দিকে।

রমেন অবাক হয়ে যায়। লতিকাও, গোপী নাই, সে নাকি চলে গেছে কাল রাত্রে, কোনখানে—কেউ জানে না। গণেশ কবিয়ালের ঝিমুনি ছুটে যায় সোৎসাহে ফোড়ন দেয়, 'সংগে কেউ গেছে না, একলাইয়ে! ওপাড়ার সোমত্ত কেউ—ঢোলওয়ালা নিশ্চিন্ত মনে ছোট কলকেটায় টান মারছিল বিরক্ত হয়ে ওঠে।

'তোমার মত সবাই লয়! কবিত লং বেউরী, আসরেও খেউর খিস্তী করবা, বাইরে ও!

রমেন বলে চলে লতিকাকে, "বাড়ীথেকে চলে গেছে, ছেলেটার গুণ ছিল চেষ্টা করলে পারত।"

●

'চেষ্টা করলে পারত।" তাকে পারতেই হবে, সারা দেশে শুনবে তার নাম, গোপী কবিয়াল হঠাৎ যমুনার ডাকে ফিরে চায় অসঙ্কোচে তার পাশটাতেই বসে পড়ে কিগো মিল বাঁধছ পারায়"

বৈকাল হয়ে গেছে! পশ্চিম দিগন্তে নীরব প্রহরীর মত ময়ূরাক্ষীর বাঁধের তালগাছ গুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে বিস্তৃত আকাশের পটভূমিকায় নিপুণ তুলিকার আচড়ে কে ছবি একে চলে অস্তগামী সূর্যের ক্রন্দন। মেলায় লোকের ভিড় এখন থেকেই সুরু হয়।

আমবাগানে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। পটলি, আমও ভোবন সকলেই ব্যস্ত! রংচটা আরসীটা সামনে রেখে পটলি চুল বেধে চলেছে নেবুতেল আর থাবলা থাবলা জল-মাথায় দিয়ে। বুড়ীরতনীর ঘর থেকে চোঙ্গওয়ালা পুরোনো একটা গ্রামফোনে কোন মান্ধাতার আমলের একটা রেকর্ড বেজে চলেছে, কি লো তুই কি বিবাগীহলি নাকি!

যমুনা অদূরে চুপকরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে প্রসাধনে বসেনা এদের মত বুড়ীরতনীর নির্দেশে আমতলায় দাঁড়িয়ে নিজেকে পসারী করে তুলতে চায়না। পটলি ফোড়ন দেয় " ওর আর ভাবনা কি বল, ওমন কবিয়াল রসিক রোজকেরে নাগরে রইচে, ওর আর ভাবনা কি!"

হাসে সকলেই। যমুনা সরে যায় আস্তে আস্তে! এদের শব্দ তার কানে আসে!

প্রতিবাদ করে দলের সর্দারণী রতনী। বুড়ীর বিশ্রী বিভৎস চেহারা কাকের মত কঠোর স্বরে চীৎকার করে ওঠে, কি লো তুর হইছে কি বলদেখি?

দলের বদনাম। এতবদি ঘরমুখী যানা গিয়েই
ঘর বাঁধ! সেমুরোদ নাই আবার ঢং!

রাতের অন্ধকারে তেলের লালচে আলোতে আমবাগানটা পরিণত হয় নরককুণ্ডে, কুৎসিত নাচ গান, ধেনোর গন্ধ! রাতের অন্ধকারে সে বাগানটা ছেড়ে দূর হতে কবির আসরের দিকে চেয়ে থাকে। ঢোলের তালে তালে গোপী ধরতা একটা দেহতত্ত্বের গান গেয়ে চলেচে—সামাস্তে কি পাবে সেই ধনে,

কতশত যোগী ঋষি
হেরবে বলে কালো শশী
ওতারা বসেছে ধ্যানে!
কালা ভজে এইলাভ হ'ল
যত কুলনারীর কুল গেল
ওসেই কালার ভণে!

ঢোলটা সশব্দে তাল দেয়! গান সাঙ্গ হবার সংগে সংগেই চলে আসে যমুনা...বাগানের কোলাহলটা খানিকটা থেমে এসেছে; কার যেন জড়িত কণ্ঠস্বর শোনা যায় পাশকাটিয়ে আসতে থাকে যমুনা, পটলি টিপ্পুনী কাটে কি লো নাগরের গায়েন শোনা হল?

গোপী আসছিল অন্ধকারে, সহসা তার গতিরুদ্ধ হয়ে যায়, কার নিবিড় স্পর্শ পেয়ে চমকে ওঠে; অন্ধকারে চেনা যায় না নির্জন পুকুর পাড়টা দিয়ে আসবার সময় এই ব্যাপার; তার উষ্ণ নিশ্বাস তার গায়ে লাগে, মুখে বিজাতীয় ধেনো মদের গন্ধ; মদ; সারা গাটা তার শিউরে ওঠে,'ছাড় ছাড় যমুনা!" তারার অস্পষ্ট আলোকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দেখে—পটলি! হাফাচ্ছে সে! কবিয়ালই হয়েছ আর জাননা না কিছুই!

তার ধারাল হাসির শব্দে নীরব বাগানটা মুখরিত হ'য়ে ওঠে। যমুনা আসছিল এই দিকে দাঁড়ায় সে।

●

রাতে ঘুম আসে না গোপীর, বিছানায় পড়ে ছটফট করে, ওপাশ থেকে যমুনা বলে ওঠে, মন কি করছে নাকি গো! কথা কয়না গোপী!

রায়জীরা ও অঞ্চলে প্রতিপত্তিশালী জমিদার, তাদের মেলা। বাড়ীর মেয়েছেলেদের—কর্ত্তাদের আগ্রহে গোপীকে আসতে হয় তাঁদের বাড়ীতেই। গ্রামের শিক্ষিত সমাজ—সাধারণ আসরের মত শ্রোতাদল এরা নয়, ডেলাইটের আলোয় দখলমটা ঝলমলকরে গোপীর গান সুরু হয়।

যমুনা সন্ধা থেকে বার হয় নি, বার বার বলা সত্বেও এ ভাবে থাকতে তার ভাললাগে না—পটলী, অমেও ওদের মত। ম্লান হ্যারিকেনটা আম গাছের ডালে ঝুলিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে এদিক ওদিকে: কাঁচা তালপাতা ঝাঁক দিয়ে ছাওয়া কুড়ে গুলোর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে চ্যাংড়া ছেলের দল। কে যেন শিষ দিয়ে যায় দরজার পাশে।

রতনী অতগুলো টাকার লোভ সামলাতে পারে না লোকদুটোকে কথা দেয় নিশ্চয় দেখে লিও ও যমুনাকেই আনব। পেত্যয় না হয়, কিছু টাকাই আবেই দিবা—

যমুনা মাথা চাড়াদেয়, না মাল আমি খাব নাই। রতন কি যেন বলে চলেছে। কথাটা তার কানে যেতেই চমকে ওঠে—সত্যি! সত্যি কথা—রতনী সোৎসাহে বলে চলে—নাহলে গোপী এই মেলার আসর ছেড়ে যাবেক কোথায়, পটলিটা ও নাই, কে জানে কদিন থেকে কি সব ফুস ফাস করছিল ওরা দুজনেই, কে যেন বলছিল গেছেক ওরা বৈরাগী তলার মেলায়। কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না যমুনা। চলে গেছে গোপী তাকে না বলেই, কাল রাত্রের ঘটনাটা মনে পড়ে। পটলিও বাগানে দাঁড়িয়ে ছিল ওই গোপীর অপেক্ষায়। তবে কি সত্যাই সত্যাই সে চলে গেল!

যমুনা পাথরের মূর্তির মত বসে থাকে। রতনী দাঁড়িয়ে রয়েছে অদূরে হাতের বোতলটা প্রায় খালিই যমুনাকে চেনা যায়না আবার আগেকার মতই হয়ে উঠেছে, চোক দুটো করমচার মত লাল। হাসে অদ্ভুত ভাবে!

লোকদুটোর কাছ থেকে রতনী বাকী টাকাটা বুঝে নিয়ে বার হয়ে যায়।

রায়জীমশায় মুগ্ধ হয়ে শুনে যান গোপীর গান। সে দেহতত্বের গান দীর্ঘতানে বিনিয়ে বিনিয়ে গেয়ে চলে, ঢোলটায় যেন ভাষা ফুটে উঠেছে। রাণীমা ভিতর থেকে গোপীনাথকে মান্ত পাঠান একখানা গরদের সাড়ী, মাথায় ঠেকিয়ে নেয় গোপী।

এভাবে থাকবে না সে। বড় সমাজে তাকে মিশতে হয়, ও রতনীর আড্ডায় আর থাকবে না সে। যমুনাই সংগে থাকবে। বেশ মেয়েটা, খাসা মেয়ে, ওর মায়াতে পড়ে রয়েছে। বেশ মানাবে সাড়ীখানা যমুনাকে। রাত তখনও শেষ হয়নি ব্রাহ্ম মুহূর্ত। গুন গুন করে একটা গানের কলি গাইতে গাইতে চলে।

ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে যায়, যমুনা নাই। সারাঘরে একটা বিশৃঙ্খলার চিহ্ন! তার দপ্তরটা, পুঁথি বইগুলো এদিক ওদিক ছড়ান। বিছানাটা পাতাই হয় নাই। রেগে যায়। চীৎকার করে—যমুনা, যমনী।

পটলির হাসির শব্দে ফিরে চায়! মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসছে সে। বার হয়ে এসেই অবাক হয়ে যায়, ওদিকটায় পড়ে রয়েছে যমুনার জ্ঞানহীন দেহ মদের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায়, মুখে ফেনা ভাঙ্গছে, সারা দেহে একটা আলু থালু ভাব, বিগত রজনীর ঘৃণ্য পাশবিকতার পরিচয়! সারা শরীর ঘৃণায় শিউরে ওঠে গোপীর! রাগ ও হয়! অবাক হয়ে উঠে রতনী, গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে—ছুড়িরই মরণ দশা, রাজার হালে ছিলি তা তোর স্বভাব যাবে কোথায়।

গোপী পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে! পটলি হাসে বিচিত্রভাবে। ছন্নাকার পুথি দপ্তর গুলো গুছিয়ে নেয় গোপীনাথ!

পুর্বাকাশে তখনও দেখা দেয় নি দিনের সূর্য! মঙ্গরাক্ষীর বাধ ধরে চলেছে গোপী। সারি সারি তাল-গাছের নিশানা দেওয়া ওই দিগন্তে পানে নোতুন দিগন্ত গানে!

যমুনার কণ্ঠস্বরে রতনী গর্জে ওঠে। এটু থেকে মানুষ করলাম আজ তোর চোখ গজাল। যমুনার চোখে জল, ব্যাকুলভাবে বলে "কেন এ সর্বনাশ করলে তুমি!"

হেসে ফেলে রতনি "সর্বনাশ! কি বলিস্‌লা, কবিয়াল যাবেতুর সাথে,

সে বলে জাঁহাবাজ লোক, সারা পরগণার লোক
তাকে চেনে, মান্য করে! আর তুই!

কথাটা শেষ হয় না, দাঁত ভাঙ্গা তোবড়ান গালে হাসির জোয়ার খেলে যায়! যমুনার চোখে জল ভরে আসে! সে—সে কবিয়ালের যোগ্য নয়, কতদিন থেকে জানে না এপথে এসেছে, ছোট থেকেই—মা, সেও ছিল হয়ত এমনি কোন নাম পরিচয়হীনা—পথ চলে ছিল পঙ্কিত পঙ্কের আবর্তে। পৃথিবীর কোন সুন্দর জিনিষের উপর তার দাবী নাই, সে সুন্দরের মেলা থেকে নির্বাসিত ঘৃণিত জীবনপথে, চোখের সামনে দূর দিগন্ত প্রসারী নীলাভ আকাশ কেমন পাণ্ডুর হয়ে আসে। বাদসাহী সড়কের ধারে বনঝাউএর মাথায় উড়ে যায় তৃষিত সাম-ঘোলের দল জাওহাড়ির বিলের দিকে! মুক্ত বলাকার পাখায় সারা আকাশ—ছন্দহারা, অবাধ মুক্ত!

রতনী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, এত বড় বিচিত্র ঘটনা সে জীবনে দেখেনি, বিশ্বাসই করতে পারেনা, উকিলা!

যমুনা ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ এখানে আর থাকব নাই! যাবার আয়োজন তার হয়ে গেছে। সে চলে যাচ্ছে মেলা-থেকে! এপথে আর থাকবেনা। ঘৃণ্য দেহবেসাতীর ব্যবসা সে ছেড়ে দিয়েছে! পটলি, অমেও, রজনী আর সকলে চেয়ে থাকে তার দিকে। গাড়ীখানা যমুনাকে নিয়ে চলে যায় দৃষ্টিপথের বাইরে!

●

গোপী আর মেলায় গান গায় না। সে এখন নাম করা কবি। কবিনা, শিক্ষিত মহল তাকে বলে পল্লীকবি বাংলার ধূলামাটির সন্তান, আর ও সব বড় বড় অনেক কথা।

সেবার দেশে অজন্মা। একে যুদ্ধ তায় অজন্মা। দুর্ভিক্ষের আগমনী শুনতে পায় আকাশে বাতাসে। শূন্য মাঠে প্রান্তরে লোক নাই। গ্রামের অনেক বাড়ীই পরিত্যক্ত! রাস্তার ধারে দেখা যায় চলিষ্ণু নরকঙ্কালের দল। জীর্ণ ট্যানায় কোন রকমে লজ্জা ঢেকে চলেছে, মাটির সরা হাতে করে। যমুনার ছোট সংসারেও এল ভরা-ডুবির স্পর্শ। গ্রামের এককোনে এসে ছিল আবার সাধারণের মত নিশ্চিন্তে দিনগুলো কাটাতে, গোপীর সন্ধান করে বেড়ায়, সেদিন ডাক্তারবাবুদের বাড়ীতে শুনছিল সে নাকি এখন মস্ত লোক, বহু চেষ্টা করে ও তার সন্ধান ঠিক মত পায় নাই। কিন্তু ওসব চিন্তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে বাঁচবার সমস্যা। গায়ে ধান মেলেনা এক-মুঠো কেউ দেবে না, বিচবে না। গ্রামে মেলেনা, চলে সহরে, জীর্ণ কঙ্কালের জনতা চলে কাতারে কাতারে।

গোপীর মনটা আলোড়িত হয়ে ওঠে, সারাদেশের এই অবস্থা নিজের গ্রামের কথাও মনে পড়ে, সেই কুচলে বনে, শাল গাছের মাথায় আজ দিনের আলো যেন

কেঁদে বেড়ায় সে হাসি নাই! জীর্ণ চালের খড় ঝড়ে উড়ে গেছে। বাড়ীর সমস্ত পাচীলটা হয়ত পড়ে গেছে,... গোয়ালের গরু আজ নিশ্চিহ্ন! সে যা দেখেছিল তার কোন চিহ্ন নাই। যে গান একদিন বেধেছিল পল্লীর বুকে সে গান আজ শুনতে চায় না লোকে!

নোতুন গান! কেন এরা মরে, কেন খেতে পাবেনা, গোপী কৈফিয়তের ভাষা খুঁজে পায় না, ভাষা আর ভাব তার কণ্ঠে কি এক নোতুন বাণী যুগিয়ে দেয়। সারা সহরে হৈ চৈ পড়ে যায়, পল্লীকবির বাণীতে সহস্র সহস্র জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তার পা যেন কাঁপে—! মাইকের সামনে গাওয়া, তবু ও কি এক অপুর্ব উৎসাহে তার মনটা ভরে যায়।

পাংশুদিগন্তের কোলে চলেছে কঙ্কালের দল, স্ত্রীপুত্র কতক আছে কতক গেছে, কেউ অর্ধমৃত অবস্থায় আসছে গ্রাম ছেড়ে সহরের দিকে, আদিম যুগের কোন অসভ্য জাতির মৃতবস্থায় বুকের রক্ত দিয়ে যারা আঁকল নবজাগরণের বেদীতলে আলপনা, তাঁদেরই গান! তাদিকে বাঁচাতে হবে।

গোপীর সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, উত্তেজিত জনতা সোৎসাহে শুনে যায়, এদের কাছে সে দেশের কথা জানাতে পেরেছে, এ আনন্দ, এ কৃতিত্ব সে বিশ্বাসই করতে পারে না, সে যেন স্বপ্ন দেখছে।

স্বয়ং ম্যাজিষ্টট সাহেব এগিয়ে আসেন তাকে অভিনন্দন জানাতে। মালাতে সারাটা গলা বোঝাই হয়ে উঠেছে।

একি! থমকে দাঁড়ায় গোপী, ছোটবাবু, তাদেরই গ্রামের চৌধুরীদের রমেশ বাবু! রমেন ও বিশ্বাস করতে পারে না তুমিই! গোপীনাথ?—গোপীনাথ প্রণাম করে, লতিকাকে দেখলে চেনা যায় না, অনেক বদলে গেছে। বদলায় নি সেই হাসিটুকু! বলে, বললাম, আমাদের সেই গোপীনাথই, তুমি বিশ্বাসই করতে চাওনা!

গোপীনাথ চেয়ে থাকে তার দিকে, মনে ভেসে ওঠে আগেকার সেই দিন গুলো। সুপারী চিবত আর বারমাসী গাইত পাড়ার বৌ ঝিদের সামনে! স্মৃতি ভারাক্রান্ত দিন গুলো আজ চোখের কোনে জল আনে। ছাড়ল না লতিকা তাকে বাসায় নিয়ে যাবে!

কোন রকমে ভিড় ঠেলে তাদের গাড়ীখানা এগিয়ে চলে! গঙ্গার ধার দিয়ে আসতে গাড়ীখানা আটকে যায় লোকের ভিড়ে। অগনিত লোক দুর গ্রাম গ্রামান্তের থেকে এসেছে, খাদ্য চাই তাদিকে বাঁচাতে হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলোর দিকে চলেছে এরা, উত্তেজিত জনতা থামবে না, গাড়ীখানাকে ঘিরে ফেলবার উপক্রম, তাদের ব্যবস্থা করতেই হবে! পুলিশফোর্স ও ভীড় সরাবার চেষ্টা করে। মরীয়া হয়ে গেচে তারা, মারকে ভয় করে না এগিয়ে চলে! হঠাৎ গাড়ীর মধ্যে চেনা অতি পরিচিত একজনকে দেখে তারা আরও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কবিয়াল কবিয়াল।

সকলের সমবেত চীৎকারে গোপীর চমক ভাঙ্গে, এতক্ষণ কি সব সে ভাবছিল, ডাকটা কানে যেতেই স্বপ্ন ছুটে যায়, তারই চারিপাশে যারা, তাদের এ আহ্বান। জনতা এগিয়ে আসে! গোপী গাড়ীর দরজা খুলে নেমে পড়তে যায়! বাধাদেন রমেন বাবু, যেওনা যেওনা গোপী পুলিশ লাঠি চালাবে। কথাশোনে না। নেমে পড়ে সে! লতিকার কণ্ঠস্বরে ডুবে যায়!

কবিয়াল কবিয়াল! চারিদিকের কোলাহলের মধ্যে কে যেন প্রাণপণে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে, পুলিশের লাঠি চলেছে বোধ হয়? পিছনে কারা যেন আর্তনাদ করে। ভিড়ের চাপে নিষ্পেষিত হয়ে ও কে এগিয়ে আসে তার দিকে, ডাকে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে, কবিয়াল।

চমকে ওঠে গোপী, অতি পরিচিত ডাক! পিছন ফিরে দেখে একবারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, শীর্ণ শুষ্ক চেহারা চেনাই যায় না।

যমুনা—! মলিন বিশীর্ণ মুখে হাসির রেখা দেখা দেয়! গলায় ভারি ভারি মালা গুলো ছিড়ে খুঁড়ে এগিয়ে চলে জনতার সংগে। সেও এদের একজন!

মন্বন্তর হয়ত থেমে গেছে! যারা গেল তাদিকে কেউ জানল না, যারা শবের বুকে বেঁচে রইল তাদিকেও না। আবার মেলা বসেছে সুন্দর গ্রামে, পল্লী প্রান্তরে এখনও তেমনি শীতের সন্ধ্যা অস্তরাগের বন্দনা গায়, ময়ুরাক্ষীর তালগাছের প্রহরার পটভূমিতে বিস্তীর্ণ আকাশ-সীমায় আজও উড়ে যায় দুর দুরান্তরের বিলের দিকে তৃষিত সামখোলের দল, আবার যেন একটা সন্ধি হবার চেষ্টা চলেছে অতীতে আর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বর্তমানে, আগেকার মত এখনও গোপী কবিগানই করে বেড়ায়, এই নাকি তার সব চেয়ে ভাল লাগে।

সম্পাদকের দপ্তর

এস, কে, মিত্র (ঠাকুর গাঁও, দীনাজপুর)

আমি একজন সাধারণ তরুণ অভিনেতা। কলকাতার কোন মঞ্চে বা ষ্টুডিওতে কাজ করতে চাই। কিন্তু জনবল ও অর্থাভাবে পেরে উঠছি না। 'সন্ধির' পরিচালক শ্রীযুত অপূর্ব মিত্র এবং স্টারের পরিচালক ও নাট্যকার শ্রীযুত মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কাছ থেকে আশা পেয়েছিলাম। কি উপায়ে সুযোগ গ্রহণ করতে পারি বলতে পারেন। অপূর্ব বাবুর বর্তমান ঠিকানা কি? তিনি কি চিত্র জগৎ হতে বিদায় নিয়েছেন? ন্যাশনাল থিয়েটার্স নামে যে রঙ্গ মঞ্চ প্রতিষ্ঠার কথা শুনছি তা কতদিনে এবং কলকাতার কোথায় প্রতিষ্ঠিত হবে?

●

আপনার মত এরূপ কত তরুণের স্বপ্ন যে স্বপ্নেই মিলিয়ে যাচ্ছে তার সন্ধান আমি রাখি। কিন্তু ঐ সমবেদনা ও হা-হুতাশ করা ছাড়া আমারও কোন উপায় নেই। আপনি শুধু নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করেই ব্যথিত হন—আর আপনার মত শত শত জনের অসহায় অবস্থার ভিতর আমি হাবুডুবু খাই। প্রতিকারের জন্য সবল মনে যখনই পা বাড়াই—আমার সমস্ত পরিকল্পনাই চতুষ্পার্শ্বের বাধাবিপত্তির সংগে সংঘর্ষ খেয়ে চুরমার হ'য়ে যায়। চিত্রজগতে নূতনের প্রবেশ পথ করে দেবার জন্য অনেক হাটাহাটি করলাম—আমার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় ভরে উঠলো। তবু দমিনি—অনুপযুক্ততার অছিলায় আমার নূতনেরা প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে এলেও, আমি নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়িনি। তাই নূতনদের উপযুক্ত করে তুলবার জন্য—একটা নাট্যবিদ্যালয়ের পরিকল্পনা নিয়ে আবার ঘোরাঘুরি করছি—বিজয়ী বীরের গৌরব টীকায় আমি দীপ্তিমান হ'য়ে উঠবো, সে আশা নিয়ে আমি অগ্রসর হইনি—ব্যর্থতায় যদি এবারও আমার পরিকল্পনা ভরপুর হ'য়ে ওঠে—ক্ষতি নেই—আমি জানি, আমার এই অভিযানের ব্যর্থতা—আমার পরবর্তী যাত্রীকে আরও দৃঢ়, আরও উৎসাহীত করে তুলবে। তাই জনবল এবং অর্থাভাবের বাধায় নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়বেন না—ভবিষ্যতের পানে আরো আশা নিয়ে অগ্রসর হউন। শ্রীযুক্ত অপূর্ব মিত্র বা মহেন্দ্র গুপ্ত যে আশাই দেন না কেন—সে আশা'কে আমি মোটেই মূল্য দেব না। কারণ, আপনার মত অনেককেই এঁরা এরূপ আশা দিয়ে থাকেন। শ্রীযুত মিত্র বর্তমানে এম, পি প্রডাকসন্সের দ্বিভাষী চিত্র 'তুমি আর আমি'র পরিচালনা করছেন। কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে চিত্রখানি গৃহীত হচ্ছে। কালী ফিল্মস ষ্টুডিও, টালীগঞ্জ—এই ঠিকানায় তাঁর কাছে পত্র দিতে পারেন।

ন্যাশনাল থিয়েটার্স বা জাতীয় নাট্যশালা বলতে আমরা যা বুঝি—জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি তার প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনাই নেই। ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন থেকে জাতীয় নাট্যশালা কোন মতেই রূপলাভ করতে পারে না। যদিও প্রত্যেক নাট্যমঞ্চের এবং চিত্র প্রতিষ্ঠানের স্বত্তাধিকারীরা বাগাড়ম্বর করে বলে থাকেন—'আমার এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রতিষ্ঠান, জাতির সেবায় আমি আত্মনিয়োগ করেছি। তাঁদের এই উক্তিকে ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না। একমাত্র রজত মুদ্রার আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শেই যে তাঁরা অনুপ্রাণিত নন, একথা জোড় করে বলতে পারি। জাতীয় আদর্শের যে ক্ষীণতোয়া ধারা মাঝে মাঝে এঁরা পরিবেশন করে থাকেন—তা ঐ ব্যবসায়কে কায়েমী

করবার জন্যই। অর্থাৎ জাতীয় আদর্শে এঁরা অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠেননি—নিজেদের প্রয়োজনে জাতীয় আদর্শের ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে থাকেন। জাতির প্রয়োজনে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন, জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে তাঁদের সে আত্মত্যাগের কথা স্বীকার করবে। গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যশালার প্রয়োজনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—দেশবন্ধু জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন দেখতেন—সুভাষচন্দ্র তাকে বাস্তবে পরিণত করতে অগ্রসর হ'য়েছিলেন। শিক্ষাপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করে নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনেই শিশিরকুমার নাট্যজগতে পা বাড়িয়েছিলেন। বর্তমান বৈদেশিক সরকারের আওতায়ও জাতীয় নাট্যশালা গড়ে উঠতে পারে—হয়ত তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাবো না—তবু তার সম্ভাবনা আছে—যদি আত্মত্যাগ ও আত্মনিষ্ঠায় যে সব নেতৃস্থানীয় বীরেরা জাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন—তাঁরা এগিয়ে এসে এরূপ নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তার অধিনায়কত্ব করবার দম্ভ একমাত্র নাট্যাধিনায়ক শিশিরকুমারেরই শোভা পায় বর্তমান যুগে। নইলে ব্যক্তিগত পরিচালনায় যে সব নাট্য-মঞ্চ বা চিত্র প্রতিষ্ঠান জাতীয় আদর্শের বড় বড় বুলি আওড়িয়ে গ'ড়ে উঠবে—তাদের ধাপ্পাবাজী থেকে আপনাদের দূরে থাকতেই অনুরোধ জানাবো। তাই জাতীয় নাট্য-মঞ্চ সম্পর্কে যে গুজব শুনেছেন তা ভূয়ো। জাতির নামেই হয়ত কোন সুচতুর ব্যবসায়ী—নিজের স্বার্থকে কায়েমী করে নিতে অগ্রসর হচ্ছেন।

অরুণিমা দেববর্মণ (শিবপুর, হাওড়া)

(১) অজয় ভট্টাচার্য ও অনিল ভট্টাচার্য প্রণীত কোন আধুনিক গানের বই আছে কিনা জানতে চাই। (২) বেতারের গোলযোগ কি মিটে গেছে? ছোটদের আসরের কি হ'য়েছে? (৩) আপনাদের রূপ-মঞ্চের যত গ্রাহক বাড়ছে বইয়ের উন্নতি হওয়ার থেকে অবনতি হচ্ছে দিন দিন। এর কারণ কি? প্রথমে একটা বন্ধুর কাছ থেকে একটা রূপ-মঞ্চ নিয়ে এলাম পড়বো বলে। সত্যি তখন বইটা পড়ে খুব সুন্দর লাগলো। সেই থেকে রূপ-মঞ্চ পড়তে থাকি। এখন এত খারাপ লাগে পড়তে! তখন রূপ-মঞ্চ আসতে দেরী হ'লে খুবই ব্যস্ত হ'য়ে পড়তাম। মনে হ'তো, কখন বই দিয়ে যাবে? রূপ-মঞ্চে আমরা অনেক খবরের আশা করি।

পূর্ব পরিষদ ব্যালে একাডেমির নৃত্যশিল্পী সরস্বতী বসু

●

(১) ৺অজয় ভট্টাচার্য প্রণীত—শুকসারী, মিলন-বিরহ কথা, আজি আমারি কথা, তাছাড়া অনুবাদ, কবিতা ও উপন্যাসও আছে কয়েকখানা। ৺অনিল ভট্টাচার্যের—কোন গানের বই প্রকাশিত আছে কিনা বলতে পারবো না। আপনি শ্রীগুরু লাইব্রেরীতে খোঁজ নিতে পারেন।

(২) বেতালই হ'চ্ছে বেতারের বৈশিষ্ট্য—তা কী

মিটবার! অর্থাৎ জনমতের এবং জনসাধারণের স্বার্থের দিক বিচার করে বেতার কর্তৃপক্ষ চলতে এতই অনভ্যস্ত যে, সব সময়ই বেসুরে বাজাচ্ছেন। ছোটদের আসরে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের গলা শুনতে পাই। তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছু নেই—কারণ এই বিভাগ পরিচালনায় তাঁর দক্ষতাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবো। অবশ্য সেই সংগে সংগে পেটেণ্ট-মালের মত বেতারের ইন্দিরা দেবী ও নীলিমা সান্যালের ন্যাকামি—শ্রোতাদের সহ্য করা ছাড়া উপায় থাকে না। মামুম ভাই, এবং মনি রায়, এঁরাও সম্প্রতি এই মহলে আড্ডা গেড়েছেন। এই বিভাগ পরিচালনায় এঁদের উপযুক্ততা (!) রেডিও সেট খুলে বসলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু কথা হচ্ছে গোলযোগ নিয়ে। যতদিন বেতার কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্তন না হবে—যতদিন বেতার তার বেতনভুক পেটেণ্ট মালদের চালু রাখতে পারবে—ততদিন যতই গোলযোগ হউক না কেন—বেতারের কণ্ঠস্বরের মতই তা শূন্যে ভেসে বেড়াবে। (৩) আমাদের বিরুদ্ধে প্রথমেই যে অভিযোগ এনেছেন—তা খণ্ডন করতে যেয়ে আপনার বিরুদ্ধেও যদি ওরূপ অভিযোগ এনে বলি, আপনার রুচীবোধকে খুব প্রশংসা করতে পারলুম না—তাহ'লে কী খুব অন্যায় বলা হবে?

'তপস্যা'য় অজিত ও কৌশল্যা

আপনি বলেছেন, রূপ-মঞ্চের যত গ্রাহক বাড়ছে—উন্নতির চেয়ে তার অবনতিই হচ্ছে বেশী। অবনতি আপনি যে দিক থেকে বলছেন, তা হয়ত রূপ-মঞ্চের বাহ্যিকরূপ অর্থাৎ তার দেহ সৌন্দর্যের চাকচিক্য হয়ত আগের চেয়ে একটু কমেছে। যুদ্ধের পূর্বে যে কাগজে রূপ-মঞ্চ মুদ্রিত হ'তো—আজকাল সে কাগজ মিল তৈরী করছে না। ব্লক ইত্যাদি যুদ্ধের পূর্বে চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি যেরূপ তৈরী করতেন, আজকাল সেরূপ করছেন না—ব্লক নির্মাণের মূল্য বেড়েছে বলে। তাই হয়ত বাইরের রূপটা রূপমঞ্চের আগের চেয়ে একটু নিষ্প্রভ হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে কাগজ মিল তৈরী করছে তার ভিতর সবচেয়ে ভাল কাগজটাই আমরা ব্যবহার করছি। রূপ-মঞ্চের আর্থিক সংগতি বৃদ্ধির সংগে সংগে তার অংগ সৌষ্ঠবের জন্য আমরা নিজেরাই ব্লক করছি। তবে যে Grade-এর কাগজে পূর্বে ছাপানো হতো সেই Grade-এর কাগজের অভাবে—বর্তমানের কাগজে ব্লকগুলি যে পূর্বের মত ভাল উঠবে না, একথা কাগজ সম্পর্কে 'টেকনিক্যাল' জ্ঞান যাঁর আছে, তিনিই স্বীকার করবেন। যদিও এই দর্শন-সৌন্দর্যের অবনতির জন্য আমরা নিরুপায়, তবু আপনার এই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে বলছি, কাগজের মিলগুলি যখন পূর্বেকার Grade-এর কাগজ প্রস্তুত করবে—আমরা তাই ব্যবহার করবো। কিন্তু এই বাহ্যিক রূপের মালিন্যের জন্য রূপ-মঞ্চের অবনতিকে আমরা কোন মতেই স্বীকার করবো না। কারণ—কাগজের মান বিচার করতে হ'লে তার বাহ্যিক রূপটা সত্যিকারের রুচীবান পাঠকের কাছে খুব কমই দাগ কাটে। পূর্বের চেয়ে রূপ-মঞ্চের রচনার মান যে অনেক উন্নত হ'য়েছে—একথা আমরা যারা রূপ-মঞ্চের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছি, তারাও যেমনি বুঝতে পারি, তেমনি যে কোন রুচীবান পাঠকই স্বীকার করবেন। পূর্বে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—কোন সুচিন্তিত পথ আবিষ্কার করে নেবার উপযুক্ততা আমাদের অনেকের মাঝেই ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ধ গায়ে ভুর ভুর করলেও সত্যিকারের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা কতটুকু বা

ছিল আমাদের! তবে যে বিরাট আদর্শ, আগ্রহ—নিষ্ঠা এবং উদ্দীপনা নিয়ে রূপ-মঞ্চের সেবায় আমরা আত্মনিয়োগ করেছিলাম—তারই স্পর্ধায় রূপ-মঞ্চকে এত অল্প সময়ের ভিতর আজকের যে অবস্থায় দাঁড় করিয়েছি—বাংলার কোন চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ সম্বলিত পত্রিকার ভাগ্যে সে গৌরব লাভের সুযোগ হয়নি। এটা আমাদের আত্ম-অহঙ্কার বা আত্ম-প্রচারের কথা নয়—আমাদের আত্ম-বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভিব্যক্তি। প্রথম যখন রূপ-মঞ্চ আত্মপ্রকাশ করে, তার মুদ্রণ সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০ কপি। আজকে এই ৪।৫ বছরে তার মুদ্রণ সংখ্যা ১১,০০০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে (অবশ্য বিশেষ সংখ্যাগুলিই ১১, হাজারের বেশী মুদ্রিত হ'য়েছে)। এবং পূর্বে রূপ-মঞ্চের পাঠক গোষ্ঠীর ভিতর যাঁদের পেয়েছিলাম—আজ প্রত্যেক সুধীসামাজের ভিতর তার পরিধি প্রসার লাভ করেছে, এবং আমাদের এই পাঠক সমাজের জন্য আমরা গৌর-বান্বিত। এঁদের সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রূপ-মঞ্চের দিন দিন উন্নতিতে যেভাবে আমাদের পরিচালনা করছে—সেজন্য আমরা চির কৃতজ্ঞ। আমরা জানি, আমাদের দুর্বলতা কোথায়—সে দুর্বলতা দূর করতে আমরা সব সময়ই সচেতন—এবং এব্যাপারে পাঠক গোষ্ঠীর সাহায্য এবং সহযোগীতা ভিন্ন কৃতকার্যতা লাভ করা অসম্ভব। আমাদের পাঠক গোষ্ঠীকে মান হিসাবে দু'ভাগে ভাগ করি। যেমন ভাগ করা যেতে পারে দর্শকসমাজকে। (১) একদল যাঁরা শিক্ষিত এবং উন্নত রুচীসম্পন্ন (২) আর এক-দল যাঁরা যদিও নিরক্ষর নন, তবু তাঁদের শিক্ষিত বলতে পারি না—এবং তাঁদের রুচীও কিছুটা নিম্নস্তরের। এইদুই দলকেই খুশী করতে হবে। দ্বিতীয় দলকে যদি অবহেলা করে প্রথম দলকে খুশী করি, তবে আমাদের আদর্শের প্রথমেই গলদ থেকে যাবে। কারণ, জনসাধারণের কৃষ্টি ও শিক্ষার প্রসারই হচ্ছে পত্র পত্রিকার প্রধান আদর্শ। তাই দ্বিতীয় দলকে অবহেলা আমরা কোনমতেই করতে পারি না—এঁদের অন্তরে প্রবেশ করে সুপ্ত বোধশক্তিকে জাগ্রত করতে হবে—তবেই আমরা দেশের সত্যিকারের কাজ করতে পারবো। আবার প্রথম দলকে যদি সম্পূর্ণ ভাবে

ট্রেভর হাওয়ার্ড। নোয়েল কাওয়ার্ডের ব্রিফ এনকাউন্টারে সেলিয়া জনসনের সংগে অভিনয় করেছেন।

অবহেলা করি, কাগজের মান তাহলে অতলে তলিয়ে যাবে। তাহলে বুঝতে পাচ্ছেন, একটা কাগজের দায়িত্ব কত। আজ যদি আমাদের পাঠক সমাজ তথা দর্শক সমাজের সকলেই সুরুচীর পরিচয় দিতেন—গৃহলক্ষ্মী প্রভৃতির মত নিম্ন শ্রেণীর ছবি দেখতে তাঁরা এত ভিড় করতেন না। আমি সর্বশ্রেণীর দর্শকের পাশে বসে একাধিক বার চিত্রখানি দেখেছি স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে—অনেককেই বলতে শুনেছি, দ্যাৎ পয়সা গুলিই নষ্ট হ'য়ে গেল—রূপ-মঞ্চের সমালোচনাটা পড়েছিলাম, তবে তখন বিশ্বাস করতে পারিনি। দর্শকদের রুচী যদি উন্নত হ'তো তবে তাঁরা আর এরূপ ভাবে প্রবঞ্চিত হতেন না। চিত্র প্রযোজকদের দ্বারাও নয়—কোন কাগজের মিথ্যা সমা-লোচনায়ও নয়।

আমার এই কথাগুলি বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, আমরা যে অগ্রসর হচ্ছি তাতে মোটেই সন্দেহ নেই—তবে

চিত্রবাণীর 'এইতো জীবন'-এ নিভাননী ও ইন্দু মুখার্জি।

কৌতূহল জাগে—কিন্তু তা সত্যিকারের জানা নয়। নাট্য মঞ্চের সত্যিকারের রূপ কি হওয়া দরকার — অভিনেত্রী হ'তে হ'লে তাঁর কি কি গু থাকা চাই—চিত্রের আদ কি হবে প্রভৃতি জানাই হচ্ছে সত্যিকারের জানা। কি আমরা চাই চিত্র ও নাট্য জগতের কাছে, কি চাওয়া উচিত, কি পেলাম আর কি পেলাম না—এই চাওয়া পাওয়া দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই রূপ-মঞ্চ নিজেকে বিকশিত করে তুলছে এই বিকাশে যেখানে যে গলদ থেকে যাচ্ছে—আপনার নিরপেক্ষ সমালোচক হিসাবে তার সমালোচনা করবেন, সে অধিকার আপনাদের আছে—আপনাদের কাছে সে দাবী উত্থাপন করবার অধিকার থেকেও আমরা বঞ্চিত নই—কারণ আমাদের হৃদয়রক্তে যে রূপ-মঞ্চের রূপদান করেছি—চলবার সময় দু'দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে বলে আমাদের গতি হয়ত একটু মন্থর বলে মনে হতে পারে আপনাদের চোখে।

রূপ-মঞ্চে আপনারা আরও বেশী সংবাদের আশা করেন। কিন্তু রূপ-মঞ্চ যে নিছক সংবাদপত্র নয় একথাটা ভুলে যান কেন? সংবাদের জন্য দৈনিক পত্রিকাই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারে। কোন মঞ্চে কোন নাটক অভিনীত হলো—কোন চিত্র প্রতিষ্ঠান কোন চিত্রারম্ভ করলেন—কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী কার সংগে প্রেমে পড়লেন—কাকে বিয়ে করলেন—সে সংবাদ জানবার হয়ত আপনাদের মত শত শত পাঠক পাঠিকাদের অনুরাগ রসে হ'য়েছে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

উজ্জয়িনী ব্যানার্জি (একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ)

১। শ্রীমতী মণিকা গাঙ্গুলীর কি এবার 'ম্যাট্রিক' দেবার কথা ছিল বেলতলা বালিকা বিদ্যালয় থেকে?

(২) শ্রীমতী সুনন্দার সংগীতের 'Back Ground' কি ইলা ঘোষ? (৩) কোন্ কোন্ অভিনেত্রী ফিল্মে নিজে গান করেন? (৪) শ্রীমতী ভারতীর সংগীতে 'Back Ground' ছিলেন শৈলদেবী, তা এখন কে গাইছেন? (৫) ভাবীকালের সিপ্রাদেবী অর্থাৎ কাননিকা চট্টো-

পাধ্যায় কি কোন রেকর্ড করেছেন—না সে কাননিকা চট্টোপাধ্যায় অন্যলোক? (৬) আমি রূপ-মঞ্চের গ্রাহক হ'তে চাই? নিয়ম কানুন জানাবেন।

●

(১) শ্রীমতী মনিকা হায়দ্রাবাদে জুনিয়ার কেম্ব্রিজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন জানি—বেলতলা বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন কিনা বলতে পারি না। তবে তিনি বেলতলা গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন একথা সত্য। শ্রীমতী মণিকা সম্পর্কে আর একটী তাজা খবর বলছি, সম্ভবতঃ শীঘ্রই তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হবেন! যথাসময়ে রূপ-মঞ্চে এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশিত হবে তাই বিস্তারীত ভাবে কৌতুহলবশত তার পূর্বে আর কিছু জানতে চাইবেন না। (২ ও ৪) আপনার ২নং ও ৪নং প্রশ্নে সুনন্দা এবং ভারতীর গান চিত্রে কে গেয়ে থাকেন বা থাকতেন—কিন্তু এ বিষয়ে আমরা নিরুপায়। সব ক্ষেত্রে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আর তাছাড়া কে কার হয়ে গাইলেন তা জানবার কোন স্বার্থকতা আছে বলে ব্যক্তিগত ভাবেও আমি মনে করি না। বরং জানলে চিত্র দেখবার সময় রসগ্রহণে বাধাই সৃষ্টি করে। (৩) আপনার তিনমম্বর প্রশ্নটাও এরই আওতায় বলে উত্তর দিলুম না।

ঝরাফুল চিত্রে নবাগতা সুধা মুখার্জি ও শরং চট্টোঃ

(৫) ভাবীকালের সিপ্রাদেবী অর্থাৎ কাননিকা চট্টোপাধ্যায় এবং যে কাননিকা চট্টোপাধ্যায়ের রেকর্ড শুনেছেন তিনি একই শিল্পী। ইনি সৌখী ন নাট্যাভিনয় এবং বেতারেও ইতিপূর্ব্বে অভিনয় করতেন। (৬) মনিঅর্ডার করে আট টাকা পাঠিয়ে দিলেই আপনাকে গ্রাহিকা করে নেওয়া হবে। আপনার চিঠিতে ঠিকানা নেই বলে, আমাদের সার্কুলেশন বিভাগ থেকে এ সম্পর্কে কোন চিঠি দিতে পারেনি।

সাত নম্বর বাড়ীতে সন্ধ্যারাণী

শ্রীউৎপল রায়

(১) সৌন্দর্যের পরিমাপ করতে গেলে পুরুষ অভিনেতার কি কি Factor থাকা প্রয়োজন (২) অভিনয় প্রতিভার দিক দিয়ে বিচার করলে কে শ্রেষ্ঠা—চন্দ্রাবতী অথবা দেবীকারাণী? (৩) সংগীতে কানদেবী ও খুরশীদ এই দুই জনের মধ্যে কার গলা আপনাদের ভাল লাগে (৪) হিন্দী ছবির পুরুষ তারকাদের মধ্যে অভিনয়ে কে শ্রেষ্ঠ ও কোন বইতে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন?

●

(১) টানা টানা চোখ—উন্নত নাসা—ভুল ভুলে চুল—ছিপ ছিপে মজবুত গড়ন—উচু লম্বা চেহারা—পুরুষোচিত দীপ্তিতে ব্যক্তিত্ব উপছে পড়ে—সর্বোপরি যাকে দেখেই মনটা খুশীতে ভরে ওঠে প্রথম দর্শনে, তিনিই আমার দৃষ্টিতে সৌন্দর্যবান অভিনেতা। (২) দেবীকারাণীর অভিনয় প্রতিভাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু চন্দ্রাবতীর দক্ষতা তাঁর চেয়েও বেশী বলে মনে করি (৩) দু'জনকে একই তৌলদণ্ডে তুলে পরিমাপ করবো—তবে কাননের মিষ্টত্ব এবং খুরশীদের মূর্ছনা—এই দুই বিশেষত্বই দু'জনকে অতুলনীয় করে রেখেছে আমার মনে। (৪) নায়ক এবং জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে অশোক কুমারের কথাই আমাকে সর্বাগ্রে বলতে হয়—কিন্তু জাগীরদার (পড়শী ও রামশাস্ত্রী) এবং মজহর খাঁ (পড়শী) র দক্ষতার কাছে অশোক কুমারকে নিষ্প্রভ বলেই মনে করি।

অনিল রায় (শ্যামবাজার, কলিকাতা

(১) বোম্বাইতে কোন নাট্যশালা আছে কি? (২) সম্প্রতি কলিকাতার শিল্পীগণ (Technician) যে একটি সমিতি গড়িয়াছেন তার ঠিকানা কি? (৩) প্রতিমা দাশগুপ্তা কোথায় এবং তাঁর পরবর্তী চিত্র কি?

●

(১) কলকাতা ছাড়া ভারতের অন্য কোন প্রদেশে স্থায়ী পেশাদার রঙ্গমঞ্চ নেই। বোম্বাইতে এখনও স্থায়ী নাট্য-মঞ্চ গড়ে ওঠেনি। তবে ভ্রাম্যমান নাট্যসম্প্রদায় এবং অস্থায়ী নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয় বম্বেতে হ'য়ে থাকে। চিত্রাভিনেতা পৃথ্বিরাজ বম্বের নাট্যান্দোলনকে সার্থক করে তুলতে বিশেষ চেষ্টা করছেন। (২) গলফ ক্লাব রোড। নম্বরটা ঠিক বলতে পারবো না। তবে শ্রীযুক্ত শম্ভু সিং, ৬৯ হ্যারিসন রোডে খোঁজ করলে এবিষয়ে বিষদ ভাবে জানতে পারবেন। (৩) প্রতিমা দাশগুপ্তা বর্তমানে কলকাতায় আছেন বলে শুনেছি—এবং নিজেই একখানা বাংলা চিত্রের প্রযোজনা করবেন বলে গুজব রটেছে।

আদিত্য মুখার্জি (রাজগ্রাম, বাকুঁড়া)

(১) কলিকাতা মহানগরীতে সর্বশুদ্ধ কতগুলি প্রেক্ষাগৃহ আছে?

●

আনুমানিক৫৩টী। এক বছরের মধ্যে এই সংখ্যার সংগে অন্ততঃ পক্ষে দশটী যোগ করতে পারবেন।

কানন চট্টোপাধ্যায় (কণ্টোলার অফ মিলিটারী একাউন্টস বার্মা, এলাহাবাদ)

(১) আমি একজন আপনাদের রূপ-মঞ্চের নিয়মিত পাঠক। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে রূপ-মঞ্চ পড়ে থাকি। আমি মনে করি বাংলা দেশে রূপ-মঞ্চের মত নির্ভীক ও প্রীতিপ্রদ কাগজ আর দ্বিতীয়টী নেই। আপনাদের রূপ-মঞ্চ যখন পাই, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকেনা এবং না পড়ে নড়বার ইচ্ছা করে না। এক মাসের রূপ-মঞ্চ শেষ হ'য়ে গেলেই পরের মাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি এবং ঘন ঘন দোকানে

খোঁজ করতে থাকি। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে, রূপ-মঞ্চ খুব বিলম্বে এখানে আসে—তাই আমাদের আগ্রহ তখনই মেটাতে পারি না। (২) বম্বের সিনেমায় সব চেয়ে সুন্দর অভিনেতা ও অভিনেত্রী কে? খুরশীদ ছাড়া বম্বের অভিনেত্রীদের মধ্যে কার কণ্ঠস্বর ভালো? জয়শ্রী কি নিজে শকুন্তলায় (হিন্দি) গেয়েছেন। (৩) আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, আপনারা অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে গ্রাহক গ্রাহিকাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানাবেন, যাতে তাঁরা রূপ-মঞ্চে তাঁদের জীবনী প্রকাশ করেন। প্রতিমাসে এক এক জন অভিনেতা অভিনেত্রীর জীবনী রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করে আমাদের অনুরোধ রাখবেন কি? (৪) আর একটি দরকারি কথা বলছি, আমি শীঘ্রই রেঙ্গুন যাচ্ছি—সেখানে আপনাদের কোন এজেণ্ট আছে কি? যদি না থাকে, আমি এজেন্সী নিতে পারি—এ ব্যাপারে কি কি করতে হবে আমাকে জানাবেন।

●

(১) রূপ-মঞ্চ অন্যান্য পত্রপত্রিকা থেকে শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট তা নির্ণয় করবার দায়িত্ব আপনাদের। আপনাদের বিচারে রূপ-মঞ্চ যদি শ্রেষ্ঠ আসন পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়—আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো। রূপ-মঞ্চ আপনাদের আনন্দ দেয়, আপনারা রূপ-মঞ্চের জন্য গভীর আগ্রহে থাকেন—অথচ রূপ-মঞ্চ নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে সব সময় আপনাদের সে আগ্রহকে মেটাতে পারে না—রূপ মঞ্চের এই অক্ষতার জন্য সত্যই আমরা দুঃখিত। ভবিষ্যতে রূপ-মঞ্চের এই দুর্বলতা দূর করবার জন্য আমরা যত্নবান হচ্ছি (২) প্রেম আদিবের মিষ্টি চেহারা আমার মন ভোলায়। শান্তা আপ্তে। সম্ভবতঃ জয়শ্রী নিজে গাননি।

(৩) আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবো। (৪) রেঙ্গুনে বর্তমানে আমাদের কোন এজেণ্ট নেই। তবে আমাদের বার্ষিক গ্রাহকদের অনেকেই রেঙ্গুনাভিমুখে যাত্রা করেছেন বা করবেন বলে জানিয়েছেন। তাই রেঙ্গুনের বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাদের মহলে রূপ-মঞ্চ ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করবে বলে

'মাই সিষ্টারে' আখতার জাহান।

অনুমান করছি। আপনি যদি এজেন্সী নিতে চান—আপনাকেই যাতে প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়, আমি আমাদের সার্কুলেশন বিভাগে সেজন্য অনুরোধ জানিয়েছি। রেঙ্গুন যেয়ে আপনার স্থায়ী ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দিলেই নিয়ম কানুন পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

অজিত কুমার রায় (রয়লজ, বারাকপুর স্টেশন রোড)

ভাবীকালের পর খ্যাতনামা সংগীত পরিচালক কমল দাশ গুপ্ত কি কোন ছবিতে সুর দিচ্ছেন? এম, পির তুমি আর আমি এবং পি, আর প্রডাকসন্সের বনফুলের সুরশিল্পী কে?

●

কৃষ্ণলীলা, আরব্যোপন্যাস। রবীন চট্টোপাধ্যায়। কমল দাশগুপ্ত।

করালী মোহন চট্টোপাধ্যায় (ফিয়ার লেন, কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত শ্রীপার্থিবের সমালোচনা পাঠ করে আমি তকরার ছবিখানি দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি ছবির ভালমন্দ বিচার করে যা লিখেছেন তা ঠিক। তবে শ্রীযুক্ত শ্রীপার্থিব পরিচালক হেমেন গুপ্তের বিরুদ্ধে Written & Directed by Hemen Gupta বলে যে অভিযোগ

করেছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ ছবির Casting এ শুধু Directed by Hemen Gupta আছে written বলে কিছুই নাই। আর তাছাড়া তকরার ছবির কাহিনী রচনা করেছেন শক্তিপদ রাজগুরু, একজনের লিখিত কাহিনী নিয়ে পরিচালক নিজেকে লেখক বলে জাহির করতে পারেন না।

●

ছবির Casting এ যে, তকরার চিত্রের কাহিনী-কারের নাম এবং হেমেন বাবুর নামের পূর্বে শুধু Directed by লেখা আছে সেকথা শ্রীপার্থিবের চোখ এড়িয়ে যায়নি। কিন্তু গল্প পুস্তিকা এবং চিত্রের প্রচারকার্যের প্রতি লক্ষ্য করে, যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই কর্তৃপক্ষের প্রতি সন্ধিহান হ'য়ে উঠবেন। 'To err is human' তাই প্রচার পুস্তিকায় যদি Written and Directed by Hemen Gupta ভুল হ'য়ে থাকে, শ্রীপার্থিবের বলবার কিছু নেই। তবে এইভুল যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তবে? এবং ইচ্ছাকৃত বলবো এইজন্য যে, বম্বের কাগজগুলোতেও Written & Directed by প্রচার করা হচ্ছে। এরূপ ভুল প্রায়ই দেখা যায়, তাই পরিচালকদের এই হীন মনোবৃত্তির জন্যে শ্রীপার্থিব এক্ষেত্রে অভিযোগ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে হেমেনবাবুর ওপর তাঁর বিদ্বেষ মোটেই নেই।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর কংশ বনিক (টালীগঞ্জ রোড, কলিকাতা)

(১) দুই পুরুষে নূট বিহারীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও মানে না মানায় দেবনাথের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে অভিনয়ের কলা কৌশলের দিক থেকে কাকে আপনারা শ্রেষ্ঠ আসন দেবেন।

(২) নেতাজী চিত্র কোন ভাষায় গৃহীত হবে? মনে করুণ বাংলা ভাষায় যদি গৃহীত হয় তবে নিচের লেখা অভিনেতাদের মধ্যে কাকে নেতাজীর ভূমিকায় আপনি পছন্দ করবেন?—দেবী মুখার্জি, জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্ন্যাল ও সায়গল? লক্ষীস্বামী-নাথএমর ভূমিকায় এঁদের ভিতর কাকে নির্বাচন করবেন—সুনন্দাদেবী, বিনতা বসু, সুমিত্রা দেবী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, লীলা দেশাই।

●

(১) দুইটী বিভিন্ন ধরণের চরিত্র, তাই দুটীর জন্যই বিভিন্ন প্রতিভার প্রয়োজন। নূটবিহারীর চরিত্রে যেমন অহীনবাবু হতেন ব্যর্থ, তেমনি ভূতনাথের চরিত্রে ছবি বিশ্বাসও (২) 'নেতাজী' কোন ভাষায় গৃহীত হবে—এবং হবেই কিনা তা কিছুদিন না যাওয়া অবধি বলতে পারি না। আপনার প্রদত্ত শিল্পীদের তালিকার ভিতর একমাত্র ছবি বিশ্বাসকেই আমি অনু-মোদন করতে পারি নেতাজীর ভূমিকায়। লক্ষীস্বামী-নাথমএর ভূমিকায় সুনন্দা দেবী ও লীলাদেশাইকে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীমতী রেখা ভট্টাচার্য

(হ্যারিসন রোড)

(১) শ্রীমতী কানন দেবীর অভিনীত একখানা এক বই আসতে কত দেরী লাগে? সেই 'পথ বেঁধে দিল' দেখে-ছিলাম ১০ই মে ৪৫ সালে—তারপর এই পর্যন্ত আর কিছু নেই। (২) 'পথের সাথী' আমাদের ভাল লেগেছে। অনুরূপা দেবীর শক্তিকে অকুণ্ঠ চিত্তে প্রশাংসা করবো, তাই নয় কি? (৩) কাননদেবীর আত্মজীবনী 'জানেন কি' এঁদের বিভাগে স্থান পায় না কেন?

(৪) 'রূপ-মঞ্চ' প্রকাশিত হ'তে বড্ড দেরী হয় কেন? মাসের শেষ দিনগুলো বড় ছট ফট করে কাটাই—কাগজওয়ালাদের যেয়ে জিজ্ঞাসা করি, রূপ-মঞ্চ বেরিয়েছে? 'না বাবু' মনে ভয়ানক রাগ ও দুঃখ হয়, এই অশান্ত মনকে ঠাণ্ডা করবার জন্য পুরোনো সংখ্যাগুলি পড়ি। মুহূর্তের জন্যও ভাবি না যে, এটা পুরানো—এটা নূতন এবং চির নূতন। রূপ-মঞ্চের সমস্ত কর্মিকে ও পাঠক-পাঠিকাদের আমাদের প্রণাম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি দূর থেকে মেঘদূত কাব্যের যক্ষের মতো। জয়হিন্দ।

●

(১) সত্যিকারের শিল্পী যিনি তিনি কখনও নিজেকে সস্তা করে দিতে চান না।—ঘন ঘন আত্মপ্রকাশ করে।

যখন আসেন, দর্শক মনে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে চলে যান। এই আলোড়নের জের থাকে অনেকদিন। দর্শক মন যখন তাঁর বিরহ ব্যথায় কাতর হ'য়ে ওঠে—দর্শকমনের চাঞ্চল্য বাড়িয়ে আবার তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। হলিউড প্রভৃতি দেশের বড় বড় শিল্পীদের এই বৈশিষ্ট্য কানন দেবী নিজের জীবনেও ফুটিয়ে তুলতে চান। কাননের জন্য আপনাদের যে চাঞ্চল্য—তাঁকে যদি আরো বেশী চিত্রে দেখতে পেতেন তবে তার বেগ এতটা থাকতো না। যে জিনিষ হুবহু পাওয়া যায়—সে জিনিষ যদি মূল্যবানও হয় তবু তার জন্য আমাদের হৃদয়াবেগ ততটা থাকে না, যতটা থাকে যে জিনিষ মূলবান ত বটেই, এমন কি কম মূল্যবান হলেও সহজ প্রাপ্য নয়, তার বেলায়। অবশ্য কানন দেবী ইতি মধ্যে আরও তিনখানি হিন্দি চিত্রে অভিনয় করেছেন—বন ফুল, আরব্যোপন্যাস ও কৃষ্ণলীলায়। বাংলা চিত্রে অবশ্য 'পথ বেঁধে দিল'র পর তাঁকে 'তুমি আর আমি' চিত্রেই দেখতে পাবেন। (২) আপনাদের মত আমি 'পথের সাথী' অথবা অনুরূপা দেবীকে অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করতো পারবো না। 'পথের সাথী'র সমালোচনা অন্যত্র প্রকাশিত হ'লো—আমিও সমালোচনার সংগে একমত। (৩) কাননদেবী সম্পর্কে আপনারা এত জানেন যে, তাঁকে 'জানেন কি এঁদের' বিভাগে না টেনে নিয়ে, যা জানা দরকার তা অন্যত্র প্রকাশ করা হ'লো (৪) শুধু আপনাদের নয়—আপনাদের মত অনেকেরই এই অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে—আমরা এই অভিযোগমুক্ত হ'তে চেষ্টা করছি, তবে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। জয়হিন্দ ধ্বনি দিয়ে আপনাদের তথা সমস্ত রূপ-মঞ্চ পাঠক গোষ্ঠীকে আমি প্রত্যাভিবাদন জানাচ্ছি।

সমালোচনা ও নানাকথা

★

সীতারাম

নাট্যরূপ : শ্রীযুত ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। বিভিন্নাংশে : সরযুবালা, কমল মিত্র, জহর গঙ্গো, রবি রায়, ধীরেন, সন্তোষ, জীবেন, অঞ্জলি রায়, রেখা চট্টো, দেবী, সমর, মুকুলজ্যোতি, রেণুকা, কুঞ্জ, নরেন, যতীন, শিশির, অরুণ, ইলা প্রভৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম নাট্যরূপায়িত হ'য়ে মিনার্ভা নাট্যমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। নাট্যরূপ দান করেছেন শ্রীযুত ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র।

নাটক সীতারাম সম্পর্কে সমালোচনা করবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' সম্পর্কে দু'একটি কথা বলার প্রয়োজন। এবং এ প্রসংগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হ'তে প্রকাশিত শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস মহাশয় সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারামের' ভূমিকার প্রতি পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উক্ত ভূমিকায় প্রথমেই দেখতে পাই, "সীতারামের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি স্বীকার করিয়াও তাঁহার উপন্যাসের অনৈতিহাসিকতা মানিয়া লইয়াছেন, কারণ তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, গ্রন্থের উদ্দেশ্য অন্য। প্রারম্ভে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার শ্লোক কয়টির মধ্যে সেই উদ্দেশ্যের আভাস আছে। এতৎ সত্ত্বেও ইতিহাস বিষয়ে কৌতূহলী পাঠকের উপর তিনি "Westland সাহেবের কৃত যশোহরের বৃত্তান্ত এবং Stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসে পাঠ" এর বরাদ্দ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেই ইতিহাসের ছাত্রের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না, দুইটি বৃত্তান্ত পরস্পর-বিরোধী। ঐতিহাসিক সীতারামকে লইয়া সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন—ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়, ১৩০২ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য' পত্রিকার কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ছয় সংখ্যায়। ঐতিহাসিক সীতারামের বীরত্ব ও শৌর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্কিম বর্ণিত সীতারামের অপদার্থতায় অত্যন্ত পীড়া বোধ করিয়াছেন।"

উপরের ঐ অংশটুকু আমরা এইজন্য উদ্ধৃত করলাম যে, সীতারাম নাটকের অনৈতিহাসিকতা নিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে বহু অভিযোগ এসেছে শ্রীযুত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ থেকে শ্রীযুত ভদ্রকে মুক্ত করতে যেয়ে তাঁর সপক্ষে যেটুকু আমাদের বলার প্রয়োজন, উপরে উদ্ধৃতাংশেই তা ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই যখন তাঁর সীতারামের অনৈতিহাসিকতা মেনে নিয়েছিলেন—তখন সেই অনৈতিহাসিক উপন্যাসের নাট্যরূপও যে অনৈতিহাসিক হবে, তাতে আর সন্দেহ কী আছে। আমাদের পাঠক সমাজকে শুধু এইটুকু জেনে রাখতে হবে—সীতারাম ঐতিহাসিক চরিত্রই ছিলেন—তবে বর্তমান নাটকটি ঐতিহাসিক সীতারামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও—ইতিহাস থেকে তার বহু বিচ্যুতিই ঘটেছে। এবং সেজন্য নাট্যরূপকার দায়ী নন। নাট্যরূপকারের বিরুদ্ধে আরো একটি বড় অভিযোগ আছে—বঙ্কিমের সীতারামকেও নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না নাটক সীতারামে। এ অভিযোগ নেহাৎ অমূলক নয়। বঙ্কিমের সীতারাম যে নূতন রূপে দেখা দিয়েছে নাটক সীতারামে একথা সত্য। এবং একদিক দিয়ে বঙ্কিমের সীতারামের তিনি মর্যাদাহানীই করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে নিন্দার যতখানি, নাট্যরূপকারকে আমাদের প্রশংসা করবারও তার চেয়ে বেশী আছে। কেন তা বলছি।

আজকাল যেমন পাকিস্থানের জিগির উঠেছে—বঙ্কিম আমলেও হিন্দুস্থানের পরিকল্পনার কথা আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। তবে তার পিছনে যুক্তি ছিল অনেক। তখনকার মুসলমানেরা বহিশত্রুরূপে এদেশে এসে রাজ্য জয় করেছেন—তদানীন্তন শাসক সম্প্রদায়ের অন্যায় শাসনভারে হিন্দুরা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলেন। অবশ্য ব্যাতিক্রম যে না ছিল তা নয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তদানীন্তন মুসলমানদের 'যবন' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন নি। নিখিল

ভারত মুসলিমলীগের সভাপতি মিঃ জিন্না আজকের যুগেও নিজেকে একজন ভারতবাসী বলে স্বীকার করতে গৌরব অনুভব না করতে পারেন (সম্প্রতি দিল্লীতে মন্ত্রী-মিশনের সংগে সাক্ষাৎ উপলক্ষে জনৈক সাংবাদিকের কাছে ভারতবাসী বলে নিজেকে পরিচয় দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন)—ভারতের শতকরা ৯৯ জন মুসলমান নই যে ভারতবাসী বলে গৌরব অনুভব করেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং মুসলমান জনসাধারণ ভাইয়ের অধিকার নিয়েই পাশাপাশি হিন্দুদের সংগে একত্রে বাস করতে চান—একজাতি হিসাবে। আজকের হিন্দুদের ভিতর এমন অনুদার হীন মনোবৃত্তির লোক খুঁজলে একটীও পাওয়া যাবে না—যিনি মুসলমানদের বিদেশী বলে মনে করেন। আজকের হিন্দুরাও ভাইএর দাবীতেই পাশাপাশি একই জাতিরূপে মুসলমানদের নিয়ে বসবাস করতে চান। তাই পরস্পরের ভিতর যাতে কোন বিদ্বেষ ভাব মাথা উচিয়ে না ওঠে এবং যতটুকু উঠেছে—প্রত্যেক হিন্দু এবং মুসলমানেরই কর্তব্য তাকে প্রশমিত করা। আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝে যদি বঙ্কিমের জন্ম হ'তো—মুসলমানদের তিনি 'যবন' বলে দূরে রাখতে চাইতেন না—ভাই বলেই কাছে টেনে নিতে চাইতেন। কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে মনীষীদের দৃষ্টি ভংগীরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। নইলে তিনি অগ্রগতির চাপে পেছিয়েই পড়বেন। বঙ্কিমের সীতারামকে শ্রীযুত ভদ্র ঠিক এই দৃষ্টিভংগী দিয়েই বিচার করেছেন!

সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর যুগেও পৌরাণিক নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে! কিন্তু সে পৌরাণিক নাটকগুলিকে কালোপযোগী করে নূতন দৃষ্টিভংগী দিয়ে রূপ দান করা করা হয়। যে নাটকে পূর্বে জারকে প্রশংসা করা হ'য়েছে—সেই নাটকে তাকে ব্যঙ্গ করা হ'য়েছে বিপ্লবোত্তর যুগে অভিনয়ের সময়। তবু পৌরাণিক নাটকের অভিনয় সোভিয়েট সরকার অনুমোদন না করে পারেননি—কারণ তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিফলিত হ'য়ে আছে পৌরাণিক নাটকে। শ্রীযুত ভদ্র তাঁর সীতারাম নাটকের ভিতর দিয়ে—তদানীন্তন রাজনৈতিক

'মেঘদূত' চিত্রে সাহু মোদক ও লীলা দেশাই

অবস্থার যেমনি ছবি একেছেন—তেমনি হিন্দু মুসলমানের মিলনের যে আদর্শ প্রচার করেছেন—এজন্য তাঁর প্রগতি-শীল দৃষ্টিভংগীর প্রশংসাই করবো। মিনার্ভা থিয়েটারে ইতিপূর্বে অভিনীত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিরচিত ধাত্রীপান্না এবং রাষ্ট্রবিপ্লব নাটক দু'খানিকেও এই শ্রেণীভুক্ত করবো। তা'হলে বঙ্কিমের সীতারামের মর্যাদাহানী হ'য়েছে বলে যাঁরা অভিযোগ করেন, আশাকরি তাঁরাও শ্রীযুত ভদ্রের দৃষ্টিভংগীর জন্য প্রশংসা করবেন। সীতারাম নাটকের সার্থকথার কথা স্বীকার করে নিয়ে আমরা বলবো, শ্রীযুত ভদ্র একদিকে যেমন তখনকার ফৌজদারের অন্যায় অত্যাচারের এবং তার বিরুদ্ধে সীতারাম রায়ের ন্যায় ও তেজস্বীতার ছবি একেছেন—অপরদিকে তেমনি ফকির সাহেব, সীতারাম এবং চন্দ্রচূড়ের ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আদর্শ প্রচার করেছেন।

নাটকে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। সংলাপে রসিকতাচ্ছলে যে ভাষা শ্রীযুত ভদ্র ব্যবহার করেছেন—তা শীলতাও

ছাড়িয়ে গেছে—তবু সীতারামের সার্থকতার কাছে তা নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়েছে।

অভিনয়ে কমল মিত্র সীতারামের ভূমিকায় যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তার প্রশংসাই করবো। শ্রীর ভূমিকায় শ্রীমতী সরযুবালা তাঁর পূর্বে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। রবি রায় অভিনীত চন্দ্রচূড় নাট্যামোদীদের প্রশংসার দাবী করতে পারে। গঙ্গারামের ভূমিকায় জনপ্রিয় অভিনেতা জহর গাঙ্গুলী আমাদের খুশী করতে পারেন নি। তাঁর অভিনয়ে অসন্তোষের আভাস পেয়েছি—এবং পরবর্তী অভিনয়ে উক্ত ভূমিকায় সুশীল রায়কে দেখতে পেয়ে সে ধারণা আরো আমাদের বদ্ধমূল হ'য়েছে। মুকুল জ্যোতির জয়ন্তী প্রশংসনীয়। শ্রীমতী অঞ্জলি রায়কে প্রশংসা করতে পারবো না। দর্শন-সৌন্দর্যে তিনি আমাদের তৃপ্তি দিয়েছেন কিন্তু আমাদের নাট্যলিপ্সা মন তাঁর অভিনয়কে গ্রহণ করতে পারেনি। অন্যান্য ভূমিকা একরূপ। —শ্রীপার্থিব

পথের সাথী

কাহিনী: শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী। পরিচালনা: শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র। গীতিকার: শৈলেন রায়। সংগীত পরিচালনা: দুর্গা সেন। নির্মাতাগণ: আরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের কর্মিবৃন্দ। বিভিন্ন চরিত্রাংকণে: নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দু মুখো, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টা, রেণুকা রায়, সন্ধ্যারাণী, লীলা, রাজলক্ষ্মী, বেলা, সুহাসিনী, প্রভৃতি। প্রযোজনা ও পরিবেশনা: অরোরা ফিল্ম করপোরেশন।

অরোরা ফিল্ম প্রযোজিত নূতন বাংলা চিত্র 'পথের সাথী' একযোগে শ্রী ও উজ্জ্বলা প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর 'পথের সাথী' উপন্যাস অবলম্বনে বর্তমান চিত্রের কাহিনী গড়ে উঠেছে। ইতি পূর্বে 'পথের সাথী' নাট্যরূপায়িত হ'য়ে স্থানীয় নাট্যমঞ্চে অভিনীত হ'য়েছিল। এবং সে অভিনয় জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। হয়ত সেই জনপ্রিয়তার জন্যই কর্তৃপক্ষ 'পথের সাথীর' চিত্ররূপ দিতে অনুপ্রেরিত হ'য়েছিলেন। কিন্তু নাটকে যে রস পরিবেশন করে লোক মাতানো যায়—চিত্রে তা যায় না—একথাটা আমাদের কর্তৃপক্ষরা অনেক সময়ই ভুলে যান।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী মহিলা সাহিত্যিকদের ভিতর লব্ধ প্রতিষ্ঠা—তাঁর বহু কাহিনী চিত্রে এবং নাটকে স্থান লাভ করেছে। প্রবীণা উপন্যাসিকার সমালোচনা আমরা করবো না। কারণ, তাঁর কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যের যতটুকু আশা তা পূর্ণ হ'য়েছে। (যদিও ক্ষেত্র বিশেষে এই আশা ব্যাপকতা লাভ করে।) বর্তমান কাহিনীটী সম্পর্কেও সেই কথাই বলা চলে। এর বেশী যেমনি আমাদের আশাও ছিল না—হতাশও হইনি। জীবন পথে চলতে কিরূপ সাথীর প্রয়োজন—লেখিকা তাঁর নারীমন দিয়ে যা উপলব্ধি করেছেন—সহজ সরল ভাবে তাই ব্যক্ত করেছেন। আদর্শবাদের কোন মার প্যাঁচ নেই—মনস্তত্বমূলক কোন জটিল সমস্যা বিশ্লেষণ নেই—একটা সাদা ফোঁতা কাহিনী যা কেবলমাত্র সাধারণ মেয়েদেরই খুশী করতে পারে—সাধারণ মেয়েদের জীবনেই সহায়ক হ'তে পারে, তাঁদের স্বামী নির্বাচনে। এবং সাহিত্যানুরাগীদের জন্য নয় -'নভেল' পড়তে যাঁরা ভাল বাসেন অথবা 'নভেল' পড়ে সময় কাটাতে যাঁদের ভাল লাগে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর 'পথের সাথী' তাঁদের সেই 'নভেলী'-স্পৃহাকেই মেটাতে পারে। তাই 'পথের সাথী'র চিত্ররূপ সম্পর্কে আমরা যে খুব বড় আশা পোষণ করিনি আশা করি দর্শক সমাজ তা বিশ্বাস করবেন। এবং পরিচালক শ্রীযুত মিত্র যদি 'পথের সাথী'কে সেই দৃষ্টি ভংগী দিয়েই বিচার করতেন আমাদের অভিযোগ করবার কিছু ছিল না। কিন্তু আজ কাল শুধু শ্রীযুত মিত্রই নন, বেশীর ভাগ পরিচালকেরা নির্যাতিত, বুভুক্ষু প্রপীড়িত দেশবাসীর প্রতি এতই দরদশীল হ'য়ে উঠেছেন যে, প্রত্যেক ছবিতেই একটু

জাতীয়তাবাদ, একটু দুর্ভিক্ষের কথা দিয়ে চিত্রের ভিতর দিয়ে তাঁরা দেশসেবার বাহাদুরী পেতে চান। কিন্তু আজকের দর্শক সমাজ এতই বোকা নন যে, তাঁদের এই ধাপ্পাবাজীকে তাঁদের আন্তরিকতার মাপকাঠিতে বিচার করবেন। বরং তাঁদের এই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন চিত্র শিল্পের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাবই জাগিয়ে তুলছে।

'পথের সাথী' একটা ঝর ঝরে প্রেমের কাহিনী। স্বামী নির্বাচনে মেয়েদের চিরন্তন দ্বন্দ্বই ফুটে উঠেছে— শ্রীযুক্ত মিত্র যদি তাকেই সুষ্ঠুভাবে রূপ দিতেন আমাদের বলবার কিছু ছিলনা। কিন্তু একটু দেশের জন্য তিনি না কেঁদে পারলেন না—দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য তাঁর সমবেদনা জানাবার পন্থা রূপে বেছে নিলেন 'পথের সাথীকে' সস্তা বাহবা পাবার জন্য। তাই তাঁর নায়িকা রুবীর মুখে দেশোদ্ধারের গুনি বড় বড় বুলি – দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত জনসাধারণের জন্য—তার ব্যাকুল মনের কতই না আকুলতা! নায়ক শশাঙ্ক, ধনীর ছেলে—ঘরে বসে বোনের সংগে রুবীকে নিয়ে আলোচনা চালায়—ফটো দেখে তন্ময় হ'য়ে যায়—রুবীকে পাবার জন্যই দেশাত্মবোধক বড় বড় লম্বা চওড়া বুলি ঝাড়ে। দু'জনেই এমন কোমর বেঁধে নেমেছে যেন বাংলা দেশ—বাংলার মৃতপ্রায় পল্লী এই সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠলো বলে! কিন্তু হায় হায়—'কাজের সময় কাজি—কাজ ফুরালে পাজি।' যেই নানান বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে বিয়ে সাদী হ'য়ে গেল, অমনি আচলে আচলে গিট বেঁধে তারা বসলেন সেই বিলাস ব্যসনের মাঝেই - হাবুডুবু খেতে। কোথায় ভেসে গেল আদর্শ—কোথায় গেল কি। আমাদের কথা হচ্ছে এই, যদি সেই স্বামীনির্বাচনের মূল কথাই চিত্রে শ্রীযুত মিত্র ফোটাতে চেয়েছিলেন—তবে অযথা বাগাড়ম্বরের কি প্রয়োজন ছিল? খুব সাধারণ ভাবেই তিনি কাহিনীকে রূপদান করতে পারতেন। আমাদেরও কিছু বলবার থাকতো না। এ যে 'লাঠিও ভাঙলো অথচ সাপও মরলো না।' যদি দেশাত্মবোধক কাহিনী—কি দুর্ভিক্ষের পট ভূমিকায় কোন চিত্র পরিচালকেরা নির্মাণ করতে চান—এবং যদি কোন আদর্শও তাঁরা চিত্রের ভিতর দিয়ে প্রচার করতে চান, তার ধর্মকে যেন এভাবে নষ্ট না করেন ডালখিচুড়ী করে। শ্রীযুত মিত্র একজন অভিজ্ঞ, শিক্ষিত শিল্পী, তাঁর কাছে থেকে আদর্শবাদের নামে তার জারসরস পরিবেশনায় আমরা ক্ষুব্ধই হ'য়েছি।

তাছাড়া চরিত্রবিশ্লেষণেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। অনেক চরিত্রেই বিপরীত ভাব এসে হাজির হ'য়েছে।

অমর গুপ্ত স্কুল মাষ্টার। তাঁর বাড়ীর আসবাব এবং আনুসংগিকের যা পরিচয় পেয়েছি—মুখে গরীব গরীব বল্লেও অমর গুপ্তের পরিবারটী দেখে কেউই তাঁকে গরীব বলে মেনে নেবেন না। একজন স্কুল মাষ্টার, তিনি সরকারী স্কুলের শিক্ষকই হউন আর 'প্রাইভেট স্কুলে'র শিক্ষকই হউন—স্কুল মাষ্টারের জীবন সম্পর্কে যদি শ্রীযুক্ত মিত্রের অভিজ্ঞতা থাকতো—তবে তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া শ্রীযুক্ত মিত্র অতি সহজেই সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। অমর গুপ্তের চরিত্রাভিনয়ে অবশ্য শ্রীযুত মিত্র দক্ষতারই পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু চরিত্র নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতার পরিচয় আমাদের ব্যথিত করেছে।

প্রায়ই চলচ্চিত্রে দেখা যায়, কোন জলসানুষ্ঠানে প্রাপ্ত শিল্পীদের প্রচুর উপহার স্তুপীকৃত হ'য়ে উঠলো। বিলেতী ছবির এই গন্ধ আমরা বাঙ্গালীরা সহ্য করতে নারাজ। আলোচ্য চিত্রেও অবশ্য এর সন্ধান পাওয়া যাবে। বৈদেশিক সমাজ ব্যবস্থায় শিল্পীদের উপহার দেওয়ার প্রচলন আছে। কিন্তু আমাদের সমাজ জীবনে আজ অবধিও এরূপ চোখে পড়েনি —যে কোন জলসানুষ্ঠান হ'য়ে যাবার সংগে সংগেই দর্শকেরা ছুটলেন উপহার নিয়ে—তারপর যে জলসা হচ্ছে একটা আদর্শকে কেন্দ্র করে। এবং আরও বিশদৃশ্য লাগে যখন জলসা ফেরতা নায়িকা রুবীকে কেন্দ্র করে বেশ একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধও শ্রীযুত মিত্র আমাদের দেখিয়ে ছাড়লেন। রুবীর ভূমিকায় রেণুকার অভিনয়ের প্রশংসাই করবো। আলোচ্য চিত্রে বড়-বৌ এবং ছোট-বৌকে ঘিরে যে দৃশ্যগুলি দেখতে পাই সেজন্য শ্রীযুত মিত্র প্রশংসা পেতে পারেন। এবং বড়-বৌ ও ছোট বৌর ভূমিকায় যথাক্রমে রাজলক্ষ্মী এবং বেলারাণী প্রশংসনীয়।

অমর গুপ্তের স্ত্রীর ভূমিকা নিয়ন্ত্রণেও নরেশ বাবু অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। মা যেন সাজিয়ে গুজিয়ে মন্ত্রণা দিয়ে মেয়েকে স্বামী জয় করতে পাঠাচ্ছেন। এগুলি খুবই বিশদৃশ্য লাগে। নইলে অভিনয়ে শ্রীমতী সুহাসিনীকে নিন্দা করবো না।

শরদিন্দু আর প্রতিমা দুটী ঠিক 'ফার্সে'র' চরিত্র হ'য়েছে। তবু ইন্দু মুখার্জির অভিনয়ে শরদিন্দু একটু রসালু হ'য়েছে। শ্রীমতী ছায়া অভিনীত 'প্রতিমা' একদম ব্যর্থই বলা যেতে পারে। অন্যান্য ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, মিহির ভট্টাচার্য, রবি রায় এবং জহরকে নিন্দা করবার কিছু নেই। সন্ধ্যারাণী এবং নবাগতা লীলার বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ আনবো না।

চিত্রের বিভিন্ন স্থানে বহু ত্রুটি বিচ্যুতিই পরিলক্ষিত হয়। সেজন্য দায়ী পরিচালকই। চিত্রখানি পরিচালনার জন্যই যে ব্যর্থ হ'য়েছে একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। সংগীত আমাদের কানে লাগেনি। "জাগো জাগো" গানের কথা ও পরিকল্পনার জন্য প্রশংসা করবো। চিত্র গ্রহণ ও শব্দগ্রহণ চলনসই। —শ্রীপার্থিব

এম্‌ পি প্রোডাকসন্স (কলিকাতা)

শ্রীযুত সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত এম্‌ পি প্রোডাকসন্সের আগামী বাংলা চিত্র 'সাতনম্বর বাড়ী' উত্তরা, পূরবী এবং পূর্ণ থিয়েটারে আগামী ১২ই এপ্রিল এক-যোগে মুক্তির অপেক্ষায় আছে। শ্রীযুত প্রণব রায়ের কাহিনীকে কেন্দ্র করে বর্তমান চিত্রখানি গড়ে উঠেছে। 'সাতনম্বর বাড়ী'র বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন শ্রীমতী মলিনা, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, প্রভা, শ্রীযুত ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, জীবেন বসু, কমলমিত্র, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, নির্মল রুদ্র, বুদ্ধদেব (কাশীনাথখ্যাত) প্রভৃতি। শ্রীযুত রবীন চট্টোপাধ্যায় 'সাতনম্বর বাড়ী'র সুর সংযোজনা করেছেন। 'সাতনম্বর বাড়ী' দর্শক মনোরঞ্জনে সমর্থ হউক সেই আশাই আমরা করি।

শ্রীযুত অপূর্ব মিত্রের পরিচালনায় এদের দ্বিভাষী চিত্র 'তুমি আর আমি' কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে অগ্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 'তুমি আর আমি'র কাহিনী লিখেছেন খ্যাতনামা গীতিকার শ্রীযুত শৈলেন রায়। শ্রীমতী কানন দেবী 'তুমি আর আমি'র নায়িকার ভূমিকায় আমাদের অভিবাদন জানাবেন। তাঁর পিতার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করবেন খ্যাতনামা ছবি বিশ্বাস। এই চরিত্রটী অপূর্ব ব্যক্তিত্বে ভরপুর। একদিকে কঠোর এবং নির্মম। অথচ অপরদিকে তাঁর চারিত্রিক কোমলতা মুগ্ধ করে। ন্যায় বিচারক এবং আদর্শবাদী এই চরিত্রে, ছবি বিশ্বাস যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন তা দর্শক সমাজ আশা করতে পারেন। 'তুমি আর আমি'র অন্যান্য ভূমিকায় দেখা যাবে উচ্ছলা সন্ধ্যারাণীকে, মিহির ভট্টাচার্য, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, কুমার মিত্র এবং আরো অনেককে।

শ্রীযুত বিভূতি লাহা ও শ্রীযুত যতীন দত্তের ওপর যথাক্রমে চিত্রগ্রহণ ও শব্দ-গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। সুরশিল্পী রবীন চট্টোপাধ্যায় 'তুমি আর আমি'র সুর সংযোজনা করছেন।

প্রডাকসন ম্যানেজার শ্রীযুত বিমল ঘোষকে চিত্রখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে অনেক। কিন্তু অদম্য কর্মশক্তি প্রত্যেকটী কাজে তাকে অটুট রেখেছে।

রজনী পিকচার্স (কলিকাতা)

রজনী পিকচার্সের বর্তমান বাংলা চিত্র 'তপভঙ্গ' ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে চিত্রশিল্পী বিভূতি দাসের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। শ্রীযুত দাসকে এই সর্বপ্রথম আমরা পরিচালকরূপে দেখতে পাবো। 'তপভঙ্গের' কাহিনী লিখেছেন খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুত বিধায়ক ভট্টাচার্য। এর সুর সংযোজনার ভার নিয়েছেন তকরার খ্যাত সুরশিল্পী ও সুগায়ক শ্রীযুত শচীনদাস মতিলাল। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন, সন্ধ্যারাণী, বনানী দেবী (সম্ভবতঃ নবাগতা); প্রমীলা ত্রিবেদী, জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, জীবেন বসু, বিভূতি গাঙ্গুলী এবং আরো অনেকে। চিত্রখানি ডি, লুক্স পিকচার্সের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

ক্যালকাটা আর্ট প্রডিউসার্স লিঃ (কলিকাতা)

ক্যালকাটা আর্ট প্রডিউসার্স লিঃ এর প্রথম বাণীচিত্র 'অঞ্জলির' কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শনিবারের চিঠি সম্পাদক শ্রীযুত সজনী কান্ত দাস অঞ্জলি'র কহিনী ও গীত রচনায় ব্যস্ত আছেন।

ক্যালকাটা আর্ট প্রডিউসার্সের প্রচার সচীব রূপমঞ্চ সম্পাদক শ্রীযুত কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সংগে দেখা করে বলেছেন যে, অঞ্জলির জন্ম বিভিন্ন চরিত্রে তাঁরা সর্ব প্রথমে উপযুক্ত নূতনদের দাবী মেনে নেবেন। তাই আমরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থিত কার্যালয়ে অভিনয়েচ্ছুক নূতনদের আবেদন করতে অনুরোধ করছি।

চিত্ররূপা লিঃ (কলিকাতা)

পরিচালক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গৃহীত চিত্ররূপার বর্তমান বাংলা চিত্র 'শাস্তি' দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। সম্ভবতঃ এপ্রিলের মাঝামাঝি 'শাস্তি' মুক্তির জন্ম প্রস্তুত হয়ে নেবে। বর্তমান সমাজকে কেন্দ্র করেই 'শাস্তির' কাহিনী গড়ে উঠেছে—আর তাকে রূপায়িত করছেন কুশলী শিল্পীবৃন্দ। ভাবীকাল খ্যাত শিপ্রাদেবী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে দেখা যাবে শাস্তি চিত্রে। চিত্রখানি এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

বাসন্তিকা (কলিকাতা)

গত ১২ই মার্চ বুধবার কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে বাসন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছায়াচিত্রের শুভ মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত সুশীল মজুমদার। দীর্ঘকাল বম্বে থাকার পর বাংলা দেশে এই তাঁর প্রথম উদ্যম। চিত্রের কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র। শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী বাসন্তিকার এই চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন বলে চুক্তিবদ্ধা হ'য়েছেন।

রূপাঞ্জলি পিকচার্স লিঃ (কলিকাতা)

৭৬।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিটে রূপাঞ্জলি পিকচার্স লিঃ নামে একটী চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এদের প্রথম ছবি নাট্যকার মন্মথ রায়ের একটী কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে।

মুক্তি ফিল্মপ্রডিউসার্স (দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা)

নব নির্মিত চিত্র প্রতিষ্ঠান মুক্তি ফিল্ম প্রডিউসার্সের প্রথম চিত্র 'রক্ততিলক'-এর মহরৎ উৎসব গত ২০শে মার্চ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত হেমগুপ্ত।

ইউ, সি, এ ফিল্মস্ (৩১, সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলিঃ)

গত ১৩ই মার্চ এদের প্রথম চিত্র 'যা হয় না'র শুভ মহরৎ উৎসব কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। কয়েক বছর পূর্বে এই চিত্র প্রতিষ্ঠানটী গড়ে ওঠে। বাংলা ছায়াছবির জন্ম এক সুরুচীসম্পন্ন শিল্পী গোষ্ঠী তৈরী করবার আদর্শ নিয়ে এরা কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ফিল্ম নিয়ন্ত্রণাদেশ এতদিন বলবৎ থাকার দরুন এদের সে পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারেনি। ফিল্ম নিয়ন্ত্রণাদেশ উঠে যাবার সংগে সংগে এরা কার্যক্ষেত্রে নেমেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের মূলে রয়েছেন কয়েকজন আদর্শবাদী শিক্ষিত ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত প্রমোদ দাসগুপ্তের উপর চিত্রখানির পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়েছে—যুগান্তর পত্রিকার সিনেমা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎ মিত্র প্রচার সচীবের কার্যভার গ্রহণ করেছেন।

পি, আর, প্রডাকসন্স (কলিকাতা)

পি, আর প্রডাকসন্সের হিন্দী আরব্যোপন্যাস চিত্রের কাহিনী অতি পরিচিত আলিবাবা ও চল্লিশজন দস্যুর কাহিনী। যা শাশ্বত, যা চিরস্থায়ী তার মাধুর্য ও গরিমা কালের গতি কখনও হরণ করে নিতে পারে না—চির পুরাতন হয়ে চিরদিন তা কালের গতির নূতন দৃষ্টিভংগীর সংগে নব নব রূপ ধারণ করে ও মানুষকে আনন্দ দেয়। এসপ্‌স-এর গল্প, রামায়ণ, মহাভারত, গ্রীকপুরাণ, আলিবাবা ও চল্লিশজন দস্যু এই জাতীয় চিরস্থায়ী সৃষ্টি।

পরিচালক নীরেন লাহিড়ী এ যুগের দৃষ্টিভংগী দিয়ে এই কাহিনীটিকে দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিভংগী সাম্যবাদ ও শৃঙ্খলিত মানবাত্মার মুক্তির দিকে নিবদ্ধ হ'য়েছে। তাই বোগদাদের হতভাগ্য ভিক্ষুক ও ক্রতদাসের কথাই

এই চিত্রে রূঢ় হয়ে উঠেছে। কমল দাশগুপ্তের সুর সংযোজনায় দশখানি গান যেন দশটি বসন্তের কুহুতান। নায়িকারূপে শ্রীমতী কানন দেবী এই গানগুলির অধিকাংশই গেয়েছেন। অন্যান্য বিশিষ্ট অংশে অভিনয় করেছেন নবাব, হীরালাল, রবীন মজুমদার, দেবী মুখার্জি, শ্রীমতী মলিনা, সুন্দর ও বড়কু। অজস্র কয়ের মাধুর্যমণ্ডিত চিত্রগ্রহণ সকলকে মুগ্ধ করবে। (ক: পা:)

ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্স (কলিকাতা)

প্রযোজক নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শীঘ্রই এদের দ্বিভাষী ছবির কাজ সুরু হবে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এই চিত্রের কাহিনী রচনা করেছেন। শোনা যাচ্ছে প্রিয়দর্শন তরুণ চিত্রনায়ক রবীন মজুমদার এঁদের নিজস্ব শিল্পীরূপে দীর্ঘকালের জন্য চুক্তিবদ্ধ হ'য়েছেন। (ক: পা:)

চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠান (কলিকাতা)

সুসাহিত্যিক পরিচালক সুধীর বন্ধুর পরিচালনায় রাধা ফিল্মস স্টুডিওয় 'বন্দেমাতরম' চিত্রের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। বন্দেমাতরমের নামেই কাহিনীর মূল বিষয়টী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সুধীরবন্ধু কৃতি কথাশিল্পী সুতরাং আমরা আশা করি শুধু নামের ফাঁকা আওয়াজে তিনি আমাদের ভোলাতে চাইবেন না। নব জাগ্রত জগৎ যাদের নবোদ্দীপ্ত চেতনায়, ত্যাগে, কর্মনিষ্ঠায়, অপরিসীম মনের বলে আজ সাড়া জাগিয়ে তুলেছে, তাদের ঘরে বাইরের সংগ্রামের নাটকীয় রূপটী স্বাভাবিকভাবে তাঁর চিত্রে প্রতিফলিত হবে। শ্রীমতী মলিনা, প্রমীলা ত্রিবেদী, প্রভা, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, ইন্দু মুখার্জি, অমর চৌধুরী, আশু বোস প্রভৃতি শিল্পীদের এই চিত্রে দেখতে পাওয়া যাবে। শ্রীসুকৃতি সেন (কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ) এই চিত্রে সুর সংযোজনা করছেন। (ক: পা:)

নিউ সেঞ্চুরী প্রডাকসন্স (কলিকাতা)

কিষণ সিংহকে বাধ্য হ'য়েই বৃদ্ধ জমিদার ভবানী চৌধুরী হত্যা করেছেন। গভীর মনস্তাপে দিনের পর দিন তিনি অসুস্থতার চরম সীমায় এসে পৌচেছেন। চোখ বুজলেই তার মনে হয় যেন, মৃত কিষণ সিংহের প্রেতাত্মা তার বুকের উপর বসে গলা টিপে ধরেছে—তার প্রতিশোধ চাই। হৃদয়াবেগ গতি সন্ধানী মানবচরিত্র অভিজ্ঞ শৈলজানন্দের রচনা ও পরিচালনায় 'রায় চৌধুরী'র এই দৃশ্যটী অতি করুণ। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ভবানী চৌধুরীর অংশ অভিনয় করছেন। (ক: পা:)।

এসোসিয়েটেড ওরিয়েন্টাল ফিল্ম প্রডিউসার্স

(১০৯ সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা)

গত ৪ঠা, মার্চ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এদের প্রথম বাংলা চিত্র 'দেশের দাবীর' শুভ মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। ওদিন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন মুখোপাধ্যায় এবং সাধন সরকারকে নিয়ে একখানি 'ষ্টীল-ফটো' গ্রহণ করা হয়। শ্রীযুক্ত সমর ঘোষের পরিচালনায় 'দেশের দাবী'র রীতিমত চিত্র গ্রহণের কাজ গত ৮ই মার্চ থেকে আরম্ভ হ'য়েছে। উপরের নাম ছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় জ্যোৎস্না গুপ্তা, সাবিত্রী, সন্তোষ সিংহ, নবদ্বীপ হালদার, নিভাননী, প্রভা এবং আরো অনেককে দেখা যাবে। সুর সংযোজনার ভার অর্পিত হ'য়েছে শ্রীযুক্ত রবি রায়চৌধুরীর ওপর। দীপালী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় প্রচার সচীবের ভার গ্রহণ করেছেন।

প্রশান্ত প্রডাকসন্স (১৬৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন কুণ্ডুর প্রযোজনায় প্রশান্ত প্রডাকসন্সের প্রথম সামাজিক বাণীচিত্র 'রক্ত-রাখী' শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বিশু বাবু) পরিচালনায় গত ২৭শে মার্চ কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে শুভ মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রক্তরাখী' উপন্যাসটী অবলম্বন করেই এই বাণী চিত্রের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে।

বিনোদের ভূমিকায় প্রমোদ গাঙ্গুলী, কিশোরীর ভূমিকায় অমিতা দেবী, বিজন দত্তের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরমার ভূমিকায় পূর্ণিমা দেবী, সমীর চৌধুরী বা দাড়িদার ভূমিকায় পুরু-মল্লিক, মধুর ভূমিকায় আশুবোস, তারা কিংকরীর ভূমিকায় নিভাননী, হরেনের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তী ও মন্দাকিনীর

ভূমিকার রেবা বসু অভিনয়াংশের জন্য চুক্তি বদ্ধ হ'য়েছেন। বিশিষ্ট সুর শিল্পী শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নান্তু বাবু) সংগীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। নৃত্যশিল্পী বিনয় ঘোষ রক্তরাখীর সহকারী পরিচালকরূপে কাজ করছেন।

বড়ুয়া আর্ট প্রডাকসন্স (২।১বি, ফাল্গুন দাস লেন, কলিকাতা)

বড়ুয়া আর্ট প্রোডাকসন্সের প্রচার সচীব শ্রীযুত সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন যে, বিশেষ কারণ বশতঃ বড়ুয়া আর্ট প্রডাকসন্সের পূর্বতন প্রচেষ্টা স্থগিত রেখে নূতন একটি চিত্র গ্রহণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। এই নূতন চিত্র নাটের়া কাজ ইতিমধ্যেই অনেকখানি অগ্রসর হ'য়েছে এবং 'জাগরণ' নাম নিয়ে যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করবে। আজ অবধি যে সকল দৃশ্যাবলী গ্রহণ করা হ'য়েছে তার মধ্যে দুর্ভিক্ষের কয়েকটি দৃশ্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার বুক চিরে যে হাহাকার উঠেছিল এবং যার ক্ষীনতম রেশ এখনও মিলিয়ে যায় নি—সেই নিদারুণ—সংকটের পূর্ণরূপ দিতে দিতে গিয়ে পরিচালক শ্রীবিভূতি চক্রবর্তী যে শ্রম স্বীকার করেছেন তা সার্থক হবে বলেই বিশ্বাস। এই দৃশ্যাবলী তুলবার জন্য অর্থ সাহায্য দিয়ে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বহু নিঃস্ব স্ত্রীপুরুষ ও শিশুকে ষ্টুডিওতে আনা হয়েছিল। গত দুর্ভিক্ষের সময় যাদের আমরা কলকাতার রাজপথে এবং বাংলার পল্লী অঞ্চলে দিনের পর দিন মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হ'তে দেখেছি—তারই মর্মান্তিক ছবি ফুটে উঠবে বর্তমান চিত্রে।

ইউনিটি প্রডাকসন্স (কলিকাতা)

শ্রীযুত রাখের শর্মা পরিচালিত ইউনিটি প্রডাকসন্সের হিন্দি চিত্র 'তপস্যার' কাজ দ্রুতগতিতে ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে এগিয়ে চলেছে। তপস্যার বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন শ্রীপরেশ ব্যানার্জি, অজিত, লচ্ছু মহারাজ, ঊর্মিলা, ট্যানডন কাপুর, রণজিৎ রায়, রাধারাণী, কৌশল্যা প্রভৃতি। ইতিমধ্যে তপস্যার এক দৃশ্যপটে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সাংবাদিকদের আমন্ত্রন করেছিলেন। শ্রীযুত এস, এম, বাগড়ে, সত্যনাথ মজুমদার, ভবানীরায়, সুধীরেন্দ্র সান্যাল, কালীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেকে উক্ত দৃশ্যপটে উপস্থিত ছিলেন। প্রচার সচীব দীপেন্দ্র সান্যাল এবং ইউনিটির কর্মাধ্যক্ষ মিঃ আয়ার সাংবাদিকদের সুটিং দেখবার পর জলযোগে আপ্যায়িত করেন। ভারতলক্ষ্মীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত বাবুলাল চোখানীও সংবাদিকদের চা পানে আপ্যায়িত করেন।

ইউনিটির পরবর্তী চিত্রের নাম পরিচালক শর্মা ইতিমধ্যে ঘোষনা করেছেন। চিত্র দুঃখানির নাম হবে (১) হরিজন ও (২) জগৎ গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য।

এস, ও, এস, ফিল্ম সার্ভিস (কলিকাতা)

৮৪।এ বহুবাজার ষ্ট্রীটে উপরোক্ত চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠানটী গড়ে উঠেছে। শ্রীযুত নীতীশ ঘোষ উক্ত প্রতিষ্ঠানটীকে একটী প্রথমশ্রেণীর পরিবেশক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

ইউনিভারস্যাল ফিল্ম করপোরেশন (ইণ্ডিয়া) লিঃ

গত ১০ই মার্চ কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে এদের প্রথম বাংলা চিত্র 'বার্মার পথে'র শুভ মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্রখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শিল্পী হিমাংশু সেন আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। রূপ-মঞ্চের প্রথম প্রচ্ছদপটটী শ্রীযুত সেনের অংকিত ছিল। শ্রীযুত সেনের এই নতুন উদ্যমে রূপ-মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা বিশেষভাবে সাফল্য কামনা করছি।

ভ্যারাইটী পিকচার্স লিঃ (কলিকাতা)

ভ্যারাইটী পিকচার্সের নির্মীয়মান হিন্দি চিত্র 'প্রেম কি দুনিয়া' দ্রুত গতিতে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। চিত্রখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে প্রযোজক শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন বসু আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। নৃত্যশিল্পী অলকনন্দাকে এই চিত্রে একটী বিশেষ ভূমিকায় দেখা যাবে। তাছাড়া তার কয়েকখানি নৃত্যও দর্শক সাধারণকে আকৃষ্ট করবে। প্রেম কি দুনিয়ার সংগীত পরিচালনা করছেন শ্রীযুত সুবল দাশগুপ্ত। প্রবীণ পরিচালক

জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চিত্রখানি ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে।

পূর্বাচল বসন্তোৎসব (রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

পূর্বাচলের অন্যতম সংস্কৃতি সম্পাদক শ্রীযুত অমল দে আমাদের জানিয়েছেন, গত ১৭ই মার্চ সমিতি কক্ষে বসন্তোৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। নানাবিধ তৈলচিত্রে দ্বারা কক্ষটি সজ্জিত করা হয়। সংগীতাংশে ছিলেন অমর লাহিড়ী, কল্যাণ সাহা, জগদীশ বিশ্বাস, বাণী হালদার বারীন চ্যাটার্জি এবং শৈল চ্যাটার্জি। আবৃত্তিতে প্রভাত চট্টোপাধ্যায় এবং অমরেন্দ্র প্রকাশ রায় চৌধুরী অংশ গ্রহণ করেন। জগদীশ বিশ্বাসের বাঁশী সকলকে আকৃষ্ট করে। উৎসব সভার প্রারম্ভে সমিতির সদস্যগণ 'ওরে গৃহবাসী' এবং শেষে 'জনগন মন অধিনায়ক' গান সমবেত ভাবে গান।

দি শ্যামপুকুর ক্লাব

(তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা)

উক্ত ক্লাবের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সমিতির সভ্যগণ কর্তৃক গত ৪ঠা মার্চ রঙমহল রঙ্গমঞ্চে 'পোষ্যপুত্র' অভিনীত হয়। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উৎসবে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বিচারপতি শ্রীযুত রূপেন্দ্র কুমার মিত্র।

শিল্পভারতী (হাজরা রোড, কলিঃ)

গত ১৭ই মার্চ শিল্প ভারতীর বাৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে।

বিদ্যাসাগর কলেজ ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন (বানিজ্য বিভাগ)

গত ৮ই মার্চ বিদ্যাসাগর কলেজের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের বার্ষিক সম্মেলন ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত জে, কে, চৌধুরী।

রূপছায়া লিঃ (১০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

চলচ্চিত্রের মারফৎ দেশ এবং জাতির প্রভুত কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে বলে রূপ-ছায়া লিঃ এর কর্তৃপক্ষ মনে করেন এবং সেই আদর্শই

অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁরা চিত্র জগতে পা বাড়িয়েছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন। রূপ-ছায়ার কর্তৃপক্ষের এই বিশ্বাস অটুট থাকুক তাই আমরা কামনা করি। এদের প্রথম চিত্র হবে একখানি পূর্ণাংগ শিক্ষামূলক চিত্র—চিত্রখানির নাম করণ হ'য়েছে 'জ্ঞানের আলোক'। 'জ্ঞানের আলোক' শুধুই নামেই নয় কার্যকরী ক্ষেত্রেও যাতে দর্শক সাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে সেজন্য কর্তৃপক্ষদের সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করছি প্রথম থেকেই।

ব্রিটিস ডিষ্ট্রিবিউটর্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ

আগামী ৫ই এপ্রিল এদের পরিবেশনায় নোয়েল কাওয়ার্ড প্রযোজিত 'ব্রিফ এনকাউণ্টার' একযোগে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং লাহোরে মুক্তিলাভ করবে। এই সপ্তাহটী ব্রিটিস ডিষ্ট্রিবিউটর্সের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব সপ্তাহ। লণ্ডনের বিভিন্ন পত্র পত্রিকা 'ব্রিফ এনকাউণ্টার'-এর প্রশংসা করেছেন। চিত্রখানি ইতিমধ্যে আমাদেরও দেখবার সৌভাগ্য হ'য়েছে।

একটী একাঙ্ক নাটক থেকে নোয়েল কাওয়ার্ড কাহিনীকে পূর্ণাংগ চিত্রে রূপান্তরিত করতে যেয়ে নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণই রেখেছেন।

অভিনয়ে ট্রেভর হাওয়ার্ড (Trevor Howard)-এর যদিও এই প্রথম চিত্রাবতরণ তবু তিনি নিজের অভিনয় প্রতিভায় স্বীয় ভবিষ্যৎ যে সহজেই গ'ড়ে নিতে পারবেন—আলোচ্য চিত্রে সে সন্ধান আমরা পেয়েছি। সিলিয়া জনসন-এর (Celia Johnson)-এর অভিনয়েরও আমরা প্রশংসা করবো। চিত্রখানি সুধী দর্শকদের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

ব্যাঙ্ক অফ্ কমার্স লিঃ

গত ১০ই মার্চ শ্রীযুত এইচ. পি. চৌধুরীর দমদম স্থিত বাগান বাড়ীতে ব্যাঙ্ক অফ্ কমার্সের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে এক সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হ'য়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও গন্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত অতুল মুখোপাধ্যায়

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রযোজক শ্রীযুত অতুল মুখোপাধ্যায় বর্তমানে মুভী টেকনিক সোসাইটী লিমিটেডের পরিচালনা বিভাগে যোগদান করেছেন।

মুরারী সম্মিলন (বারানসী ঘোষ ষ্ট্রিট, কলিকাতা)

গত ৯ই চৈত্র স্বর্গতঃ মুরারীমোহন গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বারানসী ঘোষ ষ্ট্রিট নিবাসী শ্রীযুত বাবু দামোদর দাস খান্না (লালা বাবু) মহাশয়ের ভবনে এক সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গত মুরারী বাবুর বহু সংগীত-শিষ্য, বিশিষ্ট সুধীজন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বাশা (শিল্প ও সংস্কৃতি মূলক প্রতিষ্ঠান)

সম্প্রতি গঠিত উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি পেশাদার রঙ্গমঞ্চে 'ঘূর্ণী' মঞ্চস্থ করতে মনস্থ করেছেন। অভিনয় ছাড়াও সংগীত জলসা, বিতর্ক সভা প্রভৃতিও এখানে নিয়মিত ভাবে হবে। আমরা এদের সাফল্য কামনা করি।

পরলোকে প্রবীণ অভিনেতা কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী

প্রবীণ অভিনেতা কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী বৃদ্ধ বয়সে কিছুদিন হ'লো কাশীধামে মারা গেছেন। আগামী সংখ্যায় আমরা স্বর্গতঃ অভিনেতা সম্পর্কে বিষদ বিবরণ প্রকাশ করবো।

মানেনা মানা হীরক-জয়ন্তী উৎসব

গত ৩১শে মার্চ রবিবার উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে 'মানে না-মানা' চিত্রের হীরক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র। নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রযোজক শ্রীযুক্ত এস, আর হেমাদ 'মানে না-মানা'র শিল্পী এবং কর্মীবৃন্দকে এক একটি করে স্বর্ণাঙ্গুরী উপহার দেন। এবং যে যে প্রেক্ষাগৃহে 'মানে না-মানা' মুক্তিলাভ করেছিল তার কর্মীবৃন্দ এবং এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্সের কর্মীবৃন্দকে এক মাসের মাহিনা বোনাস বাবদ দেবেন বলে ঘোষণা করেন।

'ক্রাফ্‌স কর্ণারে'র সভ্যবৃন্দের তরফ থেকে শৈলজানন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে এক অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয়। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি শৈলজানন্দের গুণপনার

ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতা করেন। অভিনন্দনের প্রত্যোত্তরে শৈলজানন্দ স্বরচিত লিখিত এক অভিভাষণ পাঠ করেন। শিল্পী-সংঘ, সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকা, ষ্টুডিও কর্তৃপক্ষ সকলের বাধা ডিঙিয়ে শৈলজানন্দ তাঁর বীরত্বপূর্ণ ইতিকথা বলতে যেয়ে বিশেষ করে সাংবাদিকদের প্রতি হীন বিষোদ্গারে উক্তরা প্রেক্ষাগৃহটি বিষাক্ত করে তোলেন। স্থানাভাব বশতঃ বর্তমান সংখ্যায় বিষদ ভাবে উক্ত বিষোদ্গার সম্পর্কে আমরা কিছু উল্লেখ করতে পারলাম না। আগামী সংখ্যায় 'কৃষ্ণ/শৈলজানন্দ' প্রসংগে আমাদের সংবাদ প্রতিনিধি যিনি নিমন্ত্রিত হয়ে ওদিন উপস্থিত ছিলেন—ভদ্রতার খাতিরে প্রতিবাদ না জানিয়ে শৈলজানন্দের বিষোদ্গার সাময়িকভাবে হজম করে এসেছিলেন—তিনিই এ বিষয়ে আলোচনা করবেন।

মাই সিসটার—নিউ থিয়েটার্সের হিন্দিচিত্র 'মাই সিসটার' স্থানীয় একাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। আমরা আগামী সংখ্যায় 'মাই সিসটারের' সমালোচনা প্রকাশ করবো। স্থানাভাব বশতঃ এই সংখ্যায় সমালোচনার স্থান করে দিতে পারলুম না বলে দুঃখিত।

খড়দহে শত শ্রীখোল উৎসব

গত ১০ই চৈত্র রবিবার শ্রীপাট খড়দহে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বাসভবন "কুঞ্জবাটীতে" মহাসমারোহে শত শ্রীখোল উৎসবের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এ বৎসর শ্রীখোলের সংখ্যা ১০২ খানি হয়েছিল। সকাল হতে বহু কীর্তনীয়ার দল শ্রীখোল নিয়ে শ্রীপাট খড়দহে আগমন করেন। প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়ক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য (বরাহনগর), শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ), শ্রীযুক্ত বিনোদলাল গোস্বামী প্রভৃতি বেলা ৩টা হতে সমাগত ভক্তমণ্ডলী সহ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে "কুঞ্জবাটী" হতে বাহির হয়ে কীর্তন সহকারে সারা শ্রীপাট প্রদক্ষীণ করতঃ মুহু'মুহু হরিধ্বনিতে গ্রাম মাতিয়ে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর জীউর শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

বেলা ৫॥০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীজীউর নাট্যমন্দিরে রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। বাঙ্গলার বিখ্যাত সাহিত্যিক ৮৪ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুত কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দক্ষিণেশ্বর) মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ব্যারিষ্টার জজ সুকবি শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, অধ্যাপক শ্রীযুত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ (সলিসিটর), শ্রীযুত মিহিরকুমার সুর (সুর নিয়োগী কুমার লিঃ), ব্যারিষ্টার শ্রীযুত পি, দে (দর্জিপাড়া), প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ শীল, রায় বাহাদুর শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মিত্র (কালীঘাট), রায় বাহাদুর শ্রীযুত বিজয় বিহারী মুখোপাধ্যায় (গোখলে রোড), রায় বাহাদুর শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, (খড়দহ), রায় সাহেব শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (আরিয়াদহ), রায় সাহেব শ্রীযুত তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় (টিটাগড়) প্রভৃতি বহু ভক্ত যোগদান করে আনন্দদান করেন। অনেকের বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা ও সুললিত কীর্তনে সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর জীউ, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়ধ্বনি সহকারে সভা ভঙ্গ হয়। এবং সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ বণ্টনে পরিতৃপ্ত করা হয়। বাংলাদেশে এই ধরণের ধর্মোৎসব এই প্রথম।